



# বান্ধব।

মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন।

তৃতীয় খণ্ড।



শ্রীকালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্তৃক

সম্পাদিত।

ঢাকা-গিরিশচন্দ্র।

মুদ্রিত মণ্ডলাবল প্রণেতার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৮৩।

মূল্য ৩- তিন টাকা।

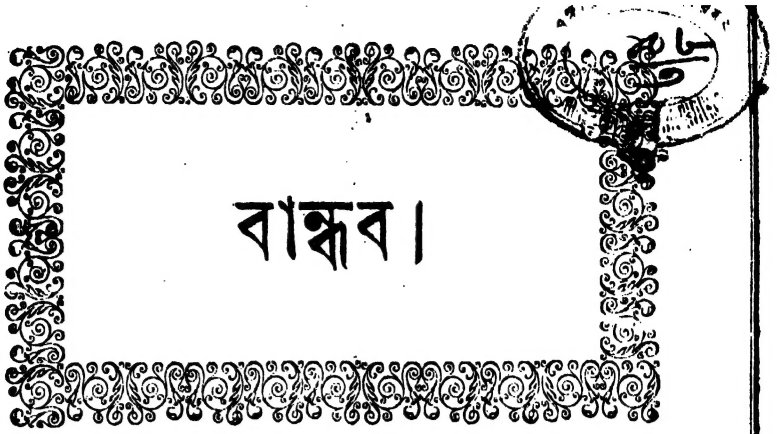




## সূচীপত্র।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অনন্ত শূন্য ( পদ্য )    ..    ..    ..    ..    ..    ..	১২৩
অধ্যয়ন বিষয়ে ক একটি উপদেশ ..    ..    ..    ..    ..	২৪৪
অশিক্ষিত ইস্ত্রিয়ের ত্রয় ও প্রমাদ    ..    ..    ..    ..	২৭১,
অবলাহিতৈষিনী সভার সাংবৎসরিক বিবরণ।    ..    ..    ..	৪২৫
আবুল ফজল    ..    ..    ..    ..    ..    ..	১৮১
অবেক্ষণশক্তি।    ..    ..    ..    ..    ..    ..	৪৩৩
আয়ুর্কেদ।    ..    ..    ..    ..    ..    ..	৪৪৫
এই কি সেই অযোধ্যা ( পদ্য )    ..    ..    ..    ..    ..	১৫৯
কবির উপহার।    ..    ..    ..    ..    ..    ..	১৮০
কার্য ও কারণ।    ..    ..    ..    ..    ..    ..	৩৬৩
কি করি ( পদ্য )    ..    ..    ..    ..    ..    ..	৩১৮
খণ্ড কবিতা।    ..    ..    ..    ..    ..    ..	২৯০
ষোমটা    ..    ..    ..    ..    ..    ..	৪৩৯
চন্দ্রগ্রহণ ( পদ্য )    ..    ..    ..    ..    ..    ..	৩৯৭
জানকীর অগ্নি পরীক্ষা।    ..    ..    ..    ..    ..    ..	১৪৬
জীর্ণোজ্জার।    ..    ..    ..    ..    ..    ..	২২৫
দেবোপাখ্যান। ( খ্রীস ও ভারতবর্ষ )    ..    ..    ..    ..    ..    ..	২২৫, ১২৭, ১২৩, ৩১১, ৪২০
নর্হদার প্রতি ( পদ্য )    ..    ..    ..    ..    ..    ..	১২৭
নাটক।    ..    ..    ..    ..    ..    ..	১০৫
নিম্নুকের এত নিম্ন। কেন ?    ..    ..    ..    ..    ..    ..	১৫৩
নিশীথ চিন্তা ( নদীর জল )    ..    ..    ..    ..    ..    ..	৫৯
পরিত্যক্ত পত্নী ( পদ্য )    ..    ..    ..    ..    ..    ..	২৫১
পার্সিজাতি।    ..    ..    ..    ..    ..    ..	২১০

বিষয়	পৃষ্ঠা।
প্রভু ও ভূতা।	১৩৩
প্রকৃতি ও পশু পক্ষীর সংস্কার।	১৬২
প্রমোদিনী। ( উপস্থাপন )	৩২০
প্রাতঃস্থান ও প্রাতঃক্রিয়া।	৪৩, ৮৫
বধূর অঞ্চল ( পদ্য )	৮৩
বঙ্গদর্শনের বিদায়।	৯৬
বিরজা। ( উপস্থাপন )	৪৮, ৭৪
বিনয়ে বাধা।	২৯৯
বোপদেব ও জীমস্তাগবত।	২৩১
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া।	১
ভারতের ইতিহাস অধ্যায়ন	২০১
ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য	২৬৬
ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ।	৩৯৯
রণরত্নের প্রলাপ	১৯, ২৩৮, ৩৫৭, ৪১৫
রামায়ণ	১২, ৩০৫
কল ত্রিট্যানিয়া ( পদ্য )	২১৬
লাক্ষণীয়	৩৭
লোকরঞ্জন	৩৮৫
শব সাধন ( পদ্য )	৩৪
০ সংক্ষিপ্ত সমালোচন	৬৩, ১০১, ১৮২, ২১৯, ৩০২, ৩৮২, ৪৬১
সাধনা ও সিদ্ধি	৬৫
স্বয়ং নিগম	২৫৪,
০ সমালোচনের সমালোচনা	৩৭০
ছয়গোঁড়ী	১৬৯,



# বান্ধব ।

## মাসিক প্রবন্ধ ও সমালোচন ।

৩য় খণ্ড ।

বৈশাখ । ১২৮৩ । জ্যৈষ্ঠ ।

[ ১ম ও ২য় সংখ্যা ।

### বৃটিশ ইণ্ডিয়া ।

“ পুরা যত্র শ্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাং

বিপর্যাসং যাতো ঘনবিলম্বতাবঃ কিতিকহাম্ ।

বহোদৃষ্টিং কালাদপরিমিব মনো বনমিদং

নিবেশঃ শৈলানাং তদিদৃশিতি বুদ্ধিং ত্রুতয়তি ॥

যখন দুর্বারপরাক্রম জুলিয়স সিজর,  
খৃষ্টের ৫৫ বৎসর পূর্বে, কতিপয় অর্ণব-  
পোত এবং কএক সহস্র সৈনিক লইয়া  
রটেনিয়ার উপকূলে প্রথম উপনীত হই-  
লেন, তখন ইহা দেখিয়াই তাঁহার নিরতি-  
শয় কোভ ও হুঃখ হইল যে, তিনি যাহা-  
দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন, তা-  
হারা অর্দ্ধ মনুষ্য, অর্দ্ধ পশু । অপক মাংস  
তাহাদিগের আহার ; ভূগর্ভ কিংবা ভূগ-  
র্ভের ভ্রায় স্থায় কুটীর তাহাদিগের আবাস-

গৃহ; তকশাখা তাহাদিগের বিনোদ-ক্ষেত্র;  
তাহাদিগের শরীর নীল, পীত, লোহিত  
প্রভৃতি নানা বর্ণে চিত্রিত; মুখচ্ছবি অসুত,  
অদৃষ্টপূর্ব এবং হাস্যরসের উদ্দীপক;  
এবং ভাষা মুখচ্ছবি হইতেও অধিকতর অ-  
সুত, অবগ-কঠোর এবং শাখা-মৃগের ভা-  
ষার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যের অবোধা ।  
আর, যখন বীরচূড়ামণি সেকন্দের সাহ,  
জুলিয়স সিজরেরও প্রায় তিন শত বৎসর  
পূর্বে, পারস্যাদি যবনরাজ্য পদতলে দলন

করিয়ান, দিগ্ধজয়-বাসনার চরিতার্থতাভেদে ভারতের প্রান্তদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ইহা দেখিয়াই তিনি এবং তাঁহার সহচরবর্গ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন যে, তাঁহারা দেশে থাকিয়া যাহাদিগকে এক প্রকার অসভ্য মনে করিতেন, তাহারা সভ্যতা বিষয়ে গ্রীকদিগেরও শিক্ষাণ্ডক । তাহারা রূপে অতুল, হৃদয়-গীত-বাদ্যাদি ক্ষুদ্রমাত্রাংশে গন্ধর্ব্বসদৃশ, তাহাদিগের সৌখ-সমাকীর্ণ নগররাজী ইন্দ্রের অমরাবতী, আচার ব্যবহার সর্ব্বথা পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত, পরিচ্ছদ ও বেশবিন্যাস সুরলোকের উপযুক্ত, প্রকৃতি কাঠিন্য ও কোমলতা এবং দয়াদাক্ষিণ্য ও অভিমানাদি সমস্ত পৌকব-গুণে বিভূষিত, এবং তাহাদিগের ভাষা মন্দাকিনীর তরঙ্গ-ভঙ্গি-জন্য কলনাদের ন্যায় বার পর নাই প্রতিমধুর ও মনোমদ ।

বস্তুতঃ, যুদ্ধের আবির্ভাবসময়ে ভারতবর্ষ যে অবস্থায় ছিল, যদি তাহার সহিত ব্রিটিশ দ্বীপের তদানীন্তন অবস্থার তুলনা করা যায়, তবে এই উভয় স্থানের অধিবাসীরা যে একজাতীয় জীব, একই উপকরণে গঠিত, এবং একরূপ স্বভাববিশিষ্ট এই বিষয়েই মনে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে । যখন ভারতবাসী, শান্তির প্রিয়-নিকেতন স্বরূপ রমণীর তপোবনে অথবা কোম প্রাশস্তরুদয়া তটিনীর মনোহর পু-লিনে যোগাসনে সমাসীন হইয়া, সৃষ্টির প্রাণরূপিণী পরমাশক্তির স্বরূপচিত্তায় নি-মগ্ন হইতেন, অথবা ভদীর আরাধনার জন্য

স্বর্গস্থ দেবতাদিগের ন্যায় জলদগন্তীর ম-ধুরস্বরে সামগান করিতেন, তখন ব্রুটেনি-য়ার অধিবাসীরা ড্রুইডদিগের ভূত-ভয়েই সতত অদীর থাকিত, এবং আপনাদিগের মনোরত্তির অমূরূপ নানাবিধ ভয়ঙ্কর ও বীভৎস মূর্তির নিকট জীবিত মনুষ্যকেও অগ্রিক্রমে ফেলিয়া দিত । যখন ভারতীয় আর্ধ্যসম্ভান, বাসবাস্থ্যাকির হৃদয়কন্দর-নিঃ-সৃত নিরুপম কাব্যসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া, অভিজ্ঞানশকুন্তলের মত কবিদের অলৌ-কিক-মহিমাময় লোকমোহন নাটকাদির অভিনয়দর্শনের জন্য হীরক-হার-শোভিত সুরঙ্গিত সভাস্থলে আসিয়া উপবিষ্ট হই-তেন, এবং সংগীতের অমৃতস্রোতে অঙ্গ চালিয়া দিয়া উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে আনন্দা-র্গবে ভাসিয়া যাইতেন, তখন ব্রিটিশবা-সীরা বানরের ন্যায় লক্ষ বক্ষ প্রদান ক-রিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত, এবং বিকটস্বরে চীৎকার ক-রিতে পারিলেই সংগীতের পরাকাষ্ঠা হ-ইল এইরূপ ভাবিয়া পরিতৃপ্ত রহিত । যখন বীরবিনোদিনী ভারত-ললনা মগ্নমুক্তা প্র-বালাদি অমূল্য বস্তুনিচয়কেও অনুপযুক্ত আভরণ বিবেচনায় অঙ্গে ধারণ করিতে লজ্জিত হইতেন, এবং প্রীতি ও কবিতায় বিলসিত হইয়া আপনারাই সর্ব্বত্র মূর্তিমতী প্রীতি এবং মূর্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় শোভা পাইতেন, তখন ব্রিটিশ-কামিনীরা গশ্চর্ঘ্যে অর্দ্ধ আবৃত হইয়া বার ভার স-হিত ভোগ্যাভাবে বধেচ্ছ বিচরণ করিত,

এবং যে আসিয়া কোন্‌রূপ ভয় প্রদর্শন  
কি বিভ্রম্না করিতে পারিত, তাহাকেই  
তৎকালে পতিজ্ঞান করিয়া তাহার স-  
হিত চলিয়া যাইত। সংক্ষেপতঃ ইহা  
বলিলেই হয়, যখন ভারতে, দর্শন, ধ-  
র্ম‌তত্ত্ব, নীতিবিজ্ঞান এবং রাজনীতি প্র-  
ভৃতি শাস্ত্র চরমোৎকর্ষ পাইয়াছে, জ্যা-  
তিষের আবিষ্কার হইয়াছে, শিল্প-বি-  
দ্যা শত শাখায় মৌল্য বিস্তার ক-  
রিয়াছে, চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় শূরশ্রেষ্ঠ মহাযো-  
ধদিগের অসাধারণ বীর-কীর্তিতে দশদিগ্‌  
বাজিয়া উঠিয়াছে, শাকাসিংহ ও শঙ্ক-  
রাচার্য্য প্রভৃতি সাধুপুরুষদিগের দেব-  
বাণী-সদৃশী উপদেশ-কথা সর্ব্বত্র ছা-  
ইয়া পড়িয়াছে, পাণিনি ও পতঞ্জলাদি  
মুণিগণের ভাষাবিজ্ঞান পৃথিবীতে ভারতীয়  
বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, জগৎ, মৃত্যু এবং  
বিবাহাদি সম্পর্কিত অনুষ্ঠানসমূহ শোধনের  
পরপুনঃশোধনে যতদূর সম্ভব বিশুদ্ধকাস্তি ও  
উন্নতি দেখাইয়াছে, এবং জগতে অদ্যাপি  
যে সকল সামাজিক প্রথের মীমাংসা হয়  
নাই, আর্য্যসমাজ তত্ত্বাবৎ কূট সমস্যার  
মীমাংসা করিয়া সাম্য ও বৈষম্যের মিশ্রণ-  
জনিত সূদৃঢ় ভিত্তিতে স্থির হইয়া দাঁড়াই-  
য়াছে, ব্রিটিশ দ্বীপ তখনও অনক্ষর ও অ-  
জ্ঞানতিমিরারত, এবং তৎকালকার অধিবাসীরা  
তখন পর্য্যন্তও সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যাগণনার  
বহিঃস্থিত।

কিন্তু কালের কি অপূর্ণপ নীলা !  
সংসারের কি বিচিত্র গতি ! আজি সেই

রটেনিয়া ‘রাজরাজেশ্বরী’ এবং আজি  
সেই ভারতভূমি ‘ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া’।

“কোথায় ভারতবর্ষ,- কোথায় ব্রটন,  
অসজ্জা পর্কতশ্রেণী, অনন্ত সাগর,  
অগণিত রাজ্য, উপরাজ্য অগণন,  
অর্ধেক পৃথিবী মধ্যে ব্যাপি কলেবর ;  
ইংলণ্ডের চন্দ্রসূর্য্য দেখে না ভারত,  
ভারতের চন্দ্রসূর্য্য দেখে না ব্রটন ;  
পবনের গতি কিম্বা কম্পনার রথ  
কোন কালে এত দূর করে নি গমন  
আকাশ কুসুম কিম্বা মন্দার যেমন,  
জানিত ভারতবাসী ইংলণ্ড তেমন।

\* \* \*

সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়  
ভারত-অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত,  
এই রবি শীত্ৰ অন্ত হইবার নয়,  
কখনও হইবে কি না জানে ভবিষ্যত।”

পৃথিবীর অন্তস্তলে যে সকল ভৌতি-  
কশক্তি নিহিত রহিয়াছে, তাহার পরস্পর  
সংঘর্ষে কখনও বহুজনাকীর্ণ গ্রীষ্ম জনপদ  
অতলজলে ডুবিয়া গিয়াছে, এবং কখনও  
জলময়ী নিম্নভূমি উর্ধ্বে উন্নমিত হইয়া কা-  
লসহকারে অপূর্ব্ব এক নগরে পরিণত  
হইয়াছে ;—নদ নদী মনুষ্যের বাসযোগ্য  
হইয়া উঠিয়াছে, এবং মনুষ্যের আবাসস্থল  
মকর কুন্ডীরের বিহারস্থল হইয়া পড়ি-  
য়াছে ;—এমন কি, যেখানে যেসমুদিত  
পর্কতমালা তাপসবেশে দগ্ধমান থাকিত,  
সমুদ্রের তরঙ্গ আসিয়া সেখানে ক্রীড়া  
করিতেছে, এবং যেখানে এক সময়ে সমু-

ত্রেয় অনন্তপ্রসারিত নির্বিড় নীলিমা সেই এক ভয়ঙ্কর শোভায় শোভিত রহিত, সেই স্থান ইদানীং পার্শ্বত্যা-পশুপক্ষীর কণ্ঠনাদে অহোরাত্র নিনাদিত হইতেছে । সময়ের আবর্তনে, ভারত আর রুটেনিয়ার যেরূপ অবস্থাগত বিপ্লব ঘটিয়াছে, আমাদিগের বিবেচনায় তাহা কোন অংশেই উল্লিখিত-প্রকার পার্থিব বিপ্লব অপেক্ষা হীনতর বা অল্প বিস্ময়কর নহে । ভারত কি ছিল, এইক্ষণ কি হইয়াছে, আর রুটিশ দ্বীপই বা কি ছিল, এইক্ষণ কি হইয়াছে ! আজি যদি রুটিশ দ্বীপের ভূতপূর্ব ভূপতি কেসি-ভিলনাম স্বকীয় সমাপ্তিমন্দির হইতে পুন-কথিত হইয়া ইংলণ্ডের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পাদচারণা করেন, তাহা হইলে এই ইংলণ্ডই যে সেই ইংলণ্ড ইহা কি কোন প্রকারেই তাঁহার প্রতীতি হইবে ? আর, আজি যদি বীরকুলের চিরকীৰ্ত্তি মহারথী ভীষ্ম কুরুক্ষেত্রের শর-শয্যা হইতে গাত্ৰো-খান করিয়া একবার এই ভারত সাম্রাজ্যের চতুঃসীমায় পরিভ্রমণ করেন, তাহা হইলে এই দেশই যে সেই পুরাতন আৰ্য্যাবর্ত, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ, কেহ সহস্রবার শপথ করিয়া কহিলেও কি একথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিবে ?

আজি এজগতে ইংলণ্ডের ভুলনা কো-থায় ? স্বপ্ন বাহা দূর হইতে দর্শন করিতে পারি নাই, দুরাশাও যেখানে পঙ্কচিতে স-মর্থ হয় নাই, আজি ইংলণ্ডের সৌভাগ্য-লক্ষী তাহারও উর্দ্ধদেশে বিরাজ করিতে

ছেন । যে ইংলণ্ডের কুটীর-পংক্তি দেখিয়া রোমান ও ডেন নরমানেরা পরিহাস ক-রিত, আজি সেই ইংলণ্ডের প্রাসাদ-পংক্তি স্বর্গ-শোভাকেও পরিহাস করিয়া দিগ্দি-গন্তবাসী পরিব্রাজকদিগের বিস্ময় জন্মা-ইতেছে ;—এবং যে ইংলণ্ডের বিকট বুলি এক সময়ে যার পর নাই অশ্রাব্য ছিল, আজি তাহা সকল ভাষার রসাকর্ষণ ক-রিয়া, সকল জাতীর কাব্য এবং কাব্যের সকল প্রকার মধু ও মদিরার পরিপুষ্ট হইয়া, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও চরিতাখ্যান প্রভৃতি অনন্তশাস্ত্রের অনন্ত ভাণ্ডার হ-ইতে বল ও বেগবত্তা পাইয়া, ওয়াসিংটন ন-গর হইতে চায়না ও জাপানের শেষ সীমা পর্য্যন্ত শত কোটি মনুষ্যের জিহ্বায় জি-হ্বায় লীলা করিয়া বেড়াইতেছে । ইংল-ণ্ডের ধন-বৈভব এত বাড়িয়াছে যে, তত্রতা সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা স্বর্ণ কি রক্তত বস্ত্র স্পর্শ করিতেও ভালবাসেন না ; ইংলণ্ডের বিক্রম, ক্ষুধা ও জনবৈভবও এত বাড়িয়াছে যে, সমগ্র যেদিনী করায়ত্ত হইলেও ইংলণ্ডের এইক্ষণ আর পরিতৃপ্তি হয় না । ভূত য-মন প্রত্নর পদাঙ্করাজি দর্শন করিলেই পু-লকে পূর্ণ হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হয়, আজি সপ্তসাগরের উর্ধ্বমালাও রু-টিশ বৈজয়ন্তী দর্শনে সেইরূপ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া প্রেমোচ্ছ্বাস প্রদর্শন করি-তেছে, এবং গিরিশঙ্করের অতি দুর্গম স্থা-নেও সেই বৈজয়ন্তীই দর্পভরে দোলায়িত হইতেছে । পৃথিবীর যেখানে যাও সেখা-

নেই ব্রটিশ স্বর্ষা, ব্রটিশ সভ্যতা, ব্রটিশ জ্ঞান, ব্রটিশ চাতুরী, ব্রটনের প্রতাপ ও সম্প্রদায় এবং ব্রটেনিয়ার নাম-মুদ্রা।

“নব আবিষ্কৃত আমেরিকা দেশে,  
কিবা আফ্রিকার যুগ-ভূমিকায়,  
ঐশ্বর্য্য-শালিনী পূর্ব প্রদেশে,  
ইংলণ্ডের কীর্তি না আছে কোথায় ?  
পূর্ব পশ্চিম গায় সমুদয়।  
জয় জয় জয় ব্রটিশের জয়।

এদিকে ভারত ? ভারত ভূমির প্রতিও একবার ফিরিয়া চাও। যে রাজ্য কোন দিন অবনীর ললাটমণি ছিল—যাহার কমনীয়জ্যোতিঃ প্রাতঃস্বর্ষ্যের কিরণমালার ন্যায় জগৎকে আশ্রয় ও আলোকিত করিয়াছিল, আজি তাহার কি দশা ঘটিয়াছে, তাহাও একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ। ভারতভূমি কোথায় ?—সমীরণ যে গভীর নিশীথে এই দিগন্ত-বিস্তারিত মহাশ্মশানের উপর দিয়া হাঁ হাঁ শব্দে প্রবাহিত হয়, উহাও বিলাপিয়া বিলাপিয়া ইহাই পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে,—ভারত ! তুমি কোথায় ? পৃথিবীর মানচিত্রে কোন দেশকে এইক্ষণ ভারতবর্ষ বলে ? ভারতে যুগান্তর ঘটিয়াছে। উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে বিজ্জাচল এবং পূর্বে চন্দ্রনাথ প্রভৃতি পর্বতপংক্তি ভিন্ন ভারতের সমস্তই প্রলয়পয়োধির জলোচ্ছ্বাসে ধৌত হইয়া গিয়াছে। ভারতের নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা দেখিতেছ, অথবা প্রসূপ্তে যাহার বিবরণ পাঠ করিতেছ,

তাহার নাম ‘ব্রটিশ ইণ্ডিয়া’। নৃতন স্বষ্টি, নৃতন রাজ্য, এবং সর্বত্রই নৃতন শক্তির সঞ্চার-চিহ্ন !

এই নৃতন ভারতের অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস সমস্তই এইক্ষণ ব্রটেনিয়ার। এখানে ভারতবাসী নিজবাসগৃহে, নিজ বাস্তুভূমিতেও পরপ্রত্যাশী, প্রবাসী ; এবং ব্রটন প্রবাসী হইয়াও সর্ব্বেসর্ব্বা ও গৃহ-স্বামী। ব্রটিশ জাতিগের মধ্যে যাহাদিগের মস্তিষ্কে বুদ্ধি, বাহ্যে বস, এবং সমাজে আধিপত্য আছে, যাহারা পুরুষমণ্ডলে পরিগণ্য ব্যক্তি, তাহাদিগের কথা আর অনর্থক কেন উল্লেখ করিব ? যে ব্রটন স্বদেশে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও দিনান্তে মুক্তিমিত উচ্ছিস্টার সংগ্রহ করিতে পারে না, স্বদেশীয় আঢ্য লোকদিগের পদাঘাতেও যাহার অপমান বোধ হয় না, আপনার উদরার সংস্থানের জন্য ভার্য্য বিক্রয়েও যাহার লজ্জা কি ঘৃণা জন্মে না, সেও একলক্ষ সমুদ্র পার হইয়া ভারতীয় মুক্তিকায় পদক্ষেপ করিতে পারিলেই রাজাদিরাজ রাজচক্রবর্তী। তখন তাহার মুখচ্ছবি হইতে অগ্নিরস্ফি হয়, দৃষ্টি সকলকেই যেন ‘দূরে রহ’ বলিয়া আদেশ করে, বাক্যে রাজা এবং রাজসিংহাসনও বিনষ্ট কি বিচূর্ণিত হইয়া যায়—এবং মেদিনী যেন প্রতিপদ-নিক্ষেপেই ধর ধর কাঁপিয়া উঠে। সে যত কেন নিঃস্বল হউক না, এখানে পহঁছিলেই ব্রহ্মাও তাহার ; কারণ লক্ষ্মী এখানে দাসীর ন্যায় তাহার পরিচর্যা ক-



রেন, সৌভাগ্য আপনি গিয়া তাহার শোভা সম্পাদনে রত হন, এবং মান ও সম্পদ এখানে বিনা আহ্বানেও তাহার চরণতলে লুটাইয়া পড়েন। আর, সে যত কেন হু-রত, হুচরিত্র ও কলঙ্কিত হউক না, এখানে সমাগমমাত্রই সে 'শুদ্ধ-ক্ষটিক-সঙ্কাশ' নি-বুল পুঙ্খ; কারণ চন্দ্রেও কলঙ্করোখা সম্ভবে, তথাপি এই ভারতরাজ্যে রুটিশ-চরিত্রে ক-খনও কলঙ্ক সম্ভবে না। যদি সে প্রমত্ত ব্যাক্ত ভ্রমূকের মত নরমুণ্ড লইয়া খেলা করে, এখানে তাহার নাম বাকণী-মদ-ম-ত্ততা, যদি সে পরম্ব লুঠন করে, এখানে তাহা প্রমোদ-কৌড়া এবং যদি সে ক্লাইবের মাধু দৃষ্টান্ত অমুসরণ করিয়া কপটলেক্ষ্য প্রস্তত করে, এখানে তাহার পরিচয় অক-ম্পিত-পূর্ব্ব প্রতিভা। নিয়ম তাহারই অ-ধীন, সে নিয়মের অধীন নহে। যে তাহার এহার সহিতে না পারে, সে অশিষ্ট, সে উ-দ্ধত; যে তাহাকে ভোগ্য বস্তু সংগ্রহণ ক-রিয়া দিতে না পারে, সে ষষ্ঠ, সে ধূর্ত; এবং যে পক্ষমুখে তাহার স্তুতিগীত গাইতে না পারে, সে অজ্ঞ, সে মিথ্যাবাদী। তা-হার ইচ্ছায় বিধি, তাহার অভিসম্পাতে বিপদ, এবং তাহার সন্দেহ কি চিন্ত-বিকার জন্মিলে, নিতান্ত অসম্ভব্য স্থলেও সর্ব্বনাশ কি ঘোরতর বিপ্লব। ভারতগত রুটনদিগের সকলই যে এইরূপ, এমন বলা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমরা শুধু কি জানে যেকলে নহি। স্মৃতরাং একজন কি একশত জনের চরিত্র দেখি-

য়াও একটি সমগ্রজাতির চরিত্র সম্বন্ধে কোন রূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতে আমা-দিগের সাহস হয় না। আমরা জানি যে, বৃটিশ দ্বীপ হইতে এদেশে যাহারা আ-সিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেককে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেও লোকের প্রবৃত্তি হ-ইতে পারে, তাঁহাদিগের সংস্পর্শেও মনুষ্য রুতার্থ হয়। কিন্তু রুটিশ বংশীয় অপদে-বতাও যে এখানে আসিয়া উপরোক্তরূপে দেবতা এবং অনাহুত অধিপতি হইয়া বসে, কে এ কথার অপলাপ করিবে?

এদেশে রুটনের বাহ্যপ্রতাপ যদি ঐরূপ বিশ্বয়জনক, রুটনের অভ্যন্তরীণ প্র-তাপ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর বিশ্বয়-জনক। জাতিবিশেষের উপর জাতিবিশে-ষের বাহ্য প্রভুতায় শরীর ও সম্পত্তিমাত্র ল্পষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রভুতায় সমাজের আত্মা এবং প্রাণ প-র্য্যন্ত আহত হয়। জর্ম্মণ এবং ফরাসি এই দুই জাতিতে বহুকাল ব্যাপিয়া বিরোধ বা-ইতেছে। কখনও ফরাসি বীর বার্লিন ন-গরে জয় ভেরী বাজাইয়াছে এবং কখনও জর্ম্মণ পল্লপাল পারিশ নগরে প্রবিক্ত হইয়া পৈতৃক শ্রুণ পরিশোধ করিয়াছে। আল-শেব আর লোরেন, তদ্ভবায়ের করম্বত তুরি-বস্ত্রের ন্যায়, একবার ফ্রান্সে গিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে এবং একবার জর্ম্মণীয় করতলস্থ হইতেছে। কিন্তু আজি পর্য্যন্তও ফ্রান্স জর্ম্মণী হয় নাই, কিংবা জর্ম্মণী ফ্রান্স হইয়া যায় নাই। রুটনের সংস্পর্শে

ভারতসমাজে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব  
বটিকাছে,—বৃটেনের পরাক্রম কেবল বা-  
হিরেই পর্যাবসিত না হইয়া একবারে সমা-  
জের মূল পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।  
ভারতে যেখানে বেদ ও উপনিষদাদির

পঠন পাঠনা হইত, সেখানে এইক্ষণ বা-  
ইবল; যেখানে মন্ত্রি রাজবল্লভাদিশা-  
স্ত্রপ্রবর্তকদিগের পূজা হইত, সেখানে এই-  
ক্ষণ ব্লাকফোর্ড, বেম্বাম এবং ফ্রিফেন;  
ভারতের বধু এইক্ষণ বিবি, ভারতের বৈ-  
কুণ্ঠ এইক্ষণ বিলাত, এবং ভারতবাসীর  
কৈবল্যলাভ এইক্ষণ ব্রিটিশ-রুষের প্রসন্ন

। ভক্ত যেমন ভববন্ধন মোচনের জন্ত  
বরদার আরাধনা করে, বর্তমান ভারতও  
সেইরূপ ভবভঙ্গ হইতে অব্যাহতি লাভের  
জন্ত বৃটেনিয়ার আরাধনা করিতেছে;—  
কখনও উল্লেখনেত্র, কখনও অব্যাহতি, কখনও  
উত্তানশায় এবং কখনও বা একপদে দণ্ডা-  
সন্মান হইয়া ঐ একই মূর্তির ধ্যান ধারণায়  
নিমগ্ন রহিয়াছে। এদেশে কবি কাব্য লি-  
খিবেন, তাহার বিষয় এলবার্ট কি এডও-  
য়ার্ড, এবং আদর্শ মিল্টন কি বাইরন;—  
সমাজ-সংস্কারক নিজ্জীব হিন্দুলমাজে তা-  
ড়িত-বল প্রয়োগ করিয়া পুনরায় উদ্ধাকে  
সজীব করিবেন, তাঁহার অশ্রুপাত ব্রিফেল  
নগরে কি বার্মিংহামে; এদেশে বিবাহ  
পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহার ব্যবস্থা-  
দাতা মোক্ষমূলর; বেদাঙ্গ ও ব্যাকরণাদি  
শাস্ত্রের ভাষ্যকার গোণ্ডকর; অতি-  
ধামকর্তা উইলিয়ম কি উইলসন; পরিধের

বস্ত্র মানচেস্টারে লবণ লিভরপুলে; এবং  
এনেশের জীবন, মৃত্যু, উত্থান ও পতন  
এবং শুভাশুভ যত কিছু কল্পিত হইতে  
পারে, তাহার বিধিলিপি ব্রিটিশ পার্লিমা-  
য়েণ্টে।

ভারতে পাপ পুণ্য এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের  
মুম্ব্য পার্থক্যও এইক্ষণ প্রফালিত হইয়া  
গিয়াছে, নীতি শাস্ত্র সংক্ষিপ্ত হইয়া পাড়ি-  
য়াছে, এবং ভজনা ও আরাধনা রূপান্তর  
লাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম কি আর পুণ্য কিসে  
এই কথা লইয়া পুরাতন দার্শনিকগণ কতই  
শাস্ত্র মন্ডন ও বিচার বিতর্ক করিয়াছেন।  
ভারতবাসীর ধর্ম্ম এবং পুণ্য, ইহকাল এবং  
পরকাল সমস্তই এইক্ষণ ব্রিটেনের সেবক-  
জন-বাহিত পদপঙ্কজে! গোপনে কি স্ব-  
জাতীয় সমাজের জান-গোচরে কোন  
সংকার্যের অনুষ্ঠান করিলে এইক্ষণ আর  
ভারতবাসীর আত্মা পরিতৃপ্ত হয় না। যে  
অনুষ্ঠান ব্রিটিশ চক্রার বিঘোষিত না হইল,  
তাহা অনুষ্ঠান নহে, এবং যে কার্যের গ-  
শোধনি পার্কট ও সাগর লঙ্ঘন করিয়া ব্রি-  
টেনিয়ার উপকূলে গিয়া না ঠেকিল, তাহাও  
কোনরূপ কার্য মধ্যে গণনীয় নহে। বাহা  
ব্রিটিশ চক্রে প্রীতিপ্রদ তাহাই পবিত্র এবং  
মঙ্গলকর; এবং বাহা ব্রিটিশ চক্রে অপবিত্র,  
সহস্র অনুশাষণ থাকিলেও তাহা অপবিত্র  
এবং অমঙ্গলের নিদান। ভাবগদগদ ধর্ম্মো-  
পদেশকগণ ব্রিটেনিয়াকে অতিক্রম করিয়া  
ইফ্রিম জপ করিতেও এইক্ষণ ভালবাসেন  
না, অথবা মনে উৎসাহ পান না। গুত্তরাৎ

এদেশে প্রার্থনা এবং ভ্রূকৃতির জন্য অনু-  
তাপাদিও ইন্দানীং বিজেতৃ-ভাষাতেই অহ-  
রহঃ পরিবাক্ত হইয়া থাকে। যেন রুটন আগে  
না শুনিলে বিধাতাও শুনিতো পান না,  
এবং রুটিশ হৃদয় বিগলিত না হইলে দয়ার  
সেই অনন্ত প্রস্রবণও বিগলিত হয় না।  
অহো লজ্জা ! অহো লাঞ্ছনা ! অহো বিড়-  
ম্বনা ! পৃথিবীতে জেতা এবং পরাজিত,  
অথবা আশ্রয় এবং আশ্রিতের মধ্যে কোন  
দেশেও কি কামিন্‌কালে এইরূপ উপাস্য  
উপাসকের সম্বন্ধ ঘটিয়াছে ? আজি সেই  
জয়মাল্যভূষিত জগদাক্ষর অর্ধাজ্ঞাতির ক্রী-  
ড়াকাননকপিণী ভারত ভূমি আহারে ব্যব-  
হারে, শিক্ষায় ও দীক্ষায়, ভাষায় ও বেশ  
বিন্যাস-ভজিমায়ে, আমোদে উৎসবে, এবং  
লৌকিক ও অলৌকিক সর্ববিধ ব্যাপারে  
যে রূপ ‘রুটিশ ইতিহাস’ হইয়াছে, ভেক-  
ভুজ্জলভাবাপন্ন অথ কোন দুই জাতিতেই  
কি কখনও এইরূপ দেখা গিয়াছে ?

এই অচিন্তিত-পূর্ব অবস্থান্তর পর্য্য-  
লোচনা করিয়া, সকলেই ইহা জিজ্ঞাসা  
করিবেন ;—এইরূপ কেন হইল ? আমা-  
দিগেরও ইহাই প্রধান জিজ্ঞাসা,—এইরূপ  
কেন হইল ? আজি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্রতর  
রুটিশ দ্বীপের ইতিহাস জগতে কেন এইরূপ  
গৌরবের ছটায় শোভা পাইল, এবং আজি  
ভারতবর্ষের ইতিহাসও কেন অতল কলঙ্ক-  
মাগরে ডুবিয়া গেল ? এ প্রশ্ন পরিহাসের  
নহে। যদিও পণ্ডিতেরা উপদেশ করিয়া-  
ছেন যে, “ কৃত্যস্য করণং নাস্তি গত্যস্যা-

নাস্তি হৃদনা ”, অর্থাৎ যাহা হইয়া গিয়াছে  
তাহা আর ফিরিবার নহে এবং গত বিষ-  
য়ের অনুস্মৃতি রূপা, কিন্তু একথায় আমা-  
দিগের মন প্রবোধ মানেন না। আমাদি-  
গের এইরূপ বিশ্বাস যে, যাহা অতীত তা-  
হাই ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা। অত-  
এব অতীত কথার মর্মোদ্ধার করিয়াই ভবি-  
ষ্যতের অর্থগ্রহ করিতে হইবে। বালক পদ-  
স্থলন-বেদনা হইতেই ভবিষ্যতে পাদচা-  
রণা করিতে শিক্ষা পাইয়া থাকে, এবং  
যেসকল জাতি অধঃপাতে গিয়াছে তা-  
হারও ঐ অধঃপাতের দুর্ভোগ হইতেই পু-  
নরুত্থানের উপায় দর্শন করে। ভারতবর্ষ  
একবারে অধঃপাতে গিয়াছে। যদি উহার  
পুনরুত্থানের সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহার  
অবলম্বনযুক্তি ঐ অধঃপাতে। রূপা চীৎ-  
কার করিলে হইবে না, রূপা আশ্রয় লন ক-  
রিলেও হইবে না। কিন্তু অতি স্থিরভাবে,  
অতি প্রশান্তবুদ্ধিতে, অতীব গান্ধীর্ষ্যসহ-  
কারে রুটন আর ভারতীয়-আর্য্য এই উ-  
ভয় জাতির অভ্যুদয় এবং অধোগমনের  
মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

ভারতে কি বীরত্বের অভাব ? যিনি  
ভারত-সম্মানকে নিরীক্ষা কাপুরুষ বলেন,  
তিনি মনুষ্য-প্রকৃতি বিষয়ে অদ্যাপি অন-  
ভিজ্ঞ। রামায়ণ যে দেশের আদি কাব্য,  
মহাভারতের বীররসবিলাসিনী প্রমাদিনী  
বর্ণনায় যে দেশের আভাবিক চিত্র, এবং  
ভারবি ও মাঘ যে দেশের শেষ সময়ের  
কবি, সে দেশ যে কোন সময়েও পুরুষ-

কারের মোহন-মাধুরি বিষয়ে অন্ধ ছিল, এমন কথা মনে করাও নিষ্ঠুরতা। এই যে সে দিনও রাজপুত জাতি ভারতীয় রাজত্ব-মিতে ক্রীড়া করিয়াছে, ইহাদিগের ক্রিয়াকলাপও কি পুরাতত্ত্বশাস্ত্র বিন্মুত হইবে? স্বদেশীয়েরাই বরং স্বদেশবাসীমোহিত হইয়া একে আর কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু বিদেশীয়ের আর তাহা হয় না। বিদেশীয় কর্ণেল টড রাজপুতচরিত্রের গরিমা ও বীর্যবত্তা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কাহার চক্ষু না অশ্রুজলে পরিপ্লুত হয়? কোন্ নিকং-সাহ হৃদয় না অভিমানে ক্ষীত ও ক্ষীত হইয়া উঠে? তিনি বলিয়াছেন,—“রাজস্থানের যেখানে যাও, সেখানেই ঋষ্যপোলী, যে রাজ্যে প্রবিষ্ট হও, সেই রাজ্যেই লিয়নিডাস”। মনে রাখিও,—ঋষ্যপোলী আর লিয়নিডাস সামান্য নাম নহে। ঐতিহাসের আদরের ধন পুরাতন ঐশ্বদেশে যদি কোন পুণাপুঙ্কময় মহাতীর্থ থাকে, সেই তীর্থ ঋষ্যপোলী;—আর, স্বর্গস্থ বীরেন্দ্রসমাজে যদি কোন প্রাতঃস্মরণীয় বীর দেশাতুরাগ এবং অদীনপরাক্রমের জন্ম সকলের প্রাণ-গত আকাংক্ষা এবং প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইতে অধিকারী হইয়া থাকেন, সেই বীর লিয়নিডাস। ঐতিহাসিকের পক্ষপাতশূন্য কঠোর দেখনী যে দেশের অধিকাংশ যোদ্ধৃপুরুষকেই লিয়নিডাস এবং অধিকাংশ বুদ্ধবৃদ্ধকেই ঋষ্যপোলী বলিয়া অভিধান করিয়াছে, সেই দেশও কি বীরত্ব-

শূন্য? পশ্চিমবঙ্গের ডক এবং অন্যান্য পুরাতত্ত্বলেখকগণ মহারাজারদিগের যে বিবরণী দিয়াছেন, তাহাও ভারতের অশঙ্কর নহে। ফলতঃ রাজপুত যদি মদগর্বে সিংহ, মহারাজী তবে শার্দূল, এবং নেপালী ও পঞ্জাবী প্রভৃতি অন্যান্য জাতীয়েরাও অনেক গুণেই ইহাদিগেরই অনুরূপ। মুসলমান সম্রাটগণ ইহাদিগেরই কোন না কোন জাতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছেন; ভারতে ব্রিটিশ পতাকাও ইহাদিগেরই কোন না কোন জাতির বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহাদিগের আকস্মিক ক্রোধস্বরূপ যে ভয়ানক ভূকম্পে ব্রিটিশ-সিংহাসন টলমল হইয়াছিল, তাহাও পুনরায় ইহাদিগেরই কোন না কোন জাতির প্রভুপারায়ণতার রক্ষা পাইয়াছে; এবং চীন, তাতার, আফগান ও বর্মী প্রভৃতি বিদ্রোহের প্রতিবেশীরাও ইহাদিগেরই গর্জনধ্বনিতে বুটনের নিকট নিস্তর হইয়া রহিয়াছে। ভারত, চিরকালই এইরূপ বীরতার বিহারক্ষেত্র। কিন্তু তথাপি উহা পূরের নিকট আত্মবিক্রয় করিতে বাধ্য কিংবা প্ররোচিত হইল কেন?

ভগবন্তক বৃদ্ধ বলিবেন, ‘ইহা ললাটের লেখা’। ললাটে যাহা লিখিত থাকে, কিছুতেই তাহার খণ্ডন হয় না; স্বর্বাঙ্গ কক্ষত্রক হইলেও ললাট-লিপির অন্যথা ঘটে না। আবার, পাশ্চাত্য-প্রবাদতত্ত্ব ঋষ্যপুত্রত নব্যবাব বলিবেন, ইহা বিধাতার ‘বিশেষ বিধান’। কিন্তু এই নিয়মতত্ত্ব লোহবুগে এই উত্তর সিদ্ধান্তই

অর্থোক্তিক ও অবলাজনযোগ্য বলিয়া উপেক্ষণীয়, এবং আশাশূন্য ও সর্বপ্রকার উদ্যমের অন্তরায় স্বরূপ বলিয়া বুদ্ধিমানের পরিত্যক্ত। যাহা পাপ, যাহা প্রতারণা, যাহাতে ছলনা, বঞ্চনা, এবং নির্যম নিষ্ঠুর ব্যবহারের পরিসীমা নাই, রাজনীতির সেই কুটনীলাও কি লস্যাটলিপি এবং বিধাতারই ‘বিশেষবিধি’? আর, আজি এই লস্যাটলিপি এবং দৈবনির্দিষ্ট ‘বিশেষ বিধির’ অনুশাসনেই কি ভারত পৃথিবীর জাতীয়-সভার আসনচ্যুত, অস্তিত্বহীন, নিস্পন্দ ও নীরব? হাঁহারা, পার্শ্বিক পক্ষের অস্পৃশ্য, অচিত্ত-প্রকৃতি বিদাতৃপুরুষে, এইরূপ মোকাচারের কলকারোপণ করেন, তাহারার পর নাই সরলমতি হইতে পারেন, কিন্তু কখনও মনুষ্যমণ্ডলীর অধিনায়কতার উপযুক্ত নহেন। তাঁহাদিগের দ্বারা লু-তাত্ত্বসদৃশ দর্শনশাস্ত্রের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, কিন্তু কখনও স্বজাতির কোন উপকার দর্শে না।

পক্ষান্তরে, হাঁহারা সংসারের নিয়মাবলী এবং সংসারের ঘটনানিচয় পাঠ করিয়াই সাংসারিক ব্যাপারের কার্যকারণ নিরূপণ এবং নীতিমূলক নির্বাচন করেন,—ঐহিক কথার মীমাংসায় ঐহিক শাস্ত্রেরই সাহায্য লন, উল্লিখিত বিষয়ে তাঁহাদিগের ধারণা অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন যে, বটন আর ভারতবাসীর প্রকৃতিগত প্রভেদ এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে সেই প্রভেদের ক্রমিক বিকাশই এই উভয়ের অধুনাতন অবস্থাগত

প্রভেদের একমাত্র কারণ। বৃটিশ জাতি যে মস্ত্রের সাধনা করিয়াছে, তাহার সেই মস্ত্রে সিদ্ধি হইয়াছে; আর ভারতবাসীও যে মস্ত্রের জপনা দ্বারা ইহলোকেই মোকান্তরীর অনন্ত নিত্রার কাষনা করিয়াছে, তাহারও সেই মস্ত্রে ঠিক সেই ফলই ফলিয়াছে।

বৃটিশের মূলমন্ত্র অকৃপ্তি, অসম্বোধ; ভারতবাসীর মূলমন্ত্র কৃপ্তি আর লজ। বৃটিশ নিতাক্রিয়াহিত, নিরালস্য এবং নিত্যা-হীন;—ভারতবাসী ক্রিয়ামুগ্ধ, আলস্য-মগ্ন এবং স্বভাবতঃ চিরনিত্রাভিভূত। বৃটিশের সকল কার্যই সংযোগে;—অভ্যন্তরে শত সহস্র বিরোধ থাকিলেও তাহার সংযুক্ত হইবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং একতাতেই তাহার বল, একতাতেই তাহার বৃদ্ধি ও বৈভব, এবং একতাতেই তাহার মুখ। ভারতবাসীর সকল কার্যই বিরোধে;—কেহ সংযোজন করিয়া দিলেও সে আপন হইতে পুনরায় বিযুক্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং অটনেকোই তাহার দুর্বলতা, অটনেকোই তাহার ক্ষয় ও পরাভব এবং অটনেকোই তাহার দুঃখ। বৃটিশের চক্ৰ, বিজ্ঞান এবং ইতিহাস; ভারতের চক্ৰ, দর্শন এবং কাব্য। ইহাও উভয়ের প্রকৃতিগত বিরোধেরই ফল। বৃটিশের ধর্মনীতি ‘লাভ’; ভারতবাসীর ধর্মনীতি ‘দান’। বৃটিশের রাজনীতি ‘অবিশ্বাস’; ভারতবাসীর রাজনীতি ‘বিশ্বাস’। এই শ্লেষোক্ত কথা শাস্ত্র

দ্বারা সপ্রমাণ না হইলেও শত সহস্র কার্গা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। ব্রিটিশের সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব ‘স্বত্ব’; স্বত্বরক্ষা এবং স্বত্ববিস্তারের জন্য সে সকল স্বত্বের জন্য জলাঞ্জলি দিয়া সকল কার্গাই সম্পাদন করিতে পারে। তখন অগ্নি তাহার ভয় জন্মায় না, সাগর তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে না, এবং মেঘ মমতা প্রভৃতি কোন বন্ধনীই তাহাকে বন্ধন করিতে অথবা অনাহার, অনিদ্রা, অনাশ্রয় পর্য্যটন, কারাবাস, অপমান, ও মৃত্যুযজ্ঞনা প্রভৃতি কোন বিধিযিকাই প্রতিবন্ধকরূপে তাহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না। ভারতবাসীর সকল তত্ত্বের সারতত্ত্ব শান্তিরসান্বিত নিকপদ্রব ‘স্বত্ব’। সে এই অকণ্টক স্বত্বের তুলনায় কোন স্বত্বকেই স্বত্ব বলিয়া মানেন না, কোন নিগ্রাহকেই নিগ্রাহ বলিয়া গণনা করেন না, এবং যদি সৃষ্টি মন্তকের উপর দিয়া বিপর্যাস্ত হইয়া যায়, তথাপি সে আপনি তাহাও সেই ‘স্বত্ব’ লইয়া অক্ষুণ্ণ ও অক্ষত রহিলে তৎপ্রতি ফিরিয়া চায় না। এই জন্যই ব্রিটেনিয়ার মেগনাচাটার চুক্তিদ্বারা, এবং এই জন্যই ভারতে দণ্ডশাস্ত্রের দৃঢ় নিগড়। সার্থকজন্মা রুটন এই সমস্ত হেতুতেই দ্বিতীয় বিশ্বকর্ষার ন্যায় ভূতলে স্বর্গ নির্মাণ করিয়াছে, আর ভারতবাসীও এই সমস্ত হেতুতেই ভূতলস্থ বা-

পারে বীতশ্মুহ ও কমতাহীন হইয়া মন-ধীরে স্বর্গবাসী হইতেছে!

ভারতের এইক্ষণ যদি কিছু আশা থাকে, সেই আশাও, বোধ হয়, এই ব্রিটেনে! ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, স্মৃতি হউক, আর দুঃখে হউক, ব্রিটনের স্বার্থেই ভারতের পুনর্জীবন-সম্ভাবনা। ব্রিটন দ্বারা অনুরোধে বাহা না করিয়াছে, কর্তব্য-বুদ্ধি ও রক্তজ্ঞতার শাসনেও বাহা না করিতে পারিয়াছে, সম্ভবতঃ এইক্ষণ স্বার্থের অনুরোধে তাহা করিবে, এবং ইউরোপে আপনার শক্তি, সম্পদ, ও স্থান বৃদ্ধির জন্যই ভারতের মৃতকম্প দেখে ধীরে ধীরে বৈদ্র্যাত-বল চালনা করিতে যত্নপর হইবে। অতএব ইহা সকলেরই প্রার্থনীয়, অন্ততঃ প্রয়োজনের জন্যও বাঞ্ছনীয়, যে, এই দুইয়ের বর্তমান সম্বন্ধ দীর্ঘস্থায়ী হইয়া উত্তরোত্তর অধিকতর জড়িত হউক, এবং উহা বিশেষশূন্য ও শূন্যতাবর্জিত হইয়া অতঃপর দুইয়েরই মঙ্গল সাধন করুক। আমেরিকা যেমন ইংলণ্ডের এক অক্ষয় কীর্তি, হইতে পারে এই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াও কালে ব্রিটনজাতির তেমন কি ততোধিক উজ্জ্বল আর এক কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপে দণ্ডায়মান হইবে, এবং কালে যে সকলই সংঘটিত হইতে পারে প্রমাণের উপর পুনরায় ইহার প্রমাণ দিয়া ভবিষ্যৎদীর্ঘগণকে আনন্দিত করিবে।

## রামায়ণ ।

বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের মত ।

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

আমি পূর্বে রামায়ণ হইতে দুটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, রাম-চন্দ্র ও বাল্মীকি একসময়ে বর্তমান ছিলেন, সুতরাং রামের প্রাচীনত্ব সন্দেহে এপর্যন্ত বাহা বলা হইল, তাহা ঠিক বাল্মীকিতে-ও প্রযোজিত হইতে পারে । এইক্ষণে স্বক্ষ-রূপে বাল্মীকি ও রাম এই দুইয়ের অন্যতরের সময় নিকপণ করিতে পারিলেই রামায়ণের প্রাচীনত্ব কতদূরে সীমাবদ্ধ তাহা অনায়াসে পরিস্ফুট হইয়া উঠে । কিন্তু এই-রূপ স্বক্ষতা সহকারে ঈদৃশ বিষয়ের সময়নিকপণ নিরতিশয় দুর্লভ ব্যাপার । এই দুর্লভ কেবল বাল্মীকির রামায়ণেই পর্য্যবসিত হয় নাই, ছোমরের মহাকাব্যে-ও ইহা আবদ্ধ হইয়া সাধারণকে দিশাহারা করিয়া তুলিতেছে ।

বাহা হউক, আমি সমুদয় পৌরাণিক যুগ অতিক্রম করিয়া রামায়ণের প্রাচীনত্ব নিকপণে প্রবৃত্ত হইতেছি । সুপ্রসিদ্ধ পুরাণভট্ট উইলসন ও বগুকের মতে পুরাণ-সমূহ রামায়ণ অপেক্ষা আধুনিক সময়ে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং রামায়ণের প্রাচীনত্ব সন্দেহে পৌরাণিক যুগ বিষয়ক অবা-

স্তর তর্কের অবতারণার কোনও আবশ্য-কতা দৃষ্ট হইতেছে না । এতদ্বিক্রম উক্ত সময় পরিগণনা-বহিত করিয়া আমি খ্রীষ্টীয় অব্দের সপ্তাদিক পঞ্চাশৎবর্ষ পূর্ববর্তী সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সময়ে উপনীত হইতেছি । এই সময়ে রামায়ণ-বর্ণিত অতি বিস্তৃত ঘটনার সংক্ষিপ্ত ভাব অবলম্বন পূর্বক একখানি মহাকাব্য প্রণীত হয় ; এই মহাকাব্যকারের নাম কালিদাস, মহাকাব্যের নাম রঘুবংশ । যদি ইহার সংক্ষিপ্ততা রামায়ণের পূর্ববর্তিতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ না হয়, যদি ইহার শিল্পকৌশল্য কল্পনার ত্রীড়াময়ী কবিতাদ্বারা রামায়ণের সারস্বতময়ী ও স্বভাবশোভিনী কবিতার পূর্ববর্তিতা প্রমিত না হয়, তাহা হইলেও কেবল একমাত্র কালিদাসের উক্তি দ্বারা ই রামায়ণকে তৎপ্রণীত রঘুবংশের পূর্ববর্তী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে । কালিদাস রঘুবংশের প্রারম্ভে পূর্বতনপণ্ডিত-দিগকে লক্ষ্য করিয়া স্বীয় মহাকাব্য নিবন্ধনের সূত্রে এইরূপ লিখিয়াছেন :—

“ অথবা কৃত বাগ্ধারে বংশেহস্মিন্  
পূর্বস্মৃতিভিঃ ।

মনো বজ্রসমুৎকীর্ণে হৃদসোবাশ্রি

যে গতিঃ ॥

পূর্বতন পণ্ডিতগণ এই রঘুবংশীয় ইতিবৃত্তের কবীট উল্কাটন করিয়াছেন, হুতরাং হীরকচ্ছিন্ন মণির অভ্যন্তরে হৃদয়ের ন্যায় ইহাতেও আমার প্রবেশ পথ লক্ষিত হইতেছে। যে সমস্ত ভারতীয় কাব্যে রামচরিত বিবৃত হইয়াছে, বাঙ্গালীকিই তৎসমুদয়ের আদি ও অধিষ্ঠিত প্রভাবণ, হুতরাং আমার বিবেচনার কালিদাসলিখিত পূর্বতন পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বাঙ্গালীকির নাম সহজেই নিবেশিত হইয়া উঠিতেছে।

কালিদাসের সময় পরিভাগ করিয়া আরও উর্দ্ধে অগ্রসর হইলে আমার সমক্ষে হিমালয়-ভূখরমালার ন্যায় অনন্তউচ্চতাশোভি গম্ভীর-দৃশ্য মহাকাব্য-সুদৃঢ় পরিদৃষ্ট হয়। ভারতীয় কিম্বদন্তী ইহাকে অতি প্রাচীন বলিয়া নির্দেশ পূর্বক বেদবিভাগকর্ত্তা বাসের ক্রতিভে নিবেশিত করিয়া থাকে। এই উত্তম কাব্যসুদৃঢ় মহাভারত নামে আখ্যাত। আমি এই মহাকাব্যরূপ বিরাট মূর্তির নিকট মন্তক অবনত করিতেছি। প্রাচীনত্ব সত্ত্বে এই মহাকাব্য আমার মতে নিঃসন্দেহ রামায়ণ অপেক্ষা আধুনিক। কোন সাহিত্যগ্রন্থের বিশেষতঃ মহাকাব্যের প্রাচীনত্ব নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার প্রত্যেক সূক্ষ্মাংশের তারতম্য করা বিধেয়। কাব্যের এই সমস্ত সূক্ষ্মাংশ সমধিক প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু কাব্য মধ্যে এই গুলির

সমবয়স ও শৃঙ্খলা বিধানে স্থলবিশেষে প্রাচীনত্বের ইতর বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। এই জন্যই আমি মহাভারতে তদুপাংশ সমূহের শৃঙ্খলা বিধান রামায়ণ অপেক্ষা আধুনিক বলিতেছি। রামায়ণ যে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন তাহা মহাভারতের লিখনভঙ্গীতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। মহাভারতের একস্থলে উল্লিখিত আছে, বাঙ্গালীকি একসময়ে ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ কর্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া সমগ্র রাম-চরিত গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এতদ্ব্যতীত মহাভারতে বাঙ্গালীকি-প্রণীত রামায়ণের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রামায়ণের প্রাচীনত্ব পরিপোষক এই প্রমাণবয়স ব্যতীত ঐক্য চরিতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র (যদিও গীত গোবিন্দ বর্ণিত কৃষ্ণচরিতের সহিত ইহার কোনও সামঞ্জস্য নাই) রামায়ণে পরিদৃষ্ট হয় না, রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তী হইলে বাঙ্গালীকি কখনও ঐক্যের দেবভাবের বিষয় উল্লেখ করিতে তুষ্টিলাভ অবলম্বন করিতেন না। এতদ্বারা রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্যক্ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

আমি রামায়ণের প্রাচীনত্ব সত্ত্বে যে যে সুক্তির উল্লেখ করিলাম, তথ্যক্কে একটি আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। আমি স্বীয় মত অনুসারে রাধিবীর আশ্রয়ে বধ্যসাধ্য উক্ত আপত্তির খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেছি। ভারতীয় কিম্বদন্তী মহাভার-



তকে ব্যাসের স্তুতি বলিয়া নির্দেশ করে । যদি এই ব্যাস বেদবিভাগকর্তা ব্যাসের সহিত অভিন্ন হয়েন তাহা হইলে ইহার আধিভাব সময় বৈদিক সময়ের মধ্যে নিবেশিত হইয়া উঠে । কোণ্ঠককের মতে বেদ গ্রীঃ পূঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল । সুতরাং এই সময় রামায়ণের সময় অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে । কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, ভারতীয় তত্ত্বানুসন্ধারী পণ্ডিতগণ ভারতীয় ব্যাসকে একজন অনিশ্চিত পুরুষের মধ্যে পরিগণনা করিতে পরস্পর ঐকমত্য অবলম্বন করিবেন । বস্তুতঃ আমরা মতে ব্যাস ভারতীয় কল্পনার পোষাপুত্র ও বেদবিভাগের আরোপিতমূর্তী ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে । সুতরাং দৈর্ঘ্য ব্যক্তি যে কোন সময়েই হউক না কেন, বেদ, মহাভারত ও পুরাণের সংগ্রাহকর্তা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না ।

রামায়ণের অবতারণিকায় শ্লোকের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিস্বদন্তী উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্বারা রামায়ণের প্রাচীনত্ব অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তর হইতেছে । এই কিস্বদন্তী নির্দেশ করিয়া থাকে যে, একদা কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের অন্যতরকে নিদাষণের বিধ দেখাতে বাল্মীকির রসনা হইতে অতিক্রান্ত ভাবে এই অশুভুজ্জ্বলের শ্লোক বিনির্গত হয় :—

“না নিষাদপ্রতিষ্ঠাং ভ্রমগমঃ শা-  
বতীঃ সমাঃ ।

যং ক্রৌঞ্চমিথুনাদেক মবধীঃ কাম-  
মোহিতং” ॥

রে নিষাদ তুমি যখন কামমোহিত ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে হত্যা করিলে, তখন জগতে কখনও তোমার প্রতিষ্ঠা লাভ হইবে না ।

রঘুনাথ বাচস্পতি নামক জনৈক উত্তরাঞ্চলীয় টীকাকার এই শ্লোকটি রূপকালঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত করিয়া অন্যান্য অর্থে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন । উদীয় মতে শ্লোকোক্ত নিষাদ শব্দ রাবণের প্রতি এবং ক্রৌঞ্চমিথুন রাম ও সীতার প্রতি আরোপিত হইয়াছে । অর্থাৎ রাবণ নিদ্রা নিষাদের ন্যায় ক্রৌঞ্চমিথুন-সদৃশ সন্তল-দাম্পত্য-প্রেমে আবদ্ধ রাম ও সীতার মূখ বিনষ্ট করিয়াছিল । রঘুনাথ বাচস্পতিরূত এই ব্যাখ্যা নিরবচ্ছিন্ন অন্তঃসার শূন্য ; এতদ্বিবন্ধন আমি ইহাতে কিছুমাত্র আস্থাবান না হইয়া শ্লোকের উৎপত্তি বিষয়ক কিস্বদন্তীর সম্বন্ধেই আর দুই একটি কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি । ঋগ্বেদে শ্লোকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা ।

“মিনীহি শ্লোকমাসো পর্জন্য ইবততনঃ ।\*”  
উক্ত বেদের কবিতা এই শ্লোকের অনুরূপ ছন্দেও প্রণীত হইয়াছে :—

“ইলাহি সোম ইন্দ্বে ত্রাস্তা চকার বর্ধনং ।

শবিত্ত বজ্রয়োজনা পৃথিব্যা নিশল্য

অহিং ॥ ” †

\* ঋগ্বেদ সংহিতা । ৩৮ ।

† ঋগ্বেদসংহিতা । ৮ ।

একগে বাম্বীকিই যদি সর্ব্বাণো অমুর্ত্ব  
 ক্ষুদ্রাক্ষক স্নোক রামায়ণে নিবেশিত ক-  
 রিয়া থাকেন, তাহা হইলে বেদে কিরূপে  
 তাহা প্রবেশিত হইতে পারে? বেদ অব-  
 নাই রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীন, রামায়ণে  
 যখন বেদের বিশেষ উল্লেখ আছে, তখন  
 এবিষয়ে আর কোনও সন্দেহ জগিতে  
 পারে না। যাহা হউক এইরূপ পরস্পর  
 বিরুদ্ধতের সামঞ্জস্য রক্ষার্থ কোনও কুট  
 তর্কের আশ্রয়গ্রাহী হইবার আবশ্যকতা  
 নাই। বোধহয় ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে  
 যে, বেদের সমুদয় অংশ সমান প্রাচীন নয়।  
 কোন কোন অংশ অতি প্রাচীন এবং  
 কোন কোন অংশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক  
 সময়ে বিরচিত হইয়া বৈদিক গ্রন্থে স্থান  
 পরিগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং বাম্বীকির  
 উদ্ভাবিত ছন্দে যে সমস্ত কবিতা গ্রথিত  
 হইয়া বেদে প্রকিপ্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়  
 রামায়ণ অপেক্ষা আধুনিক হওয়া অসম্ভা-  
 বিত নহে। উপরে ঋগ্বেদ হইতে অমুর্ত্ব  
 ক্ষুদ্রাক্ষক যে কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা  
 এই সম্ভাবনা অনুসারে রামায়ণ অপেক্ষা  
 অপ্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে;  
 কিন্তু আমি কেবল ঈদৃশ অনুমানমূলক স-  
 ম্ভাবনার উপর নির্ভর না করিয়া অন্ধকার-  
 ময় ইতিহাসপট আলোকিত করিতে অন্য-  
 বিধ আলোকবর্তিকার সাহায্য প্রার্থী হ-  
 ইতে বাধ্য হইতেছি।

মুদ্রাসিক কাশ্মীর ইতিহাস রাজতর-  
 জিনীতে রামায়ণের উল্লেখ আছে। কতি-

পয় বেন-নিম্বাত ব্রাহ্মণ কোন কারণ বি-  
 শেষে ক্রুদ্ধ হইয়া কাশ্মীররাজ দ্বিতীয় দা-  
 মোদরকে অভিশাপ প্রদান করেন, পরি-  
 শেষে প্রমাদিত হইয়া শাপ বিমোচনার্থ  
 এই আদেশ করেন যে, যদি রাজা এক-  
 দিনে সমগ্র রামায়ণ শ্রবণ করেন, তাহা  
 হইলে তাঁহার এই অভিশাপের শাস্তি  
 হইবে :--

“অশেষ মেকেনৈবাক্ষা জ্ঞাত্য রামায়ণং  
 তব।

শাপস্য শাস্তির্ভবিতেক্ষাচিরে তে প্রসা-  
 দিতাঃ ॥” \*

একগে কাশ্মীরের বংশাবলী অনুসারে  
 এই দ্বিতীয় দামোদরের পরবর্ত্তী পাঁচজন  
 রাজার রাজত্বের পর তৃতীয় গোনর্দ কাশ্মী-  
 রের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজ-  
 তরঙ্গিনীর মহাপ্রজ্ঞ অনুবানক ট্রয়ার সা-  
 হেবের গণনা অনুসারে তৃতীয় গোনর্দ  
 খ্রীঃ পূঃ ১১৮২ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন।  
 একগে যদি দ্বিতীয় দামোদর ও তৃতীয় গো-  
 নর্দের মধ্যবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত পাঁচজন রাজার  
 রাজত্বকাল গড়ে ২৪ বৎসর ঃ ধরিয়া দ্বি-  
 তীয় দামোদরের আকির্ভাব সময়ে উপস্থিত  
 হই, তাহা হইলে আমাদিগকে খ্রীঃ পূঃ ৮-  
 তুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে উপনীত হই-  
 তে হয়। আমি এই সমস্ত সময় নিকপণ

\* রাজতরঙ্গিনী। ১। ১৬১।

† ট্রয়ার প্রকাশিত রাজতরঙ্গিনী।

২য়খণ্ড। ৩৭৩ পৃষ্ঠা।

ঃ ঃ।

সম্বন্ধীয় গণনা বিশিষ্ট সূক্ষ্ম ও অবশ্য বি-  
খ্যাসা বলিতে প্রস্তুত নহি, কিহা আমি  
গৌরব প্রয়াসী হইয়া রামায়ণের ঠিক স-  
ময় নির্দ্ধারণ করিতে প্রস্তুত হই নাই। কিন্তু  
আমি বিশ্বাস করি, উপরে রাজতরঙ্গিনী  
হইতে যে বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তদ্বারা  
রামায়ণের অতি প্রাচীনত্ব বিশিষ্ট রূপে  
প্রতিপন্ন হইবে। যে সমস্ত কিশকিন্দী তা-  
রতবর্ষের ইত্যন্ত বিকশিত হইয়া রহি-  
য়াছে তৎসমুদয়ও এই প্রাচীনত্বের দৃ-  
ঢ়তা সম্পাদন করিতেছে। যেমন প্রকাণ্ড  
তরুণের ক্ষুদ্রদেশ হইতে বিবিধ ক্ষুদ্র  
শুল্কের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তদ্রূপ রামা-  
য়ণ হইতে বিবিধ কিশকিন্দী উদ্ভূত হইয়া তা-  
রতবর্ষ পরিচালিত করিয়া রাখিয়াছে। অতি  
প্রাচীন কাল হইতেই এই রামায়ণোক্ত  
কিশকিন্দীতে তারতশরীর ওতপ্রোত। উদ্ভূত  
বিষয়গুলি যখন এত প্রাচীন সময় হইতে  
আপনাদের গতি প্রসারিত করিয়াছে, ত-  
খন উদ্ভব-ক্ষেত্র যে তাহা অপেক্ষা প্রা-  
চীন হইবে, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে  
পারে। যদিও রামায়ণের প্রাচীনত্ব সূক্ষ্ম-  
রূপে নিকশিত না হউক, তথাপি এই স-  
মস্ত বুদ্ধি অনুসারে উহা অতি প্রাচীন কা-  
লীন অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর  
প্রায় বলিয়া নির্দেশ করিলে যথেষ্ট হয়  
আমি ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হইব না।

তাত্ত্বপর্ণী ও পালীসিদ্ধান্ত সিংহল দ্বীপের  
হুটি প্রাচীন নাম। এই সংজ্ঞার খ্রীষ্টীয়  
কতিপয় শতাব্দীর পূর্বে প্রচারিত হই-

রাছে। কিন্তু রামায়ণে এই সংজ্ঞার  
একটিও উল্লেখ নাই। সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-  
পতি অশোকের কএক শতাব্দী পূর্ববর্তী  
মহারাজ বিজয়ের উপনিবেশ স্থাপন উ-  
পলক্ষে যে সিংহল \* নামের উৎপত্তি হই-  
য়াছে, রামায়ণে তাহারও কোন উল্লেখ  
দৃষ্ট হয় না। সিংহল-দ্বীপ রামায়ণে প্রা-  
চীন লঙ্কা নামেই উক্ত হইয়াছে। এরূপ  
পুরাতন নামের সমাবেশও রামায়ণের  
প্রাচীনত্বের একটি বলবৎ প্রমাণ।

রামায়ণের সাধারণ ধর্ম *১২৮৩*

\* অযোধ্যাধিপতি স্বর্ঘ্যবংশপ্রভব রাম-  
জয় সিংহলের দ্বর্জিত ও অসত্য অধিবাসি-  
গণের সহিত সময়ে প্রস্তুত হইয়া তাহা-  
দ্বিগকে সমূলে বিধ্বস্ত করেন, এই বিষয়ই  
রামায়ণের সর্ব প্রধান ঘটনা। এই সাধ-

\*। এরূপ প্রবাদ আছে, বিজয় স্বয়ং  
সিংহের সম্মান ছিলেন বলিয়া লঙ্কা অধি-  
কারের পর তিনি উহার ‘সিংহল’ নাম  
রাখিয়াছিলেন। এই কিশকিন্দী ‘পেহ-  
লুসি’ নামক চীন দেশীয় প্রায় ও রা-  
জাবলীতে সবিস্তর বিবৃত হইয়াছে।

অধ্যাপক লাসেনের মতে বিজয় লঙ্কা  
জয়ের পর উক্ত স্থান কত্রিয় অর্থাৎ বো-  
দ্ধজাতির আবাসভূমি হইল বলিয়া ‘সিং-  
হল’ নাম অর্পণ করিয়াছিলেন। বাহা  
হউক; এই বিজয় কর্তৃক লঙ্কা অধিকার  
যে খ্রীষ্টীয় কএক শতাব্দীর পূর্বে সম্ভ-  
বিত হইয়াছিল, তাহাযে মতবৈধ নাই।

রিক ঘটনাই বাণীকির রসময়ী কবিতায় বিবৃত হইয়া রামায়ণে উপগীত হইয়াছে। রামচন্দ্র যে সমস্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে এই লোকপ্রসিদ্ধ অভিযানে প্ররুত হইলেন, তৎসমুদয় বিদ্যাপরুতশোভী প্রদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু রামায়ণে এই সৈন্যবৃহৎ বানর জাতিতে পরিগণিত হইয়া বানরীকৃষ্টিতে পরিণত হইয়াছে। বোধ হয়, তাহারা অসভ্যপ্রকৃতি ও সংস্কৃতভাষী আৰ্য্যজাতির সহিত সংস্রবশূন্য ছিল বলিয়া বাণীকি তাহাদিগকে এইরূপ পাশবভাবে পরিকীর্তিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র যে জাতির বিরুদ্ধে সমরাদানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহারাও উৎপত্তি, সভ্যতা ও ধর্মভাব বিষয়ে আৰ্য্যজাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নলক্ষণাক্রান্ত। কিন্তু হোমার যেমন ত্রোজান ভূমিতে গ্রীসদেশের সামাজিক আচার ব্যবহার ও ধর্মপদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন, রামায়ণের কবিও সেইরূপ বিধর্মীর অধ্যুষিত লঙ্কার সংস্কৃতভাষী আৰ্য্যজাতির ব্যবহার ও ধর্মমুদ্রাদিত ক্রিয়াকলাপ প্রবর্তিত করিতে ক্রটি করেন নাই। এইজন্যই তদানীন্তন সময়ে উপগীতমান বেদের পবিত্র ধর্ম ও আৰ্য্যজাতির অমুষ্টিত পবিত্র আচার পদ্ধতিতে লক্ষ্য পরিণত হইয়াছিল। রামের এই প্রতিদ্বন্দ্বীগণ রামায়ণে রাক্ষস নামে অভিহিত হইয়াছে। ভারতীয় আৰ্য্যসম্প্রদায়ের মতে রাক্ষসগণ নিরতিশয় হিংস্র, ভয়ানক ও বেদামুদ্রাদিত ক্রিয়াকলাপের

সম্পূর্ণ বিরোধী। এই জন্যই বোধ হয়, রামায়ণ-কবি স্বভাবসিদ্ধ যুগের বশবর্তী হইয়া এই আচার-ভ্রষ্ট জাতিকে রাক্ষসিক ভাবে চিত্রিত করিয়া সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'রাক্ষস' এটি ঐতিহাসিক সত্যোদ্ভূত কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নহে। সুতরাং রাক্ষস নামে কোন বিশেষ প্রাকৃতিক জাতির অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া পূর্বোক্ত কল্পনার আশ্রয়গ্রাহী হওয়াই সর্বগোচর। রাজাবলি নামক সিংহলদ্বীপস্থ রাজবংশের সময়নিরূপণ গ্রন্থে লিখিত আছে, খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয় সংস্কৃতভাষী আৰ্য্যসম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইয়া কলিঙ্গপতন হইতে সিংহলে আগমন পূর্বক তথায় উপনিবেশ ও স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন। এই উপনিবেশ স্থাপনের প্রাকালে সিংহল দ্বীপে বিগত ১৮৪৫ বৎসর হইতে দৈত্যদিগের অধিবাস ছিল। এই দৈত্যগণই সম্ভবতঃ লঙ্কার আদিম অসভ্যজাতি, এবং এই আদিম অসভ্যজাতিই রামায়ণে রাক্ষস রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে রামায়ণের মহাসমর দুটি বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্নধর্মপদ্ধতির সম্প্রদায়ের বিরোমিঞ্জনে সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ঈদৃশ বিপরীত ধর্মাক্রান্ত বিষয়বস্তুর সমাবেশে উত্তম ও অধমতার চিত্র সম্যক্ পরিষ্কৃত হইয়াছে। এরূপ বিভিন্ন বর্ণের চিত্র প্রদর্শন করিয়া অপরের ক্ষম্যে তাহার স্বভাব প্রতিকলিত করা প্রায় প্রতিভার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আমি পূর্বে রামায়ণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে স্বীয় মত সবিস্তরে বিবৃত করিয়াছি। এই প্রাচীনত্বমূলক বিচারে রামায়ণ আবার নিকট ত্রীঃ পুঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণকে এইরূপ প্রাচীন বলিলেও উহা বর্তমান সময়ে আমাদের নিকট তথা-বিধ পুরাতন যুক্তি পরিগ্রহ করিয়া উপস্থিত হয় নাই। কালান্তরাগত বিপ্লব পরম্পরায় ইহার অংশবিশেষও বিপ্লবিত, প্রকিপ্ত ও পরিবর্তিত হইয়াছে। আমি প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় প্রদর্শন করিয়াছি যে, রামায়ণের গৌরদেশ উত্তর ভারতবর্ষপ্রচলিত পাঠের সহিত পরস্পর একতা দৃষ্ট হয় না। ইহাতেই প্রতিপন্ন হইবে যে, সময়ের পরিবর্তনের সহিত রামায়ণের পাঠও পরিবর্তিত হইয়াছে।

✓ ভারতীয় রামায়ণের সহিত হোমার-রচিত গ্রীক মহাকাব্যের অনেক সামান্য লক্ষিত হয়। উভয়ই ভুবন-মোহিনী কম্পনার কোমল করে সমান বিকশিত, উভয়ই প্রকৃতি-মূলভ কোমলতা, নবীকৃততা, জাতীয় কিম্বদন্তী প্রিয়তা, সংক্ষেপতঃ আদিম অবস্থার সমুদয় কবিত্ব সম্পত্তিতে সমান পরিস্ফুট। গ্রীক ও ভারতীয় কবিতা এরূপ সমান গুণশালিনী হইলেও জাতিগত স্বভাব ও প্রতিভার বৈপরীত্য নিবন্ধন পরস্পর বিভিন্ন ধর্মাক্রান্ত। গ্রীসের স্বভাব ও প্রতিভার ফল—মানবের সহিত প্রকৃতির সামঞ্জস্য, ভারতের স্বভাব ও

প্রতিভার ফল—মানবের সহিত প্রকৃতির প্রতিদ্বন্দ্বীতা। একদিকে এই সামঞ্জস্য আদিম গ্রীক মহাকাব্যে, অন্যদিকে এই প্রতিদ্বন্দ্বীতা আদিম ভারতীয় মহাকাব্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

রামায়ণের কবিতা সাধারণতঃ অতি গভীর, অতি মর্মস্পর্শনী ও অতি গৌরবে বিভূষিত হইলেও বর্ণনাবহুল ও অতি বিস্তৃত। ইহা অসীমতায় বিলীন হইয়াছে। হোমারের কবিতা অতি উদগ্র ও অতি সজীব হইলেও গাভীর্য ও কমণীয়তায় সংযত। হোমারে প্রত্যেক মানবচরিত্র বিশিষ্ট স্ফুরণে চিত্রিত হইয়াছে—তাহার ক্ষমতা ও শক্তি অতি সজীবতা সহকারে প্রতিকূলিত হইয়াছে। বাস্তবিকিতে এই মানব চরিত্র প্রকৃতির বিকক্ষে নিয়মান হইয়া সমুদয় বিষয়ে যেন রজ্জুবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। তাহার কার্য, শক্তি কিছুতেই পরিস্ফুট হইয়া অপরের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইতেছে না। অধিক কি, রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্র যদিও গাভীর্য ও ঔদার্যে অটল, তথাপি তাহার চরিত্র যেন স্থলবিশেষে প্রকৃতির বিকক্ষে অত্যাশ্রিত হইয়া মহাসংগ্রামে প্ররক্ত হইয়াছে।

রামায়ণের কবিতা অনন্ত সময়ের অনন্ত কার্যের অনন্ত কিম্বদন্তী অনন্ত ভাব ও অনন্ত কথ্যে পরিপূর্ণ, হোমারের কবিতা সঙ্গীর্ণ বিষয়ের সঙ্গীর্ণ সীমায় সংযত। যদিও ইলিয়াদ অপেক্ষা ওনিসির দৃশ্য অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত করা হইয়াছে,

তথাপি ভারতীয় মহাকাব্যের তুলনায় উহা সঙ্গীতের সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই।

ভাষা বিষয়ে গ্রীক ও ভারতীয় মহাকাব্য উভয়ই সরস, স্বাভাবিক ও কষ্টকল্পনার বহির্ভূত। কিন্তু বাস্তবিক ভাষাসঙ্গীতের রীতি হোমার অপেক্ষা অটল ও সুবাসস্থিত। যাহা হউক সংক্ষেপতঃ রামায়ণ ও হোমারের মহাকাব্য দুটি বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধিত্ব করির দুটি

অতি মহৎ কীর্তিস্থত। শেষটি প্রকৃতির দ্বিত্ব অতি সমঞ্জসীভূত ও শিল্পকুশল। কল্পনার তুলিকায় অতিচিহ্নিত; প্রথমটি প্রতিভার উচ্চভাবে অতি বিস্তৃত ও অতি গৌরবান্বিত। শেষটি রণস্থলবর্তিনী সংহার মূর্তির ন্যায় বিরীতভাবে অবস্থান করিতেছে, প্রথমটি নিরীহস্বভাব সংযত-মনা তপস্বিশ্রেষ্ঠের ন্যায় পবিত্র ভাবে ভাসমান রহিয়াছে।

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

ক্রমণঃ। র—

## রণরঘুর প্রলাপ

শোন শয্যা; জ্ঞান ও মোহ।

বসন্তকুমারের এমন অবস্থা! এই তিন দিন যাত্রা হইল, তাহাকে দেখিয়া আমি-  
যাছি, তাহার সঙ্গে সুরাসুর, সুর-সুর,  
বিজ্ঞা-অবিজ্ঞা, ক্ষোভ-আশা, প্রবৃত্তি-নি-  
বৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা-তৃপ্তি, বিলাস-ভিক্ষা প্র-  
ভৃতি নানা প্রসঙ্গের আলাপ করিয়া আ-  
সিয়াছি;—আর আজি তাহার এই দশা! সে দিন আষোড় প্রমোদে ফাঁকি দিয়াছিলাম, অদ্য কাল আমাকে ফাঁকি দিয়াছে। বুঝি আর বসন্তকুমারের নিকট বিদায় লওয়াও হয় না, বুঝি বসন্ত এজ্ঞেয়র মত ‘আসি’ বলিয়াও আমার প্রণয়ের প-  
রিশোধ দিতে, প্রাণের এ নিদাকণ জ্বালা

নিবারণ করিতে পারিবে না, পাইবে না! বিদাতঃ তোমার মনে কি ইচ্ছাই আছে?

বিদাতঃ! আমি জানি না, লোকে বলে তুমি নিষিকার; তাই বলিয়া কি তুমি আমার সুখ দুঃখ বুঝিবে না? এই বিভীষিকা-  
ময় সংসারে আমাকে একক করিতে তুমি ব্যথিত হইবে না? বিষম সংসারাবর্তে এই তৃণকণকে বিষৃণ্যমান দেখিয়া পরি-  
তুষ্ট হইবে? অলক্ষ্যযোগ্য এই রণরঘুকে তোমার ক্রীড়াকন্দুক করিয়া বালকতা করিবে? তাহা হইলে তোমার যে তা-  
হাই বিকার? নিঃশুণে যে গুণাগুণ হইবে! গুণধাম, তোমার দয়াময় নাম যে লোপ

পাইবে ! প্রভো ! আত্মবিস্মৃত হইও না ;  
বিকার প্রাপ্ত হইও না, মায়াগুণকে আ-  
শ্রয় দিও না, আমাকে পর করিও না ।  
পরাম্পর ! আমি আপন বলিতে পারি,  
এমন আমার একমাত্র আছে, সেই—বসন্ত-  
কুমারকে আশ্রয় করিও না ! যে বীজ  
তোমারই রোপিত, তুমিই তাহাকে উৎ-  
পাটিত করিও না । হায় ! বিধাতা অতী-  
ন্দ্রিয়, আমার কথা তিনি বুঝিবেন না,  
আমি তাহাকে বুঝাইতে পারিব না । ন-  
হিলে, বসন্তকুমারের আজি এমন দশা  
হয় ?

বসন্ত ! কেন তুমি কুটীরবাসী হও  
নাই ? তোমার ত্রিভল হর্গোর সোপান-  
শ্রেণী আমাকে যুগপরিমের পথের ব্যব-  
ধানে রাখিতেছে ; এখন মূলভে যুগ, এ  
বিলম্বের বিড়ম্বনা কি সহ্য যায় ? তুমি  
দাস দাসী পরিব্রত কেন ? এখন কি দৃষ্টি-  
পথে অবরোধ মহা করিতে পারি ? আর  
এমন সময়েও এ উৎকণ্ঠ প্রাণকে অদিক-  
তর উদ্ভ্রান্ত করিয়া বসন্তকুমারকে দেখিতে  
দিবে না, তুমি কে ?

তুমি কে ? সুরসুন্দরী বিনিমিত রূপ ;  
কিন্তু রূপে আভা নাই, তুমি কে ? বিদ্বাৎ-  
খণিলোচন, কিন্তু লোচনে জ্যোতিঃ নাই,  
কটাক্ষ নাই ; আনন্দধাম ওষ্ঠাধর, কিন্তু  
যন্ত্রণা বিকৃষিত, তুমি কে ? পাষাণযুতী,  
কিন্তু অবিরল নীরব অশ্রুপ্লাবিতা, তুমি  
কে ? চপলা, কিন্তু স্পন্দন রহিত, তুমি  
কে ? মৌনব্রতধারিণী বাগ্‌দেবী, তুমি

কে ? কদম্বশাখা হইতে অন্তরে কিন্তু  
শয্যাশায়ীকে হৃদয়ের হৃদয়ে রাখিয়া অ-  
নিমবে নিরীক্ষণ করিতেছ, তুমি কে ?  
কুসুম কুমারী ! অবোধ বালিকে ! ক-  
রতলে এমন করিয়া ললাটগুণ স্থাপন  
করিয়া বসিতে হয় না, উহা যে অশুভ ল-  
ক্ষণ । ছি ছি ! এ সুন্দর অলঙ্কার-নিম্যা-  
ন্দন করতল তুমিতে পাতিয়া থাকিতে হয়  
না । ইহা যে অমঙ্গল চিহ্ন । তুমি যাও,  
গৃহান্তরে যাও, কক্ষান্তরে ব্যাপৃত থাক  
গিয়া । তুমি আদরের সামগ্রী, মাণার  
মণি, সুখের সঙ্গিনী, এ তোমার স্থান নয়,  
আজি তোমার দিন নয় । তুমি বিলাসের  
বধূ, এই দীপ-নির্ব্বাণ সময়ে এখানে কেন ?  
বাঁজুভাঙের হলহলি করিয়া গৃহলক্ষ্মী  
বলিয়া সজ্জা সমারোহে তুমি আনীত,  
এখন তুমি এখানে কেন ?

এসকল কথা আমার মনে উদ্ভিত হ-  
ইলে কি হইবে ? কুসুম কুমারী এতদূর হ-  
ইতে সরিবে না । বজ্রের সর্ব্বস্বান্ত হইবে,  
মর্তী থাকিবেই ; বজ্রের শ্মশানের সঙ্গে  
এই সুখমা চিরজড়িত । আমার বসন্ত,  
বসন্তের কুসুম—এবিচিত্র মিলন, সকলে  
ইহার গৃঢ়তা অশুভব করিতে পারিবে না ।

বসন্ত আমার কেহ নয় ; এই সংসারে  
কেহইত কাহারও নয় । তথাপি বসন্ত  
আমার সর্ব্বস্ব, কারণ বসন্তকে আমি  
ভাল বাসি । দাদা একদিন জিজ্ঞাসা ক-  
রিয়াছিলেন—বসন্তকুমারের সহিত আ-  
মার প্রণয় কেন ?—বধূকে জিজ্ঞাসা ক-

রিসাছিলেন, আমি অন্তরালে থাকিয়া  
শুনিয়াছিলাম, তখন কিছু বলি নাই;  
কিন্তু বলিতে হইলে বলিতাম—কল-  
নাহিনী গঙ্গা সাগরে মিশায় কেন?  
এই সংসাররূপ স্বার্থমরুভূমে প্রেমশল্ল  
সমাস্থাদিত একটু বিরামস্থান থাকিলে  
হানি কি? আমি বসন্তকুমারকে ভাল বা-  
সিলে ক্ষতি কি? বধু ভাবেন, বলেনও যে  
ক্ষতি আছে। তবে আমি করিব কি?  
দাদা বলেন, আমার বিবাহ করা উচিত।  
এ সকল কথাই অন্তরাল হইতে শুনি-  
য়াছি।

অন্তরালে পরের মন্তব্য শুনিতে আ-  
মার নায়গুরু একরা নিবেদন করিয়া  
ছিলেন। কিন্তু আমি এ নিবেদনের তাৎ-  
পর্য্য বুঝি না। স্বার্থ, আর কপটতা,  
আর লোকলজ্জা বাহ্যস্বগতের নির্দ্দাণো-  
পাদান—কয় জনে মুখ ফুটিয়া মনের  
কথা বলে? তবে কি অন্তর্জগতের পরি-  
চয় লইতে হইবে না? তবে কি সংসার-  
বিশয়ে পাদপরিমাণ জ্ঞানেই সন্তুষ্ট হ-  
ইতে হইবে? যেখানে বিশ্বাস, সেই খা-  
নেই সর্ব্বনাশ; যেখানে প্রণয়, সেই খা-  
নেই মিত্রদ্রোহ; যেখানে শাস্তি সেই খা-  
নেই বিপ্লব; যেখানে দেবতা, সেই খা-  
নেই অশুর; এই সকল তত্ত্ব কালক্রোড়ে  
ভাসিয়া যাইবে, আর আমি তীরে বসিয়া  
থাকিব, অথচ দেখিব না? আমি তাহা  
পারিব না; অন্তরালে থাকিয়া গুপ্ত কথা  
শুনিয়াছি, যত দিন বাঁচিব, সুযোগ পাই-

লেই আবার শুনিব। সংসারকে চিন্তিতেই  
হইবে, কাব্য পাঠ করিতেই হইবে।

আমি বসন্তকুমারকে ভাল বাসি, বধু  
বলেন ইহাতে ক্ষতি আছে, দাদা বলেন,  
আমার বিবাহ করা উচিত। কি প্রকারে  
এই উপপত্তি হয়, তাহা আমি বুঝিতে  
পারি না; এই সকল কথায় কি কাব্য-  
কারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা আমি দেখিতে  
পাই না। আমার বিবাহ! চমৎকার কথা!  
পণ্ডিতগণের বিচারে শুনিয়াছি, বিবাহ না  
করিলে দুইটি দোষ ঘটে, প্রথম, বংশলোপ  
হয়; দ্বিতীয়, চরিত্র নষ্ট হয়। আমার  
বংশলোপ জন্য শঙ্কা নাই; আমি অর্থা-  
কলকলঙ্ক, কুকুরাধম বজ্রমস্তান, পরপ্রসাদ  
প্রত্যাশায় অজ্ঞাতকুলশীল আগন্তকের প-  
দলেহন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ ভাবিয়া  
থাকি; আমার এবংশ কি থাকিলেও রা-  
খিতে আছে?

তবে, চরিত্র নষ্ট হইবার কথা;—  
আমি দাসী-পুত্রের দাস, আমার আবার  
চরিত্র কোথায় যে নষ্ট হইবে? যাহা কিছু  
সৎ, যাহা কিছু মহৎ, যাহাতে সার  
আছে, যাহাতে গৌরব আছে, সে সকলই  
বিসর্জন দিয়া নীচতা, ভীকতা, প্রবঞ্চনাকে  
জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়াছি, আমার কি  
আছে যে নষ্ট হইবে? আমার বলিতে  
কেবল আমি আছি; আমি আছি বলি-  
য়াই, বজ্রমাতার এ দুর্গতি; নহিলে, বজ্র-  
ভূমি কি এই স্বাবরদশাপন্ন হইয়া, পূর্ব্বতন  
অপূর্ব্ব রূপগরিমার রাশি কলঙ্ক-সাগরে



ডুবায়ে। আমার মা বলিয়া পরিচয় দিয়া বেড়ায় ? আমারই জন্য মাতার এত বিড়-  
ম্বনা ; এখন আমার স্থান ছেলেই মাতার  
দুঃখাবসান হয় । বস্তুতঃ আমার নিরীক্ষণ  
হওয়াই উচিত ; আমার চরিত্র অক্ষুণ্ণ রা-  
খিবার কথা আকাশকুসুম তুল্য অলীক ।

আবার গুরুভাবনা পরিত্যাগ করিয়া  
লঘু দৃষ্টিতেও কি বিবাহের কর্তব্যতা বি-  
ষয়ে কেহ ( দাদা ও বধূচাকুরাণী ব্যতীত )  
পরামর্শ দিতে পারেন ? বজ্রক্ষেত্রে আজি  
কালি কএটি কুসুমকুমারী পাইবে ? রক্তা  
জননী প্রত্যবে উঠিয়া প্রাক্তন-পরিষ্করণা-  
বধি পাক-পরিবেশন সম্পন্ন করিয়া পুত্র-  
বধূকে আহ্বারার্থ আহ্বান করিবেন, আর  
বধুর কাককাকারী বা কাবাপাঠের বাধাত  
হইল বলিয়া তিরস্কার সহিবেন ; পুরা গুরু  
স্বামি সহধর্মিণীসমীপে ধর্মোপদেশের  
পাঠ লইবেন, আর প্রণয়চ্ছলে ভক্তি প্রদ-  
র্শন জন্য প্রণয়িনীর পাশ্চাত্যধূলি মার্জন  
করিবেন, এদৃশ্য দেখিতে যাহার নিতান্ত  
সাদ সাহেব বিবাহ ককক । আমি লক্ষ্মী-  
ছাড়া, আমার এ গৃহলক্ষ্মীতে কাজ নাই।  
দেবতা আমাকে বিবাহ হইতে রক্ষা করুন !

অতএব আমি বিবাহ করিব না । দা-  
দার সম্মানরক্ষা আমা হইতে হইল না ;  
বধুর অবাধ্য আমাকে বাধ্য হইয়া, দংয়ে  
পড়িয়া হইতে হইল । শুদ্ধ বিবাহ করিব  
না, তাহা নয় ; বসন্তকুমারকে ছাড়িব না।  
আজি হয় ত শেষ দেখা, আজি কি বধুর  
কথা শুনিয়া, দাদার কথা মানিয়া বসন্ত-

কুমারকে দেখিতে না আসিয়া থাকিতে  
পারিতাম ? থাকিতে পারিলে আসিব  
কেন ?

সুরাপানে যদি পাপ হয়, তবে আ-  
মার বসন্ত পাপী । আজি বসন্ত সেই  
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে ; আজি কি  
কাছারও নিষেধ পালন করিয়া, এখানে  
না আসা আমার সম্ভবে ? বসন্ত দেবতা  
নয়, মানুষ ; সুতরাং তাহার সহজ দোষ  
থাকিতে পারে, তাই বলিয়া আমি তা-  
হাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না ।

আজি যে দৃশ্য দেখিলাম, চিরদিন  
তাহা আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিবে ; গুরু-  
জনের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া যে প্রত্যাবায়-  
গ্রস্ত হইয়াছি, এখানে তদন্থিক জ্ঞানলাভ  
করিলাম । সংসারের বৈচিত্র্য এই স্থলে  
আজি একত্র দেখিলাম । স্বর্গে, নরকে,  
বিলাসভবনে, শ্মশানে, জানে, মোহে মি-  
লিলে যাঁহা হয়, তাঁহা অদ্য প্রত্যক্ষ করি-  
লাম । বসন্ত-কুসুমের আজিকার এই ভাবের  
সমাবেশ চূড়ান্ত কাব্য !

বসন্তকে দেখিতে আসিয়াছি, কিন্তু  
কথা কহিবার চেষ্টা করি নাই । বসন্ত  
বড়ই কাতর ; কথা কহিতে কি পারিবে ?  
সকলেই নীরব, সেই জন্য আমি বসন্তকু-  
মারের নাম ধরিয়া এখন পর্য্যন্ত—এই কি  
জনমের শোধ ?—সম্বোধন করিতেও সা-  
হস পাই নাই । বসন্ত কি পার্শ্বপরিবর্তন  
করিতে পারিবে ? বসন্ত কি আমার পানে  
চাহিয়া দেখিতে পারিবে ? দেখিলে কি

বসন্ত আজি আমাকে চিনিতে পারিবে ?

কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না, আমাকেও কেহ কোনও কথা বলিল না ; অপেক্ষা করিয়াই রহিলাম। ক্রমে গৃহ পরিত্যক্ত হইল, কি ভাবিয়া বলিতে পারি না, একে একে, ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে সকলেই চলিয়া গেল। সকলেই ?—না। আমি রহিলাম, বসন্ত অবশ্যই রহিল, আর রহিল কুসুমকুমারী।

চিকিৎসক ঔষধ রাখিয়া গিয়াছিল, পানপাত্রে ঔষধের মাত্রা পরিমাণ জন্ম কুসুমকুমারী গবাক্ষদ্বার উদঘাটিত করিল, মন্দীভূত রবিকিরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বসন্তের স্নান পাণ্ডুর মুখে পড়িল, বসন্ত মুখ ফিরাইল ;—সে মুখ দেখিয়া আমিই তাহাকে ভাল মত চিনিতে পারিলাম না, বসন্ত আমাকে চিনিবে কি ? কুসুমকুমারী ঔষধ সেবন করাইল, পুনরপি পূর্বস্থানে গিয়া পূর্ববৎ বসিয়া রহিল ; আমি যেখানকার সেইখানেই।

আরও একটু বেলা গেল। বসন্ত মূহুর্জড়িতাবরে কথা কহিল ; আমি উৎকণ্ঠ হইলাম। কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বসন্ত কথা কহিতে লাগিল বুঝিতে পারিলাম না। একবার কুসুমকুমারীর মুখ পানে চাহিলাম, তাহার অশ্রুবেগে ষিঙণিত হইল, কিন্তু মুখে শব্দ নাই।

বসন্ত বলিতে লাগিল :—

“আজিকার সম্বাদ কি ? প্রশিয়ার এ বীরণা সহিবে না, রহিবে না। নাপোলি-

য়ন্ বন্দী ? ফ্রান্সের অধঃপতন ? দেখিব না। দেখিতে হইবে না। পতন ও উত্থান, পর্যায় মাত্র। দিনে হউক, মাসে হউক, বৎসরে হউক, যুগে হউক—কালবশ্তে অদৃষ্টচক্র ঘুরিবেই ঘুরিবে, স্থির রহিবে না। \* \* \* \* \*

কি বলিলে ? আমার চরম কাল উপস্থিত হইয়াছে ? আমাকে চরমেচ্ছাপত্র প্রকাশ করিতে হইবে ? এমন দিন কি হইবে ? আমার শেষ ? আমি ফুরাইলে আমার নাম ফুরাইবে ত ! যদি না ফুরায়। \* \* \* পিপাসা। মা ! ”

আমি অভিভূত হইয়াছিলাম, কুসুমকুমারী কখন উঠিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই। নিকটস্থ একটি পাত্রে কি ছিল, ঔষধ বিবেচনায় বসন্তের মুখে ঢালিয়া দিলাম। বসন্তের চক্ষুঃ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, বসন্ত উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিল, পারিল না। বুঝিলাম বন্ধুর কার্য্য করিয়াছি, কোন বিষ দিয়াছি !

বসন্ত উগ্র হইয়া উঠিল, পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—

“আমি ক্লান্ত নহি। যে হস্তে অমৃত পাইয়াছি, সে হস্তে বিষ লইতে কুণ্ঠিত হই না। আমি কারাগারে, যিনি দয়া করিয়া বা নির্ভরতা প্রকাশিয়া এই কারাগারেব বিভোধিকা আমাকে দেখাইতে জানালোকের সম্পাত করিয়াছেন, তিনি এই যন্ত্রণা ভুলিবার যে উপকরণ দেন, তাহা অবশ্য গ্রাহ্য, তাই আমি

এহণ করিয়াছি। বীৰ্য্য, সাহস, ক্ষমা, দয়া কাহাকে বলে জানি, আমার প্র-  
 যোগ শক্তি নাই, তাহা জানি। তবে কি  
 বন্ধনে মরিব; তাই এই অমিয় সাগরে  
 ডুবিয়াছি। সুরেশ্বরী ভগবতি! দুর্গতি না-  
 শিনি! কুপ্রবৃত্তি দমুজ দলনি! যেদিন কি-  
 রুরীর চরণকঙ্কণী তালে তালে রিমি রিমি  
 রিমি করিল, যে দিন তুমি আমার ম-  
 স্তকে অধিষ্ঠিতা হইয়া সেই মস্তকে সেই ম-  
 ধুর নিরুণ তুলিলে, তুলিয়া এ মস্তকে  
 সে চরণে প্রভেদ নাই এই দিব্যজ্ঞান আ-  
 মায় দিনে, সেই দিনে তোমার মায়া  
 বুঝিলাম। দেবি! তুমি দয়া করিয়া আ-  
 মায় ভ্রমভঞ্জন করিলে। শিখিলাম যে  
 তুমিই আমার গতি। মা! আমি অৰোধ  
 সন্তান; কি দিয়া তোমার পূজা করিব?  
 অভিমানপূর্ণ মন ছিল, পরে কাড়িয়া  
 লইয়াছে; অবশিষ্ট ভালবাসা ছিল,  
 অপাত্রে রণরথকে তাহা পূর্বেই দিয়া ফে-  
 লিয়াছি—“আমি অশ্রু স্রবণ করিতে  
 পারিলাম না—“দেহ আছে; তাহা কি  
 হইবে? এ যন্ত্রণা হইতে আমার কি উদ্ধার  
 করিবে? পাপদেহের তোষামোদ করিতেই  
 প্রাণ ক্ষরিত হইয়া গেল, হইতেছে। এখনও  
 যদি দেহ লগ্ন তবে দিতে পারি। কালে  
 বুঝি ইহাও থাকিবে না। তখন কি দিব

মা? মুক্তিদাত্রি সুরে! এখন বল দাও,  
 লৌহ সেবন করাও, একবার প্রাণ তরিয়া  
 তোমার নাম গাইয়া আস্বাদে চরিতার্থ করি।  
 ভারতমাতা আমার বিমাতা; তোমার  
 ক্রোড়ে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ দুঃখ ভুলি—  
 এজন্মের মত ভুলাও মা! যেখানে ইচ্ছা  
 লইয়া চল, আর তিষ্ঠিতে পারি না মা! \*  
 \* \* \* \* \* বিষয় বিতবের বা-  
 বস্থা করিতে হইবে? কি বিষয়? কাহার  
 বিষয়? কি ব্যবস্থা? কে করিবে? ঐ  
 দেখ! ঐন্দ্রজালিক দেখ। পৃথিবী দু-  
 রিয়া গেল, দিব্যবসান হইল; আর ব্যব-  
 স্থার প্রয়োজন নাই। মুকুট, পদতলে;  
 চতুর্দিকে প্রাচীর; আস্রপূর্ণ সমান জ্ঞান।  
 এ ব্রহ্মজ্ঞান দিতেও তুমি, হরিতেও তুমি।  
 আর কেন?”

অবস্থা ভয়ঙ্কর; আমার ভাবনা হইল।  
 এমন সময়ে একজন সন্ন্যাসীসহ বসন্তের  
 মাতা সেইখানে আসিলেন, আসিয়াই মু-  
 চ্ছিত হইয়া বাতাহত কদলীবৎ পড়িলেন।  
 সন্তানের অমঙ্গল সমাচার পাইয়া কাশী-  
 ধাম হইতে পথে পথে এই মাত্র আসিয়া  
 এই দেখিলেন। বিষম বিভ্রাট। আমি আর  
 থাকিতে পারিলাম না, চলিয়া আসি-  
 লাম।

ঐরগরমু গোস্বামী ।

## দেবোপাখ্যান

( গ্রীস ও ভারতবর্ষ )।

পঞ্চম প্রস্তাব।

পার্কীতি, লক্ষ্মী, সরস্বতী  
হিরি, ডিমিটারি, এথিনি।

০১০০

আমরা প্রথমতঃ ভুবনেশ্বরী পার্কীতির  
সহিত গ্রীসের সরস্বতী হিরির তুলনা  
করিব।

হিরির আয়তন দীর্ঘ, বর্ণ উজ্জ্বল গৌর; তিনি পরমসুন্দরী। তাঁহার মুখশ্রী গ-  
স্ত্রীর ভাবব্যঞ্জক এবং গর্ভদ্যোতক। এ-  
কটি প্রিয় ময়ূরশিশু তাঁহার অঙ্গে শয়ন  
করিয়া আছে। দেবী অতি সাবধানে স্ব-  
র্গোজ্জ্বল কেশগুচ্ছ সরাইয়া আপন বদন-  
সৌন্দর্য্য বিকীর্ণ করিতেছেন। এক স্থান  
হইতে অন্য স্থানে গমন করিতে হইলে  
ময়ূরগণ অনন্ত বায়ুমাগারে সমুদ্রগ ক-  
রিয়া তাঁহার শকট চালাইতেছে। তাঁ-  
হার একপার্শ্বে আইরিস্ ( রামধনু ), ও  
অন্য পার্শ্বে আরি ( পল্লী ) গণ স্রসজ্জিত  
হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছে। অ-  
ন্যান্য দেবতা সকলের ন্যায় হিরিরও দুই  
হস্ত, দুই পদ; আকৃতি মনুষ্যের অনুরূপ।

সরস্বতী পার্কীতির একস্থানে বসিয়া  
থাকামাত্র কার্য্য নহে। তাঁহার হস্তে ত্রি-

ভুবনের তার ন্যস্ত। তিনি শক্তি, স্মরণ্য  
সমস্ত বিশ্বের স্থিতি বিনাশ তাঁহারই হস্তে।  
শক্তির অনন্ত শক্তি রণরঙ্গিনী বেশে জগ-  
তের বিপদ বিনাশ করিতেছে, ভুবনেশ্বরী  
বেশে জগতে রাজত্ব করিতেছে, আবার  
স্নেহময়ী জননী হইয়া সমস্তানের লালন পা-  
লন করিতেছে। নগেন্দ্রনন্দিনীকে তজ্জন্তাই  
ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিধারণ করিতে হইয়াছে।  
অম্বরমর্দিনী ভবানী ‘দশবাহু সমন্বিতা’,  
এই বেশে তিনি এথিনির সহিত উপমেয়া।

দুর্গার এই মূর্তি কেবল ভয়ঙ্করী নয়,  
আবার পরম রমণীয়া। যদিও তিনি ‘জ-  
টাজুট সমায়ুক্তা, অর্দ্ধেন্দ্রকৃতগেখরা’  
তথাপি আবার ভক্তের নিকটে তখনই,  
‘পূর্ণেন্দ্র সদৃশাননা’ ‘অতসী পুষ্প-  
গাঁভা সুপ্রতিষ্ঠা স্রলোচনা’ ‘নবযৌবন-  
সম্পন্ন সর্বাভরণভূষিতা’ ‘প্রসন্নবদন।  
দেবী সর্বাধিকারপ্রদা’।

আপন সম্মানগণের বিপন্নিবারণার্থ  
পার্কীতি দশবাহু ধারণ করিয়াছেন, ‘ত্রি-

শূল, খজা, চক্রাদি ' অস্ত্রের সাহায্যে  
অসুরগণের বিনাশ সাধন করিতেছেন। বি-  
পদের শীঘ্র দূরীকরণ জন্য ইচ্ছাময়ী, অনেক-  
হস্ত প্রসারিত করিয়া একদা অনেক শত্রু  
সংহার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি ভক্তের  
নিকট কিছুই ভয়ঙ্কর নয়, সকলই মনোহর।  
ভক্ত দূর হইতে দেখিতেছে মূর্তিমতী ক-  
রণাময়ী তাহার জন্য সংগ্রামপ্রবৃত্তা।  
তাহার জন্য একহস্তে বর ও একহস্তে অ-  
ভয় রহিয়াছে, ত্রিনয়নীর একটি নয়ন মধুর  
হাসি বিকাশ করিয়াই যেন ভক্তের প্রতি  
নামস্ত রহিয়াছে। সেই পূর্ণেন্দু সদৃশ আ-  
নন, সেই অতসী কুমুদিত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ,  
তাহার চিত্তে সমস্তোষ প্রদান পূর্বক তা-  
হাকে উৎসাহিত করিতেছে

সমরাবসানে পার্শ্বতী আবার দ্বি-  
ভূজা ভুবনমোহিনী, উপাসক তখন :—

অশোকনির্ভংসিত পদ্মরাগং

আরুণ্যহেমদ্রাতি কর্ণিকারং

মুক্তাকলাপীকৃত সিন্ধুবারং

বসন্ত পুষ্পাভরণং বহন্তি ।

আবর্জিতা কিঞ্চিদিব—

বাসোবসান্য তরুণার্কাগং

পর্যাণ্ডপুষ্পাস্তবকাবনত্রা

সঞ্চারিণী পল্লবিনী লভেব ।

শুগন্ধিনিশ্বাস বিরুদ্ধ তৃষ্ণং

বিশ্বাধরাসন্নচরং ধিরেকং

প্রতিকণং সংক্রম লোলদৃষ্টি

লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী—

সেই পার্শ্বতীকে মনোহর শরীরে দে-

খিতেছে। পার্শ্বতী এক্ষণে বোঁড়িশী,  
রূপবতী, যৌবনসোপানারূঢ়া। কখনও  
বা তিনি জীবগণের মঙ্গলার্থ ভিক্ষার্থিনী ;  
কখনও জগৎপতি পতিসহ আশাবাসিনী,  
জগতের কার্য কারণ, সুখ দুঃখ, ধর্মাদর্শ  
প্রভৃতির বিষয় অথবা অত্যাচ্ছ পরমার্থতত্ত্ব  
স্বকান্ত-মুখে অবগে যত্নবতী। আবার প্র-  
য়োজন বিশেষে কালীমূর্তি প্রভৃতিও পরি-  
গ্রহ করেন।

পার্শ্বতীতে গৌরব আছে, কিন্তু সে  
গৌরব হিরির ন্যায় বাহ্যিক আকারে প্র-  
কাশ হইয়া দাস্তিকতার পরিণত হয় নাই।  
জননী আপন গান্ধীধামিশ্র গৌরবসহ আ-  
পন সম্মান সমীপে যেমন হাস্যময়ী, স্নেহ-  
ময়ী, মাতা শৈলসুতাও তাহাই। তাঁহাতে  
কোনরূপ বিলাসচিহ্ন নাই, হিরিতেও নাই।  
কিন্তু হিরির ক্রোধ, অহঙ্কার, ঈর্ষা ও কপ-  
টতা আছে। পার্শ্বতীতে এসমস্ত দোষ  
সম্ভবেনা। তিনি অকারণ ক্রোধবশব-  
র্ত্তিনী হইয়া হিরির ন্যায় ট্রেনগরীর বি-  
নাশ সাধন করেন নাই, বিষাক্ত বসনে বা  
কপট মন্ত্রণায় সপত্নীসংহারও করেন নাই।  
রূপগর্বে গর্ভিতা হইয়া সামান্য মানবকে  
রূপবতীত্বের রূপনির্ণয়মধ্যস্থও মান্য ক-  
রেন নাই।

হিরিও সতী, সতীও সতী। এক্ষণে  
সতীতে সতীতে প্রভেদ আছে কিনা এক-  
বার দেখা যাউক। হিরি স্বামী ভিন্ন অ-  
ন্যের প্রণয় ক্ষণেকের জন্যও হৃদয়ে স্থান  
দান করেন নাই, এজন্য গ্রীসে তিনি প্র-

শংসনীয়। আর্টিমিস্ (চন্দ্র) চিরকোমার্যা-  
ব্রতাবলম্বিনী বলিয়া সতী নামে অভিহিত।  
পতিগতপ্রাণা পার্শ্বতীও ভারতে সতী  
নামে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে দেখিতে হইবে  
কে শ্রেষ্ঠ।

আর্টিমিসের সতীত্বের সহিত হিরি ও  
দুর্গার সতীত্ব উপমের নয়। কারণ এ স-  
তীত্ব ভিন্ন প্রকৃতির। স্বামী ও স্ত্রীর প্রণয়ে  
ঐক্যমত্যা ও সুখাবস্থান সতীত্বের সুফল।  
অপ্রিয়কার্য্যকারী গুণহীন স্বামীর প্রতিও  
যে স্ত্রী প্রিয়বাদিনী ও তদগতপ্রাণা, বা-  
স্তবিক তাহাকেই সতীবলা ঘাইতে পারে।  
হিরি, যিয়সের আচরণে সর্বদাই অস-  
ন্তোষ। তাঁহাকে পারজয়িকতা জন্য অ-  
পমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে হিরি এত  
কৌশল ও এত পথ উদ্ভাবন করিয়াছেন  
যে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায়  
না। এমন কি, একদা নিতান্ত সামান্য  
নরস্ত্রীর ন্যায়, একান্ত ইতরস্বভাবা পর-  
ম্পূহাবতী ঘোষিতার ন্যায় আপন কন্যা ও  
দেবরের সহিত পরামর্শ করিয়া যিয়সকে  
বন্ধন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন! এই কি  
সতীত্বের লক্ষণ! এরূপ যে স্থলে সুরেশ্ব-  
রীর পতিভক্তি সে স্থলে নৈতিকবল কত  
প্রবল পাঠক বিবেচনা করিবেন। এই জ-  
ন্যই কবি এগামেম্‌নন্‌, ইডিপস্ প্রভৃতির  
পরিবারের ভ্রূর্ণতি বর্ণনায় কৃতকার্য্য। এই  
জন্যই হেলেন গ্রীসের সর্বপ্রধান মহা-  
কাব্যের নায়িকা।

আবার পার্শ্বতীকে দেখ। সাধারণ

লোকের মধ্যে এইরূপ গম্প প্রচলিত আছে  
যে শিব ভাস্ক ধৃত্বার্য্য সর্বদা উগ্রত;  
ভিক্ষাজীবী দেবের গৃহে খাদ্য বস্তুর অ-  
ভাব; সম্মানগণ কাদিতেছে। পার্শ্বতী  
তাহাতেও স্বামীপ্রতি অপ্রিয়বাদিনী বা  
অপ্রিয়কারী নন, সর্বদা পতিসেবার  
রতা; পতির জন্য সিদ্ধি প্রস্তুত করিতে-  
ছেন; ঘৃণা নাই, আলস্য নাই। যারূপে  
শিব জরাগ্রস্ত, সকলে ঘৃণা করে; কিন্তু  
পার্শ্বতীর পতিভক্তি তখনও অবিচলিত।  
তিনি পতিসহ শ্মশানে, পতিসহ ভিক্ষা-  
খিনি, পতিসহ জগতের হিতাকাজিকী,  
আবার পতিপার্শ্বে ত্রিভুবনেশ্বরী। তাঁহার  
রাজত্ব জাকজমক নাই। হিরির ন্যায় তাঁ-  
হার শিরে হৈমকিরীট মণি মাণিক্যাদিতে  
সুশোভিত হইয়া ‘সময় ও গুণাশির’ সহিত  
উজ্জলতা প্রদর্শনে প্রতিযোগিতা করেন।  
তাঁহার নিকট পার্শ্ব স্বর্ণাদি নিতান্ত অ-  
কিঞ্চৎকর। ঐশ্বর্য্য বিলাসের জন্য, আ-  
শ্রিত জীবের জন্য। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য কি?

হিরির রূপে তুলনা নাই, রূপে অগ্নি  
স্থলে; প্রভাবেরও তুলনা নাই, ত্রিদিবেশ  
যিয়সও তাঁহার ভয়ে কম্পিত; আবার  
ক্রোধেরও তুলনা নাই। সামান্য জীবগণ-  
কর্তৃক অবজ্ঞাত হইলে, অথবা পরমশক্তি-  
ব্যবস্থাপিত জগতের কোন নিয়ম অতিক্রম  
করিতে দেখিলে দেবগণের যে ক্রোধ স-  
ত্ত্ববে, তাহা হইতে প্রায় কেহই মুক্ত ন-  
হেন। আবার অনেকের মনের গতি অনু-  
যায়ী ক্রোধোদ্বেগও দেখা যায়। হিরির

ক্রোধ এই শেষোক্ত প্রকারের । এ ক্রোধ নিতান্ত দুষ্টনীয়া । স্বার্থের সহিত এ ক্রোধের নিকটসম্বন্ধ । জগতের প্রচলিত রীতির পরিবর্তন ঘটাইতে চেষ্টা করিলে, জীবসাধারণের অনায়াস সাধন করিলে, অথবা আপন যোগসাধনের ব্যাঘাত জগিলে তমোগুণের অপর সীমান্তবর্ত্তী দেবাদিদেব ভগবান ভূতভাবনেরও ক্রোধ হয় । সে ক্রোধ ভয়ঙ্কর । ক্রোধের লক্ষ্য অসহ্য ও অদম্য । যখন শূলীর শূল কম্পিত হয়, জটাবন্ধন খসিয়া পড়ে, এবং রবীন্দ্রপাবক এই ত্রিনয়ন ধ্বংস করিয়া জ্বলিয়া উঠে তখন জগতে ফাহার সাধ্য যে সে ক্রোধ নিবারণ করে ? কিন্তু সে ক্রোধ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় না, কারণ নিঃস্বার্থ ও বিরোচিত । তাহার শান্তি ও শান্তি নিমেষ মধ্যে সম্পাদিত হয় । এজন্য তিনি আশুতোষ । পার্বতীর ক্রোধও নিঃস্বার্থ ও ক্ষণস্থায়ী । কিন্তু হিরির ক্রোধ সেরূপ নহে । তাহার ক্রোধানল তুষানলের ন্যায় থাকিয়া থাকিয়া ক্রমে ক্রমে দগ্ধ করে । টুয়ের অবরোধ সময়ে তাহার আচরণে, সপত্নী ও সপত্নী-তনয়দিগের সহিত নিষ্ঠুর ব্যবহার এবং স্বামি প্রতি ক্রোধ প্রদর্শনে তাহা বিলক্ষণ প্রমাণিত আছে । পার্বতীর হৃদয় স্নেহ ও কোমলতার প্রিয়নিকেতন । অরণ্যের মৃগ, আকাশের পক্ষী, বনের বৃক্ষ সকলেই তাহার স্নেহের অংশভাগী । তিনি ইন্দ্রাদি দেবগণের মাতৃস্বরূপা, ভক্তের নিকট ক্রীড়া খাত্রী, সর্বসাধারণের আশ্রয়দায়িনী স্নেহ-

ময়ী জননী । তিনি রামপ্রসাদের সহিত 'বেড়া' বাঁধিতেও ক্রেশ বোধ করেন নাই, সুরথ রাজার জীবন রক্ষার্থ লক্ষ অসি প্রহার সহ্য করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই ।

পার্বতীর পৌরাণিক মত উল্লিখিত হইয়াছে । আর এক প্রকৃতি আছে, সে তাত্ত্বিক প্রকৃতি \* । ইউরোপীয়গণ কালী ও শিবকেই হিন্দুদিগের দেব দেবীর মূল্যধারণ জান করিয়া কালীর তাত্ত্বিক প্রকৃতির এক অংশ এবং শিবের তাপস প্রকৃতির কদর্যাংশ নিতান্ত অপকৃষ্টবর্ণে চিত্রিত করিয়া পাঠকগণসমক্ষে উপস্থিত করেন । তাহাতে ইউরোপীয়দের ত কথাই নাই অনেক এদেশীয় কৃতবিদ্য যুবকও বিশ্বাস করিয়া, সাদাচক্ষে (!) স্পষ্ট দেখা যায়, বিবেচনায় এদেশীয়দিগের পৌত্তলিকতার নিন্দা, এবং গ্রীসের পৌত্তলিকতার প্রশংসা করিতে ক্রটি করেন না । প্রথমতঃ তাহাদের মতে মত দিয়া দেবীর তাত্ত্বিক প্রকৃতি নিতান্ত অবজ্ঞেয় ও অশ্রদ্ধের মনে করি । এক্ষণে দেখিতে হইবে গ্রীসের ব্যাকস্ এবং তাহার উপাসনা কি পদার্থ । যদি ব্যাকস্কে প্রশংসা কর, কালীকে নিন্দা করিবে কেন ? কালীর উপাসক অধিক,

\* কেনেডি সাহেব বলেন, মাত্র ত্রয়োদশ হুর্গাপূজা, কিন্তু সেটি ভ্রম । মার্কণ্ডেয় পুরাণের সর্ব প্রধান উপগম্পই হুর্গাপূজা ( জর্গাল্ অব্ এসিরাটিক সোসাইটি, মার্চ ১৮৩৭ । ২৪১ খ্রী ) পৌরাণিক সময়ের পূর্বোক্ত হুর্গাপূজার উল্লেখ দেখা যায় ।

না ব্যাকস্মিষ্য অধিক ? যদি ব্যাকস্ম  
পরিভ্যাগ কর, তন্ত্ৰেও ছাড়িয়া দাও ; ছিন্ন-  
মস্তকায় শরীরোপরি আবরণ বস্ত্রের পতিত-  
হউক । আর যদি তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়,  
তন্ত্ৰেও,—হিন্দুসমাজের অধিকাংশ স্থলে  
অবজ্ঞেয় তহুও জারজ ; অনাদৃত তন্ত্ৰেও  
অনেক শ্রেষ্ঠত্ব দেখিতে পাইবে ।

কালে সকলই বিকৃত হয় । উদ্ভূত  
তাত্ত্বিকগণমধ্যে অনেকে তন্ত্ৰের যেরূপ  
অর্থ করিয়া আসিয়া কর্দমিত করিতেছে  
পূর্বে সেরূপ ছিল না । জ্যোতিষ, অথচ  
শিক্ষিত কএকজন ইপিকিইরাস বা চার্লস-  
কের মতের পক্ষপাতী হইয়া সাময়িক সুখ  
মূল্যবান জ্ঞানে তন্ত্ৰের অবতারণা করিয়াছে ।  
কিন্তু তন্ত্ৰ প্রাশংসনীয় না হইলেও একথা  
নির্দেশ করা অসঙ্গত হইবে না যে, ব্যাক-  
সের উপাসনা উপলক্ষে গ্রীসে যেরূপ পা-  
পানুষ্ঠান হইত, তন্ত্ৰে সেরূপ কখনও হয় নাই ।

হিরির প্রকৃতি পর্যালোচনা করিয়া  
তাঁহার উপাসককেও ভীত থাকিতে হয় ।  
কালী কেবল বিপক্ষের কালরূপিণী । তবে  
কালীকে ভয়ঙ্করী বলিব কেন ? কালী-  
মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী হইলেও প্রকৃতি অনেক স-  
ময়ে মনোহারিণী সংশয় নাই ।

সতী হিরি সতীত্বের উপর বিরাজ ক-  
রেন । কুমারীগণের বিবাহানুষ্ঠানে তিনি  
সর্বদাই আগ্রহপরা । পার্শ্বভীও তাই ।  
যে পর্য্যন্ত কুমারী অর্ধমববীরা থাকে, তা-  
হার পবিত্রতা গিরিজার প্রিয় নিকেতন ।  
বিবাহ উপলক্ষে হরপার্শ্বভীর বিবাহ প্র-

স্তাব, স্ত্রীলোকদিগের গম্প সকল ও গান  
সকল, এদেশে যেমন আসরের সহিত  
শ্রুত হয় এবং প্রত্যেক স্থলেই উপমারূপে  
ব্যবহৃত হয়, গ্রীসেও সেইরূপ হিরির সহিত  
বিয়সের পরিণয় বিষয়ক প্রস্তাব সকল  
গানে, প্রস্তাবে এবং ললনাকণ্ঠে শ্রুত হ-  
ইত । তবে বিশেষ এই যে সতী সর্বদাই  
সতীর পক্ষপাতিনী, তাঁহার প্রার্থনা সর্ব-  
দাই পূর্ণ করেন । হিরির নিকট প্রার্থনা  
করিতে হইলে তাঁহার প্রকৃতি বুঝিয়া প্রা-  
র্থনা করিতে হয় । ভক্ত অকুতোভয়ে পা-  
র্শ্বভীর নিকট সর্বদাই বলিতে পারে :—

“ও মহিষ্মি ! মহামায়ে ! চামুণ্ডে !  
মুণ্ডমালিনি !

আয়ুরারোগ্যবিজয়ং দেহি দেবি  
নমস্তুতে ।

ও ভূত দৈত্য পিশাচেভ্যো রক্ষো-  
ভ্যশ্চ মনুষ্যৈঃ ।

দেবেভ্যো মানুষোভ্যশ্চ ভয়েভ্যশ্চ-  
হিমাংসনা ।

সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে ! শিবে ! সর্বার্থ-  
সাদিকে !

উমে ! ব্রহ্মাণি ! কোমারি ! বিশ্বরূপে !  
প্রসীদ মে ।

রূপন্দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতী  
দেহি মে

পুত্রন্দেহি ধনংদেহি সর্বান্ কামাংশ্চ  
দেহি মে ।

চন্দ্রেন সমারন্ধে কুহুমেন বিলেপিতে  
বিশ্বপত্র কৃতাবাসে দুর্গেহং শরণংগতঃ ॥”



একগে লক্ষ্মীকে কাহার সহিত তুলনা করিব ? সমুদ্রমন্ডনে তাঁহার উৎপত্তি, সূত্রাং সমুদ্রের ফেনজা এফ্রোডাইটের সহিত কি কমলার তুলনা হইবে ? লক্ষ্মীর পাদম্পর্শে ধরা শমাপূর্ণা ও হাস্যমতী হয়। আবার এফ্রোডাইট যেস্থলে পাদপার্শ্ব করেন, সেস্থলও সবুজ শোভায় স্বশোভিত হয়। তবে এফ্রোডাইট ও লক্ষ্মী কি এক প্রকৃতির ? না। এফ্রোডাইটের এমন দুর্কলতা আছে যে লক্ষ্মী তাহা হইতে অনেক উচ্চে অবস্থান করেন। এফ্রোডাইট সৌন্দর্য ও প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ; সুন্দরী প্রীতিময়ী লক্ষ্মী ধন ও সৌভাগ্যের ঈশ্বরী। সুতরাং লক্ষ্মীকে ডিমিটারের সহিত তুলনা করিয়া এফ্রোডাইটকে রতির সহিত তুলনা করা উচিত।

ডিমিটার গ্রীসের লক্ষ্মী। শমশোভিত ক্ষেত্রসকল তাঁহার প্রিয় নিকেতন। উজ্জ্বল পীতবর্ণ কেশগুচ্ছ শমাছটায় স্বশোভিত করিয়া, দক্ষিণহস্তে ধান্যশীর্ষ ধারণ করিয়া এবং বামহস্তে আলোক ও কর্তৃত্বিকা লইয়া, অথবা রাজদণ্ড ধারণ করিয়া ডিমিটার শ্রমজীবী কৃষকগণের পরিশ্রম পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ আয়তন, উজ্জ্বল মুখশ্রীতে মিলিত হইয়া গৌরব ও গান্ধীর্ষ যুগপৎ প্রকাশ করে। ইনিমুসেশের পবিত্রতা তাঁহারই প্রসাদাৎ। তিনি শান্তপ্রকৃতি, আবার ভায়িনী। কিন্তু লক্ষ্মীর ন্যায় চপলা নহেন।

ডিমিটারের অন্য নাম সিরেস। তিনি

যিয়সের প্রতি অসম্বৃষ্টা হইয়া কিলিয়স নামক এক সজ্জতিপন্ন মানবের বাটীতে গমন করিয়া গন্ধহারিকার বেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সম্মানের লালন পালন করিতেন। এক দিবস সেই মানবশিশুকে অমর করিবার জন্য অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া উঠাইতেছিলেন। তাঁহার অপরিজ্ঞাত কার্য্যসকল দর্শন করিয়া সকলেই সন্দেহপর হইয়াছিল। সুতরাং তাহার অদৃশ্যভাবে থাকিয়া বালকের প্রতি সিরেসের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। ঐ অমানুষিক অগ্নিনিক্ষেপব্যাপার সম্মর্শনে সকলেই ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ডিমিটার ক্রোধপরবশ হইয়া বালককে তাহার মাতৃঅঙ্গে প্রদান করিলেন, এবং নিজরূপ ধারণ করিয়া আপন উদ্দেশ্য বর্ণন করিলেন। বালকের অমরত্বে ব্যাঘাত হওয়ায় সকলেই ব্যর্থ পর নাই হুঃখিত হইল। ডিমিটার অদৃশ্য হইলেন।

এই প্রস্তাবের সহিত ভারতীয় অনেক প্রস্তাব ঐক্য হয়। ডিমিটারের ন্যায় লক্ষ্মী অন্যের বাটীতে যাইয়া দাসীত্ব স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু ডিমিটারের অনুরূপে কিলিয়সের যেমন অতুল ঐশ্বর্য্য হয়, লক্ষ্মীর পদপার্শ্বে এবং কণ্ঠকটাক্ষে সেইরূপ অনেকেই অতুলবিভব হইয়াছে। এদেশীয়স্ত্রীলোকেরা অনেকেই এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব সকল আলোচনা করিয়া থাকেন।

লক্ষ্মী সমুদ্রমন্ডনে উদ্ভল ফেনরাশিতে

উৎপন্ন হইয়াছিল; বিষ্ণুর সহধর্মিণী হইয়া বৈকুণ্ঠের সিংহাসনের অর্দ্ধভাগ লাভ করিয়াছেন; আপন প্রকৃতির কোমলতায় কমলে পদস্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, রূপদ্রোণি শরীরে ধরে না, কমলালয়া কমলা পূর্ণ যৌবনা। মুখে, সরল শুভ্র দশন জ্যোতি-বিকাশক, নয়ন সরলতাবাঞ্ছক, স্বভাবের পবিত্রতাদোষাক হাসি প্রকাশ হইয়া অঙ্গলতিকা যৌবনলহরীতে দোলাইতেছে, কিন্তু অলঙ্কার নাই। সুরন্দরী মানবীর আয় রূপগর্বে গর্ভিতা হইয়া প্রসাদনবালুলোও প্রয়াস পান না। পুরুষোত্তম স্বামী লাভ করিয়াও হরিপ্রিয়া রুখা গৌরব প্রকাশ করেন না। তাঁহার স্নেহময়ী মূর্তি, মুখা-ময়ী দৃষ্টি সকলই মনোহারিণী। লক্ষ্মী জগতের জী, বৈকুণ্ঠের জী, শরীরের জী, সবুজবসনে সুরসজ্জিতা প্রকৃতি দেবীর ত্রীসম্পাদনকারিণী। লক্ষ্মী ত্রীস্বরূপা। তিনি সর্বদাই মিষ্টভাষিণী, পতিব্রতা।

পার্বতী, লক্ষ্মী, হিরি এবং ডিমিটার সকলেই সুরন্দরী। পার্বতীর বর্ণ অত্যন্ত পুষ্পের ন্যায় অথবা তপ্তকাক্ষনতুল্য, অথবা নিবর্তিত প্রদেশস্থ প্রদীপবৎ স্থির। লক্ষ্মীর বর্ণ চপলার ন্যায়, অতি মনোহর, অথচ চঞ্চল। হিরির বর্ণ উজ্জ্বল পাবক-বৎ অথবা নৈদাঘমার্ত্তণ্ড তুল্য। ডিমিটার বর্ণ হরিষর্ণ রূপত্বের ন্যায়। এক গৃহে দীর্ঘকাল সৌভাগ্য থাকে না, ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এজন্য লোলা।

সরস্বতী তাঁহার সম্পত্তি। তাঁহার সহিত কমলার প্রণয় সম্ভবে না। বাহ্য প্রকৃতির কত্রী, বাহ্য মুখসম্পাদবিধায়িনী দেবীর সহিত অন্তঃপ্রকৃতির অদীশ্বরী দেবী বীণা-পাণির কখনও প্রণয় সম্ভবে না। সম্পদ থাকিলে বিদ্যা বিরল, বিদ্বান প্রায়ই দরিদ্র।

চপলা চপলা হইলেও ডিমিটারের ন্যায় ক্রোধাভিভূতা নহেন। ডিমিটার পার্শ্বকোণির অনুসন্ধানে অকৃতকার্য হইয়া দেব ও মানবের প্রতি যেরূপ ক্রুদ্ধব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে আর তাঁহাকে প্রসন্নবদনা দেবী কমলবাগিনীর সহিত উপমেয় বলিয়া বোধ হয় না।

লক্ষ্মী বৈকুণ্ঠেশ্বরী, সর্ববিষয়েই ঐশ্বর্য-শালিনী। তাঁহার সুচিকণ কৃষ কেশগুচ্ছ-মধ্যস্থ সৌন্দর্যমণীতুল্য বদনসৌন্দর্যের সহিত জগতের কোন সৌন্দর্য্যই উপমেয় নয়। জীবনস্বরূপ অর্থ লক্ষ্মীর প্রসাদ-মাত্র। তিনি সকল বিষয়েই ধনশালিনী। তাঁহার প্রকৃতিও অমূল্য। ডিমিটার সেরূপ নন। তাঁহার হস্তে মনুষ্যজীবন, লক্ষ্মীর হস্তেও মনুষ্যের জীবন। লক্ষ্মী রাজবেশ-ধারিণী, কিন্তু ডিমিটার কৃষকসহচরী, এবং কৃষককন্যার ন্যায় সামান্য শয্যায় সুশো-ভিতা। এস্থলে সারল্যে ও অমায়িকতায় ডিমিটারের চিত্র অধিক মনোহর সন্দেহ নাই। অন্যদিকে কৃষকগণের দারিদ্র্য এবং রাজা, বণিক, শিল্পী এবং রাজপুরুষগ-ণের ঐশ্বর্য্য দৃষ্টি করিলে ত্রীককবির ক-ল্পনা অথবা প্রযুক্ত বোধ হইবে।

বীণাপাণি দেবীর সহিত পেলাস এ-  
থিনীর তুলনা চলে। পেলাস্ রোমের মিন-  
ভায় আরও অধিক সুন্দররূপে চিত্রিত।  
ঐককবি পেলাসকে বাহুজগতে সংস্কৃত  
রাখিয়াছেন ; রোমের কবি মিনভাকে অ-  
ন্তরস্থ জগতের অধীশ্বরী করিয়াছেন, স্তরায়  
মিনভায় ও সরস্বতীতে অধিক সাদৃশ্য  
পরিলক্ষিত হয় ।

গ্রীক কবি এথিনীকে স্ত্রীমূলভ কোমল-  
সৌন্দর্য্যে সাজাইতে প্রয়াস পান নাই।  
তিনি পার্শ্বতীর ন্যায় রণরঙ্গিনী। সৌন্দ-  
র্য্যের লক্ষণ ইউরোপে অজ্ঞাতাধিমা, সু-  
তরায় দেবী এথিনীর আকৃতিও দীর্ঘ। তিনি  
যিয়সের মস্তকভেদ করিয়া অস্ত্র শস্ত্রে সু-  
সজ্জিতবস্ত্রায়, ভূতলে অবতীর্ণা হন। স্বয়ং  
শৈলেশতনয়ার ন্যায় সর্ষদা দৈত্যবধ ক-  
রেন না বটে, কিন্তু, দৈত্যাদলন হিরাক্লস,  
বেলারোফটেস্ পার্সিয়স্, থিসিয়স্ প্রভৃ-  
তির সাহায্যার্থ সর্ষদাই বন্ধপরিকর।  
আবার তিনি জ্ঞানজগতের অধীশ্বরী, সকলের  
বুদ্ধি সংপথে পরিচালন, সকলকে বিজ্ঞা ও  
জ্ঞানে শিক্ষিত করণ প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য  
সম্পাদন তাঁহার নিত্যকর্ম্ম। এই গুণে তিনি  
সরস্বতীর সহিত তুলনীয়। গ্রীসে শিল্প  
বিজ্ঞানাদির অধিষ্ঠাত্রী নয়টি দেবী আছেন,  
তাঁহাদিগকে মিত্রজ্ঞ বলে। এথিনী সেই  
মিত্রজ্ঞগণের কর্ত্তা। বীরগণের বীরধর্ম্ম রক্ষা  
করা তাঁহার এক প্রধান কর্ত্তব্য। তিনি  
সতী। কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বলতা আছে কিনা  
একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

এথিনী গ্রীসের দেবীগণ মধ্যে সর্ব্বা-  
পেক্ষা উত্তমা হইলেও কদর্য্যকচির হস্ত  
হইতে মুক্তা নহেন। গ্রীসের দেবী মান-  
বের দেহধারিণী। গ্রীসের পৌরাণিক  
সময়ের অনেক পূর্ব্ব হইতেই দেবদেবীগণ  
মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু  
এথিনীর কাহারও সহিত বিবাহ হয় নাই,  
অথচ তিনি ফিবস্ ও লিকনসের জননী!  
কেহ কেহ বলেন, এপোলন হিফিস্টেসের  
ওরসে তাঁহার ভগ্নী এথিনীর গর্ভে জন্ম  
গ্রহণ করেন। আবার এথিনী মৃত্যুশীল  
মানব পিসিষ্ট্রেটস্ ও প্রমিথিয়সের প্রণয়া-  
কাজ্জিনী! আবার প্রমিথিয়সের প্রেমে  
মুগ্ধ হইয়া স্বীয়জনক যিয়সকে বন্ধনা পূ-  
র্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে অগ্নি অপহরণ  
কার্য্যে সহকারিণী। আবার আপন পি-  
তাকে বন্ধন করিতে চেষ্টা করিয়াও  
অকৃতকার্য্য!

একগুণে শুভ শরীর, শ্বেতাঙ্গরা, জ্ঞান-  
ময়ী দেবী সরস্বতীর আকৃতি ও প্রকৃতি  
পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক। বা-  
গ্বেদবী ‘তব্ধন সকল মিন্দোর্ম্মিভ্রতী শুভ-  
কান্তী’।

রোমীয় মিনভার ন্যায় বিদ্যার্থীর প্র-  
তিই তাঁহার বিশেষ স্নেহ। তাঁহার সক-  
লই শুভ, সকলই সরল ; তিনি বেলফুল।  
তাঁহাতে মানবীর বিলাস লালসা, সামান্য  
দেবীদিগের অকারণ ক্রোধ বা পরানিষ্ট  
কামনা কিছুই নাই। তাঁহার সকলই নি-  
খল ও পবিত্র। যদি জ্ঞানের মনোমোহন

চিত্র কল্পনার বিষয়ীভূত হইতে পারে, যদি সেই চিত্র অনুরূপসরলসজ্জায় সুশোভিত করিয়া শরীরী ও দৃষ্টব্য করা যাইতে পারে তবে সে চিত্র বীণাপাণি সরস্বতীতে আছে। যখন তাঁহার ঈশ্বর প্রস্কুরিত অধরাস্ত্রে শুভ্রদশনের জ্যোতি ও প্রকৃতিবদ্ধ প্রকৃত্যতা বিকাশ হয় তখন জ্ঞানীর হৃদয় জ্ঞানালোকের বিমল জ্যোতিতে সুশোভিত হইয়া উঠে।

বাগদেবীও কমলাসনা। ঐশ্বর্যশতদলে চরণ-সুগল স্থাপন করিয়া দেবী ভারতী সুমধুর বীণা বাদন করিতেছেন; সেই যমোহর স্বরে জ্ঞানীর হৃদয়-সরোবরে জ্ঞানের লহরী চলিতেছে। অফিসেসের গান শ্রুতিতে স্রোতস্বতীর স্রোতগতি রোধ হইত, পশু-পক্ষিগণ নিশ্চল ও নিষ্পন্দ হইয়া সেই দুর্লভ কণ্ঠনিদ্রা প্রবণ করিত, প্রসূরাদি নিজীব পদার্থে সজীবতা সঞ্চারিত হইত। সে গানে অতীতসময় যমোরত্ননিচয় উত্তেজিত হইত। কিন্তু সে উত্তেজনা স্থায়ী হইতে পারিত না, হৃদয়স্থ যমুনী-স্রোত উজান বহিত না—নিদ্রাভিযুগল বেগ বর্জিত হইত মাত্র। বীণাপাণির বীণাস্বর সেরূপ ক্ষণস্থায়ী নহে। সে স্বর কীর্তিদেবীর সুকণ্ঠ-নিঃসৃত সুধাপূর্ণ স্বর। তাহাতে দুর্বল মন সবল হয়, নিরাশ হৃদয়ে আশা সঞ্চারিত হয়, ধমনীতে উষ্ণ-শোণিত-স্রোত বিদ্যায়-বেগে প্রধাবিত হইতে থাকে। বরদার বরপুত্র কালিদাস সরস্বতী কুণ্ডে স্নাত হইয়া সেই দেবদুর্লভ বীণা-মিষ্ণু প্রবণ

করিয়াছিলেন, তাহাতেই দেবলালিত-কবিতামুখা বর্ণন করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছেন।

তুমি বিপন্ন, বাগদেবী দৈববাণীতে তোমায় আশ্বস্ত করিলেন। তুমি বিদ্যার্থ যত্নশীল, ভারতীর অনুগ্রহে বেদবাস হইলে। তোমার জীবনের প্রথমার্ধ অকার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে, দৈববাসাৎ দেবীর রূপাকটাক্ষ মুহূর্ত্তজনা তোমাতে নাস্ত হইল, তুমি ক্রৌঞ্চমণ্ডন-নিদন-দর্শনে ব্যাপকে তৎসনা করা উপলক্ষে ভ্রমণলের প্রথম কবি বাল্মীকি হইলে!

মিনর্তা যেমন টেলিমেকসের ভ্রমণসময়ে অরণ্যে, পর্ব্বতে, সমুদ্রে, পরগৃহে সর্বদাই তাহাকে আপন তত্ত্বাবধানে রাখিয়া প্রতিপালন ও সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন, বিছাদেবীও সেইরূপ ভারতসন্তানকে জ্ঞান-ভ্রমণে ভূষিত করিয়া নিরাপদ ও উন্নত করিতে সর্বদাই যত্নশীলা। এ চন্দ্রে কলক নাই, এ শুভ কুসুম পূর্ণাসিত হয় না, এ দবল বসনে দাগ নাই, এ হীরকে ছিট্র নাই। সরস্বতী পবিত্রতা, সরলতা এবং উত্তমতার জীবময়ী প্রতিমূর্ত্তি।

আমরা দেখিলাম সুরেশ্বরী হিরি এবং জানেশ্বরী এথিনীর গৌরব পাক্ৰতীতে আছে। ডিমিটারের গুণ ও শক্তি এবং এফ্রোডাইটের সৌন্দর্য্য লক্ষ্যীতে আছে; এথিনীর লোকহৃদয়ের অভ্যন্তরস্পর্শি কার্য্য ও শক্তি সরস্বতীতে আছে। কিন্তু যে পার্থক্য অবলম্বন করিয়া ভারতীর দেবীদিগকে আর্ধ্যকবিগণ স্বর্ণে স্থাপন করি-

রাছেন, সেই লোকাভিত পবিত্রতা গ্রীসে কোথায় পাইব ? কোথায় সে বিলাসবিরতা লোকাভিত দেবপ্রসূতি, আর কোথায় সামান্য জনসুলভ কলহপ্রিয়তা ও দুর্জ-সতা ! সামান্য মানবের গৃহবিবাদে হিরিকে একপক্ষ সমর্থন করিতে দেখিলে, অসংচর্য্যানুষ্ঠানে এখিনিকে সহকারী মনে করিলে, এবং ভিনসপ্রকৃতি স্মরণ হইলে, কোন্ মহদয় ব্যক্তি গ্রীসের দেবী-গণকে সামান্য কলহপ্রিয়া রমণী বিবেচনায়া তাহাদিগের ঘৃণপদ প্রকৃতির প্রতি ঘৃণা করিয়া পাক্ষতি লক্ষ্মী সরস্বতীর সম্বিত তুলনায়া না বিরত হইবে ? কেই বা বলিবে যে গ্রীক দেবীগণ সহানুভূতি বিষয়ে অধিক সমর্থ ।

উৎপাদিকা প্রকৃতিতে তিনটি শক্তি বর্তমান, শারীরিক, মানসিক এবং আ-

র্থিক । ভগবতী সৃষ্টিমতী দৈহিকশক্তি, সরস্বতী মানসিক এবং লক্ষ্মী আর্থিক-শক্তিস্বরূপা । এই ত্রিবিধ শক্তির কার্য প্রদর্শনেই ভারতীয় দেবোপোখ্যানে দেবী-ত্রয়ের অবতারণা । দেবত্রয়কে স্বতন্ত্র স্ব-তন্ত্ররূপে পুঙ্খকল্পনা করিলে দেবীত্রয়-মধ্যে প্রত্যেকেই প্রকৃতি । এই প্রকৃতি ও পুঙ্খসেই জগতের স্কাতিয়া বাপার সম্পাদিত হয় । কমলঘোনি কখনও প্রকৃতি কখনও পুঙ্খ, কারণ তিনি স্কাতিয়া ।

এক্ষণে যে ভাবে ইচ্ছা হয়, দুই দেশের দেবীগণকে তুলনা কর । আকৃতি সমা-লোচনা কর, প্রকৃতি পরীক্ষা কর এবং নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখ ভারতীয় দেবীসকল প্রকৃতি দেবীই কি না । এখনও কি বলিবে সহানুভূতি প্রদর্শনে গ্রীকদেবীগণেরই একচেটিয়া অধিকার ? ব্র—

## শব-সাধন ।

নিবেছে অনল ?—নিবে নি এখন,  
কে নিবাবে বল, নিবিবে কেমনে ?  
সপ্তশত বর্ষ জ্বলিছে এমন,

কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে ?  
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল !  
কোথায় ভারত ?—অনন্ত ঋণান !  
ঋণান—ঋণান—ঋণান কেবল !  
রাগের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ ।

ঢাল যদি সপ্ত মহাপাণ্ডার,  
এ অনল নাহি হইবে নিসর্গণ,  
দেহ চাপাইয়া হিমাত্রির ভার,  
যাবে ভস্ম হয়ে ভূগের সমান ।  
দ্রুধিনী কল্পনে ! কেন উদাসিনী  
রুধা নেত্রবারি কর বরিষণ,  
নয়নের জলে জান না তাপিনী,  
এ প্রচণ্ড শিখা হবে না বারণ ।

৩

এই-মহা অগ্নি, ভীষ্মের পিপাসা,  
ভূজারের বারি উপহাস তার;  
ধরিয়া গাণ্ডীব,—ভারতের আশা!—

ভারত হৃদয় করহ বিদার;  
ভোগবতী গঙ্গা ভীম-প্রবাহিনী  
অন্তঃস্থল হতে উঠিবে শুষ্কারি,  
নিবাবে অশান, শক্তি-স্রোতস্বিনী,  
সুড়াবে ভারত অমৃত সঞ্চারি।

৪

না পার,—বসিয়া এ মহা-অশানে,  
বিশ্বশতিকোটিক শবের উপর,  
উগ্র উদ্দীপনা মহাসুরা পানে,  
সাধ মহামন্ত্র অভয় অম্বর।  
ঘোর অমাবস্যা প্রগাঢ় তিমিরে,  
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন,  
অশান-অনল গর্জিছে গম্ভীরে,  
হাহাকার শব্দে স্থনিছে পবন।

৫

আর্ঘ্য-বীর্ঘ্য-ভঙ্গ মাখি কলসবরে,  
স্মৃতি মহামালা জপ অনিবার,  
‘ত্রাহি মে ভৈরবি’—ডাক উঠিছে স্রবরে  
সাধ মহামন্ত্র—ভারত-উদ্ধার।  
কত বিভীষিকা করিবে দর্শন,  
ব্রহ্মাস্ত্র-গর্জন, পাশ-অনংকার,  
মলুক উপর সনন্ সনন্  
খেলিবে বিজলি শত তরবার।

৬

কি ভয়? আবার হৃদয় ভরিয়া,  
কর উদ্দীপনা মহাসুরা পান,

করতালি দিয়া, নয়ন মুদ্রিয়া,  
কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান;—

‘করালবদনা, হুমুওমালিনী,  
লেলিহান জীহ্বা কধিরে মোহিত,  
উর মা অশানে অশানবাসিনী,  
স্বক-স্বন্দ গলক্রধির চর্চিত।

৭

‘মহাঅঘপ্রভা! কর বরিষণ  
মহা বারি ধারা জ্বলন্ত অশানে;  
ফলুক আবার সাধনার ধন

বীর রত্নরাশি এই আর্ঘ্যস্থানে!  
সদাচ্ছিন্ন আর নহে ওই শির,  
কি লাজে ধর মা দেও ফেলাইয়া,  
খরশান খঞ্জো মলিন কধির,  
সদা রক্তে পুনঃ লও শাণাইয়া!

৮

‘ঘোরারাবে মাতা ছাড়িয়া ওকার,  
মহারৌজীরূপে হও অদিষ্ঠান,  
নাচ রণরঙ্গে, নাচ আরবার,

দেখুক নয়নে ভারত সম্মান!  
যেই বীরদর্পে ক্ষিতি টলমল,  
দেখি মহাকৃদ্র দিলেন পাতিয়া  
হিমাত্রি সদৃশ হৃদয় অটল,—  
দেখিব সে স্মৃতি নয়ন ভরিয়া।

৯

‘অভয়, বরদ,—অধ উর্দ্ধ কর,  
শোভিছে দক্ষিণে ভারতের তরে,  
দেহ মা অভয়, হায়! নিরস্তর

নিবসি অশানে সত্তর অন্তরে;  
প্রচণ্ড অনলে কত কাল হায়!

জ্বলে আৰ্খাজ্জাতি কাল-নির্কিংশেয,  
একি অভিশাপ ! তপাপি পরায়  
হতভাগ্য জাতি হলো না নিঃশেষ ।

১০

‘অনন্ত জীবন, অনন্ত দাহন,—  
কত কাল সবে ভারত দুঃখিনী ?  
মরে না, বাঁচে না, জীবনে মরণ,  
অর্দ্ধ মৃত, অর্দ্ধ দম্ব অভাগিনী !  
তুমি মা বরদা, দেহ এই বর,—  
নিঃশেষি জীবন নিবুক অশান ;  
কিনা চিতানল নিবাও মত্তর,  
মৃতকম্প দেহে কর প্রাণ দান !

১১

‘অচল ধমনি—উঠুক উছলি,  
নব বরষায় জাহ্নবী যেমন ;  
স্থির রক্ত স্রোতে ছুটুক পিডলি,  
‘জয় মা ভৈরবী’—উঠুক গর্জন ।’  
ফলিয়াছে শব-সাদন তোমার,  
নয়ন মেলিয়া দেখেছ কম্পনা ;  
ভারত অশানে আজি আরবার ;  
কি ভীষণ হৃতা, কি ঘোর বাজনা !

১২

প্রতি ঘরে ঘরে—অশানে অশানে !  
মহাবিশু দিনে মহাশক্তি ওই  
নাচিছে রঞ্জিনী সুর-কৃপাণে,

গর্জিছে সাধক ‘মা ভৈ মা ভৈ’  
নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকারে ;  
ধূমপুঞ্জ মাঝে নাচে ভয়ঙ্করী,  
ত্রিনেত্র হইতে অনল লুকায়ে,  
মহাকালী মূর্তি—ভীমা দিগম্বরী !

১৩

বাজে জয়টাক ঘন ঘোর বোলে,  
শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশা ভীষণ আরাবে,  
কত শূন্যে ভীমা,—কত ধরা কোলে,  
রক্তারক্ত অশ্ব-নর-রক্ত আবে !  
নর-কর-কাঞ্চি কটিদেশে বাজে,  
নর-মুণ্ড-মালা হুলিছে গলায় ;  
কথির-আধার এক করে নাজে,  
অন্য করে ভীত কৃপাণ খেলায় ।

১৪

ভারত সন্তান ! দেখ না মাতার  
লোলজীহ্বা শুক, শুক রক্তাধার,  
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,  
সদা উষ্ণ রক্ত মাগে বারবার ।  
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,  
আপনার বক্ষ করি বিদারণ,  
করে, জননীর পিপাসা নিবারি,  
ভারত অশানে শক্তি আরাধন ।

শ্রীঃ—

## লাক্ষ্মণেয়।

ময়ূষা-জদরে সুরের কথা অপেক্ষা  
 হুংখের কথা অধিক দৃঢ়রূপে অঙ্কিত  
 থাকে। কিন্তু দুর্দ্বিষহ হুংখের সময়েও  
 আমরা সুরের কথানুষ্ঠানে ক্ষণকালের  
 জন্ত উৎসাহ এবং উল্লাসে মাতিয়া উঠি,  
 সুররাং ভালবাসি। বর্তমান কচি অনু-  
 সারে, এই স্বাভাবিক প্ররুতির অনুবর্তন  
 করিলে কৃতবিদ্যগণের অশ্রদ্ধাভাজন হও-  
 য়ারই অধিক সম্ভাবনা, এই আশঙ্কা করিয়া  
 বাজালির বর্তমান হুংখ অথবা পূর্বসূর্য,  
 কিছুই স্পর্শ করিব না। শুদ্ধ বজের পুরা-  
 রত্নঘটিত কএকটি ঐতিহাসিক কথা আ-  
 লোচনাই এই প্রবন্ধে আমাদের একমাত্র  
 উদ্দেশ্য রহিল।

মুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ্জ-  
 দ্দীন তাঁহার ‘তবকাৎনাসরী’ গ্রন্থে ব-  
 লিয়াছেন—বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গ-বিজয়-  
 কালে \* \* \* ‘লক্ষ্মণিয়া’ নামে  
 জর্জৈক রাজা বজের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত  
 ছিলেন। ইনিই তাঁহার যতে বঙ্গদেশের  
 শেষ হিন্দুরাজা। কিন্তু এতদেশীয় প্রাচীন  
 গ্রন্থসমূহে ‘লক্ষ্মণিয়া’র কোন বিব-  
 রণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় বঙ্গালসে-  
 নের পৌত্র ও লক্ষ্মণসেনের পুত্র মাধব-  
 সেন এবং তদীয় ভ্রাতা কেশবসেন অভি

অপকাল রাজত্ব করা নিবন্ধন, মুসলমা-  
 নেরা তাঁহাদের পরবর্তী ভূপতিকে লক্ষ্মণ-  
 সেনের পুত্র বিবেচনায়—‘লক্ষ্মণিয়া’  
 নাম দিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ ‘লক্ষ্ম-  
 ণিয়া’ সংস্কৃত বা বাঙ্গলা শব্দ বলিয়া  
 বোধ হয় না। সুররাং ইহা ‘লাক্ষ্ম-  
 ণেয়’ (লক্ষ্মণ শব্দের উত্তর ‘কেয়’ প্রত্যয়  
 নিপ্পন্ন) শব্দের অপভ্রংশ মাত্র, এইরূপ অনু-  
 মান একেবারে অগ্রাহ্য করা যুক্তিসম্মত নয়।

মুসলমানদিগের যতে কেশবসেনের  
 পরে নৌজিব, নারায়ণ, (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণ,  
 এবং লক্ষ্মণিয়া এই চারিজন ক্রমান্বয়ে  
 রাজত্ব করেন। রাজাবলী গ্রন্থে মাধবসে-  
 নের পর সুর অথবা সুরসেনের নামোল্লেখ  
 দেখা যায়। আবার কিংবদন্তী এইরূপ যে  
 অশোক নামে আর একজন রাজা ছি-  
 লেন। কিন্তু ইনি কাহার পরবর্তী বা  
 কাহার পূর্ববর্তী তাহার কোন নির্দেশ  
 নাই। এখন দেখা যাউক বঙ্গালসেন হ-  
 ইতে বখতিয়ার কর্তৃক বঙ্গাধিকার কতদূর  
 ব্যর্থমান, এবং তাহাতে এতগুলি রাজার  
 সমাবেশ সম্ভবে কি না।—বঙ্গালসে-  
 নের রাজত্বকাল সম্পর্কে ‘সময়প্রকাশ’  
 এবং ‘আইন আকবরীতে’ ঐক্য দেখা  
 যায়। ‘সময়প্রকাশ’ অনুসারে ১০১৯



শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃঃ অব্দে বল্লাল-সেন 'দানসাগর' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন \* । অতএব তিনি অবশ্য একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । 'আইন আকবরী' মতে বল্লাল-সেন ১০৬৬ খৃঃ অব্দে রাজপদে অভিষিক্ত হয়েন । 'দান সাগর' গ্রন্থ প্রণয়নের পর তিন বৎসর কাল জীবিত থাকিলে, ১১০১ খৃঃ অব্দে তদীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ গণনা করিতে হইবে । এদিকে, মিনহাজুদ্দীন বখতিয়ার-কর্তৃক বঙ্গাধিকারের ( ৫৮ ) অষ্টাধিক পঞ্চাশৎ বৎসর পর অর্থাৎ ১২৬০ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশে লক্ষ্মণসেনের সমকালিক লোকের প্রমুখ্যৎ প্রকৃত অবস্থা অবগত হইয়া 'তবকাৎনাসরী' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; কাজেই তাঁহার কথা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । তাঁহার মতে বঙ্গদেশের শেষ রাজা 'লক্ষ্মণিয়া' অশীতি বৎসর রাজত্ব করিয়া ১২০৩ খৃঃ অব্দে বখতিয়ার কর্তৃক পদচ্যুত হয়েন । সুতরাং তাঁহার রাজ্যারম্ভকাল ১১২৩ খৃঃ অব্দ বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে । এখন ১১০১ হইতে ১১২৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত যাত্র ত্রয়োদিক বিংশতি বৎসর রহিল । এই অঙ্গকালের মধ্যে এতগুলি রাজাকে সন্নিবেশিত করিতে হইবে ।

\* নিখিল মৃগচক্রভিলক-জীবদ্রাশালসেন দেবেন । পূর্ণেশশিল নব দশমিতে ল-কাজে দান সাগরো রচিতঃ ।

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালের গণনা কোনস্থলে সঠিকরূপে নির্দিষ্ট নাই । আবুল-ফাজেল বলেন তিনি মাত্র আট বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন । কিন্তু তদীয় মন্ত্রী হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্ব' গ্রন্থে লিখিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে কৈশোর বয়সে সভাপতি নিযুক্ত করেন, যৌবনাবস্থাতে মন্ত্রিপদ প্রদান করেন এবং অবশেষে ধর্ম্মাধিকার পদে বরণ করেন । কিন্তু এত অঙ্গকাল মধ্যে এইরূপ পরিবর্তন কোন মতে সম্ভবে না । এতদ্বিবন্ধন বর্তমান তত্ত্বানুসন্ধারিগণ ১১০১ হইতে ১১২১ খৃঃ অব্দ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বলিয়া স্থির করেন । ইহার পরে মাদব-সেন এবং কেশবসেন । সুতরাং দেখা যায়, হয় নৌজিব, ( দ্বিতীয় ) লক্ষ্মণ এবং হু অথবা সুরসেন ও অশোক প্রত্যেকে মাত্র দুই এক মাস রাজত্ব করিয়াছেন— অথবা এই অভিধানগুলি এক লক্ষ্মণসেনের নামান্তর মাত্র । প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয় অনুমান অধিক যুক্তিসঙ্গত এবং প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় ।

কোন ব্যক্তির সম্পর্কে কিছু লিখিতে গেলে তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের উল্লেখ না করা ভাল দেখায় না, এই জন্য এস্থলে তাঁহাদের সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে ।

মেট্রাক্ সাহেব রাজসাহীর অন্তর্গত দিয়পাড়ার নিকটবর্তী বুর্ডিন ( Burrin ), নামক স্থানে একখানা তাম্রশাসন প্রাপ্ত

হয়েন। তাছাতে বিজয়সেন, হেমন্তসেন, শামন্ত সেন এবং বীরসেন এই চারিজন সেনবংশীয় রাজার নাম লিখিত আছে। সম্ভবতঃ বীরসেনই এই বংশের নায়ক, কারণ তিনি চন্দ্রের অপত্য বলিয়া খ্যাত এবং তাঁহার পূর্ববর্তী আর কাহারও নাম উল্লিখিত নাই। বীরসেনের পুত্র শামন্ত-সেন, তৎপরে হেমন্তসেন, হেমন্তসেনের পুত্র বিজয়সেন। কথিত আছে বিজয়-সেন আসাম (কামরূপ) ও কনিষ্ঠ দেশ \* অধিকার করিয়া পাশ্চাত্য ভূপতিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিলেন।

বরিশালে ৮ কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারিতে প্রিন্সেপ সাহেব যে দানপত্র প্রাপ্ত হয়েন, তাছাতে লিখিত আছে, গৌড়েশ্বর কেশবসেন জ্ঞানৈক ব্রাহ্মণকে বাঙলে, বেতোগাত ও উদ্বমূল † নামে তিনখানি গ্রাম দান করেন। সম্প্রদাতা কেশবসেন ‡ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বঙ্গাল-

\* “ত্বং নানাবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং

ঔজ্জ্বল্যনাথাননরত্ননিগূঢ়রোষঃ।

গৌড়েশ্বরমজ্জবদপাকৃতকামরূপ-

ভূপং কলিঙ্গমপি যন্তরসাম জিগায় ॥

এই শ্লোকের শেষার্ধের অর্থ সম্পর্কে যতপার্থক্য দৃষ্ট হয়।

† প্রসিদ্ধ আছে যে, এই গ্রামত্রয় বিক্রমপুরের নিকটবর্তী ছিল।

‡ শিম্পলিপির যেস্থলে কেশব সেনের নাম লিখিত আছে, সেইস্থলে বোধ হয়, পূর্বে অপর একটি নাম ছিল; সেই নাম

সেনের পৌত্র এবং বিজয়সেন অথবা মুখসেনের প্রপৌত্র আত্ম পরিচয় দিয়া-ছেন। ‘আইন আকবরী’ তেও মুখ-সেনকে বঙ্গালসেনের পিতা বলা হই-য়াছে। ‘দানসাগর’ এত্বে বঙ্গালসেন-প্রদত্ত যে দানপত্রের উল্লেখ আছে, তা-ছাতে তিনি বিজয়সেনের পুত্র এবং হে-মন্তসেনের পৌত্র বলিয়া পরিচিত। অ-ধুনাতন সুন্দরবনে লক্ষ্মণসেনের যেতাত্ত-শাসন পাওয়া গিয়াছে, তাছাতে লিখিত আছে লক্ষ্মণসেন বঙ্গাল সেনের পুত্র, বিজয়সেনের পৌত্র এবং হেমন্তসেনের প্রপৌত্র। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় ব-ঙ্গদেশের সেনবংশীয় ভূপতিদিগের কীর্তি-স্তম্ভস্বরূপ শিম্পলিপি সমূহে উল্লিখিত রা-জগণ একই বংশ সম্ভূত।

লাক্ষ্মণেয় হইতে বঙ্গালসেন পর্য্যন্ত ভূ-পতিগণের রাজত্বকালের একরূপ নির্দেশ আছে। কিন্তু বঙ্গালসেনের পূর্ববর্তীগ-ণের কাল নিরূপণ চেষ্টা সম্যাক্রূপে অনু-মান মূলক হইবে বলিয়া উছা হইতে বিরত থাকিলাম।

সেনবংশ এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ হইতে পারে।

কাটিয়া হুতন নাম সংযোজিত হইয়াছে। সেই অপর নাম মাধবসেন। বোধ হয় দানসিদ্ধির পূর্বেই মাধবসেনের মৃত্যু হয়। হুতরাং স্পষ্ট দেখা যায়, কেশবসে-নের পূর্ববর্তী মাধবসেনও লক্ষ্মণসেনের পুত্র।

বীরসেন \*    .. .. .  
 সামন্তসেন    ( পুত্র )  
 ছেমন্তসেন    ( পুত্র )  
 বিজয়সেন ওরফে  
 সূর্যসেন    ( পুত্র )  
 বল্লালসেন    ( পুত্র ) ১০৬৬ খ্রীঃ অঃ  
 লক্ষ্মণসেন    ( পুত্র ) ১১০১ খ্রীঃ অঃ  
 মাধবসেন    ( পুত্র ) ১১২১ খ্রীঃ অঃ  
 কেশবসেন    ( ভ্রাতা ) ১১২২ খ্রীঃ অঃ  
 লাক্ষণের ওরফে  
 অসোক, 'র অথবা } (পুত্র) ১১২৩ খ্রীঃ অঃ  
 সুরসেন ।

অনেকের মনে এই সিদ্ধান্তটি বদ্ধমূল আছে যে বঙ্গদেশের সেন রাজারা বৈদ্যবংশীয় ; এবং এখনও অনেক বৈদ্যসন্তান বর্তমান আছেন গাঁহারী বল্লাল সেনকে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ মনে করিয়া গর্ব করেন । একবার উচ্চবংশজ বলিলে যতদূর কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা সহজ্রবার অন্য প্রকার জ্ঞতিবাদে ততদূর হওয়ার নহে । কেউকে সম্বন্ধে করিবার এ একটি অব্যর্থ মহান উপায় । কুলাচার্য্যগণ ইহা বিলক্ষণ

\* রাজা আদিশুর এবং বীরসেন প্রায় সমকালিক, এরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয় ; কিন্তু আদিশুরকে পালবংশীয় বলিয়া বোধ হয় না । এই জন্য কেহ কেহ অনুমান করেন ‘আদিশুর’ বীরসেনের নামান্তর । ‘শুর’ এবং ‘বীর’ একই অর্থ ব্যঞ্জক ; এবং ‘আদি’ প্রথম, অর্থাৎ বংশনায়ক, এই অর্থে ব্যক্ত হইয়াছে ।

জানিতেন, এবং জানিয়া স্বার্থসাধন মানসে অনেক অপেক্ষাকৃত নীচবংশজাত ব্যক্তিদিগকে কোন প্রসিদ্ধ রাজকুলের বংশধর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন । বঙ্গদেশের বৈদ্যদিগের সঙ্গে বল্লালসেনের এইরূপ সম্বন্ধ হওয়াই নিতান্ত সম্ভব । বর্তমান সময়েও এতদ্দেশে এইরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে । সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যখন কোন বিবাহাদি কার্যোপলক্ষে কুলীনগণ মৌলিকের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন ‘ঘটক চূড়ামণি’ গণ অর্থলোভে মৌলিকদিগকে একেবারে স্বর্ণে তুলিয়া দেন ; আবার সময়ান্তরে ইচ্ছামত অর্থসাহায্য না হইলে তাহাদিগকে মরকের কীট বলিতেও অগ্রমাত্র কুণ্ঠিত হইয়েন না । সকলেরই বিদিত আছে এই পতিতপাবন মহাত্মাদিগের অসাধ্য কৰ্ম্ম নাই ।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ‘অশ্বঠ’ নামক এক শ্রেণী ক্ষত্রিয় বাস করিত । ‘বিষ্ণু-পুরাণে’ † উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের জাতিসমূহের উল্লেখ আছে এবং পাণিনির ব্যাকরণে ‘অশ্বঠ’ শব্দ ক্ষত্রিয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । মহাত্মারতে ‘অশ্বঠ’ শব্দের অর্থ এক স্থলে ‘ক্ষত্রিয়জাতি’ এবং স্থানান্তরে স্বনামখ্যাত ক্ষত্রিয়বংশজাত রাজা । মহাত্মারতের ‘অশ্বঠ’ এবং মনুর উক্ত ‘অশ্বঠ’ একই অর্থব্যঞ্জক বলিয়া ভ্রম হওয়া বশতঃই, বোধ হয়, সেন রাজারা বৈদ্যবংশজ, এই জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়া † ‘মজারামানুধ্যায়ঃ পারসিকানন্তথা’

থাকিবে । আবার আবুলফাজেল এবং পীর ভোফেনখেলার সেনরাজাদিগকে কার্যস্থ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । বর্তমান সময়েও উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ‘অ-য়ঠ’ নামক এক শ্রেণী কার্যস্থজাত বাস করে । সম্ভবতঃ ইহাই এই ঔকতর ভ্রমের মূল কারণ হইবে । কিন্তু এইরূপ অযৌক্তিক জনশ্রুতির প্রতিকূলে সেনবংশের ক্ষত্রিয় সম্পর্কে যে সকল যুক্তিসম্মত প্রমাণ বর্তমান আছে, তাহাতে কোন মতে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া পারা যায় না ।

রাজমাহীর তাম্রশাসনে স্পষ্ট লিখিত আছে, সেনবংশনায়ক বীরসেন \* চন্দ্র-বংশজাত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় । অপরস্থলে শামস্তসেন ‘ব্রহ্মক্ষত্রিগাম্ কুলশিরো-দাম’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন † । বা-

\* ‘যং সিংহাসনদীপ্তরাস্য কণক-

প্রায়ঃ জটামণ্ডলং

গজাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈর্বক্রামরপ্র-

ক্রিয়া ।

শ্বেতোৎকলফণাঞ্চলঃ শিবশিরঃ স-

ন্দানদামোরগ-

চ্ছত্রং যস্য জয়তাসাবচরমৌ রাজা

সুধাদীপতিঃ ॥

বংশেশস্যামরস্রীবিভতরতকলাসাকি-

ণোনাকিণাত্য-

কোণীশৈবকীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ

কীর্তিমন্দির্বভূবে । ইত্যাদি ।

† ‘সত্রক্ষক্ষত্রিগামজনি কুলশি-

রোদামশামস্তসেনঃ ।’

বরগঞ্জের তাম্রশাসনেও সেন রাজাদিগকে সোমবংশসম্বৃত বলা হইয়াছে । স্বন্দরবনে লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তদনুসারেও সেনবংশ ক্ষত্রিয়, একথা প্রতিপন্ন হইতেছে ‡ । এই রূপ ভূরি ভূরি প্রবল প্রমাণ বর্তমানে বোধ হয় কাহারও মনে সেনবংশের ক্ষত্রিয় মগন্ধে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না ।

ক্ষত্রিবংশসম্বৃত রাজা লাক্ষ্মণিয়ার ভ্রাতৃমগন্ধে ‘তবকংনাসরীতে’ একটি গল্প লিখিত আছে । এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা বোধ হয় দোষাবহ হইবে না । পিতার মৃত্যুকালে লাক্ষ্মণেয় মাতৃগর্ভস্থ, সুরাং রাজমুকুট গর্ভোপরি স্থাপিত হয় । রাজমাতার প্রসবকাল উপস্থিত হইলে দেশীয় জ্যোতির্বিদগণ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, এই সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নানা অনর্থের কারণ হইবে, কিন্তু দুই ঘণ্টা পর প্রসব হইলে তাদীনী রাজা অশীতিবর্ষকাল সিংহাসনা-রূঢ় থাকিবেন । রাজমাতা তদনুসারে

‡ ( ক ) ‘তেজোবিস্তর মুবোধিব্যতামভূবন্ ভূমীভুজঃ ক্ষুটমণৌবধনাগ-বংশে ।’

( খ ) ‘দোকব্যাক্ষপিতারি সজ্জরসে ।

রাজনাধর্ষাশ্রয়ঃ

ক্রীমলক্ষ্মণসেনভূপতিরতসৌজন্যসীমা-

হজনি ॥’

এই শিঙ্গ-লিপির কোন স্থলে বলাল সেনকে ক্রীমলক্ষ্মণপুরবাসী বলা হইয়াছে ।

পদদ্বয়ে রজ্জুবন্ধন দ্বারা উর্দ্ধপাদ হইয়া  
খুলিয়া থাকেন, এবং শুভলগ্ন উপস্থিত হ-  
ইলে বন্ধনমুক্ত হইয়া লাক্ষ্মণেরকে প্রসব  
করেন। কিন্তু অসহ্য প্রসবযন্ত্রণায় তাঁহার  
মাতার তৎক্ষণাৎ প্রাণ বিয়োগ হয়।

লাক্ষ্মণের বিলক্ষণ শাস্ত্রপারদর্শী এবং  
ধর্মজ্ঞ বলিয়া কথিত। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায়  
১২০২ খৃঃ অব্দে যখন বখতিয়ার বেহার  
জয় করেন, বঙ্গীর ব্রাহ্মণ এবং জ্যোতির্বিদ-  
গণ সমবেত হইয়া রাজাকে বলিলেন—  
তাঁহাদের পুরাতন গ্রন্থসমূহে তুরস্কদিগ-  
কর্তৃক বঙ্গ অধিকৃত হইবে বলিয়া লিখিত  
আছে এবং তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সেই  
সময় উপস্থিত; সুতরাং দেশ পরিত্যাগ  
করা বিধেয়। লাক্ষ্মণের বৃদ্ধবয়সে রাজ-  
ধানীর মমতা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন  
না, অথচ দেশরক্ষার্থ কোন উপায়ও অব-  
লম্বন করিলেন না। অন্তুলে বক্তব্য এই যে,  
লাক্ষ্মণেরকে ভীক, কাপুরুষ, যাহাই যিনি  
বলুন, দেখিতে হইবে বখতিয়ারকে বঙ্গ-  
বিজয় উপলক্ষে ইতিহাসবিদগণ যে য-  
শোরাশিতে বিভূষিত করিয়াছেন, প্রকৃত  
পক্ষে তিনি তাহার উপযুক্ত কি না। ব-  
খতিয়ার সমস্ত সেনা নিকটবর্তী অরণ্যে  
লুক্কায়িত রাখিয়া মাত্র সপ্তদশ অর্ধারোহী  
সমভিব্যাহারে নদীয়ায় প্রবেশ করেন।  
নিরস্তর ধূর্ততা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা এবং অ-  
সরল ব্যবহারে আত্মগোপন করিয়া ক্রমে  
রাজপ্রাসাদপর্যন্ত নির্বিবাদে প্রবেশাধি-  
কার প্রাপ্ত হইলেন এবং অতিনিষ্ঠুরভাবে

নিরস্তর রাজামুচরবর্গকে অন্যায়রূপে আক্ৰি-  
মণ করতঃ অবশেষে সোনার বাজালা এ-  
কেবারে ছারখার করেন। যদি বলেন,  
ইহা প্রবঞ্চনা বা ধূর্ততা নহে, ইহা যুদ্ধ-  
কৌশল; আমি জিজ্ঞাসা করিব, মিথ্যা  
কথা বা অন্যায় এবং অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা  
কি প্রকৃত যোদ্ধার ধর্ম? উহা চোরের  
ধর্ম, দস্যুর ধর্ম। এরূপ ছলনা করাতে  
কি বখতিয়ারের ভীকতা প্রকাশ পায়  
নাই? তবে তিনি কি অভিপ্রায়ে রক্ষক-  
দিগের নিকট দূত বলিয়া আত্মপরিচয়  
দিলেন? কি অভিপ্রায়ে প্রকৃত যোদ্ধার  
ন্যায় স্পৃহভাবে যুদ্ধঘোষণা করিলেন না?  
হিন্দুরা কোন কালে দ্বিভ্রমী যোদ্ধা ব-  
লিয়া ভুবনবিখ্যাত ছিলেন। এমন দিন  
ছিল, যখন হিন্দুযোদ্ধাবর্গের সগর্ভপদ-  
ভরে মেদিনী কম্পমান হইত। কিন্তু তাঁ-  
হার কোন কালে প্রবঞ্চনা এবং ছলনা,  
মিথ্যাকথা এবং অসত্য ব্যবহার স্বপ্নেও  
জানিতেন না। সর্বত্র সর্বদা সরলতা-  
পূর্ণ, শত্রু মিত্র উভয়েরই প্রতি সমভাবে  
সরল এবং উদার। হিন্দুদিগের সঙ্গে  
তুলনা করিলে যবনদিগের চরিত্রের অপ-  
কৃষ্টতা সর্বত্র পরিলক্ষিত হইবে। বাস্ত-  
বিক এইরূপ ছলনা এবং অসত্য ব্যবহারে  
বখতিয়ারের চরিত্রে অনপনের কলঙ্ক রহি-  
য়াছে, সন্দেহ নাই। তাঁহার সম্বন্ধে ন-  
দীয়ার একটি প্রাণীরও মনে কোন সন্দেহ  
উপস্থিত হইয়াছিল না; বরং তাহার বখ-  
তিয়ারকে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্তী হইয়া

অস্ত্রধারণ না করা পর্য্যন্ত অশ্বাবাসায়ী বলিয়া স্থির করিয়াছিল। যখন অকস্মাৎ রাজপুরী এবং নগরমধ্যে ভয়ানক কোলাহল উপস্থিত হইল, তখন লাক্ষ্মণের আহ্বার করিতে বসিয়াছিলেন এবং প্রকৃত অবস্থা জানিবার পূর্বেই বখতিয়ার প্রবলবেগে অস্ত্রপুরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তোপায় হইয়া বৃদ্ধরাজ্যপরিবার ও অনুচরবর্গ এবং সমস্ত অর্থসম্পত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক একাকী শূন্তপথে প্রাণভয়ে ধাবমান হইলেন।

আর গুটি দুই কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। বখতিয়ার সমস্ত বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন, এই কথা সত্য নহে। ১২৬০ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা মিনহাজউদ্দীন লিখিয়া গিয়াছেন ‘রায় লাক্ষ্মণিয়া সঙ্কট (জগন্নাথ ?) ও বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করেন। সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। অদ্যাপি তাঁহার সন্তানেরা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছেন।’

কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আরবী ভাষাবিশারদ বুকমেন সাহেব লিখিয়াছেন ‘বখতিয়ার সমস্ত বঙ্গাধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা অন্যায়। তিনি মাত্র মিথিলার দক্ষিণপূর্বাংশ, বারেন্দ্র, রাঢ়ের উত্তরাংশ এবং বগড়ির উত্তর-পশ্চিমাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। বাস্তবিক পদ্মানদীর পূর্বপারস্থিত বঙ্গরাজ্য তাঁহার আয়ত্তাধীন হয় নাই। ‘তবকং নাসরী’ বা বঙ্গে মুসলমানরাজত্বের প্রথম শতাব্দীর কোন মুহুর্তে সুবর্ণ প্রাণের নাম উল্লেখ নাই। ‘তারিখি বরনী’ ঐতিহাসিক গ্রন্থে বুলবন বাদসাহের সময়েও (১২৮০ খৃঃ অঃ) সুবর্ণপ্রাণ একজন স্বাধীন রাজার বাসস্থল বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। তৎপক সাহার রাজত্বকালে (১৩২৩ খৃঃ অঃ) সোনারগাঁও প্রভৃতিস্থল মুসলমানদিগদর্ভক প্রথম অধিকৃত হয়।

শঃ—

## প্রাতরুথান ও প্রাতঃক্রিয়া।

‘পাখী রবে কলরবে, এখনো ঘুমিয়ে রবে?’

স্বাস্থ্যপ্রদায়িনী উষা দ্রুত্রে দাঁড়ায়ে ঐ।’

‘শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং’— এই অমূল্য কবিতাটুকি যে মহাত্মার অমৃতময়ী লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তিনি যে শরীরমাত্রেয়ই চিরকৃতজ্ঞতাজ্ঞান, তাহাতে অপ্রমাণ সন্দেহ নাই। বাস্তবিক

শরীররক্ষাই আদি ও সূর্য্যগ্রগণ্য ধর্ম। দেহের প্রতি যত্নশূন্য হইয়া ঐহিক বা পারলৌকিক কোন প্রকার ধর্মসাধন করা দুর্ব্বল—যদি কেহ তাহা করিতে চেষ্টা করে, তাহাও বিড়ম্বনামাত্র। এই জন্যই

উল্লিখিত কবিতাংশের স্মৃতি হইয়াছে । যদিও পুরাতন ঋষিগণ সময়ে সময়ে দেহের প্রতি মমতাশূন্য হইয়া ধর্মসম্বন্ধের বিধান দিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা ইহা আবার শরীর রক্ষার জন্য নানাবিধ স্বাস্থ্যকর নিয়মসমূহের তত্ত্ব ও উপায় উদ্ভাবন করিতে ক্রটি করেন নাই । আয়ুর্বেদ, চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্রই তাহার উদাহরণ স্থল । এই সকল গ্রন্থ পূর্বকর্তন ঋষিগণেরই লেখনীপ্রসূত । প্রকৃতির সহিত প্রাণিগণের নিত্য ঘনিষ্ঠতা আছে, সুতরাং কিরূপ নিয়মে চলিলে সেই ঘনিষ্ঠতার যোগভঙ্গ না হয়, এবং কীদৃশ অনিয়মের বশীভূত হইলে উহার বিচ্ছেদ ঘটে, তত্ত্বাবৎই ঐ সকল গ্রন্থে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে । ঐ সকল গ্রন্থের মর্মগ্রহণ পূর্বক নির্দিষ্ট নিয়মাবলীর উপর নির্ভর করিয়া চলিলে দীর্ঘকাল শরীর সুস্থ থাকে এবং বিবিধ আময়সমূহের যজ্ঞনা হইতে পরিভ্রাণ লাভ করা যায় । কিন্তু ইহার ব্যতিচার ঘটিলে শরীর দুর্বল হয়, বাঁচিয়া থাকা ভার বোধ হয় এবং অসুস্থতার মধ্যে মৃত্যুও ঘটে । অনেক সর্বলকার ব্যক্তি প্রথমতঃ রক্তের তেজে স্বেচ্ছাচারী হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালনসম্বন্ধে শৈথিল্য প্রকাশ করে; তাহার মনে করে যে, যথেষ্টাচারী হইয়া জীবনধারণে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না; কিন্তু তাহার যদি একবার ভাবিয়া দেখে যে, বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির

অভেদাঙ্গ সঘন্য আছে, তাহার পার্থক্য ঘটিলে অবশ্যই বিপর্যয় ঘটবে, সুতরাং এতদুভয়ের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করা নিত্য কর্তব্য—ইহার অন্যথা করিলে অকালে কালকবলিত হইতে হইবে, তাহা হইলে অসময়ে প্রায় কাহাকেই জীবন-বিসর্জন দিতে হয় না । কিন্তু মানুষের যে কেমন এক অমনোযোগিতা, সে সুস্থাবস্থায় আত্মশরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে ইচ্ছা করে না । সুতরাং অচিরেই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয় । যখন শরীর সুস্থ থাকে, সেই সময় হইতে ভাদি স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া চলা উচিত । বরাবর শরীরের প্রতি যত্ন প্রদর্শন করিয়া চলিলে অবিচ্ছিন্ন স্বাস্থ্যরক্ষার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যত প্রকার নিয়ম আছে, তন্মধ্যে প্রাতঃকণ্ঠন একটি অতুৎকষ্ট নিয়ম । এই প্রস্তাবে তাহাই লিখিব ।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে প্রাতোঃকণ্ঠন করিয়া ধর্ম ও অর্থ চিন্তা করিবে । মনে মনে ঈশ্বরের ধ্যান করিবে \* । সুস্থ ব্যক্তি অমৃত রক্ষার্থ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া শারীরিক চিন্তা অর্থাৎ জীর্ণাজীর্ণ বিবেচনা করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবেক † । রজনী অপসৃত

\* ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উৎস্রয় ধর্মমর্থক চিন্তয়েৎ ।  
কায়ক্লেশশুভ্রুজুতং ধ্যানেত্তু মনসেধ্বং ॥ কৃ-  
ত্বপুংসু, উপবিভাগ; ১৭ অধ্যায় ।

† ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উত্তিষ্ঠেৎ স্বস্থো-  
ক্ষার্থম্যুত্থঃ । শরীরচিন্তাং নিবর্ত্য মৈ-  
ত্রকর্ষং সমাচরেৎ ॥ রাজবল্লভ গ্রন্থ ।

হইলে পূর্বদিকে যে তমিষালােক জনিত একপ্রকার আভা সমুদ্ভূত হয় তাহারই নাম ব্রাহ্মমূর্ত বা উষাকাল। খনার বচন বলিয়া বঙ্গদেশে একটি প্রবাদ আছে, 'ডাকে পাখী না ছাড়ে বাসা, খনার মতে সেই সে উষা'। পেচক প্রভৃতি কয়-প্রকার পক্ষী বাতীত অপরাপর বিহঙ্গ ব্রাহ্মিকালে দেখিতে পায় না, সুতরাং উষাকালের আলোক ও অন্ধকার নিবন্ধন পক্ষিগণ জাগ্রত হইয়াও উড়িতে পারে না। ক্রমে আলোকের পরিমাণ রুদ্ধ হইলে উষ্ণতা উদ্ভূত হয়। এই সময়ে মৃত জগতের নবজীবন সঞ্চার হইতে থাকে। এই সময়ে মনুষ্যমাত্রেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গাত্ৰোপ্তান করা সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবন আশা করে, এই সময়ে তাহাকে শয্যা ছাড়িয়া উষাচরণে অগ্নিপাত করিতে হইবে। এই সময়ে গাত্ৰোপ্তান করিয়া 'জীবনেছু দীর্ঘ ব্যক্তি স্বভাবতঃ প্ররক্ত মলমূত্রাদির বেগধারণ করেন না, কিন্তু স্বভাব প্ররক্ত কামক্রোধাদির বেগধারণ করিয়া থাকেন' \*। 'যে ব্যক্তি সৌভাগ্যলক্ষ্মীর আকাজক্ষা করে সে এই সময়ে গাত্ৰোপ্তান করিয়া বৈদ্য, পুরোহিত, মন্ত্রী ও নৈবজ্ঞ এই চারি ব্যক্তিকে দর্শন করিবে',† অর্থাৎ তাঁ-

\* স্বভাবতঃ প্ররক্তানাং মলাদীনাং জিজীবিষুঃ। ন বেগাধারণৈর্দীর্ঘঃ কামাদীনাং ধারণেৎ ॥ রাজবলভ।

† বৈদ্যঃ পুরোহিতোমন্ত্রী নৈবজ্ঞো-

হাদিগের নিকট নৈমন্ত্রিক শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জ্ঞাপন করিবে।

স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে গাত্ৰোপ্তান করিয়াই ক্রিয়ৎকণ ইত্যন্তঃ পদচারণা করা কর্তব্য। কেননা সে সময়ে নিদ্রা শরীরকে একপ্রকার জড়তাবাপন্ন ও নৈব্রহ্মকে অবগত করিয়া রাখে যে, উঠিয়া শয্যোপরি অবস্থান করিলে তৎক্ষণাৎ আবার নিদ্রাভিত্ত হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। পদচারণার সময়েই শীতল ভূলে একবার নৈব্রহ্মপ্রকাশন করা উচিত। ইহাতে নিদ্রার আবরণী শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং দৃষ্টির প্রসন্নতা জন্মে। অনন্তর স্ব্যা উঠিতে না উঠিতে প্রত্যহ অন্তঃ একঘণ্টা কাল প্রাতঃস্নান করা বিধেয়। এতদ্ব্যতীত এবং পাশ্চাত্য কৃতবিদ্যা ও সুবিচক্ষণ চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে প্রাতঃস্নান প্রতিমাত্র হিতকর বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং বর্তমান ভিনকেরাও ইহা বলিয়া থাকেন। এইরূপ ভ্রমণে কক্ষ, মেদরোগ, শরীরের স্থূলতা প্রভৃতি নষ্ট করে ॥ যাহাদিগের শরীর দুর্বল বা পাণ্ডিত, তাহাদিগেরও এসময়ে সূর্যপ্রচারে অর্থাৎ পাদচারে ক্রিয়ৎকাল বেড়ান বিধেয়। সূর্যপ্রচার আয়ুঃ ও বলবৃদ্ধিকর

ইহ চতুর্গকঃ। প্রভাতকালে ত্র্যম্বকোমিত্যং অগ্নিসমিচ্ছতা ॥ রাজবলভ।

‡ অথ। মেদঃকফশৌল্য \* \* \* বিশাশনঃ। রাজবলভ।



এবং পদরোগ বিনাশক \* । যাহারা ধনবান, তাঁহারা পারে হাঁটিয়া বেড়ান লজ্জাকর বিবেচনা করিলে স্বস্থ বাহনে আরোহণ করিয়া প্রাতঃদ্রমণ করিতে পারেন । হস্তীতে, অশ্বে, শকটে বা পাল্কীতে চড়িয়া বেড়াইলেও অঙ্গের স্থিরতা, বল ও অগ্নিরুদ্ধি হয়, কেবল কিয়ৎপরিমাণে বায়ু প্রকোপিত হইয়া থাকে † । কিন্তু অধিক-ভাগে উপকার লাভ হইলে যৎসামান্য অপকার অনায়াসে সহ্য করা যাইতে পারে ।

সূর্যোদয়ের প্রাক্কালে যে শীতল বায়ু মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা বিশুদ্ধরূপে স্বাস্থ্যপ্রদ । তদ্বারা নিদ্রাজাত শারীরিক ক্রম ও জড়তাপনোদন হইয়া থাকে, এবং হুতন বলের সঞ্চয় হয় । এই জন্যই আমাদের দেশে উহাকে ‘বীরবায়ু’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । শীতকালে উহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে কফ-বর্দ্ধক হয়, সুতরাং সে সময়ে প্রাতঃদ্রমণের পরিচ্ছদ উষ্ণ হওয়া আবশ্যিক । বিশেষতঃ বক্ষ, কণ্ঠ ও পাদদ্বয় উত্তমরূপে পশমজাত বস্ত্রাদির দ্বারা গরম রাখা নিতান্ত কর্তব্য । এই কয় অঙ্গেই অধিক পরিমাণে শীতানুভব হইয়া থাকে, বাসন্তীয় উষাকালের ভ্রমণ পরিচ্ছদ পশম ও কা-

\* সূত্রপ্রচারমাসুখ্যং বলাৎ পাদকজ্জা-  
পহং ॥ রাজবল্লভ ।

† হস্তাশ্বরথচোলাদৈর্ন্যে দ্রমণং বাতকে-  
পনং স্থিরীকরণমজান্যং বলাৎ বহিবিব-  
র্জনং ॥ রাজবল্লভ ।

পাসমুত্র নিখিঁত বা কেবল কার্পাসের মোটা সূতা নিখিঁত হইলে ভাল হয় । গ্রী-  
ষ্মকালে উষাভ্রমণের সময় কার্পাসজাত  
মৃক্ষ পরিচ্ছদ ব্যবহার্য । বর্ষাকালে প্রা-  
তঃদ্রমণ নিষিদ্ধ ; কেবল মধ্যে মধ্যে এক  
একদিন আকাশমণ্ডল পরিষ্কৃত ও ভূভাগ  
বিশুদ্ধ থাকিলে বেড়ান উচিত । কিন্তু  
বর্ষাকালের উষাকালীন রুক্তিবর্ধণে মুখানু-  
ভব করিয়া উষোস্থান করিতে অলস হওয়া  
নিতান্ত অনুচিত । বর্ষা সময়ের উষাকালে  
নিদ্রিত থাকিলে অত্যন্ত বায়ুরুদ্ধি হয়, সু-  
তরাং স্বাস্থ্যসংক্ষেপে অনেকটা অপকার ঘটে ।

প্রত্যতকালে ভ্রমণ যেরূপ উপকারি,  
ঐ সময়ে সেইরূপ ব্যায়ামের দ্বারাও বহুল  
পরিমাণে কার্যকর স্বাস্থ্যলাভ হয় । কিন্তু  
ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ব্যায়াম উপযুক্ত ও  
অনুপযুক্ত । স্নিগ্ধ দেহ ( যুগ্ম, দুগ্ধাদি )  
ভোজনশীল ও বলবান ব্যক্তির প্রত্যহ  
ব্যায়াম ( কুস্তি ) চর্চা কর্তব্য । বিশে-  
ষতঃ শীত ও বসন্তকালে ইহা উৎকৃষ্টতম  
পথ্য । অপর একটি ঋতুতে আত্মহি-  
তার্শে স্বাভাবিক ক্ষমতার অর্দ্ধ পরিমাণে  
কুস্তি করা বিধেয় । যে পর্যন্ত কৃক্কিদেশে,  
ললাটে ও গ্রীবার ঘর্ষোদাম এবং অম-  
বোধ ও শ্বাসোদ্ভব না হয়, সেই পর্যন্ত  
ব্যায়াম করিবে, তদতিরিক্ত করিলে উপ-  
কারের পরিবর্তে অপকার ঘটিবে । প্রত্যহ  
কুস্তি করিলে শরীরের লঘুতা, কার্যক-  
রণে সামর্থ্য ও ক্রেশসহিষ্ণুতা জন্মায় এবং  
বাত-পিত্ত-কফের সমতা ও অগ্নিরুদ্ধি হয় ।

বিকল্প ও অজীর্ণকর ত্রযা ভোজন করিলেও পরিপাক হইয়া যায়। ব্যায়ামের জায় অস্বাভাবিক স্থৌল্যবিনাশক অন্য ক্রিয়া নাই। যেরূপ গরুড়ের নিকট সর্পসমূহ গমন করিতে পারে না, সেইরূপ জ্বর, ব্যাধি, শত্রু প্রভৃতি ব্যায়ামশীল মনুষ্যকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু রক্তপিত্তরোগী, ক্ষয়কাশী, যক্ষ্মারোগী, শ্বাসকাশযুক্ত, ভুক্ত, ও ক্রীসংসর্গে রূশ ব্যক্তির ব্যায়াম কর্তব্য নহে \*। অতাস্ত ব্যা-

\* ব্যায়ামোহি সদা পথ্যা বলিনাং সিন্ধভোজিনাং। স চ শীতে বসন্তে চ তেবাং পথ্যাতমঃ স্মৃতঃ ॥ সর্বতু সর্ধৈর্হি মর্ত্যৈরাবহিতার্থিভিঃ শক্ত্যর্থে ন তু ক-  
র্তব্যো ব্যায়ামার্গো ন চান্যথা ॥ কৃকো ললাটে জীবান্নং যদা ঘর্ষঃ প্রবর্ততে। শক্ত্যর্থে তং বিজানীয়াদান্নাসোচ্চাস-  
মেব চ ॥ লাঘবং কর্ণসামর্থাং শৈথ্যং ক্লেশসহিষ্ণুতা। লোষকরোহগ্নিরজিহ্বা-  
বায়ামাদ্রুপজায়তে ॥ ব্যায়ামং কুর্ষতো নিত্যং বিকল্পমপি ভোজনং। বিদগ্ধম-  
বিদগ্ধংবা নির্দোষং পরিপচাতে ॥ ন চ ব্যায়ামসদৃশমন্যং স্থৌল্যাপকর্ষণং। ন চ ব্যায়ামিনং মর্ত্যমরয়োহপিহি নোবলাং ॥  
ন চৈনং সহসাক্রম্য জ্বর সমধিগচ্ছতি। ব্যায়ামকুরগাত্রস্য পত্ন্যামুদ্বর্তিতস্য চ ॥  
ব্যাধয়ো মোপসর্পন্তি বৈনভেরমিবো-  
রোগাঃ। রক্তপিত্তী ক্ষয়ী শোথী কাশী শ্বা-  
সীকতাতুরঃ। ভুক্তবান্ ক্রীচ্ চ কীণোব্যা-  
য়ামং পরিবর্জয়েৎ ॥ রাজব্রতত।

য়ামে অর্থাৎ অবৈধ কৃতিতে কাশ, রক্তপিত্ত, শ্রমক্রান্তি, শরীরক্ষয়, তৃষ্ণা জ্বর ও ছর্দি (বমন) প্রভৃতি রোগের উৎপত্তি হয় †। বাহ্যরূপ পূর্বোক্ত রোগগ্রস্ত, তাহাদের প্রতি ব্যায়ামের পরিবর্তে কেবল প্রাতঃক্রমণই সুপ্রশস্ত।

প্রাতঃকালে উঠিয়া ব্যায়াম বা প্রাতঃক্রমণের পূর্বে মল মূত্রাদি পরিতাগ্য করা উচিত। তাহা না করিলে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিপরীত হইয়া পড়ে।

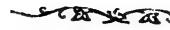
প্রভাতে উঠিয়া প্রত্যহ উত্তমরূপে দন্দ-  
ধাবন, জীহ্বামর্দন ও মুখ নেত্রাদি প্রক্ষা-  
লন করা নিত্য কর্তব্য। ভারতবর্ষ উষ্ণ-  
প্রধান দেশ, এখানে রক্ত হইবার পূর্বেই প্রায়  
অনেকেই দন্দপতন হইয়া থাকে। প্রাচীন  
ঋষিগণ ও ভিক্ষুগণ ইহা বিশেষরূপে অ-  
বগত ছিলেন। এইজন্যই তাঁহারা দন্দধাবন  
প্রভৃতির নিমিত্ত নানাবিধ নিয়ম উদ্ভা-  
বন করিয়া গিয়াছেন। ত্রাতিকালে দীর্ঘ  
নিদ্রাবশতঃ মুখের বৈজাত্য জগ্মার এবং  
লালা নিগত হইয়া ওষ্ঠপার্শ্ব ও গণ্ডস্থল  
দুর্গন্ধ হইয়া উঠে, সূত্রাং ভাল করিয়া  
মুখ প্রক্ষালন করা উচিত। দীর্ঘকাল নেত্র  
নিমিলিত থাকিলে নেত্রমল সমুদ্ভব হইয়া  
দৃষ্টির অস্পষ্টতা ঘটায়, সূত্রাং শীতল জলে  
নেত্রধাবনও কর্তব্য। জিহ্বায় ক্লেদজন্মায় সূ-  
ত্রাং মার্জনীসহযোগে জিহ্বামার্জন বিধেয়।

(ক্রমশঃ) জীরাণ—

† অতিব্যায়ামতঃ কাসোরক্তপি-  
ত্তঃ প্রবর্ততে। শ্রমঃ ক্রমঃ ক্ষয়ঃ তৃষ্ণা  
জ্বরচ্ছর্দিশ্চ জায়তে ॥ রাজব্রতত।

## বিরজা ।

. উপাখ্যান ।



প্রথম অধ্যায় ।

আবার মাস ; বেলা প্রহরেক মাত্র আছে, আকাশের উত্তর পূর্বে কোণে এক খণ্ড রূহৎ নীল মেঘ সাজিয়াছে, তাহার ঈতস্ততঃ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বারিদখণ্ড ছড়াইয়া রহিয়াছে । ভগবান্ কমলাপতি যতই অন্তাচল-শিখরাভিমুখী হইতে লাগিলেন, রূহৎ বারিদখণ্ড ততই বৃহত্তর হইতে লাগিল । গ্রামে কেহ বলবান্ ও ক্ষমতাশালী হইলে অন্য পাঁচজনে যেমন তাহার শরণাগত হয়, তদ্রূপ ক্ষুদ্রকায় বারিদখণ্ডগুলি দেখিতে দেখিতে রূহৎ বারিদখণ্ডের সঙ্গে মিশাইয়া গেল । সূর্য্য-কিরণে মেঘগুলির পশ্চিম প্রান্ত রক্তবর্ণ হইল । ঝড় বৃষ্টি আগমনের পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া গগনবিহারী বিহঙ্গেরা ধীরে ধীরে নিম্নগমন করিতে লাগিল । দুই একটি শ্বেতকায় পক্ষী বারিদখণ্ডকে বিজপ করার ছলে তাহার ঈতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিল । নদীর আর পতিব্রতা নারীর একই স্বভাব; স্বামীর মুখ বিষম দেখিলে পত্নীর বদনকমলও বিষম হয় ;—বারিদখণ্ডের ক্লমকায় দেখিয়া পতিত-পাবনী ভাগীরথীও ক্লমকায় হইলেন ।

এই সময়ে একখানি নৌকা গঙ্গা দিয়া নবদ্বীপ হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাইতেছিল । নৌকাখানি আবার মাসের গঙ্গার তীক্ষ্ণ-স্রোতবেগে পূর্ব্বপার দিয়া দ্রুতগমনে যাইতেছিল । আরোহীরা ছইয়ের ভিতরে ছিলেন, অতি অবেলায় আহার করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন ; আকাশে যে নিবিড় ক্লমবর্ণ মেঘ সাজিয়াছে তাহা তাঁহারা দেখেন নাই । যে স্থান দিয়া নৌকা যাইতেছিল, সেখানে এমন বিপদ সময়ে নৌকা রাখিবার উপযুক্ত স্থান নাই । আকাশে যে ক্লমকায় মেঘ দেখা দিয়াছে, তাহা নৌকার মাঝি দেখিয়াছে, দেখিয়া ভীত হইয়াছে । উপযুক্ত স্থান পাটলে সে এখনই নৌকা রাখে, কিন্তু স্থান নাই । এমন সময়ে, যাঁহারা নৌকার সম্মুখদিকে বসিয়া দাড় বাহিতেছিল, তাহাদের একজন মাঝিকে অনুষ্ঠেঃ-স্বরে সম্বোধন করিয়া কহিল, ‘দাদা কি আন্দাজ কর ?’, মাঝি কহিল ‘আন্দাজ করব আর কি ? পাখী সব নাচতেছে দেখ না ?’ পাছে আরোহীরা শুনিতে পান ও শুনিতে পাইয়া ভীত হন, এই জন্য উহারা অনুষ্ঠেঃস্বরে কণা কহিয়াছিল, কিন্তু

কথা তাঁহাদের নিকট অবাক্ত রহিল না। নৌকার মধ্যে সকলেই ঘুমাইতেছিলেন, কেবল একটি বালিকা জাগরিত ছিল। আকাশে কি হইয়াছে, তাহা সে দেখে নাই; কিন্তু গঙ্গার জল অত্যন্ত ক্রমবর্ণ দেখিয়া সে চমৎকৃত ও ভীত হইয়াছিল। এখন সে মাঝিদের কথা শুনিয়া আপনা আপনি কহিল, ‘গঙ্গার জল এমন হইল কেন? আকাশে বৃষ্টি মেঘ করিয়াছে?’ তাহার কথা এক জন যুবক আরোহীর কর্ণে গেল, তিনি আকাশে মেঘের কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। নৌকার ঝাপ খুলিয়া দেখিলেন, পূর্ব ও উত্তরদিকে ভয়ানক মেঘ করিয়াছে। তিনি ভৃত্যকে তামাকু সাজিতে আজ্ঞা করিয়া ছইয়ের উপরে উঠিয়া বসিলেন। যুবক বড় ভীত হইয়াছিলেন, তিনি যদি এই সময়ে একাকি এই নৌকায় থাকিতেন, এত ভীত হইতেন না; কিন্তু তাহার সঙ্গে দুইটি ক্রীলোক ছিল।

ভৃত্য তঁহা কাটি বাবুর হাতে দিল। বাবু তামাকু টানিতে টানিতে মাঝিকে কহিলেন ‘যেখানে হউক, এক জায়গায় নৌকা ধর।’

মাঝি কহিল, ‘কর্তা এ পারে নৌকা রাখ্বেব জায়গা নাই। আর দুকোশ ভেটিয়ে গেলেও এপারে নৌকা রাখ্বেব জায়গা পাব না। জুহুম হয়ত ওপারে গিয়ে নৌকা ধরি।’

বাবু কহিলেন ‘পাড়ি দিবার সময়

নাই, পাড়ি দিতে দিতে জল ঝড় আসিয়া পড়িতে পারে; এই পারেই নৌকা ধর।’

নৌকায় একজন পূর্ববাসী লোকের দাড়ি ছিল, সে বাবুর কথায় বিরক্ত হইয়া কহিল ‘এ পারে নাও রাখ্ণা কি জান খোয়াবার নৈগা, আল্লা আল্লা বৈলা পাড়ি ধর, বা থাকে নসিবে, আপনি আপনি হইবে।’

ইহার কথা শুনিয়া বাবু রাগত হইলেন, কহিলেন : ‘মাঝি ওর কথা শুনিও না। নৌকা ডুবি হইলে ওদেরত কোন ভয় নাই। ওরা জলজন্তু।’

বহুবন্ধি বাবুর কথা শুনিয়া বড় রাগিয়া কহিল ‘বাবু কথা কৈবা, গালি দিবা কেন? আর যদি কবুর করি আমারে গালি দিবা, আমার দেশের লোকের গালি দিবা কেন? আমারে গালি দিলে মইতে পারি, আমার দেশের লোকের গালি দিলে আমার দিলে খোঁচা লাগে।’

মাঝি বহুবন্ধিকে দুই একটি মিষ্ট ভৎসনা করিয়া চুপ করাইল, পরে বাবুকে কহিল ‘বাবু পূবে হাওয়া আছে, দেখতে দেখতে পাড়ি দিব, ভয় নাই।’ মাঝি নিজে ভীত হইয়াছিল, তথাপি বাবুকে কহিল ‘ভয় নাই।’ মানুষের স্বভাব এই আপনি বিপদ সাগরে ভাসিয়া অন্যকে বলে ‘ভয় নাই।’

বাবু মাঝির কথায় কোন উত্তর করিলেন না; মাঝি তাঁহার মৌনভাব সন্তোষের লক্ষণ জানিয়া পাড়ি ধরিল। দা-

ড়িরা পাইল তুলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মুসলমান দাড়িরা আল্লা আল্লা বলিয়া নৌকার গলুইয়ে জল ছিটাইয়া দিল ।

নৌকার অভ্যন্তরে স্ত্রীলোক দুটির একটি বালিকা আর একটি মধ্যবয়স্ক। বালিকাটি সেই স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা করিল ‘ঝি, তুমি সাঁতার জান ? ’ সে কহিল ‘বক্রেস্বর নদীর তীরে আমার জগ বটে, কিন্তু আমি কখনও সাঁতার জানি না । ’

বালিকাটি আবার কহিল, ‘তবে যদি নৌকা ডোবে ত কি করিবে ? ’

ঝি কহিল, ‘অমন কথা বস্তুতে নাই, স্থির হয়ে বোসে থাক । ’

এমন সময়ে পূর্বদিক হইতে প্রবল বেগে বান্নু বহিল, ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় কোটায় রুষ্টি আসিল ; গঙ্গা জলের উপর চড় চড় শব্দে ও নৌকার ছইয়ের উপর চটাস্ চটাস্ শব্দে জল পড়িতে লাগিল ।

পাইলে দম্কা বাতাস লাগাতে নৌকা কাইত হইল, নৌকার বিস্তর জল উঠিল । ঝি ভয়ে কাঁপিতেছিল এবং ত্রাহিরবে মা গঙ্গাকে ডাকিতে লাগিল । এক জন দাড়ি নৌকার জল সঁচিতে আরম্ভ করিল । অন্যেরা পাইলের দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল । বাবু ছুঁফা হাতে করিয়া নীচে নামিলেন, এবং নৌকা ডুবিলে যেন সহজে বাহিরে পড়া যায়, এমন স্থানে রহিলেন ।

বাবুর অবস্থা দেখিয়া বছরদি নিকটে

আসিয়া কহিল, ‘বাবু তোমার ডর লাগছে ? ডরাইও না ! যদি নাও ডোবে, আমি থাকতে তুমি মরবে না । ’

চারিদিক অন্ধকার করিয়া ভয়ানক ঝড় রুষ্টি হইতে লাগিল । নদীর কুল দৃষ্ট হয় না । বিপদ নিশ্চিত জানিয়া সকলে ঈশ্বরের নাম করিতে লাগিল । সুবক নাস্তিক ছিলেন, তিনিও এক্ষণে বিপদবান্ধব ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিলেন । ইতিমধ্যে আবার দম্কা বাতাস আসিয়া নৌকা জলমগ্ন করিল ।

## দ্বিতীয় অধ্যায় ।

গঙ্গার উভয় তীরে গঙ্গাবাসিন্দের বাস করিবার জন্য স্থানে স্থানে গৃহ নির্মিত আছে । তাহাকে মরার ঘর বলে । কাহারও জীবনসংশয় পীড়া হইলে তাহার আত্মীয়েরা তাহাকে আনিয়া সেই গৃহে রাখে । গান্ধ্যপ্রদেশের অনেক দূরবর্তী স্থান হইতেও মরণাপন্ন পীড়িতদিগকে এইরূপে গঙ্গাতীরে আনা হয় ।

পাঠককে এক্ষণে আমাদের সঙ্গে একটি মরার ঘরে বাইতে হইবে । ঐ দেখ, এক তক্ষাপোষে একজন রক্ত প্রাণসংশয় পীড়িত হইয়া পড়িয়া আছেন । উহার শয্যাপাশ্বে উহার দুই পুত্র বসিয়া আছেন । আর ঐ যে রক্তা আসন্নমরণ ব্যক্তির মস্তকে হস্তপ্রচার করিতেছেন, তিনি রক্তের পত্নী । অফাৎ অতীত হইল

ঐ পীড়িত ব্যক্তিকে এখানে আনা হইয়াছে। জলহিম্মোলে পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হওয়াতে রক্তের আত্মীয়েরা অত্যন্ত ভাবনামুক্ত হইলেন। কেননা গঙ্গাযাত্রার পর কোন ব্যক্তির মরণ না হইলে, এদেশে বড় কষ্টের বিষয় হয়। বহুবারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সেই দুর্ভাগ্য ব্যক্তিকে গৃহে লইতে হয়; তথাপি একটা অখ্যাতি থাকিয়া যায়। কিন্তু আজি ঋতু রুষ্টি দেখিয়া রক্তের আত্মীয়েরা বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা রক্তকে গঙ্গাজলে স্নাত করিয়া দশি ভাত খাওয়াইয়া দিয়াছেন। তাহাতে আবার যে গৃহে রক্তকে রাখা হইয়াছে, সে গৃহের দ্বারসকল মুক্ত; মুক্তদ্বার দিয়া বিলক্ষণ স্নিগ্ধ মাকতহিম্মোল গৃহে প্রবেশ করিতেছিল। এই সকল কারণে রক্তের নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে। এক জন কবিরাজ নিকটে ছিল, সে নাড়ী ধরিয়া কহিল, ‘আর বিলম্ব নাই।’ সকলে রক্তের প্রাণপ্রস্রাবের অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। এক্ষণে কবিরাজের অনুমতি পাইয়া তাঁহারা তাঁহাকে গঙ্গাভীরে লইয়া গেলেন। তাঁহার নাড়ীদেশ পর্যন্ত গঙ্গাজলে রাখিয়া, মস্তকে গঙ্গাজল ও গঙ্গামৃতিকা দিয়া (কফের জোর বাড়িয়া) সকলে হরি নাম করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দুই প্রহর, এ সময়ে রুষ্টি নিবারণ হইয়াছিল, কেবল বেগে শীতল বায়ু বহিতেছিল। রক্তের জন্য চিতা প্রস্তুত, কেবল তাঁহার মৃত্যু হইলেই হয়। অনেক

কণ পরে তাঁহার কঠিন (নির্লজ্জ) প্রাণ প্রয়ান করিল। শাস্ত্রবিহিত কাণ্ড করিয়া তাঁহার দেহ চিতায় আরোহিত করা হইল। চিতা বায়ুভরে জ্বলিয়া উঠিল। রক্তের পত্নী গঙ্গাভীরে চিতায় অনতিদূরে বসিয়া অনুচ্চ ধোদন করিতে লাগিলেন।

আমাদিগের নব্যদলের পাঠকেরা হয়ত বলিবেন, ‘এ বড় বেহায়া ত্রিলোক; যাহাকে জোর করিয়া মারিল, তাহার জন্য আবার রোদন কেন?’ আমরা এরূপ পাঠকগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জনের কথা স্মরণ করুন। পুল বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদেশে গেলে যে হিন্দুমাতারা কাঁদিয়া অস্থির হইলেন, তাঁহারাই এক কানে, ধর্ম্মের অনুরোধে, পাগলে বুক বাঁদিয়া, গঙ্গাসাগরে স্বহস্তে সন্তান বিসর্জন করিতেন। ধর্ম্মের অনুরোধে ত্রিলোক কেন, পুরুষ কি না করিতে পারে? আর কি না করিয়াছে?

ঋতু রুষ্টি থামিয়া গিয়াছে; আবার আকাশে বড় বড় নক্ষত্র ফুটিয়াছে; আবার অনন্ত নীল আকাশে শশধর দেখা দিয়াছেন; আবার ভাগীরথীর তরঙ্গ নানারঙ্গে নক্ষত্রশশধরশোভিত আকাশমণ্ডলের ছবিখানি বুকে করিয়া নাচিতে নাচিতে সাগরাভিমুখে বাইতেছে।

পশ্চিমেরা বলেন, এ জগতের ধন মান সকলই অস্থায়ী; আমরা বলি, এজগতের শোক দুঃখও অস্থায়ী। কালে সকলই সহিয়া যায়। রক্তার শোকাবেগ অনেক

হ্রাস পাইল। তিনি রোদন পরিত্যাগ করিয়া নীরবে বসিয়া আছেন। মনে মনে কি ভাবিতেছেন। এমন সময়ে অদূরে স্ত্রী লোকের অনুচ্চ রোদন শুনিতে পাইলেন। প্রথমবার শুনিয়া কিছু চাঁহরিতে পারিলেন না; আবার মন দিয়া শুনিলেন; বুঝিলেন, এ স্ত্রীলোকের রোদন শব্দ। রুদ্ধা তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে ডাকিলেন, ‘গঙ্গাধর!’ গঙ্গাধর মাতার নিকটে আসিলে রুদ্ধা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ‘ঐ দিকে মেয়ে মানুষের কান্না শুনতে পাচ্ছি; আমার সঙ্গে এস, দেখে আসি।’ মাতাপুত্রে চলিলেন, যাইয়া দেখেন, একটি বালিকা নদীতীরে বালুকা চড়াতে পড়িয়া রহিয়াছে, অনুচ্চ রোদন করিতেছে, উচ্চ রোদন করিবার যেন শক্তি নাই। রুদ্ধা অতিবাস্তে নিকটে যাইয়া তাহাকে ধরিয়া তুলিতে তুলিতে জিজ্ঞাসিলেন, ‘তুই কে মা?’ বালিকা কোন উত্তর করিল না, হাত বাড়াইয়া রুদ্ধার হাত ধরিল। কিন্তু রুদ্ধা তাহাকে তুলিতে পারিলেন না দেখিয়া গঙ্গাধর তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া কোলে লইল। রুদ্ধা কহিলেন, ওকে আঙনের কাছে নিয়ে চল। গঙ্গাধর লইয়া চলিল। যাইতে যাইতে রুদ্ধা বালিকাকে জিজ্ঞাসিলেন, ‘বাহা তোর এ দশা কেন?’ বালিকা অতি অশ্রুত স্বরে কহিল, ‘নৌকা ডুবি হয়েছে।’ রুদ্ধা বুঝিলেন যে, বৈকালিক ঝড়ে উজ্জ্বল এই দশা করিয়াছে।

চিতার নিকটে আসিয়া রুদ্ধা আপনি স্বতন্ত্র অগ্নি জ্বালিলেন, এক জনকে দিয়া একখানি শুষ্ক বস্ত্র আনিয়া বালিকাকে পরাইলেন, এবং অগ্নির নিকটে একটি মা-দুহের বালিকাকে রাখিয়া সৈঁকিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক সৈঁকিতে সৈঁকিতে বালিকার শরীর একটু উষ্ণ হইল। রুদ্ধা দেখিলেন, বালিকাটি পরমশুন্দরী; শরীরে নৃতন গহনা। এক্ষণে জিজ্ঞাসিলেন, ‘হাঁ গা, তোর নাম কি গা?’ বালিকা উত্তর করিল, ‘আমার নাম বিরজা।’ রুদ্ধা বালিকার অর্দ্ধশুদ্ধ কেশগুলি নাড়িতে নাড়িতে আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোরা আপনারা কি?’ বালিকা কান্দিতে কান্দিতে বলিল, ‘আমরা ব্রাহ্মণ।’ রুদ্ধা তাহাকে সাস্তুনা করিয়া কহিলেন, ‘কান্দিও না; এখন আমাদের বাড়ী চল; খোঁজ করিয়া আমি তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিব। আমি তোমাকে আপনার মেয়ের মত রাখিব।’

অনেকক্ষণ পরে শব্দবাহ শেষ হইল। শান্ত্রিতা সম্পাদন করিয়া সকলে সেই মরার ঘরে যাইয়া অবশিষ্ট রাত্রি যাপন করিল। পরদিন প্রাতে সকলে গঙ্গাস্নান করিয়া গৃহে যাত্রা করিল। সে দিবস তাহারা গৃহে পহঁছিতে পারিল না; পথে এক চটিতে রাত্রি যাপন করিল; পর দিন অপরাহ্নে গৃহে পহঁছিল। ইহাদিগের বাটী গঙ্গাতীর হইতে ১৬ ক্রোশ দূরে। বিরজা ইহাদের সঙ্গে গিয়া ইহাদের বাটীতে

রহিল। বাঁচীই সকলে বিরজাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতে লাগিল।

### তৃতীয় অধ্যায়।

যে রক্তকে পাঠক গঙ্গাভীরে তনু-তাগ করিতে দেখিলেন, তাঁহার নাম রামতনু ভট্টাচার্য্য; এ বাঁচী তাঁহার। রামতনু ভট্টাচার্য্য বিনক্ষণ সজ্জিতপন্ন গৃহস্থ ছিলেন। দশ বিঘা জমি জুড়িয়া তাঁহার বাঁচী। বাঁচীর বাহিরে একটি ও খিড়কিতে একটি, এই দুইটি পুকুরিণী। প্রায় দুই শত বিঘা ভূমি আবাদ করা হয়। বাহির বাটের ও ভিতর বাটের উঠান দুটি যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ। এতদ্বিন্ন টাকা কড়ি দার দেওয়া আছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠের নাম গোবিন্দচন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম গঙ্গাধর। ইহাদের বিবাহ হইয়াছে। এক্ষণে গোবিন্দের বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি, গঙ্গাধরের অষ্টাদশবর্ষ। গঙ্গাধর বর্জমানের ইংরাজি বিদ্যালয়ে লেখা পড়া যৎকিঞ্চিৎ শিখিয়াছে। আমরা যৎকিঞ্চিৎ বলি, কিন্তু রামতনু ভট্টাচার্য্য মনে করিতেন, লেখা পড়া ইহা অপেক্ষা অধিক হইতে পারে না। যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিলে যে দোষ হয়, তাহা গঙ্গাধরের হইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র বড় ধীরস্বভাব—যদিও তিনি কখনও বিদ্যালয়ের কঠাসন স্পর্শ করেন নাই তথাপি সচ্ছরিত। গোবিন্দ সর্বদা

সংসার লইয়া বাস্ত। সময়ে আহার হয় না, সময়ে নিদ্রা হয় না। প্রাতঃকালে মাঠে যান, একটা দুটার সময় গৃহে আসিয়া স্নানাহার করেন; আহারান্তে আবার তাগাদায় বাহির হন। কিন্তু গঙ্গাধর এ সকল চাষার কৰ্ম মনে করে; সকালে সকালে স্নানাহার করিয়া সে প্রাতঃের নিরুদ্যম লোকের সঙ্গে তাস পিটে ও বড় টিপে সময়সংহার করে। গুণত এই, ইহাতে যদি আবার দেও বলিলে বাড়ীতে কোন জিনিষ না পান, তবে মায়ের প্রতি রাগ, বড় বউয়ের প্রতি রাগ, দাসদাসীদের প্রতি রাগ। সকলে গঙ্গাধরকে বাবু বলে, গঙ্গাধর বাবুর ভয়ে সকলে ভীত। জ্যেষ্ঠ-ভাতা গঙ্গাধরকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, তাঁহার চক্ষে গঙ্গাধরের দোষ দোষ বলিয়া বোধ হয় না। গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী অত্যন্ত সাধুশীল; তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর, দুটি পুত্র সন্তান হইয়াছে। গোবিন্দের মাতা নামে গৃহিণী, কিন্তু ঘরকন্না সকল জ্যেষ্ঠপুত্রবধূর হাতে। গঙ্গাধরের পত্নী আর বিরজা একই বয়েসী; অর্থাৎ গঙ্গাধরের পত্নীর বয়স দশবর্ষ মাত্র, নাম নবীনমণি। এ বয়সে বালিকারা স্বামি-গৃহে যায় না; কিন্তু সংক্রান্তক ভ্রূরে নবীনের পিতা মাতা উভয়ের মৃত্যু হওয়াতে নবীনকে এখানে আনা হইয়াছে।

বিরজা এই গৃহে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সে আপনার স্বভাবগুণে সকলের প্রিয়পাত্র হইল। বিশেষ ছোট বউ



নদীনের সহিত তাহার অত্যন্ত ভালবাসা  
হইল । দুইজন এক সঙ্গে স্নান করে, এক  
সঙ্গে আহার করে, এক সঙ্গে খেলা করে ।

এক দিন গৃহিণী আহাৰান্তে দাবায়  
মাদুর পাতিয়া শুইয়াছেন । বিরজাকে  
মাথা দেখিতে বলিয়াছেন, সে শিয়রে  
বসিয়া মাথা দেখিতেছে । এমন সময়ে  
গৃহিণী বিরজাকে নৌকা ডুবির রক্তাশু  
বিলত করিতে অনুরোধ করিলেন ।

বিরজা বালিকা, নদীনের সঙ্গে খে-  
লায় মত্ত থাকিত, স্মরণে সে সকল বিষয়  
এক প্রকার বিস্মৃত হইয়াছিল । এক্ষণে  
তাহার সকল কথা মনে পড়িল । তাহার  
চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল । গৃহিণী  
কহিলেন, ‘এখন আর ভয় কি ? এখান  
বল । না বলিলে কেমন করিয়া তোমাকে  
তোমার বাপের বাড়ী পাঠাব ?’

বিরজা কহিল, ‘আমার বাপ মা  
কেউ নাই, আমি কোথা যাব ; এখানেই  
থাকিব ।’

‘তা থাক না, কে তোমাকে তাড়ায় ?  
তবে তোমার আর কে আছে ?’

বালিকা কাদিতে কাদিতে বলিল,  
‘আমার কেউ নাই ।’

রুদ্ধা যে রাত্রে বিরজাকে পাঠিয়া-  
ছিলেন, সে রাত্রে বিরজার সীমস্তে সিন্দুর-  
ফোটা দেখিয়াছিলেন, সে কথা তাহার  
মনে আছে । তিনি আবার কহিলেন, তো-  
মার বিয়ে হয়েছে কোন্ গ্রামে ?’

‘আমি সে গ্রামের নাম জানি না ।’

‘তোমার বাপের বাড়ী কোন্ গ্রামে ?’

‘আমি জানি না ।’

‘তোমার মামার বাড়ী কোথা ?’

‘আমি তাও জানি না ।’

রুদ্ধা আর কোন কথা উত্থাপন না  
করিয়া নিত্ৰা যাইতে মনস্থ করিলেন ।  
নদীন নিকটে আসিয়া বিরজাকে হাতে  
ধরিয়া লইয়া গেল । যাইতে যাইতে তা-  
হার চক্ষের জল মোচন করিয়া দিল ।

ইহার একবৎসর পরে বিরজা একদিন  
নদীনকে আত্মবিবরণ বলিল, তাহা এই—

‘অতি ছোট বেলায় আমার পিতার  
মৃত্যু হয়, তাহার পর আমার মাতা শান্তি-  
পুরের এক গোস্বামীর বাড়ীতে আমাকে  
লইয়া থাকেন । মাতা সেই বাড়ীতে রা-  
ধুণীর কর্ম করিতেন । আমার যখন চারি-  
বৎসর বয়স, তখন মাতার মৃত্যু হয় । মা-  
তার মরণে আমি অনেক কাদিয়াছিলাম ।  
সেই অবধি আমি সেই গোস্বামিদের বাড়ী-  
তেই থাকিতাম । দশ বৎসর বয়সে আ-  
মার বিবাহের কথা হয়, কলিকাতার এক  
বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহ হয় । বিবাহের  
আট দিন পরে সেই বাবু আমাকে লইয়া  
কলিকাতায় যাইতেছিলেন, সেই দিন ঝড়  
রুদ্ধ হইয়া নৌকা ডুবি হয় । আমি বড়  
মাতার জানিতাম ; সকলে আমাকে জল-  
জন্তু বলিত । আমি মাতার দিয়া দিয়া  
নদীর তীরে আলো দেখিয়া সেইখানে  
উঠি । তাহার পরে এরা আমাকে দে-  
খিতে পাইয়া লইয়া আইসেন ।’

আমরা বিরজার রক্তাশ্রুর অবশিষ্টাংশ বলি। বিরজা গোস্বামীদের পালিতা কন্যা বলিয়া তাহার বিবাহের বিষয়ে বড় কষ্ট হইয়াছিল। বিরজার নিজের কোন দোষ ছিল না; সে দেখিতে সর্বাঙ্গসুন্দরী। কিন্তু বিরজা কাহার কন্যা, তাহার নিশ্চয় প্রমাণ নাই; সুতরাং কোন্ ভদ্র লোক বিবাহ করিবে। শান্তিপুরের একটি যুবক কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত; সে এই সংবাদ তাহার এক বন্ধুকে দেয়। বন্ধু শুনিয়া এক দিন শান্তিপুরে বিরজাকে দেখিতে যান। দেখিয়া তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি বিদেশী, পিতা মাতাকে না বলিয়া গোপনে বিরজাকে বিবাহ করেন। তাহার ইচ্ছা ছিল, বিরজাকে কলিকাতায় আনিয়া কোন বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার্থ রাখিয়া দিবেন। পথে নৌকা ডুবি হয় পাঠক তাহা নিজে দেখিয়াছেন। ইহার পরের রক্তাশ্রু বিরজা নিজে বলিয়াছে।

### চতুর্থ অধ্যায়।

গোবিন্দের পত্নী ভবতারিণীর পিত্রালয় কোন্নগরে। তিনি লিখিতে পড়িতে জানিতেন; এবং বিরজা ও নবীনমণিকে অবকাশমতে শিক্ষা দিতেন। চারি পাঁচ বৎসরে তাহারা উভয়ে এক রকম লেখা পড়া শিখিল, বিরজা কিছু অধিক শিখিল। বিরজা গৃহিণীর কাছে বসিয়া

রামায়ণ বা মহাভারত পাঠ করিত, পাড়ার অনেক প্রাচীনা আসিয়া জুটিয়া শ্রবণ করিতেন।

বিরজা এক্ষণে পঞ্চদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে; নবীনমণি এই বয়স। বিরজা গোরাঙ্গী, নবীনমণি শ্যামাঙ্গী। গোরাঙ্গী হইলেই রূপবতী হয় না, আর শ্যামাঙ্গী হইলেই কুৎসিতা হয় না। ইহারা উভয়েই রূপমণী; কিন্তু বিরজার রূপলাবণ্য চমৎকার, নবীনমণির রূপলাবণ্য সাধারণ। বিরজা দীর্ঘকায়ী, নবীনমণি স্বল্পকায়ী। বিরজার নাসিকা অযুগলের মধ্যস্থলে যতটুকু স্থান থাকিলে মানায়, ততটুকু স্থান অবিকার করিয়াছে; আর ততটুকু উচ্চ। কিন্তু নবীনমণির নাসিকা কিছু অধিক উচ্চ। বিরজার নয়ন দুটি বৃহৎ, দীর্ঘাকার, নবীনমণির নয়ন দুটি আরও বৃহৎ, কিন্তু কলিকাতার কালী প্রতিমার চক্ষের ন্যায় প্রায় কর্ণপর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাকেই যদি বলিয়া এককর্ণ বিখ্যাত চক্ষু বলেন, তবে আমরা ইহাতে সৌন্দর্য্য দেখি না। বিরজার কপাল সমতল, কিন্তু নবীনমণির কপাল উচ্চ। বিরজার ঐক্যবিশেষ দীর্ঘ, বাহ্যকে হৃৎস্রোতা বলে, কিন্তু নবীনমণির ঐক্যবিশেষ ক্ষুদ্র। অন্যান্য বিষয়ে উভয়ের রূপ সমান। উভয়ের কেশদাম নিতবৃষ্টিত, উভয়ের বাহু মৃণালসন্নিভ, উভয়ের অঙ্গুলীগুলি স্নিগ্ধগোল পদ্মকলিক। সদৃশ, উভয়ের দেহে নবযৌবনের সম্পূর্ণ আবির্ভাব, কিন্তু স্বভাববিষয়ে বৈলক্ষণ্য আছে। উভয়ে একত্র বাস করেন; অল্প-

দ্বিম প্রণয় ; কিন্তু উভয়ের স্বভাব এক-  
রূপ নহে । বিরজা মিষ্টভাবিণী, নবীনও  
মিষ্টভাবিণী ; কিন্তু যে স্থলে উচিত কথা  
বলিলে অন্যের মনে কষ্ট হয়, বিরজা সে  
স্থলে কোন কথা বলে না, নীরবে থাকে ।  
নবীন তাহা পারে না ; অন্যের মনে কষ্ট  
হউক, আর না হউক, আপনি সকল স-  
ময়ে উচিত কথা বলে । সত্য ও উচিত  
কথা বলাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু বলিলে  
যদি পরের মনে কষ্ট দেওয়া হয়, তাহা  
হইলে না বলিয়া মৌনাবলম্বন করা ভাল ।  
নবীন ইহা জানিত না, বা বুঝিত না ।  
গঙ্গাধরের সঙ্গে নবীনের সুপ্রণয় না হই-  
বার ইহাই এক প্রধান কারণ । গঙ্গাধর  
সমস্ত দিন তাস পিটে ধরে আনিলে,  
বিরলে পাইয়া নবীন তাহাকে ভৎসনা  
করিত । অকপটচিত্তে তাহার দোষের কথা  
উল্লেখ করিত । গঙ্গাধরের মঙ্গল সাধনো-  
দ্দেশে নবীন এরূপ করিত ; কিন্তু গঙ্গা-  
ধর তাহা বুঝিত না । সে মনে করিত স্ত্রী  
স্বামীর অধীন ; স্বামীর দোষ উল্লেখ ক-  
রিতে তাহার অধিকার নাই । বাঁহারা স্ত্রীকে  
গৃহের সামগ্রাবিশেষ জান করেন, তাঁ-  
হারা গঙ্গাধরের সঙ্গে একমত হইবেন ;  
এবং স্ত্রীর মুখে আপনার দোষ উল্লেখ শু-  
নিয়া বিরক্ত হইবেন । কিন্তু এরূপ মহাত্মা-  
দিগকে আমরা জানাইতেছি যে, স্ত্রীলো-  
কেরা আপনাদিগকে স্বামিগৃহের তৈমস-  
বিশেষ জান করে না ; তাহারা আপনা-  
দিগকে স্বামীর সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী,

স্বামীর বন্ধু, স্বামীর সুপরামর্শদাতা মন্ত্রী ;  
অধিক কি, তাহারা আপনাদিগকে সং-  
সার রূপ তরণীর হালি জ্ঞান করে । এজন্য  
আবশ্যক স্থলে স্বামীকে ভৎসনা করিয়া  
থাকে । কিন্তু নবীন যেমন দোষী স্বামীর  
প্রতি সর্বদা আরক্ত নয়নে দৃষ্টি করিত,  
আমরা এরূপ করিতে কোন মুন্দরীকে  
পরামর্শ দি না । মিষ্টবাক্যে ও সপ্রেম  
ব্যবহারে স্বামীকে সন্তুষ্ট করিবে । এবং  
পরে স্বামীর অসদ্যবহারে নিজে দুঃখিত  
হইয়া দুঃখের সহিত কোমল নয়ন দুটি বাষ্প-  
বারি পরিপূর্ণ করিয়া স্বামীকে ভৎসনা  
করিয়া দেখিও, স্বামী সুপথে আইসে  
কি না ।

এই কারণে গঙ্গাধর পার্শ্বামানে নবী-  
নকে দেখা দিত না । তাহাতে নবীনের  
আরও অনিষ্ট হইতে লাগিল । গঙ্গাধর  
বিরজার প্রতি অনুরক্ত হইল । বিরজার  
হাস্যবদন, বিরজার মধুর বাক্য, বিরজার  
অনুরাগের ভাব, সদাই সে ধ্যান করিত ।  
বিরজা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই ।  
শেষে গঙ্গাধরের ভাববৈলক্ষণ্য টের পা-  
ইল । কিন্তু নবীনকে বলিল না, বলিলে  
নবীনের সহিত তাহার বিচ্ছেদ হয়,  
এই ভাবিয়া বলিল না । নবীনের বির-  
জার প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ও ভালবাসা  
ছিল । এজন্য তাহার প্রতি সন্দেহ হইল  
না । বিরজা আরো ভাবিল যদি একথা  
নবীনকে বলি, গঙ্গাধরের প্রতি নবীন  
আরও হতশ্রদ্ধ হইবে । বিরজা নবীনকে

স্বামীর সহিত মধুর ব্যবহার করিতে, ও স্বামীর মন যোগাইয়া চলিতে পরামর্শ দিল। নবীন বিরজার পরামর্শে সেরূপ করিতে চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু পারিল না; যাহা তাহার স্বভাবের বিপরীত, তাহা পারিবে কি প্রকারে? বিরজা ভাবিয়াছিল, নবীনের প্রতি যদি অনুরাগ দৃঢ় হয়, তবে আর গঙ্গাধর তাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে না। সে কল্পনা সিদ্ধ হইল না; নবীন গঙ্গাধরকে বশ করিতে পারিল না। গঙ্গাধরের অনুরাগ বিরজার প্রতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। একদিন গঙ্গাধর বিরজাকে বলিল, ‘তুমি কলিকাতায় চল; এখানে দাসীভাবে আর কতকাল থাকিবে? কলিকাতায় বিধবাবিবাহ হয়, তোমাকে বিবাহ করিয়া আমি কলিকাতায় থাকিব।’ বিরজা ‘অমন কথা বলিও না,’ বলিয়া গঙ্গাধরের সম্মুখ হইতে বিদ্রোহের ত্রায় চলিয়া গেল। গঙ্গাধর অবোধ, সে মনে করিল, তাহার প্রতি বিরজাও অনুরাগিনী।

### পঞ্চম অধ্যায়।

ভাদ্র মাস, শরতের পূর্ণিমা পবন মেঘরাশি সরাইয়া অনন্ত আকাশ নির্মল করিয়াছে। মাট, ঘাট, সরোবর জলে পরিপূর্ণ। ভট্টাচার্য্যদের বাটীর খিরকির পুষ্করিণীতে বিস্তর জল হইয়াছে। আজি পূর্ণিমা রাত্রি। আহা! রাতে বিরজা ও নবীন খালাহাতে করিয়া ঘাটে গিয়াছে। পু-

ষ্করিণীর জলে অসংখ্য কুমুদিনী ফুটিয়াছে, সরোবরের কোলে তারকামণ্ডিত ও পূর্ণচন্দ্র পরিশোভিত নীল নভোমণ্ডল হাসিতেছে। কুমুদপত্রগত বারি-মধ্যে পর্যাস্ত চন্দ্রশ্মী খেলা করিতেছে। পুষ্করিণীর চারি তীরস্থ রক্ষাবলীর পত্রে চন্দ্রকিরণ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিরজা যে খালা ধুইয়া যানবাধা ঘাটে রাখিয়াছেন, তাহাতে পর্যাস্ত চন্দ্রকিরণ পড়িয়া হাসিতেছে। বিরজা ঘাটের আলিসায় বসিয়া আছেন, নবীন গা ধুইতে জলে নামিয়াছেন।

নবীন গা ধুইতে ধুইতে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বিরজা তাহা লক্ষ্য করিলেন। কহিলেন, ‘নবীন এমন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলে কেন?’

‘মনের দুঃখে।’

‘কি দুঃখ?’

‘তা কি জান না?’

বিরজা, ‘জানি’ বলিয়া ক্রিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া আবার কহিল, ‘ও কি ও, নবীন! তুমি কাদিতেছ না কি?’

‘কাদিতেছি।’

‘এত জলে দাঁড়াইয়া কাদিতেছ কেন?’

‘বিরজে! আমার কেউ নাই যে, কাদিলে চক্ষের জল মুছাইয়া দেয়। তাই জলে দাঁড়াইয়া কাদিতেছি যেন চক্ষের জল পুকুরের জলে মিশে যায়।’

‘কেন আমি আছি—আমি কি তোমার চক্ষের জল মুছিয়া দেই নাই?’

‘দিয়াছ—কিন্তু কতকাল দিবে?’

‘যতকাল বাচিব।’

‘তুমি কি আমায় এত ভাল বাস?’

‘তা তুমি জান?’

‘আমি যদি মরি, আমার জন্তে তুমি কাঁদিবে?’

‘কাঁদিব।’

কেবল কাঁদিবে, আমি মরিলে মরিবে না?’

নবীন বিরজাকে ভাবনায় ফেলিল।

বিরজা বলিল, ‘মরিব বই কি?’

‘আমি মরিলে, আমার জন্যে মরিতে পার, তুমি আমায় এত ভাল বাস না। তাহা হইলে অত ভাবিয়া বলিবে কেন ‘মরিব বৈ কি?’

বিরজা কথা উড়াইয়া দিবার জন্য কহিল, ‘আচ্ছা, আমি তোমায় ভাল বাসি না, আর তোমারও মরে কাজ নাই, আমার ভালবাসাও দেখাইয়া কাজ নাই; এখন গা ধুইয়া উঠ।’

এমন সময়ে পুষ্করিণীর তীরে টিপু করিয়া একটি পাকা তাল পড়িল। তখন নবীন হাসিয়া কহিল, ‘তবে বুঝি ভালবাসা, যদি আমাকে ঐ তালটি কুড়িয়ে এনে দাও।’

বিরজা একটুও কথা না কহিয়া তাল কুড়াইতে গেল। আমাদিগের পল্লীগ্ৰামস্থ পাঠক ও পার্শ্বকারী জানেন যে, তাল তলায় প্রায়ই ছোট ছোট অনেক বৃক্ষলতাদি থাকে। এ তালতলায়ও তাহা

ছিল। অন্তরাং পূর্ণিমার রাত্রি হইলেও তালতলায় কিছু কিছু অন্ধকার ছিল। তালের রং আর অন্ধকারের রং একই; বিরজা যাওয়া মাত্রই তালটি পাইল না। সে উবু হইয়া জঙ্গলের মধ্যে তালটি খুঁজিতে লাগিল। তাল খুঁজিতে অনেক ক্ষণ লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে তাল পাইয়া ‘পেয়েছি, পেয়েছি’ বলিয়া মন্তক তুলিয়া ঘাটের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, জল হইতে একজন পুরুষ মানুষ উঠিয়া চলিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া বিরজার শরীর শীহরিয়া উঠিল। আবার তদগে সহসে ভর করিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে আইল। ঘাটে আসিয়া নবীনকে দেখিতে পাইল না; কিন্তু পুষ্করিণীর জল যেন অত্যন্ত গভীর বোধ হইল। বিরজার সমস্ত শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। হাতের তাল অজ্ঞাতসারে মাটিতে পড়িয়া গেল। বিরজা শেষে থালা কথানি কম্পিত হস্তে তুলিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল।

বাটীতে আসিয়া, অন্যে যেন সন্দেহ করিবার কারণ না পায়, এমত ভাবে নবীনের অন্বেষণ করিল, কিন্তু পাইল না। নবীনের শয়নগৃহ দেখিল, সলিতা আনিবার ছল করিয়া বড়বধূর শয়নগৃহে গেল, মহাভারত খানা আনিবার ছল করিয়া গৃহিণীর ঘরে গেল, কোথাও নবীনকে দেখিতে পাইল না! পাছে অন্যে সন্দেহ করে, এই ভয়ে আর কিছু না করিয়া

বিরজা আপনার ঘরে যাইয়া শয়ন করিল।

মন উৎকণ্ঠিত থাকিলে নিদ্রা হয় না।  
রাত্রি দ্বিপ্রহর হইল, বিরজার চক্ষে নিদ্রা  
নাই। বিরজার মনে নানা চিন্তার তরঙ্গ ;  
কেবল পাক্ষ' পরিবর্ত করিতে লাগিল।  
এই প্রকারে আরও প্রহরেক গত হইল।  
বিরজা তখন ভাবিল, এখন সকলে নি-  
দ্রিত, একবার ঘাটে যাইয়া দেখি, কি  
হইয়াছে। বোধ হয়, নবীনকে কেউ  
জলে ডুবাইয়া মারিয়াছে। তা হলে এ-  
তক্ষণ সে ভাসিয়া উঠিয়াছে। বিরজা  
সাহসে নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে  
গেল। দেখিল, জলে একটি শব ভাসি-  
তেছে। বিরজা শব দেখিবামাত্র পশ্চাৎ  
সরিয়া বাঁটার ভিতরে আসিল। পরে  
আপনার কক্ষে আসিয়া ভাবিল, এখন কি  
করি? দুই জনে এক সঙ্গে ঘাটে গিয়াছি-

লাম, সকলে জানে। নবীন যদি নিজেও  
জলে ডুবিয়া মরিয়া থাকে, কিম্বা আর  
কেহও যদি তাহাকে মারিয়া থাকে, দোষ  
আমার উপরে পড়িবে। সকলে আমাকে  
সন্দেহ করিবে; নানা লোকে নানা কথা  
কহিবে। থানা পুলিশ হইবে, অপমান  
ও লাঞ্ছনা আমার হইবে। ‘নবীন, তুই  
মরিলি, আমাকে মারিসি কেন?’

বিরজা শেবে, অনেক চিন্তার পর  
দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল,  
আজি হইতে এ বাড়ীতে আমার অন্ন উ-  
ঠিল। যদি নৌকাডুবিতে মরিতাম, এ  
দুঃখ হইত না। এখন কি করি? অনেক  
ভাবিয়া বিরজা স্থির করিল, এস্থান পরি-  
তাগ করাই পরামর্শ। এই স্থিরসংকল্প ক-  
রিয়া সে ধীরে ধীরে রাত্রি থাকিতে থাকিতে  
ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ত্যাগ করিয়া চলিল।

## নিশীথ চিন্তা।

নদীর জল।

“সাগর উদ্দেশে নদী, ভ্রমে দেশে দেশে রে,

অবিরাম গতি!

গগনে উদিলে শশী, হাসি যেন পড়ে খসি,

নিশী রূপবতী।”

ঐ যে কলকল্যায়মানা নদী, জ্যোৎস্না-  
ভরদে ভরদ মিশাইয়া, উষাদিনীর মত,  
প্রেম-বিহ্বলার মত, আনন্দের প্রবাহের মত,  
উছলিয়া উছলিয়া চলিয়া যাইতেছে, আ-

জিকার এই আনন্দময়ী উষাদিনী জ্যোৎস্না-  
স্নায় উহার সহাস্য পুলিনই আমার এ হৃদ-  
য়ের বিশ্বাসস্থল। জ্যোৎস্না হাসিতেছে,  
নদীর তরঙ্গও হাসিতেছে, অথচ এই হা-

সিতে প্রাণ কেন যে উদ্বেল, উদাস এবং কেমন এক সঙ্কট যন্ত্রণায় অধীর হইয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না । যাহারা স্বার্থের দাস, সুখের ভিখারী এবং সমাজরূপ অভিনয়গৃহের ক্রীড়াপুতল তাহারাই গিয়া ধনীর প্রাসাদ এবং বিলাসীর প্রমোদভবনে স্বার্থ, সুখ এবং সামাজিক সম্মানের অন্বেষণ করুক ; যাহারা অর্দ্ধমৃত, তাহারাই গিয়া মনুষ্যের অর্দ্ধমৃত প্রাণ, অর্দ্ধমৃত আমোদ, অর্দ্ধমৃত উপদেশ এবং অর্দ্ধমৃত হৃদয়ের জন্য লালায়িত রহুক । আমার ভোগের স্থান ঐ নদীর জল, বিলাসের স্থান ঐ নদীর জল, এবং শিক্ষার স্থানও ঐ নদীর জল । আমি উহার তর-তর-বাহি সজীব প্রবাহে যে সজীব সৌন্দর্য্য এবং চল-শোভা দেখিতেছি, সংসারে কিসের সহিত তাহার তুলনা দিব ? উহার হাস ও রুদ্ধি, আবর্ত ও আবেগ, উহার ক্রোধের গর্জন, উহার মধুর সম্ভাষণ, উহার আবিলতা এবং অট্টহাস্যও আমার চক্ষে যেরূপ প্রতিভাত হইতেছে, জগতে কোন্ বস্তুকে তাহার উপমান্বল বলিব ?

তরঙ্গিণি ! তুমি মায়াময়ী, তুমি মহিমা-ময়ী, তুমি চিন্তার চির-উদ্দীপনা । তোমায় আমি ভালবাসি । তোমারও নিদ্রা নাই, আমারও নিদ্রা নাই । তুমি অবিরাম প্রবাহিত হইতেছ ;—জান না কোথায় যাই, তথাপি বহিয়া যাইতেছ । আমার হৃদয়-নিঃসৃত হৃণিবার স্রোতও অবিরাম প্রবা-

হিত হইতেছে ;—জানেন না কোথায় যাই, তথাপি বহিয়া যাইতেছে । তুমিও আপনার নার.সুখে এবং আপনার দুঃখে আপন আপনি গাইতেছ, এবং আপনার গীতে আপনিই ঢল ঢল রহিয়াছ ;—গামিও আপনার সুখে এবং আপনার দুঃখে আপন আপনি গাইতেছি, এবং আমার এই অক্ষুট অথচ গভীর সংগীতে আপনিই বিভোর রহিয়াছি । আজি তুমি যেমন চন্দ্র-মার অমল কৌমুদী রাশিতে মিশিয়া গিয়াছ, সর্ব্বাঙ্গেই কৌমুদী পরিয়াছ, এবং সমীরণের ছিলোলে ছিলোলে ছিলোল তুলিয়া ঐ কৌমুদী লইয়াই ক্রীড়া করিতেছ, আমার ইচ্ছা করে আজি আমিও সেইরূপ সর্ব্বাঙ্গে তোমাকে মাখিয়া, তোমার সহিত মিশ্রিত হইয়া, তোমার ঐ ময়াল-নিম্বি লহরীচয়ের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে একবারে সেই অনন্ত সাগর-ক্রেড়ে গিয়া নিপতিত হই । কিন্তু তুমি স্বাধীন, আমি পরাধীন ! কে আমার চরণের লৌহ-নিগড় ভাঙ্গিয়া আমাকে তোমার মত স্বাধীন করিয়া দিবে ? তুমি কাহারও ক্রটি-ভঙ্গিতে ফিরিয়া চাও না ; আমি মনুষ্যের ভয়ে সতত শশবাস্ত । কে আমায় অভয় দান করিয়া আমাকে তোমার মত দৃকপাতশূন্য করিবে ? হায় ! আমি যদি তোমার ঐ একাগ্রমতি, নির্ভীকগতি এবং উচ্ছৃঙ্খলতা লাভ করিতে পারিতাম, তবে এতদিনে আমিও, তোমার মত, আমার গম্যস্থান প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইতাম ।

কিন্তু আমার সে মনোরথ কি কখনও সফল হইবে ?

হে মোহান্ধ মনুষ্য-কবি ! তুমি আমার কি কাব্যে মোহিত করিবে, বল। তোমার কাব্য অপূর্ণ, অর্দ্ধবিকশিত। কল্পনা তোমার মানসপটে কখনও খেলা করে, কখনও খেলা করে না। উছা তোমার নিকট বিদ্রোহের কলিক ক্ষুরের ন্যায় এই দৃশ্য, এই অদৃশ্য। তুমি শত আরাধনা করিয়াও উহাকে হৃদয়ে বান্ধিয়া রাখিতে পার না। তুমি লৌকিক যশের জন্য নিয়ত আকুলিত; কল্পনার অলৌকিক-শোভাময় কেলিকাননে কিরূপে প্রবেশ করিবে! তুমি দেব-হিংসার অমীন; কল্পনার অপাপবিদ্ধ অমৃতরসাজনে তোমার ঐ পাণচক্ষু কিরূপে রঞ্জিত হইবে! আর ভাষা? তুমি কল্পনার আকস্মিক ককণায় সত্য ও সৌন্দর্যের যে টুকু আভা দৈবাৎ দেখিতে পাও, তোমার মামুদী ভাষায় তাহাও পরিব্যক্ত হয় না;—তোমার দুর্বল বর্ণতুলিকায় তাহাও ফলায় না। আমার কাব্য ঐ তরঙ্গিনী,—পরিষ্কৃত, পূর্ণবিকশিত, এবং তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত। আমি উহাতে কখনও প্রীতির প্রমত্ত উজ্জ্বল দেখিয়া পুলকে পরিপূরিত হই, কখনও ককণায় বৃদ্ধকণ্ঠ শুনিয়া দর দর ধারায় অশ্রুবিসর্জন করি, কখনও বীররসের তটভিষাতি কল্লোল-নাদে মত্ত হইয়া উঠি, এবং কখনও উহার অবাতবিক্ষোভিত প্রশান্ত মূর্তি অবলোকন করিয়া, ধীরে ধীরে, চৈতন্যেরও

অগোচরে, শাস্ত্রি নির্মলসলিলে নিমজ্জিত হইতে থাকি।

মনুষ্যের প্রেমে আমার বিশ্বাস নাই, মনুষ্যবর্ণিত প্রেমিক এবং প্রেমিকায়ও আমার আস্থা নাই। আমি অমন আশ আশ ভালবাসা ভালবাসি না, প্রেমের অমন ভ্রমর-রক্তিতায় কখনও ভুলিয়া পড়ি না। যে প্রেম আঁখির পলকে পরিবর্তিত হয়, আতপতন্তু কুসুমের মত দেখিতে দেখিতেই শুকাইয়া যায়, অথবা ব্রততীর ন্যায় বাতাহত হইলেই ছিন্ন হইয়া পড়ে,—যে প্রেম স্রুখে এক, হ্রুখে এক, সম্পদে এক, নিপদে এক, যখন নূতন তখন এক, এবং যখন পুরাতন তখন এক, কুকবির কুহকাজ্ঞন চঞ্চল মনুষ্যই তাহালইয়া তৃপ্ত রহিতে পারে। আমার প্রেমের গুরু তরঙ্গিনী। যদি কখনও ভালবাসি,—যদি কখনও সাধনা করি, তবে ঐ তরঙ্গিনীর নিকটই ভালবাসা এবং সাধনার মন্ত্র গ্রহণ করিব। জোয়ারে উঠিব, ভাটার নামিব, বর্ষায় ক্ষীত হইব, শীতে ক্ষীণ হইয়া যাইব, তথাপি গতি সাগরের দিকে। যদি পর্বতও স্রুখে আসিয়া পড়ে, তাহা ভাসাইয়া দিব, কি ভেদ করিয়া চলিয়া যাইব, এবং যদি প্রাণ-প্রবাহ একবারে শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি অন্তঃসলিলা কল্লগজ্জার ন্যায় অভ্যন্তরে প্রবাহিত হইব। প্রেমের এমন লীলা আর কোথায় আছে?

মনুষ্য যে মনুষ্যের জন্য বিলাপ করে, তাহাতেও আমার হৃদয় আত্মহীন হয় না।



মনুষ্যের বিলাপ ক্ষণস্থায়ী, উহা প্রায়ই স্বার্থ এবং কপটতায় জড়িত, এবং অধিক স্থলেই নটনৈপুণ্যের ন্যায় প্রদর্শিত। প্রাতে যাহার শোক, এবং সন্ধ্যাগমেই যাহার সুখ-লালসা, যে লোকচাঁচরের বশবর্তী হইয়া হাসিতে হাসিতে কান্দিয়া ফেলে এবং ক্রন্দনের আত্মনাদ নিরন্তর না হইতে হইতেই কুল অরবিন্দের ন্যায় হাসিতে থাকে, শোক যাহাকে অন্ততঃ এক যুগও ক্ষুদ্রাত্ম্যায় বর্জিত, আমোদ ও উৎসবে বিরত এবং শয্যাগত করিয়া না রাখে, সে কেন রুখা শোকাকুলতা দেখাইয়া মমতার বিভ্রম না করে? আমার যদি কখনও কেহ প্রিয় হয়, আর আমি যদি কখনও প্রিয়জন-শোকে আকুল হই, তবে ঐ পুরোবর্তিনী তরঙ্গিনীর ন্যায় বিলাপ করিব। সূর্য্য উদিত হইবে এবং সূর্য্য অস্ত যাইবে, চন্দ্র তারা নভোমণ্ডলে প্রক্ষুটিত হইয়া পুনরায় বিলীন হইবে, আমি তথাপি ঐ দ্রব-ময়ীর ন্যায় বিলাপ করিতে থাকিব। যদি প্রাণ ভরিয়া এবং যগান্ত ব্যাপিয়া কান্দিতে না পারিলাম, তবে আর সে ক্রন্দনের তাৎপর্য্য কি?

হে সহৃদয়! তুমি কি তোমার জীবনে কখনও কাহারও জন্য কান্দিয়াছ, অথবা অন্যের ক্রন্দন শুনিয়াছ? যদি কান্দিতে কি ক্রন্দন শুনিতে ইচ্ছা কর, তবে স্বচ্ছ-সলিলা সরসুর তটে গমন কর। কত রাজা ও রাজ্য জগতে বিরাজ করিল, কত রাজা ও রাজ্য বিলয় পাইল। পরিবর্তনের

শ্রোতে কতই কি পরিবর্তন ঘটিল। কিন্তু সরসুর তটে আজিও হা রাম! হা অযোধ্যা! এই একমাত্র হাহাকার! জ্যোৎস্না এবং অন্ধকারে, সন্ধ্যার রক্তিমায় এবং উষার বিরসলাবণ্যে, সকল সময়েই ঐ হা রাম! হা অযোধ্যা! এই একই হাহাকার-ধ্বনি স্নেহগদগদ শ্রোতস্থিনীর বক্ষঃস্থল বিদারণ করিয়া ফাটিয়া বাহির হইতেছে, এবং পরদুঃখকাতরা প্রতিধ্বনিও যেন হা রাম! হা অযোধ্যা! বলিয়াই নিশাির নিস্তব্ধ গা-স্তীর্ষের মধ্যে বিলাপ করিতেছে।

অকৃতজ্ঞ ভারতবাসী, বর্তমান মুহূর্তের ভোগে মুখে নিমগ্ন হইয়া, ভারতের ভূত-পূর্ব্ব-কীর্তি চিরকীর্তনীয় আৰ্য্যজাতিকে অনাগ্রাসে ভুলিতে পারিয়াছে;—যাঁহাদিগের পদরজঃস্পর্শে পৃথিবী পবিত্র হইয়াছিল, যাঁহাদিগের গুণগরিমায় এবং তেজঃপ্রভায় ভারতভূমি দেবভূমি বলিয়া পরিচয় পাইয়াছিল, যাঁহাদিগের কবিজন-স্পৃহণীয় পৌৰুষ-সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া কবিতা আপনিই এক সময়ে প্রেম-ধীন। কুলকামিনীর ন্যায় ভারতনিকুঞ্জে বিরাজমানা ছিল, ভারতসম্মান সেই প্রাণাধিক-প্রিয় পূজনীয় পূর্ব্বপুরুষদিগকে অকাতরমনে পাসরিয়া রহিয়াছে। কাহারও চক্ষু একদিনু অশ্রুবারি দিয়াও তাঁহাদিগের তর্পণ করে না; কাহারও হৃদয় তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া সামান্য একটি নিঃশ্বাসেও উত্তপ্ত হয় না; কেহ দিনান্তেও একবার তাঁহাদিগের নাম করিয়া স্ববংশ-

বাৎসল্য ও স্বজনানুরাগের পরিচয় দেয় না। কিন্তু আর্থ্যের গৌরবসহচরী কালিন্দী এবং ভাগীরথী, নন্দনা এবং গোদাবরী আজি বিংশতি শতাব্দীর সুদূর ব্যবধানেও আর্থ্যনাম তুলিতে পারে নাই। উহার। অদ্যাপি পুত্রশোকাতুরা জননির ন্যায়, পতিশোক-বিবশা বিধবার ন্যায়, ভারতীয় আর্থ্যের জন্য নিয়ত বিলাপ করিয়া, তটস্থিত তকলতা এবং তরুশাখা-স্থিত বিহঙ্গনিচয়কেও শোকে সংজ্ঞানশূন্য করিয়া রাখিতেছে; এবং যাহার শরীরে শোণিতের কিঞ্চিদ্রাও সঞ্চার আছে, যাহার হৃদয়বস্ত্র প্রায়-নিষ্পন্দ ঘটিকা-যন্ত্রের ন্যায় এখনও একটুকু একটুকু স্পন্দিত হইতেছে, ঐ মর্ম্মস্পর্শি নৈশবিলাপ তাহাকেও আকুল ও উন্মত্ত করিয়া তুলিতেছে।

ধিক্‌ আমার! আমি আপনাকে আপনি মনুষ্য বলিয়া গণনা করি! ধিক্‌ আমার! আমি আমার এই শীতসঙ্কুচিত পাবনকঠিন প্রাণের আবার স্পর্শা করি!

আমি যদি এইরূপ নিম্নগণ মনুষ্য না হইয়া রক্ষের একটি পাতা কি বনের একটি ফুল হইতাম, তাহাও ইহা অপেক্ষা শতগুণে আমার ভাল ছিল। আমার এ আগুণ তাহা হইলে আর আমার দাহন করিত না, লজ্জার এবং অনুতাপে অহোরাত্র এইরূপ পুড়িয়া মরিতাম না, এবং স্মৃতি ও আশা, অভিমান এবং আত্মাবমাননার বিরোধ-দুঃখও আমাকে সর্বদা এরূপ দংশন করিত না। যেমন স্রোতের জলে নির্মাল্য পুষ্প,—হর্ষ নাই, বিষাদ নাই, ভূত নাই, ভবিষ্যৎ নাই,—আমিও তাহা হইলে ঠিক সেইরূপ থাকিতাম, এবং চিরকাল তরঙ্গ-বক্ষে ভাসিয়া ভাসিয়া অবশেষে ঐ স্রোতের জলেই মিশিয়া যাইতাম। আমি আছি কি নাই কেহ তাহা দেখিত না, আমি ছিলাম কি না তাহাও কেহ জানিত না। যদি দেখিত কি জানিতে পাইত, তাহা হইলেও কেহ আমার হাসিত না, কি আমার জন্য কাদিত না।—(উদাসীন।)

## সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

সরোজিনী, বা চিতোর আক্রমণ নাটক। পুরুবিক্রম নাটকরচয়িতা কর্তৃক প্রণীত।—এই নাটকখানি গ্রীক-কবি ইউরিপাইডিজের ইফিজিনিয়া নামক ম্রুপ্রসিদ্ধ নাটকের অনুকৃতি। কিন্তু অনুকৃতিতে প্রায়ই যে সকল দোষ ঘটে, ইহাতে তাহা পরিলক্ষিত হয় না। ইহা

সর্বপ্রাংশে হৃতন সৃষ্টির মত হইয়াছে; যাহার কবিত্ব নাই, যাহার কল্পনা ক্ষুদ্র-মতী নহে, যিনি পুরাতনকে হৃতন করিতে না পারেন, এইরূপ অনুকরণ তাঁহার পক্ষে এক অসাধ্যব্যাপার। আমরা পুরুবিক্রম পাঠ করিয়া প্রমুখ্যকারকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছি; সরোজিনী পাঠে বুঝিয়াছি যে,

তিনি আত্মগোপনের জন্য অশেষ যত্ন করিলেও বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে আর অধিকদিন অপরিচিত রহিতে পারিবেন না। গ্রন্থনায়িকা সরোজিনী মৌন্দর্যের এক আশ্চর্য্য প্রতিমূর্তি। প্রীতি এবং পবিত্রতা সরোজিনীতে যেন এক হইয়া গিয়াছে। পবিত্রতা প্রীতির ন্যায় কমণীয় প্রতিভাত হইতেছে, এবং প্রীতি কুসুমকোমলা হইয়াও পবিত্রতার উজ্জ্বল জ্যোতিতে শোভা পাইতেছে। এইরূপ চিত্রনৈপুণ্য সামান্য শক্তির কার্য্য নহে। আমরা এই নাটকখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে আর কিছু না বলিয়া ইহার দুইটি কবিতা পাঠকবর্গকে উপহার দিব। আমরাদিগের নিশ্চিত ভরসা আছে যে, যিনি তাহা পাঠ করিবেন, তিনিই গ্রন্থকারকে মুকবি বলিয়া প্রশংসা করিবেন, সহৃদয় বলিয়া ভাল বাসিবেন, এবং স্বদেশবৎসল বলিয়া তাঁহার নিকট অন্ধা ও কৃতজ্ঞতার পাশে বন্ধ হইবেন।—

“পরানে আত্মি দিয়া সমর-অনলে,  
স্বর্গে পিতা পুত্র পতি গিয়াছেন চ’লে,  
এখন কিস্থখ আশে, থাকিব সংসার-পাশে,  
এখন কি স্থখে আর ধরিব পরাণ।  
হৃদয় হয়েছে ছাই, দেহও করিব তাই,  
চিতার অনলে শোক করিব নির্বাণ।

দূর হ! দূর হ তোরা ভূষণ-রতন!  
বিধবা রমণী আজি পশিবে চিতায়;  
কবরি! তোরেও আজি করি নু মোচন,  
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়;  
অনল সহায় হও, বিধবারে কোলে লও,  
লয়ে যাও পতি পুত্র আছেন যথায়;  
বিধবা পশিবে আজি অনল-শিখায়।

( সকলে সম্মুখে )

জ্বল জ্বল চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,  
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।  
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন  
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥  
শোন্‌রে যবন! শোন্‌ রে তোরা!  
যে জ্বালা হৃদয়ে জ্বালাসি সবে,  
সাক্ষী রলেন দেবতা তার,  
এর প্রতিফল ভুগিতে হবে ॥

\* \* \*

কতকগুলি আহত রাজপুত সম্মুখে  
দ্যাখ্‌ রে জগৎ, মেলিয়ে নয়ন,  
দ্যাখ্‌ রে চন্দ্রমা, দ্যাখ্‌ রে গগন!  
স্বর্গ হ’তে সব দ্যাখ্‌ দেবগণ,  
জ্বলদ-অন্ধরে রাখ গো লিখে।  
স্পর্ধিত যবন, তোরাও দ্যাখ্‌‌রে,  
সতীত্ব-রতন, করিতে রক্ষণ,  
রাজপুত সতী আজিকে কেমন,  
সঁপিছে পরাণ অনল-শিখে ॥”

## সাধনা ও সিদ্ধি।

মম্ব্যালোকে যাহা কিছু লুপ্তকর, যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, তাহাই সাধনাসাপেক্ষ। বিনা সাধনায় কিছুতেই সিদ্ধি হয় না। বিজ্ঞা, বৈভব, মান, প্রণয়, প্রভুত্ব, পরাক্রম, চারিত্র-বল, আত্মশোধন, স্বজাতির উন্নতি, স্বদেশের গৌরব বিস্তার, স্বাধীনতা অথবা স্বর্গলুপ্ত, ইত্যাদি সর্বপ্রকার সম্পদই সাধনার অদীন। সাধনার বজ্রবিদ্রাঘ ভূতোর কার্য করে, পরিত স্বকীয় পাবাগবন্ধ বিদারণ করিয়া সাধকের গতানুগতের জ্ঞান পথ খুলিয়া দেয়, অন্ধকার আলোকের স্রায় দৃষ্টির সহায় হয়, এবং যাহা কাম্পনার চক্ষেও কেহ দেখিতে পার না, তাহা স্বাভাবিক কার্যের স্রায় সুসম্পন্ন হইয়া যায়। এই নিমিত্তই সাধনার নাম ব্রত, সাধনার নাম তপশ্চর্যা, এবং সাধনার নাম যোগ। যাহারা সাধনার পথে পথিক হইয়া যত্নসহকারে ব্রত পালন করেন,—তপস্বীর ন্যায় উছাতেই একবারে ভূবিয়া বান, তাঁহারা সিদ্ধ হন। যাহারা তাহা না করিয়া চিরকালই স্রোতের জলে ভাসিতে থাকেন, তাঁহারা চিরকালই ঐরূপ ভাসমান রহেন।

যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে চাহেন, তাঁহাকে তদুপযোগিনী সাধনা অবলম্বন করিতে হয়। যথা, যিনি সন্ন্যাসী সাধক, তাঁহার একরূপ সাধনা; যিনি জ্ঞা-

তীর স্বাধীনতারূপ মহামন্ত্রের সাধক তাঁহার আর একরূপ সাধনা। যিনি প্রভুত্বের সাধক, তাঁহার একরূপ সাধনা, যিনি প্রেমের সাধক, তাঁহার আর একরূপ সাধনা। গ্যালিলিও আর গারিবল্ডী, শররচাৰ্য্য আর শিবজী, অথবা হাওয়ার্ড আর ক্রেমওয়েল, এবং চৈতন্য ও প্রতাপাদিত্য, ইহারা সকলেই অতি শ্রেষ্ঠ কাম্পের সাধক, অথচ ইহাদিগের সাধনা বিভিন্ন প্রকারের। ইহাদিগের কাহারও হস্তে বীণা, কাহারও হস্তে ভেরী। কেহ কেবলই কুশুম চয়ন করিয়াছেন, কেহ কেবল কটক চয়ন করিয়া তদ্বারা ই পরিশেষে কুশুম-কোমল শয্যা রচনা করিয়াছেন। কেহ নিরবচ্ছিন্ন অশ্রুবর্ষণ করিয়াছেন, কেহ অশ্রুর মূল প্রস্রবণ পর্য্যন্ত শোষণ করিবার জন্য আপনার হৃৎপিণ্ডকেও ছিড়িয়া ফেনিয়াছেন। কিন্তু এই অমৈক্যেও একতা আছে, এই বিভিন্নতার মধ্যেও কতকগুলি নিয়ম বিষয়ে অভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমরা এই প্রবন্ধে সর্ববিধ সাধনার বীজস্বত্রস্বরূপ সেই সাধারণ নিয়মগুলিই অতি সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

সাধনার প্রথম অঙ্গ, উদ্দেশ্য নির্ধারণ—অথবা মন্ত্রপরিগ্রহ। কৃতী পুরুষেরা বহু-

চিন্তা, বহুপর্য্যবেক্ষণ এবং নিজ হৃদয়ে বহু আলোচনার পর কোন না কোন মস্ত্রে দীক্ষিত হন, এবং শয়নে, জাগরণে, নি-  
 জ্জনে কি লোকারণ্যে সতত ঐ ইষ্টমন্ত্রই  
 জপ করিতে রহেন । এই মন্ত্র গ্রহণেই  
 মনের একাগ্রতা, এবং এই একাগ্রতাত্তেই  
 উন্নতি । নাবিক যেমন গভীর অন্ধকারের  
 মধ্যে নক্ষত্রবিশেষের প্রতি চক্ষুঃ স্থির রা-  
 খিয়া সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার ভেদ করিয়া  
 চলিয়া যায়, প্রকৃত সাধকেরাও সেইরূপ  
 আপনার মূলমন্ত্রে মনঃসম্মিলনপূর্ব্বক অ-  
 নন্ত সংসার সমুদ্রের তরঙ্গরাজি ভেদ ক-  
 রিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হন । স্তবরাং তাঁ-  
 হাদিগের দৃষ্টি অর্থযুক্ত, এবং তাঁহাদিগের  
 হাস্য, উল্লাস, আমোদ, উৎসব, ভোগ, বি-  
 লাস, শ্রম ও বিরাম সমস্তই অর্থযুক্ত ।  
 তাঁহাদিগের প্রতিপদনিক্ষেপেই জীবনের  
 এক একটি কার্য্য । তাঁহাদিগের গতি স্থির ।

যখন ইটালীর চিরকীৰ্ত্তিস্বরূপ ক্ষণ-  
 জয়া রায়েঞ্জি, রোমের দুৰ্দ্ধরত দুৰ্ব্বৃত্ত  
 আভিজাতদিগের প্রমোদগৃহে উপবিষ্ট র-  
 হিয়া, সুরসিক বিদূষকের ন্যায় তাহাদি-  
 গকে প্রতিদিন নানাবিধ নূতন কথায় প-  
 রিতুচ্ছ করিতেন,—কখনও হাসিতেন, ক-  
 খনও হাসাইতেন, কখনও আপনাকে হাস্য-  
 স্যাম্পদ করিয়া পরের মন যোগাইতেন,  
 যদি কেহ তখন তাঁহার হৃদয়ের অভ্যন্তরে  
 প্রবেশ করিয়া তদীয় ইষ্টমন্ত্র পাঠ করিতে  
 পারিত, সে নিশ্চয়ই ভয়ে কটকিত  
 কিংবা ভক্তিতে স্তম্ভিত হইত । মুখেরা

তাঁহাকে আমোদলহরীর ফণী মাত্র মনে  
 করিত, কিন্তু তিনি নিয়ত আপনার মন্ত্র  
 সাধন করিতেন । যখন মস্ত্রিবর কলবাট,  
 চতুর্দশ লুইর স্বর্ণময় সিংহাসনের এক  
 পাংশে অতি নির্ঝোঁপের মত দণ্ডায়মান  
 থাকিয়া, কুতাঞ্জলিপটে রাজনিয়োগ পা-  
 লন করিতেন, যদি পুরাতন রাজপুঙ্খবগণ  
 তাঁহার সেই লাভগাম্ভীর্ণ্য, মাধুর্য্যবিহীন নি-  
 শুদ্ধ মূর্ত্তির বহিরাবরণ ভেদ করিয়া, তিনি  
 কি নাম জপনা করিতেছেন তাহা তখন জা-  
 নিতে পাইতেন, তবে তাঁহারা তদ্ভেদেই তাঁ-  
 হাকে উন্মূলিত করিয়া ফেলিতেন । জম্বাজ্জ  
 পৌরবর্গ তাঁহাতে কেবল রূপেরই অভাব  
 দেখিত ; কিন্তু তিনি তখন গুণগত পরাক্র-  
 মের এক আশ্চর্য্য প্রাসাদ নির্মাণেই অ-  
 হোরাত্র যত্নপর রহিতেন । যখন বীর-  
 শ্রেষ্ঠ বোনাপার্ট, যোসিফিনের মৃণালনিন্দি  
 বাহুলতা অবলম্বন করিয়া, পারিসের তদা-  
 নীন্তন প্রভু প্রসিদ্ধনামা বেরাসের বিহার-  
 ভবনে তালে তালে নৃত্য শিক্ষা করিতেন,  
 যদি কেহ তখন তাঁহার অন্তরতম মস্ত্রের  
 অক্ষুট গর্জ্জন শ্রবণ করিতে সমর্থ হইত,  
 সে নিশ্চয়ই আতঙ্কে অধীর হইয়া দূরে স-  
 রিয়া পড়িত । লোকে ভাবিত তিনি নৃত্য  
 শিখিতেছেন ; কিন্তু যে তালে সমগ্র ইউরোপ  
 এক সময়ে ভয়ানকরূপে নৃত্য করিয়াছিল,  
 তিনি তখন সেই কদ্রতালই অভ্যাস করি-  
 তেন । পৃথিবীতে ষাঁহার কার্য্য করিয়া  
 গিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই এই-  
 রূপ এক একটি মন্ত্র ছিল । তাঁহারা ম-

জ্বলে পৃথিবীকে স্বর্গে তুলিয়া নিয়াছেন, অথবা স্বর্গের শোভা সম্পদ পৃথিবীতে আনিয়া ছড়াইয়া দিয়াছেন,—মৃতদেহে জীবনী দান করিয়াছেন, এবং পুতুল ও ক্রীড়াকন্মুক লইয়া পর্বত ভাঙ্গিয়াছেন।

যাহারা কোন মস্ত্রের দীক্ষিত নহে, তাহাদিগের সকলই ইহার বিপরীত। তাহাদিগের জীবন অর্থশূন্য, তাহাদিগের গতি বাতহিল্লোলে তৃণের মত। তাহারা কখনও উত্তরে যায়, কখনও দক্ষিণে গড়াইয়া পড়ে, কখনও পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়, কখনও প্রতিকূলবায়ুতে পশ্চিমে নীত হইতে থাকে। তাহাদিগের মন্ত্র নাই, মন্ত্রসাধনা নাই, স্মৃত্তরাং কিছুই ‘কার্য্য’ নাই। ক্ষুধার সময়ে তাহারা আহার করে, নিদ্রার সময়ে তাহারা শয়ান রহে; কেহ জাগাইলে তাহারা একটুকু জাগে বা না জাগে, কেহ না জাগাইলে তাহারা ঐরূপই পড়িয়া থাকে। লালসা আর ইচ্ছা এক নহে। লালসা প্ররুতির দাসী, প্ররুতিরই অনুগামিনী;—ইচ্ছা অদীশ্বরী, প্রভাবশালিনী। লালসা প্ররুতির উদ্বেক্ত উদ্ভিক্ত হয়, প্ররুতির নিদ্রিতাবস্থায় নিদ্রিত রহে। ইচ্ছা আপনার ক্ষমতাতেই আপনি উদ্ভিক্ত থাকিয়া সমস্ত প্ররুতির উপর আধিপত্য করে। বস্তুতঃ ইচ্ছা একটা মহতী শক্তি। যাহারা মন্ত্রদীক্ষিত, তাহারা লালসামূন্য, কিন্তু ইচ্ছামিত্ত; তাহাদিগের ইচ্ছা প্রগাঢ়, ঘনীভূত, কেন্দ্র-নিবদ্ধ। তাহাদিগের বুদ্ধি, হৃদয় ও সর্ব প্রকার মানসিক

বৃত্তি সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের ইচ্ছাধীন। আর যাহারা উল্লিখিত প্রকার মন্ত্রহীন, তাহারা ইচ্ছামূন্য, কিন্তু লালসামিত্ত। তাহাদিগের সমুদয় মনোবৃত্তিই স্বতন্ত্ররূপে কার্য্য করে, কোনটিই কাহারও প্রভুত্ব মানে না। যদি তাহাদিগের মনে ইচ্ছার কল্পিতাত্র স্ফুর্তি জন্মে, সে ইচ্ছা গাঢ় হয় না, ঘনীভূত হয় না, এবং কোন একটি বিশেষ কেন্দ্রে নিবদ্ধ হইতে পারে না। বলিয়াই কদাপি ফলে আসে না।

সাধনার দ্বিতীয় অঙ্গ রহস্যরক্ষা অথবা মন্ত্রগুপ্তি। মন্ত্রগুপ্তি মন্ত্রসিদ্ধির কিরূপ অনুকূল, তাহা সহজে বুঝান এক কঠিন ব্যাপার। কিন্তু যাহারা, কল্পনার বিনোদকাননে বিচরণ না করিয়া, মানব-জীবনের বহুকটকময় দুর্গম শৈলে পাদচারণা করিয়াছেন, যাহারা লোকপ্রকৃতির বহির্দেশেই চিরদিন অভের নায় দণ্ডায়মান না থাকিয়া, চিন্তার সহায়তায় উহার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পাইয়াছেন, তাহারা দেখিয়াছেন, তাহারা বুঝিয়াছেন, তাহারা ভূয়োভূয়ঃ এইরূপ উপদেশও দিয়াছেন যে, কোন মন্ত্রই মন্ত্রগুপ্তির দুর্ভেদ্য-বর্ষবিরহে দীর্ঘকাল সজীব থাকে না। যে মন্ত্র সাধকের হৃদয়মধ্যে কূপোদক-নিকিণ্ড সোপ্তিবৎ লুকায়িত রছিল, তাহা মন্ত্র; যাহা লোকের মুখে মুখে পরিভ্রমণ করিল,—এক কর্ণের পর আর এক কর্ণ এইরূপ করিয়া সহস্র কর্ণে যাতায়াত করিতে লাগিল, তাহা কথা। কথার কার্য্য

হয় না, কার্য্য যাছা হয় তাছা মস্ত্রে । অ-  
তএব মস্ত্র যাছাতে কথার কথায় পরিণত  
না হয়, এবিষয়ে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে  
বিধেয় ।

খৃষ্ট বলিয়াছেন, তোমার দক্ষিণ হস্ত  
যে কার্য্য করে, তোমার বাম হস্ত যেন  
তাহা জানিতে না পায় । অধুনাওন খৃ-  
ষ্টীয় ইউরোপ দানাদি সম্বন্ধে এ বিধির  
অনুবর্তী হইয়া না থাকিলেও মস্ত্রগোপন  
বিষয়ে ইহা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন ক-  
রিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে । বল্লিনের  
লৌহময়ী রাজনীতি শুদ্ধ মস্ত্রগুপ্তির ম-  
হিমা বলেই বাহুবলদৃপ্ত উদ্ধত ফরাশি জা-  
তিকে পদতলে আনিয়াছে । কশিয়া  
মস্ত্র-গোপন বিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ  
করিয়াছে বল্লিয়াই সমস্ত প্রতিবেশীকে স-  
তত শঙ্কাঘিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছে ।  
রোমের বর্তমান রাজবৈজয়ন্তী মস্ত্রগুপ্তির  
প্রসাদেই পুনরায় রোমীয় প্রাসাদসমূহে  
বহুদিনের পর শোভা পাইতেছে, এবং  
ব্রিটিশ মস্ত্রনাও এসিয়া এবং আফ্রিকায়  
বিস্তার-বিমুক্ত রাজ্যনিচয়ে এই হেতুতেই  
সমধিক প্রভাবের সহিত কার্য্য করিয়া  
আসিতেছে ।

এইরূপ প্রবাদ আছে যে, পণ্ডিতবর  
পিথাগোরাস তদীয় শিষ্যবর্গকে পাঁচ বৎ-  
সর কাল মৌনী রহিতে বাধ্য করিতেন,  
এবং যে এই পাঁচবৎসরের মৌনব্রত সাধুতার  
সহিত উদ্ভাষন করিতে সক্ষম হইত, তা-  
হাকে পরিশুদ্ধীত শিষ্যজ্ঞানে শিক্ষা দি-

তেন, যে তাছাতে অক্ষম হইত, তাহার  
নিকট হইতে একবারে বিদায় লইতেন ।  
মূলদর্শী ব্যক্তির পিথাগোরাসের এই ক-  
ঠিন নিয়মে যত কেন উপহাস কখন না,  
ইহার প্রকৃত অর্থ অতীব গভীর । মৌনে  
মনোনিধান, মৌনে গাভীর্য্য এবং মৌন-  
ব্রতেই চিত্তসংযমের প্রথম সোপান । কোন  
কোন ক্ষীণপ্রাণ মনুষ্য যে বিনা প্রয়োজ-  
নেও মর্মান্বিত গৃঢ় সংকল্প অথবা সম্প্র-  
দায় বিশেষের গৃঢ় মস্ত্র প্রকাশ করিয়া  
ফেলে, ইহার কারণ কি ? — না সে তরল, সে  
লঘু, সে ভারবহনে অসমর্থ, সে লৌকিক  
যশের জন্য লালায়িত । সে অগাধ-জ্ঞান-  
সঞ্চায়ী অবিকারী রোহিতের সৈন্য ও অ-  
টলজায় কি মাহাত্ম্য আছে তাহা বুঝিতে  
পারে না । তাহার হৃদয় শফরীর মত, উহা  
গণ্ডুজলেই হৃত্য করিয়া স্রবাস্রভব করে ।  
কার্শ্যের সুরমাশ্রুতি দূরে থাকুক, কার্য্য অ-  
রস্ত না করিয়াই সে তাহার পরিণামভোগ্য  
প্রশংসাবাদের জন্য অস্থির হইয়া উঠে ।  
অবলা যেমন অবলার কণ্ঠে ভর করিয়া অ-  
কারণেও মনের সুখদুঃখঘটিত কথা লইয়া  
আমোদ করে, সেও রাজ্যের উত্থান ও প-  
তন এবং সমাজের স্থিতি-বিপ্লব-ঘটিত ভয়-  
ঙ্কর কথা লইয়া আমোদ করিতে সেইরূপ  
ভালবাসে । পরের চক্ষেই সে সর্ব্বদা দে-  
খিতে চাছে, পরকীয় দৃষ্টিতেই সে বিল-  
ম্বিত রহে । সুবিখ্যাত রিশিলু এই শ্রেণির  
পুরুষদিগকে পুরুষদেহে স্ত্রীলোক বলি-  
তেন । আমরাও ইহাদিগকে স্ত্রীলোক ব-

লিগাই রূপার ময়নে দেখিয়া থাকি । ইহা-  
দিগকে যত ইচ্ছা আত্মা কর, প্রীতি কর,  
কাহারও তাহাতে আপত্তি নাই ; প্রমোদ-  
প্রসঙ্গে ইহাদিগের সাহচর্য্য গ্রহণ কর,  
তাহাতেও কাহারও ক্ষোভ দুঃখ নাই ।  
কিন্তু মন্ত্রভবনে ইহাদিগকে কখনও আ-  
হ্বান করিও না । কারণ, ইহারা মন্ত্ররক্ষায়  
অসমর্থ ; ইহারা স্বভাবতঃ অসিদ্ধ ।

সাধনার তৃতীয় অঙ্গ উৎসাহ অথবা  
মন্ত্রমদ ; চতুর্থ অঙ্গ উদ্যম অথবা মন্ত্র-প্র-  
য়োগ ; পঞ্চম অঙ্গ আত্মোৎসর্গ অথবা ম-  
ন্ত্রার্থ আত্মত্যাগ ; ষষ্ঠ অঙ্গ অধ্যবসায় অথবা  
মন্ত্র-শক্তিতে নির্ভর এবং শেষ ও সপ্তম অঙ্গ  
অপরাজিত সহিষ্ণুতা অথবা মন্ত্রপুতচক্ষে  
কালপ্রতীক্ষা । এই পাঁচটি সাধনার প্রাণ ।  
ইহাদিগের সংমিশ্রণে মনে কি যে এক  
অপূর্ব্ব অবস্থা জন্মে, তাহা আপনিই তাহা  
যথোচিত রূপে ব্যক্ত করিতে পারে না ।

কে বলে যে মনুষ্য দুর্ব্বল ?—কে  
বলে যে, রোগে মনুষ্যের শক্তি হ্রাস হয়,  
শোক তাহাকে দাহন করে, বয়োহ্রদ্বিস-  
হকারে জরা আসিয়া তাহাকে গ্রাস ক-  
রিয়া ফেলে, এবং দুঃখ, দারিদ্র্য ও নানা-  
বিধ দুর্ঘটনায় তাহার আত্মা অবসন্ন হইয়া  
পড়ে ? বাহার হৃদয়ে উৎসাহের উদ্দীপনা  
নাই, এবং সুতরাং আত্মীয় ক্ষুধা ও অ-  
ন্তরে চৈতন্য নাই, তাহার পক্ষে এসকলই  
সম্ভব বটে । সে বিনা রোগেও ক্লম, বিনা  
বার্জ্যকোও জরাভীর্ণ, এবং শোক দুঃখের  
কশাঘাত বিনাও চিরমান, চিরবিষয়, চির-

কালের জন্য অকর্ম্মণ্য । কিন্তু যাহারা মন্ত্র-  
মদে প্রমত্ত, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র । তাঁ-  
হারা কখনও বুদ্ধ হন না, কখনও ভাদ্জিয়া  
পড়েন না, এবং জীবনের অন্তিমক্ষণেও  
তাঁহারা উৎসাহশূন্য ও উদ্যমহীন হইয়া  
মনুষ্যজীবনের অসারতা প্রতিপাদন করেন  
না । তাঁহাদিগের হৃদয়ের রক্তে, রক্তে এক  
অনির্ব্বচনীয় তেজঃপ্রবাহ প্রবাহিত হয় ;  
উহা তাঁহাদিগের প্রত্যেক ধমনীতে তাড়িত  
বেগ প্রদান করে, এবং শরীর যখন ছা-  
ড়িয়া দেয়, হস্তপদ শিথিল হইয়া পড়ে,  
তখনও উহা তাঁহাদিগকে কেমন এক আ-  
শ্চর্য্য প্রভাবে বুবার মত সজীব রাখে ।

মহাত্মা ওয়াশিংটন অতি বুদ্ধ বয়সেও  
যখন স্বজাতির ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতেন, ত-  
খন তাঁহার নিস্তেজ মস্তিষ্ক প্রদীপ্ত হইয়া উ-  
ঠিত, তাঁহার নিম্পন্দদেহ শক্তির পুনঃসঞ্চারে  
পুলকিত হইত । তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম  
নিদ্রাবস্থায়ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে  
নাই । ডেনিয়েল ওকোনেল যখন জীবন ও  
মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দণ্ডায়মান, আয়তনের  
মঙ্গল কামনা তখনও তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ  
তুলিত, এবং তাঁহার পবিত্র রসনা হইতে  
তখনও যে দুই একটি বাক্য বহ্নিকণার ন্যায়  
স্থলিত হইত, সহস্র সহস্র হৃদয়ে তাহা এক  
ভয়ানক দাবানল জ্বালিয়া দিত । নিকো-  
সাহ ও অবসাদ কাহাকে বলে হাম্বো-  
ল্ড তাহা কখনও জানিয়া যান নাই । যে  
বয়সে অন্যেরা বৈরাগ্যের ভজন্য করে,  
বিষয়ে বীতরাগ হইয়া নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘনিঃ-



স্বাস্থ্যসেই সময়স্ফীতিপাত করিতে ভালবাসে, অথবা অতীতস্মৃতির আশ্রয় লইয়া পুরাতন কথার রোমন্থন করিতেই যত্নপর রহে, তিনি তখনও যৌবনের নূতন মত্ততায় জ্ঞান সাপন করিতেন, এবং মুহূর্তের পর মুহূর্তে নূতন কিছু লাভ করিবার জন্য যার পর নাই আকুল রহিতেন। লর্ড পামার্টন যখন চম্ফুমেলিয়া চাহিতেও কষ্ট অনুভব করিতেন, কসিয়ায় তখনও অনেকে অনিষ্ট ও উৎকর্ণ রহিয়া তাঁহার মন্ত্রনার মৰ্ম্মার্থভেদ করিতে চেষ্টা করিত। চিরজীবী টিয়ার ছুষ্টী কাকের মত ফরাশি রাষ্ট্রবিপ্লবের ভূকম্প দেখিয়াছেন, প্রথম নেপোলিয়নের বিজয়-দুন্দুভিনাদে হতা করিয়াছেন, তৃতীয় নেপোলিয়ানকে পিতৃব্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া করতালি দিয়াছেন, আবার সেদিন সিডানের বিপৎপাতের পর হইতে পারিসের কথিরাক্ত দেহে ঔষধি লেপন করিয়া আপনি যে অদ্যাপি ইহলোকেই রহিয়াছেন এবং অদ্যাপি স্বদেশেরই সেবা করিতেছেন, সংসারকে তাহা কার্য্যতঃ জানাইয়াছেন। লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে ব্রিটিশ রাজত্বরণীর বর্তমান কর্ণধার বান্ধকো অত্যন্ত জড়িত হইয়াছেন। কিন্তু আজও ব্রিটিশ প্রাণ তাঁহার উৎসাহে উৎসাহিত হইতেছে; রটেনিয়ার মন্দীভূত প্রতাপ-শ্রোত তাঁহারই অভিঘাতে বেগে বহিতেছে। সাধকের উৎসাহ ও উদ্যম সর্বত্র ও সকল সময়েই এইরূপ। উহা অসীমত বন্ধি। যে উহা নিভাইতে

কিংবা উহার গতিরোধ করিতে যায়, সে আপনিই উহাতে পুড়িয়া মরে।

সাধক সম্প্রদায়ের আত্মোৎসর্গ ইহা অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়জনক। তাঁহাদিগের এই আত্মোৎসর্গই যথার্থ আরাধনা। ভক্ত যেমন আপনাকে আরাধ্য দেবতার পদারবিম্বে পুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ সমর্পণ করিয়া উহাতেই বিলীন হইতে কামনা করেন, তাঁহারাও সেইরূপ তনু, মন, প্রাণ সর্বস্বই তাঁহাদিগের আরাধ্য মন্ত্রে আহুতি স্বরূপ উৎসর্গ করিয়া নিজ নিজ পৃথগস্ত্রিও উহাতেই নিমজ্জিত করিয়া দেন। তখন তাঁহারা তদাত, তদায় হন। স্বধ তখন তাঁহাদিগকে স্মরণ করে না, প্রশংসার মূহুরমোহন মধুর ধনি তখন তাঁহাদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না, হন স্নেহ মমতার মায়াবন বন্ধনীতে বদ্ধ হইয়া চায় না, এবং কিছুই তাঁহাদিগকে তখন দক্ষিণে কি বামে হেলাইতে পারে না। তখন তাঁহারা অত্যন্ত জীবিত এবং এই হেতুতেই অত্যন্ত মৃত, অথবা অত্যন্ত মৃত এবং এই হেতুতেই অত্যন্ত জীবিত রহেন। বাল্মীকির অস্থি পঙ্কুর হইতে রাম নামের ন্যায় তাঁহাদিগের মৰ্ম্মাস্থি হইতেও তখন কেবল একই নাম নির্গত হয়, এবং তাঁহাদিগের পরিগৃহীত মন্ত্র যত কেন হুঃসাধ্য হউক না, আত্মোৎসর্গের অভাবনীয় বলেই তখন তাহা সুসাধ্য হইয়া উঠে।

কাব্য ও পুরাণে ঐহাদিগের বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সেই সমস্ত প্রাচীন সাধকগণ নী-

তের সময় হিমরাশিতে পরিবেষ্টিত র-  
হিতেন, অতি ঘোরতর গ্রীষ্মের সময়ে চা-  
রিদিগে অগ্নি জ্বালিয়া তাহার মধ্যে উপ-  
বিষ্ট থাকিতেন। কেহ আপনার চক্ষু হু-  
টিকেও সাধনার পরিপন্থী বিবেচনায় উৎ-  
পাটন করিয়া ফেলিয়া দিতেন, কেহ অল্প  
প্রকারে মনোনিবেশে সমর্থ না হইলে  
জিহ্বা কিংবা হস্ত পদ প্রভৃতি অপরিহার্য্য  
অঙ্গ প্রত্যঙ্গও অকাতরমনে পরিবর্জন ক-  
রিতেন। এসকল কার্য্য সঙ্গত কি অসঙ্গত,  
তাহার বিচার করা এইক্ষণ অনাবশ্যক।  
সাধারণতঃ বলিতে গেলে প্রকৃতির বি-  
রোধী না হওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু যাহারা  
সাধনার রত হইতে চান, তাগ এবং আত্ম-  
নিগ্রহই তাঁহাদিগের প্রধান সহায়। যা-  
হারা তাগে ভীত, যাহারা আত্মনিগ্রহে  
কুণ্ঠিত, তাহাদিগের মত লোকের দ্বারা  
সত্য যুগেও কোন কার্য্য হয় নাই, কলি-  
যুগেও কোন কার্য্য হইবে না।

তুমি জানী,—তুমি সরস্বতীর সাধক।  
তোমার আবার সুখের লালসা কেন? যদি  
তুমি জ্ঞানের নির্মল আনন্দ অপেক্ষা সাংসা-  
রিক খ্যাতি প্রতিপত্তিকেই অধিক মনে  
করিলে—তোমার আরাধ্য শক্তির প্রসন্ন  
দৃষ্টি অপেক্ষা ভোগ বিলাসের আবিল  
আনন্দের জ্ঞানই অধিকতর অধীর রহিলে,  
তবে তোমার আবার সাধনা কি? তুমি  
প্রেমিক, তুমি অপার্থিব বৈভবের জন্য  
লালায়িত। এই বণিষ্ঠুতিসম্পন্ন কলু-  
ষিত মনুষ্যলোকে যাহা স্বপ্নে বই কেহ

দেখে না, কবি বই যাহা কেহ জানে  
না, কবিমুখে বিনা যাহার কথা শুনা  
যায় না, তুমি সেই জ্ঞানের অগম্য  
অজ্ঞেয় ধনের জন্য চিরতৃষিত। তোমার  
আবার ধন, মান, ক্ষতিসাহ গণনা কেন?  
আর তুমি স্বদেশবৎসল! স্বজাতির বন্ধু!  
তুমি যে প্রত্যেক কার্য্যেরই পরিণাম চি-  
ন্তার পূর্বে আত্মপরিণাম চিন্তা করিতেছ,  
দেশ-হিত-ব্রতে ত্রুতী হইতে গিয়া প্রতিক-  
ণেই আত্মহিত ব্রতে অগ্রসর হইতেছ,  
দেশীয়দিগের মধ্যে স্বাধীনতার পবিত্র নাম  
সইয়া ধীরে ধীরে পরাধীনতার বিষাক্ত  
বীজ ছড়াইয়া দিতেছ, সকলকে স্বর্গের  
শোভা দেখাইবে বলিয়া নরকে আনিয়া  
ডুবাষ্টেছ,—প্রভুস্বরূপ পূজা করিবে ব-  
লিয়া পদতলে আনিয়া বান্ধিতেছ, তো-  
মারও এ প্রতারণা, এ বিড়ম্বনা কিসের  
জন্য? তুমি অধিকৃণ্ডে আপনাকে ভাস্কর  
আর না কর, সে এক পৃথক্ কথা। কিন্তু  
যদি তুমি জ্ঞান চাও, কি প্রেম চাও, কি  
স্বজাতির অভ্যাদয় চাও, তবে আগে আপ-  
নাকে বলি দান কর,—আপনার বলিতে  
যাহা কিছু আছে, তাহা দূরে ফেলিয়া  
দাও, সাধকের ন্যায় আপনি ক্রুশকাঠে  
বিলম্বিত হও, তাহার পর সিদ্ধির কম্প-  
লতা হইতে আপনার আকাঙ্ক্ষিত ফল  
বাছিয়া লও। জনক রাজা যোগী হইতে  
পারেন নাই; তিনি তাঁহার কমণ্ডলুটি বড়  
ভাল বাসিতেন। সলোমন জানী হইতে  
পারেন নাই; তিনি জ্ঞান অপেক্ষা সুখ

সম্ভোগের অধিক আদর করিতেন। এবি-  
লার্ড প্রেমিক হইতে পারেন নাই ; তিনি  
প্রেম অপেক্ষা আপনাকে অধিক জানি-  
তেন। রবিন্সনীয়র স্বজাতির নৃহৎ হইতে  
পারেন নাই, তিনি দেশের স্বাধীনতা ও  
গৌরব অপেক্ষা আপনার স্বাধীনতা ও  
গৌরবের জন্য অধিকতর ব্যগ্র রহিতেন।  
ইহারা কেহই আত্মোৎসর্গ করেন নাই।

অধ্যবসায় উল্লিখিত সর্বপ্রকার সাধক-  
ধর্মের ভিত্তি স্বরূপ। উহা স্বাস্থ্য অমৃত,  
উহা রোগে ঔষধ, এবং উহাই মুমূর্ষুর অ-  
বলম্ব-যষ্টি। যদি এ সংসারকে সমুদ্র বল,  
অধ্যবসায়ই তাহার একমাত্র ভেলা ; যদি  
সাধনাকে জ্বলন্ত বকি বল, অধ্যবসায়ই  
তাহার একমাত্র উদ্দীপনা। সাধকের ক্ষয়-  
নিহিত যে ভাব যখন ছীন-শক্তি হইয়া  
পড়ে, অধ্যবসায়ই সেইটিকে তখন আশ্রয়-  
দানে দৃঢ় করিয়া রাখে, এবং যে তেজ  
নির্ব্বাণপ্রায় হয়, অধ্যবসায়ই তাহাকে  
পুনরায় প্রদীপ্ত করিয়া তুলে। অধ্যবসায়  
ভীষের প্রতিজ্ঞা ; যষ্টিও যদি বিপর্য্যস্ত  
হইয়া যায়, তথাপি উহা টলে না ; উহা  
সাহসের সার, ভয়ের কোন রূপ কারণই  
উহাকে বিচলিত করিতে পারে না।

অভীষ্ট সংকল্প প্রথম উদ্যমেই সংসিদ্ধ  
হইবে এমন আশা করা কাহারও উচিত হয়  
না, এবং প্রথম পদস্থলনে কি প্রথম বিঘ্ন-  
দর্শনেই যাহার উদ্যম-ভঙ্গ, আশা-ভঙ্গ  
ও ব্রত-ভঙ্গ হয়, তাহার দ্বারাও কখন কোন  
রূপ কঠোর সাধনা হইয়া উঠে না। অত-

এব অধ্যবসায়ের আবশ্যিকতা। সামর্থ্য  
আর কি ? অধ্যবসায়ই প্রকৃত সামর্থ্য। ঐ  
যে দুর্ব্বল শিশু, অদূরবর্ত্তিনী স্নেহময়ী জন-  
নীর আশ্বাস-প্রদ মধুর হাস্যে উৎসাহিত  
হইয়া, অল্পে অল্পে দণ্ডায়মান হইবার  
ক্রম শিখিতেছে, উহার ঐ দুর্ব্বল দেহ-  
লতিকা কতবার ছলিয়া পড়িবে, কতবার  
কত বিকৃত হইবে, কে তাহা এইক্ষণ বলিতে  
পারে ? কিন্তু হয়ত ঐ শিশুটিরই পদভরে  
পর্ব্বতও এক সময়ে বিকম্পিত হইবে।  
একখানি প্রস্তরের ক্ষুদ্রতম এক অংশও  
উহার নিকট এইক্ষণ হিমার্ত্রিসদৃশ ; কিন্তু  
অধ্যবসায় থাকিলে হয়ত উহারই পদ্বের  
স্তায় কোমল হস্ত পিরামিড গড়িয়া তুলি-  
বে। বস্তুতঃ, অধ্যবসায়ের তুলনা নাই।  
অধ্যবসায় বিঘ্ন বিপত্তির সহিত ক্রীড়া  
করে, সাগর শোষণ করিয়া ফেলে, এবং  
সহস্র বিভীষিকা, বজ্রপাত ও ঝঞ্ঝাবায়ুর  
মধ্যেও তকলতাপূর্ণ্য তুষারমণ্ডিত অচলের  
ন্যায় নির্ভীক ও নিষ্কম্প রহিয়া আপ-  
নার মস্ত্র আপনি সাধন করিতে থাকে।

সহিষ্ণুতা অন্য এক পদার্থ। উহা  
অধ্যবসায়ের সদৃশ, অথচ স্বল্প দৃষ্টিতে  
অধ্যবসায় হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। সা-  
ধারণতঃ সহিষ্ণুতার অর্থ ক্ষমা, সহিষ্ণুতার  
অর্থ মৃদুশীলতা। কেহ তোমায় তিরস্কার  
করিল, তুমি প্রত্যুত্তরে তাহাকে তিরস্কার  
করিলে না ; কেহ তোমার মস্তকে পদা-  
ঘাত করিল, তুমি তাহার পদনখও স্পর্শ  
করিলে না। লোকে ইহাকেই সহিষ্ণুতা

বলিবে। কিন্তু সহিষ্ণুতার প্রকৃত নাম কাল-  
প্রতীক্ষা। যে কার্যো যশ নাই, মান নাই,  
আশু মৃত্যুর প্রলোভন নাই, এবং সম্মুখেও  
আশার উদ্ভ্রম নাই, —যে কার্যো  
এইক্ষণ কোনরূপ সহায় নাই, এবং শত  
বৎসরেও যাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনা নাই,  
যিনি তাহাতেও হৃদয় মন সঁপিয়া লিপ্ত  
রহিতে পারেন, তিনিই যথার্থ সহিষ্ণু,  
এবং যিনি এই প্রকার সহিষ্ণুতাকে আ-  
পনার প্রাণের মধ্যে পোষণ করিয়া ভবি-  
ষ্যতের নিবিড় অন্ধকার ভেদ পূর্বক কা-  
লের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারেন,  
তিনিই যথার্থ সাধক, তিনিই যথার্থ  
পুরুষ।

প্রকৃতির সহিষ্ণুতা দেখ। আজি যে  
প্রকাণ্ড বটরক্ষ সহস্র বিহঙ্গকে আশ্রয় দান  
করিয়াছে, সহস্র তাপিতদেহ শীতল করি-  
তেছে, এক সময়ে তাহা ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র  
একটি বীজ মাত্র ছিল; প্রকৃতি ধীরে ধীরে  
ইহাকে এইরূপ পরিবর্তিত করিয়াছেন।  
আজি যে দৃঢ় ভূমি অসংখ্য জীব জন্তুর  
আবাস-স্থান এবং গ্রামনগরে শোভিত  
হইয়াছে, এক সময়ে তাহা একটি বালু-  
কণা মাত্র ছিল; প্রকৃতি বালুকণার সহিত  
বালুকণা বাঞ্জিয়া তাহাতেই ধীরে ধীরে এই  
আশ্চর্য্য ভিত্তি গড়িয়াছেন। আজি যে  
প্রশান্তহৃদয়া স্রোতস্বিনী লক্ষ লক্ষ প্রা-  
ণীর উপজীব্য এবং সমগ্র একটি দে-  
শের সুখ ও সৌভাগ্যের ভার বক্ষে  
ধারণ করিয়া গর্ব্বভরে বহিয়া যাইতেছে,

এক সময়ে তাহা অতি ক্ষুদ্র একটি  
রক্তরেখা মাত্র ছিল; প্রকৃতি সেই রক্ত-  
রেখাটিকেই ধীরে ধীরে কি না করিয়া তুলি-  
য়াছেন! আবার, যুগান্তের পরে যে  
বিপ্লব ঘটিবে, যে বিপ্লবে কত কি উ-  
চ্ছিন্ন যাইবে, কত কি উন্মূলিত হইবে,  
—যে বিপ্লব কোথাও প্রলয়পায়োধির তি-  
মিরান্নত তরঙ্গমালার ন্যায় ভয়ঙ্কর রাবে  
গর্জন করিবে, কোথাও কালের সর্বসং-  
হারিণী মূর্তিতে জগতের স্তম্ভর ও কুৎসিত,  
স্তায়ী ও অস্থায়ী, দ্রব ও ঘন সমস্ত বস্তু  
লইয়া কৌড়া করিতে রহিবে,—যাহার  
স্বাস প্রস্থাসে অনন্ত অশনিপাত, যাহার  
স্বাবর্তে আবর্তে অনন্ত জ্যোতিরাবর্ত ক্ষু-  
টিত ও আলোকিত হইতে থাকিবে, প্র-  
কৃতি এখনই তিল তিল করিয়া তাহার  
শক্তি সঞ্চয় করিতেছেন,—ধীরে, নিস্তব্ধ  
ভাবে, তাহার কারণ পরম্পরার শৃঙ্খল  
গাঁথিছেন,—কেহ দেখে না, দেখিয়াও কেহ  
বুঝে না এমন রূপে তাহার উপকরণ সং-  
গ্রহে রত রহিয়াছেন। ইহাই সহিষ্ণুতা।  
যদি অনন্ত শক্তিও সাধনা ব্রতে এইরূপ স-  
হিষ্ণু হইতে পারে, মনুষ্য কি তবে অস-  
হিষ্ণু হইবে?

হায়! যে দেশে বাবদুকতাই ক্রমশঃ  
রুদ্ধি পাইতেছে, আর সাধনা ক্রমশঃই বি-  
লুপ্ত হইতেছে, সে দেশে কাহার আর কিসে  
সিদ্ধি হইবে? যে দেশে প্রত্যেকেই শতমন্ত্রে  
দীক্ষিত এবং মন্ত্র রক্ষায় সকলেই অশি-  
ক্ষিত, যাহাদিগের মধ্যে পরস্পর-বিদ্বেষ ও

আক্ষফালনের নাম উৎসাহ, চীৎকারের নাম উদাম, অঞ্চলবায়ু-সেবনের নাম আত্মোৎসর্গ এবং অবিচলিত নিদ্রার নাম অধাবসায়, তাহাদিগের আর ভরসা কোথায়? যাহার প্রাণঃস্বর্ষের অভ্যুদয়ে যে কার্যের কল্পনা করে, সন্ধ্যা হইতে না হইতেই তাহার ফল-ভোগের জন্য ব্যস্ত হয়,—এক রাত্রিতেই

রোম নির্মাণ করিতে চাহে, খৃষ্টদেবের পৃথিবী জীবনের সকল ব্যাপার সম্পাদন করিয়া কীর্তিশৈলে আরুঢ় হইয়া বসে, তাহাদিগের আর আশা কি? তবে জানি না, কবে সাধকের পুনরুদয় হইবে,—কবে আবার সাধনা পুনঃপ্রবর্তিত হইয়া অন্ধকারকে আলোক করিবে।

## বিরজা

ষষ্ঠ অধ্যায়।

রাত্রি প্রভাত হইল। সকলের অগ্রে ভবতারিণী খিড়কির ঘাটে গিয়াছেন। বায়ুর হিলোলে নবীনমণির মৃতদেহ ঘাটের দক্ষিণ পাশে আনিয়াছে। ভবতারিণী প্রথমেই মরা মানুষ জলে ডাসিতে দেখিয়া শীহরিয়া উঠিলেন। তিনি ভয় পাইলেন, কিন্তু তাঁহার পাদসঞ্চার হইল না; স্তম্ভিতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ইচ্ছা, পশ্চাৎ সরিয়া বাটীতে যান, কিন্তু পদযুগল তাঁহার ইচ্ছার অনুগত হইল না; তিনি দণ্ডবৎ স্থির রহিলেন। যতক্ষণ সেই মৃতদেহের প্রতি তাঁহার চক্ষু রহিল, ততক্ষণ একপদও পশ্চাৎ সরিতে পারিলেন না। এক্ষণে চক্ষু অন্যদিকে পতিত হইল, অমনি তিনি পশ্চাৎ সরিতে আরম্ভ করিলেন। খিড়কির দ্বার পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে গেলেন; দ্বার অতিক্রম করিবামাত্র উৰ্দ্ধ্বাঙ্গে দৌড়িয়া একবারে আপন কক্ষে প্রবিষ্ট হই-

লেন। গোবিন্দ পত্নীর এতাদৃশভাবে গৃহপ্রবেশ দেখিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া জি-জ্ঞাসিলেন ‘রক্তাভটা কি? এমন করিয়া দৌড়িয়া আসিলে যে?’ ভবতারিণী ঘন-নিশ্বাসত্যাগজনিত অস্পষ্টস্বরে কহিলেন, ‘ঘাটে মড়া ভাসছে।’

‘ঘাটে মড়া ভাসছে?’

‘হাঁ, দেখ সে।’

‘তুমি আর কিছু দেখেছ?’

‘না; মড়া ভাসছে। চল দেখ্বে এখন।’

গোবিন্দচন্দ্র দেখিতে চলিলেন। ভবতারিণী তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। যাইবার সময়ে ভব নবীন মণির শয়নকক্ষের জানালায় আঘাত করিয়া নবীনকে ডাকিলেন। উত্তর না পাওয়াতে কহিলেন, ‘আবাগি, ওঠ, ওঠ, দেখ্বে ঘাটে মড়া ভাসছে।’ এই বলিয়া দ্রুতপদে স্বামির অনুগমন করিলেন। তাঁহার যাইবার পূর্বে গোবিন্দ ঘাটে

পক্ষিরা গালে হাতদিয়া ভাবিতেছিলেন। ভবকে তাঁহার গালে-হাতদিয়া ভাবিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হইল না; তিনি এখন চিনিতে পারিলেন যে, নবীনের দেহ জলে ভাসিতেছে। ভব উত্তরবে কাঁদিতে উদাত হইলে গোবিন্দ তাঁহার মুখে হাত দিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে নিষেধ করিলেন। ভব কাঁদিলেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে বাড়ীর সকলেই জানিল যে, নবীন জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। আরো দেখা গেল যে, বিরজা নাই; তাহার টিনবাক্স খুলিয়া দেখা গেল, তাহার গহনার কোটাও নাই। তখন স্পষ্ট জানা গেল যে, বিরজা পলায়ন করিয়াছে; বিরজা যখন পলাইয়াছে, তখন তাহা হইতেই নবীনের প্রাণনষ্ট হইয়াছে। গঙ্গাপর সে রাত্রি বাহিরে শুইয়াছিল; সে বলিল, আমি নবীনকে ও বিরজাকে রাত্রি থালা হাতে করিয়া ঘাটে যাইতে দেখিয়াছিলাম। তখন সকলেরই বিশ্বাস হইল যে, বিরজাই নবীনকে মারিয়া ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। গঙ্গাপর তাহাও পনি থানায় সংবাদ দিতে গেল। পাড়ার সকল লোকে জানিল। নবীনের দেহ পুষ্করিণীতে ভাসিতে লাগিল; চৌকিদার তীরে বসিয়া চৌকি দিতে লাগিল।

গৃহিণী শোক করিতে বসিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি কেন এ পাপ ঘরে আনিয়াছিলাম। এ হইতে আমার সর্বনাশ হইল; কুলে কলঙ্ক হইল! আমার

বাণীতে যাহা কখনও হয় নাই, তাহা হইল। ভবতারিণীও অনেকক্ষণ রোদন করিলেন। তাঁহার অনেকক্ষণ রোদন করিবার কারণ এই যে, তিনি নবীন ও বিরজা, উভয়কেই অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল না যে, বিরজা নবীনকে বধ করিয়াছে। তিনি গঙ্গাপরের চরিত্র বিলক্ষণ জানিতেন; আরও জানিতেন যে, গঙ্গাপরের বিরজার প্রতি অসম্প্রতি জন্মিয়াছে; তজ্জন্য দুই একবার বিরজাকে সাবধানও করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘বিরজে! সাবধান, ভয় পিছনে লাগিয়াছে।’ তাহাতে বিরজা বলিয়াছিল, ‘ভয় নাই, দিদি!’ বিরজা বয়সে ছেলে মানুষ বটে, কিন্তু ধর্মভয় আছে। তাঁহার অনেক কথা মনে পড়িল। কোন্ দিন গঙ্গাপর বিরজার প্রতি কি প্রকার মানুরাগ দৃষ্টিপাত করিয়াছিল, তাহাতে বিরজা কেমন করিয়া ঘোমটা টানিয়া মরিয়া পড়িয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। গঙ্গাপর নবীনের প্রতি সচরাচর কি প্রকার বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়াছিল; নবীন গঙ্গাপরের অসদ্ব্যবহারে কি প্রকার খেদ করিত, তাহাও মনে পড়িল। তিনি গৃহকথা ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে, ভাবিতে—আবার ভাবিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। বাড়ী নিতান্ত শূন্য ও শোকপরিপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল। সকলেরই মুখে বিষাদের চিহ্ন, সকলেই শোকাকুল। গোবিন্দ-চন্দ্র শোকে ও লজ্জায় অধোমুখে বাহির

বাড়ীতে বসিয়া হুঁকা টানিতে লাগিলেন । কলিকায় আগুন নাই, টানে ধুমা বাহির হয় না ; তখাচ তিনি হুঁকা টানিতে ও দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । গ্রামস্থ প্রাচীনদের মধ্যে কেহ কেহ কাছে বসিয়া তাঁহাকে সাশ্রুনা করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের বাক্যব্যয় মাত্র সার হইল । কেন না তাঁহাদের সাশ্রুনাশ্রুচক বাক্যসকল গোবিন্দচন্দ্রের কণে প্রবেশ করিয়াছিল কি না, সন্দেহ । কাহারও কথায় শোক নিরুত্তি হয় না । সময়ই একা শোক নি-বারণ করিতে পারে । শোক যত বড়ই হউক না কেন, সময়ে শমতা প্রাপ্ত হয় ।

বৈকালে হরিপুরের থানার নাএব-দারোগা লোক জন সঙ্গে করিয়া তদারক করিতে আসিলেন । তিনি তদারক করিয়া রিপোর্ট করিলেন যে, বিরজা হইতেই এ কর্ম হইয়াছে । মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরও সেই প্রতিতি হইল । তিনি বিরজার আ-কৃতি বর্ণনা করিয়া ইস্তিহার জারি করিলেন ; আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কেহ বি-রজাকে ধরাইয়া দিতে পারিবে, সে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পাইবে । থানার থা-নার এই কথা প্রচার করিয়া দেওয়া হইল ।

এই ঘটনার গঙ্গাধরের চরিত্র এক-বারে পরিবর্তিত হইল । সে এখন আর গ্রামের গাঁজা ও গুলিখোরদের সঙ্গে মিশে না । ব্যবসায়ী অলসদের সঙ্গে দি-বারাত্র তাস পিটিয়া ও বড়ে টিপিয়া সময় নষ্ট করে না । কিন্তু বাড়ীরও কোন কর্ম

করে না । বাহির বাড়ীতে বসিয়া মনে মনে কি ভাবে আর কেবল তামাকের সর্বনাশ করে । স্নান করিতে গেলে গামছা কাঁধে-করিয়া ঘাটে বসিয়া ভাবে, আহা-রে ব-সিলে ভাবে, শয্যা শুইয়া ভাবে । স-দাই তাহার বিষম বদন । ইহা দেখিয়া বাড়ীর সকলে মনে করিল যে, গঙ্গাধর যদিও নবীনকে মুখে ভালবাসা দেখাইত না, তথাপি মনে মনে ভাল বাসিত । এ-খন তাহার শোকে গঙ্গাধরের এ দশা হ-ইয়াছে । গৃহিণী গঙ্গাধরকে আপনার কুঠরীর এক অংশে শয্যা করিয়া দিলেন । গঙ্গাধর সেইখানে শুইত । রাত্রে সে এক একবার চমকিয়া উঠিত ।

ক্রমে বৎসরেক অতীত হইল । বা-ড়ীতে যে কাণ্ড হইয়াছিল, সকলে তাহা এক প্রকার বিস্মৃত হইলেন । গোবিন্দচন্দ্র গঙ্গাধরের আবার বিবাহ দেওয়া স্থির ক-রিলেন । সহস্র দুশ্চরিত্র হইলেও এদেশে—এদেশে কেন ? এসংসারে—পুরুষের বি-বাহের কোন অন্ত্রবিধা নাই । অধিকাংশ স্থলে—লোকে পুরুষের রূপ দেখে না, গুণ দেখে না, চরিত্র দেখে না ; কেবল দেখে কুল ও ধন । গঙ্গাধরের তাহা ছিল ; কুল ছিল, ধন অধিক ছিল না বটে, কিন্তু যাহা ছিল, তাহা যথেষ্ট । অনেক স্থলে বিবাহের কথা হইল । গোবিন্দচন্দ্র স্বয়ং দুই এক স্থলে কন্যা দেখিতে গেলেন । অনেক স্থলে কন্যা দেখিবার পর একস্থলে একটি মনের মত পাওয়া গেল । বিবা-

হের বিষয় সকলই স্থির হইল। কেবল দিন ধার্য্য হওয়া বাকি। এমন সময়ে গঙ্গাধর একদিন নিষ্কণ্ঠে। গ্রামস্থ কোন বাড়ীতে তাহাকে পাওয়া গেল না। গ্রামান্তরে কুটুম্ব বাড়ীতে সন্ধান করা গেল, সেখানেও পাওয়া গেল না। দুই মাস অনুসন্ধান হইল, গঙ্গাধরের উদ্দেশ্য আর পাওয়া গেল না। শেষে স্থির হইল, গঙ্গাধর মনের দুঃখে উদাসীন হইয়াছে। গৃহিণী কহিলেন, ‘আহা, বাছা আমার বউয়ের শোকে বাহির হইয়া গেল!’

০২০০০০

### সপ্তম অধ্যায়।

ঐতিহাসিক কালের বাভৌগোলিক পন্থার অনুসরণ করা উপন্যাস রচনার প্রথা নহে। অতএব সময়—গঙ্গাধর নিষ্কণ্ঠের দুই বৎসর পর; স্থান—কলিকাতার জেনেরেল পোষ্টাফিস।

ডাকঘরের নিয়ম এই, যে সকল পত্র বিলি হয় নাই ও বিজ্ঞাপন দিলেও যে সকল পত্র কেহ লইয়া যায় না, তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করা হয়। একজন বাবু তাহা খুলিয়া দেখিয়া দেন, তাহাতে কোন মূল্যবান বস্তু আছে কিনা। বাবু আজি অনেক পত্র দেখিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে এক খানি বাঙ্গালা পত্র তাঁহার হাতে পড়িল। পত্রখানি মোটা জীরামপুরী কাগজে লিখিত হইয়াছিল। বাবু পত্রখানি খুলিলেন, দেখেন, তাহাতে জীলোকের নাম স্বাক্ষরিত।

তিনি পত্রখানি পকেটে রাখিয়া দিলেন; মনে মনে বলিলেন, এ কোন মেয়ে মানুষের প্রণয় পত্রিকা হবে, বাসায় গিয়া পাঠ করিব। পত্রখানি পকেটে রহিল। তিনি আপন কর্ত্তব্য ব্যাপ্ত হইলেন।

এই বাবুর বাসা সিমলায়। বাবু অপরাহ্নে বাসায় আসিয়া! আহা! আশ্চর্য্যে বি-শ্রাম করিতেছেন। এমন সময়ে সেই পত্রের কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি পত্রখানি পকেট হইতে বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন।

এই বাবুর বয়ঃক্রম প্রায় ত্রিশ বৎসর। এবয়সে বাঙ্গালি বাবুরা অবিবাহিত থাকেন না। কিন্তু ইনি বিবাহ করিয়াছেন কি না আমরা জানি না। ক্রমে জানা যাইবে।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে বাবুর ললাট দেশ স্বেদার্ত্ত হইল, বদনে আনন্দ, বিষয় প্রভৃতি নানা মানসিক ভাবের প্রতিবিম্ব অঙ্কিত হইতে লাগিল। যে পত্র পড়িয়া বাবুর মনে এরূপ ভাবোদয় হইল, আমরা তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

“জীমতী ভবতারিণী দেবীর জীচরণেশু আপনারা জানেন, আজি দুই বৎসর ধরিয়া আমি নিষ্কণ্ঠে। আমি কাহাকে না বলিয়া আপনাদের বাটী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। কারণ কি? পাছে নবীনকে খুন করিয়াছি বলিয়া আপনারা আমাকে পুলিশে দেন। কেন না নবীন আর আমি এক সঙ্গে ঘাটে গিয়াছিলাম,



ভোর রাত্রে নবীনের দেহ জলে ভাসিয়া উঠিল ; আমার প্রতি সকলের সন্দেহ । আমি যদি বলিতাম, আমি নবীনকে খুন করি নাই, কে বিশ্বাস করিত ? নানা কারণে লোকে আমার প্রতি সন্দেহ করিত । এই জন্য আমি পলাইয়া আসি ।

কিন্তু আজি বলিতেছি আমি নবীনকে খুন করি নাই । আজি বলিতেছি, নবীনকে আমি মারি নাই ; আমি তাহাকে প্রাণের সমান ভাল বাসিতাম । কিন্তু তাহার মরণে নিজের প্রাণভয়ে আমি তখন প্রাণ তরিয়া কাঁদিতেও পারি নাই । তাহার পরে কাঁদিয়াছিলাম ।

গজাধর বাবু ভয়ানক পীড়িত হইয়া কলিকাতার ডাক্তার খানায় আইসেন । মরণকালে তিনি সমস্ত স্বীকার করিয়াছেন । নবীন আর আমি এক সঙ্গে যাটে গিয়াছিলাম সত্য; বাগানে তাল পড়াতে নবীন আমাকে তাহা কুড়াইতে বলে, আমি তাল কুড়াইতে যাই ; তাল খুঁজিতে আমার বিলম্ব হয়, তখন নবীন গা ধুইতেছিল । ইতিমধ্যে গজাধর বাবু যাইয়া নবীনকে জলে ডুবাইয়া ধরেন । যতক্ষণ সে জলের ভিতরে নড়িল, ততক্ষণ ছাড়িলেন না । আমি তাহাকে উঠিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম । কিন্তু একথা আমি বলিলে তখন কে বিশ্বাস করিত ? গত কল্য প্রাতঃকালে গজাধর বাবুর মৃত্যু হইয়াছে । মৃত্যুকালে তিনি আমাকে বাচাইয়া গিয়াছেন । আরো শুনলাম, তাহার কথা সকল হাস-

পাতালের বড় সাহেব লিখিয়া আপনাদের জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, সুতরাং আমি এখন মুক্ত ।

আমি আর আপনাদের বাটীতে যাইব না ; আর কি করিতে যাইব ? আর সে নবীন নাই ? কাহার সঙ্গে প্রাণ তরিয়া কথা কহিব ? গজাধর বাবু আরো বলিয়াছেন যে আপনার শাশুড়ীর পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে । সুতরাং আর কাহাকে রামায়ণ পাড়িয়া শুনাইব ? আপনাদের বাটীতে আর যাইব না । কিন্তু আপনাকে ভগিনীর মত ভালবাসি তাহা জ্ঞানেন, বড়বাবু যখন কলিকাতায় আসিবেন, শিবনাথ ডাক্তারের বাসায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিবেন, আপনার ছেলেদের জন্য কিছু জিনিষ দিব ।

আমি আপনাদিগের দয়া প্রাণ থাকিতে তুলিতে পারিব না । বলিতে কি, আপনার স্বর্গীয়া শাশুড়ী আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন । তিনি যদি আমাকে গজাধর হইতে তুলিয়া লইয়া না যাইতেন, আমি সেই রাত্রে পুকুর পাইতাম । কিন্তু আমার মৃত্যুই ভাল ছিল । আজি আট বৎসর, স্বামির উদ্দেশ্য পাইলাম না । তিনি কি নৌকা ডুবিতে মরিয়াছেন ? তবে বিধাতা আমাকে বাঁচাইয়া রাখিলেন কোন্ বিবেচনায় ? বোধ হয়, তিনি মরেন নাই, নৌকার একজন বাজাল মারি বলিয়াছিল, সে তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে । দিদি আ-

মার ঘন বলে, তিনি বাঁচিয়া আছেন।  
মুশীলের বাপকে বলিবেন, যদি বিপিন  
বিহারী চক্রবর্তী নামে কোন লোকের স-  
জ্ঞান পান, তাঁহার কাছে যেন আমার বি-  
বরণ বলেন। দিদি এখন পত্র শেষ করি।

আমি সেই বিরজা।”

পত্রখানি একবার, দুইবার, তিনবার  
পড়া হইল। তিনবারের পর বাবু পত্রখানি  
ভাকিরার উপরে রাখিয়া একটি দীর্ঘনি-  
শ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। কোন কোন  
লোকের স্বভাব এই, একটি গুরুতর বিষয়  
উপস্থিত হইলে বহুক্ষণ বহুদিন অগ্রপ-  
শ্চাৎ বিবেচনা করেন, ভবিষ্যৎ ভাবেন।  
এমন লোক প্রায় কোন বিষয়ে ক্লতকার্য্য  
হয়েন না। আমরা যে বাবুটির কথা বলি-  
তেছি, ইনি এরূপ স্বভাবের লোক ছি-  
লেন না, ইনি একেবারে কর্তব্য স্থির করি-  
লেন। উঠিয়া কামিজটি পড়িয়া, চাদর  
ও যষ্টি লইয়া বাটীর বাহির হইলেন।  
যাত্রাকালে পত্রখানি সঙ্গে লইলেন।

ডাক্তার শিবনাথ বাবু কলিকাতার  
মধ্যে ডাক্তারি কার্য্যে বড় বিখ্যাত লোক  
ছিলেন না। কলিকাতায় অনেক ডাক্তার  
আছে, হাইকোর্টের অনেক উকিলের ম-  
তন তাহাদের বাসাখরচ পর্য্যন্ত চলে না।  
শিবনাথ বাবু এদলের ডাক্তার নহেন,  
কিন্তু একজন বিখ্যাত ডাক্তারও নহেন  
তাহার প্রতিবাসী, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ছাড়া  
অন্যে বড় তাহাকে ডাকে না; হাসপা-  
তালে যে বেতন পান তাহাতে স্বচ্ছন্দে

চলে। শিবনাথ বাবু এক সময়ে ব্রাহ্ম ছি-  
লেন, গোপনে যজ্ঞোপবীতও ত্যাগ করি-  
য়াছিলেন, কিন্তু শুনিতে পাই, মাতার মৃত্যুর  
পর আবার হিন্দু হইয়াছেন। ব্রাহ্ম হইয়া  
স্ত্রীকে বিলক্ষণ লেখা পড়া শিক্ষাইয়া-  
ছিলেন, এবং অনেকটা স্বাধীনতাও দিয়া-  
ছিলেন; এখন হিন্দু হইয়া সে স্বাধীনতা-  
টুকু কাড়িয়া লইতে পারেন নাই। এখন  
আপত্তিকর ভক্ষ্য অপেক্ষাকৃত অধিক প-  
রিমাণে ভক্ষণ করা হয়; কিন্তু তাহাতে  
কোন দোষ নাই; কেননা হিন্দুধর্ম্মের আ-  
বরণ অঙ্গে আছে। সে যাহা হউক, শিব  
নাথ বাবু বড় ভদ্র লোক, তাহার পত্নী  
কাত্যায়নীও বড় দয়াবতী ও মুশীলা।  
আমাদের বিরজা ইহাদের বাড়ীতে থাকে।  
যে বয়সে ইংরেজ পুরুষ ও কামিনীদিগকে  
যুবকযুবতী বলা যায়, শিবনাথ বাবু ও কা-  
ত্যায়নীর সেই বয়স; অর্থাৎ চল্লিশ ও  
পঁয়ত্রিশ। বিরজা শিবনাথ বাবুর বাড়ীতে  
সামান্য পরিচারিকার ন্যায় থাকে না;  
শিবনাথ বাবুর হুটি কন্যাকে শিক্ষা দেওয়া  
বিরজার কর্তব্য কর্ম্ম

পুনঃ পুনঃ ধর্ম্ম পরিবর্তনে শিক্ষিত স-  
মাজে শিবনাথ বাবুর নাম রাষ্ট্র হইয়া  
যায়। আমরা পূর্বে যে বাবুর কথা ব-  
লিতেছিলাম, গোবরগুলি নিবন্ধন তিনিও  
শিবনাথ বাবুর নাম শুনিয়াছিলেন।

রাত্রি দশটার পরে শিবনাথ বাবুর  
দ্বারবান উপরে যাইয়া সংবাদ দিল যে,  
একটি বাবু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক-

রিতে আসিয়াছেন । শিবনাথ বাবু তৎকালে আহাৰাদি করিয়া সর ওয়ান্টার স্কটের আইবানহো নামক আখ্যায়িকা পাঠ ও ভাষার অর্থ পত্নীকে বুঝাইয়া দিতেছিলেন, এবং এই পুস্তকের কোন্ কোন্ চিত্রের সহিত বান্ধব উপন্যাস বিশেষের কোন্ কোন্ চিত্রের সাদৃশ্য আছে তাহাও বলিতেছিলেন । ভগবতী যেমন মহাদেবের মুখে অনন্যমনে যোগকথা শ্রবণ করিতেন, পতিপ্রাণা কাত্যায়নী তদ্রূপ কাপেট বুনিতে বুনিতে শ্রবণ করিতেছিলেন । ঈশ্বরবান্ সন্বাদ দিলে শিবনাথ বাবু পুস্তক বন্ধ করিয়া নীচে গেলেন ।

নীচেকার বৈঠকখানায় আগন্তুক বাবু বসিয়াছিলেন, শিবনাথ বাবু তথায় যাওয়া বসিলেন । আগন্তুক জিজ্ঞাসিলেন, ‘মহাশয়ের নাম শিবনাথ বাবু ?’

‘আজ্ঞা হাঁ’

‘কি প্রয়োজনে আসা হইয়াছে ?’

‘এই পত্রখানি পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন ?’

এই বলিয়া আগন্তুক ডাক্তারের হাতে পত্রখানি দিলেন, শিবনাথ বাবু প্রদীপের নিকট সরিয়া গিয়া পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন ।

দীর্ঘ পত্র পড়িতে একটু সময় লাগিল । পড়া শেষ হইলে পত্রের যে পৃষ্ঠায় বিপিন বিহারী চক্রবর্তীর নাম উল্লেখ ছিল, সেই পৃষ্ঠা উন্টাইয়া শিবনাথ বাবু

জিজ্ঞাসিলেন, ‘আপনার নাম কি বিপিন বাবু ?’

‘আমার নাম বিপিন বিহারী চক্রবর্তী—আমি বিরজার স্বামী ।’

‘এখন আপনার অভিপ্রায় কি ?’

‘আমি বিরজাকে গ্রহণ করিতে চাই ।’

‘আপনি সেই অবধি বিবাহ আর করেন নাই ?’

‘করি নাই—করিতামও না ।’

‘শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম । আমি বিরজার বিবরণ সমস্ত শুনিয়াছি । আপনার অনেক অনুসন্ধান গোপনে গোপনে করিয়াছি, কিন্তু উদ্দেশ্য পাই নাই । বিরজা অতি মতী লক্ষী মেয়ে, আমার ব্রাহ্মণী বিরজাকে আপনার কন্যাবৎ স্নেহ করেন । তবে বিরজাকে ত সহসা বিদায় করিতে পারি না । বিরজা আমার কন্যাসদৃশী, আপনি জামাতা ; যেমন করিয়া কন্যা বিদায় করিতে হয়, তেমনি করিয়া বিরজাকে বিদায় করিব ।’

‘আপনি যে সম্পর্ক পাতিলেন, ইহাতে অধিক কথা বলিতে পারি না ; তবে এই মাত্র বলিতে চাই যে, অদ্য একবার আমি কি বিরজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি না ?’

‘অবশ্য পারেন । আপনি বহুদূর, আমি বাড়ীতে এ সংবাদ দি ।’ বলিয়া তিনি অন্তঃপুরে যাইয়া পত্নীকে সমস্ত বলিলেন । তিনি বিরজাকে ডাকিয়া জি-

জাসিলেন, ‘বিরজে, বিপিনবিহারী চক্র-  
বর্তীকে তুমি চিন ?’-বিরজা শীহরিয়া উ-  
ঠিল; আনন্দ ও বিস্ময়ে বিরজাকে পরাভূত  
করিল; ক্ষণেক কাল স্তম্ভিতের ন্যায় থা-  
কিয়া বিরজা উত্তর করিল, ‘আমার স্বা-  
মির ঐ নাম।’

‘তঁাহাকে দেখিলে এখন তুমি চি-  
নিতে পারিবে?’

‘পারিব’ বলিয়া বিরজা কাঁদিয়া  
ফেলিল।

‘আমি তঁাহাকে উপরে লইয়া আসি’  
বলিয়া শিবনাথ বাবু নীচে গেলেন।

গৃহিণী বিরজাকে কহিলেন, তিনি তো-  
মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন।

### অষ্টম অধ্যায়।

আশার আশ্বাস মাত্রে যে মিলন এ-  
তদিন বিলম্বিত ছিল, বহুদিন পরে, যু-  
গান্ত্রে, গভীর নিশীথে দম্পতীর সেই মি-  
লন কি সুখের সামগ্রী। শিবনাথ বাবুর  
দোতালার বারেন্দায় আজি সেই গভীর  
আনন্দময় মিলন। বিপিনবিহারীর পদ-  
প্রান্তে বিরজা কাঁদিতেছেন, আর নিশী-  
থিনীলক্ষ চক্ষু মেলিয়া তাহাই দেখিতেছে।  
বিপিনবিহারী উদাসীনের মত স্পন্দরহিত,  
রবরহিত দণ্ডায়মান আছেন। যে পূর্ণ-  
চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে সে উদাসীন।  
পূর্ণতার আজি বিপিনবিহারী উদাসীন।

সহৃদয় শিবনাথ নিরর্থক শব্দ করিয়া  
গৃহহইতে গৃহান্তরে গমন করিলেন। ভ-

খন বিপিন বিরজার চমক হইল। তখন  
বোধ হইল যে সংসারে এরূপ মিলন অ-  
নন্তকাল স্থায়ি নহে। ক্রমে আরও বোধ  
হইল যে, একবার সর্ব সমক্ষে উভয়ে উ-  
ভয়ের পরিচয় লওয়া আবশ্যক।

বিরজা অগ্রেই কথা কহিলেন; ‘আমি  
যে এখানে আছি, আপনি কেমন করিয়া  
জানিলেন’ বলিয়া এতক্ষণ পরে বিরজা  
চক্ষু মুছিবার চেষ্টা করিলেন। আবার জল  
বেগে উছলিয়া উঠিল, মনে মনে ভাবিলেন  
‘হায় আমি এমন কপালও করিয়াছিলাম,  
এই প্রীতিপূরিত হৃদয়ের প্রথম সম্বোধনে  
হৃদয়েখরকে এমন করিয়া সম্ভাষণ করিতে  
হইল।’

বিপিনবিহারী এখনও নীরব; তিনি  
বিরজার পত্র বিরজাকে প্রদান করিলেন।

বিরজা জিজ্ঞাসা করিলেন এ পত্র আ-  
পনাকে কি ভবতারিণী দিদি দিয়াছেন?  
বিপিন বলিলেন ‘না’। একটি কথার পর  
দশটি কথা বলা অতি সহজ। এখন বিপিন  
বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘ভবতারিণী’  
তিনি কে? তুমি তাঁহাদের বাড়ী কতদিন  
ছিলে? সেখান হইতে তুমি তাঁহাদের না  
বলিয়া কোথায় গিয়াছিলে? আমি প-  
ত্রের সকল কথা বুঝিতে পারি নাই।’

বিরজা আবার অশ্রু সংবরণ করিতে  
পারিলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,  
‘আমি হতভাগী একটা সংসার মজা-  
ইয়াছি; আমার হৃদয়দৃষ্ট বশে একটা রহৎ  
সংসার হতভাগী হইয়াছে। ভবতারিণী দি-

দীর দেবর আমাকে কলুষিত চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন ।’ বিরজা কণেক নিস্তব্ধ হইয়া রছিলেন, বিপিন বিহারী পার্শ্বস্থ একখানি চৌকিতে উপবেশন করিলেন ।

বিরজা বলিতে লাগিলেন ‘আমি তাঁহার পত্নী নবীনমণিকে প্রাণের মত ভাল বাসিতাম, আর ভবতারিণী দিদী আনাকে স্বীয় অনুজ্ঞা ভগিনীর মত ভাল বাসিতেন । আমরা নবীনমণির স্বামীর অসৎ অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সর্বদা সশঙ্কিত থাকিতাম । সে আপনার অসৎ পথ হইতে কটক দূর করিবার অভিপ্রায়ে রাত্রিযোগে নবীনমণিকে হত্যা করে । আমি সেই রাত্রিতেই সেখান হইতে পলায়ন করি । কতভাগা কিছুদিন পরে গৃহ হইতে নিকদ্দেশ হইয়া যায়, এবং বাতুলের মত দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় । পরিশেষে সে কলিকাতার অন্যান্য রোগীদিগের আশ্রয়ে সর্ব সমক্ষে নিজ গুরুতর পাপ স্বীকার করিয়া ইহসংসার হইতে অপস্থত হইয়াছে । আমি আমার আশ্রয়দাতা শিবনাথ বাবুর মুখে সকল শুনিয়া ভবদিনীকে পত্র লিখিয়াছিলাম । সে বাড়ীতে আমি আর ইহ জন্মে মুখ দেখাইতে পারিব না । আমি সে বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ না করিলে, নবীনমণি এতদিন স্বামীসোহাগে সেই সংসারের শোভা বর্জন

করিত, আর বর্বীয়সী গৃহিণীও পুজ শোকে প্রাণ বিসর্জন করিতেন না । যখন দেখিলাম যে হতভাগার হৃদয়ে কালাগ্নি জ্বলিয়াছে, তখন কেন আমি সেই গৃহ হইতে স্থানান্তরে গেলাম না । আমি সেই গভীর রাত্রিতে পথচারিণী হইয়াছিলাম, কিছুদিন পূর্বে সেরূপ করিলে আমার আজি তোমার কাছে অনুশোচনা করিতে হইত না ।’

এবার বিরজার হৃদয়ভার অনেক লঘু হইয়াছে, তিনি মুখ ফুটিয়া কাদিতে লাগিলেন । এতক্ষণ বিপিন বিহারী প্রায়ই নীরবে ছিলেন, তিনি এখন প্রকৃত পুরুষের মত দণ্ডায়মান হইয়া, রোক্তমান্না বিরজাকে হৃদয়প্রান্তে আকর্ষণ করিয়া লইলেন, এবং বলিলেন—‘সাদি, তুমি কেন অনুশোচনা করিবে ? পবিত্রহৃদয়া অবলা প্রদীপ্ত পাবকশিখা ;—যে প্রেমের অবমাননা করিয়া পতঞ্জের মত তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িবে সেই এইরূপ পুড়িয়া ভস্ম হইবে । তবে নবীনের সারল্যময়ী প্রতিমূর্তি যে তোমার চিত্রপটে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে, এবং উহা যে অনেক সময়েই তোমাকে দৃষ্ট করিবে, তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারি । অবলা কোমলপ্রাণা, কুসুমকোমলা । ইহাতেই অবলার সুখ, ইহাতেই অবলার দুঃখ । ইহাই অবলার গৌরব, ইহাই অবলার যজ্ঞগা ।’ ( হ )

সমাপ্ত ।



## বধূর অঞ্চল।

গাওরে সকলে গাও 'বজ্রের বিজয়'  
গাও সুগভীর স্বরে, গাও ছয় কোটি নরে,  
জয়নাদে দশদিশি হোক জয় জয়  
হোক আজি স্বর্গে মর্ত্যে অকাল প্রলয়।

প্রসিয়ার বীরগর্ব যাক রসাতলে,  
কাঁপুক ইংলণ্ড বাঙ্গালির ভূজবলে,  
দাপটে অধীর হোক ফরাশির দল,  
ভয় পেয়ে ভীত হোক কসিয়ার বল;  
ঘুটিল বজ্রের ভয়, গাওরে বজ্রের জয়,  
নির্জীব ভারত হোক সজীব এখন;  
মাতুক পাশাগচয়, জলস্থল সমুদয়,  
জ্বলুক বজ্রতে আজি জ্বলন্তদহন।

কি ভয় বজ্রের, আর কি ভয় বজ্রের?  
প্রদীপ্ত প্রতিভা বলে, বাঙ্গালির করতলে;  
কামিনী-অঞ্চল-অস্ত্র অমোঘ অজয়,  
ধর অস্ত্র, মাজ রণে, কর বিশ্বজয়  
গাওরে আবার গাও 'বজ্রের বিজয়'।

নাহি অসি চর্খ, নাহি বন্দুক কামান,  
নাই তেজ, নাই বীরা, নাই ধনুর্কাণ,  
হৃদয়ে সাহস নাই, দেহে নাই বল,  
নাই বা থাকিল—আছে বধূর অঞ্চল!  
বীরত্ব গৌরব স্থল, প্রেরণী বসনাঞ্চল,

ছাড়িও না, ছাড়িও না কভু বঙ্গবাসি!  
বাজাওরে জয়ভেরী, মাজাওরে নিজনারী,  
ছড়াওরে স্বাধীনতা, হাস সুখহাসি।

নখ দস্তে সিংহ ব্যাঘ্র রণেতে ভীষণ,  
ভূজধ্বজ বরাহের সম্মল দশন,  
মদমত্ত করী করে কর আশ্ফালন,  
মেঘ মহিষের শৃঙ্গ রণে প্রহরণ,  
সারসের বায়সের চঞ্চুই সম্মল  
বাঙ্গালির ব্রহ্ম অস্ত্র বধূর অঞ্চল।

তবে কেন?—বল তবে কেন আর  
রুথা কাল হর, হও অগ্রসর,  
'বাঙ্গালি বিজয়ী' গাওরে আবার,  
কর সমাগরা ধরা অধিকার।

অর্জুনের গাভীরে নাই প্রয়োজ্ঞশ,  
জুলিয়স সিজরের, অথবা সেকন্ডরের,  
শানিত অসির ব'ণ্ডা ক'রোনা কখন;  
বাহুগু না রাইফল বন্দুক কামান  
অঞ্চলের নিধি! কর অঞ্চলের ধ্যান।

কিসের অভাব তবে বঙ্গ যুবকের?  
সাহিত্য বিজ্ঞান গণিত দর্শন;  
লোক ব্যবহার নীতি বিবরণ,

অস্ত্র পাশপত, চক্র শূদর্শন,  
গদা কৌমোদকী, অশনি ভীষণ,  
বজ্র কুলবধূদের আঁচলের কোণে ;  
ভুবনে অতুল বজ্র আঁচলের গুণে,  
বল আর বাজালির অভাব কিসের ?

পিতৃভক্তি ভ্রাতৃস্নেহ দূরমপসর,  
ভগিনীর প্রতি প্রীতি প্রকাশে কি কাজ ?

চিরস্তন সমাজবন্ধন ছিন্ন কর,  
দূর কর লজ্জাবতী রমণীর লাজ ;  
হউক উজ্জ্বল বজ্র যশের কিরণে  
যুগ্মক বজ্রের যশ সমগ্র ভুবনে ।

স্বর্গাদপি গরীরসী সুহৃৎপ্রবাহিনী  
কে বলিবে এজগতে কেবলি জননী ?  
আছে ভক্তি-প্রীতি-স্নেহ-আদরের ধনি,  
প্রাণাধিকা প্রণয়িনী নয়নরঞ্জিনী ;  
যার চঞ্চল অঞ্চলে, বিলম্বিত কুতূহলে,  
রসাল বাহালি, সেই বজ্র বধূ কুল,  
একমাত্র বাজালির উন্নতির মূল ।

ললিত লতিকা শোভে কিসকল দলে,  
সুদৃশ্য পাদপচয় ফুল ফুল ফলে,  
নব দুর্ন্দাদলে শোভে শিশিরের বিন্দু,  
শায়দ গগনে শোভে সুবিমল ইন্দু,  
আবার—

শশীসহ তারাদলে নিশি শোভা পায়,  
কামিনীর কণ্ঠ শোভে মুকুতামালার,  
নুপুর সিঞ্জে শোভে নর্তকীচরণ,  
বধুর অঞ্চলে শোভে বজ্রবাসিগণ ।

আর কি ভাবনা,—তবে আর কি ভাবনা ?  
কর মন্ত্রপুত আঁচলের কোণা ;  
ছুটিবে বিহ্বাতরাশি, কাঁপিবে ত্রিলোকবাসী,  
দেব দৈত্য নর গন্ধর্ব্ব কিয়র,  
যক্ষ রক্ষ আদি কাঁপিবে সকল,  
ঝলসিবে চক্ৰ, ঘুড়িবে মন্তক,  
মানিবে সভয়ে সবে পরাজয়,  
বাজিবে অস্ত্রের বিজয় ঝঞ্ঝনা  
হইবে অচিরে বিজয় ঘোষণা ।

তাই বলি—

দম্ভভরে যেতে উঠ বজ্রবাসিগণ !  
প্রচণ্ড প্রতাপ তাপে, ভয়ঙ্কর বীরদাপে,  
ভূজলগ্নের প্রভাবে, হৃদয়ের উষ্ণভাবে,  
টলুক কৈলাসপুরে শূলীর আসন ;  
কাঁপুক অবনী বোম, খসুক আদিত্য সোম,  
পড়ুক নক্ষত্র পুঞ্জ হয়ে কক্ষচ্যুত ;  
মাত ভীম রণমদে, ধাও সবে কিপ্রপদে,  
দেখাও বিক্রম আজি চিরনির্ব্বাপিত ।

কি ভয় ?

ক্রান্তকলেবর যবে হইবে আহবে,  
ধরিয়া চিবুকখানি, বামকরে বামাজিনী,  
অঞ্চল দোলায়ে মৃদু বাতাস করিবে,  
ললাটের স্বেদজল অঞ্চলে মুছিবে,  
কি ভয় ? অঞ্চল যার সহায় এতবে ।

আক্রমে বিপক্ষ যদি হর্যাক বিক্রমে,  
আকর্ণ-পুন্নিয়া করে বাণবরিষণ,  
আঁচল সাজোরা দিয়ে, কুলতনু আচ্ছাদিয়ে

দিবে ফুলময়ী, হবে অভেদা তখন,  
আন্ত হবে শত্রুচমু শুধু পশুশ্রমে ।

অসংখ্য অরক করে সংখ্যাতীত অসি,  
দেখিয়া স্তম্ভিত ভয়ে হ'ওনা কখন ;  
ধীরে আঁচলের আঁড়ে, ধীরে দাঁড়াইবে স'রে,  
মেঘ আঁড়ে মেঘনাদ যুঝিত যেমন,

যুঝিবে তেমতি, দেখে সৌদামিনী হাসি ।  
শিরে শিরস্বাণ দিবে আঁচল টানিয়া,  
কামিনী-কটাক লবে শাণাইয়া ;  
লভিবে বিজয়লক্ষ্মী আঁচলের বলে,  
কর সিংহনাদ, ভয়ে কাঁপুক সকলে ।  
জান কি ভবের ভাব কিসে কিবা ফলে ?  
বজ্রের অব্যর্থ সন্ধি বধুর অঞ্চলে । শ্রীম

## প্রাতঃরুখান ও প্রাতঃক্রিয়া

( পূর্ব প্রকাশিতের অবশিষ্ট । )

মম্বা বাসীমুখে থাকিলে সর্বদা অ-  
পবিত্র, সেই ছেতু যত্নপূর্বক দম্বধাবন ক-  
রিবে ( ১ ) । প্রাতঃকালে নিশিঞ্জল পান  
করিয়া কোমল অথচ কষায়, কটু ও তিক্ত  
রসযুক্ত দম্বকাঠ ( দাঁতন ) দ্বারা দম্বঘর্ষণ  
কর্তব্য । কিন্তু এরূপভাবে ঘর্ষণ করিতে  
হইবে যে, তদ্বারা দম্বমাংসের ( মাড়ির )  
যেন পীড়া না হয় (২) । দম্বকাঠ মধ্যাঙ্গু-  
লির ন্যায় স্থূল, দ্বাদশাঙ্গুলি দীর্ঘ ও তুচ-  
যুক্ত হইবে । তাছাতেই দম্বধাবন করিবে (৩)  
কিংবা উহা কনীনি অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির  
অগ্রভাগের ন্যায় স্থূল হইলেও চলিতে

(১) মুখে পর্ষ্যবসিতে নিত্যং ভবতাপয়তো  
নরঃ । তস্যাং সর্বপ্রযত্নেন ভক্ষয়েদম্বধা-  
বনং ॥ ( বৃদ্ধশাতাতিপ । )—(২) প্রাত-  
ভুক্ত্য চ পানীয়ং কষায়কটুতিক্তকং ।  
ভক্ষয়েদম্বকাঠকং দম্বমাংসানাবাধয়নং ॥  
( রাজবল্লভ ) ।—(৩) মধ্যাঙ্গুলসমম্বৌল্যং  
দ্বাদশাঙ্গুলসম্বিতং । সত্বচং দম্বকাঠং স্যা-

পারে (৪) । করবীর, আত্ম, করঞ্জ, বকুল,  
ক্ষীরি, মালতী, অপামার্গ, বিশ্ব প্রভৃতির  
এবং কটকযুক্ত রক্ষমাত্রের কাঠে দম্বধা-  
বন কর্তব্য (৫) । যাবতীয় তিক্তরসযুক্ত দ-  
ম্বকাঠের মধ্যে নিম্নের দম্বকাঠই সবিশেষ  
প্রশস্ত । বঙ্গদেশোপেক্ষা উত্তর পশ্চিমা-  
ঞ্জে ও উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশস্থ লোকদি-  
গের মধ্যে অনেকেই দম্বকাঠ ব্যবহার  
করে । গুবাক, তাল, হিন্দাল, খজুঁর,  
কেতকী, নারিকেল, তেড়েং প্রভৃতি কএক  
স্তম্বাগ্রেণ চ ধাবয়েৎ ॥ ( কুর্মপুরাণ,  
উপবিভাগ, ১৭ অধ্যায় । )—(৪) কনীনা-  
গ্রনিভম্বৌল্যং সক্ষুর্চং দ্বাদশাঙ্গুলং ।  
( নরসিংহ পুরাণ । )—(৫) করবীর-  
সালশ্চ করঞ্জবকুলাসনান্ । দম্বকাঠার্থ-  
মন্যে তু সর্বশস্ত্রান্ কটিকিতান্ ॥ ( রা-  
জবল্লভ ) ।—ক্ষীরিহক্ষসমুদ্ভূতং মাল-  
তীসম্ভবং শুভং । অপামার্গঞ্চ বিশ্বঞ্চ ক-  
রবীর বিশেষতঃ ॥ ( কুর্মপুরাণ, উপবি-



প্রকার কাঠে দন্তধাবন কর্তব্য নহে (১) । এই সকল রন্ধের শিরা ( ডাঁটা ) পত্র প্রভৃতির দ্বারা দন্তধাবন করিলে, যে পর্য্যন্ত গোদর্শন না হয়, তাবৎকাল চণ্ডালঘটে (২) । দন্তমাংসে আঘাত লাগিয়া পাছে রক্তপাত ও পীড়া উপস্থিত হয়, সেই জনাই এই সকল রন্ধকাষ্ঠাদিতে দন্তধাবন নিষিদ্ধ বলিয়া নানা প্রকার শাসন সজ্জিত হইয়াছে । ইষ্টক ( ইট বা অন্য প্রকার দৃষ্টমুক্তিকাথ ) লোফ ( লৌহ-মল ) প্রস্তর ও অঙ্গুলি দ্বারা দন্তধাবনও কর্তব্য নহে । কিন্তু সময়বিশেষে যদিও অঙ্গুলিযোগে দন্তধাবন করিবার আবশ্যক ঘটে, তাহা হইলে অনামিকা ও রন্ধাঙ্গুলি যেন ব্যবহৃত না হয় (৩) । অঙ্গুলি দিয়া দন্তধাবন করিলে নখরাঘাতে দন্তমাংস ছিন্ন হইয়া যন্ত্রণা উপস্থিত হইবে বলিয়া প্রাচীন ঋষিগণ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন । কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, ভাগ, ১৭ অধ্যায় । )—(১) গুবাকতাল-হিস্তালখর্জুরৈঃ কেতকীযুতৈঃ । নারিকেলেন তাড়্যা চ ন কুর্ধ্যাদ্দন্তধাবনং ॥ ( রাজবল্লভ । )—(২) গুবাকতালহিস্তালান্তথা তাদ্ভী চ কেতকী । খর্জুরনারিকেলৌ চ সপৃষ্ঠে তৃণরাজকাঃ ॥ তৃণরাজশিরাপত্রৈর্ধঃ কুর্ধ্যাদ্দন্তধাবনং । তাবন্তবতি চাণ্ডালোষাবকাং নৈব পশ্যতি ॥ ( ক্রিষ্ণাকৌমুদী । )—(৩) নেফ্টাকালোফাষা-গৈরিতরাঙ্গুলিভিস্থখা । তন্তুনা অনামিকা-দুষ্ঠৌ বর্জয়েদ্দন্তধাবনং ॥ ( পরাশরভাষ্য

যদি দন্তকাষ্ঠের প্রচলন দোষাবহ নহে, তবে অঙ্গুলি ব্যবহার কি জন্য দোষের হইবে ? দন্তমাংসে শোণিতপাত ও পীড়ার ভয় কি কেবল অঙ্গুলিতেই হয়, দন্তকাষ্ঠে হয় না ? আমরা স্বীকার করি, তাহা হয় বটে, কিন্তু অনিষিদ্ধ দন্তকাষ্ঠের দ্বারা দন্তধাবনের সময়, যদিও সময়ে সময়ে মাড়ি ছিন্ন হইয়া পীড়া উপস্থিত হয়, কিন্তু তদ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না । নখরদ্বারা একপ্রকার বিবাক্ত স্রব্য আছে, স্তরতঃ নখর দ্বারা দন্তমাংস ছিন্ন হইলে স্বাস্থ্যহানির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা নখর-বিষের বিষয় সবিশেষ অবগত ছিলেন, এমন কি দন্তকাষ্ঠের অভাবে ও দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তমাংসের প্রতিষিদ্ধ দিবসেও অঙ্গুলি ব্যবহারে অনুমতি দেন নাই ; কেবল দ্বাদশ গণ্ডু-জল দ্বারা মুখশুদ্ধির বিধান দিয়া গিয়াছেন ( ৪ ) । দক্ষিণাস্যে দন্তধাবনে আয়ুঃকয়, পশ্চিমাস্যে রোগ, উত্তরাস্যে ও পূর্বাস্যে সম্পদ লাভ হয় (৫) । অমাবস্যা, প্রতিপদ ও নবমী তিথিতে দন্তধাবন নিষিদ্ধ ( ৬ ) । যাজবল্ক্য । )—(৪) অলাতে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনে তথা । অপাং দ্বাদশগণ্ডু-বৈমুখশুদ্ধিস্বীদীয়তে ॥—(হসিংহপুরাণ । ) (৫) যুতাস্যাদক্ষিণাসোন পশ্চিমাসোন চাময়ঃ । পূর্বাস্যোনোত্তরাসোন সম্পদে-দন্তধাবনাং ॥ ( রাজবল্লভ । )—( ৬ ) প্রতিপদর্দশমী নবম্যাঞ্জেব সন্তমাঃ । দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাসগুমং

অজীর্ণ হইলে, ব্রত বা উপবাস করিলে, এবং জন্ম, বিবাহ ও জ্ঞান দিবসেও দন্তধাবন পরিত্যাগ করা উচিত (১)। বোধ হয় অনেকে দন্তধাবনের এরূপ শাস্ত্রীয় বিধি দেখিয়া উপহাস করিবেন। বিশেষতঃ অধুনাতন নব্য বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলীর নিকট ঈদৃশী শাস্ত্রবিধি পাগলামি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু যাহারা এরূপ কথা বলিতে অগ্রসর, তাহারা একবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন যে, পূর্বতন আৰ্য্যমনীষিগণ কেবল সনাতন হিন্দুধর্মেরই চরমোৎকর্ষ স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন না, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান মিশাইয়া বুদ্ধিমত্তার প্রচুর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। যে কোন আৰ্য্যধর্মশাস্ত্র খুলিয়া দেখ, তাহার মধ্যে বিজ্ঞান মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। আবার যে কোন আৰ্য্য-বিজ্ঞান-শাস্ত্র উন্মোচন কর, তন্মধ্যে বিজ্ঞানের হাড়ে হাড়ে ধর্মের নাম উজ্জ্বলিত দেখিবে। এরূপ হইবার কারণ কি? মনুষ্য পাপের ভয়ে ও পুণ্যের লোভে ধর্মকে ভয় করে। বিশেষতঃ প্রাচীন কালে যখন সমগ্র জগৎ সরলতাপূর্ণ ছিল, তখন লোকের মনে ধর্মস্থান স্বতঃই জাগ্রত থাকিত। ধর্মোপার্জনের জন্য সকলেই আত্মবিসর্জন দিতেও কাতর হইত কুলং ॥ (হসিংহ পুরাণ)।—(১) জ্ঞান জন্মদিনে চৈব বিবাহেজীর্ণসম্ভবে। ব্রতে চৈবোপবাসে চ বর্জয়েদন্তধাবনং ॥ (বৃদ্ধশাতাভপ।)

না। এক্ষণে কালমাহাত্ম্যে ক্রমে ক্রমে ধর্মবন্ধন শিথিল হইতেছে দেখা যায়, তখন ধর্মবন্ধন শিথিল না হইয়া বরং উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইয়াছিল। অপিচ তৎকালে নীরস বিজ্ঞানের দিকে বড় কেহ আদর প্রদর্শন করিত না, বরং উহাকে তুচ্ছ ভাবিয়া উপেক্ষা করিত। সুতরাং তৎকালে মনুষ্যকে বিজ্ঞানে বিশ্বস্ত করিবার জন্য উহার সহিত ধর্মশাসন মিশ্রিত করিতে হইয়াছিল। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি বিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্যতর অংশ বলিয়া পরিগণিত। অতএব প্রাচীন ঋষিগণ যেখানে স্বাস্থ্যসম্বন্ধে যে কোন কথা বলিয়াছেন, সেইখানেই ধর্মভর দেখাইয়া উহা দৃঢ়বদ্ধ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কোন্ দিকে অভিযুখীন হইয়া দন্তধাবন প্রভৃতি স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় কার্য্য করিলে রোগ, কোন্ দিকে সম্পদ, বা কোন্ দিকে আয়ুঃকর্য্য এবং চণ্ডালত্ব, পাপগ্রস্ত বা পতিত হইতে হয়, এবং বিধি নানা প্রকার কথা লিখিত হইয়াছে। সুচতুর ঋষিগণের এই প্রকার কৌশলে প্রাচীন সময়ে সকলে ধর্মভীত হইয়া স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নবান হইত। ভারতবর্ষ ব্যতীত অত্রাশ্র দেশের চিকিৎসাশাস্ত্র সমূহ উদঘাটন করিয়া দেখ, তৎসমুদয়ে ধর্মের কোন সংশয় আছে কি না সম্ভেদ। তাহারই বা কারণ কি? আশ্রমের এক প্রকার বলিতে পারি যে, আৰ্য্যধর্ম যেরূপ উৎকৃষ্ট ও আৰ্য্যজাতি যেরূপ ধর্মভীত, সেরূপ পৃথিবীর অন্য কোন দে-

শেষ ধর্ম উৎকৃষ্ট বা তথাকার লোক ধর্ম-  
ভীক বলিয়া বোধ হয় না। ভারতবর্ষে  
ধর্মের বন্ধন নিরতিশয় দৃঢ় বলিয়াই যাব-  
তীয় বিষয়েই কোন না কোন রূপে উহা  
প্রতিভাসিত হইয়াছে। যাহা হউক, আ-  
মরা প্রাচীন ঋষিগণকর্তৃক স্বাস্থ্যের স-  
হিত ধর্মমিশ্রণসম্বন্ধে আর একটি কথা ব-  
লিব। তাঁহারা যে কেবল স্বাস্থ্যরক্ষা বি-  
ষয়ে খালি খালি ধর্মের দোহাই দিয়া  
গিয়াছেন, এমন নহে। কেন না তাঁহা-  
গের বিধিব্যবস্থাসমূহের প্রতি বিশেষ ম-  
নোযোগসহকারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে,  
তাহার নিষ্ঠুর তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।  
বিজ্ঞানবিৎ মাত্রেই অবগত আছেন যে,  
চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি গ্রহগণের সঙ্গে জীব-  
শরীরের সহিত অতি নিকট সম্বন্ধ আছে।  
তিথিবিশেষে ঐ সকল গ্রহের সংক্রমণ  
কালে মানব শরীরের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে হ্রাস  
বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এইজন্য অমাবস্যা,  
পূর্ণিমা, একাদশী প্রভৃতি তিথিতে লঘু  
আহার বা উপবাস ইত্যাদির বিধান প্রদত্ত  
হইয়াছে। এবং এইজন্যই অমাবস্যা, প্র-  
তিপৎ বসন্তী ও নবমী তিথিতে দন্তকাষ্ঠদ্বারা  
দন্তধাবনাদির ব্যবস্থা দেওয়া হয় নাই।  
দিক্-বিশেষে অভিমুখীন হইয়া দন্তধাবনেরও  
এই প্রকার নিষ্ঠুর কারণ আছে, তাহাতে  
সন্দেহ নাই। প্রাচীন মনীষিগণ মানবকু-  
লের স্বাস্থ্য রক্ষার নিমিত্ত এবং বিধ নানা  
প্রকার বিধি ও উপদেশ দিয়া গিয়া সাধারণ-  
গণের চিরকৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যে

পরিমাণে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে, সেই  
পরিমাণে তাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তা, চিন্তার  
গভীরতা ও অপূর্ব কৌশল সমন্বিত স্বাস্থ্য-  
বিধান সমূহের অন্তস্তলস্থ মর্ম হৃদয়স্থ ম-  
রিতে সক্ষম হইবে। কতকগুলি অদূরদর্শী  
ব্যক্তির মতে প্রাচীন হিন্দুগণ বিজ্ঞান-  
চর্চায় অনিপুণ ছিলেন বলিয়া প্রতিষে-  
ধিত হইয়াছে, কিন্তু সেটি নিতান্ত ভ্রম ও  
অন্যায়। আমরা বলিতে পারি, ধর্ম স-  
ম্বন্ধে হিন্দুজাতির নিকট কাহারও উচ্চশির  
হটবার পস্থা নাই, কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে  
যদিও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে অতিব্যাপ্তি প্র-  
ভৃতি কোন কোন দোষ ঘটিয়া গিয়া-  
ছেন বটে, তথাপি বিজ্ঞানে তাঁহাদিগের  
অসাধারণ জ্ঞান ছিল না বলিয়া কে প্রতি-  
পন্ন করিতে পারে? এ প্রস্তাবে সে বিষ-  
য়ের অবতারণা করা উদ্দেশ্য নহে।

দন্তধাবনের পক্ষে লবণ ও তাল প-  
দার্থ। ইহা দ্বারা দন্ত মাংসের দূষিত রস নি-  
গত হইয়া দন্তমূলকঠিন হয়। দন্তের উদ্ধাধঃ  
বর্ষণ পূর্বক মুখে জলপূর্ণ করিয়া নেত্রদ্বারে  
জল সেচন করিলে শীঘ্র দৃষ্টিপ্রসন্ন হয়।  
(১)। কিন্তু অর্দিতরোগী অর্থাৎ বায়ু রোগে  
বক্রীকৃত মুখরোগগ্রস্ত ব্যক্তি, কণ্ঠরোগী, দন্ত-  
রোগী, নবজ্বরী, যক্ষ্মারোগী, কাসরোগী  
ও মুচ্ছারোগীযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে দন্তকাষ্ঠ  
দ্বারা দন্তধাবন কর্তব্য নহে (২)। এতদ্বা-  
(১) দন্তাহর্জ্যমধোযুক্ত। জলসিঞ্জেত লো-  
চনে। তোনপূর্ণমুখস্তেন দৃষ্টিরাস্ত্র প্রসী-  
দতি ॥ (রাজবল্লভ)।—(২) অর্দিতী ক-

তীত শ্রুত ও অপরিবিধ পীড়াগ্রস্ত লোক-  
দিগের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য দন্তকাঠ  
ব্যবহার করা প্রযুক্ত্য।

প্রাতঃক্রিয়ার আর একটি অঙ্গ জিহ্বা-  
মার্জন। শ্রবণ, রক্ত, তাত্র অথবা সৌ-  
হের দশাঙ্গুল পরিমিত স্কন্ধ অথচ কো-  
মল মার্জ্জনীতে (জিব-ছোলাতে) জিহ্বা-  
মার্জনে যুথের বিরসতা ও জিহ্বা ও দন্ত-  
ক্রেদ দূর হয়, এবং আরোগ্য, কচি ও দ-  
ন্তের সদ্যঃ বিশুদ্ধতা জন্মে (১)। জিহ্বা-  
মার্জ্জনের দ্বারা জিহ্বামার্জ্জনের এই সকল  
গুণ থাকিতেও অনেকে উহা ব্যবহার করে  
না, সেটি কেবল আলস্যদোষে ঘটয়া  
থাকে। আবার কেহ কেহ অনালস্য পর-  
তন্ত্র হইয়া কেবল তর্জ্জ্বনী ও মধ্যমা অঙ্গু-  
লিরয় মুখমধ্যে যুগপৎ প্রবেশ করাইয়া  
জিহ্বার উপর ঘন ঘন সঞ্চালন করিয়া  
থাকে। এ উভয়ই ভাল নহে। কারণ, এ-  
কবারে জিহ্বামার্জন না করিলে জি-  
হ্বায় ক্রমে ক্রমে ক্রেদ জন্মিয়া জিহ্বাক্ত  
হইবার সম্ভাবনা এবং অঙ্গুলি প্রবেশনে  
জিহ্বা মার্জন করিলে কণ্ঠনালীর বিকৃততা  
ঘটিয়া উঠে।

প্রাতঃভ্রমণ ও তদনন্তর মুখ, দন্ত, জি-  
হ্বাশূলী চ দন্তরোগী নবজ্বরী। শোষী কাসী  
চ যুচ্ছার্ভো দন্তকাঠং বিবজ্জয়েৎ ॥ (রাজ  
বলভ)(১) জিহ্বানিলেখনং রৌপ্যং সৌবর্ণ-  
তাত্রমায়সং। তন্মলাপহরং শস্তং যুহুস্কমং  
দশাঙ্গুলং ॥ নিহন্তি বক্তু বৈরসায় জিহ্বা-  
দস্তজিতং মলং। আরোগ্যং কচি মাধতে

হ্বাদি ধাবনের পর প্রাতঃস্থান করা অতি  
বিধেয়। প্রাতঃস্থান করিলে যে দেহী মা-  
ত্রেরই স্বাস্থ্য অটুট ও পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহা  
প্রাচীন আর্য্য মনীষিগণ বিশেষরূপে অব-  
গত ছিলেন। প্রাতঃস্নানী ব্যক্তি পূর্ক-  
দিক্ অকণকিরণগ্রস্ত দেখিয়া প্রাতঃস্থান  
করিবে (২)। প্রতিদিবস প্রাতঃকালে  
শ্রুত ব্যক্তি দন্তধাবন করিয়া নদাদিতে বা  
গৃহে স্নান করিবে (৩)। প্রাতঃস্নানে বি-  
শেষরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় বলিয়া প্রাচীন  
ঋষিগণ ইহার মধ্যেও ধর্ম্মের দোহাই দিয়া  
গিয়াছেন (৪)। বাস্তবিক স্নান করিলে

সদ্যোদন্তবিশোধনং ॥ (রাজবলভ) — (২)

প্রাতঃস্নাতকণকিরণগ্রস্তং প্রাচীনবলোক্য

স্নাতং। (সমুত্রকর)। — (৩) যথাহনি

তথা প্রাতর্নিত্যং স্নাদদনাতুরঃ। দন্তান্

প্রক্ষাল্য নদাদৌ গেহে চৈতদমত্ৰবৎ ॥

(কাত্যায়ন)। — (৪) উষাকালে তু সং-

প্রাপ্তে কৃতাচাবশ্যকং বুধঃ। স্নানান্নীদীশু শু-

দ্ধাসু শৌচং কৃত্বা যথাবিধি ॥ প্রাতঃস্নানেন

পুয়ন্তে যেহপি পাপকৃতো জনাঃ। তস্মাৎ

সর্বপ্রযত্নেন প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ ॥ প্রা-

তঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ।

অলক্ষ্মীঃ কালকর্ণী চ হুঃস্বপ্নং হুর্বিচিন্তিতং ॥

প্রাতঃস্নানেন পাপানি ধুয়ন্তে নাত্র সংশয়ঃ।

নচ স্নানং বিনা পুংসাং প্রশান্তং কথম্ সং-

শ্রুতং ॥ হোমে জপ্যে বিশেষণে তস্মাৎ

স্নানং সমাচরেৎ। (গাকড় পুরাণ, ৫০

অধ্যায়)। — অপিচ—উষান্মাসি যৎ স্নানং

সঙ্কায়ামুদিতেরবৌ। প্রাজ্ঞাপতোন ত-

শরীর পবিত্র হয়, অর্থাৎ বর্ষ, গাত্রমল  
প্রভৃতি দূষিত পদার্থ বিধৌত এবং শারী-  
রিক বল প্রভৃতি বর্ধিত হইয়া থাকে (১) ।  
অধিকন্তু লোমকূপ সমূহ পরিষ্কৃত হইয়া  
শোণিত বিশুদ্ধ হয় । সুতরাং স্বাস্থ্য বর্দ্ধ-  
নের পক্ষে স্নান অত্যন্ত হিতজনক । অ-  
নেকে স্নানবিধানুসারে দিবাভাগের মধ্যে যে  
কোন সময়ে স্নান করে, কিন্তু স্নেহপ না  
করিয়া যদ্যপি প্রতিদিন প্রাতঃস্নানের  
কোন স্নানবিধা করিতে পারে, তাহা হইলে  
শারীরিক সুস্থতা বিষয়ে অধিকতর উপ-  
কারলাভ হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

স্নান প্রধানতঃ দুই প্রকার । অবগাহন  
ও উষ্ণবর্ণ । নদী, সরোবর প্রভৃতি জলা-  
শয়ে বা রূহৎ জলপূর্ণ পাত্রে সমুদয় শ-  
রীর মগ্ন করাইয়া প্রথম প্রকার ও পাত্রস্থ  
জল উষ্ণ হইতে মস্তকাদিতে ঢালিয়া দ্বিতীয়  
প্রকার স্নান হইয়া থাকে । এতদুভয়ের মধ্যে  
অবগাহন স্নানই প্রশস্ত ও অধিকতর হিতকর ।

পূর্বে বলা হইয়াছে, সুস্থ ব্যক্তির  
পক্ষে প্রত্যহ স্নান করা কর্তব্য । কিন্তু অ-  
তুল্য মহাপাতকনাশক ॥ যৎকলং দ্বাদ-  
শাকানি প্রাজ্ঞাপঠ্যৈঃ কুর্তৈর্ভবেৎ । প্রা-  
তঃস্নানী তদাপ্রোতি বর্ষণে অক্ষয়ান্বিতঃ ॥  
য ইচ্ছেদ্বিপুলান্ ভোগান্ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহো-  
পমান্ । প্রাতঃস্নানী ভবেন্নিত্যং ধৌমাসৌ  
মাষকান্তুনৌ ॥ ( গারুড়পুরাণ ২১৫  
অধ্যায় )— ( ১ ) স্নানং পবিত্রমাম্রমাং  
অমশ্বেদমলাপহং । শরীরবলসঙ্কানং কে-  
শমাজস্করং পরং ॥ ( রাজবল্লভ ) ।

দ্বিতরোগী, নেত্ররোগী, কণ্ঠরোগী, অভি-  
সাররোগী, আধ্বানরোগী, পীনসরোগী,  
অজীর্ণরোগী এবং ভুক্ত ব্যক্তির পক্ষে  
নিত্যন্ত নিষিদ্ধ ( ২ ) । এবং বিধ রোগীদি-  
গের রোগ শমতা ও ভুক্ত ব্যক্তির আহাৰ্য্য  
জীর্ণ হইলে স্নান করা বিধেয় । অনেকে  
পেট ফাঁপিলে তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া  
ডুব দিতে থাকে, কিন্তু তদ্বারা উপকারের  
বদলে অনিষ্ট ঘটবার নিত্যন্ত সম্ভাবনা ।  
বায়ু প্রকুপিত হইলেই পেট ফাঁপে, সু-  
তরাং তখন উদরে তৈলমর্দন করাই বি-  
ধেয় ( ৩ ) ।

উল্লিখিত উভয়বিধ স্নানই শীতল  
( কাঁচা ) ও উষ্ণ ( পাকা ) জলে সম্পন্ন  
হয় । তন্মধ্যে উষ্ণজলে অধঃকায়ের ( ম-  
স্তক ব্যতীত দেহাংশের ) পরিষেক করিলে  
বলহ্রাস হয়, কিন্তু মস্তকের পরিষেক ক-  
রিলে কেশ ও চক্ষুঃসত্তা বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।  
আর শীতল জলে শিরঃস্নান অর্থাৎ অব-  
গাহন স্নান করিলে তৃষ্ণা, তালু ও ওষ্ঠ-  
শোষ, মলা, উষ্মব্রণ, গাত্রকণ্ডু এবং পি-  
ত্তজন্য শিরোরোগ বিনষ্ট হয় ( ৪ ) ।

— ( ২ ) স্নানমর্দিতনেত্রাস্যকর্ণরোগা-  
তিসারিষু । আধ্বানপীনসাজীর্ণভুক্তবৎসু  
চ গর্হিতং ॥ ( আয়ুর্বেদ ) ।— ( ৩ )  
নাস্তি তৈলাৎ পরং কিঞ্চিদৌষধং মা-  
কতাপহং । ( রাজবল্লভ )— ( ৪ ) উ-  
ষ্ণান্নানাদঃকায়স্য পরিষেকো বলাপহং ।  
তেনৈবভূতমঙ্গস্য বলকুৎ কেশচক্ষুষোঃ ॥  
বিনিহন্তি শিরঃস্নানং তৃকাতাষোষ্ঠশো-

প্রভাহ বাহাদিগের প্রাতঃস্থান সহ্য হয় না এবং বাহারা অশক্ত ও পীড়িত, তাহাদিগের পক্ষে প্রাতঃবগাছন স্নানের পরিবর্তে আশিরস্ফ্রান অর্থাৎ গাত্র প্রক্ষালন বা আর্জ গাত্র-মার্জনী (গামোছা) দ্বারা শরীর পরিষ্কার করা কর্তব্য (১)।

প্রাতঃস্নানের অবাবহিত পূর্বে নিদান পক্ষে ১৫ মিনিটকাল উত্তমরূপে তৈলমর্দন করা উচিত। লোমকূপ দিয়া শরীর-রাভাস্তরে তৈল প্রবিষ্ট হইলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেকটা উপকার দর্শে। তৈলমর্দনে শরীর কোমল, কফ ও বায়ুর শমতা, ধাতুপুষ্টি এবং কান্তিপ্রসন্নতা হয়। পায়ের তলায় তৈলমর্দন করিলে নেত্রের উপকার দর্শিয়া নিত্রার ব্যাঘাত ঘটে না। এবং পায়ের কোনপ্রকার পীড়া থাকিলে, তাহার শমতা হইয়া থাকে। কিন্তু কফ-রোগী, জীর্ণরোগী ও বমনবিষেকাদি দ্বারা সংশুদ্ধ দেহীর তৈলমর্দন কর্তব্য নহে। তৈলমর্দন করিয়া স্নান করিলে বল বৃদ্ধি হয় এবং লোমকূপ দিয়া শিরামুখযোগে নাড়ীতে তৈল প্রবিষ্ট হইলে শরীরের তৃপ্তিসাধন হইয়া থাকে। সর্বদা তৈল দ্বারা বগৎ ॥ মলোক্ষপিড়কাকণ্ডুশিরোরোগা-ক্ষপৈতিকান্। (রাজবল্লভ)।—(১) অশক্তাবশিরস্ফ্রং বা স্নানমস্যা বিধীয়তে। আত্রেণ বাসসা চাখ মার্জনং কারিকং স্মৃতং ॥ (কুর্খপুরণ, উপ, ১৭ অঃ)—অপিচ—আশিরস্ফ্রং ভবেৎ স্নানং স্নানান্তো চ কর্ণিগাং। অত্রেণ বাসসা বাপি মার্জনং

মস্তক আর্জ রাখিলে শিরঃশূল, টাকপড়া প্রভৃতি মস্তকের পীড়া হয় না, এবং শীত্ৰ কেশপক ও কেশ পতন না হইয়া বরং ঘন, দৃঢ়, কৃষ্ণবর্ণ ও দীর্ঘ হয়। তৈলমর্দনে মুখজী বৃদ্ধি হয় এবং কর্ণে নিত্য তৈলপূরণ করিলে বায়ুজন্য কর্ণরোগ, বাধির্ঘা অর্থাৎ উঠেঃশ্রবণ প্রভৃতি পীড়ার শাস্তি হইয়া থাকে (২)। মর্দনের পক্ষে তিল ও সরিষার তৈলই সুপ্রশস্ত। সার্বপ তৈল কটু, উষ্ণবীৰ্য্য, এবং কফ, বায়ু, গাত্র-কণ্ডু ও ক্রিমিরোগনাশক; কিন্তু রক্তপিত্ত রোগে অহিতকারী ও শুক্রনাশক (৩)। তিলতৈল বয়ঃক্রমের স্বৈর্য্যকর, বায়ুনাশক, বস্তিকর্ষে অর্থাৎ পিচ্চারীতে, মর্দনে, দৈহিকং বিদুঃ। (জাবাল)—(২) অভ্যঙ্গো মার্দবকরঃ কফবাতবিনাশনঃ। ধাতুনাং পুষ্টিজননো মৃজাবর্ণপ্রসাদনঃ। পাদাভ্যঙ্গোহথ নিত্রাকুলক্ষুষঃ পাদরোগহা। বর্জ্যোহভ্যঙ্গঃ কফশূলকৃতসংশুদ্ধ-জীর্ণিভিঃ ॥ স্নেহোহবগাছনে যুক্তঃ শরীরে বলমাচরেৎ ॥ শিরামুখে রোমকূপৈর্জমনী-ভিষ্ণু তর্পয়েৎ। নিত্যং স্নেহাৰ্জশিরসঃ শিরঃশূলং ন জায়তে। ন খালিত্যং ন পালিত্যং ন কেশাঃ প্রপতন্তি চ। দৃঢ়মূলশ্চ কৃষ্ণাশ্চ ভবন্তি চ ঘনান্নতাঃ। ইন্দ্রিয়ানি প্রমীদন্তি শুদ্ধং ভবতি চাননং ॥ কর্ণপ্রপূরণান্নিত্যং ন মন্যাহুসংগ্রহঃ। নোঠৈঃ ঞ্জতি র্ন বাধির্ঘাৎ ন কর্ণে বাতজাকজঃ ॥ (রাজবল্লভ)।—(৩) কটুকং সার্বপং তৈলং রক্তপিত্তপ্রদূষণং। কফশুক্কাশিল-

নাসিকা ও কণ্ঠ প্রভৃতিতে সংপূরণে হিত-  
কারী (১) । নিম্নতৈল তিক্তরস, ক্রিমি  
ও কুষ্ঠরোগ পর্যায়শ্বেদ ও শমতাকারক (২) ।  
কিন্তু স্বানার্থ মর্দনের পক্ষে যাবতীয়  
তৈলাপেক্ষা তিল তৈলই অধিকতর প্র-  
শস্ত (৩) ।

স্নানকালে তৈলমর্দনে যেমন উপকার  
লাভ হয়, সেইরূপ গাত্রমার্জনে ও গাত্রঘ-  
র্ষণ দ্বারাও অনেকটা উপকার হইয়া থাকে ।  
গাত্রমার্জনে হুর্গন্ধ, গাত্রের শুকতা, চুলকনা,  
ছুলি, মলা, অকচি, ঘর্ষ, ঘৃণা ইত্যাদি নষ্ট  
হয় (৪) । গাত্রের হুর্গন্ধ প্রভৃতি নষ্ট হ-  
ইলেই ঘৃণা অপনোদিত হইয়া থাকে । স্নান  
কালে গাত্রমার্জনে বাতীত দিবসের মধ্যে  
আরও দুই তিনবার ঐরূপ করা আবশ্যিক ।  
গামোছা, তোয়ালে প্রভৃতি দ্বারা পুনঃ পুনঃ  
গাত্রমার্জনে করিলে লোমকূপ সমূহ আবদ্ধ  
থাকে, স্রুতরাং তন্মধ্য হইতে শরীরভাস্তরস্থ  
ঘর্ষ প্রভৃতি দূষিত পদার্থের নির্গমন এবং  
বহিঃস্থ বিশুদ্ধ বায়ুর প্রবেশন হইয়া স্বা-  
স্থ্যের উপকার সাধিত হয় ।

উদ্বর্তন অর্থাৎ গাত্রঘর্ষণ করিলে বাত,  
হুতং কণ্ডু ক্রিমি বিনাশনং ॥ (রাজবল্লভ) —  
(১) তিলতৈলং বয়ঃ-স্বেদ্যাকরং বাতঘ্নমুত্তমং ।  
হিতং বস্ত্রাভ্যঙ্গপানেন-নমো কণ্ঠক্টিপূরণে ॥  
(ঐ) — (২) নিম্নতৈলস্ত কুষ্ঠয়ং তিক্তং  
ক্রিমিহরং পরং । (ঐ) — (৩) সর্কেভ্যা-  
স্ত্বিহ তৈলভ্যস্তিলতৈলং প্রশস্যতে । (রা-  
জবল্লভ) — (৪) দৌর্গন্ধং গৌরবং কণ্ডুং  
কঙ্কুং মলমরোচকং । শ্বেদং বীভৎসুতাং

কফ, মেদরোগ ও বায়ু নষ্ট হয় এবং অঙ্গ  
সমূহের হৈর্ঘ্য ও ত্বকের প্রসন্নতা হইয়া  
থাকে (৫) । হরিদ্রাদিতে গাত্রঘর্ষণ ক-  
রিলে গাত্রচুলকনা, বিবর্ণতা ও কক্ষতা নষ্ট  
হয় (৬) । এবং তিলের দ্বারাও এই স-  
কল ক্রিয়া হইয়া থাকে (৭) । কিন্তু কথা  
এই যে, হরিদ্রার দাগ লাগিয়া বস্ত্র প্রভৃতি  
কুৎসিত হইয়া যায় এবং বর্তমান সময়ে স-  
ভাষা সম্বন্ধেও হরিদ্রাঘর্ষণ ভ্রমমাজে  
প্রচলিত নহে; স্রুতরাং তিলের দ্বারা  
মধ্যে মধ্যে উদ্বর্তন কার্য্য সমাধা করা অমু-  
পযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না ।

প্রাঃসূত্রের পর প্রাচীন ঋষিগণ চ-  
ন্দন প্রভৃতি সুরগন্ধি দ্রব্য ও মৃত্তিকাদি দ্বারা  
তিলক ও দেহলেপনাদির বিধান দিয়া গি-  
য়াছেন (৮) সুরগন্ধি দ্রব্য লেপনে প্রীতি  
হস্তি শরীরপরিমার্জনং ॥ (রাজবল্লভ) —  
(৫) উদ্বর্তনং বাতহরং কফমেদোহিলাপহং ।  
শ্মিরীকরণমঙ্গানাং ত্বক্প্রসাদকরং পরং ॥  
(ঐ) — (৬) উদ্বর্তনং হরিদ্রাদৈঃ কণ্ডু-  
বৈবর্ণ্যরৌক্ষ্যজিৎ । (ঐ) — (৭) তিলে-  
নোদ্বর্তনং কণ্ডুরৌক্ষ্যভেদোঘনাশনং । (ঐ)

(৮) জাহ্নবীতীর সমুদ্রতঃ মৃদং  
মৃদ্ধা বিভর্তি যঃ । বিভর্তি রূপং সৌহর্কশ্চ  
তমোনাশায় কেবলং ॥ (ব্যাস) — গোম-  
তীতীরসমুদ্রতঃ গোপীদেহ সমুদ্ভবাং ।  
মৃদং মৃদ্ধা বহেদ্যস্ত সর্কপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥  
(শাতাভ্য) — উর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা কুর্যাৎ  
ত্রিপুণ্ড্রং ভস্মনা সদা । তিলকং বৈ দ্বিজঃ  
কুর্যাৎ চন্দ্রেন যদৃচ্ছয়া ॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজঃ ॥

ও তেজোরন্ধি হয় এবং-ঘর্ম, দুর্গন্ধ, তন্ত্রা, পাপ অর্থাৎ পীড়া, অম ইত্যাদি বিলুপ্ত হইয়া যায় (১)। ফলকথা, দুর্গন্ধ নি-  
বারণের পক্ষে সুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ প্র-  
য়োজনীয়। কেহ কেহ বলেন মৃত্তি-  
কা দ্বারা তাড়িৎ নষ্ট হইয়া থাকে।  
বোধ হয়, এই জন্যই বহিঃস্থ শরীরজ প্র-  
য়োজনাতিরিক্ত তাড়িৎ নিবারণার্থ মৃত্তিকা  
তিলকাদি ধারণের বিধান প্রচারিত হইয়া  
থাকিবে। অধুনা আমাদের বঙ্গদেশে  
নব্যশ্রেণীর মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবিষ্ট  
হওয়াতে চন্দন বা মৃত্তিকার তিলকাদি অ-  
প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যদিও পশ্চিগ্রাম  
অঞ্চলে কোন কোন স্থলে ইহা দৃষ্ট হয়  
বটে, কিন্তু রাজধানী প্রভৃতি স্থানে এক-  
বারেই অদৃশ্য। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে  
তিলক বা অমূলপনের প্রচলন এখনও  
পূর্বের ন্যায় বর্তমান আছে। অশ্বদেনীয়  
নব্য শ্রেণীর মধ্যে আতর, গোলাপ, বিলাতি  
সুগন্ধি দ্রব্য এক্ষণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,  
তাহাও ভাল। যে কোন প্রকারেই  
হউক, সুগন্ধি দ্রব্য হইলেই চলিতে পারে।

প্রাতঃস্থানের পরেই যেন সম্পূর্ণরূপে  
আহার করা না হয়, কারণ, তৎকালে  
শিরাসমূহে দ্রুতবেগে রক্ত চালিত হইতে  
কুর্য্যৎ ক্ষত্রিয়শ্চ ত্রিগুণ্ডিকং। অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ  
বৈশ্যশ্চ বর্তুলং শূদ্রযোনিজঃ ॥ (ব্রহ্মা-  
ওপুরাণ)।—(১) প্রীতিভেজকরং হ-  
যাং শ্বেদনৌর্গন্ধনাশনং। তন্ত্রাপাপোপ-  
শমনং অম্বমূলপনং ॥ (রাজবল্লভ)।

থাকে। স্থানের এক ঘণ্টা পরে ভোজন  
করা বিধেয়; কিন্তু স্থানের অব্যবহিত  
পরেই কিঞ্চিৎ জলযোগ করাও উপযুক্ত।

আমরা প্রাতঃস্থান ও প্রাতঃক্রিয়ার  
বিষয় বলিতে গিয়া শেষটিরই কথা অনে-  
কটা বলিলাম। কিন্তু এক্ষণে প্রথমটির  
সম্বন্ধে আরও কিছু বলিয়া এই প্রবন্ধের  
উপসংহার করিব। আমরা পূর্বে বলি-  
য়াছি যে, যে ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু লাভ  
করিতে ইচ্ছা করে, উষাকালে তাহার গা-  
ত্রোৎখান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। কিন্তু  
এক্ষণে বলিতেছি যে, যাহার ঐ উভয়  
এবং জ্ঞান ও প্রসিদ্ধি লাভ করিবার বা-  
সনা থাকে সে অবশ্য সূর্যোদয়ের পূর্বে  
শয্যা ত্যাগ করিবে। প্রাতঃস্থান ব্যতীত  
দীর্ঘজীবী ও প্রসিদ্ধ হওয়া অতি অল্প  
লোকের ভাগ্যেই ঘটয়া থাকে। সুতরাং  
সাধারণের তাহাতে নির্ভর করা অদূরদর্শি-  
তার কার্য। যাহাদিগের প্রাতঃস্থান অ-  
নভাস্ত তাহাদিগের স্বাস্থ্যের যেমন ক্ষতি  
হয়, সেইরূপ আবার প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যও  
অনেকটা ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্যই ম-  
হাত্মা ফ্রাঙ্কলিন্ বলিয়া গিয়াছেন যে,  
“যে ব্যক্তি বিলম্বে গাত্রোৎখান করে,  
তাহাকে স্বকার্য সাধনের জন্য সমস্ত দি-  
বস অত্যন্ত দৌড়াদৌড়ি করিতে হয়, অ-  
থচ রাত্রি পর্য্যন্ত খাটিয়াও সম্পূর্ণরূপে  
সমাধা হয় না।” সুবিজ্ঞ ভীন মুইফ্ট ব-  
লেন যে, তিনি প্রাতঃস্থানী ব্যতীত কোন  
ব্যক্তিকে সক্ষম ও মহৎ হইতে দেখেন



নাই। পশ্চিমবঙ্গ বন্ধু সাহেব তাঁহার গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে বলেন যে, তিনি প্রথমা-বস্থায় অত্যন্ত নিম্নপ্রিয় ছিলেন, সুতরাং তদীয় বহুমূল্য সময় অনেকটা ব্যথা নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য তিনি তাঁহার জো-জেক্ নামক একজন ভৃত্যকে আজ্ঞা করেন যে, সে যেন প্রত্যহ তাঁহাকে সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠাইয়া দেয়, তাহা হইলে তিনি তাহাকে একটি করিয়া ক্রাউন্ মুদ্রা প্রদান করিবেন। জোজেক্ তদনুসারে তাঁহাকে ভোরে জাগাইতে গেল, কিন্তু তিনি এতদূর পর্যন্ত প্রাতিভিজ্ঞার বশীভূত হইয়াছিলেন যে, কর্তব্যাকর্মপরায়ণ ভৃত্যের আস্থানে ভগ্ননিদ্রা হইয়া মারিতে উদ্যত হইলেন। ভৃত্য পলায়ন করিল। তদনন্তর তিনি অভ্যাসানুসারে ১০।১১ টার সময়ে উঠিয়া জড়ভরতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। পুনর্ব্বার তিনি জোজেক্কে জাগাইতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন যে, আমি যদি সে সময়ে তোমাকে গালি দিই বা মারিতে বাই, সে আমার দোষ, তোমার নহে। কিন্তু জোজেক্ ক্রাউন লাভের আশা পরিত্যাগ করিও না, আর আমারও স্বাস্থ্য ও উন্নতির উপায় যেন তোমার হৃদয়ে প্রতিনিয়ত জাগরিত থাকে। কএক দিনের পর জোজেক্ ক্লান্তকায় হইল— ত্রিপ্রহরোপাধী বন্ধু সাহেবও প্রাতঃকথা হইলেন। তিনি একদা বলিয়া ছিলেন যে, “আমি যতগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, তন্মধ্যে ১০। ১২ খানির জন্য মদীয় পরম

মিত্রেষী জোজেক্কে নিকট চিরজীবন খণী থাকিলাম।” বাস্তবিক, প্রাতঃকথানবশতঃই উল্লিখিত পণ্ডিত একজন উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থকার হইয়া গিয়াছেন। প্রাতঃকথানবশতঃই গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। যিনি একজন উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার হইতে ইচ্ছা করেন, বন্ধু সাহেবকে তাঁহার সর্বদা স্মরণ করা অবশ্য কর্তব্য।

প্রসিয়াধিপতি দ্বিতীয় ফ্রেডরিক প্রত্যহ রাত্রি ৪টার সময়ে গাত্রোপাখ্য করিয়া কর্তব্য কার্য ও ভ্রমণ করিতেন। অনেকেই কসিয়াধিপতি পিটার দি এটেকে অবগত আছেন। ঐ মহাদ্রা যখন লণ্ডন নগরস্থ একটা ডকে পোত সূত্রধরের কার্য করিতেন, যখন কামারের কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে যখন কসীস-রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, সকল সময়েই তিনি উষাকালে শয্যা পরিত্যাগ করিতেন। তিনি বলিতেন যে, “আমি আমার জীবনকে দীর্ঘকাল স্থায়ী করিবার জন্য যতদূর পারি নিজেকে অল্প সময় প্রদান করিয়া থাকি।”

প্রাতঃকথান সম্বন্ধে ডব্লিউ জ় সাহেব বলেন যে, “প্রত্যহ প্রাতঃকালে ৫টা হইতে ৭টার মধ্যে গাত্রোপাখ্য করিয়া আমি নিউটেটোমেটের টীকা ও অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছি। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে নিজ গিয়া প্রাতঃকালে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শয্যাভ্যাগ করিলে ৪০ বৎসরের

মধ্যে প্রায় ১০ বৎসরের সময় পাওয়া যায়। সুতরাং ঐ ১০ বৎসরে জীবনের অনেক উন্নতি হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ কি? একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ ঔষ্ণ্ণ-কারকে কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ‘মহাশয় আপনি প্রত্যহ বেলা ১০টা হইতে সমস্ত দিন আয়োদ্য আস্থানে অতিবাহিত করিয়া থাকেন, কিন্তু এত পুণ্ডক কিরূপে রচনা করিলেন?’ তিনি তদুত্তরে বলেন যে, ‘আমি প্রত্যহ রাত্রি শেষে ৩টার সময় গাঁত্রোস্থান করিয়া সকাল পর্য্যন্ত লিখিয়া থাকি’।

বিদ্যাধ্যায়ী ছাত্রগণের পক্ষে প্রাতঃস্থান সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক। অধিক রাত্রি জাগিয়া পাঠাভ্যাস কখনই কর্তব্য নহে। একেত অধ্যয়ন কেবল মানসিক পরিশ্রম, তাহাতে আবার অধিক রাত্রি-জাগরণ করিলে যে, কি পর্য্যন্ত বিষময় ফলোৎপাদন হয়, তাহা চিকিৎসকমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত হইয়া এবিষয়ে সতর্ক হইতে আদেশ দিয়া থাকেন। রাত্রি ৯টা হইতে দশটার মধ্যে ছাত্রদিগের শয়ন করা অবশ্য কর্তব্য। তাহা হইলে ৬।৭ ঘট্টা কাল নিদ্রার পর ভোরে ৪।৫ টার সময় গাঁত্রোস্থান করিবার সুবিধা হইতে পারে। দীর্ঘকাল বিজ্ঞান্যের পর শরীর ও মন প্রকৃতিস্থ থাকে, সুতরাং প্রাতঃকালে অধ্যয়ন কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ আস্থ্যেরও ব্যাঘাত ঘটিবে না। রাত্রি শয়নের জন্য, জাগি-

বার নিমিত্ত নহে—প্রাতঃকাল জাগরিত হইবার জন্য, নিদ্রার নিমিত্ত নহে। সুতরাং দীর্ঘকাল রাত্রি জাগিয়া ও দীর্ঘকাল নিদ্রিত থাকিয়া স্বভাবের নিয়মভঙ্গ করা অতি গর্হিত কার্য্য। মনকে নিরতিশয় পীড়িত করিয়া, রাত্রি জাগিয়া অধিক বিদ্যোপার্জনের অপেক্ষা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে চলিয়া অপেক্ষাকৃত কম বিদ্যা হয়, তাহাও ভাল। কিন্তু আস্থ্যের প্রতি সর্ব্বপ্রযত্নে দৃষ্টি না রাখা নিতান্ত মন্দ। ডাক্তার পেরিস্ সাহেব বলেন, মনকে বিদ্যাভারে অতিমাত্র ভারি করিয়া শরীরকে দুর্বল করা অপেক্ষা অল্প পরিমাণে মনোরত্তির চালনা করিয়া হার্কুালিসের ন্যায় শরীরকে বলিষ্ঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

যে ব্যক্তি আস্থ্যরক্ষার জন্য প্রাতঃস্থান করিবার ইচ্ছা করে, তাহাকে দিবা নিদ্রা ও অনেককণ পর্য্যন্ত রাত্রিজাগরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। দিবসে নিদ্রা গেলে রাত্রিকালে শীঘ্র নিদ্রা আসে না এবং অধিককণ রাত্রিকালে জাগিয়া থাকিলে শেষ রাত্রিতে নিদ্রার অত্যন্ত সমাবেশ হয়, সুতরাং প্রাতঃস্থানের কিছুই সুবিধা থাকে না। প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে রাত্রির প্রথমভাগেই শয়ন করা কর্তব্য। তাহতে চক্ষু বা আস্থ্যের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটে না। ডাক্তার ডুইট্‌ তদীয় ছাত্রগণকে বলিতেন যে, রাত্রির প্রথমভাগে এক ঘট্টা

কাল নিমিত্ত থাকিলে যতটা উপকার দর্শে, উহার অন্তিমে দুই ঘট। পর্য্যাপ্ত শু-ইয়া থাকিলে তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিক, উক্ত ডাক্তারের উপদেশ বহু-মূল্য। ডুইটের মতানুসারে আমাদিগেরও চিকিৎসা। শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ দেখা যায়। যথাযোগ্যকালে নিত্রা সেবনে ধাতুর সমতা, তত্ত্বানুশ, শরীরের পুষ্টি, বর্ণ, বল, উৎসাহ ও অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে (১)।

ইহা অতিমাত্র বিশ্বাসযোগ্য যে, যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে নিয়মিতরূপে প্রা-

তক্স্থান ও প্রাতঃক্রিয়া অভ্যাস করে, সে দীর্ঘজীবী, কর্মঠ ও গুণাবিত হয় এবং তাহার জীবনকাল শান্তি ও আনন্দে অতিবাহিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহার বিপরীতচরণে প্রায়ই বিপরীতফল উৎপন্ন হয়। জীবনের ন্যায় শয্যাও নিত্রাকে অতিশয় প্রিয়জ্ঞান করা নিতান্ত ভ্রান্ত ও অর্বেচনীয়। কিন্তু জীবন সহচর প্রাতক্স্থানকে জীবনের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করা অবশ্য করণীয়, ইহা যেন ব্যক্তিমাত্রেই মনে জাগরিত থাকে।

ক্রীড়াজ—



## বঙ্গদর্শনের বিদায় !

সংসারে অধিকাংশ মানুষাই প্রয়োচনার দাস, প্রবৃত্তির ক্রীড়াসামগ্রী, এবং স্রু-খের প্রত্যাশী। যে বস্তুতে যে পরিমাণ প্রয়োচনা, প্রবর্তনা ও স্রুখের প্রত্যাশা, সেই বস্তুতেই সেই পরিমাণে তাহার প্রীতি; এবং সেই বস্তুর বিরোধ কি বিচ্ছেদেই সেই পরিমাণে তাহার দুঃখ। বঙ্গদর্শনের আকস্মিক বিরোধ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের বর্তমান দুঃখধ্বনিও এই কথাই প্রমাণ করিতেছে। বাঙ্গালি বঙ্গদর্শনে স্রুখী ছিল; বঙ্গদর্শনের বিরোধ অথবা বিচ্ছেদ

(১) নিম্নোপস্থুক্তকালে চ খাতু-সাম্যমতজ্ঞিতাং। পুষ্টিবর্ণবলোৎসাহমগ্নি-দীপ্তিং করোতি চ ॥ (রাজবল্লভ।)

তাহার নিকট দুঃখপ্রদ এবং অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

বঙ্গদেশীয় পুরুষদিগের মধ্যে বাঁহারা অন্ধ-অবলা,—বাঁহারা স্বভাবতঃ চিন্তায় অসমর্থ, এবং শিক্ষার হানতাদি কারণে চিন্তার উদ্দীপক বিষয় মাত্রেই স্রুতরাং বি-রক্ত, এই চারি বৎসর কাল একমাত্র বঙ্গ-দর্শনই যুদ্ধ মদিরার ন্যায় তাঁহাদিগের অব-লম্ব ছিল। বঙ্গদর্শন দার্শনিক তত্ত্বের গুঢ় সংবাদ লইয়া কিরূপ ব্যাখ্যাম করিতেন, তাহা তাঁহারা ভাবিতেন না; বঙ্গদর্শন ভ-বভূতি প্রভৃতি কবির কাব্য সমালোচন-প্রসঙ্গে কিরূপ পাণ্ডিত্য, স্বাদগ্রাহিতা ও মনোমিতা প্রদর্শন করিতেন, তাহা তাঁহারা

গণনার আনিতেন না; বঙ্গদর্শন স্তম্ভমুখী ও প্রতাপ প্রভৃতির অতিমানুষ-সৌন্দর্য্যময় অপূৰ্ণ চিত্র সকল আঁকিতে গিয়া কিরণ কবিত্ব, নৈপুণ্য, এবং কল্পনার কিরণ লীল খেলা দেখাইতেন, তাহা তাঁহারা দেখিতে চাহিতেন না। কিন্তু বঙ্গদর্শনে ললিতলবঙ্গ-লতা, কুম্ভনন্দিনী ও শৈবলিনী প্রভৃতি কাহিনীর যে কাহিনী টুকু থাকিত, তাহাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত রহিতেন। সুরুমারমতি বালক বালিকারা ধাত্রীমাতার চতুঃপাশে উপবিষ্ট ছইয়া যেরূপ তৃষিত কণে রাজ-কন্যা ও মন্ত্রিকন্যার কাহিনী শুনে, তাঁহারাও বঙ্গদর্শনের চতুঃপাশে উপবিষ্ট ছইয়া শুধু সেইরূপ কাহিনী শুনিতেন। কাহিনীর পর পর ঘটনা অবগত হওয়ার জন্য তাঁহারা যথার্থই আকুল ছইয়া থাকিতেন, এবং কাহিনী শুনিয়াই এই কণ্টকময় পৃথিবীর সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলিয়া যাইতেন। যে বার বঙ্গদর্শনে কোন কাহিনী না থাকিত, সেবার তাঁহাদিগের ক্রোধ, ক্ষোভ ও মনস্তাপের আর সীমা থাকিত না। বনের পশু পক্ষী, তরু লতাও তখন তাঁহাদিগের বিষাদে বিষন্ন হইত।

বঙ্গদেশে যাহারা ‘রসিক’ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ,—যাহারা অসুঃপুরে প্রবিষ্ট ছইলেই রসিক ছইয়া বসেন, ছাত্রমহলে কেবলই রসের কথা কহেন, এবং গ্রাম্যজমিদারের বিলাসভবনে, বিবাহের সভায়, বাসরঘরে, বাড়ির আসরে এবং হুতম প্রেতুকারমণ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন রসতরঙ্গেই ভর-

লাগিত রহেন, বঙ্গদর্শনে তাঁহাদিগেরও একমাত্র উপজীব্য ছিল। উহাতে বিজ্ঞানরহস্যের মাধ্যমও যাহা থাকিত, তাহা তাঁহাদিগের চক্ষে বিষের ন্যায় লাগিত। উহাতে উচ্চ অঙ্গের যে সমস্ত কবিতা প্রকটিত হইত, তাহা তাঁহাদিগকে ভয়ানক কষ্ট দিত। উহাতে চরিত্রবর্ণনচ্ছলে মানবহৃদয়ের যে সকল গভীরতত্ত্ব আলোচিত হইত, তাহা তাঁহাদিগের যতদূর সম্ভব বিরক্তি জন্মাইত। কিন্তু উহার নবীনা ও প্রাচীনার কথা, আলবালা সুরুমারী কি অলঙ্কারাগরঞ্জিত চরণের বর্ণনা, ইন্দিয়ার পরিহাস-রসিকতা, বানরের কল্যাণে জাতুহিতীয়া এবং ‘ঢাল ত্রাণি ঢাল’ এইরূপ ব্যঙ্গার্ভ দুই একটি লহরীই তাঁহাদিগের সকল তৃষ্ণা পূর্ণ করিত। তাঁহারা দিনান্তে একবার

“আররে চাঁদের কোণা

তোরে খেতে দিব কুলের মধু,

পরতে দিব সোনা ”

অথবা—

‘আমার ময়র কথা তাই লো তাই’

এইরূপ কতিপয় পংক্তি পাঠ করিতে পাইলেই চরিতার্থ হইতেন।—নিবিড়জলদাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে বিদ্যুতের ক্ষণিক প্রভার ন্যায় কদাচিৎ কখনও চটুলনয়না হীরা কি বচন-চতুর্দা হরিদাম্বী বৈষ্ণবীর ক্ষণিক দর্শন পাইলেই তাঁহারা হরিনামভক্ত বৈষ্ণবের ন্যায় চলিয়া পড়িতেন। অপিচ, যাহারা পণ্ডিত, যাহারা দ্রুশিকিত, মুকচিসম্পন্ন, যাহা-

হারা কাব্যে সৌন্দর্য্যপ্রিয়, কথায় রস-  
প্রাণী, এবং যাহারা স্বাভাবিক ও শিক্ষা-  
লব্ধ সামর্থ্যে চিন্তাজনিত ক্রেশে অকাতর,  
বঙ্গদর্শন তাঁহাদিগেরও একান্ত আদরের  
পাত্র, উহা তাঁহাদিগেরও সহায়, সুস্থ ও  
অপরিহার্য্য সহচর ছিল। এই সমুদয়শ্রে-  
ণির বান্ধালিই বঙ্গদর্শনের বিরোধে হুস্মে  
আঘাত পাইয়াছেন,— প্রিয়বিরোধগদঃখ  
অমৃত্যব করিতেছেন।

বঙ্গদর্শনের বিলোপ বান্ধবের নিকট  
উল্লিখিত সমস্ত কারণের অতিরিক্ত আর  
এক কারণে বিশেষ দুঃখজনক। আ-  
মরা সেই দুঃখেই প্রকৃত মর্থাহত হইয়াছি।  
যদি শুধু উপভাস পড়াই উদ্দেশ্য হয়,  
তাহা বান্ধালায় পড়িলেও চলে, ইংরেজীতে  
পড়িলেও চলে। বরং ইংরেজীতেই সে আ-  
কাঙ্ক্ষার অধিকতর সম্ভরণ হয়। ইংরেজী  
গ্রন্থালয়ে যে সকল রসপরিপূর্ণ উপাদেশ  
উপভাস স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে,  
শতাব্দীর এক-চতুর্থভাগেও তাহা পড়িয়া  
শেষ করা যায় না। যাহার যেমন কচি,  
ইংরেজী উপন্যাসে তাহাই তিনি প্রাপ্ত  
হইবেন। যিনি প্রীতির প্রশস্তক্রেত্ৰ এবং  
শোভার অনন্তবিস্তার চাহেন, পুঙ্খ-  
কারের নয়নাভিরাম গান্ধীর্ধ্য দেখিতে  
ভালবাসেন, তিনি কটের গিরিকন্দর-  
শোভিত, নির্ঝরবারিসিক্ত কল্পকামনে  
প্রবিষ্ট হইলেই বিম্ব হইবেন; আর,  
যিনি মেধাক্লান্তচক্ৰমার বিবাদময় সৌ-  
ন্দর্য্য দেখিয়া মুখী হন, অথবা যিনি

আলোকমিঞ্জিত অঙ্ককারেই অধিকতর আ-  
নন্দলাভ করেন, তিনি বুলওয়ার লিটনের  
খাননিম্নে প্রবেশ করিলেই পরমা তৃপ্তি  
লাভ করিবেন। সমাজে ও মনুষ্য প্রকৃ-  
তিতে যাহা কিছু উপহাসনীয়, তিল তিল  
করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ বর্ণনে অথচ সা-  
ধারণতঃ দয়া ও মহানুভাবতার পুষ্টিসা-  
ধনে,—যাহা সর্ব্বত্র উপেক্ষিত, তাহাতেও  
আদরের বস্তু প্রদর্শনে ডিকেন্সের তুলনা  
কোথায়? আবার, সমাজে পাপের যে  
প্রবল প্রবাহ চলিতেছে, মনুষ্যপ্রকৃতিতে  
ভোগ্যহৃদ্য যেরূপ তর তর ধারে বহি-  
তেছে, তাহার উদ্ধাপক ও যুবজনমানক  
অভিবর্ণনেও কে কলঙ্কভয়শূন্য রেনল্ডের  
সমকক্ষ হইবে? বিজ্ঞান ও দর্শনাদিশাস্ত্র  
শিক্ষার জ্ঞাত ও ইংরেজী প্রভৃতি ইউরোপীয়  
জ্ঞানার পুস্তকনিচয় যেরূপ সাহায্য দান  
করিতে পারে, বঙ্গীয় কোন পুস্তকেই  
তাহা প্রত্যাশা করিতে পারি না। স-  
রোবরের স্বচ্ছসলিল পরিত্যাগ করিয়া  
কুপোদকে তৃষ্ণা পূরণ করিতে ইচ্ছা হয় না;  
এবং বেকন, কোমত, মিল, বেন্থাম, স্বকল,  
ও স্পেন্সার প্রভৃতি আগাধনব্দ মুখী জনের  
সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বান্ধালির অপূর্ণ-  
বিকসিত প্রতিবিস্তৃত চিন্তার আশ্রয় লই-  
তেও প্ররতি যায় না। যদি কাব্যের কথা  
বল, তবে কি কারণে শেঙ্গপীর কি বায়রণ,  
মিণ্টন কি ড্রাইডেন ছাড়িয়া বান্ধালায় নক-  
লের নকল তরল কবিতা লইয়া সমরাস্তি-  
পাত করিব, বল। কেহ ইচ্ছা করিলে,

ইংলণ্ডের কাব্যকৃত্তে সমস্ত জীবনও মুখে  
যাপন করিতে পারেন। কিন্তু ইহার কি-  
ছুই বাঙ্গালী নহে,—যেমনাদবধ প্রভৃতি  
কাব্য, কিংবা বহুরসের প্রভাবণ বঙ্গ-  
দর্শনের ন্যায় ইহার কিছুই বাঙ্গালির নি-  
র্জন্ম নহে। বাঙ্গালির জন্য বাঙ্গালার যে  
মুখ, বাঙ্গালার যে সম্মান, এবং বাঙ্গালার  
যে স্বার্থ, সামর্থ্য, ও গৌরব, জগতে আর  
কিছুতেই কি তাহা সম্ভবে?

আমরা ইহা ভূয়োভূয়ঃ প্রকাশ করি-  
রাছি,—আমাদিগের কণ্ঠধনি যতদূর উচ্চে  
উঠিতে পারে, সেই স্থলে উঠিয়া আমরা  
ইহা তারশ্বরে বলিয়াছি যে, বঙ্গভাষা আ-  
মাদিগের প্রাণস্বরূপ অথবা প্রাণাধিক  
প্রিয়তর। আমরা উহাকে যার পর নাই  
ডালবাসি; উহার উন্নতি দেখিরা আনন্দে  
অগীর হই, উহার হীনাবস্থা ও অধোগতি  
দেখিলে দুঃখে ত্রিস্রমাণ হইয়া পড়ি। আ-  
মাদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, বাঙ্গালির  
কখনও যদি নিত্ৰাতঙ্গ হয়, যদি কখনও শ-  
ক্তির অগ্নিময়স্পর্শে বাঙ্গালির মৃৎপিণ্ড স-  
দৃশ নিস্তেজ হৃদয় চৈতন্যলাভ করে, বঙ্গ-  
ভাষার শক্তিসাভাই তাহার কারণ হইবে।  
কোট হ্যাট বাহা করে নাই, পরপাত্রকা-  
লেছেন বাহা হয় নাই, পরকীর ছন্দানুব-  
র্ত্তে বাহা ফলে নাই, বঙ্গভাষার বিকাশ  
ও সামর্থ্যসঞ্চারেই তাহা সম্পন্ন হইয়া আ-  
সিবে; এবং যেমন রক্তসঞ্চারে বলসঞ্চার,  
তেমম জাতীয় হৃদয়ে ভাষাপথে তেজঃস-  
ঞ্চারেই এই বৃত্তপ্রায় জাতি পুনরায় দৃঢ়,

বলিষ্ঠ ও কথঞ্চিৎ হইয়া মনুষ্যলোকে মনুষ্যের  
ন্যায় উত্থান করিবে।

ঐ যে নব্য বাবু, দুঃখিনীর সন্তান,  
আজি পরিস্কন্দপরিবর্ত্তেই আপনাকে ক্ল-  
তার্থ জ্ঞান করিয়া দ্বিতীয় বাসব হইয়া ব-  
সিয়াছেন,—স্বদেশ ও স্বজাতির সম্পর্ক  
পর্যাস্তও তুলিয়া গিয়াছেন, স্বর্গাদপি গরী-  
রসী জগত্ভাষাকে বৃণিত দাসী জ্ঞানে পায়ে  
ঠেলিয়াছেন, উহার নিকট আমাদের  
প্রত্যাশা নাই। ঐ যে পদগৌরবাক্ত  
বৃত্তন সন্তা, ঐ যে ক্ষুদ্রপ্রাণ মহামতি প-  
রের উল্লিষ্টে প্রতিপালিত, পরপ্রসাদে  
হৃৎ পুষ্ট হইয়া আপনার জাতীয় চিত্ত অ-  
পসারণের জন্য একটুকু একটুকু করিয়া  
যত্ন করিতেছেন,—জাতীয় ভাষার প্রিয়বন্ধন  
ছেদন করিতে পারিলেই আত্মাদে অবশ  
হইতেছেন, উহার নিকটও আমাদিগের  
ভরসা নাই। আমাদিগের ভরসাস্থল স্ব-  
দেশপ্রিয় সহৃদয় বাঙ্গালি, আমাদিগের  
আশা বঙ্গভাষার ভাবি সম্পদে। যে  
কোন ব্যক্তি বাঙ্গালার উন্নতি ও ক্ষমতা-  
বৃদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিবেন,  
তাহাকেই আমরা শ্রদ্ধা করিব,—যে কোন  
সদৃশগাহিত সৌভাগ্যবান লোক বঙ্গভা-  
ষাকে নানা উপচারে পূজা করিবেন, নানা  
আতরণে সাজাইয়া তুলিবেন, তাহাকেই  
আমরা হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার দিব।

বঙ্গদর্শন এই চারি বৎসরকাল বঙ্গভাষার  
পূজা রূপ পবিত্র উৎসবে অকাতরপ্রাণে  
পরিশ্রম করিয়াছে;—আর, যদি আমরা

নিভান্ত অন্ধ না হই, বজ্রভাবার বৈভববিস্তারেও বহুল অংশে রূতকার্য্য হইয়াছে। মধুহৃদয় যেমন দেবী বজ্রভারতীকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের নিগড় হইতে নির্মুক্ত করিয়াছিলেন, বজ্রদর্শনও ভাবাকে কতকগুলি কুসংস্কারের নিগড় হইতে নির্মোচন করিবার জন্য সেইরূপ অশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, এবং বস্তুতঃ তদর্থ বীরের মত অশেষ অত্যাচারও সহিয়াছে। এই হেতুতেই আমরা উহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে চিরবন্ধ, এবং এই হেতুতেই আজি উহার তিরোধানে আমরা এইরূপ তীব্র হ্রঃখে হ্রঃখিত। বজ্রদর্শনে আমরা বাঙ্গালার চল সৌন্দর্য্য, লীলাচাতুর্য্য, আবেগ, উচ্ছ্বাস ও সজীবতা দেখিয়াছি। ইহা কেমনে শীঘ্র বিন্যস্ত হইব? উহা আশাদিগের কর্ণে কখনও নিশীথে বংশীধ্বনির ন্যায় মধুধারা ঢালিয়া দিয়াছে, কখনও বীণার মৃদুল স্বরে হৃদয় মন উন্মাদিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহা কিরূপে ভুলিতে পারিব?

আমরা আশা করি, বজ্রদর্শন শীঘ্রই আবার অন্য কোন মুক্তি পুনর্জীবিত হইবে, এবং যিনি উহার প্রাণ ও প্রতিপত্তি ছিলেন, আর ঐহাদিগের পরিশ্রমে উহার এত গৌরব বাড়িয়াছিল, তাঁহারা সকলে মিলিয়া পুনরায় বজ্রভাবার অধিকার ও বৈভববিস্তারে যত্নপর হইবেন। বাঙ্গালার আজিও

সাহিত্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আজিও শিক্ষাভিমাত্রী বাঙ্গালির সহিত বাঙ্গালার দৃঢ় সম্বন্ধ জন্মে নাই, আজি পর্য্যন্তও বাঙ্গালার অভাব ও প্রভাবের সীমারেখা নির্দিষ্ট হয় নাই। যে পর্য্যন্ত না এ সমস্ত গুরুতর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, সে পর্য্যন্ত আমরা বজ্রদর্শনের মত প্রতিভাযুক্ত সহায়কে বিদায় দিতে সমর্থ হইব না। আমরা সকল সহিতে পারি, সর্বপ্রকার নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা অক্লান্তদয়ে ভোগ করিতে পারি; কিন্তু জননী, জন্মভূমি, এবং জন্মভাবার কাতর মুক্তি ও হীন দশা চক্ষে দেখিতে পারি না। পৃথিবীতে কোন্ ভূমি বজ্রভূমির ন্যায় শ্যামল শোভাশালিনী, স্বজনপরিপালিনী ও নদ নদীর স্বাভাবিক সম্পদে উদারতার প্রতিমূর্তিরূপিণী? কিন্তু বাঙ্গালির আলস্য ও অনাদরে উহার কি অবস্থা ঘটিয়াছে! পৃথিবীতে কোন্ ভাষা বজ্রভাবার ন্যায় হৃদয়-স্পর্শিনী, অমৃতবর্ষিনী এবং আশাদিগের সন্তোষহারিনী? কিন্তু আত্মাদরশূন্য প্রাণহীন বাঙ্গালির উপেক্ষা ও অবমাননায়, —ঐহারা ধন-বৈভব-সম্পন্ন, ঐহাদিগের মোহমহিমার, ঐহারা বিষয়রত, গণনা-তৎপর, ঐহাদিগের মদ্যাক্ততার, এবং ঐহারা শিক্ষিত ও শক্তিসামর্থ্যযুক্ত ঐহাদিগের নিম্নজ্ঞ-উদাসীনতার উহার মুখের কিরূপ মলিন রহিয়াছে!



## সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। মানসরঞ্জিনী। প্রথমভাগ।—ঈশ্বর  
বাবু প্রমদাচরণ সেন-প্রযত্নে প্রকাশিত।

২। কুসুমকলিকা। ঈশ্বরকুমার  
ঘোষ প্রণীত।

যেরূপ কবিতা পাঠমাত্রের একবারে হৃদ-  
য়ের মর্মস্থলে গিয়া স্পৃষ্ট হয়, এ দুখানিতে  
সেইরূপ কবিতা নাই, এবং যেরূপ ছন্দের  
গাঁথনি ও পদাবলীতে তাবা হেলিয়া হুলিয়া  
হুতা করেন এ দুখানির ছন্দোবন্ধনেও তেমন  
বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু এই উভয় পুস্তকই সু-  
খপাঠ্য। মানসরঞ্জিনী অপেক্ষাকৃত গাঢ়,  
কুসুমকলিকা অপেক্ষাকৃত মধুর ও মনো-  
মদ। উভয় গ্রন্থেই প্রাশংসার অনেক কথা  
আছে। মানসরঞ্জিনী-প্রণেতা ককণরসে  
অধিক রক্তকার্য্য হইবেন, এবং বোধ হয়  
প্রসন্ন বাবু ক্রোধ, বিষেব ও অভিমান প্র-  
ভৃতি মানসিক ভাবের উদ্দীপনে অধিকতর  
যশোলাভ করিবেন। পাঠকসমাজে এই  
হুতন লেখকদ্বয়ের আদর হওয়া উচিত।

৩। কবিতা-কলাপ। প্রথমভাগ।—  
ঈরামলাল চক্রবর্তী বিরচিত।

৪। পদ্য-প্রহ্ন। প্রথমভাগ।—ঈম-  
হেপ্রচন্দ্র সোম প্রণীত।

৫। কবিতাকুসুমাকুর। প্রথমভাগ।—  
ঈমরূপ উদ্দীন আছাদদ এবং ঈরামনারায়ণ  
দাস কর্তৃক বিরচিত।

এই তিনখানি পদ্যপাঠ শিশুদিগের  
জন্য লিখিত হইয়াছে। দোষ গুণ তিনখা-  
নিতেই প্রায় সমান। কবিতাকলাপ নিতান্ত  
নিম্ন শ্রেণীর বালকদিগের উপযোগী হইবে  
না। বাহারা শিশুশিক্ষা তৃতীয়ভাগ পর্যন্ত  
পড়িয়াছে, তাহাদিগের ইহা উপকারী  
হইতে পারে। ইহার লেখক সরস পদ্য  
রচনার ক্ষমতাশূন্য নহেন। পদ্য-প্র-  
হ্নের দুই একটি পংক্তি যেমন সরল,  
তেমন সদর্থযুক্ত। ‘পার কি না পার  
ফিরে দেখ আর বার’ এই কবিতাটি বা-  
লকদিগের কণ্ঠস্থ করান কৰ্ত্তব্য।

৬। মণিহারী কণী ভারতজননী।  
পদ্য। ঈপার্কতীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

৭। ভারতবন্দিনী। রূপক। ঈম-  
নোরঞ্জন গুহ চাকুরতা প্রণীত।

সকলেই যে কাদিতে পারে, এমন  
নহে। কাদিবারও ক্ষমতা চাই। পার্কতী  
বাবুর কাদিবার একটুকু ক্ষমতা আছে।  
কিন্তু তিনি তাঁহার গ্রন্থের নামকরণে বড়  
ঠকিয়াছেন। মণিহারী কণী বলিলেই গো-  
বিন্দ অধিকারীর কীর্ত্তন এবং ব্রজের বি-  
রহবিধুরা রাধার কথা মনে আসে, ভার-  
তের কথা মনে আসে না। তাঁহার পুস্তক  
ভারতবন্দিনী অপেক্ষা অনেক গুণে উৎ-  
কৃষ্ট হইয়াছে। ভারতবন্দিনীতে স্থানে



স্থানে শব্দের আশ্ফালন আছে; কোথাও কিঞ্চিৎ পারিপাট্য আছে। কিন্তু পারিপাট্য অপেক্ষা আশ্ফালন অধিক।

৮। সটীক পাঁচালি। প্রথমখণ্ড। জীৱন্তরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।—গ্রন্থকার দাশরথির মন্ত্রশিষ্য। কিন্তু ঠিক শিষ্যে অনেক অন্তর। এখনকার ভদ্রলোকেরা দাসুৱায়ের পাঁচালিতেই যার পর নাই বিরক্ত;—গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পাঁচালি তাঁহাদিগের নিকট কি পরিমাণ প্রীতিকর, অতিমনোহর, ও রসমাধুর্যযুক্ত বোধ হইবে, তাহা অনেকক্ষণ না ভাবিয়া বলিতে পারি না। আমরা নিম্নে পাঠকবর্গের বিবেচনার জন্য ইহার কএক পংক্তি সাদরে উদ্ধৃত করিলাম।

‘পাঁচালির ভক্তি যত শুদ্ধি সমুদয়।

চৌদ্দহাজার আঁচালপেঁচাল মিথ্যা সমুদয়।

ভাল কথা শুনে মিঠা লাগে সমুদয়।

খান দুই তিন মজার কথা আছে সমুদয়।

মিঠা যেমন কাশীর চিনি আছে সমুদয়।

৯। ক্রেটশ ও এণ্টনীর বক্তৃতা। জী

হরিন্দাস গঙ্গোপাধ্যায় প্রকাশক।—শেক্সপীরের জুলিয়াস সিজার নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটকে ক্রেটশ ও এণ্টনীর যে বক্তৃতা আছে, গ্রন্থকার তাহাই অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। বাঁহারা যুলে অনধীতী, এই অনুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইবেন। তাঁহারা ইহাতে পদযোজনার লালিত্য দেখিবেন, এবং অর্থের ও গাভীর্য দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ

অনুভব করিবেন। আর বাঁহারা শেক্সপীর পড়িয়াছেন, তাঁহারা গ্রন্থকারকে সহোদরের ন্যায় ঘেঁষ করিলেও বলিবেন যে, তাঁহার সমস্ত পরিভ্রমই বিফল হইয়াছে। হৃদয়ের অনুবাদ কাব্য,—কাব্যের আবার অনুবাদ কি? কাব্যের মধ্যে শেক্সপীরেরও কি আবার অনুবাদ সম্ভবে? অলৌকিক শেক্সপীরের ক্রেটশ ও এণ্টনীর মুখে বাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িবার সময়ে মূর্ত্তিমতী কাপুরুষতাও জেজে প্রজ্জলিত হইয়া উঠে, পাষাণও কঙ্কণায় বিগলিত হয়। যে ভাব্যর উচ্চা লিপিত হইয়াছে, সেই ভাব্যরও উহার রূপান্তর হইতে পারে না, এবং বোধ হয় কবি স্বয়ং আসিয়া পুনরায় চেষ্টা করিলেও উহার একটি অক্ষর অপসারণ কিংবা উহাতে আর একটি অক্ষর বৃ্তন যোজন করিতে পারেন না। আমরা তথাপি অনুবাদকে নিন্দা করি না। অনেকেই অনুবাদ করিতে গিয়া অশুকরণ করিতে শিখেন, অশুকরণ করিতে যত্নশীল হইয়া শেষে উদ্ভাবনার আলোক দেখিতে পান। যদি তাহা আর ভিলে তুলনা কর প্রায়শ্চিত্তশূন্য পঞ্চ মহাপাতক মধ্যে পরিগণিত না হয়, তবে বলিতে পারি যে, উপন্যাস-গুরু ওরাল্টার ক্রুটের প্রথম শিক্ষাও এইরূপে হইয়াছিল।

গ্রন্থের মুখপত্রে লিখিত আছে “ভাওয়াল-রাজ-হুহিতা জীমতী কৃপাময়ী দেবীর কৃপাশীলতায় এই কবিতাটি লোক শোচনের বিষয়ীভূত হইল।” দেবী কৃপাময়ী এবং

তদীয় সহোদর কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ  
সত্য সত্যই বঙ্গীর সাহিত্যের মুহূর্ত ও  
আশ্রয় হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহাদিগের  
দৃষ্টিতে ভূম্যমিবর্ণের অনুকরণীয়।

১০। জাতীয়-সংগীত। প্রথম ভাগ।  
স্বদেশানুরাগোদ্দীপক সঙ্গীত-মালা। বাঁ-  
হার প্রযুক্ত এই ক্ষুদ্র গীতি-পুস্তকখানি  
প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহাকে আমরা অ-  
গণ্য ধন্যবাদ প্রদান করি। তিনি বুদ্ধি-  
মান, কারণ তিনি কচির গতি বুঝিয়া-  
ছেন। তিনি স্বদেশবৎসল, কারণ এই  
সংগ্রহেই তিনি বিলক্ষণ সহৃদয়তার পরিচয়  
দিয়াছেন। স্বদেশীয় ব্যক্তিমাত্রেরই এই  
পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করা ধর্মসঙ্গত  
কার্য। ইহাতে কবির হেমচন্দ্রের বিখ্যাত  
ভারত-সংগীত, বাঙ্কবের প্রবাসী বঙ্ক  
কর্তৃক লিখিত হৃদয়হারিণী যমুনালহরী,  
বাবু সত্যেন্দ্রনাথের “মিলে সব ভারত স-  
স্তান” নামক জলদ-গম্ভীরী গীতি, বাবু ম-  
নোমোহন বসুর ‘দিনের দিন, সবে দীন’  
নামক মর্মস্পর্শিনী পদাবলী, বাবু দ্বিজেন-  
্দ্রনাথের “মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত ভো-  
মারি” এবং সংগ্রহকারের ‘মা জাগিলে  
সব ভারত মলনা’ প্রভৃতি কতকগুলি অতি  
প্রশংসনীয় গীত সংগৃহীত হইয়াছে।  
এই গীত গুলি সর্বত্র প্রচলিত, যে,  
ইহার কোনটিরই পৃথক উদ্দেশ্য করা আব-  
শ্যক বোধ হইল না। সাধারণীর সুবিজ্ঞ  
সম্পাদক এই গীতসংগ্রহে ‘সাহজানা আ-  
লম্’ ইত্যাদিক লক্ষণের পসিদ্ধগীত দিচয়

প্রথিত না দেখিয়া কোভ ও হুংথ প্রকাশ  
করিয়াছিলেন। আমরা ভরসা করি সংগ্র-  
হকার ইহার দ্বিতীয় সংস্করণের সময় সাধা-  
রনীর কথাগুলি স্মরণ রাখিবেন, এবং পলা-  
সির যুদ্ধের যে সকল দীপক কবিতা গীতে  
পরিণত হইতে পারে, তাহাও এই সংগ্রহে উ-  
দ্ধৃত করিয়া ইহার পূর্ণতা সম্পাদন করিবেন।

১১। কাশ্মীর কুসুম। অর্থাৎ কা-  
শ্মীরের বিবরণ। শ্রীরাজেন্দ্রমোহন বসু  
কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। ভারতবর্ষ  
নৈসর্গিক শোভায় ভূতলে স্বর্গ বলিয়া  
পরিচিত, কাশ্মীর রাজ্য সেই ভারতবর্ষের  
মুকুট-মণি। কাশ্মীরের বিবরণ পাঠে  
সকলেরই যে কৌতুহল জন্মিবে, ইহাতে  
কিছুই বিচিত্রতা নাই। গ্রন্থকার কাশ্মী-  
রের প্রাকৃত সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন  
এবং উহার প্রাকৃত সৌন্দর্য বর্ণনাই স-  
মধিক প্রয়াস পাইয়াছেন। যদি ঐতি-  
হাসিক বিষয়ের গুঢ় অমুসন্ধান করা এবং  
সমাজসংস্থানের অন্তস্তল পর্য্যন্ত পরীক্ষা  
করিয়া দেখা তাঁহার উদ্দেশ্যের অন্তর্গত  
হইত, তাহা হইলে এই গ্রন্থের গৌরব  
অনেক বাড়িত। যাহা হউক, তিনি প্র-  
থম উদ্যমেই আমাদের কাছে যাহা উপহার  
দিয়াছেন, আমরা তজ্জন্য তাঁহার নিকট  
বাধিত রহিলাম। কাশ্মীরের মর্ম কথা  
বুঝিতে না পারি, এই উপদেশের গ্রন্থ পাঠে  
কাশ্মীরের বহিরাবরণ সংক্রান্ত অনেক কথা  
জানিতে পাইব। ইহার লেখা অনেক  
স্থলেই উপন্যাসের ন্যায় মনোহর।

১২। বিনোদিনী। মাসিক পত্রিকা, জীমতী ভুবনমোহিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত। আমরা ইহার প্রথমসংখ্যা দর্শনে আশা প্রকাশ করিয়াছিলাম, ইহার উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে আমরাদিগের সেই আশা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহাতে যে সকল কবিতা প্রকটিত হইতেছে, তাহা ভুবনমোহিনীর নামের অযোগ্য নহে। এদেশের আধুনিক সভ্যদিগের মধ্যে অমেরকেই ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী। বঙ্গীয় কুলকামিনীগণ নৃশিক্ষিত হউন, ইহাই তাঁহাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং এই উদ্দেশ্যসাধনেষ্ট্র জ্ঞান তাঁহারা নিজ নিজ বক্ষঃস্থল বিদ্যারণ্যপূর্বক রক্তধারা ঢালিয়া দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে, তাঁহারা এই অমূল্যবর্দ্ধিতা বঙ্গবালাকে উৎসাহের সাহায্যদানেও হুঁঠিত।

১৩। উত্তরপাড়া হিতকরী সভার ত্রয়োদশ সাংবৎসরিক বিবরণ।—উত্তরপাড়া গ্রাম অন্যান্য সংকার্যের সঙ্গে এই হিতকরী সভার অমুষ্ঠাননিচর দ্বারাই অধিক পরিচিত। আমরা সভার এই বিবরণী পাঠ করিয়া মুখী হইলাম। সভা আপাততঃ ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানেষ্ট্র অধিক মনোযোগ দিতেছেন। ইহার অপর্যায় বিভাগেও উপযুক্তরূপে কার্য হয়, এমন বোধ হইল না। হিতকরী সভা সম্রাতি দেশার চিকিৎসা শাস্ত্রের অমূল্যলভ্যের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের উ-

দ্যোগ করিতেছেন। ইহা প্রশংসনীয়।

১৪। উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ভূরক্তান্ত। আলিগড়ের রাজকীয় বিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক জীকালীপ্রসাদ শাণ্ডিল্য কর্তৃক সঙ্কলিত।—উত্তর পশ্চিমাঞ্চল ভারতবাসী ব্যক্তি মাত্রেরই আদরের স্থান; বর্বারান ও বুৎবক, রোগী ও নৃহকার তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণবিদ্যাসী, ঐতিহাসিক ও কবি সকলেরই স্মরণীয়। ভারতের উন্নতি এই প্রদেশে, অধোগতি এই প্রদেশে, এবং বোধ হয় ভাবি আশাও এই প্রদেশে। বঙ্গভাষায় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন উৎকৃষ্ট ভূগোল ছিল না। গ্রন্থকার সেই অভাব ঘোচন করিয়া ধন্যবাদাহঁ হইরাছেন। উত্তর পশ্চিমের লোকসংখ্যামধ্যে প্রায় চৌদ্দ আনা হিন্দু, এবং কেবল হিন্দুই ইংলণ্ডের লোকসংখ্যার দ্বিগুণ।

১৫। আমার বাসগৃহ অর্থাৎ মানব দেহের বিবরণ। ত্রীমচরণ নাথ কর্তৃক সংগৃহীত। এই পুস্তকখানিতে শারীরসংস্থান বিদ্যার অবশ্যজ্ঞের কথা সকল সচিত্র বিবৃত হইরাছে। ইহার লেখা সরল এবং বালক শিক্ষার উপযোগী।

১৬। চিকিৎসাসার। ত্রীমচরণ নাথ কর্তৃক প্রকাশিত। ইহার বিজ্ঞাপনে লিখিত আছে, “জিকিৎসাসার কেবল চিকিৎসাব্যবসারিদিগের প্রয়োজনীয় নহে, প্রতি পরিবারের কর্তার বা কর্তার ইহা অধ্যয়ন করা কর্তব্য।”

## নাটক।

( আধুনিক বাঙ্গালা নাটক । ) \*

কোন এক প্রসিদ্ধ কবি বলিয়াছেন যে, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্যই মনুষ্যের উৎকৃষ্টতম পাঠ্য পুস্তক। কবি বা দার্শনিক, ব্যবসায়ী বা রাজনীতিজ্ঞ, সকলের পক্ষেই মনুষ্যচরিত্রের কোন বা কোন ভাগ মূলধন। যিনি মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি কবি হইলে ব্যাস বা সেকপিরর, দার্শনিক হইলে শঙ্করাচার্য বা কোম্বৎ, ব্যবসায়ী হইলে ঈশ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি, এবং রাজনীতিজ্ঞ হইলে কণিক বা মেকিরাবেলি, চাণক্য বা ডিস্টেলি।

এই মানব চরিত্রের বৈচিত্র্য নানা প্রকারে সাধিত হয়। মনুষ্য সমগ্রশ্রোতের তাড়নায় নিরন্তরই ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ করিতেছে। এই রূপেই প্রাচ্য আৰ্য্যজাতির অধঃপতন ও প্রতীচীন আমেরিক জাতির অভ্যুত্থান। এই জন্যই ইংলণ্ড তেরিজ জমা খরচ দেখিতেছে, স্পেন গৃহবিবাদ করিতেছে, ফ্রান্স ক্ষতদেহে প্রলেপ দিতেছে, প্রুসিয়া অস্ত্রবলে গর্বিত, তুর্কি খ্রীষ্টানগণের যড়যন্ত্রভয়ে বিকম্পিত। ইত্যাদিরূপে সমগ্র শ্রোতের তটাবিধাত ইতিহাসের সমালোচ্য। মনুষ্য জীবনের কিয়ৎপরিমাণে

\* ১। শরৎ সরোজিনী। ( দ্বিতীয় সংস্করণ )।

২। হেমলতা। ( দ্বিতীয় সংস্করণ )। জীহরলাল রায় প্রণীত।

৩। মহারাষ্ট্রকলর। জিটমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

৪। যৌবনে যোগিনী। জীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত।

৫। ভারতবিজয়। জীরাঙ্গেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রণীত।

৬। জয়পাল। জীপ্রমথনাথ মিত্র প্রণীত।

৭। ভারতের মুখশশী যবনকবলে। জীনবীনচন্দ্র বিন্দ্যারত্ন কর্তৃক বিরচিত।

৮। কল্পপাল নাটক। ( ইংরেজী মেকবেথ অবলম্বন করিয়া ) জীহরলাল রায় প্রণীত।

৯। শত্রুসংহার। ( বেণীসংহার নাটক অবলম্বন করিয়া ) জীহরলাল রায় প্রণীত।

১০। প্রণয়ের প্রতিকল নাটক। জীমোহিনীমোহন ঘোষাল কর্তৃক প্রণীত।

১১। প্রকৃতবন্ধু। জীব্রজেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত।

১২। কুণ্ডলকামিনী। জীরজনীকান্ত শর্মা বিরচিত।

১৩। প্রমোদমনোরমা। জীবিশেষ্বর বসু কর্তৃক প্রণীত।

ক্ষিত্যপ্তেজোমক এই ভূত চতুর্ভুজের দাস ; এবং আহার ও পরিচ্ছদ বৈচিত্র্যেও মানবীর চরিত্রের বৈচিত্র্য হয় থাকে । এজন্যই নাকি তগুল-ভোজী ভারতবাসী, গোল-আলু-ভোজী আইরিস ও রক্তাফলভোজী দাক্ষিণামেরিক, মাংসভুক বিজেতার চিরদাসঘে নিযুক্ত রহিয়াছে । এজন্যই ভারতবর্ষের বুদ্ধির দীপ এত ঝঞ্জাবাতেও নিবিয়াও মিবে না, আর লাপলাণ্ড বা শিবির দেশবাসীর তিমি-পঙ্ক্তর-নির্মিত কুটীরমধ্যে তিমিতৈল পান করা শুচিয়াও শুচেনা । মনুষ্যচরিত্র লইয়া শীতবাতাতপের এইরূপ ক্রীড়া কুর্দন উন্নত পদার্থবিদ্যার এবং আধুনিক ক্রীড়-বিদ্যার সমালোচ্য সামগ্রী ।

আবার দেখিতে গেলে মনুষ্য কিরূপ পরিমাণে নীতিশিক্ষার স্বল্প-গঠিত পুত্রল । বগিষ্ঠ ত্তিক ইংরেজের নিকট নিত্য নীতি শিক্ষা করিয়া, আধুনিক আর্থসম্ভান এখন অনারাসে অতিথিকে প্রত্যাখ্যান ও স্বীয় ভবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন;—মুসলমানের নিকট নীতি শিক্ষা করিয়া পক ক্রীড়াকলের মত, সুরগন্ধি কপূরখণ্ডের মত, মহিলাগণকে বাস্পস্পর্শবিরহিত অবরোধে বদ্ধ করিয়া রাখেন । আবার এই নীতি-শিক্ষার প্রভাব বলেই পরমভাগবত নিত্যানন্দগৌড়ীসমুত্ত হুবক সুরা সেবনে স্থগিত, আর এই শিক্ষাবলেই প্রবঞ্চকের প্রিয়শিষ্য ধর্ম্মাচার্যের পদে অভিষিক্ত ।

আর এক প্রকার দেখিতে গেলে য-

হুয়া প্রাসাদশোভিনী বাতশলাকার মায় সর্বদাই তাড়িত হইয়া থাকে । সেই তাড়নাকার কারণসম্মতিকে সংসার বলা যায় । সকল মনুষ্যই এই জগৎ সংসারের ক্রীড়াকন্দুক । সময়ের তরঙ্গাভিঘাতকে, জড় জগতের শক্তি সামর্থ্যকে, বা নীতির উপদেশপরিচালনাকে সংসারতাড়না বলি না ; মনুষ্য এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় আবেগের উপর যে পরকীয় আবেগের আঘাত প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই সংসার তাড়না বলি । সংসার তাড়নার একটী অপূর্ব নিয়ম আছে । তাহা এইরূপ ;—দর্শনিক হইতে দশজনে ভিন্ন ভিন্ন অভি-প্রায়ে তোমার তাড়না করিতেছে, অথচ তোমার প্রকৃতিবলে তুমি একটি নির্দিষ্ট দিকে চালিত হইতেছ । আমরা যাহাকে প্রকৃতি বলিলাম এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা তাহাকেই অদৃষ্ট বলেন । এই অদৃষ্ট বা প্রকৃতিপরিণত মানবের সহিত, সংসার বলিয়া অভিহিত পরকীয় আবেগসমষ্টির যে যুদ্ধ, তাহাই নাটকে বর্ণিত হইয়া থাকে । এই যুদ্ধ যে একের সহিত অনেকে করিতেছে, এমন নহে । এই সংসারে সকলেই সকলের সহিত যুদ্ধ করিতেছে, অথচ সময় বিশেষে এই সময়ক্ষেত্রে এক একজন মাত্র অধিনায়ক বা অধিনীত রূপে পরিলক্ষিত হইতেছেন । কুরুক্ষেত্রের ভীষণ সময়ে সপ্ত অকৌহলীসহিত একাদশ অকৌহলী সময়ে প্রবৃত্ত ছিল, অথচ তাহার ভাগ-বিশেষ অধিনায়কের নামে ভীষণপর্ষ, বা

দ্রোণপৰ্ব বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। সংসারও সেইরূপ; কত শ্বেতপুৰুষ ভারতবাসীকে উৎপীড়িত করিতেছেন, এবং স্বাকীৰ্য অমল শ্বেত অঙ্গে কুৎসার দিয়া রাজ্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিতেছেন। কিন্তু সময়ে সময়ে কেবল মিয়র্স বা ফুলারই অধিনায়ক বা অধিনীতরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন। নাটকে সেইরূপ; কেটে, মল্লিক, এড্‌মণ্ড, এড্‌গার, বিদুষক, গণরিল, রিগান, ও কর্দ্‌লিয়া সকলের মধ্যেই আবেগের “স্বাত প্রতিস্বাত” চলিয়াছে; কিন্তু সকলের মধ্যে বার্ক্‌কোর বেগপরিচালিত হৃপতি লীয়ারই অধিনীত, সুতরাং সমস্ত নাটক খানির নাম ‘লীয়ার’। নাটকের অভিমুখরূপী দিনেমার রাজকুমার সপ্তরথী পরিবেষ্টিত,—রজনীযোগে ভূতযোনিকর্তৃক আক্রান্ত, পরদিন প্রগয়িনীকর্তৃক প্রত্যাখ্যাত; কখনপাপিষ্ঠা গর্ভধারিণীর সহিত বাগ্‌বন্ধ করিতেছেন, আবার কখন বা প্রাণবদ্ধ হোরেশিয়োর পরামর্শে সংশরাজ্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন; লেয়ার্টসের বিষাক্ত বাণে জর্জরিত কলেবর হইয়া ঈদৃশ কপটচরণে ঘূণায় অভিভূত;—আবার সেই মুহূর্ত্তেই বজুর প্রাণরক্ষাজন্য মৃত্যুশয্যা হইতে উত্থান করিতেছেন। তিনিই অধিনায়ক এবং তিনিই অধিনীত; সুতরাং সেই নাটকের নাম ‘হেমলেট’।

মূলতঃ বলিতে গেলে অধিনায়ক বা অধিনীত বিশেষের সংসার ভাঙনার বা

পরকীর্ত্ত আবেগসমষ্টির উত্তেজনার যে চরিত্রগত পরিবর্তন ও পরিণাম হইয়া থাকে, তাহা প্রদর্শন করাই নাটকের মুখ্য উদ্দেশ্য। যিনি শিথিতে জানেন তিনি নাটক হইতে ইহলোকের চরমশিক্ষা লাভ করিতে পারেন। বিষয়ক্ষেণে মৃত্যু হয়, বঙ্গদেশে বাস করিলে শরীর দুর্বল হয়, কেবল মাত্র অন্নভোজী হইলে মনুষ্য লেখোদর স্তবরাং অলস-প্রকৃতি হয়, বিলাসপ্রিয় জাতি ক্রমে কঠোরপ্রাণ জাতির কর-কবলিত হয়, ইতিহাস বা বিজ্ঞানের সমীপে যেমন এইরূপ নানা কথা শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ কাব্যনাটকের স্থানেও আমরা নানা গভীর নীতি শিক্ষা করিয়া থাকি। যদি ঘৃণাকরেও সরলা প্রগয়িনীকে অনর্থক অবিশ্বাস কর, তবে তুমি ওথেলো রূপা পাঠ করিয়াছ; আবার যদি প্রগয়িনীর অসঙ্গত আকাক্ষা পরিপূরণ করিতে ঘৃণাকরে সম্মত হও, তবে তুমি হেকবেথ রূপা পড়িয়াছ। সম্মানলুন্ধ ব্যক্তিরা প্রায়ই চাটুবচনপ্রিয়। তুমি লীয়ার পড়িয়াছ এখনও কি চাটুবচনে হত্যা করিবে? আর তুমি নেপোলিয়ন, লিঙ্কন, বিখমার্ক বা ডিস্ট্রেসি, তোমারা কি মনে কর যে কেবল নীজরের বিকছেই ক্রটসের বিশ্বাসঘাতকতার সমাধা হইয়াছে? শত শত ক্রটস হয়ত এই মুহূর্ত্তেই তোমাদের নিমিত্ত গুপ্ত-অস্ত্র শাণিত করিতেছে। কবির কল্পনা হইতে এইরূপ গভীর উপদেশ সকল পাওয়া যায়। তবে কেহ তিনবৎসরেও খজু

পাঠের ব্যাখ্যা করিতে পারে না, আর কেহ যাবজ্জীবনেও উৎকৃষ্ট নাটকের মর্ম কথার বর্ণনাত্মক বুঝিতে পারে না। সংসার তাড়নার অধিনায়ক বা অধিনীত-বিশেষের চরিত্রগত পরিবর্তন ও পরিণাম যখন নাটকের উদ্দেশ্য, এবং মানসিক আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছ্বাসিত তরঙ্গের ‘ঘাত প্রতিঘাতই’ যখন নাটকের জীবন, তখন কথোপকথন বা স্বগত বচনই নাটকের একমাত্র দেহ।

অন্তরূপ কাব্যে কম্পনার অধিকতর নীলাচাতুরি আছে, সৌন্দর্যের স্ফুটতর বিকাশ আছে, হৃদয়ের তরতর উচ্ছ্বাস আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাম অবশ করে এমন ঘোহিনী শক্তি আছে, এবং হয়ত অনেক স্থলে আবেগেরও তরঙ্গ আছে, কিন্তু কেবল মাত্র নাটকেই সেই তরঙ্গের “ঘাত প্রতিঘাত” দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন কোন বস্তুর নিকট চিত্তাবেগ প্রকাশ করিলেন ; বস্তু তাঁহাকে সামান্যবাক্যে উত্তর দিলেন ; প্রথম বক্তার আবেগ অমনিই অন্যদিকে ধাবিত হইল, বস্তুহৃদয়ের আর এক দিকে এবার আঘাত লাগিল, বস্তু এবার সামান্য না করিয়া সহানুভূতি-ভরে দুইটি কর্ণী কহিয়া কদকণ্ঠ হইলেন, তাহাতেই আবার প্রথম বক্তা বিচলিত হইলেন।—এইরূপ কথোপকথন নাটকের দেহ। কিন্তু উপকথন থাকিলেই যে নাটকের বস্তু হইল এরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। তাহা হইলে প্লেটোর

তর্কবাদ বা কলমোহন বস্কোপাধ্যায়ের যড়দর্শনসংবাদ উৎকৃষ্ট নাটক ; কেন না তর্কিকের মধ্যে যত আবেগ আছে, এত বোধ হয় সংসারে আর কাহারও নাই। কিন্তু তাহাতে সংসার কৈ ? সংসারের তাড়না কৈ ? অধিনায়ক বা অধিনীত কৈ ? ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন, ঐ যড়দর্শনসংবাদে বা প্লেটোর তর্কবাদে যদি দুটি একটি ত্রীলোক থাকিত, ও সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দর গল্প থাকিত, তাহা হইলেই ঐ গ্রন্থগুলি নাটক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। এটিও নিতান্ত ভ্রমের কথা। তাহা যদি হইত তবে টেক চাঁদের হরিহর, পদ্মাবতীর কথোপকথন, এবং যজ্ঞ বাবুর ধাত্রী-শিক্ষাও উৎকৃষ্ট নাটক বলিয়া সেকপীরয়ের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারিত। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের দেক আছে, প্রায়ই প্রাণ নাই। কেবল রসপূর্ণ কথোপকথন আছে, আবেগ তরঙ্গের চলাচল নাই। কেবল নাটক বলিয়া নয়, আমরা সর্বত্রই শুদ্ধ বাহ্যভূষণের প্রতি দৃষ্টি রাখি, এবং বাহ্য চিত্রের উদ্দেশ্য কি তাহা ভুলিয়া যাই। অন্যান্য কাব্যেতেও এইরূপ হইয়াছে। এতদিন বাঙ্গালা বাহ্যকে প্রধান কবি বলিয়া জ্ঞান করিতেছিল, সেই ভারতচন্দ্র একজন বাহ্যভূষণপ্রিয় কবি ; তাঁহার দৃষ্টি কেবল ছন্দে আর লালিত্যে, অনুপ্রাসে ও ঘমকে ; এখনও বাহ্যদিগকে আমরা কাব্যকাননের সারী শুক বলিয়া প্রিয় সম্বোধন করি, তাঁ-

হারাও কি অনেক সময়ে কেবল বাহি-  
ন্যাসে মত্ত নহেন? তখন সাতু বাবু, নিধু  
বাবু, কোকিল, কমল, জয়রঞ্জন, কন্দয,  
নাড়িম লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, এখন হইয়াছে  
“নৈশগগনের সাক্ষ্য সমীরণ”—আর “নৈ-  
দায় তপনের মূৰ্খরদাহন”। ফল কথা বর্ণন-  
কাব্যে এখনও আমরা শব্দের অনুচিত শা-  
সন এড়াইতে পারি নাই। সেইরূপ স-  
ঙ্গীতে দেখিবেন, কলাবত কেবল তান লয়  
মান প্রভৃতি সঙ্গীতের বাহ্য প্রকৃতি লই-  
য়াই ব্যস্ত। এথিকে ককণরসের গানে  
বীভৎস-রসপূর্ণ গমক সরিবেশিত করি-  
তেছেন, বা ভক্তিরসে উৎকট বিকট গী-  
টকারি যোজনা করিয়া সম্পূর্ণ রসভঙ্গ  
করিতেছেন, সঙ্গীতের অন্তঃপ্রকৃতির প্রতি  
তাহার দৃষ্টিই নাই। এইরূপ সকল বি-  
ষয়েই আমরা বাহ্যভাষ্যের সমুদ্রে। আ-  
মাদের মধ্যে সভা আছে, সমিতি আছে,  
সমাজ আছে, কিন্তু একতা নাই। ত্রি-  
কণ্ঠীশোভিত, ত্রিগুণক-চর্চিত, সর্বাস্থে  
হরিনামাক্রান্ত গোস্বামী বাবাজী আছেন,  
আর ইমন-গীতি-পরিপূরিত, চল-বীজন-সে-  
বিত, স্ফাটিক-দীপাধার-বিলম্বিত প্রার্থনা-  
মন্দির আছে, কিন্তু কোথাও এক শতক  
ভক্তি আছে কি না সম্ভেদ? এখন গে-  
করা বসন পরিধান করিলেই যোগী, আর  
কথোপকথন প্রসঙ্গে গল্প রচনা করি-  
লেই নাটক। অথো কি হুজুগা।

কথোপকথন নাটকের শরীর, এই  
কথার নাটকীয়ত্ব বর্ণনের পর্যাপ্তি হয় না।

আবেগের তরঙ্গচলাচল সাধারণতঃ ক-  
থোপকথনেই বিকশিত হয় বটে; কিন্তু  
আবেগচলাচলের আরও দুইরূপ পরিণাম  
আছে। এক, আবেগের দুইটি প্রতীপ-  
গামী সংঘাত হইতে ঘোরতর সংশয়ের  
উৎপত্তি এবং তাহা হইতে আত্মচিতপ-  
রীক্ষা, আর আবেগের পূর্ণতা হইতে উ-  
চ্ছ্বাস এবং সেই উচ্ছ্বাসের পরিণাম  
গান। এই আত্মচিত পরীক্ষা ও কণ্ঠো-  
চ্ছ্বাস উভয়ই স্বগত হইয়া থাকে, এং ই-  
হাও নাটকের অবয়বের মধ্যে। একা-  
দিক ব্যক্তি মিলিয়া যে নাটকের মধ্যে  
গান করে, এবং কাহারও আত্মচিত প-  
রীক্ষা না হইয়াও যে স্বগত বাক্যের বি-  
স্তার থাকে—সে সকল নাটকের অঙ্গী-  
ভূত পদার্থ নহে।

এখন নাটকের পরিচ্ছদের কথা।  
নাটকের ছন্দোবদ্ধন, ভাষার গাঁথনি বা  
রচনা-প্রণালী কিরূপ হওয়া উচিত? এই  
বার অনেক রুতবিদের মতের সহিত আমা-  
দের মতবিরোধ উপস্থিত। আমাদের মূল-  
মন্ত্রানুসারে বঙ্গীয় নাটককারের আবেগের  
তরঙ্গই যখন নাটকের জীবন, তখন ইহার  
পরিচ্ছদ বা ভাষাও সম্পূর্ণ তরঙ্গায়িত  
হওয়া আবশ্যিক। ভাষার নিয়মিত তর-  
ঙ্গকেই রচনার ছন্দ বলিতে পারা যায়।  
নাটকে সেইরূপ ছন্দোবদ্ধ রচনা হইলেই  
স্বভাবসঙ্গত হয়। স্বা-  
বেখানে দেখি-  
বেম মানসিক উত্তেজনা, এইখানেই দেখি-  
বেম কথা ছন্দোবধী। আমাদের যে



মৃত্যু, তাহাতে যে রূপ ছন্দ আছে, শৌক্যের যে উচ্চাঙ্গ ও ক্রোধের যে গর্জন, তাহাতেও সেইরূপ ছন্দ আছে ।

মনুষ্যমণ্ডল আবেগপূর্ণ হইলে কথা কেন ছন্দোময়ী হয়, যদিও এপ্রশ্নের উত্তর দান করা তত সহজ নহে, কিন্তু এরূপ যে হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই । এই জগৎ পৃথিবীর সকল উৎকৃষ্ট নাটককারই ছন্দোময়ী ভাষাতে নাটক রচনা করিয়াছেন । যদিও সংস্কৃত ভাষার প্রধান নাটককারেরা গদ্য পদ্য উভয়বিধ প্রকারেই নাটকের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের মূল মন্ত্রের সমর্থন হয়, অপিচ খণ্ডন হয় না ; কেন না সংস্কৃতের যে গদ্য তাহা অন্য ভাষার পদ্য বলিলেও চলে । যখন শাপবশে লুপ্তস্মৃতি হুমত হুপতি শকুন্তলাকে শুদ্ধান্তচারিণী করিতে অস্বীকৃত হইলেন, তখন সেই যে শকুন্তলা একবার মাত্র উর্দ্ধ্বদৃষ্টি করিয়া আবার নতনয়না হইয়া সর্বসম্বন্ধকে সম্বোধন করিয়া হৃদয়ভেদিনী উক্তি প্রয়োগ করিলেন,—বলিলেন “ ভাবদি বশব্রজে দেখি মে অন্তরং ” এই উক্তিকে আমরা গদ্য বলি না ইহা পদ্যের চরমোৎকর্ষ । ইহাতে তরঙ্গ আছে, ছন্দ আছে, ন্যাস আছে, লয় আছে । সংস্কৃত নাটকের গদ্য এইরূপ, আর তাহাতেই সংস্কৃত নাটকে গদ্য পদ্য উভয় পরিচ্ছদই সন্নিবেশিত আছে । বাঙ্গালা গদ্যের অবস্থা সেরূপ নহে, বাঙ্গালা এখনও এম-

ইয়া এলাইয়া পড়ে, ঘরি ঘরি করিয়া রাখিতে হয় । সুতরাং বাঙ্গালা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলিত করা নিতান্ত আবশ্যিক । যে ছন্দে হিন্দুস্থানী সিপাহী দুর্বল বাঙ্গালির উপর স্বীয় ক্রোধ প্রকাশ করে, যে রূপ ছন্দে পুরশোক-বিহ্বলা জননী বিনাইয়া বিনাইয়া আপনার শোক প্রকাশ করে, আবেগের তাহাই প্রকৃত পরিচ্ছদ । আবেগ-জীবন নাটকে সেইরূপ তরঙ্গায়িত রচনা থাকা নিতান্ত আবশ্যিক, অর্থাৎ নাটকের ভাষা সাধারণতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবদ্ধ হওয়া উচিত ।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলা আমাদের নিতান্ত কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে । নাটকের ভাষা কেবল তরঙ্গায়িত বা ছন্দোময়ী হইলেই যথেষ্ট হইবে না । ভাষার জমাট গাঁথনি হওয়া চাই । যেখানে মানসিক আবেগের গভীরতা আছে, সেখানে ভাষার গাঁথনি কখন বালকের মত আধ আধ বা গোশ্বামীর গীতিকাব্যোক্ত ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মল্ল-সমীরের ন্যায় দীর্ঘবাহী ও নিম্নাকর্ষণকারী হয় না । না বাঙ্গালা দেশেই আছে, আর না বাঙ্গালা কাব্যেই আছে, কোথাও শৌক্যের বা ক্রোধের, স্নানার বা সাহসের গভীরতা নাই । সুতরাং বাঙ্গালা ভাষা সর্বত্রই চিরবিরহাস্তে মিলিত নারকসমীপে রসালসা নাগ্নিকার মত কেবলই এলাইয়া এলাইয়া যায় ও হেলিয়া হেলিয়া পড়ে ।

ভাষার এ বিলাসিতা হইতে আমরা কবে মুক্তিলাভ করিব বলিতে পারি না।

সংবাদ পত্রে সর্বদা দেখিতে পাই, বাঙ্গালি আজি কালি পৃথিবীর মধ্যে সর্বোপেক্ষা নিম্পীড়িত জীব। শুনিতে পাই এই দুর্বল বাঙ্গালির উপর নাকি স্বদেশী বিদেশী উভয়ই সমান অত্যাচার করিয়া থাকেন। শুনিতে পাই সাহেব বা সাহেবের কর্ণচারী, জমীদার বা মহাজন, মহামারী বা জলকষ্ট সকলই নাকি বাঙ্গালির উপর সমান দৌরাস্ত্র্য করে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে এই নিম্পীড়িত জাতির ভাষায় এত বিলাসিতা কেন? তাহার মধ্যে পীড়া, গাত্রে কশাঘাত, হৃদয়ে বেদনা, সে কেন গলি গলি আধ্ধার তালে ঝাঁঝিট খাবাজ গাইয়া ডমণ করিয়া বেড়ায়? তাহার ভাষায় আবার এত রসাবেশ কেন? লালিতা কেন? মাধুর্য্য কেন? আর সেই বাঙ্গালির রচিত নাটকনামধারি কথোপকথনঘটায় এত প্রণয়, প্রণয়, প্রণয়, কেন? বাস্তবিক এই বাল-স্বভাব-মূলভ অম্প্রাণ প্রণয়েই বাঙ্গালার কাব্য বল, নাটক বল, সমাজ বল, আর যাহাই বল, সকলই ছারখার হইল। পূর্বে এই প্রণয়ের তাড়নায় জটাবল্কলধারী যোগী সেতুবন্ধনে প্রবৃত্ত হইয়া ছিদ্মন, এই প্রণয়ের বেগে শত শত সতী নারী জ্বলন্তচিতায় নৃশংস্যাবোধে মৃতপতিপাঞ্চে শয়ন করিতেন, আর এখনকার প্রণয়িনীগণ ভর্তার দৃঢ় অনুরোধে দুর্গেশ-নন্দিনী পাঠ করেন, আর প্রণয়বতার প্র-

ণয়প্রতিমার অনুরোধে তাহাকে সঙ্গে লইয়া ইডন্ উদ্যানে বাস্তুসেবন করিতে যান। সমাজে প্রণয়ের বেগ এইরূপ; তবে নাটকে তদপেক্ষা বেগতীর হইবে,—তাহার সম্ভাবনা কেন কর? রাজী এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ড-বাসীর মানসিক আবেগের গভীরতা ছিল, সেই সময়ের ভাষার প্রগাঢ়তাও সেইরূপ ভূরি পরিমাণে ছিল, তাহার ফল বেকন ও ফুলর, রালী ও সেকপিয়র, বেনজনসন ও মাসিঞ্জর। আমরা মনোমধ্যে একটু মাত্র আবেগ হইলেই শফরীর মত ফর ফর করি, দুখানি ক্ষুদ্র পক্ষ পাইলেই পিপীলিকার মত আকাশে উড়ীন হইয়া হিংস্র পক্ষিগণের কবলাস্ত্রে নির্ঝগপদ প্রাপ্ত হই। আমাদের মনের যেরূপ বেগ নাই, আমাদের ভাষার সেইরূপ গাঢ়তা ও তেজ নাই। সেকপিয়রের প্রণয়বীর রোমীয় যখন একটিমাত্র শ্লোক উচ্চারণ করেন,—He jests at scars, that never felt a wound,— আমাদের লীলাবতীর প্রণয়বাতুল ললিতমোহন সেই সময়ে আপনার পুস্তকাগারে বসিয়া কেবল হৃদয়ভাবের ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা ও টীকার উপর টীকা ও ভাষ্যের উপর অনূভাষ্য জপনা করিত। যাহাদের যেরূপ স্বভাব চরিত্র, তাহাদের ভাষাও সেইরূপ, কাব্যও সেইরূপ, নাটকও সেইরূপ। তাহাতেই নাটকের নৃদীর্ঘ বক্তৃতা সকল জমাট করিয়া লিখিতে বলি। একে সংস্কৃত কূট-প্রশ্নাবলীর অর্থবাদ করিতে এই ‘সাধু

ভাষার' স্রষ্টি হইয়াছে, বিদ্যালয়ের অঙ্গ-  
বস্তু বালকগণের সম্প্রসারিত অনুবাদে বা  
তাছাদের উপযোগী অধিকতর সম্প্রসারিত  
পাঠ্য পুস্তকে তাহার স্থিতি হইতেছে, ই-  
হার উপর যদি আবার বঙ্গ-জন-পাঠ্য  
কাব্য নাটকেও তুলির উপর তুলি ঘসিয়া  
বর্ণকের উপর বর্ণক ফলাইয়া কেবল রং  
চড়াও, ও চিত্র বিস্তৃত কর, এখনও যদি—হে  
জীবিতেশ্বর, হে দগ্নিতপ্রাণবল্লভ, হে কালী-  
কাঞ্চী-দ্রাবিড়-মধুরা-উৎকল-অঙ্গ-বঙ্গ-ক-  
লিঙ্গ-ভ্রমণ-কারিন্ ! হে তাল-তমাল-শাল-  
হিস্তাল-পিয়াল-রসাল-কিশলয়-সদৃশ শা-  
মল-শোভন-নয়ন-রঞ্জন ! হে বিপুল-বিশাল-  
বক্ষঃ, অতুল-রসাল-চক্ষুঃ, কমলচরণ, চ-  
ন্দ্রাকাঙ্ক্ষুল, বিশেষবিদ্বান্, অশেষগুণনি-  
ধান বলিয়া সম্প্রসারিত পদে বিনাইয়া  
বিনাইয়া কীদিতে বস, তাহা হইলে আর  
নিস্তার নাই। যদি বাঙ্গালির কোথাও  
কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা থাকে, তবে সে কে-  
বল ভাষাতেই আছে। আমাদের সর্ব্বশ  
গিয়াছে কেবল মাত্র এক সম্বল আছে  
এই ভাষা। বিদেশীয় রাজা যাঁহাকে আ-  
দর করিয়া উপাধি প্রদান করেন, আমরা  
তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মনে করি যে তিনিই  
বাস্তবিক একটি গণ্যজীব ; বিদেশীয় শা-  
সন-কর্তা যদি কাহারও দণ্ডবিধান করি-  
লেন, অমনি আমরা তাঁহাকে ঘৃণা করিতে  
আরম্ভ করি। বিদেশীয় রাজা বলিলেন  
এইটি অপরাধ, আমরা অমনই সেটিকে দ-  
হাশ্রাধ বলিয়া মনে করি। এইরূপ আ-

মরা আচারে, বিচারে, শাসনে, রক্ষণে, প্র-  
রক্তি পরিচ্ছদে দিন দিন অস্থি মজ্জার প-  
রাধীন হইয়া পড়িতেছি। একটুমাত্র স্বা-  
ধীনতা আছে এই মাতৃ ভাষায়। যদি আ-  
মরা বেওয়ারিস ময়দার মত তাহা লইয়া  
এখন খেলা করি, তবে কি আমরা মহা-  
পাপে পাপী নহি? এই জন্ত এক নাট-  
কের ভাষা উপলক্ষ করিয়া আমরা এত  
কথা বলিতে সাহসী হইতেছি। কষ্ট ক-  
রিয়াও কাব্য নাটকের ভাষা আমাদের  
সংযত করা কর্তব্য। ভাষার ভরে ক্রমে  
জগৎ প্রগাঢ়তা জন্মিবে, তাহা হইলে  
ছদ্ময়ের আবেগপুঞ্জও ক্রমে গভীর হইবে।

অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা  
উপরোক্ত হেতুবাদে সাধাসাধনের বিপ-  
র্যাস ঘটনা করিতেছি, আবার অগ্রে শকট-  
যোজনা করিতেছি, বাস্তবিক তাহা নহে।  
অপাততঃ বোধ হইতে পারে বটে, যে  
অগ্রে মানসিক পরিবর্তন তাহার পর ভা-  
ষার পরিবর্তন, ও তাহার পরে কাব্য-নাট-  
কাদির পরিচ্ছদের পরিবর্তন। অনেকস্থলে  
এইরূপ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।  
কিন্তু জাতীয় ভাষার উন্নতির বলে জাতীয়  
চরিত্রের উন্নতি হওয়াও বিচিত্র নহে। জ-  
গন্নির পঞ্চম চার্লস বলিতেম, যে আমি মৃতন  
একটি ভাষা শিক্ষা করিলে আমার বোধ হয়  
যেন আমি আর একটি অভিনব আত্মা  
পাইয়াছি। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা  
দেখিতে পাই। এক জনকে বেকনের প্র-  
গাঢ় ভাষার শিক্ষাদান করুন, দেখিবেন

তিনি ক্রমেই স্থির গম্ভীর হইবেন। ভাষার এইরূপ মহীরসী শক্তি আছে বলিয়াই আমরা নাটকের ভাষার দিকে নাট্যকারগণকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলি।

এখন নাটকের পরিণামের কথা।

এস্থলে সংস্কৃত আদ্যকারিকগণের সহিত, আমাদের বাঙ্গালির প্রচলিত প্রবৃত্তির সহিত এবং ড্রাইডেন প্রভৃতি সমালোচকগণের “কাব্যে স্রবিচার চাই” ইত্যাদি কথার সহিত আমাদের সম্পূর্ণ মতবিরোধ। উৎকৃষ্ট নীতি ও উৎকৃষ্ট নাটক একই শিক্ষা প্রদান করে, উভয়ই স্পষ্ট-বাক্যে আমাদের মনে করিয়া দেয়,—“শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর”। মনুষ্যজীবনের যে পরিণাম, সংসার-তাড়িত মনুষ্য-জীবন-চিত্রেরও তাহাই পরিণাম। এ যে জনাকীর্ণ সভাস্থলে ঘোর বাগ্মী স্বদেশী বিদেশী উভয়কে দক্ষিণে বামে ক-শাঘাত করিতেছেন, তাঁহার পরিণাম কি? আর এ যে পতিবিরোগবিধুরা ব-দ্বীর্ণবালা, নীরবে—অতি নীরবে, অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে,—উহারই বা পরিণাম কি? এ যে কঠোর-প্রাণ, কবাট-বক্ষঃ, বজ্রমুক্তি সাহেব স্বীয় দুর্বল ভৃত্যকে পাশব-বলপ্রয়োগে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া ঘর্ষণ-চক্র শকটে ভজনাগ্নয়ে গমন করিলেন উ-হারই বা পরিণাম কি? আর এ যে শত্রু-ঔষ্ণবসনা ভিখারিণী রোগ-শোক-জরা-জীর্ণা হইয়া রাজপথপাশে পড়িয়া আছে, উহার কীর্ণ কণ্ঠস্বর কেহ শুনিয়াও শুনি-

তেছে না, উহার রক্তহীন পাণ্ডুরচ্ছবি কেহ দেখিয়াও দেখিতেছে না, উহারই বা পরিণাম কি? সকলেরই একই পরিণাম, সেই সার্বত্রিকহস্তপরিমিত ভূমিখণ্ডোপরি “দৃষ্টিহীন নাড়ীকীর্ণ, হিম-ক-লেবর”।

এই জন্যই সকল ভাষারই উৎকৃষ্ট নাটকের পরিণাম সেইরূপ হৃদয়-ভেদ কর। নাটক বলিয়া নহে, উৎকৃষ্ট কাব্য মাত্রেরই পরিণাম এইরূপ। বাল্মীকি ও বাসুদেবের অদ্বুত গ্রন্থদ্বয়, হোমরের ইলিয়দ্ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট কবিসৃষ্ট পৌরাণিক কাব্য বা মহাকাব্যগুলির পরিণামের বিষয় সকলেই জানেন। সুতরাং নাটকের পরিণামও যে সেইরূপ ঘোর বিষাদপূর্ণ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নাটকের বিষাদ-পরিণাম সম্বন্ধে এককটি আপত্তি আছে। আমরা বলিয়াছি যে “মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ” এই কথাই স্বাভাবিক এবং নাটকে তাহাই থাকে মাত্র। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে, স্বাভাবিক হইলেই যে কাব্যোপযোগী হইবে, এমত কি কথা আছে? বরং কবির সৃষ্টি সংসারসৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কবি আবেগপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি করিয়া কল্পনার সাহায্যে মানবমণ্ডলীকে শিক্ষা প্রদান করেন। সুতরাং তাঁহার সংসার-কোশল স্বাভাবিক না হইয়া বরং অনেকটা কাল্পনিক; সুতরাং কাব্যের পরিণাম সংসারের পরিণামের অনুরূপ না হইলেও ক্ষতি নাই। বাঁহারা এইরূপ যুক্তিবাদ প্রদর্শন

করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেন যে, “ কা-  
বালাজীবিনোদেন কালো গচ্ছতিধীমতাম্”,  
ঐহাদের মতে কাব্যকলাপ তাসকীড়ার  
মত কাল কাটাইবার ও বিনোদনের সা-  
মগ্রী, তাঁহাদের সহিত আমাদের কোন  
তর্ক নাই । কিন্তু ঐহারা শিক্ষাবলে কা-  
ব্যের উচ্চতর উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছেন,  
এবং মহর্ষি বাস্করীকি বা কৃষ্ণধৈর্যায়নকে  
সংহিতাকারগণ অপেক্ষা আন্তরিক অজ্ঞা  
করেন, তাঁহাদিগকে অবশ্য স্বীকার করিতে  
হইবে যে, বিষাদ-পরিণাম নাটকইহাতে  
আমরা গভীরতর উপদেশ প্রাপ্ত হই, এবং  
সেই সকল উপদেশ গভীরতর খাতে  
হৃদয়ে বহিতে থাকে । কেন থাকে তাহা  
পরে দেখান যাইতেছে ; এক্ষণে আপত্তি-  
কারিগণের আর দুই একটি হেতুবাদের  
কথা বলিব ।

অনেকে বলিতে পারেন যে, কবিগ-  
ণকে নীতিশিক্ষক বলিয়া স্বীকার করি-  
লেও বিষাদ-পরিণাম নাটক যে অন্য না-  
টক অপেক্ষা অধিকতর নীতিপূর্ণ একথা  
স্বীকার করা যায় না । প্রথম আপত্তি এই  
যে, সংসারে এত বিষাদ আছে যে, বি-  
ষাদে হৃদয় জ্বালাত করিবার জন্য ঐরূপ  
কাব্য নাটক পাঠের কোন প্রয়োজন নাই ।  
এই তর্ক সারগর্ভ হইলে ইহাই প্রতিপন্ন  
হয় যে, সাগর দেখিয়াছে সে আবার  
বাগরগণ বা কালিদাস হইতে কি সাগরবর্ণন  
পাঠ করিবে ? সুবক সুবতী যদি বৃন্দাবন  
ভ্রমণ করিয়া থাকে, তবে তাহার আর

ভ্রমণের ভারতী অরণ করিয়া কি করিবে ?  
ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে—যখন সংসার র-  
হিয়াছে তখন আবার কাব্য কেন ? স্ব-  
ভাব-সৃষ্টিই যথেষ্ট, ইহার উপর আবার  
কবির কল্পনা কেন ? বাস্তবিক বিবেচনা  
করিতে গেলে কবির কাব্য এরূপ অপ-  
দার্থ পদার্থ নহে । কাব্যজগৎ এই জড়-  
জীব-জগতের সার,—এখনকার ভাষায়  
বলিতে গেলে এসেন্স বা আরক । কাব্য-  
শোধিত সংসার এক অপূর্ণ সামগ্রী ।  
কাব্যে যে তীব্রতা, যে উপকারিতা আছে,  
সংসারে তাহা নাই । কেন না সংসার  
যদি গোলাপবারি হয়, তবে আমরা ব-  
লিব কাব্য আতর ; আবার সংসার যদি  
দ্রাবক হয় তবে কাব্য মহাদ্রাবক । কাব্য  
তীব্র বলিয়াই অধিকতর উপকারী । মৃতরাং  
সংসারে বিষাদ আছে বলিয়া কাবানা-  
টকে বিষাদ থাকিবার প্রয়োজন নাই, এ-  
কথা সারগর্ভ নহে । সংসারে তুমি আমি  
আছি বটে, আমাদের বিষাদও আছে, কিন্তু  
কাব্যে রাম ও হরিশ্চন্দ্র, জোভা ও হেমলেট,  
ওথেলো ও লীরর, সীতা ও দেসদিমোনা  
আছেন, সংসারে মেরুপ কোথাও নাই ।  
যে জন্য কপূর থাকিতেও কপূরের আর-  
কের প্রয়োজন সেইজন্যই কাব্যের প্রয়ো-  
জন । আর এক প্রকার আপত্তি আছে ।  
—কেহ কেহ বলেন যে, বিরোধ-পরিণাম  
নাটকের একটি মহান দোষ এই যে, ই-  
হাতে মনোমধ্যে সহানুভূতি সমৃদ্ধিত হয়,  
অথচ তাহা হইতে কোন কার্য হয় না ।

এইরূপ বারংবার হইলে মনের এমনই একটি স্বভাব হইয়া উঠে যে তাহাতে কেবল সহানুভূতিই হইতে থাকে, সেই চিত্তবেগ কখনও কার্যে পরিণত হয় না। একথাটি সম্পূর্ণ মনুষ্যস্বভাবের গতির বিপরীত কথা। মহাবীর আলেকজান্ডার জগন্মানার মত হোমরের অদ্ভুত গ্রন্থ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন; এরূপ প্রবাদও আছে যে, উহার সমস্তই তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কে বলিবে যে সেই বীররসাত্মক মহাকাব্য পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে কেবল বীররসের উদ্দীপনা হইত, কখন প্রবর্তনা হইত না। মহাবীর নেপোলিয়ন সেইরূপ জুলিয়সের স্মরণিত ইতিহাস অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। নেপোলিয়ন কি কিছুই বীরের কার্য করেন নাই? চৈতন্যদেব দিবারাত্রি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতির রূপ-ভক্তির পদাবলী পাঠ করিতেন। গৌরাজ কি কেবল ভক্তিতেই অভিভূত রহিয়া ছিলেন, কোন কার্য করেন নাই? বালকবালিকার মনে যত ভয়ের ভাব উদ্দীপন করিবে, কার্যকালে তাহারা তত ভীত থাকিবে। সংস্কৃত আলংকারিকগণেরও এইমত। তাঁহারা বলেন যে, কোন রসের স্থানিভাব হইতেই কার্যের উৎপত্তি হয় এবং সকল কাব্যেরই প্রধান উদ্দেশ্য হৃদয় মধ্যে স্থানিভাবের উদ্দীপনা। উৎকৃষ্ট নাটকের স্থানিভাব শোক। যিনি কাব্যের লুক্কিশিয়া বা জ্যোপনী দেখিয়া শোকতপ্ত হইয়া রহিয়া-

ছেন, সে নব্য টারকুইন বা জয়দ্রথ দেখিলে অবশ্য তাহার আক্রমণ বিফল করিতে অগ্রসর হইবে। আরও এক প্রকার আপত্তি আছে; প্রকৃত প্রস্তাবে সেটি আপত্তি নহে, আব্দার। অনেকে আব্দার করেন যে, ভগবানের সৃষ্টিতে সুবিচার হইক না হইক, অন্ততঃ কাব্যে সুবিচার চাই। এসকল কাব্যপ্রিয় শিশুপ্রকৃতির সমালোচক মহর্ষি বাল্মীকিকে দেখিতে পাইলে এইরূপে সংপরামর্শ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন,—‘মহর্ষে! আপনি আপনার মহাকাব্যের পরিণামে সীতাদেবীকে পাতালগতা করাইয়া সুবিচারকের কার্য করেন নাই। আহা! সেই দিন যদি রামচন্দ্র সীতা সতীকে বামে বসাইতেন, আর কুশী-লব যদি তাঁহাদের অঙ্কে উপবিষ্ট হইত, তাহা হইলে কি শোভা হইত! কি আনন্দের কথা হইত! আবার কিছুদিন পরে অষ্টভ্রাতার বিবাহের পর সীতা ভগিনীত্রয়সহ নবদম্পতী চতুর্দিকে বরণ করিয়া গৃহে লইতেছেন, দেখিতে কি সুন্দর হইত!’ এই সকল সমালোচকের ইচ্ছা যে, নিমজ্জমানা ওকলিয়াকে কোন ধীর গৃহে লইয়া গিয়া রাখে, আর হেমলেট লোয়ার্টিসকে বধ করিয়া ও ক্লাদিয়সকে কাশাক্ক করিয়া গৌরার বাজানা বাজাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসেন। ইহাদের ইচ্ছা যে হৃদয় লীলার কর্দ্দেলিয়ার পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার বড়মানীদের রীতি চরি-

ত্রের ব্যাখ্যা করেন। ইহাদের ইচ্ছা যে জীবদোষ্যত ওখেলোর নিকটে কঠাগত-প্রাণ ইয়াগো মুমূর্ষুজ্ঞিতে আপনার ঘড়-স্ত্রের কথা স্বীকার করে এবং যেরূপ একটি ক্ষুদ্র শিশু স্বাপনের ভাত্রাকর্মীর নিশীথে বসুদেবের ক্রোড়হইতে যমুনার স্থলিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিছু দিন পরে সেইরূপ একটি নীলকান্ত কালমাণিক ওখেলোর অঙ্কহইতে দেশদিমোনার গলা জড়াইয়া ধরে। এসকল বালকের আব্দার বালকের মুখে শুনিতে মন্দ শুনা য় না, কিন্তু বঙ্গীর সমালোচকগণ যখন ডাইডেনের চর্কিত চর্কণ করিতে করিতে কুন্দনন্দিনীর সমালোচনার উপলক্ষে এই সকল কথার উল্লেখ করেন, তখন আমরা হাস্য সংবরণ করিতে পারি না।

যদি কর্দ্দেলিয়া আবার বাঁচিয়া উঠিতেন, তবে লীরর যাহা বলিয়াছিলেন বাস্তবিক তাহাই প্রকৃত হইত। তাহা হইলে লীররের যে এত শোক তাহা কেবল উপন্যাসের রচনাভঙ্গীমাত্র, আর কিছুই নহে। সেক্ষিপির কিন্তু তাঁহার উৎকৃষ্ট কাব্য কল্পনানিতে সে প্রকার উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেন নাই। তিনি এক এক খানিতে এক একটি গভীর রসের অবতার করিয়া গিয়াছেন। আজি লীররের জন্য কাঁদিতেছি, কাল আবার লীররের দৌহিত্রের সঙ্গে কৌতুককলাপ দেখিয়া আশ্লাদিত হইতেছি, এরূপ কাব্য লীররনাটক নহে। লীররের জন্য যে দুঃখ তাহা আমা-

দের হৃদয়ে চির-অঙ্কিত রহিয়াছে। সেই রূপ হেমলেট, সেই রূপ ওখেলো। সমস্ত শকুন্তলাকে যখন দুঃখ পূরিবর্জন করেন, তখন কেবল দুর্বাসার উপরেই ক্রোধ হয়, শকুন্তলার জন্য তত দুঃখ হয় না, কেননা জানি যে আবার সেই রাজদম্পতীর মিলন হইবে। কিন্তু চির-দুঃখিনী সীতার দুঃখের কথা শ্রবণে আছে বলিয়া অদ্যাপি কেহ আপন কন্যার নাম সীতা রাখিতে পারে না। আমাদের পূর্বতন মহর্ষিগণ বা পাশ্চাত্য কবিগণ যদি এখনকার যাত্রাকারগণের মত যুগলরূপের মিলন করিয়া সকল কাণ্ডের সমাপ্তি করিতেন, তাহা হইলে ককণরসের স্থায়িত্ব আমরা কাব্যে কখনই দেখিতে পাইতাম না। তাহা হইলে হৃদয়ের প্রধান শিক্ষার অভাব থাকিত। হৃদয়ের প্রধান শিক্ষা এই রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র্য-জরা-জড়িত সংসারে, মানবহৃদয়ের প্রধান শিক্ষা ককণরসের স্থায়িত্বে। যে পূরের দুঃখ দেখিয়া অন্তরের সহিত চিরদিন কাঁদিতে পারে, কখনও ভুলেনা, ইহজগতে তাঁহার নীতি-শিক্ষার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। এক দিন ছিল, এক কাল ছিল, যখন আর্ঘ্যসন্তান সেইরূপ উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া পূরের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেন। তখন আর্ঘ্যসন্তান বুঝিতেন যে, যে নদীতে জল ওদিকে যায় আবার এদিকে আসে, তাহা জোয়ার ভাটার নদী, সমুদ্র-উচ্ছ্বাসের লীলাখেলার সামগ্রী, কিন্তু কখনই গভীর

নায়েগো প্রপাতের মত আত্মার উচ্ছ্বাসক  
নহে। কখনই রামায়ণ মহাভারতের স্রষ্টি  
হয়। তাহার পর আর্থের অধঃপতন। এই  
অধঃপতনের পর না হইলে ভবভূতি কখনও  
রামসীতার পুনর্মিলনের কল্পনা করিয়া  
বালকরম্যের করতালির প্রত্যাশায় দণ্ডায়মান  
হইতেন না। তদবধি আমরা অধঃপাতে  
যাইতেছি, তাহাতেই আমরা এখন শোকের  
স্বাস্থ্যিভাব যত্পূর্ব্বক পরিহার করি। আর  
তাহাতেই নীলদর্পণ আমাদের তত ভাল  
লাগে না। বাস্তবিক ভারতবাসীর এখন  
আর হৃদয় নাই, মর্ম্ম নাই, আবেগ নাই।  
ভীষ্মতর, কঠোরতর, গভীরতর, গম্ভী-  
রতর ভাব প্রকৃতিতে কিছুই নাই। এ-  
খন বালকের মত কখন তাখিয়া তাখিয়া  
আছে; কখন বা “খাবার দে না” ক-  
রিয়া “মা মা” বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার  
আছে; কখন বা “দিলি না” বলিয়া  
কেশাকর্ষণ করিয়া ভূমে গড়াগড়ি আছে;  
আর কখন বা রজ্জুতে সর্প বোধ করিয়া  
ভয়ে জড়মড় হইয়া মুদিতনয়নে অবস্থান  
করা আছে। সকলই বালকের মত। হৃদয়-  
মধ্যে কোন ভাবেরই স্থায়িত্ব নাই, গভীরতা  
নাই, প্রগাঢ়তা নাই। জলতলে শৈবালরাজির  
ন্যায় আমাদের হৃদয়ভাব সকল পবনদে-  
বের স্বেচ্ছাচারকূৎকারে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব  
পশ্চিমে যাইতেছে; ভীমের স্ত্রীবেগী বন্ধ-  
মের স্ত্রায়, ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের  
ন্যায়, পাষণ্ডে গভীরখাতে ক্ষোদিত ন-  
দীশয্যার মত চিরদিন একদিকে বহে না।

আমরা পূর্ব্বেরই বলিয়াছি, মানসিক  
আবেগের বা অন্তঃপ্রকৃতির উচ্ছলিত তর-  
ঙ্গের স্বাভাৱ-প্রতিধাতাই নাটকের জীবন।  
এখন আর আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির প্রকৃত  
আবেগ নাই। মানসিক হৃদে সামান্য  
কুলকলি আছে, কিন্তু গভীর প্রপাতের  
সহিত কম্বল নাই। আমরা এখন বা-  
তুলের মত হাসিতে হাসিতে কাঁদিয়া  
ফেলি, কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া ফেলি।  
সুতরাং আমাদের মধ্যে এখন উৎকৃষ্ট না-  
টকের প্রত্যাশাও করা যাইতে পারে না।  
ভাল নাটক যে হয় না, সে এখন আমা-  
দের জাতীয় প্রকৃতির বৈষ্ণব্য হেতু; কেবল  
গ্রন্থকারগণের দোষে নহে। এই জন্য  
আমাদের দেশে ভাল নাটক হয় নাই, অ-  
থচ ভাল প্রহসন হইয়াছে। এরূপ প্রহ-  
সন অন্য কোন দেশে আছে কি না স-  
ন্দেহ। কবি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, প-  
দ্মাবতী, শর্ম্মিষ্ঠা নাটকগণনায় কোথায়  
স্থান পায় তাহা নির্দেশ করাও কঠিন;  
কিন্তু দত্তজরুত “একেই কি বলে সভ্যতা”  
ও “বুড়শালিকের ঘাড়ে রোঁ” নামক  
ক্ষুদ্র গ্রন্থদ্বয় প্রহসনের আদর্শ। আবেগপূর্ণ  
মানবচরিত্রের কিছুই তাহাতে নাই, কিন্তু  
যে রূপ গৌরীস্বরের জীব সকল এখন বাস্তা-  
লয় ক্রীড়া করিতেছেন, তাহাদের চিত্র  
সেই প্রহসনদ্বয়ে সুন্দর চিত্রিত হইয়াছে।

তাহার পর পণ্ডিতবর রামনারায়ণ  
ভট্টরত্ন। বিবেচনা করিতে গেলে তিনি  
পণ্ডিতের পদ্ধতিতে প্রহসনের কবি, নাট-



কের কেহ নহেন। তাঁহার কুলীনকুল-সর্ব্বশ পাঠ করিলে, কুলীন কন্যাগণের কথাবার্তা শুনিলে, যেমন সকলই গড়াপেটা বলিয়া বোধ হয়, মর্য্যকথা যে রূপ কণ্ঠে বাজে সে রূপ হয় না। তাঁহার নাট্যিকার মধ্যে একটি বিবাহের কথা শুনিয়া বলিলেন—

“জান্নীব যাইয়া বুঝি জান্নীবীর ঘাট।

পাইবে সুন্দর বর সুন্দরীর কাঠ ॥”

সুতরাং তর্করত্নের নাটক বিবাদ-পরিণাম হইয়াও একরূপ প্রহসন। তর্করত্নের নাপিতিনী ভাল, যখন সে অলঙ্কৃত-সজ্জা লইয়া—

“বাড়ী মোর বংশীপুরে, দেখা যায় কিছুদূরে,  
ঘেরা ঘেরা ঘর দুইখানি।”

বলিয়া আত্মপরিচয় দিতে দিতে রজ্জাজনে প্রবেশ করে, তখন আমরা তাহাকে ভারতের ছীরার সহচরী করিতে প্রস্তুত হই, আর তাঁহার উদরপরায়ণ শর্যা যখন—

“ঘিয়ে ভাজা তণ্ডুলুচি, দুচারি আদার কুচি  
কচুরি তাহাতে খান দুই”

বলিয়া উত্তম ফলার বর্ণনা করিতে থাকেন, তখন তর্করত্নের নরম লেখনীর গুণে সত্য সত্যই আমাদের রসনা রসাল হইয়া উঠে, এবং পণ্ডিতবর রামনারায়ণকে বৈদিক-কুল-চূড়ামণি বলিয়াই বোধ হয়। তর্করত্নের নবনাটকও সেই;—নাটক নহে, প্রহসন। নবনাটকের সকল কথা তুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু গবেশ বারুক তুলি নাই।

তাঁহার পর দীনবন্ধু। দীনবন্ধু এক-

কালে প্রকৃত দীনবন্ধুই ছিলেন। প্রসিদ্ধিত প্রজার জন্য দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার কোন প্রমুখকার তাহা করেন নাই। তাঁহার অক্ষয়-কীৰ্ত্তি—সেই নীলদর্পণ। অনেক মনে করেন যে, নীলদর্পণ কেবল সাময়িক তরঙ্গের উচ্ছ্বাস মাত্র; এই কথাটা কতক দূর সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। নীলদর্পণ যদি সত্য সত্যই এক দিন বা দশ দিনের জন্য হইত, যদি ক্ষেত্রবর্গের অত্যাচার কেবল এক দেশেই পর্য্যাপ্ত হইত, তাহা হইলে এসংসার সোণার সংসার, এভারত সোণার ভারত। আমেরিকার যে ষোড়শতর বৃক্ষ হইয়াছিল, তাহাও একরূপ নীলদর্পণের অভিনয়। তবে সেখানে শত সহস্র বিন্দুমাদব ও নবীনমাদব একবারে উদ্ভাণ করিয়াছিলেন, আর এখানে কচিং এক আধজন দেখা দেন এইমাত্র প্রভেদ। বহুদিন হইল মিস্ ফৌরে অক্লটমস্ কাবিন লিখিয়াছেন, তাহাও নীলদর্পণ—আর রুটিশ গায়েরনার অমজীবী গৃহস্থগণের কষ্ট বর্ণনা করিয়া একজন বিলাতের বারিফার যে কুলী নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাও নীলদর্পণ। যত দিন এই বণিবৃত্তিক রাজপুত্র অরসংস্থান জন্য এদেশে আগমন করিবেন, আর যত দিন ইংরেজ রাজবিচারে খেত-কৃষকের প্রভেদ করিবেন, ততদিন নীলদর্পণ আমাদের জাতীয় জীবনের যথার্থ চিত্র থাকিবে। মরহতাকারী ফুলরের উপযুক্ত শাস্তি হয়

নাই, এই কথা নবাগত গণের বলিয়াছিলেন বলিয়া, দেখিতেছে না এখনকার পি পি উড ও ডবলিউ ডবলিউ রোগগণ কিরূপ গর্জন করিতেছেন; তবে আর কোন্ প্রাণে বলিব যে নীলদর্পণ ক্ষণস্থায়ী সমাজচিত্র মাত্র। তাহা যে নহে এই আমাদের দ্ব্যর্থ।

দীনবন্ধু বাঙ্গালার উৎকৃষ্ট নাটককার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নীলদর্পণ রচনার পর হইতেই তাঁহার কাব্য রস-তরল হইতে থাকে। তাহার পরিচয়—সধবার একাদশী। তাঁহার নিমেষদন্ত কবির একটি অভুত সৃষ্টি। নিমেষদন্ত স্বর্গভ্রষ্ট সমতান, তাহার সম্মুখে কাচপাত্রে নরকামি; নিমচাঁদ, এখন আর স্বর্গে অধিকার নাই বলিয়া স্বর্গের উপর রাগ করিয়া, অবশেষে সেই নরকামি দিবারাত্রি গলাধঃকরণ করিতেছে। এই স্বর্গ-নরক-সম্মিলিত দীনবন্ধু তরলমতি বঙ্গীয় যুবকের দলে স্থাপিত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার নিমচাঁদ, পূর্ণকলের হইয়াও ক্ষুণ্ণ পায় নাই। নিমচাঁদের প্রয়োজন ছিল কেবল এক নরকামি। এ স্বর্গভ্রষ্ট সমাজে তাহার অভাব কোথায়। যে নরকামি হরিশ্চন্দ্রকে অকালে অতলে লইয়া গেল, যে অগ্নিতে রামগোপাল এতদিন দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে অটলের টেবিলে, গোবুলের উপবনে, কাঞ্চনের ভবনে, নিমচাঁদকে পাঠান কেন? নিমচাঁদকে সেই হরিশ, সেই রামগোপাল হইতে

স্থাপিত করিতে হয়। তবে নিমচাঁদ ক্ষুণ্ণ পাইত। আর নীলদর্পণ-কার যেরূপ পল্লী-গ্রামের চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ নাগরিক চিত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অধিকতর যশস্বী হইতেন। তাহা হয় নাই; দীনবন্ধু ক্রমেই তরলভাব অবলম্বন করেন। সেই জন্য তিনি নবীনতপস্বিনীতে নাটক লিখিতে প্রহসন করিয়াছেন, আবার জামাইবারিক প্রহসন লিখিতে গিয়া নাটক করিয়াছেন। তাঁহার লীলাবতীর নায়ক নায়িকাকে যত না মনে পড়ে, তাহার নদেরচাঁদকে তাহার অধিক মনে পড়ে। প্রহসনে দীনবন্ধু অধিতীর্থ।

তাহার পর নয়শোভাপ্রেক্ষাকার। তাঁহার নায়ক নায়িকা ঠিক লীলাবতীর মত, কিন্তু তাহার সাতুলাল একটি প্রকৃত শোভিত চিত্র। একজন সমালোচক বলিয়াছেন, সাতুলাল গাঁজার নিমচাঁদ। সুতরাং বাঙ্গালার পূর্বতন নাটক-কারগণ সকলেই প্রহসন পটু। কেবল এক নীলদর্পণ-কারই প্রগাঢ় ও নীলদর্পণ প্রকৃত নাটক-পদ-বাচ্য।

এইক্ষণ আধুনিক বাঙ্গালা নাটক।

আধুনিক বাঙ্গালা নাটক সমুদ্রবিশেষ, একে একে তাহার তরঙ্গ গণনা করা আমাদের অসাধ্য। তবে সৌভাগ্যক্রমে যে কএক খানি নাটক আমাদের সম্মুখে আছে, সেইগুলিকে আদর্শ করিয়াই আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারি। আধুনিক নাটক প্রধানতঃ তিন

শ্রেণীর । ( ১ ) দেশ-হিতৈষিতা-প্রাস-  
ঙ্গিক । ( ২ ) অসুবাদ-মূলক । ( ৩ ) প্র-  
ণয়-জীবন-নাটক ।

আমাদের উল্লিখিত কয়খানি নাটক  
এই তিন শ্রেণীর ; তবে দুই একখানি  
একটু বিশেষ সমালোচনের যোগ্য । শরৎ  
সরোজিনী \* গ্রন্থ নিতান্ততরলমতি বাল-  
কের জন্য নহে । শরৎ সরোজের প্রণয়  
প্রগাঢ় ও পরীক্ষিত, শরতের দেশহিতৈ-  
ষিতা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে মথো

মথো উচ্ছসিত হইয়া উঠে । আর ভুবন-  
মোহিনীর প্রতিহিংসাও নিতান্ত অশ্রদ্ধার  
সামগ্রী নহে । ইহার ভাষা প্রায়ই প্র-  
গাঢ় । ছন্দোবদ্ধ হইলে আরও অধিক-  
তর আবেগপূর্ণ হইত । ৫৫ পৃষ্ঠায় ভূ-  
বনমোহিনীর উক্তি মধ্যে এইরূপ আছে ;

“ এই ভেবে মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক-  
লেম, (দন্ত-বর্ষণ) যে মতিলালের রক্তে চান  
করে আমার ঘেঁরে জনম সার্থক করব । ”

আমরা বলি এইরূপ স্থলে অমিত্রাক্ষর-  
ছন্দ হইলে অধিকতর আবেগপূর্ণ হইত ।

“ মনে মনে তাই ভাবি করিও প্রতিজ্ঞা,  
মতিলাল পাপিষ্ঠের রক্তে স্নান করে,  
আমার এ নারীজন্ম করিব সার্থক । ”

যাহাই হউক গুণগণনায় শরৎ-সরোজিনী  
প্রথম স্থানিয়া ও শরৎ-সরোজিনী-কার আ-  
ধুনিক নাটক-কারগণের মধ্যে সর্বপ্রধান ।

( ২ ) তাহার পর হেমলতা । হেমলতা

\* প্রথমসংস্করণের সময়ে আমরা এই  
গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছি ।

নাটকে দেশহিতৈষিতার সঙ্গে সঙ্গে বীর-  
রস উদ্ভাবনের চেষ্টা আছে । আমাদের  
পূর্বকথিত নানা কারণে হরলাল বাবু ই-  
হাতে বিশেষকৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই ।  
কিন্তু গ্রন্থকার যে কেবল প্রণয় লইয়া মত  
না হইয়া সঙ্গে সঙ্গে টপা-প্লাবিত দেশে  
বীররস উদ্ভাবনের চেষ্টা করিয়াছেন, ই-  
হাতেই তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র ।  
হেমলতার কমলাদেবীতে আমরা বাৎসল্য  
রসের বিলক্ষণ পরিপূষ্টি দেখিতে পাই ।

৩ । তাহার পর মহারাষ্ট্রকলঙ্গ ।

ইহাতে যবন কলঙ্ক ঔরঙ্গজিবের হস্তে ম-  
হারাষ্ট্রকলঙ্ক শম্ভুজির দুর্দশার কথা ব-  
র্ণিত আছে । এই গ্রন্থে সাময়িক চিত্র  
প্রদর্শনের অনেক ব্যতিক্রম আছে, আর  
এখনকার প্রথমত তুলিকার উপর তুলিকা  
ঘষিয়া সুদীর্ঘ আত্ম সমালোচন ও বক্তৃতা  
আছে । বক্তৃতাতে শম্ভুজি গদ্যে পদ্যে  
আড়াই পৃষ্ঠা স্বগত ঢালিয়াছেন ; স্মৃতরাং  
আবেগের কঠোর আঘাত ও ভাষার প্র-  
গাঢ়তা ইহাতে অতি অল্পই আছে । কিন্তু  
তথাপি মহারাষ্ট্র-কলঙ্ক দ্বিতীয়শ্রেণীর  
মধ্যে সর্বপ্রধান নাটক ।

তাহার পর চারি খানিতে একই সম-  
য়ের চিত্র । তন্মধ্যে গৌরবে প্রথম ‘ যৌবনে  
যোগিনী ’ । ইহার অধিনায়ক একদিকে পৃথ্বী-  
রাজ প্রভৃতি, অন্যদিকে কুতুবুদ্দীন প্রভৃতি ।

দ্বিতীয় ভারত বিজয় । ইহারও অধি-  
নায়কগণ পৃথ্বীরাজ, জয়চন্দ্র, একদিকে ;  
অন্যদিকে কুতব, মামুদ, রহিম প্রভৃতি ।

তৃতীয়। ‘ভারতের মুখশশী যবন কবলে’ ইহাতেও ঐ সকল অধিনায়ক।

চতুর্থ। ‘জয়পাল’। ইহাতে পঞ্চ-নদেবীর জয়পাল ও তৎপুত্র অনঙ্গপাল একদিকে, অন্যদিকে পূর্বোক্ত মুসলমান আক্রমণকারীগণ।

ভারতের সেই দুর্দশার দিন বাঙ্গালি বা ভারতবাসী যদি এখন উজ্জ্বল অক্ষরে, আবেগ-সহকারে, প্রগাঢ়ভাষায় বা গভীরভাবে চিত্রিত করিতে পারিবে, তাহা হইলে আমাদের ভাবনা কোথায়? ভারতের এখনও সে দিন আসে নাই।

এই জন্যই বিদ্যারত্নের পৃথুরাজ ও মিত্র-জের জয়পাল জীবিতেশ্বরী, জীবিতেশ্বরী, বলিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন\*। আর এই জন্যই ভারতবিজয়ের উপসংহারে আমরা ঝিনুটি, মধ্যমানে এইরূপ সঙ্গীত শুনিতে পাই :—

‘আহা কি সুন্দর শোভাকর সবে দরশন।  
পবিত্র-প্রণয়-ডোরে বাঁধা প্রণয়ী দুজন।’  
যে জাতি এখনও দেশের কথা ভাবিতে গিয়া গৃহিণীর অলঙ্কারের সৌন্দর্যের জন্য স্বর্ণকারের সহিত কলহ করে, সেই জাতি হইতে আমরা রসমাদুর্য্য বিনা অধিক আর কি প্রত্যাশা করিব?

তাহার পর বাবু হরলাল রায় প্রণীত ইহুখানি অনুবাদিত নাটক। সংস্কৃত

\* ভারতের মুখশশী যবনকবলের ১৩৭ পৃষ্ঠা ও জয়পাল নাটকের ১১৮ পৃষ্ঠা দেখ।

বেণীসংহার হইতে শত্রুসংহার ও সেক-পিররের মেকবেথ হইতে কদ্রপাল। সেক-পিররের প্রগাঢ়তা বাঙ্গালা কদ্রপালে অনেক সময়েই রক্ষা হয় নাই বলিলে, কেবল প্রকারান্তরে সেকপিররেরই প্রশংসা করা হয় ও প্রগাঢ়তায় বাঙ্গালা ভাষা এখনও অনেক উন্নতিসাধনকে ইহাই বলা হয়। কদ্রপাল অপেক্ষা শত্রুসংহার অনুবাদে ভাল হইয়াছে।

অবশিষ্ট চারিখানি প্রণয়-জীবন নাটক। বাঙ্গালির প্রণয়ের অর্থ বেহাগের গান—‘সখিরে আমার ধর ধর’—কোমল, মৃদুল, এলায়িত, আবেশময় রসালসপূর্ণ। স্মৃতরং প্রণয়-জীবন নাটকে আর কিছু না থাকিলেও কোমলতা থাকে। প্রণয়ের প্রতিফলে সেইরূপ কোমল, ললিত পদবিন্যাস আছে। আর ‘প্রকৃত বন্ধুর’ বনদেবীতে সেইরূপ সরল লীলাময় আত্মোৎসর্গ আছে। কিন্তু কুমুদ-কামিনীতে এইরূপ কিছু না থাকিলেও, এক প্রমোদ-মনোরমাতাই সকল আছে। উহাতে রাজা আছে, পুরোহিত আছে, ভট্টাচার্য্য আছে, বিদুষক আছে, জমিদার আছে, ইয়ারগণ আছে, মন্ত্রী, শিক্ষক, ঘটক, প্রতিহারী, দূত, পান্থ, ভূতা, রাজরানী, রাজকন্যা, সুদীর্ঘ বক্তৃতা, নানারসের গীত, রজ্জুকান্ট, মৃত্তিকা, গোময়, তুষ, ছাই, পাঁশ, তাম্র সকলই আছে; নাই কেবল প্রহু-কারের শিক্ষা কিংবা শক্তির পরিচয় ও তাঁহার ভাষাজ্ঞান। অনেক নাটককার সং-

স্বত্ব বা ইংরেজী নাটক পড়েন না, প্রমোদ-মনোরমা রচরিতা বাঙ্গালা কোন নাটক পর্য্যন্তও পড়েন নাই। প্রমোদ-মনোরমা আধুনিক অপকৃষ্ট বাঙ্গালা নাটকের আদর্শ।

আমরা নাটক, বাঙ্গালা নাটক ও আধুনিক বাঙ্গালা নাটক সমালোচনা করিতে গিয়া মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আধুনিক বাঙ্গালা নাটকের অপকৃষ্ট প্রাশুর্য্য অধঃপতিত বাঙ্গালার অন্ধতম রূপে আসিয়া পতিত হইয়াছি।

একণ্ঠে এই দীর্ঘ প্রবন্ধের উপসংহারে সংক্ষেপে সারসংগ্রহ করিব।

মনুষ্য নানারূপে ভাঙিত। সংসার-ভাঙিত মানব-বিশেষের পরিবর্তন ও পরিণাম প্রদর্শন করা নাটকের উদ্দেশ্য। মনুষ্য-হৃদয়ের আবেগ-পরম্পরার চলাচলে এই পরিবর্তন হইয়া থাকে। জীব-শরীরে শোণিতসঞ্চালন যেমন জীবনী শক্তির মূল; আবেগচলাচল সেইরূপ নাটকের জীবন। আবেগপূর্ণ কথোপকথন বা স্ব-গত আত্মচিন্তাপরীক্ষা বা কঠোচ্ছ্বাস নাটকের শরীর। তরঙ্গায়িত বা ছন্দোবদ্ধ রচনাই নাটকের উপযুক্ত পরিচ্ছদ। অন্য পরিচ্ছদে একরূপ চলে, কিন্তু সাজে না। উৎকৃষ্ট নাটকের পরিণাম অতীব শোক-কর; এরূপ না হইলে ভাবের প্রগাঢ়তা হয় না, এবং রসের স্থায়িত্ব হয় না।

উৎকৃষ্ট কাব্যনাটক রচনার জন্য ভাবের প্রগাঢ়তা অবলম্বন করা আমাদের

মিতান্ত্র কর্তব্য। নহিলে রসের ধনীভাব হয় না। ভাবের প্রগাঢ়তা হইতে আমাদের ভাবের গভীরতা হইবে, তাহা হইলে ক্রমে আমরা কার্য্যকর মনুষ্য হইব। এখন আমাদের যেরূপ জাতীয় স্বভাব, আর যে রূপ এমায়িত ভাষা, ইহাতে উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকের উৎপত্তি হওয়াই অসম্ভব। ভাল প্রহসন হইতে পারে, তাহাই হইয়াছে। মধুসূদন, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, ইহারা সকলেই প্রহসন লেখক। প্রহসনে বাঙ্গালা অধিতীয়। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে কেবল দুই এক খানি ব্যতীত সকল গুলিই অসার। যেখানে দেশহিতৈষিতা উদ্দীপনের চেষ্টা, সেখানে প্রাশুর্য্য প্রায়ই অকৃতকার্য্য। বাঙ্গালি দেশহিতৈষিতা কহিতে শিখিয়াছে, মর্ষকথার দীর্ঘশ্বাসে এখনও অপরের হৃদয়ে দেশবাৎসল্য উদ্দীপন করিতে শিখে নাই। কোমল বাঙ্গালি একটু কোমল প্রণয় লিখিতে, বলিতে শিখিয়াছে। অপকৃষ্ট নাটকগুলি তাই লইয়াই ব্যস্ত। কিন্তু আমরা পূর্বে বলিয়াছি, আবারও বলি—মর্ষে যার পীড়া, গাত্রে যার কশাঘাত, গৃহে যার অন্তর্কষ্ট, বাহিরে যার দণ্ডবিধি, মস্তকে যার অগ্নিস্রাব, পদে পদে যার বিপদ, সে কেন আত্মধার তালে ঝিকিট রাগিনিতে প্রণয়ের গীত গাইয়া বেড়ায়। বঙ্গবাসিন্ একবার প্রগাঢ় ভাবায় কঠোরভাবে উদ্দীপন করিবার চেষ্টা কর দেখি।

## অনন্ত সুখ ।



আহা ! কি সুন্দর নিশি মধুময়,  
শুক্র-কলেবরা, শোভার নিলয়,  
সুনীল ললাটে পূর্ণশশধর !—  
রজতের চাপ শান্ত মনোহর ;  
মৃদু নীল-কচি অমল অম্বরে,  
খেঁতাম্বুদ-দাম মস্তুরে বিহরে ;  
নিশি-অশ্রুজল, তব্বর শিখরে,  
চন্দ্রের কিরণে ঝলমল করে ।  
উজ্জ্বাসিয়া বয় নৈশ সমীরণ,  
সৌরভের সনে মৃদু পরশন ;  
চাক-চন্দ্রচ্ছবি তরঙ্গিণী-নীরে,  
শত চন্দ্র চাক চঞ্চলিত ধীরে !

কোলে করি শশধর !

ঝলমলে নীলাম্বর !

চাক-কৌমুদিনী-মালা,

ফুটাইছে ফুল-বালা,

সরসীর নীল জলে,

তরল কৌমুদী খেলে ;

মরি কিবা মনোহর মধুরা যামিনী !

তার-কিরীটিনী চাক-চন্দ্রমা-শালিনী ।

( উজ্জ্বাস )

কোলে করি শশধর !

ঝলমলে নীলাম্বর !

চাক-কৌমুদিনী-মালা,

ফুটাইছে ফুল-বালা,

সরসীর নীল জলে,

চাঁদের কৌমুদী খেলে ;

নীরব যামিনী, নীরব ভুবন,

নীরব সকলি শান্ত দরশন ;

প্রকৃতি সুন্দরী, ক্রান্ত কলেবরা,

সারাদিন পরে নিদ্রায় কাতরা ;

প্রকৃতির সনে জগত ঘুমায়,

নিদ্রিত পার্থিব প্রাণী সমুদায় ;

নিদ্রা বিনোদিনী প্রতি ধরে ধরে,

শান্তি-সুখ-রাশি বিতরণ করে,

দরিদ্র হৃৎখীরে সুপর্ণ কুটীরে !

পতিবিরোগিনী চির-হৃৎখিনীরে !

মুড়ান জননী, সুকোমল করে—

নয়নের জল, মুছি স্নেহ ভরে !

নীরব ভুবন মরি !

শুক্র নিশি রূপেশ্বরী,

নীল চন্দ্রাতপ তলে,

থরে থরে মণি জ্বলে !

দূরে শ্যাম-তরুণের,

শুধু ঝিল্লী রব করে,

মঞ্জুল বিপিনে নিশি কোকিল কুহরে !

মঞ্জুল কুমুদীকোলে ভ্রমরী গুঞ্জে !

( উজ্জ্বাস । )

নীরব ভুবন মরি !

শুক্র নিশি রূপেশ্বরী,

নীল চন্দ্রাতপ তলে ।

থরে থরে মণি জ্বলে !

দূরে শ্যামতকপরে,  
 শুধু ঝিল্লী রব করে,  
 এহেন নিশীথে, মন্দির-তিতরে,  
 একটি রমণী বসিয়া কাতরে !  
 নীরবে ফেলিছে নয়নের নীর !  
 বিশুদ্ধ-বদন স্নান হুঃখিনীর !  
 সুখদা নিত্যের চিত্ত-সুধকরী,  
 ত্রিলোক-মোহিনী সুখার লহরী,  
 বিমোহিনী সুখা করি বরিষণ,  
 করেনি মুদিত সজ্জল নয়ন !  
 নয়ন-সম্মুখে, কোমল শয্যায়,  
 শায়িত যতনে মলিন বিভায় !  
 প্রাণের নন্দিনী ! সুবর্ণ বলরী !  
 মানসের স্বর্ণ-সরোজ-সুন্দরী !  
 মলিনবদন শশী !  
 মলিন সৌন্দর্য্য-রাশি !  
 স্নান নেত্র-নীলোৎপল !  
 স্নান বপু সুকোমল !  
 কোমল বয়ান পরে !  
 অশ্রু ঝর ঝর ঝরে !  
 মেলিয়া নয়নপদ্ম জননীর পানে,  
 চাহিছে বিবাদে বালা বিঃল পরাগে  
 ( উচ্ছ্বাস )  
 মলিনবদন শশী !  
 মলিন সৌন্দর্য্য-রাশি !  
 স্নান নেত্র-নীলোৎপল !  
 স্নান তনু সুকোমল !  
 কোমল বয়ান পরে !  
 অশ্রু ঝর ঝর ঝরে !  
 শিরেরে জননী ! স্নেহ-স্বরপিণী !

নয়নের নীরে ! তিতিলে হুঃখিনী !  
 শান্ত-প্রভাময়, নয়নের মণি !  
 অনন্ত তিমিরে, ডুববে এখনি !  
 শুকাবে এখনি নিদাঘে অকালে,  
 হৃদয়কুসুম জীবনমৃণালে !  
 চিরহুঃখিনীর, অতুল অমল—  
 একটি রতন সংসারে সম্বল !  
 সেই যতনের ক্রীবনের ধনে,  
 হরিবে কৃতান্ত অদয় জীবনে !  
 এই অভাগীর সকলি ফুরায়,  
 জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত প্রায় !

জীবনকাননে তার,  
 যৌবন-কুসুম-হার,  
 পূর্ণ বিকসিত নয় !  
 এখনি বিশুদ্ধ হয় !  
 হে বিধাতঃ বল নাথ !  
 কেন একুসুম-পাত—

অকালে, মিশায় কেন, চিরদিন তরে  
 জীবন-প্রবাহ তার, কালের সাগরে !

( উচ্ছ্বাস )

জীবন কাননে তার,  
 যৌবন-কুসুম-হার,  
 পূর্ণ বিকসিত নয় !  
 এখনি বিশুদ্ধ হয় !  
 হে বিধাতঃ বল নাথ !

কেন একুসুম-পাত ;

ইন্দুমতী নিশি চাকচন্দ্র ভাসে,  
 নীল জলধর ধরাতল হাসে !  
 দ্বন্দ্বময় পথে কোমল অধরে,  
 ত্রিদিব-নন্দিনী মর্ত্যে অবতরে !

সুরাঙা চরণ, শত-পদ-জ্যোতি !  
 নিখর বদনে শশধর জ্যোতি !  
 মন্দার-দামে বিন্যস্ত কবরী,  
 যৌবন-সাগরে লাবণ্য-সহরী !  
 তাজিয়া অন্নর উত্তরি অবনী,  
 কুটীরের দ্বারে দাঁড়াল রমণী,  
 মকতুমে হল বরিষা সঞ্চার !  
 অরণ্যে বিজনে ফুটিল মন্দার !

পারিজাত শত শত,  
 পরিমলে অবিরত,  
 রমণী-চরণ ধরি,  
 উল্লাসে ফুটিল মরি !  
 নন্দনের পরিমলে,  
 মুগ্ধ হল ধরাতলে ;  
 কাঞ্চন-প্রতীমা হেরি প্রকৃতি সুলক্ষী ;  
 চমকিল ! স্নান হল সচ্ছন্দ সর্বস্বরী !

( উচ্ছ্বাস )

পারিজাত শত শত,  
 ফুটি তথা অবিরত ;  
 রমণী-চরণ ধরি,  
 উল্লাসে ফুটিল মরি !  
 নন্দনের পরিমলে,  
 মুগ্ধ হল ধরাতলে ।  
 কছিল রমণী, কতক্ষণ পরে,  
 স্বর্গীয় নিকুণে, স্রমধূর স্বরে !  
 সরস বসন্তে কাকলি উগরি,  
 ঝঙ্কারিল বনে, পিক-কুলেশ্বরী ;  
 সুরম্য-সহরী, নৈশ সমীরণে,  
 তাসিল সত্বরে, অমৃতের সনে ;  
 “এস প্রিয়তমে এসলো ভগিনী !

তাজ হুঃখময় মন্দির-মেদিনী !  
 মায়ার শৃঙ্খল কাট এইবার !  
 অনিত্য স্বজন অলীক সংসার !  
 চল যাই সখি প্রফুল্ল বদনে,  
 চিরানন্দ ময় স্রুকের ভবনে, ”

“রোগের অনন্ত জ্বালা,  
 তথায় নাহিক বালা,  
 তকলতা প্রাণিচয়,  
 অনন্ত আনন্দময় !  
 অনন্ত স্রুকের ধাম,  
 চিরপুলকিত প্রাণ !

চির কচি মধুমাংস প্রফুল্ল কাননে !  
 চির কচি মৃদু হাসি প্রাণীর বদনে ! ”

( উচ্ছ্বাস )

“রোগের অনন্ত জ্বালা,  
 তথায় নাহিক বালা,  
 তকলতা প্রাণিচয়,  
 সকলি আনন্দময় ।  
 অনন্ত স্রুকের ধাম,  
 চির-পুলকিত প্রাণ ! ”

নীরবিল বালা ; নীরবে যেমতি  
 শ্যাম-মৃদু-কণ্ঠ ; শ্যাম-রূপবতী—  
 কোকিল-কাঁচিনী, কানন-অধিলে,  
 ললিত পঞ্চমে দূরে ঝঙ্কারিলে ;  
 মরণ-উষ্মুখ বালিকা-বদন,  
 নীহার-নিসিক্ত মলিন-নয়ন !  
 হল স্নানতর মুহূর্তেক তরে,  
 কণ্ঠে শিহরিল ক্লিষ্ট কলেবরে ;  
 কমলী-কচি বদন-চন্দ্রিকা !  
 ধীরে ধীরে মরি ব্যাশিল লীলমা !



বহিল সবেগে ধমণী-নিচয় !

উষ্ণ-রক্ত-জ্যোত শ্মশীতল হয় !

জীবনের লীলা তার,

ফুরাইবে এইবার !

আধারিয়া দশ দিশি,

আসিছে অনন্ত নিশি !

জীবন-তপন হায় !

চির অন্তাচলে যায় !

রক্ত-ভূমে অভিনয় ! হল সমাপন !

জীবনের যবনিকা হতেছে পড়ন ।

( উচ্ছ্বাস )

জীবনের লীলা তার,

ফুরাইবে এইবার !

আধারিয়া দশ দিশি,

আসিছে অনন্ত নিশি !

জীবন-তপন হায় !

চির অন্তাচলে যায় !

নিরখিল বালা মনের নয়নে,

স্বর্গ সুন্দরীরে, স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে !

নিরখিল বালা, নয়ন উপরে

আনন্দময়ীরে, বসিয়া শিরেরে,

নিরখিল বিশ্ব অঙ্গকারময় !

জন্মের তরে সব শেষ হয় !

‘ জন্মনি যাই যা ’ বলিল বদন !

নিরখিল মায়ে জন্মের মতন !

মার প্রতিবিম্ব, নয়ন-মুকুরে !

রহিল বিবিত ! চিরদিন তরে,

মুদিল যুগল নয়ন মলিন !

জীবন তরঙ্গ হইল বিলীন !

মায়ের জীবন-বনে,

নিদাঘের পরশনে,

সোণার কুমুমে গাঁথা,

শুকাল বসন্ত-লতা !

সঙ্ক্কার শারদশনী,

পশ্চিমে পড়িল খসি !

উজলি অশ্রুদেশ রূপের কিরণে ;

স্রবণের বিহঙ্গিনী উড়িল গগনে !

( উচ্ছ্বাস )

মায়ের জীবন-বনে,

নিদাঘের পরশনে,

সোণার কুমুমে গাঁথা,

শুকাল বসন্ত-লতা !

সঙ্ক্কার নবীন-শনী !

পশ্চিমে পড়িল খসি !

পার্থিব পিত্তরে তাজিয়া অচিরে,

সুরভি কোমল নন্দন-সমীরে !

কাঞ্চন-প্রভীমা ! আরোহি উল্লাসে,

চলিল মত্তরে, নন্দন সকাশে ;

চির কচি মৃদু, কমল আশনে,

বসিল রমণী প্রফুল আশনে ;

শোভিল যেন রে উমা স্রবদনে,

বজ্রের মন্দিরে শারদ-পার্বণে !

মিলি ত্রিদিবের, বিলাসিনী গগনে,

সাজাল যতনে, নন্দন-ভূষণে ;

ভুলি ভব-ধাম, পুরিল সুন্দরী—

অনন্ত সুখেতে অনন্ত মাদুরী । জীহঃ—

## দেবোপাখ্যান ।

( গ্রীস ও ভারতবর্ষ )

ষষ্ঠ প্রস্তাব ।

কার্তিকেয় ; গণেশ ; বিশ্বকর্মা ।

এরেশ্ ; হিফেস্ট্ ; হার্ণেস্ ।

কার্তিকেয় দেবসেনাপতি, এরেশ্ (মার্চ)ও দেবসেনাপতি । কার্তিকেয় ময়ূর-বাহন স্ত্রীমান্, এরেশ্ দীর্ঘায়ত বীরপুরুষ । স্কন্দের মুখস্ত্রী প্রফুল্ল, মার্চের মুখস্ত্রী কুক্ষিত, জয়গলে এবং ক্রোধকষায়িত নয়নে অকুটী প্রকাশক । কার্তিকেয় মনোহর, এরেশ্ ভয়ঙ্কর ।

অমিতপরাক্রম তারকাসুরের বিলাশ-সাধনে কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার বলবিক্রমের তুলনা নাই, দেব মানব অসুর গন্ধর্ব্ব কেহই সমরে তাহার সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় না, সকলেই তাঁহার পদা-নত হয় । কিন্তু তাঁহার আকৃতি কোমল, গৌরবর্ণ উজ্জ্বল মুখস্ত্রী,—পরমরূপবান্ পু-রুষ । তাঁহার সৌন্দর্য্যের সহিত তুলনায় মার অর্থাৎ কন্দর্পও কুরুপ, এজন্য কার্তি-কেয়ের নাম কুমার । যদিও আর্ধ্যকবি দেবগণের জ্যেষ্ঠ প্রদর্শনে তাঁহাদিগকে মানবগণহইতে ভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট ক-রিয়্যাহেন এবং যে আকৃতি মানবে অপ্র-

যুক্তা, অথবা প্রযুক্তা হইলেও প্রকৃতিগত দোষের কারণ হয়, দেবগণকে সেইরূপ আকারবিশিষ্ট করিয়া মানব হইতে অ-শেষশ্রুণে উৎকর্ষ দেখাইতে চেষ্টা করিয়া-ছেন, তথাপি আমরা স্কন্দ ও এরেশ্কে তুলনা করিতে আকৃতিতে এরেশ্কেই প্র-শংসা করিব । কারণ, বিপক্ষের শোণিত-পান যাহার ধর্ম্ম, অনার্য্যত সমরাজ্ঞ যাহার প্রিয় নিকেতন, লৌহ যাহার অঙ্গা-বরণ ও অবলম্বন, সে কুসুমসুকুমারদেহ হ-ইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব । পুরাণবর্ণিত কার্তিক বজ্রগৃহবিরাজিত বাবু কার্তিক হইতে অনেক পৃথক্ আকার হইলেও মার্চ-কেই এবিষয়ে প্রশংসা করিতে হইবে । মার্চের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিই বিপক্ষকে \*পলায়নে বাধ্য করে ।

সেনাপতির সুরুমার দেহ কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক, সুত্তরাং রূপবিষয়ে কার্তি-কেয় নিম্নবীৰ্য্য । কিন্তু ইয়োৰোপীয় লে-খকগণ যে হিন্দুদেবগণের সকলকেই ভয়-

কর বলেন, কার্তিকের সে অপবাদহইতে মুক্ত । রূপবর্ণনায় গ্রীক কবিগণ প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু গুণবর্ণনায় তাঁহারা নিম্ননীয় । তাঁহারা জানিতেন রূপের অনেক দোষ, এজন্য ভিনস্কে পিশাচী করিয়া তুলিয়াছেন, রূপ ও গুণের একত্র সমাবেশ কখনও করেন নাই । কিন্তু হিন্দুগণ দেবগণকে রূপ ও গুণ উভয়েই ভূষিত করিতে যুগপৎ প্রয়াস পাইয়াছেন । তাঁহারা কুমারকে কোমল আকৃতি প্রদান করিয়া প্রকৃতি তদনুরূপ করেন নাই । তাঁহারা হস্তে বাবুদিগের প্রিয়, বাতাসের ভরে নত ক্ষীণবেত্র অথবা বিলাসি-কর-লালিত ক্ষুদ্রোতপত্র স্থান প্রাপ্ত হয় না । তাঁহার অবস্থান বিলাস হইতে অনেক অন্তর, অনেক উচ্চ । আপন বীরধর্মের ব্যাঘাত হইবে ভয়ে তিনি চিরকোমার্য্য ব্রতাবলম্বী । সময়োপগমনোন্মুখ বীরপুরুষও বিদায় সময়ে আপন প্রেমসীর অশ্রুদর্শনে ক্ষণকালের জন্য আত্ম-চিত্ত হইয়া আপন সঙ্কল্প বিন্যস্ত হইতে পারেন, আপন জীবনকে অন্ততঃ মুহূর্ত্তজন্য যশহইতে মূল্যবান্ বিবেচনা করিতে পারেন, এজন্য বীরশ্রেষ্ঠ স্বল্প আপন হৃদয় অন্যের জন্য উৎসর্গ করেন নাই, স্বাধীনতা বিসর্জন দেন নাই । এরেশ্ও কি পার্শ্বতীনন্দনের ন্যায় চির-কুমার ? না । পরিণয় কেন ? এরেশ্ বীরধর্মের জলাঞ্জলি দিয়া, বিরজনকর্তব্য অন্যের ধর্মরক্ষা বিন্যস্ত হইয়া পর-জীর প্রণয় পিপাসু ! হিকেটসুললনা এ-

ফোডাইট মার্চের অনুগ্রহে তিনপুঞ্জের জননী ! রাক্ষস বা পৈশাচ বিবাহ অবিবাহিতার পক্ষে, এ তাহা হইতেও দূরনীয় । যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া যেমিনার যুদ্ধাবসানে স্পার্টানগরীতে লোকবসতি হয়, যে উপায়ে আর্গোনটগণকর্তৃক অনেক দ্বীপ ও উপনিবেশ জনাকীর্ণ হয়, ট্রয়ের অবরোধ সময়ে গ্রীসের লোকসংখ্যার সমতা রক্ষিত হয়, এ সেই উপায়, সেই প্রণালী । গ্রীকজাতির উপাস্য দেবগণের সেনানায়ক সৌন্দর্য্য ও প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এক্সোডাইটের রমণীয় নিকুঞ্জবনের, ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিবৃত-শ্যামল-তমাল-তালী বনের বসন্তের কোকিল, বিলাসের শায়াপাখী !

এরেশের এই বীরত্বের,—অবলার প্রতি বলপ্রকাশের পুরস্কার হাতে হাতে লাভ হইয়াছিল । এলয়েড্রয় তাঁহাকে পরাজিত ও কারাকদ্ধ করিয়া দীর্ঘকাল দাস-রূপে রাখিয়াছিল । পরিশেষে তিনি অত্যদীয় সাহায্যে মুক্তিলাভ করেন । যিনি কুমারী রিনাসিলভিয়ার প্রতি বল প্রয়োগ করিয়া রমুলস্ ও রিমসের সুতরাং রোমের জনক, রোমীয় দেবত্রে তাঁহার মহাশ্রম বিস্তারিতরূপে বর্ণিত থাকিবে আশ্চর্য্য কি ?

দেবায়ুরে যুদ্ধ, সকল দেশীয় দেবত্রেই বর্ণিত আছে । দেবগণকে এক একবার দৈত্যগণকর্তৃক পরাজিত ও অপমানিত হইতে দেখিয়া সকল দেশীয় কবিই এক একবার দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন ।

কিন্তু গ্রীস ভিন্ন প্রায় অন্য কোন দেশেই দেব-  
সেনাপতিকে দাসত্বে দেখা যায় নাই। পার্শ্বতী-  
পুত্র কখনও অন্যের দাসত্ব স্বীকার করেন নাই।

গণেশের সহিত হিফেস্টেসের তুলনা  
করিয়া দেখা যাউক। গণেশ পার্শ্বতীর  
মানসপুত্র,—শক্তির দৈবশক্তিতে জাত।  
ভল্কানও হিরির মানসপুত্র। ভগবতী  
আপন স্বামীর নিকট বর প্রার্থনা করিয়া  
গণপতিকে লাভ করেন; জুনের আপন  
ইচ্ছায় স্বামীর অজ্ঞাতসারে হিফেস্টেসকে  
প্রাপ্ত হন। নগোস্তনন্দিনী সহর্ষে আপন  
স্বামীকে তনয় দেখাইলেন, শনির দৃষ্টিতে  
পুত্রকে প্রথমতঃ ছিন্নমস্তক, পরে গজা-  
নন হইতে দেখিয়া উভয়েই যারপরনাই  
দুঃখিত হইলেন। জুনে দেখিলেন তাঁহার  
পুত্র কুরূপ ও খঞ্জ হইল, তাঁহার অহঙ্কার  
চূর্ণ হইল। কদাকার পুত্র আপন স্বামীকে  
দেখাইতে লজ্জা বাসিলেন, এবং জননী হইয়া  
পুত্রহত্যা হইতে প্রয়াস পাইলেন। অচির-  
প্রমত্ত হিফেস্টেস পলায়ন করিয়া সমুদ্র-  
গর্ভে প্রবেশ করিলেন, এবং সমুদ্রের অ-  
ধিষ্ঠাত্রীদেবীকর্তৃক প্রতিপালিত হইতে  
লাগিলেন\*। হিরির আপন মানসত-  
নয় দর্শনে লজ্জা ও স্বামীকে না দেখাইয়া  
তাঁহার বিনাশচেষ্টা, এবং পার্শ্বতীর মা-  
নসপুত্র লইয়া স্বামীসহ সুখাবস্থান ও ত-  
নয়ের বিপদ দেখিয়া দুঃখ, এতদুভয়ের  
দোষ গুণ পাঠক বিচার করুন।

\* দৈবকীন্দন কক্ষের বাল্যজীবনের  
সহিত তুলনা কর।

গণেশ খর্ব্বাকার, স্থূলতনু, গজেন্দ্র-  
বদন, লম্বোদর, স্তম্বর। যেরূপ অঙ্গগ-  
ঠনে অন্যকে নিতান্ত কুরূপ দেখায় গণেশ  
সে সমস্তেও স্তম্বর। ভল্কান খঞ্জ, স্তম্বর  
খর্ব্ব না হইলেও খর্ব্ব, স্থূলতনু, বিকৃতব-  
দন, লম্বোদর, কিন্তু কুৎসিত। দেবমানব  
সকলের নিকটেই তিনি কদাকার বলিয়া  
গণ্য। গণেশ সকলের অগ্রে পূজা লাভ  
করেন; তিনি সিদ্ধিপ্রদ, কর্তৃদ। হিফেস্টেস  
কেবল লৌহকর্মকারের নিকট পূজা লাভ  
করেন কিন্তু হেরসবৎ বিশ্বনাশন নহেন।  
লৌহদ্বারা বজ্র গঠন করিয়া যিসকে মা-  
হায়া করা মাত্র তাঁহার কর্ম। দেব স-  
ভায় গণেশের আসন সকলের সম্মুখে,  
কিন্তু ভল্কান দেব সভায় আসন প্রাপ্ত  
হন না। লঘুহস্ত চতুর্ভুজ গণপতি বেদ-  
চতুষ্টি এবং মহাভারতের লেখক, অত্যন্ত  
বুদ্ধিমান ও সম্বিবেচক। কিন্তু হিফেস্টেসের  
বুদ্ধি তাঁহার ব্যবসায়ের উপাদানবৎ স্থূল।

মানবশরীরবৎ শরীরীর চারি হস্ত অ-  
স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইলেও যখন স্থি-  
রচিত্তে পর্যালোচনা করিয়া দেখা যায়  
যে, কবিগণ সর্বদাই লঘুহস্ত বুঝাইতে চ-  
তুর্ভুজ, সম্বন্ধ বুঝাইতে পঞ্চবদন এবং  
বহুদর্শী বুঝাইতে সহস্রলোচন বলিয়া ব-  
র্ণনা করিয়াছেন, সহস্র সহস্র বৎসর প-  
রেও সেই উপমা এপর্যন্ত সেই অর্থেই ব্য-  
বহৃত হইয়া আসিতেছে, তখন আর অস্বা-  
ভাবিকত্ব স্বরণ থাকে না। তবে মানব-  
শরীরে গজযুগ্ম অস্বাভাবিক সংশয় নাই।

কিন্তু প্রকৃতির কোমলতায় ও উত্তমতায় আকৃতিগত দোষ এককালে ঢাকিয়া রাখে। মানবশরীর সময়ে সময়ে এত কদাকার দেখা যায় যে, কবির কল্পনাও তাহার সমতুল হইতে পারে না। সুরতায় ভল্কান্, শরীর কুরূপ হইলেও, অস্বাভাবিক নহে। অন্যদিকে আকৃতি স্বাভাবিক হইলেও প্রকৃতি নিতান্ত কদর্যা বলিয়া, কার্য নিতান্ত সামান্য বলিয়া মহাজ্ঞানী পরমধার্মিক গণেশের সমকক্ষ হওয়া অসম্ভব।

কবিগণ সকল দেশেই নিয়তির উপাসক। সর্বশক্তিমানী জুনো নিয়তিমার্গ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না, তাঁহার মানসপুত্র নিতান্ত ঘৃণনীয় হইল। সুরেশ-সুন্দরী পার্শ্বতীও মিয়তির হস্ত হইতে মুক্ত থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রিয়তম তনয় নিতান্ত কদাকার হইল।

ভল্কান্ যেমন কদাকার তাঁহার ত্রী তেমনই সুন্দরী। লৌহব্যবসায়ীর শরীর ও মন লৌহ ও অশনির ন্যায় কঠিন, প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শরীর কুসুম হইতেও সুকুমার, তারল্য হইতেও তরল। হিফেফিস্ সংগৃহস্থ, নিরীহব্যবসায়ী, তাঁহার সহধর্মিণী ফুলবধু বা বিবি। রূপবানের ভাগ্যে রূপবতী ভার্যা, গুণবানের ভাগ্যে গুণবতী ললনা, সুন্দরীর ভাগ্যে অনুরূপ স্বামী, অথবা গুণশীলার গুণগ্রাহী পতি লাভ করা প্রায় অসম্ভব, জগতে সচরাচর শনিকাক্ষনযোগ দেখা যায় না। যে বিধাতা সকল বিষয়ে জগতে অপরিভূত

অমন্তৃত্ব রাখিবার জন্য প্রাণিগণ ও আ-  
কাজ্ঞা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন কে  
আর কারণ বুঝিতে পারিবে? কারণ  
যেই হট্টক গরিব ভল্ললোক হিফেফিস্  
সেই জন্যই ভিনসের স্বামী, প্রণয়বিহীন  
ভল্কান্ সৌন্দর্য ও প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী  
দেবীর প্রাণকান্ত। জগতের কার্যানুকরণ  
করিয়া দেবমানবে সাদৃশ্য রক্ষা করিতে  
গিয়া, রূপবতী ভিনসের যৌবনের অপরি-  
তৃপ্ত বিলাসবাসনার পরিণাম প্রদর্শনে  
গ্রীক কবি ভিনসকে পরকীয়া করিয়াছেন,  
কল্পনা স্বাভাবিক হইয়াছে। কিন্তু এ-  
ক্ষণে জিজ্ঞাসা এই যে, যাহা মানবে স্বা-  
ভাবিক হয়, দেবেও কি তাহাই কল্পনা  
করা এবং এইরূপে অশেষগুণে শ্রেষ্ঠ প্রা-  
ণীকে মানবের ন্যায় দুর্বল ও পাপপ্রিয়  
জান করা উচিত? এতদ্বারা এরিস্টটেলের  
বাক্য সপ্রমাণ হইয়াছে। গণেশের ত্রী ন-  
বপ্রতিমা সতী সাবিত্রী। ভারতীয় অন্যান্য  
দেবললনার ন্যায় গণেশকামিনীও পতি-  
ব্রতা। মহাযোগী গণেশের সহধর্মিণীও  
তাঁহার অনুরূপ। ভারতীয় কবি দেবদেবী-  
গণের মিলন মানবমানবীর ন্যায় না করিয়া  
সতর্কতার সহিত শনিকাক্ষনের যোগের  
ন্যায় করিয়াছেন। ভারতীয় দেবীগণ  
তাই সুন্দরীর ধর্ম্যানুষ্ঠানের পথপ্রদ-  
র্শিনী।

হার্ফিস্ ক্ষীণকায়, দীর্ঘায়ত। তাঁহার  
হস্তে একখানা বস্টি, তাহার দুই পার্শ্ব দুইটি  
সর্পদ্বারা জড়ান। তাঁহার শিরত্বে

ও পান্ডুকায় পাখীর ন্যায়-চারিটি পক্ষ \*। জুপিটারের ঔরসে মারাদেবীর গর্ভে তাঁহার জন্ম, তিনি উভয়েরই প্রিয়পাত্র।

ঐকদেবদেবীগণমধ্যে হার্মেসের চরিত্র যেমন বিকল্প ও বিভিন্ন বর্ণে চিত্রিত তেমন আর কাহারও নহে। তাঁহার সম্বন্ধীয় উপাখ্যান সমস্তও অতি আশ্চর্য্য ও কৌতুহলজনক। তিনি একবার নারদ দেবদূত, অথচ কৌতুক করিবার জন্য, বিরোধ ঘটাইবার জন্য মিথ্যাবাদী। আবার তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় বাণিজ্য দ্রব্য ও শস্যাদির কর্তা। আবার দেহহইতে বিমুক্ত আত্মা প্লুটোর রাজ্যে লইয়া যাইতে পথপ্রদর্শক যমদূত। তিনি স্বত্বধর, কর্মকার, তত্ত্ববার প্রকৃতি ব্যবসায়ী লোকের উপাস্য দেবতা, স্তবরাং বিশ্বকর্ম্ম। তিনি রুহম্পতির ন্যায় বাগ্মী ও সূচতুর, দেবর্ষি নারদের ন্যায় কৌতুকপ্রিয়, বানরের ন্যায় চঞ্চল প্রকৃতি, এবং মহীরাবণের ন্যায় মায়াবী ও তন্দুর।

রজনী তিমিরাবগুণ্ঠিতা, মানবগণ আপন আপন ভবনে নিদ্রা যাইতেছে, হার্মেস্ গোপনে তাহাদিগকে সর্ব্বস্বান্ত ও প্রতারিত করিতে একাগ্রচিত্তে যত্ন করিতেছেন। তাহাতে তাঁহার উপাসকও যুক্ত হইতে পারে না। অন্যের অনিষ্ট করার সময় কেহই হার্মেসের অভিপ্রায় পূর্বে বুঝিতে পারে না, এবং কেহই তাঁ-

\* কেমন স্বাভাবিক? “পায় পাগড়ী মাথায় জুতা।”

হার নীরস হৃদয়ে দয়ার উদ্বেক করিতে পারে না। মরণধর্ম্মশীল মানবের তুচ্ছ খাই নাই, প্রবলপরাক্রান্ত দিনমণি এপোলোও তাঁহার হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। প্রসিদ্ধ ডেল্ফির মন্দির হইতে এপোলোর বহুকালসঞ্চিত সমস্ত সম্পত্তি হরণ করিতে এবং তাঁহার গোঁসকল আত্মসাৎ করিতে হার্মেসের মনে অণুমাত্রও ভয়সঞ্চার হয় নাই। তাঁহার জননী ভয়ে অভিভূতা হইয়া তাঁহাকে কত নিবারণ করিলেন, হার্মেস্ তাঁহার কথা শুনিলেন না। যখন তাঁহার বৈমাত্র জাতা লেটোনানন্দন এপোলো তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং চুরি করা যথার্থ কি না জ্ঞানিতে চাহিলেন, হার্মেস্ স্বীকার করিলেন না, স্পষ্ট কোন উত্তরও দিলেন না, হাসিয়া তাঁহার কথা উড়াইয়া দিলেন। পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় অবশেষে বলিলেন “যদি তুমি আমাকে দেবগণমধ্যে শ্রেষ্ঠশ্রেণীতে গণ্য কর এবং তোমার ন্যায় ক্ষমতা ও যশ আমার লাভ হয়, তবে আমি অনুসন্ধান করিয়া তোমার সম্পত্তি তোমাকে প্রত্যর্পণ করি।” এপোলো স্বীকার করিলেন, তখন হার্মেস্ তাঁহার সমস্ত বস্তু প্রত্যর্পণ করিলেন। এপোলো তাঁহার নিকট হইতে বীণা লইয়া তাহার বিনিময়ে আপন সর্পসংযুক্ত যক্ষিপ্রদান করেন, তখন উভয়ের সন্ধি হয়।

একদা হার্মেস্ কোন স্থানে গমন সময়ে দেখিলেন একটি কূর্ম্ম ধীরে ধীরে চ-

লিয়া যাইতেছে। তখন তিনি বলিলেন,  
“এক্ষণে কথা বলিতে পার না, কিন্তু যু-  
ত্মের পর উত্তম গান করিতে পারিবে।”  
অমনি তাহাকে বধ করিয়া তাহার দৃঢ়  
পৃষ্ঠাবরণ দ্বারা আপনার প্রসিদ্ধ বীণা প্র-  
স্তুত করেন। এপোলো সেই মনোমোহন  
বীণাধ্বনিতে মোহিত হইয়াই হার্মেসের স-  
হিত সন্ধি করেন, এবং তাঁহার সকল অ-  
পরাধ ভুলিয়া যান।

হার্মেস্ দৌত্যকার্যে তাড়িত্বার্জনা-  
বহু। মেঘে আরোহণ করিয়া অতিক্রম  
বায়ুমাগর অতিক্রম করেন। অনেক  
যাহা অসাধ্য হার্মেস্ তাহা অতি সহজেই  
সম্পাদন করেন। কার্যসাধনে তাঁহার  
ক্ষমতা আশ্চর্য। কিন্তু তাঁহাকে বিশ্বা-  
সের কার্যে নিয়োগ করিয়া কেহই নি-  
শ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

ব্যবসায়ী লোকের নিকট মার্কিয়ুরি  
শাস্ত্রপ্রকৃতি এবং বিলক্ষণ কর্মক্ষম। প্র-  
মজীবী শিল্পব্যবসায়িগণ এই জনাই ভ-  
ক্তির সহিত তাঁহার পূজা করে। বাণিজ্য-  
ব্যবসায়িগণও তাঁহার উপাসক। কিন্তু  
যখন ঝটিকারস্ত হয়, যখন তাহার মার্কি-  
য়ুরির আবির্ভাব, সঞ্চরমাণ গাঢ় ক্লম্ববর্ণ  
মেঘমালায় নিরীক্ষণ করে, তখন তাহাদের  
প্রাণ উড়িয়া যায়। এবং দেখিতে দেখিতে  
সর্বস্ব সহ যখন তাহাদের অণবমান সকল  
সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়, তখন তাঁহার  
বানরপ্রকৃতির নিন্দা করিতে এবং নেপচুনের  
শরণাগত হইতে কেহই বিমূৃত হয় না।

বিশ্বকর্মা পূর্ণায়ত সবলশরীর। তাঁ-  
হার আকৃতি দেখিলেই তাঁহাকে কর্মক্ষম  
বলিয়া বোধ হয়। শিল্পীদিগের মার্কি-  
য়ুরি আর পৌরাণিক বিশ্বকর্মা একরূপ।  
কিন্তু মার্কিয়ুরির অন্যান্য প্রকৃতির সহিত  
বিশ্বকর্মার কোন সাদৃশ্য নাই।

রহস্যতেষু ভগিনী বরজী ব্রহ্মচারিণী।  
যোগসিদ্ধা জগৎকৃম্মসক্তা বিচরতাত ॥  
প্রভাসমা তু ভাৰ্যা সা বস্তুনামষ্টমসাতু।  
বিশ্বকর্মা মহাভাগন্তস্যাংযজ্ঞে মহামতিঃ ॥  
কর্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিংশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।  
ভূষণাঞ্চ সর্বেষাং কর্তা শিল্পবতাংবরঃ ॥  
যঃ সর্বেষাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ।  
মুযাশেচাপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ ॥  
আবার,—

বিশ্বকর্মা প্রভাসমা পুত্রঃ শিল্পপ্রজাপতিঃ  
প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রতিমাত্মণাদিষু।  
তড়াগারামকূপেষু স্মৃতঃ সৌহর্যবর্দ্ধকিঃ ॥†  
রহস্যতির ভাগিনের প্রভাসতনয় ঙ্গলী  
দেবগণের শিল্প ও স্থপতিকার্য্য নির্বাহ  
করেন। তাঁহার ক্ষমতা আশ্চর্য। বৈ-  
কুণ্ঠপুরী নির্মাণ করিতে হইবে, আজ্ঞামাত্র  
কার্য্য আরম্ভ হইল, দেখিতে দেখিতে এক  
রজনীর মধ্যেই পুরী নির্মিত হইল। যাহা  
হইল তাহাতে কোন অংশে দোষ প্রদর্শন  
কাহারও সাধ্য হইবে না। যত সম্পন্ন ও  
যত উৎকৃষ্ট অবস্থা কল্পনা করা যাইতে  
পারে তাহার কিছুই বিশ্বকর্মার স্মৃতি-

\* বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশের ১৫ অধ্যায়।

† মাৎস্য ৫ম অধ্যায়।

গুণ স্বাক্ষর দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পা-  
রে না ।

বিশ্বরূপ কখনও ছদ্মবেশ বা কপটতা  
অবলম্বন করেন না । তাঁহার আকৃতি  
যেমন সরল, প্রকৃতিও সেইরূপ । সুতরাং  
তিনি সরলমতি নিরীহপ্রকৃতি কাঞ্চ ও স্থ-  
পতি গণের প্রিয়তম উপাস্য দেবতা । স-  
কলেই তাঁহাকে আদরের সহিত পূজা ক-  
রিয়৷ থাকে ।

হার্ঘ্যেদের প্রভারণাপ্রিয়তা ও খস  
প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে এবং তৎস্ব-  
রূপ পরিদর্শন করিলে কাহার মনে ভ-  
ক্তির উদয় হইবে ? যে দেব আশ্রিতকে  
প্রভারিত ও তাহার সর্বস্বাস্ত করিয়া স-  
হানুভূতি প্রদর্শন করেন, তাহার সহ-  
নুভূতি বিশিষ্ট প্রশস্ত অমৃতকরণের প্র-  
শংসা ইংরেজ ভিন্ন অন্য জাতির নিকট ক-  
খনও সম্ভবে না । গ্রীকদিগের মধ্যে অ-

নেকেই তাঁহাকে তাঁহার স্বভাব চপলতা  
ও দুর্বৃত্ততা জন্ম নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু  
ইংলণ্ডীয় রাজনীতি-কুশল সুলেখকগণ  
হার্ঘ্যসক্রে বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন ।  
আমরা স্বীকার করি, তাঁহাদের এই বর্ণনা  
কোন প্রকারে তাঁহাদের মত বিকল্প হয়  
নাই । কিন্তু নিরীহ প্রকৃতি দেব বর্জকি,  
হার্ঘ্যস ইহাতে সম্পূর্ণ-ভিন্ন-প্রকৃতি-বি-  
শিষ্ট ।

এক্ষণে উল্লিখিত তুলনা হইতে পাঠক-  
গণ এরেশ্, হিফেস্টাস ও হার্ঘ্যেদের অ-  
পেক্ষা স্বন্দ, গণপতি এবং ভৃতা যে কত  
উত্তম তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন ।  
এবং ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতগণের মত যে নি-  
তান্ত ভ্রান্তিমূলক ও একদেশদৃষ্ট, তাহাও  
সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে । সুতরাং এ প্র-  
স্তাবের আর বাহুল্যে প্রয়োজন নাই ।

## প্রভু ও ভূতা

এজগতে বৈষম্যের প্রাচুর্য্য দেখা  
যায়—ধনবৈষম্য, ধর্মবৈষম্য, বিদ্যাবৈ-  
ষম্য । এজগৎ বৈষম্যে পরিপূর্ণ । সমাজের  
শক্তি অবশি আবহমান কাল পর্য্যন্ত ইহা  
চলিয়া আসিতেছে । আজিও ইহার তন্ম-  
নক শক্তি প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয় । কেহই  
কাহারও সমান নহে, আমি তোমাহইতে  
পৃথক্, তুমি তাঁহাইতে পৃথক্ এই ভাবই

বৈষম্যের মূল । স্বক্টির প্রারম্ভেই ‘Might  
is Right’ অথবা ‘জোর যার মূলুক তার’  
এই নিষ্ঠুর নিধির প্রচলন হয় । রাম যদি  
শ্যামকে এক আঘাতে ভূমিশায়ী করিতে  
পারেন তাহা হইলে রাম প্রভু, শ্যাম  
ভূতা । রাম আজ্ঞাকর্তা, শ্যাম আজ্ঞা-  
পালয়িতা । রাম এই গ্রীষ্মকালের স্নিগ্ধ  
সুবাসিত সুরম্য গৃহে পর্য্যঙ্কে বসিয়া দিন



কাটাইবেন ; শ্যাম স্বর্ধাক্ত কলেবরে দুই  
প্রহর সময়ে মাঠে ঘুরবে, সন্ধ্যার প্রা-  
কালে আসিয়া আবার রামের আহ্বারের  
আয়োজন করিয়া দিবে ; রাম পাঁদো-  
পরি পাদনাস্ত করিয়া স্থখে উদর পূর্ণ  
করিবেন । কাহারও পৌষ মাস, কাহারও  
সর্ব্বনাশ । রাম বাবু হইয়া গৃহে বসিয়া  
প্রয়োজনান্তিরিক্ত সামগ্রীর ছড়াছড়ি ক-  
রিবেন ; আর শ্যাম ? এত খাটিয়াও প-  
রিবারের কথা দূরে থাকুক, নির্ব্বিশেষে স্বীয়  
ভরণ পোষণ করিতেও অক্ষম । ইহাই সমা-  
জের প্রথম বৈষম্য । অর্থাৎ সমাজের প্রথম  
বৈষম্য বাহুবলজনিত ; যাহার ক্ষমতা আছে  
সে প্রভু ; যাহার ক্ষমতা নাই সে ভূত্য ।

আজি কালি ভূতাত্ত্ববৈবিকল্পে ভয়া-  
নক চীৎকার শুনা যাইতেছে ; কিন্তু বৈষ-  
ম্যভাব এজগৎ হইতে লুপ্ত হয় নাই । বাহু-  
বলজনিত \* বৈষম্যের তিরোধান হইয়াছে  
সত্য, কিন্তু ধনবৈষম্য, বিদ্যাবৈষম্য, কোন  
কোন প্রদেশে বা ধর্ম্মবৈষম্য এখনও ভয়া-  
নক প্রবল । পূর্বাশ্রয় আমাদিগের  
অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে বটে ↑,

\* প্রজাদিগের মধ্যে বলবৈষম্য কি-  
য়ৎ পরিমাণে দূর হইয়া থাকিলেও রাজা-  
দিগের মধ্যে উহা দূর হয় নাই এবং শীঘ্র  
যে দূর হইবে তাহারই বা সম্ভাবনা কো-  
থায় ?

† একথা আমরা সকল জাতি সম্বন্ধে  
বলিতেছি না । আরব ও তাতারদেশীয়-  
দিগের মধ্যে পূর্বে যেসকল বৈষম্যভাব ছিল

কিন্তু যত দিন সাম্যবিধি এজগতে সম্পূর্ণ-  
রূপে প্রচলিত না হয়, ততদিন সমাজের  
মঙ্গল নাই ।

বৈষম্যের বিকল্পে এখন যদিও দুই  
একটি কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সমাজের  
আদি অবস্থায় এতৎসম্বন্ধে কোনরূপ ন্যায়  
বা দর্শন কিছুই ছিল না । প্রভুর যাহা  
ইচ্ছা তিনি তাহাই করিতেন ; মারিলে  
মারিতে পারিতেন কাটিলে কাটিতে পা-  
রিতেন, কেহই বারণ করিবার ছিল না ।  
বিশেষ আবার দেশীয় আচার, ব্যবহার,  
ন্যায়, ধর্ম্ম সকলে মিলিয়া তাঁহার কর্ণে  
স্পর্শে সম্মতি দান করিত । এই বিধি প্রায়  
সকল দেশেই প্রচলিত ছিল । সুতরাং  
প্রভুদিগের ক্ষমতা অসীম । তাঁহার আ-  
পনাদিগের ইচ্ছামত সকল কার্যই ভূত-  
ায়া সম্পাদন করাইতেন । ক্ষেত্রে বীজ  
বপন করিতে হইবে, তাহাও ভূত করিবে ;  
প্রভুর পদসেবা আবশ্যিক, তাহাও ভূতের  
কার্য । কোনরূপ ত্রুটি হইলে আর রক্ষা  
নাই, ভূতের যৎপরোনাস্তি শাস্তি আব-  
শ্যিক । ক্ষেত্রে যে শস্য জন্মিবে, তাহার  
সমস্তই প্রভুর ; ভূত কেবল যৎসামান্য  
আহার্য্য মাত্র পাইতে পারে ! কোন  
কোন স্থলে তাহাও পাওয়া দুষ্কর । এই  
এখনও সেইরূপ দৃষ্ট হয় ! পূর্বেও এখনও  
তাঁহার বনকূটীরে বাস করে, বনের ফল  
মূলে জীবনধারণ করিয়া থাকে ; সুতরাং  
তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা আদিমাবস্থা  
হইতে বড় বিভিন্ন নহে ।

রূপে কেন্দ্রজাত সমস্ত সম্পত্তিই প্রভু য-  
হাশয়েরা আশ্রমাৎ করিতে লাগিলেন।  
আর ভৃত্যেরা ক্ষুধাতৃষ্ণায় জ্বালাতন হইয়া  
ক্রমে দরিদ্রতা বাপন্ন হইয়া পড়িল। একদল  
ধনী, অপর নির্ধন; একদল ক্রোড়পতি, অ-  
পর দল ভিখারী। এইরূপে ধনবৈষম্যের  
জন্ম। যাহার অগাধ সম্পত্তি, তিনিই জ-  
নসমাজে মাননীয়; যাহার ধনসম্পত্তি নাই,  
তিনি সাধারণো নিম্নিত, স্থানিত ও উপহা-  
সাম্পদ। আজিও ধন-বৈষম্য প্রায় সর্ব-  
প্রদেশেই বহুল পরিমাণে দেখিতে পাওয়া  
যায়। ধনীরা নির্ধনীদিগকে স্থান সহিত  
অবলোকন করেন। ভিখারিরা ক্রোড়-  
পতিদিগকে মান্য করিয়া চলেন, সময়ে  
সময়ে পূজা করিতেও কুণ্ঠিত নহেন। ধন-  
বৈষম্য বহুকাল পর্য্যন্ত এদেশে প্রবল ছিল।  
‘ইহলোকে দরিদ্রতা অপেক্ষা গুরুতর  
দোষ আর কিছুই নাই। ইহলোকে যাহার  
অর্থ আছে, সেই ব্যক্তিই বহুবুদ্ধিবসম্পন্ন  
প্রধান পুরুষ বলিয়া গণনীয় ও পণ্ডিতপদ-  
বাচ্য হইয়া থাকে। ধনই কুলমর্যাদা ও  
ধর্মবুদ্ধির নিদান। নির্ধন ব্যক্তি ইহলোকে  
বা পরলোকে সুখী হইতে পারে না। লো-  
কের শরীর কৃশ হইলে, তাহাকে কৃশ বলা  
যায় না, যাহার অর্থ, গো, ভূতা ও অ-  
তিথি অধিক না থাকে, সেই যথার্থ কৃশ\*।’

সমাজস্থষ্টির অব্যবহিত পরেই দে-  
খিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা বলবান্

\* ত্রিকালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ানুবা-  
দিত মহাভারত—শান্তিপর্ব্ব।

বা ধনবান্ তাঁহারা ই পৌরহিত্যকর্ম করি-  
তেন! ধর্মসম্বন্ধে সকল ভার তাঁহাদিগের  
উপর। অন্যের স্বর্গ নরক তাঁহাদিগেরই  
হস্তে। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে কাহাকে ন-  
রকে ফেলিতে পারেন, কাহাকে বা স্বর্গে  
তুলিতে পারেন। তাঁহারা সময়ে যুদ্ধকার্য্য  
করিতেন, সময়ে আবার ধর্মমন্দিরস্থ দেব-  
তার পুরোহিত সাজিতেন। গ্রীসের পু-  
রাতত্ত্বে একপা ঘটনার স্পষ্ট নিদর্শন পা-  
ওয়া যায়। কালে লোকের ধর্মভয় প্র-  
বল হইয়া উঠিল, ইহকালের স্রষ্টার জন্য  
কেহই আর ব্যতিব্যস্ত নহে। সকলেই পর-  
কাল চায়। পরকালের স্রষ্টা, পরকালের  
শান্তি সকল ক্ষণেই বিরাজমান; কেহ  
আর সংসারের দিকে তুলিয়াও দৃষ্টিক্ষেপ  
করে না। এই সকল বড়লোকেরা তখন  
দেখিলেন, যে বাহুবলজনিত বা ধনজনিত  
বৈষম্যের আসন্নকাল উপস্থিত; সকলেই  
বীরবেশ ছাড়িয়া পুরোহিতরূপধারী হই-  
লেন। এই সময় হইতেই প্রকৃত ধর্মবৈষ-  
ম্যের স্রষ্টি। যিনি পুরোহিত, তিনিই  
পূজনীয়, অপরেরা তাঁহাকে দেবতা বলিয়া  
জ্ঞান করিত। তিনি অত্যান্যদিগকে ভূ-  
তাবৎ আচরণে দিবারাত্র জ্বালাতন করি-  
তেন। ভৃত্যেরা ইচ্ছা থাকিলেও কিছু ব-  
লিতে পারিত না, কেননা, তাহা হইলে  
তাহার ইহকালও নাই, পরকালও নাই।  
ইহকালে ভীষণ অত্যাচার, কঠোর শাস্তি,  
সাধারণো নিন্দা, আত্মীয় পরিবারের  
গালাগালি; পরকালে আবার স্বর্গ হ-

ইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে হইবে । বঙ্গদেশে ধর্মবৈষম্য ভয়ানক প্রবল ছিল । ব্রাহ্মণ বালক, দরিদ্র বা কৃপণ, উহাকে অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে । ব্রাহ্মণকে নিরাশ করা কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে প্রীত করিতে পারে, তাহার পুত্র পৌত্র, বন্ধু বান্ধব, অমাত্য, পশু, নগর ও জনপদ প্রভৃতি সমুদয় নিরাপদে অবস্থান করে । ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ হয় । ইহলোকে ব্রাহ্মণকে দান করিলে পিতৃলোক ও দেবলোকের তৃপ্তি সাধন করা হয় ॥ ”

এইরূপে ঐহারা বলবান বা ধনবান, অথবা ঐহারা পৌরহিত্য-কর্মে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারা ই সময়ে “ বড়লোক ” আখ্যা পাইলেন । বড়লোকের সম্ভান বড়লোক ; তিনি মহাপাপ করিলেও বড়লোক ; তিনি বলহীন ধনহীন হইলেও বড়লোক । তিনি ধর্মের বা পৌরহিত্য কার্যের কিছু না বুঝিলেও বড়লোক । এই স্থলে আর এক প্রকার বৈষম্যের উৎপত্তি — রক্তজনিত বৈষম্য ( Ascendency of noble blood. ) অর্থাৎ যদি কেহ বড়লোক হয়েন, তাঁহার বংশধরেরাও বড়লোক বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ও গণ্য হইবেন ।

বড়লোকেরা প্রায় পরস্পরোপরি অথবা কোন প্রাচীরবেষ্টিত গ্রামে বাস ক-

† জীকাল, প্রসন্ন সিংহ মহোদয়-  
নুবাদিত মহাভারত অনুশাসনপত্র ।

রিতেন । তাঁহাদিগের ভূত্বেরা নগরপ্রান্তে কুটার নির্মাণ করিয়া কায়ক্ৰেশে দিনযাপন করিতেন । গ্রীসের ইতিহাসে ইহারাই পেরোকই ( Peroikoi ) বা প্রান্তবাসী, বা অনাগরিক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । সময়ে সময়ে বিদেশ ইহাতে লোকজন আসিয়া এই দাসশ্রেণীভুক্ত হইত । অন্য দেশ হইতে যিনিই আসুন না কেন, এই দাসদিগের তিনি বড় প্রিয় পাত্র হইয়া দাঁড়াইতেন । তাহার বিশেষ কারণ এই যে, দাসেরা প্রভুদিগের অত্যাচারে এরূপ উৎপীড়িত হইত যে, সময়ে সময়ে তাহারা ভাবিত যে যদি কখন কোন জাতি তাহাদিগের সহিত একত্রে মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহাদিগের ক্ষমতা বাড়িতে পারে, এমন কি সময়ে তাহারা অনেকাংশে প্রভুদিগের সমকক্ষ হইলেও হইবার সম্ভাবনা; সুতরাং তখন আর এরূপ যত্নগা থাকিবে না ; অসহ্য অত্যাচারে আর প্রপীড়িত হইতে হইবে না, এবং তাহাদিগের উপর প্রভুদিগের আধিপত্যও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পরিবে । এই ভাবিয়া যে আসিত, এই দাসদল তাহাকেই আশ্রয়দান করিত — কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইত না । যে সকল লোক কোন বিশেষ পাণাচরণের জন্য স্বদেশ হইতে দূরীভূত হইত, অথবা যে সকল জাতি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বদেশের মারা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত, তাহারা এই দাসদলের সহিত এ-

কত্রে মিলিত হইত। মিসরদেশীয় ইস-  
রেলাইটিজ্ এবং আটিকার পিলাসজিয়া-  
নের। এইরূপ তাদিত হইয়া বিদেশীয় দাস-  
দিগের সহিত যোগ দেয়। এইরূপে দাস  
সংখ্যা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল; বলে  
ধনে কিছুতেই ভৃত্য আর প্রভু অপেক্ষা  
যূন নহে। প্রভুরা আর এক্ষণে তাহা-  
দিগের উপর কোন রূপ অত্যাচার করিতে  
পারেন না। এই সময় হইতেই ভৃত্যেরা  
প্রভুদিগেব পরিবারবর্গের মধ্যে গণনীয়  
হইতে লাগিল।

কিন্তু দেখিতে দেখিতে আর এক বৈ-  
ষম্য। সে বৈষম্য বিদ্যাজনিত। যাহারা  
বিজ্ঞান, তাঁহারাষ্ট মহালোক, মুখেরা অ-  
পর ভ্রোণীয়। কিন্তু আজি কালি বিদ্যাজ-  
নিত বৈষম্যের ক্রমশঃ লোপ হইতেছে।  
দীন, দরিদ্র, রাজ্য, প্রজা সকলেরই লে-  
খাপড়া শিখিবার অধিকার আছে, এবং  
প্রায় সকলেই শিখিতেছে, স্মৃতরাং বিদ্যা-  
জনিত বৈষম্যের শীত্ৰই তীরোভাব হই-  
বার সম্ভাবনা। এই বৈষম্যের লোপ হ-  
ইলে অনারূপ কোন বৈষম্যের জন্ম হইতে  
পারে; কিন্তু পূর্বাপেক্ষা সাম্যবিধির  
তত্ত্ব সকলেই অধিকতর যে বুঝিয়াছে ও  
বুঝিতেছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য। পূর্বে  
যে রূপ অত্যাচার প্রচলিত ছিল এখন তা-  
হায় অনেক উপশম হইয়াছে; এবং যাহা  
আছে, আমাদের দৃঢ় ভরসা, তাহাও সা-  
ম্যবিধিপ্রসাদে শীত্ৰই অন্তর্হিত হইবে।

বঙ্গদেশে দাসত্ববিধি প্রচলিত ছিল

বলিয়া অনেকে আক্ষেপ করেন। শৃঙ্খলা  
ব্রাহ্মণদিগের হস্তে ঘোরতর প্রপীড়িত হ-  
ইত, এই কথা বলিয়া অনেকে দুঃখ করিয়া  
থাকেন, এবং ব্রাহ্মণেরা যে অত্যন্ত স্বার্থপর  
এই কথা সপ্রমাণ করিতে চাহেন, কিন্তু  
অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে আ-  
মাদিগের এদেশকে অনেক সৌভাগ্যশালী  
বলিতে হইবে।

সেসিমিথোনিয় যোদ্ধদল দাসদিগকে  
তঁাহাদিগের জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়  
সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করিতেন। দাস না  
হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে কে তাঁহাদের সঙ্গী হইবে?  
কে আহাংরে রক্ষনকারী, শরণে বাজনকারী  
হইবে? স্বদেশে বিদেশে কে আজ্ঞাবাহক,  
কে আজ্ঞাপালক হইবে? দক্ষিণকর্ণিয়ার  
যে অসভ্যজাতি বাস করে, তাহারাও দাস-  
প্রিয় \*। ক্রীতদাস না হইলে কোন কর্কাই  
হয় না। দুষ্কদোহনেও ক্রীতদাস। অন্যান্য  
জাতি অপেক্ষা ইহারা ভৃত্যদিগের প্রতি  
ঘোরতর অত্যাচার করিতেন; এমন কি  
পাছে তাহারা পলায়ন করে, এই ভয়ে তা-  
হাদিগকে ক্রয় করিয়াই অন্ধ করিয়া দেওয়া  
হইত। পুরাকালে জর্মানজাতিয়েরা ধার্মিক-

\* আজি কালি আর পূর্ববৎ বৈষম্য  
দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ণীয় সম্রা-  
টের আজ্ঞানুসারে তথাকার কৃষকদল বহু-  
দিন দাক্ষিণ ক্লেণ সহ্য করিয়াছিল। এক্ষণ  
ওরূপ বৈষম্যভাব লুপ্ত হইয়াছে বলিলেই  
হয়। এইক্ষণে এদেশীয় দাস ও প্রভু প্রায়  
একই সোপানারূঢ়।

এগণ্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বনমধ্যে কুঠীর নির্মাণ করিয়া ফলমূলে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন, তাহাদেরও সঙ্গে দাস-গণ দলে দলে বাস করিত। এতদ্ব্যতীত ভাণ্ডার, করিমু প্রভৃতি যে সকল স্থান বাণিজ্যের জন্ম পুরাকালে জগদ্বিখ্যাত ছিল, সেখানে দাসগণ আলুপটলের দরে বিক্রীত হইত। পুরাকালের দাস-বিক্রয়ের স্থান বলিয়া আজি পর্য্যন্ত অনেক নগরী পরিচিত। দাসী গর্ভবতী হইলে অথবা দাস একটু গুণবান্ বুদ্ধিমান বা বিদ্যাবান্ হইলে দাসস্বামী ক্রেতার নিকট হইতে দ্বিগুণ মূল্য আদায় করিতেন। এই কারণে দাসদিগকে বিদ্যাশিক্ষা, সঙ্গীত-শিক্ষা, রন্ধনশিক্ষা প্রভৃতি নানারূপ অলঙ্কারে ভূষিত করা হইত, কেননা এরূপ করিলে তাহারা অধিকমূল্যে বিক্রীত হইতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত এরূপ শিক্ষা দেওয়াতে প্রভুর আর কোন সদভিসন্ধি ছিল না।

কখন কখন প্রদেশ বিশেষে ভ্রমস-স্তানদিগকেও দাসরূপে বিক্রয় করা হইত। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই জেতৃগণ অনেক স্থলে বিজিতদিগকে আপনাদিগের ভৃত্যস্বরূপ রাখিত, কখন কখন বিক্রয়ও করিত। স্বন্দর বা বলবান্ বালক, অথবা রূপবতী বালিকা পাইলে তাহাদি-

ইউরোপীয়দিগের জয়পতাকা যখন উত্তোলিত হয়, তখনও জেতৃগণ বিজিতদিগকে দাসবৎ আচরণে অহরহঃ ক্রোশিত করিত।

গের আনন্দের সীমা থাকিত না। যখন বাণিজ্যের অপেক্ষাকৃত উন্নতি হয়, তখনও মধ্যে মধ্যে দাসপ্রথা কথায় শুনা যায়। ফলতঃ যে সকল পোতভূম্যাসাগর বা ভা-রতমহাসাগরের কূলে দিবায়াত্র যাতায়াত করিত তাহারাও সুবিধা পাইলে, আমাদি-গের ঠগী ডাকাইতের ন্যায়, লোকজন চুরি করিতে ছাড়িত না। কিন্তু শুনিলে আশ্চ-র্যান্বিত হইতে হয় যে, এত অত্যাচারেও কে-হই এই ভয়ানক ভৃত্যভাবের বিকক্ষে কোন কথা কহিতেন না। এরিস্ততন্ একস্থলে স্পষ্ট নির্দেশ করিয়াছেন যে, গ্রীকেরা প্রভু, রোমীয়েরা ভৃত্য,—কেননা গ্রীকেরা সুশিক্ষিত, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান, রোমীয়েরা অশিক্ষিত, মূর্থ ও নির্বোধ। ইহাতে স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে যে, তিনি দাসসংবিধির কিছুমাত্র বিরোধী ছিলেন না। তিনি আর একস্থলে বলিয়াছেন যে, দাসেরা সজীব অস্ত্রবিশেষ (Living tool)। সূত্রধর যেমন সূত্রাদি লইয়া আপনার ইচ্ছামত কাষ্ঠ ছে-দন বা পরিমাণ করে, প্রভুও তদ্রূপ—ভৃত্য ভাণ্ডার স্বকার্য সাধনের অস্ত্র। কর্মকার যেমন সকল কর্মেই তাহার অস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, প্রভুও দাসকর্তৃক তাহার সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া লয়েন। যাহাই হউক এবিধি রোমীয়দিগের যে বিশেষ কষ্টকর হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় নাই।

মিসরদেশে দাসসংবিধির স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রভুরা ইচ্ছা করিলেই ভৃত্যদিগকে আপনাদিগের কার্যে নিয়োজিত

করিতে পারিতেন। কল, কৌশল, রত্ন, যখন যেটির স্রবিধা, তখন প্রভু সেইটির আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। কেহই তাঁহার প্রতিবন্ধক হইত না। অন্ন বস্ত্র দিলেই প্রভু মনে করিতেন, আমি ভৃত্যের আশা-তিরিক্ত পুরস্কার দিয়াছি। ভৃত্যেরা এক-রূপ ক্রীতদাস। প্রভুর ইচ্ছানুসারে তা-হার বিক্রীত বা পরিবর্তিত হইতে পারিত। প্রভুর আজ্ঞা পালন না করিলে প্রভু ভূ-তাকে বেত্রাঘাতে শাসন করিতেন। য-খন প্রভুর ক্রোধে পড়িয়া ভূতের কোন অঙ্গ বিকল হইত, তখনও প্রভুর একাদি-পত্য। কেহ তাঁহাকে কোন কথা বলি-বার নাই। ভৃত্য অকর্মণ্য হইলে প্রভু তা-হাকে দাসত্বভার হইতে মুক্ত করিয়া দি-তেন; এরূপ মুক্তি দেওয়ার তাঁহার লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই; অন্ধকে বা খঞ্জকে অন্ন-বস্ত্র দেওয়ার কি উপকার? বাইবেলের এক-স্থলে (Exodus) উক্ত হইয়াছে, প্রভু বে-ত্রাঘাতে যদি ভৃত্যের প্রাণ হনন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু প্রহারের সময়ে না মরিলে তাঁহার কোন দণ্ড হইবে না, কেন না ভৃত্য প্রভুরই সম্পত্তি। এরূপ বিধিতে ভৃত্যের কোন উপকার নাই, প্রভুরও কোন অপ-কার নাই; কেন না প্রভু কখন ক্রোধ-ভরে ভৃত্যকে বধ করেন না, বধ করিলে তাঁহারই কার্যের ক্ষতি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মিসরদেশে ভৃত্যের উপর প্রভুর একাধিপত্য ছিল। যাহারা যুদ্ধে

বন্দী, বা যাহারা ঋণপরিশোধে অসমর্থ, যাহারা চৌর্য্যব্যবসায়ী, বা যাহারা দাস-তনয়, তাহাদেরই ভৃত্যভাবে অবস্থান ক-রিতে হইত।

কিন্তু এই সকল ভৃত্যসম্বন্ধে একটি স্রবিধা ছিল। এক্সোডাসের একবিংশতি অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, যদি কোন ভৃত্য তো-মার আজ্ঞাবাহক হয়, সে ব্যক্তি ছয় বৎ-সরকাল পর্য্যন্ত তোমার অধীন থাকিবেক; সপ্তমবর্ষে সে আর কাহারও দাস নহে। যদি সে স্ত্রীসহ আসিয়া থাকে, সে স্ত্রীসহ চলিয়া যাইবে, যদি একক আসিয়া থাকে, একাকীই যাইবে।

কিন্তু সম্ভে সম্ভে আর এক স্রবিধা,— যদি প্রভু তাহার সম্বন্ধ দেখিয়া বিবাহ দিয়া থাকেন, এবং সেই স্ত্রীর গর্ভে যদি এই ছয় বৎসরকাল মধ্যে ভৃত্যের কোন অপত্যাদি জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে স-ন্তানও দাসকে পরিত্যাগ করিয়া ভৃত্যকে একাকী যাইতে হইবে।

এই ভয়ানক ও নিষ্ঠুর বিধি মৈসরী-দিগের প্রতি যে ঘোরতর অত্যাচারের কা-রণীভূত হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবি-দিত নাই। যখন মিসররাজ সলোমনের যশপতাকাম্বরূপ প্রকাণ্ড মন্দির উত্তোলিত হয়, কথিত আছে, তখনও তিনি অত্যা-দেড় লক্ষ দাসকে সেই কর্ষে নিয়োজিত করেন। বস্তুতঃ, এদেশে প্রভুরা ভৃত্য-দিগকে পশুবৎ আচরণ করিতেন।

স্পেনীয়েরা যখন আমেরিকাতে খনি

আবিষ্কার করিলেন, তখন তাঁহারা দেশী-  
য়দিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার করেন যে,  
তাঁহাতেই অনেকের মৃত্যু হয় ।

ফ্রান্স এই নিষ্ঠুর আচরণের আর একটি  
দৃষ্টান্তমূল । অষ্টাদশ শতাব্দীতে তথায়  
যে ভীষণ রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়া গিয়াছে, ইতি-  
হাস বৈষম্যকেই তাহার কারণ নির্দেশ  
করে । পঞ্চদশ লুইর লম্পটতা, বিলাস-  
প্রিয়তা প্রভৃতি দ্রুত অপরিসীম অর্থ ব্যয়  
হইতে লাগিল । তাহাতে রাজকোষ  
শীঘ্র শূন্য হইয়া পড়িল । এক কপর্দকও  
মেলা ভার । তখন উপায়? না দীনদরিত্রের  
প্রতি অত্যাচার, পীড়িতের উপর পীড়ন ।  
যে ব্যক্তি সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পরে  
কেবল আহার্য্যমাত্র সংগ্রহ করিল, তা-  
হাকে উপবাসী রাখিয়া তাহার অর্জিত  
ধন রাজার করায়ত্ত হইল । যে সমস্ত দি-  
বস ভিক্ষা করিয়া এক কপর্দক অর্জন ক-  
রিল, তাহারও নিস্তার নাই । বলে, ছলে,  
কলে, কৌশলে দরিত্রেরা প্রপীড়িত হইতে  
লাগিল । তথাপি রাজকোষ শূন্য । আর  
ধনীরা? অতুল ঐর্ষ্যের অধিপতি হইয়া  
শিররে উপবিষ্ট । ভাবনা নাই; চিন্তা  
নাই । ক্রমক্রমে আগ্রহ হইতে রাজা  
যাহা আহরণ করিলেন, তাহারও অর্দ্ধেক  
আত্মসাৎ করিতে ধনীরা যত্নবান । যত অ-  
ত্যাচার দরিত্রদিগের উপর । অস্বীকার ক-  
রিলে নিস্তার নাই, গুরুতর ও ভীষণ শাস্তি,  
কোন কোন স্থলে বা প্রাণবদ । এইরূপে  
একদিকে আমোদ ও নিশ্চিন্ততা, অ-

পর দিকে অল্পের জন্য হাহাকার \* ।

কিন্তু পৃথিবীর একটি প্রদেশে এরূপ  
ভয়ানক দাসবিধি প্রচলিত ছিল না—  
একটি দেশে ভূতাদিগের প্রতি ঘোরতর  
নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রকাশ করা হইত না ।  
অন্যান্য প্রদেশে প্রভু ও ভূতামধ্যে যে স-  
ম্বন্ধ ছিল, একটি দেশে সেরূপ সম্বন্ধ ছিল  
না,—সেটি আমাদিগের ভারতবর্ষ ।

আমরা এরূপ বলিতেছি না যে, এ-  
দেশে বৈষম্যের জন্ম হয় নাই; অথবা এ-  
খানে একদল প্রভু অপরদল ভূতা ছিল  
না । যেখানে সমাজ, সেইখানেই বৈ-  
ষম্য, সুতরাং ভারতবর্ষেও যে বৈষম্য ছিল,  
তাহা আমরা অবশ্য স্বীকার করিব । কিন্তু  
তাহা হইলেও ভারতবর্ষ অন্যান্য দেশের  
মত ঘোরতর অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়  
নাই । অত্যাচার ছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে  
ভূতেরা যে অনেকাংশে স্বাধীন ছিল, তা-  
হাও স্বীকার করিতে হইবে । পণ্ডিতবর  
বরকল একস্থলে বলিয়াছেন যে, যে দেশে  
শাস্য অধিক জগ্নে, সেখানে আহাৰ্য্য অতি  
মূল্যবানো পাওয়া যায় । সুতরাং সে-  
স্থলের লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়িতে  
থাকে । পূর্বে শত ব্যক্তির মধ্যে যে অর্থ  
বিভক্ত হইত, লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হওয়াতে  
সেই টাকা একগুণে সহস্রাংশে ভাগ ক-  
রিতে হয়, সুতরাং প্রভোকের অংশে পূর্বে

\* এই ভীষণ অত্যাচারের ফল শীঘ্রই  
ফলিয়াছিল । প্রথম বোড়শ লুইয়ের সিং-  
হাসনচ্যুতি, দ্বিতীয় তাঁহার প্রাণবদ ।

বাহ্য পড়িত, এক্ষণ তাহা অপেক্ষা নূন পড়িয়া থাকে। কাজেই দরিদ্রদিগের অবস্থা আরও হীনতর হইয়া বৈষম্যভাব প্রবলতর হইতে থাকে। ভারতভূমি শাশালিনী, রত্নগর্ভা, সুতরাং সেখানে বৈষম্য অবশ্যই থাকিবে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সেই বৈষম্য হইতেই দুইদলের উৎপত্তি, একদল ব্রাহ্মণ, অপর শূদ্র। ব্রাহ্মণেরা প্রভু, শূদ্রেরা ভৃত্য। ব্রাহ্মণেরা আজ্ঞাকর্তা, শূদ্রেরা আজ্ঞাপালয়িতা।

ব্রাহ্মণ ও শূদ্র মধ্যে যে বিলক্ষণ বৈষম্য ছিল, তাহা মনুসংকিতায় স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। ব্রাহ্মণের মঙ্গলসূচক, ক্ষত্রিয়ের বলসূচক, বৈশ্যের ধনসূচক ও শূদ্রের নিন্দাসূচক নাম করিবে। ব্রাহ্মণের মঙ্গলবাচক, ক্ষত্রিয়ের রক্ষাবাচক, বৈশ্যের ভুক্তিবাচক ও শূদ্রের দাসবাচক শব্দ করিবে \*।

পুনশ্চ প্রথম অধ্যায়ের একনবতি শ্লোকে, একমেন তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনম্রয়ান্ ॥

এই কথা দ্বারা দাসত্ব যে শূদ্রদিগের অবলম্বন, ইহা মনু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন। সাধারণ বিধি ব্রাহ্মণদিগের সেবা করা,

\* মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য সাং ক্ষত্রিয়স্য বলাদিতং। বৈশ্যস্য ধনসংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং ॥ শব্দব্দ ব্রাহ্মণস্য সাত্বাজো রক্ষাসমাস্তিতং। বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈয়াসংযুক্তং ॥ মনু ৩১,২ অ, ৩২ ॥

কিন্তু সুবিধা অভাবে শূদ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবার নিযুক্ত থাকিতে পারে ২। শূদ্র এরূপ হেয় জাতি যে, তাহার সমক্ষে বেদপাঠ করিলেও ব্রাহ্মণকে নরকগামী হইতে হইবে ৩। ‘শূদ্র জাতি যদি ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণকে কঠিন বাক্যদ্বারা আক্ষেপ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাস্লেদরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে, যেহেতু পাদরূপ জঘন্য স্থান হইতে উহার জঘন্য হয় ৪’। ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিলে শূদ্রের বিলক্ষণ শাস্তিভোগ করিতে হইবে ৫। ‘তোমা-

২ বিপ্রাণাং বেদবিহ্বাং গৃহস্থানাং যশস্বিনাং। শুশ্রূষেব তু শূদ্রস্য ধর্মো নৈঃশ্রয়সঃ পরঃ। মনু ৯ অ, ৩৩৪ ॥

৩ নাবিস্পাক্ষমধীরীত ন শূদ্রজনসন্নিধৌ। ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রাহ্মণীত্যপুনঃ অপেৎ ॥ মনু ৪ অ ৯৯ ॥

৪ (মনুসংহিতা। কুলুকভট্টকৃত টীকা) বাঙ্গলানুবাদ সম্বলিত। কলিকাতা সংস্কৃত কালেক্স স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় জীযুক্ত ভারতচন্দ্র শিরোমণি কর্তৃক সংশোধিত। পাঠকগণকে বলা বাহুল্য যে, যে সকল অনুবাদে উদ্ধৃত চিহ্ন দেওয়া থাকিবেক, তাহা উক্ত পুস্তক হইতে গৃহীত।)

একজাতিদ্বিজাতীং স্ত্র বাচা দাক্ষণ্য কিপন্। জিহ্বায়াঃ প্রাপ্তুরাদেচ্ছদং জঘন্য ণ্ডভোহি সঃ ॥ মনু ৮ম অ, ২৭০ ॥

৫ মহাসমনভিপ্রেপ্শ্বকৎকৃৎসাপকৃৎজঃ। কট্যাং কৃতানোনির্কাস্যঃ স্ফিচৎ



দিগের এই ধর্ম অনুষ্ঠেয়, দর্প করিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাভিকে এইরূপ ধর্মোপদেশ দেয়, তবে রাজা উহার মুখে ও কণ্ঠে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করিবেন \* ।’

শূদ্রগণ এইরূপ দ্রবস্থ হইলেও তাহাদিগের সামাজিক অবস্থা অন্যান্যজাতিদিগের মত ক্লেশ-বন্তল ছিল না । তাহারা ইচ্ছা করিলে যাহারই হউক, তাহারই দাস হইতে পারিত । ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ যে শূদ্রকে ইচ্ছানুসারে পালন করিতে পারিত, অনেকস্থলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় । ইচ্ছা করিলে ব্যবসায়স্বারও তাহাদিগের পক্ষে উন্মুক্ত ছিল—কেহই প্রতিবন্ধক হইতে পারিতেন না । তাহাদিগের প্রভুরাও তাহাদিগকে ব্যবহার বিকল্প কোনরূপ শাস্তি দিতে, অথবা তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার প্রকাশ করিতে পারিতেন না । ইচ্ছা করিলে শূদ্রও অর্থসঞ্চয় করিতে পারিত । মনুর একস্থলে কথিত আছে যে, অন্যান্য বর্ণেরাও পাপাচরণ করিলে শূদ্রবৎ আচরিত হইত । বর্ষ অধ্যায়ে মনু লিখিয়াছেন, অমুমতি না লইয়া অন্যের ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে, ক্ষেত্রজাত ফল ক্ষেত্রস্বামীরই হইবে † ।

বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ ॥ মনুসংহিতা ৮ অ২৮১ ॥

\* ধর্মোপদেশং দর্পণ বিপ্রাণামস্য কু-  
র্ব্বতঃ । তপ্তমাসেচয়েতৈলং বন্ধু শ্রোত্রে  
চ পার্শ্বিণঃ ॥ ৮ অ ২৭২ ॥

† যেক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবা-

ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, যে, ব্রাহ্মণ ইচ্ছা করিলে শূদ্রের প্রতি যথেষ্টাচারিতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না ।

আর একস্থলে—ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক অন্যের গৃহ, ভড়াগ, উদ্যান, বা ক্ষেত্র হরণ করিলে পাঁচশতপণ দণ্ড দিতে হইবে । অজ্ঞানবশতঃ হরণ করিলে কেবল দুইশত পণ লাগিবেক । সীমানিরূপণের গোলাযোগ উপস্থিত হইলে রাজা স্বয়ং আসিয়া সকল বিষয়ের মীমাংসা করিবেন ‡ ।

এই কথা বলিয়া মনু স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছাচারী হইবার ইচ্ছা থাকিলেও হইতে পারিতেন না । তাহাদিগকেও শূদ্রদিগের মত নিয়মানুযায়ী কর্ম্ম করিতে হইত । নিয়ম ভঙ্গ করিলে শাস্তি পাইতেন ।

রাজাও ইচ্ছা করিলে যথেষ্টাচারী হইতে পারিতেন না । সকল বিষয়েই তাহার প্রাণ্য কর নির্দ্ধারিত ছিল, তাহার অধিক তিনি চাহিতেন না, চাহিলেও পাইতেন না । “ বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য তাহা কতদূর হইতে আনীত পিণঃ । তে বৈ শস্যাস্য জাতস্য ন লভন্তে ফলং কচিৎ ॥ মনু, ৬ অ ৪৯ ॥

‡ গৃহং ভড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া  
হরন্ । শতানি পঞ্চ দণ্ডাঃ স্তাদজ্ঞানী  
দ্বিশতোদমঃ ॥ মনু । ৮ অ, ২৬৪ ॥

সীমানামবিষছারায় স্বয়ং রাজৈব ধর্মবিৎ ।  
প্রদিশেদু মিতেবামুপকারাদিতি স্থিতিঃ ॥  
মনুসংহিতা ৮ অ, ২৬৫ ॥

পাথের ব্যয় এবং তাহা চৌরাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যে ব্যয়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এবং উজ্জ্বল যত ব্যয় ধরিয়া তদতিরিক্তে যাছা লব্ধ নিশ্চয় হইবে, তদনুসারে বাণিজ্যদ্রব্যাদির উপর বণিকদিগের নিকট হইতে রাজ্য কর লইবেন। সর্বতোভাবে বিবেচনা পুরঃসর রাজ্য তাঁহার রাজ্যে কর নিরূপিত করিবেন, যাছাতে উভয়পক্ষ অর্থাৎ নিজের এবং বণিক আপন আপন কার্যের যথার্থ ফল লাভ করিতে পারেন। যে প্রকারে জলৌকা কথির পান, বৎস দুগ্ধপান ও ভ্রমর মধুপান করে, সেই প্রকারে অপ্পে অপ্পে রাজ্য বার্ষিক কর গ্রহণ করিবেন, যাছাতে প্রজাদিগের মূলধনের প্রতিকোন ব্যাঘাত না হয়। পশু ও সুবর্ণ সম্বন্ধীয় লভ্যের কর পঞ্চাশ ভাগের একভাগ। ধান্যানাশিস্য বিষয়ে কর, ক্ষেত্রের বলাবল বিবেচনায় এবং ভূমি বিশেষে কৃষিকার্যের আবশ্যিক পরিশ্রমের হানাদিকা বিবেচনায় ষষ্ঠ বা অষ্টম অথবা দ্বাদশ অংশের একাংশ রাজ্য লইবেন। রস, মাংস, মধু, স্নাত, গন্ধদ্রব্য, ওষধি, রসাদির রস, পুষ্প-মূল, ফল, পত্র, শাক, তৃণ, বংশনির্মিত পাত্র ও মৃৎ পাত্র, প্রস্তুতময় দ্রব্য এই সমুদায় প্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে যাছা লাভ হইবে, রাজ্য তাহার ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিবেন \*। ”

\* ক্রয়বিক্রয়মহানং উক্তঞ্চ সপরি-  
ব্যয়ং। যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজ্যো-

এই সকল দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, কি রাজ্য কি ব্রাহ্মণ কে-  
হই শূদ্রের প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার ক-  
রিতে পারিতেন না। সকলকেই আইনমত  
কার্য করিতে হইত। মধ্যযুগের (Mid He-  
ndra) দাসেরা (Slave) যেরূপ কষ্ট স-  
হিত, তাহার তুলনায় আমাদিগের শূদ্রেরা  
যে অনেক সুখী ছিল, তাহাতে অগুমান  
সংশয় নাই। এদেশে প্রাচীন কালে যতই  
কেন বৈষম্য থাকুক না, এক দল প্রভু অপর  
দল ভূতা হউন না, কিন্তু আমরা স্পষ্ট  
বলিতে পারি যে, তাঁহাদিগের মধ্যে  
হৃদয়বিদারক অত্যাচার কখন প্রচলিত  
ছিল না। এই জন্যই আমরা বলিতেছি-  
লাম, যদি কোন দেশে অত্যাচাররূপ  
দাপয়েৎ করান্ ॥ মনুসংহিতাঃ ৭ অ,  
১২৭ ॥—যথা ফলেন যুক্তোত রাজা  
কর্ত্তা চ কর্ম্মণাং। তথাবেক্ষ্য হৃদ্যোরাষ্ট্রৈ  
কপ্পয়েৎ সততং করান্ ॥ ঐ ৭ অ ১২৮ ॥  
যথাপ্পাপ্পমদন্তাদ্যং বার্ষ্যোকোবৎ সমট-  
পদাঃ। তথাপ্পাপ্পো গ্রহীতব্যো রা-  
ষ্ট্রাভ্রাজাদিকঃ করঃ ॥ ঐ ৭ অ, ১২৯ ॥  
পঞ্চাশভাগ আদেয়ো রাজ্য পশুহির-  
ণ্যয়োঃ। ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠো-  
দাদশ এব না ॥ ৭ অ ১৩০ ॥ আদদীতথ  
ষড়্ভাগং ক্রমাৎসমধুসর্পিবাং। গন্ধো-  
ষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ ॥ ঐ ৭ অ,  
১৩১ ॥ পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ  
চর্ম্মণাং। মৃৎসানাঞ্চভাণ্ডানাং সর্বস্যাম-  
য়স্য চ ॥ ঐ ৭ অ, ১৩২ ॥

নিষ্ঠুর বিধি না থাকে, যদি কোন দেশে প্রভু ও ভূতাদিগের মধ্যে সম্বন্ধ অন্যদেশীয়দিগের মত না হয়, সেটি আমাদেরই এই ভারতবর্ষ ।

আমরা আর একপ্রকার প্রভু ভূতের উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাব সমাপ্ত করিব ।

আজি কালি স্ত্রী ও পুরুষ মধ্যে ভ্রাতৃ-মিত্র বৈষম্যভাব দৃষ্ট হয় । এতাব যে পূর্বে ছিল না একথা আমরা বলিতেছি না । কিন্তু প্রাচীন রমণীগণ বর্তমান কামিনীদিগের অপেক্ষা যে সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন ইহা আমরা যুক্তকণ্ঠে বলিব । তখন পুরুষ ও স্ত্রী প্রায় একই সোপানারূপে ছিলেন । ব্রহ্মা আপন দেহকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে নারী এবং অপরভাগে নর সৃজন করিলেন † । এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোক যে সকলেব পূজনীয়, পিতা, ভ্রাতা, পতি, দেবর প্রভৃতি সকলেরই মাননীয়, তাহা মনুষ্য উল্লেখ করিয়াছেন । যেখানে স্ত্রীলোক পূজিত না হয়, সেখানে দেবতারও প্রসন্ন নহেন । যেখানে স্ত্রীলোক অলঙ্কারে ভূষিত ন হয়, সেখানে কোন মঙ্গল নাই । যেখানে স্ত্রীলোকের মান আছে সেই স্থান বশের আকর ; সেই কুল পবিত্র যেখানে স্ত্রীলোক পূজিত । যেখানে স্ত্রীলোক অনাদৃত হয়, সেইখানে সকল অমঙ্গল আসিয়া একত্র হয়, ই-

† বিধা কৃৎজানোদেহমর্জেন পুরুষোভবং অর্জেন নারী । মনু ।

তাদি \* । এই সকল বাক্যদ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, পূর্বকালে স্ত্রীলোকেরা অধিকতর আদৃত হইতেন । কিন্তু তাই বলিয়া যে প্রাচীন কালে পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের সমান অধিকার ছিল, তাহা কখনই নহে । স্ত্রীলোকদিগকে সকল সময়েই যে পুরুষের বশত স্বীকার করিতে হইত, তাহাও মনুর আর একস্থলে দেখিতে পাওয়া যায় । ‘স্ত্রীলোক বালিকাই হউন, যুবতীই হউন, বা রজাই হউন, গৃহেতেও কোন কর্তৃ প্রভৃতি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া করিতে পারিবেন না । স্ত্রীলোক বাল্যাবস্থায় পিতার বশে থাকিবে, যৌবনাবস্থায় স্বামীর বশে ও স্বামী মরিয়া গেলে

\* পিতৃভিত্ত্যভিত্তিষ্ঠিতাঃ পতিভির্দেবরৈশ্চ । পূজ্যা ভূষয়িতব্যাস্ত ব-  
হুকল্যাণমীশ্রুতিঃ ॥ মনুসংহিতা ৩ অ,  
৫৫ ॥ যত্র নারীযান্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দে-  
বতাঃ । যত্রৈতান্ত্র ন পূজ্যন্তে সর্কাস্তত্রাফ-  
লাঃক্রিয়াঃ ॥ ৩ অ, ৫৬ ॥ শোচন্তি জাময়ো  
যত্র বিনশ্যন্ত্যন্ত তৎকুলং । ন শোচন্তি  
তু যত্রৈতা বর্জতে তচ্ছি সর্কদা ॥ ৩ অ ৫৭ ॥  
জাময়ো যানি গোহানি শপশ্যাপ্রতিপূ-  
জিতাঃ । তানি কৃত্যাক্তানীব বিনশ্যন্তি  
সমস্ততঃ ॥ ৩ অ, ৫৮ ॥ তন্মাদেতাঃ সদাপূজ্যা-  
ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ । ভূতিকাশ্মৈবরৈর্নিত্যং  
সৎকারেবৃৎসবেষু চ ॥ ৩ অ, ৫৯ ॥ নশ্চকৌ  
ভার্য্যা ভর্তা ভর্তা ভার্য্যা ভর্থৈবচ । য-  
শ্মিন্নেব কুলে নিত্যং কল্যাণং তত্র বৈ  
ক্রবৎ ॥ ৩ অ ৬১ ॥

পুত্রের বশে, পুত্র না থাকিলে স্বামীর স-  
পিণ্ড, সপিণ্ড না থাকিলে রাজার বশে  
থাকিবেক, স্ত্রীলোক কখন স্বাধীনতা লাভ  
করিবেক না। পিতা, স্বামী, পুত্র ইহাদি-  
গের হইতে স্ত্রী কখন বিচ্ছিন্ন হইবেক না,  
যেহেতু স্ত্রী ইহাদিগের সহিত বিযুক্ত হ-  
ইলে পতিকুল, পিতৃকুল, উভয়কুল নিম্নত  
হয় \*।' কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন না হই-  
লেও যে বর্তমান রমণীদিগের অপেক্ষা  
অনেক উচ্চাঙ্গন অধিকার করিয়া ছিলেন,

\* বালয়া বা যুবত্যা বা রুদ্ধয়া বাপি  
যোষিতা। ন স্নাতজ্ঞোণ কৰ্তব্যং কিঞ্চিৎ  
কৰ্ম্মাং গৃহেহ্যপি ॥ ৫ম অ, ১৪৭ ॥ বাল্যে  
পিতৃবশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্যা যো-  
বনে। পুত্রাণাং ভৰ্ত্তরি প্রেতে ন ভজ্যেৎ  
স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং ॥ ৫ম অ, ১৪৮। পিত্রাভত্ৰা  
মুতৈর্ক্যপি নেচ্ছত্তিরহমান্ননঃ। এবাং হি  
বিরহেণ স্ত্রী গর্হে' কুৰ্ঘ্যাভূতে কুলে ॥ ৫ম  
অ, ১৪৯ ॥

পুনশ্চ মনুর নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে।

পিতা রক্ষতি কৌমাରେ ভৰ্ত্তা রক্ষতি  
যৌবনে। রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্না-  
তদ্র্যমর্হতি ॥ ৩ ॥ ইমং হি সৰ্ববর্ণানাং  
পশাশ্বোধর্ম্মযুগ্মতং। যতন্তে রক্ষিতুং ভা-  
র্যাং ভৰ্ত্তারো দুর্কলা অপি ॥ ৬ ॥

তাহা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি। পু-  
র্বেও পুরুষ প্রভু ছিল, স্ত্রী ভৃত্য ছিল, এ-  
খনও তাহাই; কিন্তু পূর্বের সমস্ত এখ-  
নকার সমস্ত হইতে অনেক পৃথক্। এক্ষণে  
সে সমস্ত ভিন্নভাবে ধারণ করিয়াছে।  
পুরুষেরা সর্ব্বসর্বা স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের  
দাসী বলিলেই হয়। সাম্যবিধি প্রচারিত  
না হইলে সকল প্রকার বৈষম্য এক্ষণে হ-  
ইতে লুপ্ত হইবে না। যত দিন তাহা না  
হয়, তত দিন ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র, স্ত্রী এবং  
পুরুষ ইহাদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব বর্ত-  
মান থাকিবেই থাকিবে। তত দিন ব্রাহ্মণ  
শূদ্রের প্রতি অত্যাচার করিবে, পুরুষ  
স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করিবে। যত দিন  
দেশে দেশে গোমে গোমে নগরে নগরে  
এবিধি প্রচলিত না হয়, তত দিন এদৃষ্ট জ-  
গতের মঙ্গল নাই। তত দিন পরম্প-  
রের মধ্যে ভ্রাতৃত্বাব আমরা দেখিতে পা-  
ইব না। তত দিন ছোট বড় জ্ঞান ভি-  
রোহিত হইবে না।†

শ্রীমঃ—

† এই প্রবন্ধ লেখকের সহিত অনেক  
বিষয়েই আমাদের মতের একতা নাই।  
সাম্য ও বৈষম্য বিষয়ে আমাদের মত  
বিকৃত আছে, আমরা কোন সময়ে অন্য  
এক প্রবন্ধে তাহা প্রকাশ করিব। সং—



## জানকীর অগ্নিপরীক্ষা ।

চরিতাখ্যায়কের নয়নে দর্শন করিলে জানকীর সমগ্র জীবনই অগ্নিপরীক্ষা । কৌমাারে ধনুর্ভঙ্গপণ, যৌবনে বনবাসে পতির অনুগমন, অশোকবনে চেড়ীদিগের উৎপীড়ন, অযোধ্যায় রামরূত নির্বাসন এবং তপোবনে পুন্ডরুত স্বামীর নিদনশ্রবণ এই সমুদয়ই সেই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় । কিন্তু এতদ্ভিন্ন একটি বিশেষ ঘটনা শব্দতঃ জানকীর অগ্নিপরীক্ষা নামে অভিহিত হইয়াছে । রাবণ নিহত হইলে যখন জানকীর উদ্ধারসাধন হয়, তখন বহুকাল পরগৃহে বাসজন্য তাঁহার সতীত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে যে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তন্নিরাকরণার্থই এই পরীক্ষা স্থগীত হইয়াছিল । রামায়ণে উল্লেখ আছে যে, জানকী জ্বলদগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তন্মধ্যস্থিতে অক্ষতশরীরে বহির্গতা হইলেন । এই পরীক্ষায় বিজয়লাভই তাঁহার অগুরুসতীত্বের নিঃশংস প্রমাণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । পৌরাণিকের নয়নে ইহা ঐশ্বরিক ব্যাপার, অথবা অতিমানুষিক ঘটনা; পক্ষান্তরে যাহাদিগের পৌরাণিক ইতিহাসে আস্থা অস্পষ্ট; তাঁহারা বলেন যে, ইহা কম্পনার অত্যশ্চর্য্য স্বক্ৰি়ে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ কবির অতিবর্ণনা ভিন্ন আর কিছুই নহে । পৌরাণিকদিগকে নমস্কার করিয়া

আমরা দূরে অবস্থান করিতেছি । তাঁহাদিগকে মর্শস্পর্শী কোন কথা বলা আদর্শের অভিপ্রায় নহে । আমরাও বিশ্বাস করি জানকী সতীত্বের আদর্শ, জানকী পরমা সতী । ঐশ্বরিক ব্যাপার কিংবা কবির অতিবর্ণনা না বলিয়া এই ঘটনা অন্য কোন প্রকারে ব্যাখ্যাত হয় কি না, বিজ্ঞান এই চুক্তোদারবিষয়মধ্যে কোন আলোক প্রদান করে কি না, এই প্রবন্ধে আমরা তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব । আমরা পাঠকবর্গকে অন্য এই ঘটনার যে ব্যাখ্যা উপহার দিতেছি, তাহাই যে উহার অত্রান্ত ব্যাখ্যা আমরা এরূপ বলি না; পক্ষান্তরে ঐ ব্যাখ্যা যে বিজ্ঞান ও সদ্ব্যক্তির অনুমোদিত তাহাতেও আমাদের সন্দেহ নাই ।

অগ্নিপরীক্ষা ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ নহে । পুরাকালে অন্যান্য দেশেও ইহা প্রচলিত ছিল । সফোক্লিসের এণ্টিগোন পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গ্রীকেরা কখন কখন অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা তাহাদিগের দোষ প্রকাশন করিত । উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে যে, ক্রিয়ম এক ব্যক্তির নামে অপবাদ করাতে সে লোহিততপ্ত লৌহ হস্তে ধারণ করিয়া, এবং অগ্নির উপর দিয়া গমন করিয়া আপনাকে নির্দোষী প্রমাণ

করিতে প্রস্তুত ছিল। ইংলণ্ডের এডোয়ার্ডের মাতা রানী এমার সহিত উইন্সচেস্টারের ধর্ম্যাধ্যক্ষ অল্‌উইনের আত্মীয়তা থাকার বশতঃ সাধারণে তাঁহার সতীত্বের উপর সন্দেহান হয়। রানী এমা লোহিততণ্ডুলোহিতের উপর দিয়া অক্ষতপদে গমন করিয়া স্বীয় কলঙ্ক দূর করেন \*। সিম্প্লিসিয়স্ অটন নগরের ধর্ম্যাধ্যক্ষ হওয়ার পরেও স্ত্রীর সহিত এক ভবনে বাস করিতেন। এই জ্ঞাত্য লোকে তাঁহাকে ভোগবিলাসী বলিয়া ঘৃণা করিত। কথিত আছে সিম্প্লিসিয়স্-জায়া রহস্যজনসমক্ষে তণ্ডুল অঙ্গার বস্ত্রে ও বক্ষে ধারণ করেন। তাঁহার বস্ত্র অদগ্ধ ও শরীর অক্ষত থাকে। পরে সিম্প্লিসিয়স্ স্বয়ংও ঐরূপ করেন। ইহাতে সর্বসাধারণ তাঁহাদিগকে ভোগস্পর্শ-শূন্য বলিয়া সাদরে গ্রহণ করে। এই ঘটনা খৃষ্টের চতুর্থ শতাব্দীতে হইয়াছিল \*। পঞ্চম শতাব্দীতে আবার সেন্ট ব্রাইস্ এইরূপে আপন কলঙ্ক প্রক্ষালন করেন †।

মধ্যযুগে ইউরোপে অগ্নিপরীক্ষা প্রচলিত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে ইহার যেরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল, অন্য কোথাও তদ্রূপ ছিল না। যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রপ্রণেদকেরা অগ্নিপরীক্ষার বিধি করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষে অগ্নিপরীক্ষা কেবল পূর্বকালে

\* মোসিমের ধর্ম ইতিহাস ২য়, খণ্ড।

† ঐ ঐ

প্রচলিত ছিল এমন নহে; ইংরেজাদিকারের পরেও মধ্যে মধ্যে ঐরূপ পরীক্ষা হইত। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে কাশীর প্রধান বিচারক আলি ইব্রাহিম খাঁ দুইটি অগ্নিপরীক্ষার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন ‡। তৎকালে নয় প্রকার পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। নিম্নলিখিত বিবরণ তাঁহারই বর্ণনা অনুসারে লিখিত। ১—পরীক্ষার্থী এক দিন সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিবে। পরে যজ্ঞান্তে তাহাকে তোলে মাপা হইবে। দোষবাচক একখণ্ড কাগজ তাহার মস্তকে বাঁধিয়া দিয়া মন্ত্রপাঠান্তর তাহাকে পুনরায় মাপা হইবে, তাহাতে তাহার ভার পূর্বাপেক্ষা অধিক হইলে সে দোষী, এবং হান হইলে সে নির্দোষী সাব্যস্ত হয়; সমান হইলে পুনরায় মাপিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকাকার যোগী বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার মিতাক্ষরা পুস্তকে বলেন যে, তৃতীয়বারে অবশ্যই হানাদিক্য হইবে। ২—নয় হস্ত দীর্ঘ, দুই বিত্ততি পরিসর এবং এক বিত্ততি গভীর একটি ষাট করিয়া তাহা পিঙ্গল কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা পূর্ণ করিতে হয়। পরে পরীক্ষার্থী নম্রপদে উহার উপর দিয়া গমন করে। পদ ক্ষত হইলে দোষী এবং অক্ষত থাকিলে নির্দোষী সাব্যস্ত হয়। ৩—নাভীজলে দণ্ডায়মান হইয়া পরীক্ষার্থী ডুব দিয়া একজন ব্রাহ্মণের পদধারণ করিয়া থাকিবে। একটি দূরনিষ্কিপ্ত তীর আনয়ন পর্য্যন্ত ডুব দিয়া থাকিতে পারিলে নি-

‡ এসিয়াটিক রিচার্চ ১ম খণ্ড।

দোষী ; অন্যথা দোষী । ৪—আট রতি মাখনের সহিত আড়াই রতি বিবনাগ ত্রা-  
ক্ষণহস্তে ভক্ষণ করিতে হয়, ইহাতে প-  
রীক্ষার্থীর যদি কোনরূপ কষ্ট না হয় তাহা  
হইলে সে নির্দোষী । বিবপরীক্ষা অন্য  
এক প্রকারেও গ্রহীত হইয়া থাকে । তা-  
ণ্মধ্যে একটি সর্প রাখিয়া তন্মধ্যে একটি  
মুদ্রা কিংবা অঙ্গুরীয়ক ফেলিয়া দেওয়া হ-  
ইত । উহা তুলিয়া লইতে সর্প যদি প-  
রীক্ষার্থীকে দংশন না করে তাহা হইলে  
সে নির্দোষী । ৫—শালগ্রাম ধোয়াইয়া  
সেই জল পরীক্ষার্থী পান করিলে যদি  
তুই সপ্তাহের মধ্যে কোন পীড়া না হয়  
তাহা হইলে সে নির্দোষী । ৬—শাল-  
গ্রাম ওজন করিয়া তণ্ডুল লইতে হইবে ।  
সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে সেই তণ্ডুল চর্কণ ক-  
রিতে দিতে হইবে । যাহার মুখ হইতে  
শুক সরক্ত তণ্ডুল বহির্গত হইবে সেই  
দোষী । ৭—তণ্ডুল তৈলে হস্ত প্রদান ক-  
রিলে যদি অক্ষত থাকে, তাহা হইলে নি-  
র্দোষী প্রমাণ হয় । ৮—তণ্ডুল লৌহকল্লুক  
কিংবা তীরাগ্রস্পর্শে হস্ত অক্ষত থাকিলে  
সে নির্দোষী । ৯—ধর্মের এবং অধর্মের  
দুইটি মূর্তি করিয়া জলভাণ্ডে নিক্ষেপ ক-  
রিতে হয় । পরীক্ষার্থী যদি ধর্মের মূর্তি  
উত্তোলন করে তাহা হইলে সে নির্দোষী ।  
এই নয়টি পরীক্ষার মধ্যে দ্বিতীয়, সপ্তম  
এবং অষ্টম এই তিনটি অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে  
গণ্য হইতে পারে । আলি ইব্রাহিম খাঁ  
সপ্তম এবং অষ্টম প্রকারের দুইটি পরীক্ষা

স্বয়ং দর্শন করিয়াছিলেন । সপ্তম প্রকা-  
রের পরীক্ষার তত্ত্বতলে পরীক্ষার্থীর  
হস্তদগ্ধ হইয়া যায় এবং সে দোষী  
সাব্যস্ত হয় । অষ্টম প্রকারের পরীক্ষার  
পরীক্ষার্থী লোহিততণ্ডুল লৌহকল্লুক অ-  
ক্ষত হস্তে ধারণ করিয়া নির্দোষী সাব্যস্ত  
হয় । আলি ইব্রাহিম খাঁ এই পরীক্ষার্থী-  
দ্বয়কে নিবারণ করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু  
তাহারা কোন প্রকারেই তাঁহার কথায় স-  
ম্মত হয় না । লৌহকল্লুকধারী হস্তে সাতটি  
অশ্বখ পত্র ও সাতটি দুর্কা দিয়ানইয়াছিল ।

যদিও এখন দোষ প্রমাণ কিংবা প্র-  
কাশন জন্য এরূপ পরীক্ষা প্রচলিত নাই,  
তথাপি এই শ্রেণীর ঘটনা মধ্যে মধ্যে দেখা  
যায় । বোধ হয় পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ  
কেহ লোহিততণ্ডুল কোদালের উপর সঠি-  
লপদ স্পর্শ করাইয়া সেই পদদ্বারা রো-  
গীকে ঝাড়িতে দেখিয়া থাকিবেন । এই-  
রূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে । বাহুল্য ভয়ে  
তৎসমুদয় ত্যাগ করিয়া আমরা এক্ষণে  
মূল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটি সাধারণ পাঠকের  
বোধগম্য করিতে যত্নশীল হইব ।

মসৃণ লৌহ বা রৌপ্যকলক তণ্ডুল ক-  
রিয়া তরুপরি কএক বিম্বু জল নিক্ষেপ  
করিলে উহা কলকের তাপানুসারে শীত  
বা গৌণে শুকাইয়া যায় ; অর্থাৎ কলক  
যত তণ্ডুল, তত অল্প সময়ে জলবিম্বু বা-  
ল্যাকারে পরিণত হয় । কিন্তু একটি নি-  
র্দিষ্ট তাপরেখা অতিক্রম করিলে কলক এ-  
রূপ ঘটে না । জলের পক্ষে এই নির্দিষ্ট

রেখা তাপমান যন্ত্রের ১৫০ ডিগ্রি \*। ১৫০ ডিগ্রি কি ততোধিক তপ্ত ফলকোপরি কতিপয় কবোক্ষ জলবিন্দু নিক্ষেপ করিলে উহা সহসা বাষ্পীকারে পরিণত না হইয়া মলিনীদলগত জলবৎ ইত্যন্তঃ পরিভ্রমণ করিতে থাকে এবং প্রায়শঃই জলবিন্দুর পাখী কুঞ্চিত দৃষ্ট হয়। তরল পদার্থের এই অবস্থা গোলকম্প অবস্থা নামে অভিহিত হইয়াছে। ফলক খানিকে

\* এই প্রবন্ধে তাপ নির্দেশ সময়ে তাপমান যন্ত্রের শতকীর বিভাগ (Centigrade scale) ব্যবহৃত হইয়াছে। তাপমানের এই রূপ বিভাগ করিতে নিম্ন লিখিত প্রণালী অবলম্বন করিতে হয়। প্রথমতঃ তাপমান যন্ত্র গলৎ বরফের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখিলে পারদ যে স্থলে নামিয়া স্থির হয় তাহা চিহ্নিত করিতে হয়। পরে স্ফুটজ্বলের বাষ্পে নিমগ্ন করিলে পারদ যেন্থলে উঠিয়া স্থির হয় তাহাও চিহ্নিত করিতে হয়। এই দুই চিহ্নের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে শতাংশে বিভক্ত করিতে হয় এবং নিম্ন হইতে ০, ১, ২, ৩, . . . . . ৯৮, ৯৯, ১০০ চিহ্নের সংজ্ঞা দিতে হয়। ১০০ র উচ্চে ঐরূপ সমান অংশ করিয়া ১০১, ১০২, ১০৩ ইত্যাদি চিহ্ন দিতে হয় এবং ০র নীচে ঐরূপ সমান অংশ করিয়া—১,—২,—৩ ইত্যাদি চিহ্ন দিতে হয়। সুতরাং—৩৯ ডিগ্রি বলিলে শূন্য ডিগ্রির ৩৯ ডিগ্রি নিম্নতাপ অর্থাৎ যে তাপে বরফ গলিতে থাকে তাহার ৩৯ ডিগ্রি কম তাপ বুঝায়।

ক্রমে শীতল হইতে দিলে যখন তাহার তাপ ১৫০ ডিগ্রির হান হয়, তখন সহসা শব্দ করিয়া গোলকম্প জল বাষ্পীকারে পরিণত হয়। অনেক কাল হইতে এই বিষয়টি বিদিত ছিল, কিন্তু শতাব্দিক বর্ষ হইল লীডনফোর্ড প্রথম উহার গূঢ়াভ্যাসন্ধান করেন। সম্প্রতি বুটিনী এতৎসম্বন্ধীয় অনেক গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়াছেন। বুটিনীই ‘গোলকম্প অবস্থা’ এই সংজ্ঞা প্রথম ব্যবহার করেন। সম্ভবতঃ সমুদয় তরল পদার্থই এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে। এযাবৎ জল, সুরাসার, ইথর, তরল গন্ধকীয় অম্ল, তরল যবক্ষারীয় অম্লজান, সোডিয়াম গন্ধক ও যাবক্ষারিক অম্ল এই কএকটি তরল পদার্থজারাই পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া গিয়াছে†। সুরাসার দিয়া এই পরীক্ষা করিতে হইলে ফলকের তাপ ১৩৪½ ডিগ্রি কিংবা তদুচ্চ হওয়া আবশ্যক, ইথরের পক্ষে কেবল ৬১ ডিগ্রি হইলেই হয়।

যে তাপে কোন তরল পদার্থ কুটিতে থাকে সে তাপকে সেই পদার্থের স্ফুটন তাপ কহে। পরীক্ষাকালে তাপমানযন্ত্র দ্বারা গোলকম্প তরলের তাপ নিরূপণ করিলে দেখা যায় উহার তৎকালীন তাপ

† আমরা ইংরেজী অস্ ও ইকের পার্থক্য বাজলায় জয় এবং ইক দ্বারা নির্দেশ করিব। যথা সালফিউরিক এসিড গাঙ্ককিক অম্ল; সালফিউরস্ এসিড গাঙ্ককীয় অম্ল।



স্ফুটনতাপ অপেক্ষা হয়। এতদ্বিষয়ে বুটিনীর তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। পদার্থের বিপরীতে প্রথমতঃ স্ফুটন-তাপ ও তৎপরে গোলকম্পাবস্থার তাপ লিখিত হইল।

জল.....	১০০ ডিগ্রি	.....৯৫ ডিগ্রি
সুরাসার	.....৭৮.....	.....৭৫ ..
ইথর.....	৩৭.....	.....৩৪ ..
গন্ধকীয় অম্ল..	১০.....	.....১১ ..

এই হস্তের উপর নির্ভর করিয়া বুটিনী কএকটি আশ্চর্য্য এবং বিস্ময়জনক পরীক্ষা সম্পাদন করিয়াছেন। গন্ধকীয় অম্ল—১০ ডিগ্রির নীচে এবং যাবৎকারীয় অম্ল—৭০ ডিগ্রির নীচে তরল অবস্থায় থাকে এবং তদুচ্চ তাপে বাষ্পীকরণ ধারণ করে। লোহিততপ্ত ক্ষুদ্র রৌপ্য পাত্রে যদি কএক বিন্দু তরল গন্ধকীয় অম্ল নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে উহা গোলকম্পাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং বুটিনীর পরীক্ষারূপে উহার তাপ—১১ ডিগ্রি থাকে, জল ০ ডিগ্রির নীচেই অস্রব বরফে পরিণত হয়। অতএব যদি ঐ লোহিততপ্ত পাত্রস্থ তরল গন্ধকীয় অম্লের উপরে কএক বিন্দু জল নিক্ষেপ করা যায় তাহা হইলে জলের তেজঃক্ষয় হইয়া উহা বরফে পরিণত হয়\*। বুটিনী এই প্রকারে পারদ-

\* আমরা Heat হীট এবং Temperature

টেম্পারেচার এই দুইয়ের পার্থক্য রক্ষার জন্য বাঙ্গালায় তেজ ও তাপ এই দুইটী শব্দ নির্দেশ করিব। জীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ও

কেও অস্রবাবস্থ করিয়াছেন।—৩৯ ডিগ্রির নীচে পারদ অস্রব অবস্থা ধারণ করে। গোলকম্প তরল যবৎকারীয় অম্লের তাপ—৭০ ডিগ্রির নীচে থাকে, অতএব তদুপরি কএক বিন্দু পারদ নি-  
এই দুই শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু অধুনাতন বিজ্ঞানলেখকদিগের মধ্যে জীযুক্ত কানাউলাল দে রায় বাহাদুর এবং জীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এই দুইয়ের পার্থক্য রক্ষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া উভয় স্থলেই তাপ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। হীটকে তাপ বলিয়া থারমমিটরকে তাপ-মান বলিয়া যে কতদূর অসঙ্গত তাহা ষাঁহার। বিজ্ঞানের উপক্রমণিকা মাত্র পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাও বুঝিবেন। ইহারা কি হীট এবং টেম্পারেচারের পার্থক্য স্বীকার করেন না? না কেলরিমিটার এবং থার্মিটার উভয়ই ইহাদিগের নিকট এক পদার্থ। হীটকে তাপ বলিলে এই কেলরিমিটারকেই তাপমান বলা উচিত। বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রয়োগ বিষয়ে ইহাদিগের এক এক জনের উদাসীনতা আরও বিস্ময়কর; ইহারা সমস্ত পুস্তকে হীটকে তাপ বলিয়া শেষে স্পেসিফিক হীটকে আপেক্ষিক তেজ নাম দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। আমরা হীটকে তেজ, টেম্পারেচারকে তাপ, থারমমিটরকে তাপমান, কেলরিমিটরকে তেজোমান এবং স্পেসিফিক হীটকে আপেক্ষিক তেজ বলিব।

ক্ষেপ করিলে উহার তেজঃক্ষয় হইয়া উহা অত্রবাবস্থ হয়। ফেরাতে এই প-রীক্ষাটি প্রকারান্তরে সম্পাদন করিয়া-ছেন। তিনি তরল যবক্ষারীয় অম্লের পরিবর্তে ইথর এবং অত্রব আঙ্গারিক অ-ম্লের ব্যবহার করিয়াছেন।

তরল পদার্থের এই গোলকম্প অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার কারণ কি? সামান্যতঃ একটি উষ্ণ এবং একটি শীতল পদার্থ একত্র করিলে উভয়ের তাপসামঞ্জস্য হয়, অর্থাৎ উষ্ণ পদার্থ কিঞ্চিৎ শীতল ও শী-তল পদার্থ কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া উভয়েরই এক তাপ হয়। আবার তেজের তাপ রুদ্ধি যেরূপ একটি কার্য্য, অবস্থা পরি-বর্তন করাও সেইরূপ আর একটি কার্য্য, অর্থাৎ তাপরুদ্ধি হইতে যেরূপ তেজঃক্ষয় হয়, অত্রব পদার্থকে তরল, কিংবা তরল পদার্থকে বাষ্প করিতেও সেইরূপ তেজঃক্ষয় হয়। গোলকম্প অবস্থার পরীক্ষা সমূহে তেজ, ফলক ও তরলের তাপসামঞ্জস্য করিবার পূর্বেই তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করে। এই বাষ্পমণ্ডলে গোলকম্প তরল পদার্থ ভাসমান থাকে অর্থাৎ তরল পদার্থ লোহিতোষ্ণ ফলককে স্পর্শ করে না বাষ্প উহাদিগের মধ্যে ব্যবধান থাকে। এই ব্যবধান থাকার বশতঃই তাপসামঞ্জস্য শীঘ্র হইতে পারে না। ফলক ক্রমে ক্রমে শীতল হইলে আর পর্য্যাপ্ত বাষ্প উদ্ধাত হয় না। তখন তরল পদার্থ ফলক স্পর্শ করে এবং স্পর্শমাত্রই তাপসামঞ্জস্য ক-

রিতে লোহিততপ্ত পাত্রের তেজঃ তরল পদার্থকে এককালে বাষ্পাকারে পরিণত করে।

গোলকম্প তরল পদার্থ ও লোহিত-তপ্ত ফলক যে পরস্পর স্পর্শ করে না, তাহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণীকৃত হইয়াছে। ফ-লক খানি ঠিক সমান করিয়া বসাইয়া যদি কএক বিম্বু জল তাহার উপরে নিক্ষেপ করা যায়, তাহা হইলে জল কোন দিকে গড়াইয়া পড়ে না। উপর হইতে একটি তার জলমংলম করিয়া ধরিলে জল স্থির থাকিবে। এখন ফলক ও জলের মধ্য দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অপর পার্শ্বস্থ দীপশিখা দেখা যাইবে। জল কালী দ্বারা কাল করিয়া দিলে পরীক্ষাটি আরও স্পষ্ট হয়। তাড়িতালোক সাহায্যে পটে এই পরীক্ষার ছায়া নিক্ষেপ করিলে ফলক ও জলের মধ্যে যে ব্যবধান আছে তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। নিম্নতল হইতে অতিমাত্রায় বাষ্প উদ্ধাত হওয়াতেই এই ব্যবধান থাকে এবং এই কারণেই গোলকম্প তরল স্থির না থাকিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। চার্জ সাহেব ভিন্ন একারের গুটিকত পরীক্ষা দ্বারা এই ব্যবধান সপ্রমাণ করিয়াছেন। ঐ সমস্তের একটির মাত্র আমরা এস্থলে উল্লেখ করিব। রৌপ্য সোডিয়ম-গন্ধক-সংলগ্ন হইলে রৌপ্য-গন্ধক প্রস্তুত হয় এবং তজ্জন্য রৌপ্যে একটি কাল দাগ পড়ে। চার্জ সাহেব দেখাইয়াছেন যে, রৌপ্যপাত্র লোহিততপ্ত করিয়া তদুপরি

সোডিয়ম-গন্ধক নিক্ষেপ করিলে যতক্ষণ উহা গোলকম্প অবস্থায় থাকে ততক্ষণ রৌপ্যপাত্রে কোন দাগ লাগে না ।

অতি তপ্ত ধাতু এবং তরল পদার্থ যে পরস্পর সংলগ্ন হয় না, তাহা আরও অন্যান্য উদাহরণদ্বারা দেখান যায় । যদি প্লাটিনমনির্মিত একটি কন্দুক লোহিততপ্ত করিয়া জলপাত্রে নিমজ্জিত করা যায় তাহা হইলে জলরাশি উহার পার্শ্ব হইতে অপস্থত হয় এবং প্লাটিনম কন্দুকটি বাষ্প-মণ্ডলে আবৃত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত লোহিততপ্তই থাকে ; পরে যখন জলকে বাষ্পে পরিণত করিতে উহার এত তেজঃক্ষয় হয় যে, উহার তাপ ১৫০ ডিগ্রির ন্যূন হইয়া যায়, তখন অন্যান্য সংলগ্ন হইয়া জল ফুটিতে থাকে এবং প্রভূত বাষ্পরাশি উদ্গাত হয় । আরও একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । পটাসিয়ম জলে নিক্ষেপ করিলে জলজ্বান ও পটাস প্রস্ফুট হয় । জলজ্বান জ্বলিতে থাকে এবং তজ্জন্য এত অধিক তাপ হয় যে, পটাস জলসংলগ্ন না হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে । জলসংলগ্ন হইলে ভার-বশতঃ ডুবিয়া যাইত ।

গলিত সীসকের মধ্যে অথবা গলিত দৌহের মধ্যেও কিরূপে হস্ত দেওয়া যাইতে পারে তাহা উপরোক্ত পরীক্ষাসমূহ বুঝিয়া থাকিলে, সহজেই প্রতিপন্ন হইবে ।\*

\* সীসকের গলনতাপ ৩৩৫ ডিগ্রি, দৌহের ১৫০০ ডিগ্রি ।

হস্ত আর্জবস্ত্রে মুছিয়া পরে গলিত ধাতুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিতে হয় । অতি-তাপজন্য হস্তের জল বাষ্পীকারে পরিণত হইয়া হস্তকে ধাতুসংলগ্ন হইতে দেয় না । এই জন্যই হস্ত অক্ষত থাকে । কিন্তু তপ্ত জলে হস্ত দিলে জলসংলগ্ন হওয়াতে দগ্ধ হইয়া যায় ।

এক্ষণে দেখা যাউক অগ্নিপরীক্ষা বিস্থাপন করা যায় কি না ? হইতে পারে মনুষ্যের জ্ঞানভাণ্ডার পুরাকাল অপেক্ষা এক্ষণে প্রশস্ততর হইয়াছে । কিন্তু ইহাও কি সম্ভবপর নহে যে পুরাকালে যে সমস্ত বিষয় লোকবিদিত ছিল তাহার মধ্যে দুই চারিটি আমরা জ্ঞানি না । সম্ভবতঃ এমন কোন পদার্থ পুরাকালে বিদিত ছিল যাহা শরীরে মর্দন করিয়া কিংবা মাখিয়া গেলে তাহার বাষ্প শরীরকে অগ্নিসংলগ্ন হইতে দেয় না । অতএব দেখা যাইতেছে বাষ্পাব্যবধানে অগ্নিপরীক্ষার সুন্দর ব্যাখ্যা রহিয়াছে । আর একটি কথা বলিয়া আমরা প্রস্তাবের উপসংহার করিব ।

সংপ্রতি নুইডেন দেশবাসী কাণ্ডান আলষ্ট্রম এক নূতন পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছেন । উহা পরিধান করিয়া অস্বচ্ছন্দে অগ্নিমধ্যে অর্দ্ধঘণ্টা বা তদৃদ্ধ কাল কটন করা যায় । মিলিসিয়া নগরে এই পরিচ্ছদের যে পরীক্ষা হয়, তাহাতে আলষ্ট্রম, স্বয়ং জ্বলদগ্নির মধ্যে প্রবেশ করেন । চারি স্তূপ কাষ্ঠ অগ্নিসংযোগে জ্বলিয়া উঠিল । তিনি অনারাসে অগ্নিশিখার মধ্যে জ্রমণ

করিতে লাগিলেন কখনও বা কোন জ্বলৎ কার্ত্ত্বশেণের উপর বসিতে লাগিলেন। পর দিবস নিকটস্থ অজ্ঞারখনির মধ্যে পুনরায় এই পরিচ্ছদের পরীক্ষা করা হয়। খনির এক পার্শ্ব গ্যাসপূর্ণ করিয়া অন্যান্য অংশ হইতে পৃথক্ করা হয়। একজন ভ্রমলোক স্বেচ্ছাক্রমে ঐ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া খনিমধ্যে অবতীর্ণ হইলেন এবং গ্যাসে অগ্নি প্রদান করা হইল। তিনি ২০ মিনিট কাল এই জ্বলৎ গ্যাস মধ্যে বিনা কষ্টে থাকিয়া বাহিরে আসিলেন। আলট্রিম্ এই পরিচ্ছদ প্রসিয়া-দিপের নিকট ৫। মার্ক মূল্যে বিক্রয়

করিয়াছেন। বিজ্ঞানের কোন্ নিষ্ঠুর স্বভাব বলয়ন করিয়া তিনি এই পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা এযাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। পরিচ্ছদের মূল্যবাস্তবে উহা অপ্রকাশিত রাখা হইয়াছে। আমরা উপরে বিজ্ঞানের যে একটি তত্ত্ব প্রকটিত করিয়াছি তাহা এবং এই অগ্নিপরিচ্ছদের মূলতত্ত্ব এক কি না বলিতে পারি না। যদি এক না হয় তাহা হইলে জ্ঞানকীর এই ভুবনবিজ্ঞাত, প্রসিদ্ধ অগ্নিপরীক্ষার আরও একটি বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

শ্রীল—

## নিম্নকের এত নিন্দা কেন ?

এদেশের এক প্রাচীন নীতি-প্রবক্তা এইরূপ বলিয়াছেন যে, পৃথিবী সকল ভার সহিতে পারেন, নিম্নকের ভার সহিতে পারেন না। নিম্নক পর্বত ও সমুদ্র হইতেও হ্রস্ব। আবার সকল নীতি-প্রবক্তার শিরোমণি মহামনা সেক্সপিরও নিম্নকের নিন্দাচ্ছলে অতিমর্য্যাপার্শি বাক্যে এই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন যে,—

“যে আমার ধনরাশি অপহরণ করে, সে আমার কিছুই অপহরণ করে না। উহা অবস্থামধ্যে পরিগণনীয়। উহা আমার ছিল, এইক্ষণ তাহার হইল, এবং পুঙ্খোঁ উহা সহজ সহজ লোকের ভোগে আ-

সিয়াছিল। কিন্তু যে আমি হইতে আমার সুনামটি অপহরণ করে, সে আপনি ধনী হয় না, অথচ আমার প্রকৃতই দরিদ্র করে।”

এইরূপে দৃষ্ট হইবে যে, সমাজে সকলেই নিম্নকের উপর খড়াহস্ত; সকলেই নিম্নককে ছদয়ের সহিত ঘৃণা করেন। নিম্নকের জিহবার নাম বিষ, নিম্নকের সাহচর্যের নাম মরক, নিম্নকের কথোপকথনের নাম ভাষার কলঙ্ক। ইহা কেন? নিন্দা যদি এমনই এক মহাপাতক, তবে এপাণে কে না লিপ্ত? মনুষ্যনিবাসে কে না পরের নিন্দা করে?

যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, বহুদর্শী, তাঁহারা নব্যমাত্রকেই হিতাহিতবিবেচনাশূন্য, অ-  
হিরণ্যভাব ও উদ্ধত বলিয়া নিন্দা ক-  
রেন;—যাঁহারা নব্য, তাঁহারাও বুদ্ধি-  
গকে নিক্রিয়, নিকদাম, অনুরাগশূন্য ও  
কতিলাভ-গণনা-তৎপর বলিয়া নিন্দা ক-  
রিতে ভালবাসেন। যেখানে পাঁচটি  
প্রাচীনা গৃহিণী একত্র উপবিষ্ট হন, সে-  
খানে কেবলই নবীনাদিগের নিন্দা,—ন-  
বীনা ফুলবধুরা, বিলাসিনী, বস্ত্রাভরণপ্রিয়  
অলস, লজ্জাহীন, অকর্মণ্য কেবলই এই  
আলাপ। আবার যেখানে পাঁচটি স-  
ভাভাতিমানিনী নবীনা দৈবযোগে আ-  
সিয়া একত্র হন, সেখানেও শুধু প্রাচীনা-  
দিগেরই নিন্দাবাদ।

কি বিচিত্র! যাঁহারা স্বয়ং যার-  
পর নাই নিম্ননীর, তাঁহারাও পরনিম্নায়  
বিমুগ্ধ নছেন। কোন প্রাচীনা কোন্‌লে  
এত অমৃতক যে, আর কাহাকেও না পা-  
ইলে, তিনি বাগানের বৃক্ষ লতার সহিতও  
প্রতিদিন কিছুকণ বিবাদ করিয়া থাকেন।  
তাঁহার আশ্ফালনে, উদ্ধারে, উজ্জ্বলনে ও গ-  
র্জনে, তাঁহার জরুঞ্জে, বাহুভাঙনে  
দন্তে দন্তবর্ষণে, ও চক্ষুদ্বয়ের বিকট আব-  
র্তনে বালক বালিকার কথা দূরে থাকুক,  
পশু-পক্ষীও ত্রাহিরবে পলাইয়া যায়।  
তাঁহার গগণ-বিদারী স্বর্ষর চীৎকারে আ-  
মের কুকুর গুলিও ভয়ে চমকিয়া উঠে।  
অথচ তিনি তাঁহার জাতীয় পুত্রবধুটিকে,  
সর্বদাই মুখরা বলিয়া তিরস্কার করেন,—

আধুনিক যুবতীরা লেখাপড়া শিখিয়া অ-  
শিষ্ট হইতেছে এই ভাবিয়া সর্বদা দুঃখিত  
রছেন। এদিগে ক্ষীরদা ছয় মাস হ-  
ইল কথ ছাড়িয়া নাম আর পুত্র লি-  
খিতে অভ্যাস করিতেছেন; তিনি পায়ে  
একটুহু আলতা মাখিয়া, হাতে একখানি  
শিশুশিক্ষা লইয়া, স্বপ্ন ননান্দ প্রভৃতি  
গুরুজনদিগকে মুখ ও অসভ্য বলেন, এবং  
তাঁহাদিগের শাস্ত্রালাপবর্জিত কাব্যকথা-  
শূন্য, কথোপকথন হইতে দূরে রহিতে  
পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ বিবেচনা  
করেন।

এই প্রকার পরস্পর নিন্দা সর্বত্রই  
প্রচলিত। যাজক সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা  
কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিনিপুণ ব্যক্তি-  
দিগকে প্রায়ই সেই এক অনির্বচনীয় সা-  
নুমানিক স্বরে পাপী ও নাস্তিক বলিয়া  
নিন্দা করেন; ইহারাও পক্ষান্তরে অতি  
উদারস্বভাব, বিশুদ্ধচরিত্র ও মেহান্তিত  
যাজকদিগকেও কপট, ভণ্ড, বকতপন্থী ও  
বিশ্ববিদ্বেষী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন।

যেমন প্রভুদিগের মধ্যে ভৃত্যের নিন্দা,  
ভৃত্যদিগের মধ্যেও সর্বদাই সেইরূপ প্রভু-  
নিন্দা। স্বহৃদ প্রভু বড় রূপণ, বড় শঠ।  
তিনি তাঁহার ভৃত্যদিগের প্রতি আগে  
নানারূপ সদাশয়তা প্রদর্শন করেন, কিন্তু  
বেতন দিবার সময়ে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে  
মানাবিধ কোশলে বঞ্চনা করিতে যত্নপর  
হন। রামেশ্বরের প্রভু পিশাচের নিক-  
টই প্রথম বরসে পাঠ লইয়া থাকিবেন।

মহিলে তাঁহার কথা কহিবার রীতি এমন কদম্ব কেন যে, শুনিলে ইতরলোকেও লজ্জা অনুভব করে। রমেশের প্রভু কাক কি কোকিল, ইহাই সম্বন্ধের বিষয়। তাঁহার চক্ষু কোকিল-চক্ষুর ন্যায়, সকল সময়েই আরক্ত; তাঁহার কণ্ঠধনি কাককণ্ঠনিঃসৃত কঠোরধনি হইতেও অধিকতর অপ্রতিপীড়ক। মাধব বলে যে, তাহার প্রভু এক আশ্চর্য্য বীর। তিনি ঘরের বাতির হইলে সর্বদাই মার্জ্জারভীত ঘৃষিকের ন্যায় ভয়ে জড়সড় থাকেন; কিন্তু যেই অগৃহে প্র-  
ত্যাগত হন, অমনি ইহাকে পদাঘাত করেন, উহাকে কটু কথা বলেন, এবং আর কাহারও কিছু না পারিলেও মাধবকে আর মাধবের কর্তী ঠাকুরাণীকে অবশ্যই কিঞ্চিৎ বচনমুখা উপহার দেন। প্রভু-  
চরিত্রের এইরূপ আলোচনা কোথায় না প্রাপ্ত হয় ?

মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের যত যত বিষয়ে আলাপ হয়, তাহার প্রধান এক ভাগই দৈ-  
দৃশী নিন্দা। দুখানি জিহ্বা আর চারিটি কর্ণ একখানে হইলেই একজন না একজ-  
নের নিন্দাবাদ আরম্ভ হইল। ইহাতে এই বোধ হইতে পারে যে, মনুষ্যকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির পণ্ডিতেরা যেমন দ্বিপাদ, দ্বিভূজ, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন, মনুষ্য জাতিকে নিন্দ্রকসংজ্ঞা দিলেও দ-  
র্শনশাস্ত্রানুসারে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না।

আর একপ্রকারে দেখিতে গেলে

নিন্দা অপরিহার্য্য। তুমি এই সংসারে যে কোন কার্য্যে লিপ্ত হও, তাহাতেই তোমাকে অল্প কি অধিক পরিমাণে নি-  
ন্দ্রক হইতে হইবে। যাঁহার ধর্ম্ম সংস্কা-  
রক, কি কোন বিশেষ সত্যের প্রচারক, তাঁ-  
হার সকলেই নিন্দ্রকের অগ্রগণ্য। সম্প্র-  
দায় বিশেষের নিগ্রহ বিনা সাম্প্রদায়িক  
বিজয়পতাকা কোন দেশে উড্ডীন হয়  
নাই। লোকে লুণ্ঠরের কতই না প্রশংসা  
করে। কিন্তু বিচারতঃ তাঁহার প্রধান  
প্রশংসা এই যে, পোপ এবং পোপের  
শিষ্যবর্গকে নিন্দ্রা করিবার সময়ে তিনি  
একাই একসহস্র জিহ্বা এবং সহস্রাধিক  
ভেরীর কার্য্য করিতেন। ক্যাথলিকগণ  
যেখানে তাঁহার এক গুণ নিন্দ্রা করিতেন,  
তিনি সেখানে অযুতগুণে তাঁহাদিগের  
নিন্দ্রা করিয়া ঋণপরিশোধে যত্ন পাই-  
তেন। এইরূপ ঐতিহাসিক, এইরূপ চ-  
রিতাখ্যায়ক, এইরূপ রাজনীতিবেত্তা এবং  
এইরূপ সংবাদ পত্রাদির সম্পাদক ও সা-  
হিত্য সমালোচক। কেহ লোকান্তরবাসী  
রাজা ও রাজমহিষী এবং মৃত গ্রন্থকার-  
দিগকে মন্ত্রণলে পুনর্জীবিত করিয়া তাঁহা-  
দিগের উপর নিদাকণ কশাঘাত করিতে-  
ছেন;—কেহ জীবিত রাজপুরুষ, জীবিত  
গ্রন্থকার অথবা অন্য কোন শ্রেণির জীবিত  
প্রধান ব্যক্তিদিকে ক্রীড়া পুস্তকের মত নি-  
জ্জীব বিবেচনার যথেষ্ট গালি দিতেছেন।  
অধিক আর কি, কম্পনা মাত্র যাঁহাদিগের  
সম্বল সেই কবিগণও অতি সূক্ষ্ম কৌশলে

লোকের নিন্দা করিয়া জগতে নিন্দার সার্থকতা দেখাইতেছেন । যখন সকলেই এই প্রকার কাহারও না কাহারও নিন্দা করিতে বাধ্য হইতেছেন, বল তবে নিন্দকের আর নিন্দা করিব কেন ?

এই প্রশ্নটি প্রথমে যত সহজ বোধ হয়, বস্তুতঃ তত সহজ নহে । ইহার প্রত্যুত্তরে অনেক কুট কথার আন্দোলন হইতে পারে । আমরা তথাপি সহজপথ অবলম্বন করিতেই চেষ্টা করিব ।

আমাদিগের বিবেচনায় স্মৃতি ও নিন্দা উভয়েরই সীমারেখা সত্য । সত্যকে উন্নয়ন করিয়া স্মৃতি করিবে না, এবং সত্য উন্নয়ন করিয়া কখনও কাহারও নিন্দাও করিবে না । কিন্তু যদিও এক মাত্র সত্যই এই উভয়ের শেষ সীমা, কিন্তু এক মাত্র কর্তব্যবুদ্ধিতেই উভয়ের প্রবর্তনা নহে । মনুষ্য প্রণয়ের অধীন হইয়া প্রিয়জনের স্তুতিবাদ করিতে পারে, ভক্তিরসে বিগলিত হইয়া ভক্তিতাজনের গুণানুবাদ করিতে পারে । তাদৃশ স্থলে সত্যের মর্যাদা রক্ষা হইলেই হইল । আমরা তখন স্মৃতি ও গুণানুবাদের প্রয়োজন ও প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব না । উদ্বেলহৃদয় অন্যদীর হৃদয়ের প্রতি প্রধাবিত হইলে, তাহাতে সংসারের মুখসমষ্টির ভ্রাস হয় না, বরং রুদ্ধি হয় । কিন্তু বিনা প্রয়োজনে ও বিনা বিবেক ও কর্তব্যবুদ্ধির শাসনে মনুষ্য মনুষ্যের নিন্দা করিতে অধিকারী নহে । নিন্দা গরল ;

চিকিৎসক যেমন শুধু ঔষধার্থেই গরল ব্যবহার করিতে পারেন, উহা লইয়া খেলা করিতে পারেন না, বাঁহারা বিশেষ কোন মনুষ্য কি বিশেষ কোন সমাজের উপকার করিতে চাহেন, তাঁহারাও শুদ্ধ সেই এক প্রয়োজনেই নিন্দার ব্যবহার করিতে পারেন, উহা লইয়া খেলা করিতে তাঁহাদিগের অধিকার নাই । তাঁহাদিগের কথা কেবল সত্য হইলেই হইবে না, কিন্তু যে কথা তাঁহারা বলিতেছেন তাহাতে প্রয়োজন এবং ন্যায়পরতার শাসনও আছে কি না, তাহাও প্রমাণ দৃষ্টিতে দর্শন করিতে হইবে । বাহারা নিন্দুক বলিয়া পরিচিত, সাধারণ্যে তাঁহাদিগের যে এত নিন্দা ইহাই তাহার এক প্রধান হেতু । তবে নিন্দারও প্রকার আছে, প্রকৃতি আছে, এবং যেখানে উহার অন্তস্তলে বিবেক নাই, সেখানে অন্য কোন গুঢ় কারণ আছে । কেহ আহুত নিন্দুক, কেহ অনাহুত নিন্দুক, কেহ বা রবাহুত নিন্দুক । নিন্দুককে কি পরিমাণে নিন্দা করিতে হইবে, তাহা অবধারণ করিবার পূর্বে সেই প্রকার, প্রকৃতি ও কারণের প্রতি দৃষ্টি করা আবশ্যিক ।

নিন্দার এক কারণ সহানুভূতির অভাব । বাহার সম্বিত তোমার মতে মিলে না, হৃদয়ে মিলে না, তুমি তাহার নিন্দা কর এবং সেও তোমার নিন্দা করে । তাহার আত্মা তোমার নিকট এক গভীর অন্ধকার-কূপ, তোমার আত্মাও তাহার

নিকট এক গভীর-অন্ধকার-কূপ। দুইয়েই দুইয়ের বহিরাবরণ মাত্র দেখিয়া থাক, এবং শুদ্ধ বহিরাবরণ দেখ বলিয়াই দুইয়ে দুইয়ের সম্বন্ধে একে আর এক অর্থ কর। সাম্প্রদায়িকদিগের পরস্পর নিন্দা এই শ্রেণির, যাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থার পার্থক্য নিতান্ত রূহৎ, তাঁহাদিগের পরস্পর নিন্দাও এই শ্রেণির, এবং রুদ্ধ ও যুবজনে যে পরস্পর নিন্দা হইয়া থাকে তাহাও প্রধানতঃ এই শ্রেণির। রুদ্ধ যুবাব প্রাপ্ত ও প্রাপ্ত হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারেন না—সে কেন হাসে, সে কেন কান্দে, সে কি উৎসাহে উৎসাহিত হয়, কি দুঃখে ভুলিয়া পড়ে, তিনি কোন দিন বুঝিয়া থাকিলেও এখন আর তাহা বুঝেন না। আবার, যুবজনেরা রুদ্ধের শীতসকুচিত ঘনীভূত প্রাণের মর্মস্থান দর্শন করিতে সমর্থ হন না। তাঁহারা এক পা অগ্রসর হইবার পূর্বে কেন শতবার চিন্তা করেন, তাহা তাঁহাদিগের তরল বুদ্ধিতে প্রবেশ করে না। সহানুভূতির অভাবে কিরূপে নিন্দার সৃষ্টি হয়, আমরা তাহার প্রকার মাত্র দেখাইয়া দিলাম। চিন্তাশীল ব্যক্তির ইহা হইতেই বহুবিধ কথার তাৎপর্য্যগ্রহ করিতে পারিবেন। সহানুভূতির অভাবমূলক নিন্দা কথঞ্চিৎ সহনীয়। কারণ ইহার অভ্যস্তরে খলতার ভাগ অভ্যাস। ইহা অনাহুত হইলেও ক্ষমাযোগ্য।

নিন্দার আর এক কারণ শক্তির অভাব অথবা অক্ষমতা। অশক্ত ও অক্ষম

ব্যক্তির আপনা হইতে উচ্চতর ব্যক্তিদিগের নিকটে পৌঁছিতে পারে না,—তাঁহারা চিন্তার যে প্রাণে অবস্থান করেন, কল্পনার সহায়তায় যেখানে উদ্ভটন রহেন, সেখানে উঠিতে সামর্থ্য পায় না এবং সুরতায় তাঁহারা কেন কি করেন, তাহা ইহাদিগের নিকট কার্য ও কার্যের শূন্যকালে দৃঢ়বদ্ধ বলিয়াই প্রতীয়মান হয় না। তাঁহাদিগের অতি সূক্ষ্ম কার্যও ইহাদিগের নিকট সূক্ষ্ম দেখায় না। ইহারা এই নিমিত্তই রূপাপাত্র। পৃথিবীর এক অসাধারণ পুরুষ মরণযুহুর্ভেও এই শ্রেণির নিম্নুক ও অত্যাচারীদিগকে আশীর্বাদ করিতে পারিয়াছিলেন।

আপাততঃ এইরূপ বোধ হইতে পারে যে, যাঁহারা শক্তির অভাব কি হীনতা হেতু নিম্নুক, তাঁহাদিগের দ্বারা সমাজের অনিষ্টসাধন হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা হয় না। স্বাভাবিকী প্রতিভা প্রথমতঃ যত কেন প্রচ্ছন্ন থাকুক না, উহা পাবকতুল্য। তৃণরাশি কখনও উহাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। তৃণ আপনিই দক্ষ হইয়া যায়। শক্তি ও অশক্তিতে, আলোকে ও অন্ধকারে, জানে ও অজ্ঞতায়, এবং পুরুষে ও অপুরুষে যেখানে বিরোধ হইয়াছে, ইতিহাসে সেখানেই এই কথা জ্বলদন্ধরে লিখিত রহিয়াছে।

নিন্দার তৃতীয় কারণ অতৃপ্ত ক্রোধ। ক্রোধ জিহ্বাসার অপক ফল। কাহারও সম্বন্ধে মনে ক্রোধ জন্মিলে স্বভাবতই তা-



হার অনিষ্ট সংসাধনে প্ররুতি জন্মে। যেখানে সে প্ররুতি পরিতৃপ্ত হয়, সেখানকার পরিণাম অনুতাপ অথবা দয়া; যেখানে উহা পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, সেখানকার পরিণাম নিন্দাবাদ। যদি কাহারও আচারে কি ব্যবহারে অথবা কোন কথার আশাদিগের অভিমান আহত হয় এবং সেই আহত অভিমান, আহত সর্পের ন্যায়, তাহাকে ফিরিয়া দংশন করিতে না পারে, তাহা হইলেই আমরা সেই ব্যক্তির নিন্দা করিয়া থাকি। এই প্রবন্ধে নিন্দার যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনেকটাই এই শ্রেণীতে স্থান পাইবে। আর, সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন ব্যক্তির যে হীনাবস্থ ব্যক্তিগণকর্তৃক অনেক সময়ে নিন্দিত হইয়া থাকেন, তাহারও কারণ এই বলিতে হইবে। নীতি-নিপুণ পণ্ডিতেরা এই জন্যই উপদেশ করিয়াছেন যে, কাহারও অভিমানে অকারণে আঘাত করিও না, কাহারও ক্রোধান্বিতেও বিনা প্রয়োজনে মূতাঙ্কুর দিও না। ইহা ন্যায়ের চক্ষে অসহ্য, ইহা দয়ার চক্ষে নিষ্ঠুরের কার্য, ইহা বুদ্ধির চক্ষে অশুভকর। যাহারা আহত হইয়া নিন্দা করে, তাহারাই আহত নিন্দুক।

নিন্দার চতুর্থ কারণ জাতীয় বিবেচ। ইহার অভ্যন্তরে সহানুভূতির অভাব আছে, অজ্ঞতা আছে, এবং তদতিরিক্ত বিবেচ আছে। ইহাও আহত মধ্যেই পরিগণনীয়। এই বিবেচবুদ্ধির বশবর্তী হইয়াই ফ-

রাশি প্রাণীমানের সর্ব্বাঙ্গে কালিয়া দেখেন, এবং ইহারই প্রণোদনায় প্রাণীয়ার পরমধার্মিক ব্যক্তিও ফরাশির নিন্দাবাদে জিহ্বাকে কলুষিত করেন। ইহার আরও অনেক দৃষ্টান্ত অকুলিনির্দেশ সহকারে প্রদর্শন করিতে পারি। কিন্তু চক্ষুস্থানের জন্য তাহা অনাবশ্যক।

নিন্দার পঞ্চম ও শেষ কারণ পরজীকাতরতা। ইহাকে স্বজীকাতরতা বলিলেও ভাষার গুরুতর দোষ ঘটে না। কেননা ইহা স্বজাতি ও পরজাতির মধ্যে স্বজাতীয় ও মিলিত প্রতীবেশীকেই বিশেষতঃ লক্ষ্য করে, এবং বলিব কি—ইহা দূরসম্পর্কিত অপেক্ষা নিকট সম্পর্কিতকে, যথার্থ পর অপেক্ষা স্বরূপ পর, আপনায় জনকেই বরং অধিকতর স্পর্শ করে। নিন্দার অন্য অন্য কারণ সম্বন্ধে যে কোন কথাই কেন বল না, বোধ হয় যুক্তির কোনরূপ আকৃষ্টনেই পরজীকাতরতামূলক জঘন্য নিন্দাবাদের পক্ষ সমর্থন করা সম্ভব হইবে না। যাহারা পরজীকাতরতার বিষমজ্বালার দগ্ধ হইয়া স্বদেশীয় কি স্বজাতীয় উন্নত ব্যক্তিদিগের অনর্থক নিন্দা করে, যেখানে অমৃতের প্রাণী সেখানে গরল ঢালিয়া দেয়, সম্মুখে স্তুতিবাদ করিয়া পরোক্ষে আঘাত করিতে থাকে, তাহারাই যেমন খল-স্বভাব তেমনই ক্ষুদ্রপ্রাণ। যদি নিন্দুক শব্দের কিছুমাত্র অর্থ থাকে, তবে ইহারাই সেই নিন্দুক। ইহার জ্যোৎস্না দেখিলেই চক্ষু মুদ্রিয়া রহে, এবং সমস্ত দিনও যদি ইহার প্রাণ

কুসুমকাননে পরিচারণ করে, তথাপি ই-  
ছারা করে কতিপয় কটকমাত্র লইয়াই গৃহে  
প্রত্যাগত হয়। ইছারাই প্রকৃত রবাহৃত নি-  
ন্দুক। অভ্যদয়ই ইছাদিগের চক্ষে অপরাধ  
এবং উন্নতিই ইছাদিগের চক্ষে পাপ।—  
ইছারা অভিমানশূন্য,—কারণ, যেখানে  
অভিমান আছে, সেখানে বিনা আঘাতে  
পরকীয় সমৃদ্ধিতে কাতরতা হয় না। ইছারা  
কাপুকব;—কারণ যেখানে পৌকব তেজ-  
স্বিতার কণিকা মাত্রও বিদ্যমান থাকে,

সেখানে অন্যদীয় শক্তি, সামর্থ্য ও সম্পদ-  
রাশিতে আনন্দ বই কখনও ঈর্ষা ও অন্ত-  
র্দাহ জন্মে না।

মম্বাসমাজে অদ্যাপি নিন্দার কর্তব্য-  
বুদ্ধি ও ন্যায়পরতার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত  
হয় নাই। বিবেকের বশবর্তী হইয়াই মম্বাস  
মম্বোর নিন্দা করে না। যে দিন তাহা হ-  
ইবে, সে দিন এই পৃথিবীতেই স্বর্গের দুর-  
ন্তত দুস্মৃতিবাদ প্রত হইবে। সে দিন মম্বাস  
সমাজের অর্ধেক দুঃখতার কমিয়া যাইবে।

## এই কি সেই অযোধ্যা ?

চিত্র আশা ছিল মনে—

দেখিতে অযোধ্যা, যার কীর্তির পতাকা  
উড়িয়াছে সূর্য্যবংশ-প্রশংসা-পবনে ;—  
ভারতদর্পণে আজো রহিয়াছে আঁকা।  
পুরাত্নে যার নাম করেছি অবগ;—  
কত্রিয়-গৌরবে তরা শোভার বাজার—

এই কি সে রাজপুর ?

বিক্রমে বিশাল, শূর—

—সূর্য্যবংশ অবতংশ ইক্ষ্বাকু রাজার ?

এই কি সে প্রকৃতির বিলাস ভবন ?

ছিল একদিন হিন্দু-মুখের সদন ?

২

এই কি সে জ্যোতস্বতী

সরসু,—শোভিত যার বিমল সলিলে

পুরাঙ্গনা-মুখ-পদ্ম প্রকাশিত-জ্যোতিঃ

ঈষৎ হুলিয়ে মুখে প্রদোষ অনিলে ?

এই কি পবিত্রা নদী অযোধ্যার মাঝে ;

সুরতরঙ্গিনী যথা স্বর্গে মন্দাকিনী ?

কল কল রব উঠে

হৃদয়ে তরঙ্গ ছুটে

রজতের ধারা যেন স্নান্য বিরাজে।

সাগর উদ্দেশে দ্রুত ধায় প্রবাহিনী।

কলস্বরে নিরন্তর অচল-মন্দিনী !

৩

এতদিন যার মূলে—

করিনাম সলিল সিঞ্জন প্রাণপণে,

সেই আশা-লতা যদি শোভিল মুকুলে,

অমনি কি ছোল শেষ নিশার স্বপনে ?

হায় ! একি ইতিহাসে বর্ণনাই সার ?

কবির কল্পনা, সে কি আকাশ কুসুম,

সত্যের সুবেশ দিয়া

মিথ্যা রাখে সাজাইয়া  
লুঠে নয় তাঁবুকের হৃদয় তাণ্ডার ।  
উথলয় ভাব কূপ মিছামিছামুখে ;  
অবশেষে, মানুষে কি ফেলায় দিগ্‌জন্মে?

৪

এই কি অযোধ্যাপুরী—  
বহে সমীরণ যার বশের সৌরভ  
কত দেশে কতখানে সাগর উত্তরি  
জাগাইয়া ভারতের নিজিত গৌরব ?  
এই কি সে অমুপম স্রুথের আগার ?  
ভারতে অলকা সম এই সে নগরী ?  
আমি যাঁহা শুনে কানে  
আইলাম প্রাণপণে  
কই তার চিহ্ন কিছু নাহি দেখি আর ।  
কে নাশিল শোভা তব ভারতসুন্দরি !  
কত্ৰিয় কুলের গর্ভ লইলেক হরি ?

৫

কোথা বীররাজ সব  
সমরে অটল, স্বর্গবংশের ভূষণ  
মাক্‌তাদি হৃপচয় কত্ৰিয় গৌরব ?  
রাবণ-বিজেতা রাম কোথায় এখন ?  
দাম্পত্য-প্রণয়-স্রুথে হইয়া নিরাশ  
চিরদিন শোকানলে হৃদয় দহিয়া  
যেই রঘুকুল-কেতু  
লোকের সম্ভোষ হেতু  
প্রেরসী মহিষী-ধনে দিলা বনবাস—  
অকাতরে সীতাশোক অন্তরে সহিয়া ;  
প্রকৃতিরঞ্জন-ব্রতে জীবন অপিয়া ?

৬

অযোধ্যার অলঙ্কার—

কোথা দাশরথি এবে দয়ার সাগর ?  
এর প্রতি আজ তব ককণা সজ্জার  
হয় নাকি, রঘুকুল-গৌরব-আকর ?  
পরের দেখিয়া স্রুথ আনন্দে ভাসিতে—  
করিয়াছ প্রাণপণে প্রজার মন্তন ।

দেখিলে অন্যের দুখ  
ফাটিয়া যাইত বুক,  
আজ কেন চিত্ত তব না হয় চঞ্চল ?  
ভাসে তব রাজপুরী দুর্দশার জ্বোতে ।  
কেমনে রয়েছ রাম, খৈর্য্য ধরি চিতে ?

৭

হায় ! কেন দেখিলাম—  
তোমাদের নগরি ! হেরি বিদরে হৃদয় ।  
নয়ন ভাসিয়া ধারা বহে অবিরাম ;  
পূর্ব্বের সৌভাগ্য মনে হইলে উদয় ।  
আহা ! আর্ধ্যভূমি মাঝে শোভার সদন,  
আনন্দের সরোবর স্রুথের আগার ;  
পবিত্র পুণ্যের ভূমি ;  
বীরপ্রসবিনী ভূমি ।  
হইত যশের গান ভারতে তোমার !  
ছিদে তুমি আর্ধ্যবংশ উজ্জলি তখন ।

তোমার সে ছবি ছায় ! কোথায় এখন ?

৮

কোথা সে সুন্দর বেশ ?  
সুদৃঢ় সুরমা স্বর্গ্য পরশি গগন  
বিরাজিত দেহ তব সাজায়ে অশেষ ।  
ছিলে তুমি সুবিমল স্রুথের ভবন !  
পরিপাটি রাজবাটী ; সজ্জিত তোরণ  
নিরন্তর স্রুশোভিত কুমুম-শয্যায় ;  
রমণীয় উপবনে

বিহঙ্গ বিহঙ্গী মনে

মুখের করিত গান বসিয়া বাসায়।

অমৃতের বরিষণে জুড়াত প্রবণ।

সুখের সে দিন তব গিয়াছে এখন !

৯

কিছুই নাহিক আর !

আছে মাত্র চিহ্ন তার বাড়াইতে দুখ,

ভারতের ডাগো ঘোর যাতনা অপার।

চিন্দুকুলে প্রতিকুল বিধাতা বিমুখ।

অটল-অচল-সম রম্য হুঁয়ামালা,

ভাঙ্গিয়া পড়েছে যেন প্রসরের ঝড়ে !

নিবিড়কটকী লতা ;

পুরিয়া রয়েছে তথা।

ভূজঙ্গের বাসা আজি তাহার ভিতরে !

ধিক্ বিধি বুঝিতে না পারি তব লীলা।

কাহারে ইন্দ্র পদ, কার হাতে খোলা !

১০

কোথা সে অমরাবতী—

—অযোধ্যা নগরী মর্ত্যে ; এবে ভগ্নপ্রায়।

সিংহপুরে শৃগালের রাজত্ব সম্প্রতি ?

গগন পরশি মৌঘ শোভা নাহি পায়,

প্রকুল কমল তুল্য গবাক্ষের ঘারে

শোভেনা সুন্দরী কুল, নয়ন উজ্জ্বল,

মদন-ছিন্নোলে দুলি

কটাক্ষে সকল তুলি

নলিনীর বনমাঝে পুলক অন্তরে—

শোভিত যেন্নপে আছা ! নৃপতি চঞ্চল,

বসেনা সেন্নপে আর পুরনারীদল !

১১

একদিন এইস্থানে—

—এই রাজপুরে—এই উন্নত প্রাসাদে—

রঘুদল নরপতি সুপ্রশস্ত মনে—

সুবিধি স্থাপন হেতু বাদ অনুবাদে

রত থাকিতেন নিজ পারিষদ লয়ে।

এখন শার্দূল বুক ভীষণ মুরতি—

সহচরী সহ বাস—

করিতেছে বারমাস—

কৃতৃহলে লয়ে নিজ সন্তান সন্ততি।

বিচরণ করে সদা নিঃশঙ্ক হইয়ে ॥

১২

এই বিশ্বাম ভবনে—

রাজকার্য্য অবসানে লভি অবসর,

আসিতেন নরনাথ আরাম কারণে—

অকৃত্রিম প্রণয়ের বাড়াতে আদর—

বিরলে মহিমীসহ আনন্দ অন্তরে।

হায় হায় ! কব কায দুঃখের কাহিনী।

এহেন সুখের স্থানে,

এবে বন্য জন্তুগণে

পরস্পর নিরন্তর কোলাহল করে।

বীণার বিনোদতান আর নাহি শুনি।

শিবাসব করে রব, দিবস যামিনী !

১৩

ভারত-উজ্জ্বলা এই

অযোধ্যা নগরী আছা ছিল একদিন !

জ্যোতিঃ হীন এবে, হায় ! কিছুমাত্র নেই

পড়িয়া পরের করে হয়েছে জীহীন।

হায় রে দুঃখের ভার সহনীর নয়

কেমনে বহিবে তবে ; ধিক্‌রে বিধিরে।

কিবলি ব'হায় হায় !

দেখে বুক ফেটে যায়।

বামরে খেলেছে স্মৃতি ভানুর মন্দিরে ? \*  
 ধিক্ হে সহস্রকর রুখা তেজোময়,  
 তব কুলে একলক্স একি প্রাণে সয় ?

১৪

এই কি অযোধ্যা সেই ?  
 তবে কেন চিন্তে ঘোর যাতনা বাড়ায় ?  
 নাশিতে সস্তাপ ছেথা কিছুই কি নেই ?  
 সকলি কি কাল সহ হয়েছে বিলয় ?  
 ধিক্ তোর ভারত বাসি, ধিক্ তোমা সবে ।  
 হুরাওয়া স্ববন আসি তোমা সবাকার  
 অতুল বিভব কাড়ি  
 লইল হৃদয় করি ;

\* সূর্য্যবংশীয় হৃপতিগণের প্রতিষ্ঠিত  
 সূর্য্য দেবের মন্দির একগুণে নিবিড় অরণ্যে  
 পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয় ।

রাজত্ব তেজিয়া শেষে দাসত্ব স্বীকার ?  
 আর কত কাল সবে অপমান সবে ?  
 একলক্স ভারতের কতদিন রবে ?

১৫

হে অযোধ্যা একা নয় ।  
 তোমার হৃদয় ; ঘোর দুঃখের অনলে  
 জ্বলিয়াছে আর্ধ্যভূমি স্মৃতির আলয় ।  
 ভাসিছে ভারত লক্ষ্মী নয়নের জলে !  
 ঘোরতর নাগ পাশে স্রুত্ব বন্ধনে ।  
 জননী স্বৈহময় সন্তান সকল  
 পড়িয়া মায়ের বুকে  
 কাঁদিতোছে অধোমুখে,  
 অন্নভাবে শীর্ণতম গায় নাহি বল ।  
 ঈশ্বরের জীব তাই বাঁচাতে জীবনে  
 দাসত্বে উদর পালে অন্যের চরণে ! জীব-

## প্রকৃতি ও পশু পক্ষীর সংস্কার ।

মনুষ্য প্রবল বুদ্ধিবলে, বহুযত্নে এবং  
 অতিপরিশ্রমে বিজ্ঞান এবং গণিত মন্থন  
 করিয়া যে সমস্ত সত্য উদ্ধার করিয়াছে,  
 পশুপক্ষীর সংস্কারবলে দৈনিক কার্য-  
 ব্যবহারে তৎসমুদয়ে কিরূপ আশ্চর্য্য অ-  
 ভিজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা চিন্তা  
 করিলে বিস্ময়রসে আগ্রস্ত হইতে হয় ।  
 পশুপক্ষীর গ্যালিলিওর অগাধসত্ত্ব মেধাও  
 বাহা ধারণা করিতে সমর্থ হয় নাই, মক্ষি-  
 কারা প্রতিদিন সেই বিজ্ঞানস্বত্ব কার্য্যে প-  
 রিণত করে, এবং মধুমক্ষিকারা চক্র নির্মাণে ।

যে অপূর্ব্ব কোশল প্রকাশ করে, গণিতগুরু  
 নিউটন সমস্ত জীবনের অশেষ পরিশ্রমেও  
 তদ্বিময়ক জ্ঞান সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পা-  
 রেন নাই । পশুপক্ষীর সংস্কারগত কা-  
 র্য্যপ্রণালীতে মনুষ্যের আয়াসলব্ধ বিজ্ঞান  
 এবং গণিত সম্বন্ধীয় জ্ঞান কতদূর লক্ষিত  
 হয়, এবং তাহাদের শরীরসংস্থানে প্রকৃতির  
 কিরূপ আশ্চর্য্য কোশল ও নৈপুণ্য দৃষ্ট হয়,  
 তাহা জানিবার নিমিত্ত স্বভাবতঃই কোঁতু-  
 হল জন্মে । সেই কোঁতুহল পারিতোষনার্থেই  
 আমরা এই প্রবন্ধে পশুপক্ষীর শরীর সং-

স্থানের এবং তাহাদের সংস্কারগত কার্য-  
প্রণালীর কএকটি উদাহরণ প্রদান করিব।

নির্দিষ্ট স্থান মধ্যে যদি সমান এবং একবিধ কুঠরী সমূহ নির্মাণ করিতে হয়, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে স্থান রাখা নষ্ট না করিয়া ত্রিবিধ আকারের কুঠরী হইতে পারে। প্রথম সমবাহু ত্রিভুজ, দ্বিতীয় সমবাহু চতুর্ভুজ এবং তৃতীয় সমবাহু ষড়্ভুজ। অন্যবিধ আকারের কুঠরী নির্মাণ করিলে যে মধ্যে মধ্যে স্থান রাখা নষ্ট হয় তাহা গণিত সাহায্যে অন্যায়সে প্রমাণ করা যায়। আবার এই ত্রিবিধ আকারের মধ্যে সমবাহু ষড়্ভুজই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। কারণ ইহার কোণ সমূহ স্থূল হওয়াতে কোন গোল পদার্থ রাখিতে হইলে কোণে অতি অল্প স্থানই রাখা নষ্ট হয়। ষড়্ভুজের আরও একটি সুবিধা আছে। ইহাতে অন্তর্দেশ কিংবা বহির্দেশ হইতে কোন বল প্রযুক্ত হইলে অনিষ্ট হইবার অতি অল্প সম্ভাবনা। কুঠরী গুলি গোলাকার হইলে এই অনিষ্টের আরও অল্পতর আশঙ্কা হয় মতা; কিন্তু তাহাতে মধ্যে মধ্যে রাখা স্থান থাকে। মক্ষিকারা মধুচক্র নির্মাণ করিতে কুঠরী গুলি এইরূপ ষড়্ভুজই করিয়া থাকে। ইহাতে স্থান-লাভবণ হয় এবং নির্মাণসামগ্রীও অল্প লাগে। অন্য কোন আকারের কুঠরী করিলে স্থান এবং নির্মাণসামগ্রী উভয়ই অধিকতর লাগিত। কুঠরী সমূহের প্রাচীর নির্মাণ বিষয়েই যে

এইরূপ কৌশল অবলম্বিত হয় তাহা নহে, কুঠরীর ছাদ ও ভিত্তি আশ্চর্য্যতর কৌশলে নির্মিত হয়। গণিতবেত্তারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অল্পতম স্থানে দৃঢ়তম সংস্থান করিতে হইলে ছাদ অথবা ভিত্তি এক বিম্বুতে সংলগ্ন তিনটি বর্গক্ষেত্র দ্বারা নির্মিত হওয়া আবশ্যক। বীজগণিতের উচ্চতম শাখা অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ক্ষেত্র তিনটি যদি একটি নির্দিষ্ট কোণে \* পরস্পর সংলগ্ন হয় তাহা হইলে অল্পতম স্থান ও অল্পতম পরিভ্রম লাগে। অন্য কোন কোণে সংলগ্ন হইলে অধিকতর নির্মাণ সামগ্রী ও পরিভ্রম আবশ্যক করিবে। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে যে মধুমক্ষিকারা কুঠরী সমূহের ছাদ কিংবা ভিত্তি তিনটি বর্গক্ষেত্র দ্বারা নির্মাণ করে এবং ক্ষেত্র তিনটিও এই নির্দিষ্ট কোণেই পরস্পর সংলগ্ন হয়। গণিত শাস্ত্রের এই সমুদয় তত্ত্ব অগাধ-ধী-সম্পন্ন নিউটনের আশ্চর্য্যতম আবিষ্কারের ফল স্বরূপ; তিনিও জানিতেন না: পরে তাঁহার শিষ্যরাই আবিষ্কার করিয়াছেন। ক্ষুদ্র কীটেরাও যে এসমুদয় জানে ইহা কি কেহ স্বপ্নেও ভাবিয়াছিল?

যনে কর কোন পাত্র হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া হইল। বায়ু নিষ্কাশনের পূর্বে বাহিরে এবং অভ্যন্তরে

\* স্থূল কোণ ১১০° ডিগ্রি এবং স্থূল কোণ ৭০ ডিগ্রি।

বায়ু থাকাবশতঃ পাত্রেব বহির্গাতে বায়ুর যেরূপ চাপ পতিত হয় অন্তর্গাতেও সেইরূপ চাপ পড়ে \* । নিষ্কাশনের পরে বহির্গাতে বায়ুর চাপ পতিত হয় কিন্তু ঐ চাপের প্রতিকূলে অভ্যন্তরে আর কোন চাপ থাকে না । এইজন্য পাত্রেব বহির্দেহে সবলে নিষ্পেষিত হয় । কঠিন পাত্র অভ্যন্তরস্থূল না হইলে তাড়িয়া যায় এবং কোমল পাত্র কুণ্ডিত হইয়া যায় । মধুমক্ষিকারা ছোট ছোট ফুলহইতে মধু আহরণ করিতে হইলে ফুলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না ; মধুভাণ্ডের মুখে

\* এই ভুক্তই আমরা বায়ুর চাপ বুঝিতে পারি না এবং জলে ডুব দিলেও জলের চাপ বুঝি না । চতুর্দিকে এবং উপরে ও নীচে বায়ু কিংবা জল থাকাতে সমুদয় দিক হইতেই চাপ লাগে । জ্বব পদার্থের ( তরল এবং বায়ব ) এই একটি গুণ যে উহা সকল দিকেই সমান ভাবে চাপে । উপর হইতেও যজ্রপ, নিম্ন হইতেও তজ্রপ এবং চতুর্দিক হইতেও তজ্রপ, পুতরাং পরস্পর বিরুদ্ধ চাপ থাকাতে একটি অপরটির প্রতিকূলাচরণ করে এবং আমরা কোন চাপই বুঝিতে পারি না । পক্ষান্তরে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের মুখে হস্ত স্থাপন করিয়া যদি হস্তের নীচের বায়ু নিষ্কাশিত করা যায়, তাহা হইলে বায়ুর উপরের চাপ অপ্ৰতিহত থাকে ( কারণ হস্তের নীচে আর বায়ু নাই ) এবং হস্তে বায়ুর ভার অনুভূত হয় ।

মস্তক ও শরীর প্রদীক্ষিত করিয়া বায়ু চুমিয়া লয় । ইহাতে ফুলের কোমল বহির্দেহ কুণ্ডিত হয় এবং মধু ভাণ্ডাদিগের মুখের সন্নিধানে উপস্থিত হয় ।

বায়ুর এই চাপ প্রতি বর্গ বুলে প্রায় সাত সের । অতএব যদি দুই হস্ত একত্র করিয়া হস্তমধ্যে বায়ু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করা যায়, তাহা হইলে হস্তদ্বয় ঐ চাপের দ্বিগুণ বলে পরস্পর সংলগ্ন থাকিবে ।

কারণ, হস্তের উভয় পৃষ্ঠেই ঐ চাপ পতিত হয় । আবার যদি হস্ত প্রাচীরে স্থাপন করিয়া হস্তপ্রাচীরমধ্য বায়ু সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে হস্ত প্রতি বুলে সাত সের পরিমাণে অর্থাৎ দুই মণের অধিক চাপে প্রাচীর সংলগ্ন হইয়া থাকিবে । মক্ষিকা, অক্ষপদ প্রভৃতি কীটসমূহ প্রাচীর এবং ছাদ বাহিয়া সজ্জন্দে যাতায়াত করে ; ছাদে তাহাদের মস্তক ও শরীর নীচে স্থলিয়া থাকে । ব্যবচ্ছেদবিদ্যা বিশারদ হোম সাহের প্রমাণ করিয়াছেন যে, কীটসমূহ বায়ু নিষ্কাশন দ্বারাই এরূপ অনায়াসে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয় । অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারা দেখা গিয়াছে যে, ঐ সমস্ত কীটের পদ ছংসাদির মাংস চর্মারত । ঐ চর্ম আকুণ্ডিত করিয়া তাহারা বায়ু টানিয়া লয় । মনে কর একটি মক্ষিকা ছাদে আছে । একগণে তাহার পদ ও ছাদের মধ্যে যে বায়ু ছিল তাহা টানিয়া লওয়াতে, উপর হইতে বায়ুর চাপ থাকিল

না, কিন্তু নিম্ন হইতে চাপ থাকিল; সুতরাং উহা না পড়িয়া ছাদ দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে সক্ষম হয়। টিকটিকী, তৈলপোকা প্রভৃতিও এই কোণসেই গমনাগমন করে এবং সিঙ্কুঘোটকও এই কোণসেই তুষারপর্কতাপরি শীর্ষভাবে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়।

শকটের কোন চক্রের পরিমিকার্ঠে একটি লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিলে শকট যদি চালিত হয় তাহা হইলে ঐ লৌহশলাকাটি বায়ুতে যে পথনির্দেশ করে, গণিতবেত্তারা উহাকে (Cycloid) চক্রকম্প পথনামে অভিহিত করিয়াছেন। এই চক্রকম্প বক্র রেখার একটি গুণ এই যে, যদি কোন বস্তু, স্বকীয় ভারবলে এবং অন্য একটি শক্তি দ্বারা চালিত হইয়া, একস্থান হইতে ঠিক তন্নিম্ন স্থান বাতীত অন্য কোন স্থানে না-মিতে চায়, তাহা হইলে এই চক্রকম্প পথে নামিলেই অপ্ততম সময় লাগিবে। সরল রেখায় কিংবা চক্রকম্প রেখা হইতে কম বা অধিক বক্র অন্য কোন পথে নামিলে অধিকতর সময় আবশ্যক করে। পর্যাবেক্ষণ দ্বারা পক্ষিগণের গতির দ্বি-নির্দেশ করা সম্ভব নহে, কিন্তু যে সমস্ত পক্ষী পর্কতাপরি কুলায় নিৰ্মাণ করে বলিয়া প্রায়শঃই উচ্চতর বা নিম্নতর পর্কতে উঠে কিংবা নামে, তাহাদিগের গতির সহিত এই চক্রকম্প রেখার অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছে।

গোলাকার পদার্থের বিস্তৃতি সর্বাপেক্ষা অপ্প অর্থাৎ নিৰ্মাণ সামগ্রী সমান

হইলে গোলাকার পদার্থ যত অপ্প স্থান ব্যাপিয়া থাকে, অন্যবিধ কোন আকারের হইলে তদপেক্ষা অধিকতর স্থানের আবশ্যক হয়। কিন্তু কোন দ্রব (তরল কিংবা বায়ব) পদার্থের মধ্যে অতি সহজে যাতায়াত করিতে অতি ক্ষম্য তারই সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। চতুর্পাশ্ৰু দ্রব পদার্থ ক্ষম্যতম বস্তুর অপ্ততম বাধা জন্মায়। আবার যদি এরূপ জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কোন বস্তু এক হস্ত দীর্ঘ হইলে এবং সুলতম স্থানে এক বিতপ্তি প্রস্থ হইলে দ্রব পদার্থের মধ্যে অতি সহজে যাতায়াত করিবার নিমিত্ত উহার কিরূপ আকার হওয়া উচিত? তাহা হইলে দেখা যাইবে যে গণিতবেত্তারা যাহাকে ‘অপ্ততম প্রতিরোধজনক আদ্রব’ (Solid of least Resistance) নামে অভিহিত করিয়াছেন উহার সেইরূপ আকারই হওয়া আবশ্যক। বীজগণিতের উচ্চতম শাখার সাহায্যে অতি দ্রুতই যুক্তি পরস্পরা অবলম্বন করিয়া এই আকার নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার সহিত মৎস্যের মস্তকের অতিশয় সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

নিউটন প্রমাণ করিয়াছেন যে, খেত আলোক নানা বর্ণের কিরণ যোগে উৎপন্ন হয়। ভিন্ন ভিন্ন আলোককিরণ স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া গমন করিতে ভিন্ন ভিন্ন রেখায় প্রতিভ্রম হয়; তজ্জন্য প্রতিভ্রম কিরণমালার গঠিত বিস্তৃত অত্যন্ত অপ্পষ্ট হইয়া থাকে। পুরাতন দূরবীক্ষণদ্বারা পদার্থের



যে বিষয় দেখা যাইত তাহা এইরূপ অসম প্রতিভগ্ন কিরণ মালার গঠিত হইত সুতরাং অভ্যন্ত অস্পষ্ট দেখা যাইত। এই কারণে পূর্বে দূরবীক্ষণ অসম্পূর্ণ বস্তু ছিল। পঞ্চাশৎবর্ষ পরে ডোলগু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির কএক খণ্ড কাচ একত্রিত করিয়া এই দোষের কিঞ্চিৎ লাঘব করেন। ইহার ত্রিশৎ বৎসর পরে ব্লেয়ার দেখাইয়াছেন যে, কএকখণ্ড কাচ একত্রিত না করিয়া কএকটি তরল পদার্থ একত্রিত করিলে এই দোষ প্রায় নিঃশেষিত হয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, চক্ষুঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তাহাতেও এইরূপ বিভিন্ন প্রকারের তরল পদার্থ দৃষ্ট হয়। যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক কুট পরীক্ষানিচয়ে যে নিয়ম অতি অল্প দিন মাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, চক্ষুঃগত তরল পদার্থ গুলি স্বভাবতঃই সেই নিয়মে কার্য করে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ গোলক অণুবীক্ষণের কার্য সম্পাদন করে। পক্ষিগণ বৃক্ষাদির শাখা প্রশাখার মধ্য দিয়া সর্বদা যাতায়াত করে, এইজন্য উহাদিগের চক্ষুঃ শরীর হইতে বাহির না হইয়া শরীরের সমান থাকে নিত্য আবশ্যক। অন্যথা শাখা প্রশাখার লাগিয়া চক্ষুঃ নষ্ট হইয়া যাতায়াত আশঙ্কা থাকে। আবার উহার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট সমূহও শীকার করিয়া আহার করে। অতএব তাহাদের চক্ষুঃ সময়ে সময়ে গোলাকার হইয়া অণুবীক্ষণের কার্য করিতে পারে, এমত হওয়াও আব-

শ্যক। ঐ গোলাকার করিতে চক্ষুঃ শরীর হইতে বাহির হইয়া পড়ে। এই উভয় কার্যেরই সুবিধার জন্য পক্ষিগণের চক্ষুর পাখি কএকটি পেশী আছে; ঐ পেশীগুলি আকৃষ্ট বা বিক্ষারিত করিয়া পক্ষিগণ আবশ্যক মত চক্ষুঃ সমান বা গোলাকার করিয়া থাকে।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে পিপীলিকার শ্রমশীলতা এবং কৌশল মধুমক্ষিকার অপেক্ষাও বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়। উহাদিগের বাসস্থান একটি ক্ষুদ্র নগর। তন্মধ্যে জেলীবদ্ধ মৌধরাজি এবং গমনাগমনের সৌকার্যার্থ স্বন্দর প্রশস্ত পথ ও সেতুসমূহ রূপে অপূর্ব কৌশলে নির্মিত হয় যে, তাহাতে পিপীলিকাগণের স্থপতি-বিদ্যার গুঢ় তত্ত্বসমূহে আশ্চর্য্য অভিজ্ঞান লক্ষিত হয়। মধু উহাদিগের প্রধান ভক্ষ্য। উহা প্রতিদিন আবশ্যক মত সংগৃহীত হয়। অধুনা স্থিতিরূপ হইয়াছে যে, উহারা শস্য আহার করে না; মধু এবং মাংসই আহার করিয়া থাকে। উহাদিগের প্রতিবেশী একরূপ কীট আছে, তাহাদিগের নিকট হইতেই মধু আহরিত হয়। কখনও বা এই কীটগণকে নগরের মধ্যে লইয়া আসে এবং মনুষ্য বৈরূপে গাভী প্রভৃতি পালন করিয়া তাহাদিগের দুগ্ধ গ্রহণ করে, উহারাও সেইরূপ উক্ত কীটগণকে পালন করিয়া তাহাদিগের নিকট মধু গ্রহণ করে। এমন কি কখন কখন এই কীটের ডিম্বও লইয়া আইসে। তৎপরে

যত্নে ডিম ফুটাইয়া যতদিন পর্য্যন্ত মধুদা-  
নোপযোগী না হয়, ততদিন লালন পালন  
করিয়া থাকে। আর একটি আশ্চর্যের  
বিষয় এই যে, পিপীলিকারা যত শীত  
সহ্য করিতে পারে, এই কীটেরাও তত  
শীত সহ্য করিতে পারে। ইহারা তত  
শীত সহ্য করিতে না পারিয়া ঘরিয়া গেলে  
পিপীলিকারাও আহার্যভাবে ঘরিয়া যা-  
ইত। আবার শীতাদিকা প্রযুক্ত পিপী-  
লিকাগণ যখন জড়বৎ পড়িয়া থাকে  
কীটেরাও তখন তদবস্থ হয়।

পিপীলিকাদিগের নগরের নাম ব-  
ল্মীক। মহান্ পদার্থের সহিত ক্ষুদ্র পদ-  
দার্থের তুলনা করিলে ইহাকে পিপীলিকা-  
পৰ্ব্বত বলা যাইতে পারে। এই বল্মীকের  
মধ্যেই প্রাসাদ, ভাণ্ডার, গৃহ, শয়নাগার,  
পথ, সেতু প্রভৃতি নির্মিত হয়। মলুএট  
সাহেব বল্মীকের যে রূতান্ত দিয়াছেন,  
তাহা অতীব বিস্ময়কর। অত্রাণ্য পর্য্য-  
টকেরাও তজ্জপ বিবরণ প্রদান না করিলে  
উহা অতুক্তি দোষে দূষিত বলিয়া বিবে-  
চিত হইতে পারিত। তিনি যে বল্মীক  
দেখিয়াছিলেন, তাহা ১২।১৪ হস্ত উচ্চ,  
২০।২৫ হস্ত দীর্ঘ ও তদনুরূপ প্রশস্ত এবং  
আকারে মন্দিরের ন্যায়। আমরা যে  
সমুদ্র পিপীলিকা দেখি তাহাদিগের ন্যায়  
উহারা নিরীহ নহে। বল্মীকের মিকটস্থ  
হইলে সকলে মিলিয়া আক্রমণ করিয়া  
অনধিকারগামীকে খাইয়া ফেলে। ব-  
ল্মীক নষ্ট করিতে হইলে চতুর্দিকে অগ্নি

প্রজ্জ্বলিত করিয়া বল্মীকোপরি কামান  
দ্বারা গোলাবর্ষণ করিতে হয়। পিপী-  
লিকারা বাহির হইয়া অগ্নিতে পুড়িয়া মরে।  
দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকাতেই এই  
বল্মীক দৃষ্ট হইয়াছে।

বীবরেরা আবাসভূমি নির্মাণে কিরূপ  
নৈপুণ্য প্রকাশ করে তাহা চাকপাঠ প্রথম  
ভাগে অনেকে পাঠ করিয়াছেন। বাবুই  
প্রভৃতি পক্ষীর কুলার নির্মাণে কিরূপ  
কৌশল প্রদর্শন করে, তাহাও প্রায় সকলেই  
অবগত আছেন। পশুপক্ষীর সংস্কারগত  
নৈপুণ্যের বিষয় আর অধিক না বলিয়া তা-  
হাদের শরীর সংস্থানের উপযোগিতা বি-  
ষয়ে আমরা শুটিকত কথা বলিয়া প্রস্তাবের  
উপসংহার করিব। উষ্ট্রেরা মকদনেশের  
নমনীয় ভূমিতে সচ্ছন্দে যাতায়াত করিতে  
পারিবে বলিয়া তাহাদের ক্ষুর অত্যন্ত প্রশস্ত।  
অপ্রশস্ত হইলে ভারবশতঃ ক্ষুর নমনীয়  
ভূমিতে বলিয়া গিয়া যাতায়াতের অত্যন্ত  
অসুবিধা ঘটাইত। আবার সুদীর্ঘপথ অ-  
তিবাহনেও অধিক ক্লান্তি না হয়, এই জন্য  
উহাদিগের পদের অস্থি ও বন্ধনী এবং ক্ষু-  
রের মধ্যে কিঞ্চিৎ ব্যবধান আছে। এই  
ব্যবহিত স্থান অতি কোমল ও স্থিতিস্থা-  
পক পদার্থে পূর্ণ। পদনিক্ষেপ ও উৎ-  
ক্ষেপে এই কোমল পদার্থ স্বীয় আকার  
পরিবর্তন করিয়া থাকে। এই জন্য উ-  
ষ্ট্রের শরীর অত্যন্ত ভারী হইলেও উহারা  
যুদ্ধকের ন্যায় কোমল গমনে সক্ষম। অ-  
শ্বের পদেও অতি নুন্নর কৌশল আছে।

ইহাদের পদ শরীরের নিম্নে শীর্ষভাবে স্থ-  
দৃঢ় স্তম্ভের ন্যায় অবস্থাপিত হইলে প্রতি-  
পদে শরীর বিকম্পিত হইত । তাহা না  
হইয়া ইহাদিগের পদ বক্রভাবে নাস্ত এবং  
নিম্নদেশে স্থিতিস্থাপক বন্ধনী মালায়  
আবদ্ধ । শকটে স্প্রিং থাকিলে উহা য-  
জ্ঞপ আঘাত প্রতিঘাতে অস্প বিকম্পিত হয়,  
তজ্ঞপ অশ্বের এই স্থিতিস্থাপক বন্ধনীমালা  
থাকাবশতঃ আঘাত-প্রতিঘাত-জন্য শরীর  
বিকম্পনের অনেক লাভ হয় । রীণ যু-  
গের ক্ষুরে আরও আশ্চর্য্যাতর কৌশল । ই-  
হারা শীত প্রধান মেরুর নিকটস্থ প্রদে-  
শেই বাস করে এবং বরফের মধ্যে ইহারা  
শকট টানিয়া থাকে । ঐ শকটের চক্র নাই,  
নিম্নতল ভূমিস্পৃষ্ট । ইহাদের ক্ষুর অতি  
প্রশস্ত এই জন্য বরফে বসিয়া যায় না, প-  
ক্ষান্তরে বায়ু প্রতিরোধে গমনাগমনের অ-  
সুবিধা না হয়, তজ্জন্য ইহারা ভূমিহইতে  
পদোত্তোলন করিলেই ক্ষুর সঞ্চিত করিয়া  
ক্ষুদ্রায়ত করিতে পারে । ইহাদিগের  
ক্ষুরের নিম্নতল ঘন রোমরাজিতে আবৃত ।  
রোম অতি অস্প পরিমাণেই তেজস্ফা-  
লন করে, \* তজ্জন্য ইহাদিগের পদে বর-

\* রোমের এই গুণ থাকাতেই অনেক  
পশুপক্ষী শীতে কষ্ট পায় না । বরফ ক-  
ষল জড়াইয়াও এই জন্য রাখা হয় । বাহি-  
রের তেজ কষল ভেদ করিয়া শীত মধ্যে  
প্রবেশ করিতে পারে না এবং বরফ না  
গলিয়া অনেকক্ষণ অগ্রবাবস্থায় থাকিতে  
পারে ।

ফের নিদাক্ষণ ঠৈশতা লাগিতে পারে না ।  
আবার ইহাদিগের ক্ষুর এমনই সুকৌশলে  
নির্মিত যে, ইহারা তদ্বারা বরফ তুলিয়া  
ফেলিয়া নীচের ঘাস খাইতে সক্ষম হয় ।  
এই ঘাসের নাম ‘লিচন্’ । যখন শীত-  
প্রভাবে অন্যান্য উদ্ভিদ প্রায় নষ্ট হইয়া  
যায়, তখনই এই ঘাস অধিক জন্মে । এই  
শীতকালেই ইহারা মনুষ্যের অভিশয় উপ-  
কারে আসে এবং তৎকালেই প্রকৃতি এই  
ঘাসোৎপাদনে ইহাদিগের প্রাণধারণের উ-  
পায় করিয়া দেয় । শুক্ল ভণ্ডকের পদ-  
তলও রোমে পরিপূর্ণ । খন্দ্যোতিকা  
কীটের পুঙ্খবেরা উড়িতে পারে, তাহাদের  
পাখা আছে । ক্রীদিগের পাখা নাই এবং  
উড়িতে পারে না । পুঙ্খবেরা ক্রীগণের  
আলোকেই তাহাদিগকেই আশ্রয়ণ করিয়া  
লইতে সক্ষম হয় । ভূমধ্য সাগরে নাবিক  
( Nautilus ) নামে এক প্রকার আশ্চর্য্য  
মৎস্য আছে । ইহারা শয্যুক জাতির এবং  
ইহাদিগের বহিরস্থি নৌকার ন্যায় । ত-  
দুপরি শরীর স্থাপন করিয়া ইহারা চর্যচ-  
টিকার পক্ষের ন্যায় দুইটি চর্যের পাল তু-  
লিয়া দেয় এবং পদের দ্বারা ক্ষেপণীর  
কার্য্য সমাধা করে । এই প্রকারে ইহারা  
উত্তমতঃ গমন করিয়া থাকে । নৌকার  
সমুদয় উপকরণই ইহাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে  
স্থান পাইবে, কে ইহা ভাবিয়াছিল । আর  
ইহারা বিনা শিক্ষায় যে নিপুণনাবিকের  
গুণস্থানীয় হইবে, কে ইহা কল্পনা ক-  
রিয়াছিল ?

## হরগৌরী

প্রথম প্রস্তাব।



“আধ বাঘছাল ভাল বিরাজে, আধ পটাস্বর সুরার মাজে ;  
 আধ মণিময় কিঙ্কণী বাজে, আধ ফণি ফণা ধরি রে ।  
 আধই হৃদয়ে হাড়ের মালা, আধ মণিময় হার উজালা,  
 আধ গলে শোভে গরল কালা, আধই সুধা মাধুরী রে ॥  
 এক হাতে শোভে ফণিভূষণ, এক হাতে শোভে মণি কঙ্কণ,  
 আধ মুখে ভাঙ্গ ধূতরা ভক্ষণ, আধই তাহুল পুরি রে ।  
 ভালে ঢুলু ঢুলু এক লোচন, কঙ্কলে উজ্জ্বল এক নয়ন,  
 আধ ভালে হরিভাল সুরশোভন, আধই সিন্দূর পরি রে ॥  
 রূপাল-লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে,  
 দুই ভাগ অগ্নি এক অবাধে, হইল প্রণয় করি রে ।  
 দোহার আধ আধ আধ শশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,  
 আধ জটাভূট গঙ্গা সরসী, আধই চাক কবরী রে ॥”

কবির ভারতচন্দ্র পুরাণ হইতে এই চিত্রটি তুলিয়া আনিয়াছেন। কিন্তু যাঁহার রূপনার ইহা প্রথম প্রতিভাত হইয়াছিল, তাঁহার প্রশংসার সীমা নাই। তিনি অতি উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক, অতি প্রগাঢ় পণ্ডিত, অতি পূজনীয় কবি। তাঁহাকে আমরা অভিবাদন করি। তাঁহার এই লীলাময় চিত্রপটে সৌন্দর্য্যের কি বিচিত্র মাধুরী খেলা করিতেছে, মানব-প্রকৃতির পূর্ণাবয়বতা কি আশ্চর্য্য শোভা পাইয়াছে, সামাজিক সম্পদের কি অপূর্ণ প্রতিমা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং দাম্পত্য-প্রেমের কি অলৌকিক প্রতিমূর্ত্তি

ইহাতে অঙ্কিত রহিয়াছে! এই চিত্র জগতে অতুল। ইহা মনস্বী ও ভাবুক, সকলেরই সমান ভোগ্য।

ইহার বহিঃস্থ পরিষ্কৃত অর্থ পূর্ণসৌন্দর্য্য। এই অনন্ত নিসর্গরাজ্য সৌন্দর্য্যের এক অনন্ত সমুদ্র। ইহার তরঙ্গে তরঙ্গে কেবলই সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ। নয়নাভিরাম শ্যামল নভোমণ্ডলে, কুসুমকাননে, স্রোতস্বিনীর আবিল বক্ষে, চন্দ্রমার অমৃতময় জ্যোৎস্নায়, স্বর্ঘ্যের ধরজ্যোতিতে, স্বর্ধ্যালোকরঞ্জিত মেঘমালায়, সরোবরের নির্ঘল জলে, শৈবালে, শৈবালবেষ্টিত কুসুম-কমলে, শস্য-শোভাময় রমণীর ক্ষেত্রে, তৃণশ্যামসমা-

স্ফাদিত ভূখণ্ডে, বনে, উপবনে, উন্নত পা-  
দপে, হ্রদিত লতিকায়, তুষারে, তুষারম-  
ণ্ডিত পৰ্ব্বতশৃঙ্গে, জলধির তরল পৰ্ব্বতময়  
অসীম বিস্তারে, সৰ্ব্বত্রই সৌন্দৰ্য্যের উ-  
চ্ছ্বাস, এবং সৰ্ব্বত্রই সৌন্দৰ্য্যের অবিরাম-  
বাহি আমোদলহরী । হৃদয়বান্ ব্যক্তি  
এই সৌন্দৰ্য্যসুখা পান করিয়া মনুষ্যদেহেই  
দেবজনম্পূর্ণীয় স্বৰ্গস্থ শস্তোৎকরণ করে,  
এবং ভাবায় তিনি কবি না হইলেও কা-  
ব্যের এই প্রাণগতরস হৃদয়ে পোষণ ক-  
রিয়া কৃতার্থ হন । তাঁহার নিকট প্রভাত,  
সন্ধ্যা, মধ্যাহ্ন ও গভীরা নিশীথিনী সক-  
লেই সামবেদী শবির ন্যায় সৌন্দৰ্য্যের স্ত-  
তিগীত গান করে, এবং তদীয় চিত্ত সৌ-  
ন্দৰ্য্যসলিলে ভাসিয়া ভাসিয়াই সমস্ত দুঃখ  
যজ্ঞগা ভুলিয়া থাকে, এবং সৰ্ব্বপ্রকার কলুষ-  
পঙ্কিলতা, ক্ষুদ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে বিনা  
প্রযত্নেই নির্মুক্ত রহে ।

কিন্তু এই যে সৌন্দৰ্য্যের উল্লেখ হইল,  
ইহা কি সকল স্থলেই একরূপ?—না ইহাতে  
বিচিত্রতা আছে? পৰ্ব্বতে যে সৌন্দৰ্য্য,  
পৰ্ব্বতপ্রান্তবাহিনী তরঙ্গিণীতেও কি সেই  
সৌন্দৰ্য্য? পাদপের দৃঢ়তা ও দৃকপাতশূন্য  
পৌৰুষে যে কান্তি, পাদপকণ্ঠশোভিনী  
পুষ্পময়ী ত্রতীতেও কি সেই কান্তি? যা-  
হার চক্ষু আছে, তিনিই বলিবেন,—না ।

যেমন কবিতায় রসবৈচিত্র্য, তেমন  
সৌন্দৰ্য্যও বিচিত্র প্রভেদ । সৌন্দৰ্য্য  
অনেক প্রকার । উহা কোথাও ভয়ানক,  
কোথাও কাৰুণ্যব্যঞ্জক,—উহাতে কোথাও

ভক্তির উদ্দীপনা, কোথাও প্রীতির প্রব-  
ৰ্ত্তন । অমাবস্যার রাত্রি, ঘোরতম অন্ধকার,  
আকাশে নিবিড় ঘনঘটা, বায়ুর শ্বাস প্র-  
শ্বাসে শোকের স্রগভীর নিঃশ্বন, মুসলধারে  
রক্তি, মুহুমূহঃ বিদ্রোহের স্ফূর্ত্তি, মুহুমূহঃ  
বজ্রপাত, জলে স্থলে এক, শূন্যে অশূন্যে  
সমরূপতা, এই এক প্রকারের সৌন্দৰ্য্য,—  
ভয়ঙ্কর, রোমহর্ষণ, নিকপম । এই প্রকা-  
রের সৌন্দৰ্য্যে হৃদয়ে বিলাসের আবেশ  
হয় না, হৃদয় সূক্ষ্মসংস্পর্শেও শীতল হয়  
না; উহা ক্রমশঃ কেবল শুভিত হইতে  
থাকে, এবং শুভিত হইয়াও ক্রমে ক্রমে  
স্ফীত হইয়া উঠে । আবার লতায়ত বি-  
মোদকুঞ্জে কৌমুদীর ক্রীড়াকৌতুক, দ্ব-  
ন্দ্বাদলে শিশির, সন্দরীর কমলীয় ল-  
লাটে চূর্ণকুন্তল, শিশুর সরল হাস্য,  
এই সকল আর এক প্রকারের সৌ-  
ন্দৰ্য্য,—প্রাণারাম, প্রিয়দর্শন, প্রীতিপ্রদ ।  
হরগৌরীর অপরূপ সম্মিলনে এই উভয়-  
বিদ সৌন্দৰ্য্যেরই আভা রহিয়াছে । এই  
জনাই বলিয়াছি, ইহাতে পূর্ণসৌন্দৰ্য্য প্র-  
তিবিস্তিত । অগ্ন্যাত্রায় হইলেও ইহাতে  
পূর্ণতার কিঞ্চিৎ ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে,  
—কবির কল্পনা পরম্পর-বিরোধি বি-  
চিত্রতার একত্র সমাবেশ করিতে চেষ্টা ক-  
রিয়া অতি অল্প পরিমাণে হইলেও ইহাতে  
কৃতকার্য হইয়াছে । ইহাতে,—

“আধ গলে শোভে গরল কালা,  
আধই নুখা মাধুরী রে ।”  
সুতরাং বাহাতে আতঙ্ক, আমরা এই

মূর্তিতে তাহারও প্রতিরূপ দেখিতে পাই; যাহাতে আনন্দ আমরা তাহাও এই মনোহর মূর্তিতে সন্দর্শন করিয়া প্রীত হই। ইহাতে মধুরিমা ভয়ের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, ভয় মধুরবেশে মন মোহিত করিতেছে। ইহাতে কাঠিন্য কোমল হইয়া গিয়াছে, কোমলতা কাঠিন্যে পরিণতি পাইয়াছে। কে এ রূপ একবার দেখিলে বিস্মৃত হইতে পারে?—যেখানে ক্ষয় যাই যাই বলিয়াও যাইতে সাহস পায় না, এবং যে অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য হইতে চিত্ত দূরে যাইতে ইচ্ছুক হইলেও যাইতে পারে না, কে তাহার মন্ত্রমোহ হইতে মুক্ত রহিবে?

এই হরগৌরীচিত্রের অন্তঃস্থ অক্ষুট অর্থ মানবপ্রকৃতির পূর্ণাবয়বতা। মানব-প্রকৃতির কোন কোন রুতি ফণীর মত গজ্জ্বল করে, কোন কোন রুতি কিকিণীর কলনাদে ক্ষয় মন কাড়িয়া লয়;—কোন কোন ভাব অগ্নির মত জিহ্বা প্রসারণ করিয়া পোড়াইতে কি গ্রাস করিতে আসে, কোন কোন ভাব শরীরে অমৃতধারা ঢালিয়া দেয়। যখন মনুষ্য ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত, তাহাকে তখনও দেখিও; যখন সে স্নেহে বিগলিত, তাহার তদানীন্তন মাধুর্য্যও একবার দেখিয়া লইও। মনুষ্যের অভিমান সর্বদাই ‘দূরে রহ’ বলিয়া দর্প সহকারে তোমাকে ইজিত করিতেছে, মনুষ্যের মমতা জ্যোৎস্নার ছিলোলের ন্যায় তোমার তাপিত অঙ্গে আপনা হইতে আসিয়া

গড়াইয়া পড়িতেছে। মনুষ্যচক্ষের কোন রূপ দৃষ্টি বিধাক্ত শলাকার ন্যায় তোমার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া যাইতেছে, এবং উহা যতদূর প্রবিষ্ট হইতেছে, ততদূরই যেন প্রচণ্ড লৌহ কি প্রতপ্ত গরল স্রোতে বহিতেছে; আবার মনুষ্যেরই আলস্যময়, আবেশময়, প্রাণস্পর্শি নয়নভঙ্গি তোমায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে;—যে কল্পকানন স্রষ্টে বই কেহ দেখিতে পায় না, অন্ততঃ কলকালের জনাও তোমায় তাহার সুস্বিক্ষণ্যামল জ্যোতি দেখিতে দিতেছে। কবিকল্পিত হরগৌরী মূর্তিতে এই উভয়বিধ ভাবেরই একত্র নিবেশ; ইহাতে যেমন নানারূপ সৌন্দর্য্যের অপূর্ব মিশ্রণ, তেমন পুষ্পকার ও প্রীতিরও অপূর্ব সম্মিলন। ইহাই মনুষ্যের চরমোৎকর্ষ। ইহাতে ব্যাভ্রচর্য্য ও পটাস্বর আলিঙ্গনবন্ধ, ইহাতে ফণী ও মণি, জটাজুট ও চাক্ষুকবরী, ধবল বিভূতি ও গন্ধ কস্তুরী একাধারে জড়িত গড়িত। অলৌকিক কালিদাস এই মোহন মূর্তির আভা দর্শন করিয়াই দিলীপ বর্ণনে বলিয়াছেন যে,—

“ভীমকাস্তৈ নৃপগুণৈঃ সবভূবোপজীবিনাং  
অধ্বনাচাতিগম্যন্ত যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥”—  
এবং কালিদাসের আদিগুরু আদিকবি  
বাল্মীকিও শোভা ও সামর্থ্যের এই সম্মিলন ধ্যান করিয়াই কখনও রামের কোদণ  
টঙ্কারে ও জলদ-গজ্জীর গজ্জনে ত্রিভুবন  
কল্পিত করিয়াছেন, কখনও বা রামচন্দ্রের  
ককণবিলাপ ও অশ্রাবর্ণনে বনের পশু প-

কীকেও বিলাপ করাইয়াছেন ;—পাষাণে  
দ্রবময়ীর নীলা দেখাইয়া, পাষাণে কু-  
সুমরাশি প্রক্ষুটিত করিয়া লোককে বি-  
স্মিত ও বিমুগ্ধ রাখিয়াছেন ।

বিধাতা মনুষ্যকে দুটি চক্ষু দিয়াছেন ।  
কিন্তু সংসারে অধিকাংশ মনুষ্যই কাকের  
মত এক চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এবং এ-  
কার্দ্ধি মাত্র দেখিতে পান বলিয়া মানবমহি-  
মার একাধিকেরই উপাসনা করেন । তাঁহা-  
দিগের মধ্যে কাহারও নিকট শুধু পৌকষ-  
গুণেরই গৌরব ও সম্মাননা । তাদৃশ ব্যক্তি-  
দিগের বিবেচনায় যে কোন ভাব, যে  
কোন বিষয় এবং যাছা কিছুতে হৃদয়ের  
গন্ধ আছে, অবলাপ্রকৃতির সম্পর্ক আছে  
এবং অবলাজনমূলভ সারলা, কোমলতা,  
পরযুগ্মপ্রেক্ষিতা, ও পরের প্রতি নির্ভরের  
ছায়া আছে, তাহাই দৃশ্যীয়, তাহাই  
জঘন্য । তাঁহারা আত্মীয়জনের উপকার  
করিতে প্রস্তুত, কিন্তু আত্মীয়জনকে আ-  
দরে পরিভূক্ত করিতে তাঁহারা লজ্জা অনু-  
ভব করেন । তাঁহারা বন্ধুতায় অনুরোধে  
বিপদসময়ে সাহায্য দান করিতে অসম্মত  
নহেন, কিন্তু কোন অনুরোধেই কাছাকাচে  
যেহের সজলনয়নে অভিনন্দন করিতে  
তাঁহারা সম্মত হইবেন না । এসকল তাঁ-  
হাদিগের চক্ষে যেমন অনাবশ্যক, তেমন  
অবজ্ঞের, তেমনই উপহাসনীয় । তাঁহাদি-  
গের আদর্শ পুরুষ আপনাতে আপনি দৃঢ়  
হইয়া লৌহস্তম্ভের মত দণ্ডায়মান থাকি-  
বেন, কখনও পরের কণ্ঠে ভর করিবেন

না ; তিনি শত্রুমর্দনে একে এক সমুদ্রের  
মত কার্য্য করিবেন, কিন্তু কখনও স্নেহ-  
সমাগমে ঢলিয়া পড়িবেন না ; তাঁহাতে  
মার্ত্তণ্ডের প্রখর দীপ্তি থাকিবে, কিন্তু কথ-  
নও চন্দ্রমার স্নিগ্ধ কাস্তি বিলাসিত হইবে  
না ; তিনি স্রুথে স্রুখী হইতে পারেন,  
কিন্তু স্রুথে কখনও রুতজ হইবেন না ;  
এবং বিরহ, বিরোগ প্রভৃতি দুঃখ তাঁহার  
চরণোপাশ্রে প্রবাহিত হইয়া যাইবে, ক-  
খনও তাঁহাকে স্পর্শ করিবে না ।

পক্ষান্তরে, এমনও অনেক ব্যক্তি আ-  
ছেন যে, তাঁহারা পৌকষধর্ম্মে পুঞ্জার উপ-  
যুক্ত সামগ্রী কিছুই দেখিতে পান না, কিন্তু  
শ্রীতির মোহিনী মায়া এবং চল চল লা-  
বণা রাশিকেই সর্ব্বশ্য মনে করেন । তাঁহা-  
দিগের অভিধানে বিষয়লিপ্সা ও কার্য্যকুশ-  
লতার নাম কপটতা, পরাক্রমের নাম পাপ,  
বীরগর্ব ও অভিমান অধোগতির প্রশস্ত  
পথ । যে সকল পুরুষ আশ্বাতের উত্তরে  
প্রতিঘাত করিয়া পৃথিবীতে চিরকাল কেবল  
মলযুদ্ধেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ;  
যাঁহারা সৃষ্টির ন্যায় কূটচক্র ভেদ করিয়া-  
ছেন, রিপুকুলের মস্তকে বজ্রের ন্যায় ভীম-  
শব্দে নিপতিত হইয়াছেন, এবং কোথাও  
বা ঝটিকার ন্যায় সম্মুখস্থ সমস্ত বিষু বাধা  
বেগে উড়াইয়া নিয়াছেন, তাঁহাদিগের  
চক্ষে তাদৃশ ক্ষণজন্মা ব্যক্তিদ্রোহ অপদেব-  
তার অবতার । এই সম্প্রদায়ের আদর্শ  
পুরুষ কুসুমের ন্যায় কোমল হইবেন, কিন্তু  
তাঁহাতে কটকের কোন লক্ষণ থাকিবে

না; তাঁহার নেত্রযুগল হইতে স্রুখে দুঃখে সকল সময়েই ধারায় বাষ্পবারি বিগলিত হইবে, প্রণয় তাঁহার হৃদয়কে একবারে ডুবু ডুবু করিয়া রাখিবে, এবং তাঁহার দৃষ্টি ও কথায় কেবলই মধু ক্ষরিবে। তিনি বিনীত, তিনি শান্ত, তিনি ক্রোধাদিবিকার-রহিত। তিনি সংসারে নিষ্কিঞ্চ। তিনি শত্রুর নিকটও পদানত। তিনি যুদ্ধতার স-জীব প্রতিদ্বন্দ্বি।

যাঁহার পূর্ণতার উপাসক, তাঁহার এই উভয় সম্প্রদায়েরই আংশিক অনুসরণ করেন, অথচ এই উভয়ে পৃথক পৃথক্ৰপে যাঁহা অনুভব করিতে না পান, তাঁহা অনুভব করিয়া, উভয়েরই অগম্য এক উচ্চ-তর প্রাণে আকৃষ্ট হন। তাঁহাদিগের বিবেচনায় বে পৌকষে প্রীতি নাই, কেবল স্বার্থ আছে, তাঁহা স্বর্ণামসদৃশ; এবং যে প্রীতিতে পৌকষের অবলম্ব নাই, কেবল অস'র সৌরভ আছে, তাঁহা শুষ্ক ও দলিত পুষ্প-দল-সদৃশ। তাঁহ'র এই নিমিত্ত, পৌকষ ও প্রীতির সম্মিলিত অবস্থাকেই পরমপুণ্যবর্ধ বলিয়া পূজা করেন, এবং যাঁহাতে প্রেমমুখোই এই উভয় ভাবের সমুচিত বিকাশ হয়, যাঁহাতে প্রেভোকেই অংশতঃ পুণ্য ও অংশতঃ অবলা-স্বভাব হইয়া গজাসাগর সজ্জের ন্যায় এক তীর্থস্বরূপ হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার সর্বাস্তঃকরণে কামনা করেন। তাঁহাদিগের আদর্শ এই হরগৌরীমূর্তি, একাঙ্কে প্রলয়, অপরাঙ্কে প্রাণদান—একাঙ্কে সমাধির নিমন্ত্রণ গাভীর্বা,

অপরাঙ্কে দৈবকামিত প্রকুরতার প্রিয় আকর্ষণ। তাঁহাদিগের ধর্ম্মনীতি কাপুরুষকে অবজ্ঞা করে; যে ভীক, যে নিরতিমান, যে আঘাতে উত্তেজিত হয় না, অপমানের নিদাক্ষণ দংশনেও জুলিয়া কি জাগিয়া উঠে না, যাঁহার চিত্ত কোনরূপ কঠোর সাধনাতেই সাহস পায় না, যাঁহার মন কার্ষের সময় ক্রুৎকারেরও তর সহে না, তাঁহাকে উহা মনুষ্যাগণনারই বাহিরে রাখে। অথচ, যাঁহার ক্রুরকর্ম্ম, যাঁহার নিষ্ঠুর, যাঁহার কিছুতেই আত্ম হন না, কিছুতেই কাঁহাকেও আত্ম করিতে পারেন না, যাঁহার প্রাণ জুলিয়া ভাল বাসিতে জানেন না, প্রাণ দিয়া পরের পূজা করিতে ইচ্ছা করেন না,—যাঁহার ঐশ্বর্যের আনন্দ চাহেন, কিন্তু স্বৈহের অধীনতার কি অনির্বচনীয় আনন্দ আছে তাঁহা বুঝিতে চাহেন না, ঐ প্রশস্ত নীতি তাঁহাদিগকেও অধম পুরুষ বলিয়া যুগার চক্ষেই নিরীক্ষণ করে।

মনুষ্যের একটি আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। মনুষ্য আপনার অভাব ও অপূর্ণতাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিবার জন্য ভাষাকে দাসীর ন্যায় ব্যবহার করে, এবং নৃতন নৃতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া ঐ সমস্ত নৃতন শব্দের আবরণেই আপনার ক্রমতা ও ক্ষীণতা ঢাকিয়া রাখিতে যত্নশীল রহে। আমরা উপরে পৌকষ-বিরোধী ও হৃদয়-বিরোধী এই দুইটি বিভিন্নপ্রণেহিত ব্যক্তিদিগের মতি ও গতি সম্বন্ধে যাঁহা বলিয়াছি,



তাছাড়াই একথার অতি সুন্দর নির্দেশন আছে । ঐহারা পৌকষ-বিরোধী, তাঁহাদিগের মুখে আমরা সকল সময়েই শাস্তি, ক্ষমা, নির্বেদ, বৈরাগ্য, শত্রুর প্রতি দয়া, বিশ্বজনীন প্রীতি ইত্যাদি কতকগুলি পবিত্র শব্দ শুনিতে পাওয়া থাকি । তাঁহারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে এই সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করেন, এবং এই সকল শব্দের সহায়তা লইয়াই পৃথিবীর রক্তভূমি হইতে পৌকষ ও পরাক্রমের সকল প্রকার ক্রীড়া এবং সমস্ত মন্থে আপনাদিগের অপবাদ ও কলঙ্ক দূর করিবেন বলিয়া আশাশ্রিত হন । তাঁহারা যখন আহত হইয়া শয্যাগত থাকেন, তখন উহা পরকাল চিন্তা ; তাঁহারা যখন ভয়ে কটকিত হইয়া অঞ্চলের আশ্রয় লন, তখন উহা বিরোধবিমুখকতা । হায় ! এই ধর্মই যদি মনুষ্যজাতির পরিব্রাজনের ধর্ম হইত, তবে ইতিহাস কাহাদিগের কাহিনী শুনাইয়া মনুষ্যের চিত্ত বিমোহিত করিত ? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, জর্জুন, সেকন্দর, সিজর, হানিবাল, ও নোনাপার্ট প্রভৃতি ধুরন্ধর পুরুষদিগের দিগন্তবিশ্রুত নাম কোথায় থাকিত ? পর্য্যপোলীর অতুল কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া কে আনন্দে উচ্ছলিত হইত ? আর, জগতে অদ্যাপি যে সকল অবদান পরম্পরা অহরহ অমুণ্ডিত হইতেছে, কোথায় তাহার চিহ্ন থাকিত ? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই, ঐহারা পৌকষের নিন্দা করেন, তাঁহারা শব্দের স্মৃতি করিতে যেমন বিচক্ষণ, মানবপ্রকৃতির পরিবর্ত-সাধনে তে-

মন সক্ষম নহেন । তাঁহারা তাঁহাদিগের শব্দসম্পাদ লইয়া মূখে নিত্ৰাতোষণ করন ।

যে শ্রেণিগত বান্ধুরা হৃদয়গত উৎকর্ষের বিরোধী, তাঁহাদিগের প্রধান কথা, 'দুর্জলতা' । তাঁহারা সকল করিতে পারেন ও সকল সহিতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই হৃদয়ের দুর্জলতা প্রদর্শন করিতে পারেন না । তাঁহাদিগের ঘারে ভিখারী রোদন করিতেছে, দিনান্তে মুষ্টি 'ভিক্ষা' পায় নাই বলিয়া কাতবকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে, কিন্তু তাঁহারা তাহার প্রতি রূপাকটাক্ষ নিক্ষেপ করিবেন না । কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্জলতা । যে তাঁহাদিগের মুখে একটি প্রিয়কথা শুনিলেই আত্মদে অবশ হয়, তাঁহারা তাহাকে প্রাণান্তেও প্রিয় সম্বোধনে সম্ভাষণ করিবেন না । কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্জলতা । জীবনের চির-সজিনী অশেষ মানসিক যন্ত্রণায় জর্জরিত হইয়া প্রণয়-পিপাসু নরনে পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন ; তাঁহারা তাঁহার প্রতি ফিরিয়া চাহিবেন না । কারণ, ইহা হৃদয়ের দুর্জলতা । যে সকল কার্য্যে লোকে প্রীত হয়, পরিতুষ্ট হয়, লোকে অন্তরের সহিত কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ দেয়, তাঁহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক তাছাতে পরাভূত হইবেন । কেননা, ইহাও হৃদয়ের দুর্জলতা । অহো মনুষ্য ! কিছুই তোমার অসাধ্য নহে । যাহা ঘোরতর পাতক, তুমি তাহাতেও পুণ্যের কমলীসজ্জা প্রদান করিতে পার, এবং যাদৃশ আচরণে দয়া

অশ্রুবর্ষণ করেন, ধর্ম নিপীড়িত হন, তুমি তাহাও পৌকষের নির্মল নাম লইয়া অনুষ্ঠান কর।

হৃদয়ের দুর্বলতা ? দুর্বলতা এ শব্দ কে কোথা হইতে আনিল ? আর, যদি মনুষ্যের হৃদয় স্বভাবতঃই দুর্বল হয়, তবে উহা দোষ না গুণ ? হৃদয় বিবেকের অগ্রবর্তী। বিবেক যেখানে পড় ছিতে পারে না, হৃদয়ের গতি সেখানেও অব্যাহত। হৃদয়ের দুর্বলতাতেই এই অচিন্তনীয় বল। ইহা সত্য যে, মনুষ্য হৃদয়ের দুর্বলতা বশতঃ প্রাণে পরতন্ত্র হয়, পরের মুখে হাসে, পরের দুঃখে কাঁদে, পরের বিচ্ছেদ-বেদনার ক্রিষ্ট হয়, পরচিত্তবিনোদনের জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, এই হৃদয়ের দুর্বলতা বশতঃই সে গিরিসাগর লঙ্ঘন করিয়া সাধারণের অসাধ্য কার্য সকল অবহেলায় সাধন করিয়া উঠে; এই দুর্বলতার সাহায্যেই সে বিপদরাশির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; এই দুর্বলতার মহিমাবলেই সে আপনার অস্থিচর্য বিক্রয় করিয়া জাতি বিশেষের উদ্ধারের পথ উন্মোচন করিয়া দেয়। হৃদয়ের দুর্বলতা জানে তাহার সাহায্য, জগতের হিতজনক যশস্বর কার্যে তাহার উদ্দীপনা, সমরাজ্যে তাহার মনোমাদিনী শঙ্খধ্বনি, ধর্ম তাহার বীজ-মন্ত্র, প্রেমে তাহার প্রাণ। মনুষ্য প্রকৃতির সজীবতা হৃদয়ের জন্য যতবিধ মদিরা পান করিয়া থাকে, হৃদয়ের দুর্বল-

তাই তথ্যে তাহার প্রধান মদিরা। সংসার বাঁহাদিগের নিকট শ্লগী রহিয়াছে, তাঁহার সকলেই এই মদিরাপানে বিভোর থাকিতেন।

মনুষ্যের প্রকৃতিকে তুমি সুন্দর বল। কিন্তু উহার সৌন্দর্য্য কিম্বা ?—না হৃদয়ের দুর্বলতায়। মনুষ্য অনেক কার্যেই দৈতাদানবের উপমান্বল বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে; কিন্তু দেবতার সহিত যে তাহার উপমা হয়, তাহা শুধু হৃদয়ের দুর্বলতায়। যখন দেখিবে যে, যোদ্ধা ধূমাক্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে বিপকের অস্ত্রাঘাতে নিপতিত হইয়া, প্রাণ যায় যায় এমন সময়েও করুণত বারিষাত্র আপনার মুখের নিকট হইতে অপসারণপূর্ব্বক অধিকতর তৃষাতুর অন্য একজনের মুখে তুলিয়া দিতেছেন, তখন ইহা মনে রাখিও যে, হৃদয়ের দুর্বলতাই সেখানে তাঁহার বল বিধান করিয়াছে। যখন দেখিবে যে, কোন স্থানে অগ্নির জ্বলন্ত জিহ্বা, মৃত্যুর করাল জিহ্বার ন্যায়, চতুর্দিক ব্যাপিয়াই লক্ষ লক্ষ ও ধ্বংস করিতেছে, সকলেই আপনাকে মাত্র বাঁচাইয়া সে স্থান হইতে দূরে পলাইতেছে; কিন্তু একটি ক্ষীণাঙ্গী লসনা সেই অগ্নি ও সেই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে ভয় না করিয়া একটি শ্রুৎকার শিশুর জীবন রক্ষার জন্য উহার মধ্যে অগ্নাবদনে প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং আপনি অর্দ্ধদগ্ধ হইয়াও ক্রোড়স্থ শিশুটিকে আবরিয়া রাখিতেছে, তখন জানিও যে তাহার বাঁহা কিছু সামর্থ্য, হৃদ-

য়ের দুর্ভলতা। হইতেই সে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছে। যখন দেখিবে যে, যাহার পদাঘাতে পৃথিবীতে ভূকম্প হইত, যাহার ঝলসিত অস্ত্রচালনে বিদ্রাতরাশি খেলা করিত, পর্বতের মেঘম্পর্শী মস্তকও যাহার অভ্যর্থনা ও আজ্ঞাপালনের জন্য অবনত হইয়া আসিত, সেই তেজঃপুঞ্জ মহাবীর লোকলীলার অন্তিম ক্ষণেও আপনাকে বিস্মৃত হইয়া স্বজাতির অধোগতি স্মরণেই অশ্রু-জলে পরিপ্লুত হইতেছেন,—যিনিকাতরতা কাছাকে বলে তাহা কখনও বুঝিতেন না, তিনি আজি জননী ও জন্মভূমিকে কাহার হাতে তুলিয়া দিয়া যাইবেন এই চিন্তাতেই বালিকার মত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন জানিও যে হৃদয়ের দুর্ভলতাই তাঁহার রোমে রোমে প্রস্ফুট হইতেছে; হৃদয়ের দুর্ভলতাই সেই মহামুহূর্ত্তে তাঁহাকে আত্মহুঃখে অন্ধ রাখিয়া পরহুঃখে দাহন করিতেছে। হৃদয় অমৃতের অনন্ত প্রস্রবণ। একটি বালুকণাকে চঞ্চল সৃষ্টিশক্তে তুলিয়া দিলে উহা যতক্ষণ সেখানে অবস্থান করিতে না পায়, যদি ততক্ষণের জন্যও সমগ্র মনুষ্য জাতির হৃদয়-প্রস্রবণ একবারে শুক রহে, তাহা হইলে এই অবনীর অন্তস্তল হইতে এমন এক অশ্রুত-পূর্ণ হাহাকার ধনি সমুখিত হয় যে, দূরস্থ এহ নক্ষত্রও তাহাতে চমকিয়া উঠে। হে ধীর ! তুমি ইহার পরও কি হৃদয়ের দুর্ভলতার লজ্জিত হইবে? যিনি এই নিখিল সংসার মধ্যে কেবল আপনাকেই

সার জ্ঞান করিয়াছেন, তিনিই মনুষ্য হৃদয়ের দুর্ভলতার উপহাস করুন; কিন্তু যিনি আপনার ক্ষুদ্রতাকে পূর্ণতার প্রসারিত করিতে ইচ্ছা করেন, হৃদয়ের দুর্ভলতা তাঁহার চক্ষে লজ্জার নহে। হৃদয়ের দুর্ভলতা হেতুই তুমি আমার, আমি তোমার, এই আমার বন্ধু, এই আমার বান্ধব, এই আমার আত্মীয় স্বজন, এই আমার স্বজাতি ও স্বদেশ। হৃদয়ের দুর্ভলতা দূরীভূত হইলে, কাহার সন্নিহিত আর কাহার কি সম্পর্ক থাকে, বল।

আমরা হরগৌরী মূর্তির স্ক্রুট ও অ-স্ক্রুট দুইটি অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছি, এই-ক্ষণ ইহার আর একটি অর্থও সংক্ষেপে বিবৃত করিব; এবং যেমন হৃদয়ের অবমাননায় মনুষ্য মাত্রেরই বিভ্রমনা হয়, হৃদয়ের অবমাননায় সমাজেরও যে সেই-রূপ কি ততোধিক বিভ্রমনা হইতেছে, তাহা বুঝাইতেই এস্থলে প্রধানতঃ যত্নপর হইব। আমাদের বুদ্ধিতে এই হরগৌরী মূর্তিতেই মনুষ্যসমাজের ভাবি সম্পদ প্রতিভাসিত।

মনুষ্যসমাজ পৃথিবীর সর্বত্রই নিত্যন্ত কম, জীর্ণ, ও বিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। সামাজিক জীবনে কোথাও শান্তি নাই, কোথাও সুখ নাই, কোথাও ভবিষ্যতে বিশ্বাস নাই। যাহারা আশা করেন, তাঁহারা নিরাশ হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস নিঃক্ষেপ করেন; যাহারা প্রথম হইতেই নিরাশ, তাঁহারা আশাভঙ্গের তীব্র দুঃখ

অনুভব না করিলেও চিরদিন নিকৎসাহ ও নিরানন্দ রহেন। ইহা কেন? সমাজ অবিরত আবর্তিত হইতেছে, অথচ ইহার উন্নতি হয় না;—মনুষ্য সমাজসংস্করণের জন্য, ইতিহাস, অর্থবাদ, বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের সাহায্য, লইতেছে,—কখনও কাব্যের সুধারসম্বাদে দিবা-শক্তি লাভ করিয়া নূতন সৃষ্টি করিতেছে, কখনও বিবেকের অঙ্কুশতড়নে অদীর হইয়া যাহা পুরাতন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে; কিন্তু তথাপি মনুষ্যের মনস্তাপ ঘুচিতেছে না, মনে তৃপ্তি হইতেছে না। ইহার কারণ কি? এই কুটসমস্যা সমাজ-বিজ্ঞানের বীজমূত্র; আর যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা ইহার আলোচনা করিতে সমর্থ, এবং তাঁহারাও ইহার প্রকৃত মীমাংসার অসমর্থ। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই এই প্রশ্ন অবলম্বনে এক এক অভিনব তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন; এবং কেহ রাজনীতি, কেহ ধর্মনীতি, কেহ বা সমাজনীতির শত শাখায় বিচরণ করিয়া পরিশেষে যেখান হইতে আরম্ভ সেখানেই অবসরটিতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

আমাদিগের বিশ্বাস এই যে, মনুষ্য-সমাজে যত যত প্রকারের দুঃখবস্থা ও বিকার পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার সমুদয় ও-লিই এক-কারণ-সম্ভূত নহে। অতএব, একটি কারণ নির্দেশ করিলেই সমাজের বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ সমস্ত ব্যাধির কারণ-নির্দেশ হইবে, এমন সম্ভব হইতে পারে

না। একদিগে দেখিতেছি আভিজাত্য অভিমান-কুসুমকোরকস্থ কীটের মত সমাজের মর্ম্মস্থানে দংশন করিতেছে, সামাজিক-শক্তির বিকাশের পথে সহস্র প্রতিবন্ধক জঘাইয়া সমাজ বিশেষকে শতাব্দী পশ্চাৎ রাখিতেছে;—আর একদিগে দেখিতেছি পশুশক্তি ন্যায়ের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এবং যাহা লজ্জাকর, ঘৃণাকর ও লোকের অহিতকর, তাদৃশ কার্য নিচয়কেও অতি মশোহর পরিচ্ছদ দিয়া সমাজে প্রচলিত করিয়া উঠাইতেছে। এস্থানে দেখিতেছি মনুষ্য, পাপে প্রবর্তনার জন্য, বহুবিধ কটিকর বস্তুর বিপণি সাজাইয়া মনুষ্যকে তাহাতে আব্বান করিতেছে; স্থানান্তরে দেখি তেছি যাহারা অপরাধী, তাহারা নিরদ্বৈত নিরপরাধ ব্যক্তিদিগের স্কন্ধে সকল ভার চাপাইয়া দিয়া আপনারা অম্পৃষ্ট শরীরে সরিয়া পড়িতেছে। সমাজে বিভিন্ন রাজাতীর ব্যাধির এইরূপ বিভিন্ন কারণ। কিন্তু যদি তথাপি সোপানের পর সোপানে আরোহণ করিয়া বহু কারণের এক-কারণ নির্দেশ করা আবশ্যক হয়, আমরা অঙ্কুর মনে বলিব যে, সমাজে হরগৌরীর বিচ্ছেদ, অথবা নরনারীর অসামঞ্জস্যই সমস্ত সামাজিক ব্যাধির মূল। যাবৎ না ইহা তিরোহিত হয়, তাবৎ কি কখনও সমাজ-শক্তির পূর্ণবিকাশ হইবে?

কি উত্তম-ইউরোপ, কি উত্তম-আমেরিকা,

কি গৌরবজ্ঞে এসিয়া, কি তিমিরারত আ-  
করিকা, ইহার সকল দেশে এবং সকল  
সমাজেই আমরা মনুষ্যের সমবেত-বুদ্ধি  
এবং সমবেত-বাহুবলের বিবিধ কার্য্য দে-  
খিতে পাইতেছি, কোথাও সমবেত-হৃদয়ের  
কোনরূপ কার্য্য দেখিতে পাইনা। সুতরাং,  
যে দেশ ও যে সমাজ বুদ্ধিবলে ও বাহু-  
বলে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে, সেই দেশ ও  
সেই সমাজই জগতের পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি  
পাইতেছে, এবং যে দেশ ও যে সমাজ  
বুদ্ধিবল ও বাহুবল বিষয়ে ক্ষীণ হইয়া প-  
ড়িতেছে, সেই দেশ ও সেই সমাজই সবল  
প্রতিবেশীর পাদপীড়নে দিন দিন অধঃ-  
পাতে যাইতেছে। তোমরা যাহাকে উন্নতি  
বল, যাহাকে সভ্যতা বল, যে সকল কা-  
র্য্যকে ঊনবিংশ শতাব্দীর অক্ষয় গৌরব বল,  
তত্ত্বাবতের অন্তঃপ্রবাহেও কি বুদ্ধিবল এবং  
বাহুবল ব্যতীত আর কোনরূপ সামাজিক-  
বল দৃষ্টিগোচর হয়? মনুষ্য উত্তরোত্তর বুদ্ধি-  
বলে বলীয়ান হইয়া লাগরের গর্ভ হইতে  
মণি, মুক্তা, প্রবাল ও রত্ন আহরণ করি-  
তেছে,—গর্জির পাষাণবন্ধ ভেদ করিয়া  
আপনার পথ খুলিতেছে; এবং মনুষ্য  
উত্তরোত্তর বাহুবলে বলীয়ান হইয়া দুর্ন-  
লের নিষ্পেষণে নিত্য হৃতন মহিমা দেখা-  
ইতেছে,—যে দরিদ্র তাহার সর্ব্বশ্ব লুণ্ঠন  
করিয়া, যে ধনী তাহার ভাণ্ডার পূর্ণ ক-  
রিয়া দিতেছে। সমাজে ইহা ছাড়া আর  
কি হইয়া থাকে? পুরাতত্ত্বের স্তবকে স্ত-  
বকে কি এই একই কাহিনীরই নানারূপ ব-

র্ণনা নহে, এবং লোকের কণ্ঠেও কি এই এ-  
কই কথার জমণ করে না? ইংলণ্ড ফ্রান্স,  
জার্মানী ও রাশিয়া প্রভৃতি মরুভারাজ্যে  
কোটি কোটি প্রাণী উদরের জ্বালাময় অসংখ্য  
হুজিরা দ্বারা অবনীকে কলুষিত করিতেছে;  
কোন স্থানে গো মহিষের ন্যায় পুত্রকন্যা  
বিক্রয় হইতেছে; কোন স্থানে গণিকারতির  
জ্যোত ভয়ঙ্করবেগে বহিয়া যাইতেছে;  
কোথাও আকাশের চন্দ্র তারা জগৎহত্যা  
দেখিয়া দেখিয়া ভয়ে থর থর কাঁপিতেছে;  
এবং কোথাও স্ত্রীহত্যা, মাতৃহত্যা ও পি-  
তৃহত্যা পাপের অসহ্যভারে পৃথিবী  
বসিয়া পড়িতেছে; অথচ ঐ সমস্ত রা-  
জ্যের অধিনায়কেরা কেবল নিজ নিজ বা-  
হুবলবুদ্ধি ও অন্যকে বঞ্চনা করিবারই আ-  
য়োজন করিতেছেন, সমাজে আর কি হয়  
না হয় তৎপ্রতি জ্ঞানেক্ষেপ করিবারও অরস  
পাইতেছেন না। ইহাই কি মনুষ্যসমা-  
জের প্রাকৃত অবস্থা? বিধাতা কি মানব-  
জাতিকে বুদ্ধি ও বাহু এই দুইটি মাত্র শ-  
ক্তিই প্রদান করিয়াছিলেন?—না, মনুষ্য-  
সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন-ঐবভবের জন্য তা-  
হাতে অন্যান্য শক্তিরও অঙ্কুর রোপণ  
করিয়াছিলেন?

সামাজিক মনুষ্য এ সকল কথার উ-  
ত্তর দিতে অক্ষম! সে ব্যক্তিবিশেষের  
চারিত্রবিকাশের জন্য হৃদয়ের আবশ্য-  
কতা স্বীকার করিলেও, সমগ্রসমাজের জন্য  
তাহা স্বীকার করে না; সে হৃদয়হীন  
আটল ও বরজিরাকে পশু বলিয়া ঘৃণা

করিতে প্রস্তুত হইলেও, হৃদয়হীন মনুষ্যস-  
মাজকে পশুসমাজ বলিতে তাহার ইচ্ছা  
হয় না। তাহার এই কামনা যে স্বার্থই প্র-  
ত্যেক সমাজের একমাত্র লক্ষ্য থাকিবে,  
বুদ্ধি সেই স্বার্থের অনুসরণ করিবে, এবং  
বাহুবল বুদ্ধির সহায় ও সেবক হইয়া য-  
থেষ্ট বিচরণ করিতে রহিবে। সে এই  
নিমিত্তই সমাজের একাধিকে সৰ্ব্ববিধ সা-  
মাজিক সম্পদে বঞ্চিত করিয়া গভীরতম  
অন্ধকারে ফেলিয়া রাখিয়াছে;—এবং  
সে এই নিমিত্তই, যাহারা ক্ষতদেহে প্র-  
লেপ, যাহারা রোগে ভুগে, শোকে শা-  
স্ত্রনা, দুঃখে সহানুভূতি, এবং পরার্থ-  
চিত্তায় মূর্তিমতী প্রীতি, আজি সমা-  
জের হৃদয়স্বরূপ সেই অবলাজাতিকে  
কীড়ার পুতুল কি পদসেবার দাসীভাবে  
নিয়োজিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছে।

সমাজের এই অবস্থা কতযুগে পরিব-  
র্তিত হইবে তাহা বলিতে পারি না।  
সমাজে বর্ণিত্ব ও বর্ণনা দিন দিন যেরূপ  
আদর পাইতেছে, কাব্য লোকের যেরূপ  
অগ্রদ্বা জমিতেছে, মুসাম্ময়ী মহাদেনতার  
প্রভাব ও প্রভুত্ব যেরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে,  
এবং পরপীড়নাদি অনুরবাবস্থারে লোকের  
অবজ্ঞার ভাব যেরূপ কমিয়া যাইতেছে,  
তাহাতে লীজ যে কোন মৌলিক পরিব-

র্তন উপস্থিত হইবে এমনও আশা করি  
না। কিন্তু ইহা অকুতোভয়ে নির্দেশ ক-  
রিতে পারি যে, যে দিন মনুষ্য, প্রকৃতির  
কণাঘাতে উদ্বোধিত হইয়া, সামাজিক-যন্ত্র-  
চালনে বুদ্ধিবল ও বাহুবলের সঙ্গে হৃদয়-  
বলেরও আবশ্যিকতা স্বীকার করিবে, স-  
মাজের হরগৌরী সেদিন বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন  
না রহিয়া পরস্পর মিলিত হইবে। আর,  
যেদিন হইতে এই হরগৌরী-সম্মিলনে স-  
মাজের উত্তরার্দ্ধ এক হইয়া, সমাজের স-  
ম্পদ-বর্ধনে ও সন্তাপ-হরণে, সমাজের  
শাসনে ও গঠনে সমানরূপে ত্রীতী র-  
হিবে, সেদিন হইতে মনুষ্যের শোণিত-  
শোষণ অপেক্ষা মনুষ্যের শরীর-পোষণেই  
মানবজাতি অধিকতর মনোযোগ দিবে;—  
বিজ্ঞান সেদিন হইতে হতাকাণ্ডে সহায়তা  
না করিয়া সামাজিক দুঃখ-তার-মোচনেই  
অনুকূলতা করিতে থাকিবে,—বীরের অস্ত্র  
অকারণ প্রযুক্ত না হইয়া অনাথ, অনাগ্র্য ও  
দীন দুর্ব্বলের বল বিধান করিবে;—এবং  
সে দিন হইতে শ্বেত ক্রম্বে তারতম্য, অ-  
বস্থাভেদে ব্যবস্থাভেদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও দা-  
রিদ্র্যাপাণের প্রায়শ্চিত্তে কারাবাস, কা-  
রাগৃহের নরক, এবং স্বজাতির জীৱজ্জির  
জন্য পরজাতির অস্থিচৰ্ম্মণ প্রভৃতি কলঙ্ক  
রাশি পৃথিবী হইতে প্রক্ষালিত হইয়া যাইবে।



## কবির উপহার ।

( প্রাপ্ত )

রাজন্ !

রত্নগর্ভ পূর্ববঙ্গে তুমি ভাগাবান্

হিন্দুকুলে,

পূর্ববঙ্গ সমুজ্জ্বল গৌরবে তোমার ;

যে রূপাণ রূপা করি

অর্পিতা ভারতেশ্বরী

তব করে, অক্ষয় তা থাক তব ঘরে,

সমুজ্জ্বল, পূর্ববঙ্গ আশীর্বাদ করে ।

কালের করাল স্রোতে গিয়াছে ভাসিয়া

অভাগীর,

কত শত কীর্তিস্তম্ভ,—গৌরব-আধার ;

তাঁহে পদ্মা বাম যারে,

কে রক্ষিতে পারে তারে,

পূর্ব-ইতিহাস-কথা কহে ধীরে ধীরে

ভগ্নশীলা, বুড়ি গঙ্গা কীর্তিনাশাভীরে ।

এতদিনে অভাগিনী পুছিয়া নয়ন

সনিশ্বাসে,

যুড়াবে তাপিত প্রাণ, দেখিয়া তোমারে ;

মলিন বদনে আসি,

দেখা দিবে চাক হাসি,

ভগ্নশীলারাশি মাঝে দেখিবে এখন,

তব কীর্তি-স্তম্ভ-শোভা নয়ননন্দন ।

নিম্প্রভ শশাঙ্ক যথা প্রভাকর করে

সমুজ্জ্বল ;

আজি এই আর্ধ্য ভূমে হারয়ে তেমতি,

ব্রিটিশ-তপন-করে,

শোভিতেছে স্তরে স্তরে,

চন্দ্রমিভ সংখ্যাতীত নৃপতি মণ্ডল,

ভারতের স্বর্গবংশ গেছে অন্তাচল ।

আপনি নিম্প্রভ শুবু প্রভাকর করে

শশধর,

শীতল কিরণজালে যুড়ায় সংসার,

তেমতি হৈ নৃপবর,

যুড়াউক নিরন্তর,

আজি হতে বঙ্গভূমি কিরণে তোমার,

হাসুক স্মৃতিতে চির প্রতিবিম্ব তার ।

রচি যথা প্রভাকর ঘনবর-শিরে

ইজ্ঞচাপ,

চাতকিনী তুষা তাহে বাড়ায় বিগুণ,

ব্রিটিশ ভাস্কর আজি,

তোমার ভূষণে সাজি ;—

গুরুভার !—বাড়ায়েছে তুফা বাজালার,

যুড়াইবে তুমি বর্ষি দগ্ধার আসার ।

নয়নাশ্রু,

ঝরে যথা অনিবার, অদৃশ্যে, আধারে,

শোকাতুরা বিহঙ্গিনী,

কাঁদে যথা একাকিনী,

নির্জন কাননে, সেই অরণ্যে রোদিন

করে বেন তব নেত্রে অশ্রু আকর্ষণ।

উঠিয়াছে বঙ্গে যেই ছা অন্ন ছতাশ—

ছাছাকার!—

নাজানি ইহার শেষ হইবে কোথায়,

দরিদ্রতা দাবানলে,

যায় দেশ যায় জ্বলে,

কর এ অনলে দয়া-বারি বরিষণ,

বড় শোভা সমুদ্রের সজল নয়ন।

কম্পতক হোক ওই হৃদয় তোমার,

মহাভাগ!

দিন দিন দীপ্তি তার হউক বর্জিত,

প্রসারি তরঙ্গ বঙ্গে,

জ্ঞানজ্যোতি পূর্ব বঙ্গে;

শান্তি স্থখে পূর্ণ হোক সেই জ্যোতি তল,

লভুক নিরন্তর অন্ন, তৃষাতুরে জল।

দেশের দুর্ভাগ্যে যেন কাঁদে তব মন,

চূপবর!

রত্নপ্রসবিনী বঙ্গ সাগর-সম্ভবা,

হইতেছে দিন, দিন

তনুক্ষীণ, প্রাণহীন,

দিন দিন অধোগতি—ইচ্ছা বিধাতার

সম্মুখে অতল স্পর্শ রয়েছে তাহার!

বঙ্কের কবিতা ওই অনাশ্রিতা লতা,

দীনাহীনা,

পায় যেন চূপবর আশ্রয় তোমার,

দিন দিন পল্লবিতা

হয় যেন রসান্বিতা,

তব যশ পুষ্পে সাজি, কোমল বঙ্গরী,

মোহে যেন বঙ্গবাসী, সৌরভ বিতরি।

তুমি রাজা, পুত্রবর 'রাজেন্দ্র' তোমার,

পূণ্যবান,

মিশিয়াছে তব গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতী;

মিশি পূর্ব বাজালার,

যথা পদ্মা মেঘনার

চলেছে অনন্ত মুখে,—বহুক তেমতি

একস্রোতে তব গৃহে যুগ্ম স্রোতস্বতী।

বঙ্গ ইতিহাস যেন গায় শতমুখে

তবকীর্তি,

সিখে রাখে বঙ্গভাষা অমর অক্ষরে,

বাজালার ঘরে ঘরে,

অমন্ত কালের তরে,

হয় যেন যশোগান—পূরম আদরে,

পুনর্বীর পূর্ববঙ্গ আশীর্বাদ করে। \*

\* এই কবিতাটি যশস্বিগণের অগ্রগণ্য, স্বজ্ঞাতিবৎসল রাজকী কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর তদীয় উপাধিলাভের উৎসব সময়ে উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেশাতুরাগ ও সম্বন্ধময়তা চিরদিনই কাব্যে এইরূপ অভিনন্দিত হইয়া থাকে। (সং)



## সংক্ষিপ্তসমালোচন ।

১ । অদ্ভুত রহস্য । কলিকাতা মিত্র এবং কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত । এই রহস্য সপ্তাহে এক ফর্ম্যা করিয়া বা-  
হির হইতেছে । আমরা এপর্যন্ত ইহার  
যে কয় ফর্ম্যা পাইয়াছি, তাহা সুন্দর বলিয়া  
বোধ হইল । ইহার মুদ্রণকার্য যেরূপ উৎ-  
কৃষ্ট, ইহার লিখনভঙ্গীও সেইরূপ সুন্দর-  
হারিণী । ভাষা সাধারণতঃ প্রাজ্ঞল,  
কিন্তু মধ্যে মধ্যে সমাসের অনুচিত আড়-  
ম্বর ও অনুচিত অনুপ্রাস একটুকু বিরক্তি  
জন্মাইয়া থাকে । শব্দ, রসের পরিপুষ্টির  
জন্য, রসবিধাতের জন্য নহে । এই আ-  
খ্যায়িকার এক স্থানে একজনে বিরহবেদ-  
নায় আকুল হইয়া এইরূপ বিলাপ করিতে-  
ছেন,—“ প্রিয়ে ! কোথায় গেলে । তো-  
মার বিরহ আমার পক্ষে একান্ত অসহ্য  
হইয়া উঠিয়াছে । এত কষ্ট সহ্য করা কে-  
বল তোমারই জন্য । হায় ! আর কি  
তোমার সেই অমল-কমল-বিনিমিত-বদন-  
মণ্ডল দেখিতে পাইব না ! আর কি তো-  
মার সেই কোকিল-কাকলি-সদৃশ কথা শু-  
নিয়া শ্রবণমনের সার্থকতা লাভ করিব না ?  
আর কি তোমার চন্দ্রাননে সেই আসা-  
শোভন মধুরহাস্য দেখিয়া মনন চরিতার্থ  
করিতে পারিব না ? ইত্যাদি—”

আমাদের এরূপ বোধ যে, প্রকৃত দুঃ-  
খের সময়ে আসা ও হাস্য প্রভৃতি রমণীয়

দৃশ্য এবং কোকিলকাকলি ও অমল-কমল-  
বিনিমিত-বদনমণ্ডলের কথা পরিত্যাগ ক-  
রিয়া যাঁহাতে হৃদয়ের বেগ আপনা হইতে  
উছলিয়া উঠে, তাঁদৃশ গভীরভাবে, সরল  
ভাবায় পরিব্যক্ত করাই কবিসম্মত ।

অদ্ভুত রহস্যে ঘটনার কিরূপ বৈচিত্র্য  
আছে, তাহা বলা অনাবশ্যক । কারণ,  
গ্রন্থকার আপনিই স্বীকার করিয়াছেন যে  
ইহা “ কোন সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী গ্রন্থের  
উপাখ্যায়নভাগ অবলম্বনে বিরচিত ” হই-  
য়াছে । কিন্তু একথা বলা নিতান্তই আ-  
বশ্যক যে, তিনি অল্পদীর কল্পনার সাহায্য  
গ্রহণ করিয়া থাকিলেও চিত্রনৈপুণ্যে নি-  
ন্দনীয় ছন নাই । তাঁহার অনুকৃতি আ-  
দরযোগ্য । এই রহস্য বিরতির অবশিষ্ট  
অংশ কেমন হয়, তাহা দেখিবার জন্য আ-  
মরা উৎসুক রহিলাম ।

২ । গুপ্তলিপি । কলিকাতা কর  
প্রেস হইতে শ্রীযত্ননাথ মণ্ডল দ্বারা প্রকা-  
শিত ।—গুপ্তলিপি পুরাতন গুপ্তকথারই  
পুনঃসংস্করণ মাত্র । ইহার ঋচি আমাদি-  
গের মিকট নিতান্ত বিকৃত বোধ হইল ।  
উপন্যাসের লেখা ইদানীং যেরূপ হইয়া  
থাকে, ইহার লেখা সেইরূপ সরস ।  
কৌতুহলের উদ্দীপন হয় ইহাতে সেইরূপ  
কাহিনীও অনেক আছে । কিন্তু এক বি-  
কৃতকটির পরিচয়েই আমরা ইহার প্রকাশ-

ককে ধন্যবাদ দিতে অক্ষম হইলাম। তবে, এই যে কচিগত দোষের উল্লেখ করিলাম, ইহাতে আমরা স্বয়ং ধন্যবাদের যোগ্য হইয়াছি। কারণ, দেখিতেছি যে গ্রন্থের এইরূপ সমালোচনা হয়, ত্রময়প্রকৃতি পাঠকবর্গ সেই গ্রন্থের প্রতিই মুকিয়া পড়েন;—যেন তাহাতে কি মধু আছে, এইরূপ মনে করিয়া অনেকেই একবার তাহার স্বাদ লইতে ইচ্ছা করেন।

৩। পদ্যরঞ্জিনী। প্রথমভাগ। জী-প্রসন্নকুমার সেন কর্তৃক বিরচিত। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন যে, তিনি ‘এই ক্ষুদ্রপদ্যময় গ্রন্থখানা শিশুগণের উপকার সাধন মানসে বহু যত্ন ও পরিশ্রমে রচনা’ করিয়াছেন, ‘কিন্তু আশানুরূপ ফলনাভে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা বলিতে’ পারেন না। আমরা তাহা বলিতে পারি। আমরা বলিতে পারি যে তিনি কৃতকার্য হন নাই। শিশুদিগের জন্য কিরূপ কবিতা লিখিতে হয়, তাহা তিনি জ্ঞানেন না; এবং দূর্ভাগ্যের বিষয় এই, বাঁহারা সকল কার্য পরিত্যাগ করিয়া ইদানীং কেবলই শিশুদিগের জন্য পদ্য লিখিতেছেন, তাঁহাদিগের অনেকেই তাহা জ্ঞানেন না। ইহাতে কাল ও অনুতাপ ইত্যাদি শিরোনাম দিয়া যে সকল কবিতা লিখিত হইয়াছে, সেগুলি কোন্ অগৌরব শিশুর জন্ত উপযুক্ত হইবে, তাহা আমরা দিগের বুঝির অগম্য। এই পুস্তক খানির মধ্যে আমরা যে কয়টি পংক্তির

প্রশংসা করিতে পারিয়াছি নিম্নে তাহার একটি তুলিয়া দিলাম।

“হলে স্বার্থ সিদ্ধি করা খেলের স্বভাব।”

কবিদিগের সহিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের যে বিরোধ আছে, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু বোধ হয়, কর্তৃপদে আর ক্রিয়া পদে অময় রক্ষা করা তাঁহাদিগের নিত্যন্ত নিন্দাজনক না হইতে পারে। পদ্যরঞ্জিনীর রচয়িতা ঐরূপ নিন্দা ভয়ে ভীত। পাছে তাঁহার কবিত্তে কেহ সংশয় করে, এই আশঙ্কায় তিনি অনেকস্থলেই কর্তৃপদে এবং ক্রিয়াপদে অময় রাখেন নাই।

৪। পদ্যবিকাশ। জীপ্রতাপচন্দ্র বসু। বিরচিত। এখানি শিশুশিক্ষার জন্য রচিত হয় নাই, ইহার এই এক গুণ, ইহার আর এক গুণ এই যে, ইহার রচয়িতার সহিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের অহি-নকুল-সম্বন্ধ নহে। আমরা ইহার কোম কোম কবিতা পড়িয়া মুখী হইয়াছি। কিন্তু গ্রন্থকারকে আমরা একটি কথা স্মরণ রাখিতে বলিব। তাঁহার অন্তরে ইহা যেন দৃঢ় অঙ্কিত থাকে যে, ছন্দোবদ্ধ কথা আর কবিতা এক পদার্থ নহে। যুদ্ধবোধের স্তত্রগুলি ছন্দোনিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কেহ তৎসমুদয়কে কবিতা বলে না, এবং গদ্যধর ভট্টাচার্য্যের চৌনটী টীকাকে ছন্দের কোমলবন্ধনে বদ্ধ করিলে তাহাকেও কেহ, ‘অসুমানখণ্ড কাব্য’ কহিবে না। কাব্যের প্রাণ, আর কাব্যের মূলস্থান মনুষ্যের হৃদয়। যে কথা হৃদয়ে হইতে বাহির না হয়, তাহা অশেষ

শব্দালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেও কবিতা নহে।  
পদ্যাবিকাশে যে কবিতা নাই তাহা যিশ্বের  
পংক্তি কয়টি পাঠ করিলেই বিদিত হইবে।

“বিবাদ বারতা কহিব কার,  
কলুব অনলে দহিছে কার;  
ধরম করমে তুলিয়ে যত,  
বিভব সঞ্চয়ে হইমু রত।  
সুখদ-ধরম-রতন তুলি,  
লইমু পাপের পদের ধূলি।”

অন্তর্দ্বিহ ও উদ্বোধিত বিবেকের ভাষা  
এরূপ নহে। যে সকল কবিতার পাপের  
রুশিক দংশন এবং মনের হাহতোন্মিতাব  
বর্ণিত হইয়াছে, বোধ হয় মুকুমারমতি প্রা-  
মুকার এখন পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করেন  
নাই; এবং আমরা তরসা করি তিনি ক-  
খনও তাহা অনুভব করেন নাই।

৫। চক্রদত্ত অর্থাৎ মহামতি চক্রাণি  
দত্ত প্রণীত মুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসা সংগ্রহ;  
তত্ত্বচন্দ্রিকা নামক টীকা ও বঙ্গানুবাদ স-  
হিত। ত্রিকালীপ্রসন্ন সেন কবিরাজ কর্তৃক  
সংশোধিত ও প্রকাশিত। বাবু কালীপ্র-  
সন্ন সেন যে কার্যের আরম্ভ করিয়াছেন,  
যদি তাহা সমাপিত হয়, তবে তিনি ব-  
ঙ্কীয় চিকিৎসকসমাজের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা  
ভাজন হইবেন। প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র  
আজ্ঞর বিরহে বিনষ্ট প্রায় হইয়াছে। অত-  
ন্তরি যে শাস্ত্রের অঙ্কুর রোপণ করিয়াছি-  
লেন, যে শাস্ত্র মুগ্ধত বাতট প্রভৃতি রস-  
স্বিবর্ণের উপদেশ বারিতে পরিবর্তিত এবং

চক্রদত্ত প্রভৃতি চিকিৎসা-বিদ্যাবিশারদ প-  
ণ্ডিতবর্গের উৎসাহ ও অধ্যবসারে পল্লবিত  
হইয়াছিল,—আজি রামচরণ শীল ও গুণ-  
চরণ শীল প্রভৃতি ‘কবিরাজবর্গের’ কুরমার  
বুদ্ধিতে সেই শাস্ত্র ভুতলে ধও ধও হইয়া  
পড়িয়াছে, এবং বাহ্যার ইচ্ছা সেই উহাকে  
পাদতলে দলন করিতেছে। কবিরাজ ও  
চিকিৎসক হইতে আমাদের দেশে এই-  
ক্ষণ এক মাস কালও অধ্যয়ন করিতে হয়  
না; ঔষধ সংগ্রহের জন্য একটি কপর্দকও  
ব্যয় করিতে হয় না; ঔষধের পরিচয়  
লাভের জন্য কাহারও নিকট কিছুই শিক্ষা  
করা আবশ্যিক হয় না; এবং তেমন উৎকট  
ব্যাধির লক্ষণ নিরূপণ করিতে হইলেও  
ক্ষণকাল ভাবিতে হয় না। কারণ চিকিৎ-  
সকেরা এইক্ষণ গুণশীলসম্পন্ন এবং চি-  
কিৎসকেরা এইক্ষণ কবিরাজ! অমেকে  
নৈষধের দুই একটি শ্লোক আনুষ্ঠান করিয়াই  
চিকিৎসক হন। অমেকে চিকিৎসক হ-  
ইবার জন্য একটি পুঁটলিমাাত্র সংগ্রহ  
করেন। এমন অবস্থায়ও যে আয়ুর্বেদশাস্ত্র  
মৃতপ্রায় হইয়াও পৃথিবীতে জীবিত আছে,  
ইহা আয়ুর্বেদের সামান্য মহিমা নহে।

বাহ্যার আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে শিক্ষিত হ-  
ইতে চাহিলে, এই ধণ্ডাঃ প্রকাশ্য মাসিক  
পুস্তকে তাঁহাদিগের প্রভূত উপকার হ-  
ইবে। ইহার অনুবাদভাগ এরূপ সরল  
হইয়াছে যে, অধ্যাপনা বিনাও বাহ্যার  
অমেক কথা বুঝিতে সমর্থ হইবেন।

## আবুল ফজল।

যাঁহার লেখনী-প্রভাবে মহারাজ তোদড়মলের অলৌকিক রাজনীতিজ্ঞতা; রাজা মানসিংহ, জয়সিংহ, ভগবান দাস ও বীরবল প্রভৃতি বিখ্যাতনামা সেনানো-দিগের বীরত্ব এবং সর্কোপরি রাজাধি-রাজ আকবর সাহের দিগন্তব্যাপিনী কীৰ্ত্তি অবগত হইতে আমরা সক্ষম হইয়াছি; যিনি স্বকাল-প্রচলিত আচার, ব্যবহার, শাসন প্রভৃতি দর্পণের ন্যায় চিত্র করিয়া-ছেন; যিনি একাধারে বিদ্যা, বুদ্ধ, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সৈনিকনৈপুণ্য প্রভৃতি বস্তুগুলোর সমাবেশ প্রদর্শন করিয়াছেন; তাঁহার জীবনকৃত্য অন্তিসংক্ষিপ্ত হইলেও সাধারণের জ্ঞাপ্রদ হইবে এইরূপ আশা করা অসম্ভব নহে।—

সিদ্ধুদেশে সেখ খিজির নামে এক জন মুন্নি বাস করিতেন, তিনি কোন কা-র্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন পূর্বক নাগর নগরে বাস করেন, এই স্থানে সেখ মবারিক নামে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। মবারিক আরব্য ও পারস্য ভাষাতে এক জন অতি প্রসিদ্ধ মৌলবি ছিলেন। স-মগ্র মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন অধ্যয়ন করিতে, তাঁহার ধর্মমতের এত পরিবর্তন ঘটে যে, কেহ তাঁহাকে কফের, কেহ বা নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিল।

তিনি অচিরেই মুন্নি মত পরিভাগ পূর্বক সিয়া হইলেন; এবং আগরা নগরীতে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন পূর্বক দর্শন-শাস্ত্রের শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ত-দীয় বিপাকেরা তখন তাঁহার প্রতি এত নিগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তিনি বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া মপরিবারে আগরা হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। এই মবারিকের কয়েকটি পুত্র ছিল, ইহার। প্রায় সকলেই গুণবান ও কৃতী। কিন্তু স-র্বজ্যোষ্ঠ ফারাজি ও তদনুজ আবুল ফজলই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

১৫৫১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি তা-রিখে নাগর নগরে আবুল ফজলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা মবারিক স্বয়ং এই পুত্রদ্বয়ের শিক্ষা দেন। বাল্যকালাবধিই তিনি নিবিড়চিত্ত ও অধ্যবসায়ী ছাত্র ব-লিয়া বিখ্যাত। বিংশতিবর্ষ বয়সক্রমের পূর্বেই আরব্য ও পারস্য ভাষাতে তাঁহার এরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, তাঁহাকে লোকে “সেখ আবুল ফজল এলেমি” \* বলিয়া ডাকিত।

\* সংস্কৃতে যেরূপ “বিদ্যাসাগর,” “বিদ্যাবাগীশ” খ্যাতি, পারস্য ভাষায় “এলেমি” তদ্রূপ। “এলেম” শব্দের অর্থ বিদ্যা।

ফায়জি কেবল আরব্য ও পারস্য ভাষায় যে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এরূপ নহে; তিনি এক জন প্রগাঢ় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আকবর সাহেবের অনুরোধে ইনি সংস্কৃতভাষা অধ্যয়ন করেন; ভাষ্করাচার্যের বীজগণিত ও লীলাবতী, এবং মহাভারতাস্ত্যগত নলোপাখ্যান স্বয়ং অনুবাদ করেন; এবং বেদ, মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদে অপরাপর পণ্ডিতদিগকে স্কাহাষ্য করেন। তিনি নিজেও এক জন প্রধান কবি ছিলেন, এবং পারস্য ভাষায় তৎপ্রণীত অনেক কাব্য অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে আকবর সাহা যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন ফায়জির কবিতা-কুসুমের সৌরভে অমোদিত হইয়া, তাঁহাকে “রাজকবির” পদ প্রদান করেন। ইহার ছয় বৎসর পরে অর্থাৎ ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে ফায়জির অনুরোধে আবুলফজল সম্রাটের সভায় আহৃত হন। ভ্রাতৃত্ব কিছদিনের মধ্যেই সম্রাটের প্রিয় সহচর ও হৃদয়বন্ধু হইয়া উঠিলেন। আকবর সাহেবের পৌত্তলিক ধর্মে অবিশ্বাস ও নৃতনধর্মমতের আবিষ্কার আপনা হইতেই হইয়াছিল। কিন্তু এই সহোদরদ্বয়ের সহিত আলাপ ও তর্কবিতর্ক করাত্তে নবাবিকৃত মত বদ্ধমূল হয়। তদীয় বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি গুণও ইহাদের পরামর্শেই বিকসিত হয়। আকবর ইহাদের সহিত যে কেবল ধর্ম ও বিদ্যা বিষয়েই পরামর্শ করিতেন, এমন নহে। কিন্তু কোন রূপ

জৈনিক উৎকট প্রেমের উত্থাপন হইলেই ইহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন; এবং শাসন সম্বন্ধীয় গুরুতর অনেক কার্যের ভার ইহাদের উপর অর্পণ করিতেন।

দাক্ষিণাত্য আক্রমণের পূর্বে তত্রতা স্থপতিস্বল্পের সমীপে দূতস্বরূপ ফায়জি তথায় প্রেরিত হন। আবুলফজল সম্রাটের নিকট থাকিয়া দিন দিন উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে “চাহান্ন হাজারি মুনসুবদার” (অর্থাৎ চারি সহস্র পতাতকের অধ্যক্ষ), ও প্রধান সচিবের পদে আরূঢ় হন। আবুলফজলের প্রতি সম্রাটের অচল বিশ্বাস ছিল। তিনিও অমাত্রাও সৈনিকের কার্য অত্যন্ত দক্ষতার সহিত নির্বাহ করিতেন। প্রভুর কার্য সম্পাদনে তাঁহার এতদূর আগ্রহ ছিল যে, ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে যখন জইনখাঁ ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত পারাক্রান্ত ইউসফজি জাতির বিপক্ষে প্রেরিত হন, তখন রাজা বীরবল ও আবুলফজল উভয়েই তদীয় সহকারী হইতে প্রার্থী হন। এবং উভয়ের মধ্যে কে নিযুক্ত হইবেন এই তর্কের মীমাংসা জ্ঞাত স্মৃতি খেলা হয়, তাহাতে বীরবলই নির্বাচিত হন। তখন প্রভুর কার্য করিয়ান্নশোভাজন হইতে পারিলেন না বলিয়া আবুলফজলের ক্ষোভের পরিসীমা রহিলনা।

পাকিস্তানের তাঁহার উপর আকবর সাহেবেরও কতক বিশ্বাস ছিল, তাহার ও এই একটি উদাহরণ দেখিয়া যাইতেছে। দা-

ক্ষিণাতোর আমির গণের সহিত সত্ৰাটের বিবাদ চলিতেছিল। তাহাদিগের প্রথম-নার্থ যুবরাজ মুরাদ প্রেরিত হইয়াছিলেন। কথাছিল যে আকার পঞ্জাব হইতে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে যাত্রা করিলে, পথি মধ্যে যুবরাজেরা তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন; কিন্তু তাঁহাদিগের বিলম্ব দেখিয়া সত্ৰাটের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল; এবং যুবরাজ মুরাদকে দাক্ষিণাত্যে না রাখিয়া আবুলফজলকে তথায় রাখিবেন এই সঙ্কল্প করিয়া, তাঁহাকে কহিলেন “যদি আমিরেরা মিত্রভাবে স্বদেশ-শাসন-ভার আপনাদিগের হস্তে গ্রহণ করে, তবে যুবরাজ মুরাদের সহিত তুমি রাজধানীতে চলিয়া আসিবে; অতথা যুবরাজকে রাজধানী প্রেরণপূর্বক তুমি তথায় থাকিবা।” স্বীয় পুত্র অপেক্ষা একজন কর্মচারীর প্রতি অধিকতর বিশ্বাস কি সামান্য কথা?

আমরা এ বিষয়ের আর একটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সেখ ফরিদ, আবুলফজল প্রভৃতি চারিজন সেনানীর প্রতি আসির দুর্গ আক্রমণ করবার অনুমতি হয়। কিন্তু শত্রুপক্ষীয়দিগের সৈন্যসংখ্যা ইহাদের সৈন্য অপেক্ষা অনেকগুণ অধিক ছিল বলিয়া, প্রধান সেনাপতি সহসা দুর্গ আক্রমণে বিরত থাকিয়া, আসির দুর্গের তিনক্রোশ দূরে শিরিব সংস্থাপন পূর্বক সুর্যোগ অবশেষে রহিলেন। দুই লোকে সত্ৰাটকে

বুঝাইয়া দিল (ইহাদের মধ্যে কুমার সলিমও ছিলেন) যে সেনানী চতুর্দশ কোন হরতিসন্ধিতে একত্র করিতেছেন। সত্ৰাট এই কথায় ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া প্রধান সেনাপতি সেখ ফরিদকে ভৎসনা পূর্বক দুর্গ আক্রমণ করিতে লিখিলেন। তখন আবুল ফজল সত্ৰাট সমীপে উপনীত হইয়া সমস্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া সত্ৰাটের ক্রোধ একেবারে বিদূরিত হইল, এবং আবুল ফজলের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্টি হইয়া তাঁহাকে সেই দিনই খান্দেশের শাসনকর্তা রূপে নিযুক্ত করিলেন। সেখ নবাব আবুল ফজলের পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তদীয় আমিরির একটি উদাহরণ দিলেই, পাঠক তাঁহার ঐশ্বর্য্যের কথঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারিবেন। “ম-রাসিরলুওমরা” প্রণেতা কহেন “তিনি অপরিপাক্ত আহাৰ করিতেন। প্রতিদিন সূপ ও জলবাদে ২২ সের বস্ত্র ভক্ষণ করিতেন। আহাৰের সময় তদীয় তনয় আবদার রহমান ‘সফরচি’ স্বরূপ নিকটে বসিয়া থাকিতেন, এবং প্রধান ‘বাবুরচি’ ও তথায় উপস্থিত থাকিত। যদি আবুল ফজল কোন ব্যঞ্জন দুইবার আশ্বাদ লইতেন, তবে পরদিনও ঐ ব্যঞ্জন পাক হইত। কোন ব্যঞ্জন ভাল না হইলে তিনি আবদার রহমানকে আশ্বাদ লইতে পাত্রটি তাঁহার সম্মুখে দিতেন, তিনি উহার তার লইয়া প্রধান বাবুরচিকে দিতেন, কিন্তু

কোন কথাবার্তা হইত না। আবুল ফজল যখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, তখন তাঁহার এতদূর ভোজনবিলাসিতা ছিল, যে তাহা শুনিলে সহসা বিশ্বাস করা যায় না। একটি প্রকাণ্ড স্বক্কাবারে সহস্র প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রত্যহ আমিরদিগকে বিতরণ করা হইত। তাহার নিকটবর্তী অপর শিবিরে অনাহৃত ও রবাহৃত প্রভৃতিকে খাদ্য দান করিতেম। সমস্ত দিনই খিচরি পাক হইত; এবং বাহার ইচ্ছা সেই খাইত।”

১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কোন গুট মন্ত্রণা করিবার জন্য আকবর সাহা প্রিয়-সচিব আবুল ফজলকে দাক্ষিণাত্যে হইতে সত্তর আগরা নগরীতে উপস্থিত হইবার আদেশ করেন। আবুল ফজল তৎক্ষণাৎ আগরাভিমুখে যাত্রা করেন, এবং পথি মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের অন্যতর রাজা নরসিংহ দেবের বড় স্বজ্ঞে তাঁহার প্রাণনাশ হয়। যুবরাজ সলিমের মন্ত্রণায়ই নরসিংহদেব এই নৃশংস কর্ত্তে রুতী হন। “ওয়াকতে আসদ্বেগ” \* নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে “সেখ মবারকের পুত্র নবাব সেখ আবুল ফজলের আবুলফাল যখন পূর্ণ হইয়া আসিল, তখন সিরঙ্গ প্রদেশের অন্তর্গত সরাইবরার নামক স্থানে ১০১০ হিজরী শাকের রবিয়ল আওয়াল মাসের সপ্তম তারিখ শু-

\* ইহার অপর নাম ‘হালতে আসদ্বেগ’।

ক্রবার সেই বিখ্যাতনামা জ্ঞানীপ্রধান ব্যক্তি আততায়ীর হস্তে প্রাণত্যাগ করেন।” “সেই বিদ্বান্ শ্রেষ্ঠ যখন সিরঙ্গ নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন তদ্দেশের শাসনকর্ত্তা গোপালদাস কহিল ‘আপনার সমভিব্যাহারী সৈন্যেরা পরিক্রান্ত ও পীড়িত, অতএব তাহাদিগকে ইঙ্গরাজী বোন্দেলার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসদ্বেগের অধীনে রাখিয়া আমার প্রদত্ত সৈন্য লইয়া আগরা গমন করুন।’ গোপাল দাসের সৈন্য সংখ্যা ৩০০ শত ছিল, তাহার সকলকেই রাজপুত জাতীয় হীন লোক, এবং সকলেই নূতন শিক্ষিত। পরন্তু এই সময়ে নরসিংহদেব দাক্ষিণাত্যে দম্বাতা করিতেছিল; আমরা প্রত্যহ আবুল খাঁর নিকট হইতে তাহার সংবাদ পাইতাম। এরূপ অবস্থায় অশিক্ষিত, অপরীক্ষিত সৈন্য সমভিব্যাহারে একাকী যাওয়া কর্তব্য নহে। ইত্যাদি নানারূপ বাক্যে তাঁহাকে নিরত্ন করিতে আমরা যত্ন করিলাম, কিন্তু তিনি তৎসমুদয় অগ্রাহ্য করিয়া অস্বারোহণে গমন করিলেন। আমি সঙ্গে যাঁইতে প্রস্তুত হইলাম; তাহাতে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া আমাকে নিরত্ন হইতে কহিলেন। আমি অগত্যা বিরত হইলাম।” পরিশেষে কিরূপে একজন নীচাশয় রাজপুত-হস্তে আবুল ফজলের প্রাণনাশ হয়, তাহার বিস্তারিত বর্ণন আছে। অনাবশ্যক বোধে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া উদীর

চরিত্র ও রচনা প্রণালীর সমালোচনার-  
প্ররত্ত হইলাম।

এলকিনিস্টোন সাহেব একস্থানে লি-  
খিয়াছেন, “এই সময়ে (আকবর সাহেব  
সময়ে) ই আবুল ফজলের নৈসর্গিক গুণা-  
বলীর বিকাশ প্রাপ্ত হয়; এবং এই স-  
ময়েই তদীয় চরিত্রের দোষ-নিচয়ও প্রকা-  
শিত হয়। যে কোন কার্যে আকবরের  
দয়া, জ্ঞান, কিংবা সাধারণের অভাব প্র-  
কাশ পাইবার সম্ভাবনা, আবুল ফজল  
হয়ত তৎসম্বন্ধে নির্দীক, অথবা তৎস্থানে  
সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। যে স্থানে  
পড়, তাহাতেই কেবল আকবরের প্র-  
শংসা; সুতরাং লেখক ও তদীয় মায়কের  
চরিত্রে পাঠকের বৈরক্তি উৎপাদন করে।  
এই অযুক্তি চাটুর্বাদে আকবরের যথার্থ  
চরিত্র প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তবে  
তদীয় কার্যকলাপের উদ্দেশ্য, তদীয় বি-  
পদরাশি এবং কি কি উপায়ে তাহা  
অতিক্রম করিতে তিনি সক্ষম হইয়াছি-  
লেন, এ সকল কথা আমরা অন্যান্য গ্রন্থ  
হইতে অবগত হই।” অপর একস্থানে ক-  
ছেন “প্রিয় পাত্র এবং অভিভাবকদিগকে  
চাটুকারের ন্যায় অহৃতব্যাকো প্রশংসা  
করা, এবং যে কার্য বিশেষ দোষা-  
বহ মছে, দোষস্পর্শভয়ে তাহাও সত্যের-  
বিকছে বর্ণনা করা যে আবুল ফজলের  
অভ্যাগ, ‘আকবরনামা’ পাঠকালে পাঠ-  
ককে এ বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে। তদীয়  
আখ্যান ঐচ্ছিক বিহীন; নকাক্ষরপূর্ণ ও

অপরিস্ফুট; স্থানে স্থানে সামান্য চিত্তা-  
শক্তির আভাস আছে; এবং স্থানে স্থানে  
নীতিও আছে। কিন্তু উপসংহারে প্রায়ই  
অভিভাবকের প্রশংসা আছে।” পরন্তু  
অপরস্থানে “আবুলফজল আকবরের  
প্রসিদ্ধ ও প্রিয় সচিব ছিলেন। তদীয় মত  
উদারতাপূর্ণ ও বুদ্ধিশক্তি অপরিমিত।  
কিন্তু তিনি একজন আলঙ্কারিক; এবং  
যে রূপ রচনা ভারতে আদৃত, তদীয় রচনা  
তদ্রূপ অস্বাভাবিক রচনার আদর্শ।  
তিনি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং রাজ্যার  
ও রাজ্য সচিবদিগের গুণের ব্যাখ্যা,  
দোষের গোপন, এবং তাঁহাদিগের মহিমা  
কীর্তন করা তাঁহার স্বার্থ।”

এলকিনিস্টোন খাস বিলাতি সাহেব;  
তিনি বিলাতি কচিকে আদর্শ করিয়া,  
উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভ্যতাকে  
আদর্শ করিয়া, এবং মেজর প্রাইসের  
সংক্ষিপ্ত অনুবাদিত আকবর নামা সম্মুখে  
রাখিয়া, আবুলফজলের এত দোষ কীর্তন  
করিয়াছেন। সুতরাং এ স্থলে বলা অনাব-  
শ্যক যে তিনি বিষয় ভ্রমে পতিত হইয়া-  
ছেন। হৃপতি ও অন্নদাতার গুণানুবাদ  
এবং মুক্তদের গুণকীর্তন এ দেশী শাস্ত্র  
সম্মত, এবং রীতি সম্মত; সুতরাং তাহাতে  
তাঁহাকে পক্ষপাতী বা চাটুকার বলা যার  
পর নাই বিবেচিত। এলকিনিস্টোন যে  
ধলেন, আবুলফজল জাতসারে সত্যের  
অপলাপ করিয়াছেন; ইহাও তাঁহার ন্যায়  
ঐতিহাসিকের উপযুক্ত হয় নাই। অনুবাদ



দেখিয়া মূলগ্রন্থের সমালোচন ও তৎগ্রন্থ-  
কারের চরিত্রের উপর মতামত প্রকাশ  
করাই অনায়া। তাহাতে আবার সে অনু-  
বাদ মূলগ্রন্থের নহে, তাহার সংক্ষিপ্ত-  
সারের। ঐ হারা মূলগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া-  
ছেন, এবং ঐ হাদিগের মতামত পারস্য  
ভাষা সম্বন্ধে বেদ বাক্য বলিলেও বলা  
যাইতে পারে; দেখা যাউক, তাঁহার  
এ বিষয়ে কি বলিয়াছেন ?

আকবর নামার চরমভাগের রচয়িতা  
ইনাএতউল্লা কহেন “সেখ আবুলফজল  
যে রাজ-গৌরব-বেশে সজ্জিত ছিলেন,  
সে পরিচ্ছদ প্রগাঢ় ও আন্তরিক রাজ-  
ভক্তিরূপ কাককার্ষ্যে ভূষিত ছিল।” এল-  
ফিনিফোনের মতে এই রাজ-ভক্তির নাম  
পক্ষপাত ও চাটুকারিতা। ইনাএতউল্লা  
কহেন, “বীরসিংহ \* দেবের দুরভিসন্ধি  
সন্দেহ করিয়া, আবুলফজলের সহচরেরা  
যখন তাঁহাকে কহিলেন ‘এ স্থান হইতে  
ক্রোশান্তর স্থিত অন্তরিনগরে রায়রায়ান ও  
রাজা রায়সিংহ দুই সহস্র অশ্বরোহী লইয়া  
অবস্থিতি করিতেছেন, আপনি তাঁহাদিগের  
আশ্রয় গ্রহণ ককন, নতুবা প্রাণ নাশের  
বিচিত্র নাই।’ কিন্তু আবুলফজল সদর্পে  
কহিলেন ‘মৃত্যুভয় নিরর্থক, কারণ নিয়-  
তির অন্যথা কেহই করিতে সক্ষম নহে।  
আমি একজন দরবেশের পুত্র ছিলাম,  
শ্রী শৌর্য্য বীর্য্য এখন প্রধান আমির

\* আসদ ও অপরাপর গ্রন্থকারের  
মতে ইহার নাম নরসিংহ।

হইয়াছি। কেমন করিয়া নীচলোকের ন্যায়  
আমি অপরের আশ্রয় গ্রহণ করিব?’”  
এই উক্তিতে আবুলফজলের দুইটি মহৎগুণ  
দেখা যাইতেছে। প্রথমতঃ তিনি ধনী মানী  
হইয়াও মতের অনুরোধে পুরুষের দরিদ্র-  
বহুর উল্লেখ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।  
দ্বিতীয়তঃ অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করাকে  
তিনি আত্মবমাননা মনে করিতেন।  
এখন আমরা পাঠককে জিজ্ঞাসা করি,  
যিনি আপন দরিদ্রতা প্রকাশে লজ্জিত  
নন, তিনি কি অপরের দোষ সত্ত্বেও  
তাহা গোপন করিয়া মিথ্যা প্রশংসাবাদ  
করিবার ব্যক্তি? এবং যিনি তেজস্বিতা  
প্রভাবে মৃত্যুকেও ভয় করিলেন না, তিনি  
কি চাটুকার হইতে পারেন?

“মাসিরাল ওমরা” প্রণেতা আবুল  
ফজলের রচনা বিষয়ে এইরূপ সাক্ষ্য দিয়া-  
ছেন। “লেখক শ্রেণীতে আবুলফজল অ-  
দ্বিতীয়। তদীর রচনা প্রণালী উচ্চ শ্রে-  
ণির। অপরাপর মুন্সির যেনন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
সৌন্দর্য্য প্রকাশে এবং শ্রেণী বিশেষের  
বোধগম্য শব্দ প্রয়োগে ব্যস্ত, তিনি উজ্জপ  
হিসেন না। শব্দকলাপের ওজস্বিতা,  
বাক্য রচনার চাতুর্য্য, সমাসাদি প্রয়োগের  
উপযোগিতা, এবং বাক্য-সমাপ্তির সৌ-  
ষ্ঠব্য, তাঁহার লেখাতে এত যে, অপরের  
তাহা অনুকরণ করিবার সামর্থ্য নাই।”

ইলিয়ট সাহেবরূক্ত ভারতেতিহাসের  
সম্পাদক ভট্ট জম ডাওসন কহেন “আমি  
সমগ্র আকবর নামা স্বক্কাগুহকরণে প-

রীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহার অনেক অংশ অনুবাদও করিয়াছি, তাহাতে এলফিনিফটোনের মতে কখনও সাং দিতে পারি না। সত্য বটে আবুলফজল কোন কোন স্থলে আকবর সাহকে অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু আকবরের প্রতি অতিভক্তিই তাহার কারণ। ততৎ স্থান ভিন্ন যে সকল অভুক্তি আছে, তাহা আবুলফজলের অলঙ্কার-প্রিয়তার ফল, চাটুবাদেয় ফল নহে। তদীয় রচনা প্রণালীর বিচার করিবার সময়ে ইয়োৰোপীয় উন্নত ইতিহাসের সহিত তাহার তুলনা করা অনুচিত; তিনি যেদেশের লেখক, তদদেশীয় অপরাপর লেখকের সহিত তাঁহার তুলনা করাষ্ট একমাত্র ন্যায় সঙ্গত।”

প্রসিদ্ধ পারস্য ভাষাবিদ ত্রিযুক্ত বুকম্যান সাহেব স্বীয় অনুবাদিত আইন আকবরীর উপক্রমণিকায় কহিয়াছেন— “ইয়োৰোপীয় পাণ্ডিতেরা আবুলফজলকে চাটুকার ও মতোর অপলাপকারী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। একবার নিবিস্টচিত্তে ‘আকবরনামা’ অধ্যয়ন করিলেই প্রতিপন্ন হইবে যে, এরূপ নিন্দাবাদ যারপার নাই অমূলক। ঐ দেশস্থ অপরাপর ইতিহাসের সহিত ইহার তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, তিনি অপরের অপেক্ষা কম প্রশংসা করিয়াছেন, এবং যতটুকু প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাতেও স্বকৃতি ও আত্মগৌরব বিকল্প কিছুই নাই; এ বিষয়ে ভারতবর্ষের

অন্যান্য ঐতিহাসিক ও কবি অধিকতর দোষী। দেশীয় কোন লেখকই তাঁহাকে চাটুকার বলেন নাই। আবার আমরা একথা যখন মনে করি, যে রাজার মত অন্যায় কি ন্যায়ানুমোদিত হইক, এ দেশের সমস্ত নীতি ও ধর্মশাস্ত্রমতে তাহার প্রজার অনুমোদন করা কর্তব্য; পরন্তু এদেশীয় কাব্য মত্রেই যখন জঘন্য অতুক্তি রহিয়াছে; তখন আকবরের ন্যায় ন্যায়কের প্রশংসা জন্য আবুলফজলকে কোনও দোষ দেওয়া যায়না।”

দোবশূন্য লোক নাই; স্মরণ্য আবুলফজলও যে দোষগুণ সমন্বিত তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তদীয় গুণের ভাগ এত অধিক যে, ‘এলফিনিফটোনও স্থানে স্থানে তাঁহাকে অদ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই। ড্রাইডেন একস্থানে কহিয়াছেন— ‘দোষ ভাসে তৃণসম জলের উপরে।

গুণরত্ন সাগরের গরভে বিচরে।’ তাই বলিয়াই আকবরনামার প্রাইসকৃত ইংরেজী অনুবাদ দৃষ্টে এলফিনিফটোনের চক্ষে অধিকাংশ দোষই পতিত হইয়াছে। মূলগ্রন্থরূপ রত্নাকরগড়ে অবতরণ করিতে অক্ষম বশতঃ গুণ তত দেখিতে পান নাই।

“মাসিরালওমরা” প্রণেতা আবুলফজলের ধর্মমত প্রভৃতির বিষয় এইরূপ লিখিয়াছেন। “কেহ কেহ আবুলফজলকে বিদ্যার্থী, কেহ হিন্দু, কেহ অগ্নি-উপাসক, এবং কেহ নাস্তিক বলিয়াছেন। ফলতঃ

তিনি 'মুফি' ধর্মাক্রান্ত ছিলেন, এবং অপরাপর মুফির ন্যায় আপনাকে মহামুদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেন। তিনি যে অতি উন্নত প্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং সকলের সহিতই সৌখ্যভাবে বাস করিতে যে তাঁহার আস্তরিক ইচ্ছা ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি কখনও অন্যায় বাক্য মুখে আনিতেন না। উৎকোচ গ্রহণ, বেতন প্রদান না করা, অর্থদণ্ড করা প্রভৃতি তাঁহার পরিবার ও ভৃত্যবর্গ মধ্যে ছিল না। তিনি একবার কাহাকে কোন কর্ণে নিযুক্ত করিলে, সে অকর্ণ্য হইলেও তাহাকে পদচ্যুত করিতেন না। তিনি কহিতেন 'অকর্ণ্য ভৃত্যকে পদচ্যুত করিলে লোকে প্রভুকেই মূর্খ বিবেচনা করে; কারণ কর্ণ্য কি না নিয়োগের পূর্বে তাহা দেখা উচিত ছিল।' বৎসরের প্রথম দিনে তিনি পূর্ব বৎসরের শেষ দিবসে তদীয় পরিবার মধ্যে যে যে বস্তু যে পরিমাণ রহিয়াছে, তাহার তালিকা করিতেন, এবং উহা নিজের নিকট থাকিত। পূর্ববৎসরের কাগজাদি দখল করিয়া ফেলাইতেন। পাজামা ব্যতীত সমুদায় পুরাতন বস্ত্র ভূতাদিগকে দান করিতেন; পাজামা গুলি দখল করিতেন।”

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুমার সলিমের ( জাহাঙ্গীরের ) কুমন্ত্রণায় নরসিংহদেব আবুলফজলের বিনাশ সাধন করে। জাহাঙ্গীর স্বপ্রণীত “ওরাকতে

জাহাঙ্গীর ” গ্রন্থে স্বয়ং তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এবং আকবরের মৃত্যুর পর এই নরহত্যাকারীকে তিনি যথেষ্ট পুরস্কার ও উচ্চপদ প্রদান করেন। বোখারার রাজা আবদুল্লাহ কহিতেন “আবুলফজলের লেখনীকে আমি যত ভয় করি, আকবরের শাসিত শরকে তত ভয় করি না!” আবুলফজলের ক্ষমতা এইরূপ অসীমই ছিল। এই অসীম ক্ষমতাতে ভীত হইয়াই জাহাঙ্গীর এক্ষণে মৃশংস কার্যে ত্রুটি হন।

পূর্বে বলা হইয়াছে আবুলফজলের প্রতি আকবর সাহেব অকৃত্রিম প্রেম ও অচল বিশ্বাস ছিল। আসদ, এনাগতউল্লা প্রভৃতি সকলেই কহিয়াছেন, আবুলফজলের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে আকবর শোকে এত অভিভূত হইয়াছিলেন যে, তিন দিবস আহার নিদ্রা ও শয্যাশুশ্রূষা পরিত্যাগ পূর্বক বালকের ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। পুত্রকলত্রাদির সহিত পরিত্যক্ত সাক্ষাৎ করেন নাই। চতুর্থ দিবসে রায়রায়ান আবুলফজলের প্রিয় সহচর আসদুবেগকে সম্রাট সমীপে উপস্থিত করিলে, আনুপূর্বিক সমস্ত বিবরণ শ্রবণ পূর্বক শোক তুলিয়া ক্রোধে অধীর হন, এবং হত্যাকারী নরসিংহ দেবের বিকল্পে রায়রায়ান, বিক্রমোজিত সিংহ, ও আবুলফজলের পুত্র আবদুর রহমানকে প্রেরণ করিলেন। নরসিংহ দেবের রাজধানী তাম্রনাথ হয়, তদীয় রাজ্য সাতাজ্যভুক্ত হয়, এবং তদীয় আত্মীয় বহুবর্গ সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত

হয়। কেবল স্বয়ং ছদ্মবেশে নানা দেশে ভ্রাতা, সছচর, বন্ধুবান্ধব সকলের প্রতিই স-  
পর্যটন করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ আট সাতিশর অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।  
হইয়াছিল। পাকিস্তরে আবুলফজলের পুত্র এবং আসদবেগকে উচ্চপদ প্রদান করেন।



## দেবোপাখ্যান।

( গ্রীস ও ভারতবর্ষ। )

সপ্তম প্রস্তাব।

ইন্দ্রাদি দেবগণ।

ইন্দ্র দেবরাজ। সূর্য্য, সোম, যম, কা-  
লাদি দেবগণ তাঁহার অধীন। বৈদিক ভা-  
রতে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদিত্যদেব। মিত্র, ব-  
রুণ, অর্য্যমা প্রভৃতি যেমন সৃষ্টি-স্থিতি-প্র-  
লয়-কর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত, ইন্দ্রও তাই। দে-  
বরাজ্যে শান্তিরক্ষার্থ তাঁহাকে সর্ব্বদা পরি-  
শ্রম করিতে হইয়াছে। অশুরদিগের উপ-  
দ্রব নিবারণার্থ সর্ব্বদাই তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে  
অস্ত্রধারী থাকিতে হইয়াছে। আবার যখন  
সমরারম্ভে শান্তিস্থখে বিচার করিতে ব-  
সিয়াছেন, তখন তিনি মুষ্টিমান ধর্ম্ম। বি-  
চারকার্য্য সমাধা হইলে, শচীসহ নন্দনকা-  
ননে অবস্থান করিয়া স্নখে কালাতিপাত  
করিয়াছেন। ইন্দ্রের এই প্রকৃতিতে গভীর-  
রতা ও উচ্চতা এত ছিল যে, গ্রীসের সর্ব্ব  
প্রধান দেব জিয়াসও তাঁহার তুল্য নছেন।

যখন ভারতে পুরাণের আবির্ভাব, ই-  
ন্দ্রকে সিংহাসন পরিভ্রাণ করিয়া তিন

শ্রেষ্ঠ শক্তির অধীন হইতে হইল। ত্রিমূ-  
র্ত্তির আবির্ভাবে তাঁহাকে অধীন হইতে হ-  
ইল। কেবল দেবত্ব নয়, তাঁহাদের সছ-  
ধর্ম্মীগীগণও উপাসনা ব্যতীত ইন্দ্রের প্রতি  
প্রসন্ন হইতেন না। একবার ইন্দ্র দেবা-  
দিত্যের মহাদেবের মায়ায় একস্থানে তাঁ-  
হার নিজের নায় পাঁচজন ইন্দ্র দেখিতে  
পাইলেন, তাহাতে তাঁহার অভিমান এ-  
কেবারে কমিয়া গেল; সম্পূর্ণরূপে মহাদে-  
বের অধীন ও আজ্ঞাবহ হইলেন। তাঁহার  
আদিত্যবত্ব রহিল না। কিন্তু তথাপি উপা-  
সনার সময় ভক্তের চক্ষে তিনি ঈশ্বর এবং

“ বজ্রস্যাঃ শক্ত্যা ভুবনস্য গোপ্তা

রক্তস্য হস্তা নমুচেনিহস্তা,

রুক্ষে বসানো বসনে মহাত্মা

সত্যাহতে যো বিবিনক্তি লোকে।

যো বাজিনঃ গর্ত্তমপাং পুরাণুঃ

বৈখানরং বাহনমভূতৈতি,

নমোহস্ত তস্মৈ জগদীশ্বরায়

লোকত্রয়েশায় পুরন্দরায় । ” \*

ইত্যাদি বাক্যে স্তুতমান ।

পুরাণ-বর্ণিত ইন্দ্রের শক্তি বিস্তর খর্ব হইলেও তাঁহার সহিত গ্রীকদেবগণমধ্যে মাত্র যিস্বে তুলনায় । উভয়ের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্যও আছে । ইন্দ্র দেবরাজ, যিস্বেও দেবরাজ । ইন্দ্র বজ্রধর, যিস্বেও বজ্রধর । দেবশত্রু-দানবদমনে মহর্ষি দধীচির পবিত্র অস্থি, দেবশিষ্যী বিশ্বকর্মা কর্তৃক বজ্রনামক অমোঘাত্রে পরিণত হইল ; সেই অসাধারণ দৈব অস্ত্রের অপ্রমেয় তেজে দানবকুল নির্মূল হইল ; দানববর্ষত রক্ত স-বংশে নিহত হইল, দেবগণ নির্ভীকচিত্তে স্বর্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন । হি-ফেট্‌স আপন পিতা যিস্বেের জন্য অশনি-নামক অমোঘাত্রে প্রস্তুত করিলেন, সেই অব্যর্থ অস্ত্রে টাইটানকুল নির্মূল হইল, দে-বগণ নিশ্চিন্ত হইলেন ।

দেবরাজের অনুগ্রহ না হইলে রুটি হয় না, যেহ সকল তাঁহার আদেশব্যতীত জ্ঞান হইতে নড়িতেও পারে না । পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি কাজে কাজেই ইন্দ্রের উপর নির্ভর করে ; এই গুণে ইন্দ্র এ-পোলো বা সূর্যের অনুরূপ । ঐযিসসদীর্ঘও নীরদারত ।

আকাশে নানাবর্ণে রঞ্জিত বহুদারত যে ধনু-মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়,

\* মহাভারত, আদিপর্ক, তৃতীয় অ-ধ্যায়, ১৪৮ এবং ১৪৯ শ্লোক ।

সেই ইন্দ্রধনু ; যে ভয়ঙ্কর শব্দ শুনিতে পা-ওয়া যায়, তাহা শরসঙ্কানজনিত শিঙ্খী-নি-নাদ । ইন্দ্রের শাসনে ত্রিভুবন কম্পিত । এ সকল বিষয়ে ইন্দ্র যিস্বেের অনুরূপ । আবার দুর্বলতাও উভয়েই একরূপ । কনি, কম্পনার বাছা বাছা ফুল সকল ল-ইয়া যে মনোহারিণী অমরাবতী ও অনুপ-মেয় নন্দনকানন রচনা করিয়াছেন ; তা-হাতে উর্বশী, মেনকা, রস্তা প্রভৃতির অ-ভাব নাই । অলম্বুবা, মিত্রকেশী, বিদ্রাৎ-পর্ণা, তিলোত্তমা, অকণা, রুক্মিতা, রস্তা, মনোরমা, মৃকেশিনী প্রভৃতি অপ্সরাগণ পুরী আলোকিত করিয়া থাকে । স্বয়ং ক-ন্দর্প, প্রিয়সখা বসন্তসহ, চিরকাল নন্দনে বিরাজমান । তাহার পরও শত অহল্যা ইন্দ্রের সেবায় নিযুক্ত ! এ বিষয়ে যিস্বে হইতে ইন্দ্র হান নছেন । তবে বিশেষ এই যে, যিস্বে দেবাদিদেব, দেবমানবের আ-দর্শ হইয়া দুর্বল-প্রকৃতি । ইন্দ্র, ত্রে-ষ্ঠদেবগণের অধীনস্থ বিলাসলোলুপ শা-সনকর্তা ।

সূর্য্য উদয় হইয়া গ্রীষ্ম ও ভারতবর্ষ উভয় দেশেই নিরপেক্ষভাবে আলোক বিতরণ করেন, সূর্য্যবৎ সূর্য্যদেব দুই দে-শেই প্রায় একপ্রকৃতিবিশিষ্ট । উভয়েরই প্রচণ্ড প্রতাপ, দুর্ব্বল শক্তি, ও উজ্জ্বল স্বভাব কবিগণ উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন । আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়েরই একরূপ । তবে বিশেষ এই যে লেটোনা-নন্দন কি-ঞ্চিৎ স্থূলদর্শী, আদিত্য স্বকন্দর্শী । যিনি

বুদ্ধিতে রূহম্পতি, শিপে বিশ্বকর্মা, কলহ-  
প্রিয়তার নারদ, প্রতারণার এবং চৌর্যো  
হার্গেস, সেই নিরুপম ত্রীকদেব এপো-  
লোকে পদে পদে প্রতারিত করিল, এ-  
পোলো বুঝিলেন না। কিন্তু সহস্রলো-  
চন সূর্যের নিকট এ প্রকার অবস্থা গোপন  
থাকা অসম্ভব।

আদিত্যের নামাস্তর ও রূপাস্তর ব-  
শতঃ জন্মরক্তান্ত নানা প্রকার। তাঁহাকে  
অদিতির পুত্র বলিয়া উপাসনা করাই প্র-  
চলিত রীতি। বিণতাস্তর অরুণও সূর্য্য।  
আবার রূহস্তানু, চক্ষু, আত্মা, বিভাবসু,  
সবিতা, সূর্য্যিক, অরু, ভানু, আশাবহ, রবি,  
মহা ; অথবা তাহাদের নামাস্তর, দিক,  
বাত, অরু, প্রচেতা, অগ্নি, বহ্নি, ইন্দ্র, উ-  
পেন্দ্র, মিত্র, প্রজাপতি ও রূহম্পতি। দি-  
বের এই এগার পুত্রের প্রত্যেককেই সূর্য্য  
দেব বলিয়া বোধ হয়। মহাপুত্র দেবজাট,  
তৎপুত্র সূত্রাট। সূত্রাটের তিন পুত্র ;—  
দশজ্যোতি ( অগ্নি ), শতজ্যোতি ( চন্দ্র )  
এবং সহস্রজ্যোতি ( সূর্য্য ) \*। চন্দ্র ও  
সূর্য্য নামে দুইটি দানবও ছিল। এইরূপ  
এক প্রকার ও একাধিক নাম-বাহুল্যে সূর্য্য-  
দেব-প্রকৃতি কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

আলোচ্য বিষয় দেখা যাউক। আ-  
দিত্য ও এপোলো উভয়েই রূপবান ও গু-

\* বিজ্ঞান জ্ঞান দেখ। মহাত্মারত্নের  
পূর্বে সূর্য্যের ভেজ, অগ্নিহইতে শতগুণ  
নির্গম হইয়াছিল। এ তত্ত্ব এত দিনে ই-  
তোরোপে প্রকাশ হইয়াছে।

ণবান। উভয়েতেই উৎপাদিকা শক্তি,  
সুতরাং কুমারী কুন্তী কর্ণের জননী এবং  
সূর্য্যের প্রণয়িনী ; আর পরী করোনিস্  
এপোলোর প্রণয়িনী। কুন্তী তাহার পর  
ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বামীরূপে গ্রহণ ক-  
রেন, করোনিস্ এপোলোকে অবজ্ঞা ক-  
রিয়া অন্য একজনের প্রণয়পক্ষে নিমজ্জিত  
হন। বিশেষ এই যে হিন্দু কবি সাবধা-  
নতার সহিত স্বামীর অনুমতি ও দৈব ঘট-  
নার বর্ণনা করিয়া মানবীর সত্য নাম স্থির  
রাখিয়াছেন।

সূর্য্য উদয় হইয়া দ্রুতগতিতে অন্তরীক্ষে  
পরিভ্রমণ করেন, প্রসিদ্ধ পক্ষধারী হরিত  
নামক অশ্ব তাঁহার শকট বহন করিয়া ল-  
ইয়া যায়। উষস্ তাঁহার দ্বার উদঘাটন  
করিয়া দেয়। এপোলোও উদয় হইয়া  
রথারোহণে আকাশ-ক্ষেত্র ভ্রমণ করেন,  
তাঁহার কন্যা ইয়স্ তাঁহার দ্বার উদঘাটন  
করিয়া দেয়। সূর্য্য সহোদরা উষস্, এ-  
পোলো দুহিতা ইয়স্ বা অরোরা এক  
প্রকৃতি বিশিষ্ট। আবার ইয়সের সহিত  
তপন তনয়া তপতীরও বিলক্ষণ সাদৃশ্য  
আছে। উভয়েই প্রভাতদেবী, পরমসু-  
ন্দরী। উভয়েরই অঙ্কুলি সকল গোলাপবৎ  
রক্তিমাত ও মনোহর।

সূর্য্যপত্নী যষ্ট্রী অন্তরীক্ষে অখিনী কু-  
মারদল প্রসব করেন, কিন্তু ত্রীসের অ-  
খিনী-কুমার ক্যাক্টর ওপোলকস্ বিয়-  
সের সন্তান।

এক সময়ে সূর্য্যও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রায়-

কর্তা রূপে উপাসনা প্রাপ্ত হইতেন ; স্নান-  
খেদে এবং গায়ত্রীতে তাহা স্পষ্ট বুঝা  
যায়। গ্রীকদিগের স্বর্গ্য এত ক্ষমতাপালী না  
হইলেও অনেক গুণ বিশিষ্ট। সঙ্গীতশাস্ত্র,  
কাব্যশাস্ত্র, কবিত্ব, এবং দেবত্ব তাঁহারই  
হস্তে। হার্মেসের নিকট হইতে যে বীণা  
প্রাপ্ত হন, তাহাই সঙ্গীত ও কবিত্বের মূল।

দেখা গেল এপোলো ও আদিত্য এ-  
তদ্ব্যভিন্ন কাৰ্য্যতায় পার্থক্য থাকিলেও  
কাহাকেও বড় অধিক প্রশংসা করিয়া  
প্রাধান্য দেওয়া যায় না।

এক্ষণে ডায়োনা ও চন্দ্র চরিত্র আ-  
লোচনার বিষয়। কিন্তু ডায়োনা দেবী,  
চন্দ্র দেব। ডায়োনা দেবসেনাপতি কুমা-  
রের ন্যায় চিরকুমারী, চন্দ্র কলঙ্কী। হিন্দু  
কবি অন্যান্য গ্রহ পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃদেব-  
বৎ চন্দ্রকেও পুরুষ কল্পনা করিয়াছেন।  
তাঁহার বক্ষঃস্থ কলঙ্ক, সকলকে বুঝাইতে,  
গুরুপত্নী তারার অবতারণা করিয়াছেন।  
চন্দ্র সত্যায় তারার অভাব নাই, আবার  
চন্দ্রেরও কলঙ্ক আছে, কবি এ সুযোগ  
ছাড়িতে পারেন নাই, কলঙ্ক বাখ্যা ক-  
রিয়া শশাঙ্ককে কলঙ্কিত করিলেন। তাঁ-  
হার যুগাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশধর, শশী প্রভৃতি  
নামে যে দোষ গোপন করিয়াছিল, তাহা  
প্রকাশ পাইল।

গ্রীক কবি দেখিলেন সুন্দরীর বদন-  
সুধাকর রাস্তীত পূর্ণসুধাকরসহ উপমের  
বস্তু জগতে আর নাই। সুন্দরীর স্বভাবে  
মৃদুতা, সরলতা ও মধুরতা বিরাজ করে ;

সুধাকরের কৌমুদীতেও মৃদুতা, শৈত্য ও  
সুখসেব্যতা প্রচুর আছে। সুন্দরীর সর-  
লতা-পূর্ণ কোমল দৃষ্টিতে শরীর শীতল  
করে, চন্দ্রমার কোমল কৌমুদীতে তাপিত  
চিত্তও শান্তিলাভ করে। সুতরাং চন্দ্রমা  
অবশ্যই দেবী।

দেবী অথচ পবিত্রা। এমন নিখল,  
এমন সরল বস্তুতে পবিত্রতা না থাকিলে  
জগতে আর পবিত্রতা কোথায় থাকিবে ?  
সুতরাং ডায়োনা কুমারী। নিরপেক্ষভাবে  
বিবেচনা করিলে এই মনোহারিণী কম্প-  
নায় গ্রীক কবিরই প্রশংসা করিতে হইবে।  
পূর্ণশব্দধরে অন্তঃকরণে যে পবিত্রতা জ-  
মায়, বনদেবী স্বরূপা, মেঘপালিকা, অ-  
থবা শব্দরূপিণী ডায়োনা দেবীর আকৃতি  
ও প্রকৃতিতেও তাহাই করে। আর্টিমিস্  
গ্রীসে পবিত্রতার আদর্শ।

ভারতকবি বর্ণিত বিরহবিধুর নারক  
এবং প্রোষিতভঙ্গিকা নারিক মদনসহচর  
ইন্দুকিরণ অসহ্য বিবেচনা করিয়া অন্ধকার-  
হৃদয়ে অন্ধকারে বসিয়া থাকেন। গ্রীক-  
কবিবর্ণিত নিরাশরণয় যুবকযুবতী অবিচ-  
লিত পাশাংহৃদয়া ডায়োনা দেবীর শরণা-  
পন্ন হন। কিন্তু বাঁহাদের আশা আছে,  
তাঁহার ডায়োনা প্রকৃতির অস্ত্রেরস্তাব দে-  
খিয়া ভীত হন এবং দূরে অবস্থান করেন।

ডায়োনা-প্রকৃতি অজের, সুতরাং আ-  
র্টিমিস্ ত্রীলোক হইয়াও পুরুষাকার-বি-  
শিষ্ট। শশী পুরুষ, কিন্তু এমন দুর্বল ও স্ত্রী  
প্রকৃতি যে, বিদ্যাবুদ্ধি গৌরব থাকা সত্ত্বেও

ক্ৰী হইবার উপযুক্ত। ডায়োনা এপোলোর  
সহোদর। যেমন কিরাক্তিনরা লক্ষ্মী  
এবং চন্দ্র উভয়েই একস্থান হইতে উৎপন্ন  
আর্টিমিস ও এপোলনও তজ্জপ। আর্টি-  
মিসে ও চন্দ্রে বিস্তর স্মরণতা আছে।  
কিন্তু প্রথমোক্তে পবিত্রতা অবিকৃত থাকি-  
কাল এস্থলে গ্রীকদেবীরই প্রার্থিত্ত অধিসং-  
বাদিতরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে।

অতঃপর বর্ণনের সহিত নেপ্চুনের,  
পবনের সহিত ইয়োলসের, যমের সহিত  
প্লুটোর এবং অগ্নির সহিত ভল্‌কানের  
তুলনা করা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রীক  
নাম সকল বাঙ্গালার এমনই নীরস শুনায়  
যে, যাঁহাদের এ সমস্ত বিষয় আলোচনার

কোঁতুল আছে, তাঁহারাও মনোযোগ ক-  
রিয়া পড়িতে পারেন না। দীর্ঘকাল হ-  
ইল একরূপ প্রস্তাব পাঠে পাঠকগণও  
ধৈর্য্য অব্যাহত রাখিতে কষ্ট বোধ ক-  
রেন। অপিচ উল্লিখিত দেবগণ মধ্যে  
কোন কোনটির প্রকৃতি স্থানান্তরে অন্য  
দেবসহ উপমিত হওয়ার পুনরুক্তি দোষও  
হইতে পারে। অতএব ঐ কয়েকটি তু-  
লনা পাঠকগণ আপনা আপনি করিয়া  
লইবেন বলিয়া লিখিতে বিরত থাকিলাম।  
পরবর্তী প্রস্তাবে দুই দেশের অতি স্মৃশা,  
দুই একটি চিত্র প্রদর্শন করিয়া, নবম প্রস্তাবে  
সাধারণ সমালোচনা এবং দশম প্রস্তাবে  
উপসংহারভাগ লিখিতে বাসনা রহিল।

## নন্দদার প্রতি

নন্দন সৌরভময়ী নিদাখ-যামিনী;

শান্ত বিশ্ব চরাচর

পত্রিকান্ত কলেবর,

অনন্ত নিলীমা মাধা তারাময় নীলাঙ্গর,

যদি কি যামিনী শ্যামা কমলীয় মনোহর ;

২

নীরব প্রকৃতি-বালা, নীরব যামিনী,

নীরবে গগনতলে

শশধর আলমলে,

শশাঙ্ক চুম্বে মমী মৃদু হেঁসে পাগলিনী,

পরিয়া শ্যামল-কণ্ঠে সুবিমল কৌমুদিনী।

সচন্দ্র যামিনী বসি; নন্দদা বেলায়

নিরাখি নয়ন ভরে

উছলি তরঙ্গ-থরে,

কল কল মৃদু স্বনে নীরময়ী তরঙ্গিনী

বহিতেছে অবিরাম নীল-অবু-উদ্দেশিনী

৪

চুসিয়া দোলন চম্পা অনিল সঞ্চরে,

বেল-বুই-পরিমল

করে গ্রাণ স্রবীতল,

সমীরণে তরঙ্গিরে মর মরে মব দল,

উদ্ভাসিনী তরঙ্গিনী সিহরিছে অবিরল।



৫

প্রক্ষুটিত চন্দ্রকরে কল-নির্নাদিনী,  
নর্ঘদার নীল জলে  
চন্দ্র কৌমুদিনী জ্বলে ;  
নীলাবুঘরীর কোলে শশ শত শশধর,  
প্রেমে তরলিত হয়ে, চঞ্চলিছে নিরন্তর ।

৬

চঞ্চলা নর্ঘদা অগ্নি ভুবন স্রব্ধরি !  
সলিল অলকে মরি,  
মালতীর মালা পরি,  
মূহল করুণ গীতে বিশ্ব বিমোহিত করি,  
কোথা যাও নেচে মেচে তরঙ্গিনী-কুলেস্থরি,

৭

এমন অমৃতমুখী মধুনা নিশীথে,  
বিনাইয়া মৃদু স্বরে,  
কাঁপাইয়া নীলাবুরে,  
কেন আজি কলোমিনী কাঁদিতেছে অবিরাম,  
কোন দুঃখে বল নদি, বিদরে তোমার প্রাণ।

৮

হেরিয়া কি ভারতের মলিন বদন,  
তরুণের রব সনে,  
মিলায়ে, ব্যথিত মনে,  
অভাগিনী ভারতের অনন্ত বিষাদ-গান,  
সাগর-সদনে নদি, বহিতেছে অবিরাম ।

৯

সেই দিন সেই দিন, আছে কি স্মরণ,  
যেই দিন তুমি নদি,  
কলনাদে নিরবধি,  
ভারতের বশোপীড়িত মনের অনন্ত গুণে,  
সাগর-সদনে মরি বহিলে সহস্র মুখে :—

১০

সেই দিন কোথা আজি বল তরঙ্গিনী ;  
সেই তুমি প্রেম আশে,  
বও সাগরের পাশে ;  
সেই এই পূর্ণাংশী, প্রকৃতির নীল ভালে,  
সেই এই নিশীথিনী স্খচিত কুমুমজালে ;

১১

শোভার ভারত সেই নীলাবু-চুড়িতা,  
সেই কুলময়ী উষা,  
কুন্তলে কুমুম ভূষা,  
সেই কোকিলের কণ্ঠে কুহ-স্বর মধুময়,  
সেই অক্লবিন্দ-বনে গুঞ্জরে ভ্রমরীচয় ;

১২

স্বপ্নের শরদে সেই ভারত মন্দিরে,  
জুড়াতে তাপিত প্রাণ,  
তাজিয়া কৈলাস ধাম,  
আবির্ভূতা হুম্ মাতা মৃত্যুঞ্জয়-বিমোহিনী  
অনন্ত-পাবনী উষা অল্পপূর্ণা মিস্তারিণী ;

১৩

এই সেই আর্ধ্যা তুমি, শোভার নিলয়,  
সেই নদী তব জল  
বিদ্যমান অবিরল,  
সেই ভারতের কোলে চন্দ্র তমস্বিনী নীল ;  
সব বিদ্যমান কিন্তু কোথা আজি সেইদিন ।

১৪

প্রবাহিত সময়ের তরঙ্গিনী-তলে,  
অমূল্য রত্নের প্রাণ,  
সকলি রয়েছে ছায় ।  
কালের অনন্ত জ্যোত তাহার উপরে বয় ;  
যাবে দিন, যাবে যুগ, কখন কি হবে নয় ?

১৫

বল তুমি তরঙ্গিনি, বল কত দিনে,—  
কত দিনে পুনরায়,  
সেই রক্ত-রাশি ছায়!  
ডুবিয়া কালের এই অনন্ত নদীর জলে,  
ভারত সম্ভান কবে উত্তোলিবে কুতূহলে।

১৬

এক দিন দেখিয়াছ তুমি তরঙ্গিনি,  
ভারত সম্ভানগণে,  
পলিতে দুর্বীর রণে,  
বীরমদে ক্র-তেজে টলমলি ধরাতল,  
বিজয় আরাবে পুনঃ বিদারিতে অভঙ্গল।

১৭

একদিন নদী, তব এই শ্যাম তটে,  
চমকিয়া ত্রিভুবন,  
ঘটিল ভীষণ রণ,  
এক দিন তরঙ্গিনি, তোমার সুনীল জল  
যবন-শোণিতে হল রক্ত-বর্ণ অবিরল।

১৮

এক দিন তুমি সেই অচল-নন্দিনি,  
গরজি গম্ভীর স্বনে,  
উৎসাহ-পূর্ণিত মনে,  
রক্ত কলকিত এই তোমার বিনোদ বেল।  
প্রক্ষালিলে জল দিয়ে প্রসারি লহরীমালা।

( ১৯ )

প্রক্ষালিলে রক্তজ্যোত, পুনঃ তব তীরে,  
সেই শ্যাম সুরকোমল  
জননিল দুর্বাদল,  
পুনঃ সেই বমলতা হ্রসিল উকর গলে,  
নাচিল দিনেশ-ছাতি তব নিরমল জলে।

২০

কিন্তু বল তরঙ্গিনি, স্মৃতির প্রান্তরে,  
কোটি যুগ উপসারণ,  
পারিবে কি কতু ছায়!  
প্রক্ষালিতে সেই রক্ত করি চির প্রক্ষালন?  
পারিবেনা—পারিবেনা—স্থখা তব আকিঞ্চন।

২১

ফিরিবে কপাল কবে বল লো নন্দে,  
ভারতের ভাগ্যে ছায়!  
বল কবে পুনরায়,  
দাসীত্বের শত জ্বালা হবে চির বিমোচন,  
হেরিব প্রফুল্ল কবে ভারতের সুবদন।

২২

স্থখাইবে কবে মার নয়নের জল?  
কবে এই অনাখিনী,  
হবে পুনঃ আত্মাদিনী?—  
হবেনাকি কোন দিন? সৌভাগ্যের শশধর,  
অতান্ত-মাগর-গর্ভে ডুবিল কি নিরন্তর?

২৩

যাও তুমি ক্রতপদে সাগর-রঙ্গিনি;  
নীল জল প্রসারিয়ে,  
নীলাবু মন্দিরে গিয়ে,  
নীলাবু গরভে যথা রত্নরাজি অগণন।  
ভারতের সুর-শশী কর তথা অবেষণ।

২৪

তাজিয়া ভারত-ভূমি অনন্ত বিরাগে,  
অসীম পয়োদি তলে,  
কমক রাজীব দলে  
রচিত বিনোদামলে, মনোহুখে বিবাদিনী,  
ভারতের লক্ষী আজি বিরাজেন একাকিনী।

২৫

সাগর গরভে বুঝি অগ্নি প্রবাহিনী,  
পদতলে কমলার,  
চিরহুঃখে অনিবার,  
গড়াইছে ভারতের সৌভাগ্যের শশধর,  
কিরণ-বিছীন বিশ্ব ভ্রাম ডাতি কলেবর।

২৬

যাও লো নর্যদে সেই ইন্দিরা-মন্দিরে ;  
ইন্দিরা-চরণ ধরি,  
সহস্র মিনতি করি,  
বলিও রাজীব-পদে মৃদু স্বরে অবিরত,  
অনাখিনী ভারতের হুঃখের কাহিনী যত।

২৭

কি বলিব আদি হতে তুমি তরঙ্গিণি,  
আছ তুমি চির দিন  
ভারতের বক্ষে লীন,  
রহিবে অনন্ত দিন তুমি নদী পুনর্বার,  
ভারতের কণ্ঠে যেন নীলমণি-ময় হার।

২৮

পুরাকালে তুমি সেই দেখেছ রঞ্জিণি,  
ভারতের সিংহাসনে,  
বসিতে রাজেন্দ্রগণে ;

দেখিলে আবার সেই হ'ল ভাষ্য পরিণত,  
তব পুণ্যময় তীরে রাজ ইন্দ্র শত শত।

২৯

আবার দেখিলে তুমি, কালের প্রভানে,  
না জানি কি পাপ ফলে,  
কোন কুণ্ঠের বলে,  
ভারতের রক্ত-ভূমে যবনের অভিনয় ;  
আবার কালের করে ফুরাইল সমুদয়।

৩০

দেখ আজ পুনরায় দেখ তরঙ্গিণি,  
সেই সিংহাসনপরে  
কোন জাতি রাজ্য করে,  
কাজলিনী বেশে আজি কাহার চরণতলে  
সুটার ভারত ভূমি, ভাসিলা নয়ন-জলে।

৩১

নিরখিলে যুগান্তর, দেখিলে সকল ;  
এই আর্ধ্য সিংহাসন,  
আর্ধ্য নরপতিগণ,  
উজ্জলিবে কবে পুনঃ বল অগ্নি তরঙ্গিণি !  
আশার আকাশে আর ঝলে কিলা সৌ-  
দামিনী ?  
শ্রীঃ—

## ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন। \*

ভারতবর্ষ একসময়ে কোন বিষয়েই নির্ধন ছিল না। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক বিষয়েই ভারতের জ্ঞান, ভারতের গাভীরা, এক দিন পৃথিবীবাণ্ডেই ভারতীয় মহিমাকে লঙগে মহীরান করিয়া তুলিয়াছিল। যে দিন আৰ্য্য মহা-পুরুষগণ মানবমণ্ডলীর সৃষ্টিগৃহ মধ্য আসিয়ার বিস্তৃত ক্ষেত্রহইতে হলক্ষদ্বৈ গোধান-সঙ্গে হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী অতিক্রম পূর্বক পঞ্চনদে প্রথম পদার্পণ করেন, সেই দিন হইতেই ভারতীয় মহিমার সূত্রপাত হয়, সেই দিন হইতেই ভারতভূমি বিদ্যা ও সভ্যতার জননী বলিয়া পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ করে। যে উজ্জ-গিনী-জনিতা কবিতাগমীর মধুময় কুসুম বিকসিত হইয়া অদ্যাপি পৃথিবী আঘো-দিত করিতেছে, সেই দিনেই তাহার বীজ ভারতভূমিতে রোপিত হয়; যে প্রভাববতী চিকিৎসা বিদ্যা অদ্যাপি রোগার্থ জনগ-ণের প্রতীকার বিধান করিয়া আসিতেছে, সেই দিনেই তাহা ভারতজন্মের স্থান পরি-গ্রহ করে; যে প্রচণ্ড তেজ হলদিঘাট প্র-

ভৃতি রণক্ষেত্রে বিকসিত হইয়া ক্ষত-মক্ষী ইতিহাসের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে; এবং অধিক দিন অতীত হয় নাই, যাহার একটি ক্ষুলিজ চিনিয়ানওয়ারাল অতুল পরাক্রম শিখ-জাতির হৃদয়-চুলীহইতে উদগত হইয়া দ্রবীর ব্রিটিস তেজকেও বি-ধাত করিয়াছে, যাহার নিমিত্ত পবিত্র ইতিহাসের আদরের ধন হলদিঘাট ও চিনিয়ানওয়ারা গ্রীসের থার্মপলী ও মারাথন বলিয়া পরিকীর্তিত হইতেছে, সেই দিনেই তাহা ভারতজন্মের অনুপ্রবে-শিত হয়। আৰ্য্যগণ এই পবিত্র দিনে, পবিত্র সময়ে ভারতে পদার্পণ করিয়া অ-লৌকিক বুদ্ধিবলে, অলৌকিক পাণ্ডিত্য-বলে সভ্যতা প্রসারিত করেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত ভারত অচিরেই স্মৃতা হয়, এবং তাঁহাদিগের নিমিত্ত ভারতীয় মহিমা অজী-ভসাক্ষী ইতিহাসের পূজনীয় হইয়া উঠে।

এক্ষণে ভারতের সে মহত্ব বিগত হ-ইয়াছে, সে জ্ঞান, সে ধর্ম, সে নীতি, সে সদাচার, সে সভ্যতা, সে উদারতা অনন্ত সময়ের সহিত বিলীন হইয়াছে। যে পঞ্চ-

\* ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ২৪এ জুন শনিবার কলিকাতায় “সুব-জ্ঞান-সম্মিলনী” নামক সভার বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত “ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন” নামক প্রবন্ধ।

নদবাহিনী সিদ্ধু সরস্বতীর তীরে বসিয়া আৰ্যমহর্বিগণ জলদগভীর মধুরস্বরে সাম গান করিতেন, সে সিদ্ধু সরস্বতী আজও পঞ্চনদ বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, যে অত্রংলিহ হিমাত্মির নির্জন গহবরে সমাসীন হইয়া যোগরত আৰ্যতাপসগণ স্মৃতির প্রাণরূপিণী অনন্ত-শক্তির ধ্যানে নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন, সে গিরিশ্রেষ্ঠ গিরি-গহবর আজও বর্তমান রহিয়াছে, যে হলদিঘাটে প্রচণ্ড আৰ্যতেজ, আৰ্যসাহস বিকশিত হইয়া শত্রুর মর্গভেদ করিয়াছিল, সে হলদিঘাট আজও ভারতমানচিত্রে শোভা পাইতেছে । যে পশ্চিম শৈলের শিখরে দণ্ডায়মান হইয়া অদীনপরাক্রম শিবজী বিজয়ভেরী বিজয়দম্ভুতির গভীর নির্দোষ মেদিনী বিকস্পিত করিয়াছিলেন, সে পশ্চিম শৈল আজও বিস্তৃত রহিয়াছে । কিন্তু ভারতের সে জ্ঞান ধ্বংস নাই, সে জীবনী শক্তি নাই, সে একতা নাই, সে আত্মতাগ নাই । প্রাচীন ভারতের সভ্যতার অষ্টা আৰ্য মহর্বিগণের বিলাসভূমি গিরিকন্দের অবিকৃত রহিয়াছে, পুণ্যসলিলা সিদ্ধুসরস্বতী যথাগতি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু অলপ ভারত স্থান । ভারতের সে গৌরব-সূর্য এক্ষণে অনন্ত জলধিতলে নিমগ্ন হইয়াছে । সে সাহস, সে বীৰ্যবন্তা, সে রণোন্মাদ, সে একতা, সে আত্মতাগ এক্ষণে কেবল আভিধানিক শব্দে পরিণত হইয়াছে । অদ্যতন ভারত এইরূপ দুরবস্থায় পড়িত ।

অদ্যতন ভারতীয় সম্ভানগণ এইরূপ নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ও নিম্প্রহ হইয়া জড়তার সমাচ্ছন্ন । যে ভারত এক সময়ে জগতের শিক্ষা ভূমি ছিল, সেই ভারত এক্ষণে একটি সামান্য বিষয়ের জন্য অন্যের দ্বারে লালায়িত ! এইরূপ এক সময়ে তিস্তাদাতা অন্য সময়ে তিস্তাপ্রার্থী, এক সময়ে লোকারণ্যের হৃদ-য়োক্শীপক কোলাহলপূর্ণ, অন্য সময়ে বিকট শ্মশানের বিকট দৃষ্টির প্রতিরূপ ভারতের সমুদয় অবস্থা আনুপূর্বিক জানিবার উপায় নাই । ভারতের একখানি প্রকৃত ইতিহাস অদ্যাপি লোকসমাজে প্রচারিত থাকিয়া এইরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে আলোকবর্তী হয় নাই । ভারতের ইতিহাসের অভাব দেখিয়া এক্ষণে অনেকে ভারতীয় ব্যক্তিদিকে কুহকিনী কল্পনার কুপোষ্য বলিয়া দিকার দিয়া থাকেন । তাঁহাদিগের মতে, ভারতের কেহ ইতিহাস লিখিতে জানিত না, ভারতে ইতিহাসের ন্যায় প্রকৃত ঘটনাপূর্ণ কোন বিষয় কোন সময়ে বিরচিত হয় নাই, সকলেই কেবল কল্পনার পরিচর্যায় নিয়োজিত থাকিয়া স্বীয় গ্রন্থ অমানুষিক অদ্ভুত ঘটনায় পরিপূর্ণ করিত । যে ভারতীয় ব্যক্তিগণ এক সময়ে সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতিতে জগতের পূজনীয় ছিলেন, এক্ষণে তাঁহারা ইতিহাসিক ও অসত্যবাদী বলিয়া সাধারণে অপদম্ব হইতেছেন ।

আমরা আহ্বানিত হইলাম, আমাদি-

গের প্রকাশ্য বন্ধু জীবন্তবাবু নুরের প্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন সম্বন্ধে একটি মনোহর মৌখিক বক্তৃতা করিয়া ভারতীয় বান্ধিদিগকে এই অপমানের হস্তহইতে বিমুক্ত করিতে যথোচিত প্রয়াস পাঠিয়াছেন। নুরের বাবু বক্তৃতাটি ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা উহা পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। বক্তৃতার প্রতি পৃষ্ঠায় প্রতি পৃষ্ঠাতে বক্তার সত্যপ্রিয়তা, উদারভাব ও অদেশ-হিতৈষণা জাজ্জল্যমান রহিয়াছে।

সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যক্ষেত্রের মধ্যে কেবল রাজতরঙ্গিনী নামক একখানি কাশ্মীর দেশের ইতিহাস বর্তমান রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কল্লন পণ্ডিত এই ইতিহাস আরম্ভ করেন। পরে অপরাপর লেখককর্তৃক ইহার পরিসমাপ্তি হয়। এই কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিনীই সংস্কৃত সাহিত্য ভাণ্ডারের অদ্বিতীয় ইতিহাস। তবে কি সমগ্র ভারতবর্ষে ইতিহাসস্থানীয় আর কিছু লিখিত হয় নাই? অর্থাৎ ইতিহাসিকের সত্যপ্রিয়তা ও কর্তব্যজ্ঞান কি কেবল এক কাশ্মীর দেশে সমুদিত হইয়া কাশ্মীরেই বিলীন হইয়াছে? নুরের বাবু বিশিষ্ট সমীচীনতাসহকারে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তাঁহার মতে কম্পানাসহচরী কবিতার ন্যায় প্রকৃত ঘটনাগুণ ইতিহাসস্থানীয় বিষয় লিখিবার পদ্ধতিও প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। এই লিখিত বিষয়গুলি কালক্রমে বিপ্লবপ-

রম্পরায় অথবা কীট ও ক্ষতবিশেষের সাংঘাতিক আক্রমণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

নুরের বাবু এই মতের সমর্থন জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন :—আকবরের মুদ্রাসিদ্ধ মন্ত্রী আবুল ফাজেল প্রাচীন ভারতের একখানি ইতিহাস রচনা করেন। মম্বুর আবে রেমসেট্ এ সম্বন্ধে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন, আবুল ফাজেল কোথা হইতে অপ্রাণীত ইতিহাসের বিষয় সংগ্রহ করিলেন? ইহা কি তাঁহার মস্তিষ্কের উদ্ভাবনা? না ইতিহাসস্থানীয় পূর্ববর্তী বিষয়পরম্পরার সংগ্রহ? যদি আবুল ফাজেলের ইতিহাস প্রকৃত ইতিহাসপদে বাচ্য হয়; তাহা হইলে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, আবুল ফাজেল পূর্বতন হিন্দু ঐতিহাসিকদিগের নিকট হইতে স্বীয় ইতিহাসের বিবরণগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পূর্বতন ভারতে ইতিহাসলেখার পদ্ধতি প্রচারিত না থাকিলে আবুল ফাজেলের ইতিহাস প্রাণীত হইত না।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে জৈনিক মুদ্রাসিদ্ধ জৈনিক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। পরিব্রাজকের নাম হোয়েন সাঙ্গ, ধর্ম বোদ্ধ। পবিত্র বৌদ্ধ তীর্থদর্শন, পবিত্র বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সংগ্রহ এবং পবিত্র সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন প্রভৃতিই তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ ভারতবর্ষে অতিবাহিত

করেন। এই বোধ পরিত্রাজক স্বীয় ভ্রমগুরুত্ব লিপিবদ্ধ করিয়া ভবিষ্যৎ বংশীয়দিগের অতীতজ্ঞানের পথ অনেকাংশে পরিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমগুরুত্ব ক্যানিস্‌নেস্‌ জুলিয়ান কর্তৃক করাঙ্গী ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। এই বিখ্যাত ভ্রমগকারীর বিখ্যাত ভ্রমগুরুত্ব আমরা ভারতীয় ইতিহাসের নিদর্শন দেখিতে পাই। হোয়েন্স্‌ সাজ্‌ লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কেবল দৈনন্দিন ঘটনা লিখিবার ভার সমপিত ছিল। এই দৈনন্দিক বিবরণ নীলপীঠ নামে প্রসিদ্ধ। ঘটনাবলীর বিবরণ ইতিহাস ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং নীলপীঠ যে ইতিহাসের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য, তাহা যেরূপে সম্ভব নাই। হোয়েন্স্‌ সাজ্‌ বর্ণিত নীলপীঠের বিবরণে আমরা স্পষ্টে জানিতে পারি, ভারতে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবং ভারতীয় আখ্যায়িক কাব্য, দর্শন প্রভৃতির ন্যায় ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় এবং সর্বশেষ প্রমাণ, চাঁদ কবির “পৃথীরায় রাঙ্গো”। তিনি দুর্দান্ত যবনকবল হইতে জম্বুদ্বীপের রক্ষার জন্য পুণ্যক্ষেত্র ত্রিবেণিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন, যিনি অবিচলিত অধ্যবসায়, অবিচলিত উদারভাব ও অবিচলিত দেশ-হিতৈষিতার জন্য সমগ্র সমাজে হৃদয়গত আদ্য, হৃদয়গত প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাই-

তেছিলেন, তাঁহার নিমিত্ত পবিত্র ইতিহাসের আদরের ধন পাণিপথ অভুলপরাক্রম হিন্দুজাতির বিজয়ভেরীনিবাদিত সময়লীলাভূমি বলিয়া পরিকীৰ্ত্তিত হইতেছে, চাঁদ কবি সেই হিন্দুকুল-গৌরব, হিন্দু রাজত্ববর্তী পৃথীরায়ের বিবরণ লইয়া “পৃথীরায় রাঙ্গো” প্রণয়ন করিয়াছেন। চাঁদ, কবির মধ্যে পরিগণিত, এবং তৎপ্রণীত গ্রন্থও কাব্য বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কাব্য বলিয়া চাঁদ কবির গ্রন্থ ইতিহাস-সংস্কার বহিস্কার নহে। ব্যক্তিবিশেষের অকল্যাণ-পরম্পরা যাঁহাতে ধারাবাহিকরূপে বর্ণিত থাকে, তাহা তদানীন্তন সময়-প্রসিদ্ধ ইতিহাসের অংশ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। সুতরাং চাঁদ কবির “পৃথীরায় রাঙ্গো” কাব্য হইলেও যে অপরিপক ও অসম্পূর্ণ ইতিহাসের অসম্পূর্ণীয় তদ্বিষয়ে দত্ত হইবে নাই। এই “পৃথীরায় রাঙ্গো” এবং পূর্বকথিত আবু ফাজলের ইতিহাস ও নীলপীঠের বর্ণনার স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রাচীন ভারতে ইতিহাস লেখার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, এবং ভারতীয় আখ্যায়িক কাব্য, দর্শন প্রভৃতির ন্যায় ইতিহাসও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

এই ইতিহাস-স্থানীয় বিষয়গুলি ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত ছিল, এক্ষণে তাহার অনেকাংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃত্যবাবু বলেন, এই ইতিহাস-স্থানীয় ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিবার ভার রাজ্যশাসন সং-

ক্রান্ত কর্মচারীর উপর ছিল এবং উক্ত লিখিত বিষয়গুলি রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় কাগজ পত্রের মধ্যে সংরক্ষিত থাকিত। সময়ের পরিবর্তনশীল সহরীলীলার সহিত এক রাজ্যের পর অপর রাজ্য সংগঠিত হইয়াছে, এক আক্রমণের পর অন্য আক্রমণে সমুদয় বিষয় পৃথুদন্ত করিয়াছে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ রাজ্যবিপ্লবে ও ইউরোপিক জাতির পুনঃ পুনঃ আক্রমণে রাজ্যশাসন সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজ পত্রের সহিতও উক্ত লিখিত ঘটনাবলীও বিনষ্ট হইয়াছে।

যদি কেহ এই মুক্তিতে অনাস্থা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেও বক্তার তাদৃশ ক্ষোভ নাই। বক্তা অন্যস্থলে গুরুসহকারে বলিয়াছেন, আর্ধ্য পূর্বপুরুষগণের লিখিত ইতিহাস না থাকিলেও তাঁহাদিগের সুনাম অপহৃত হইবে না। কারণ যে ইউরোপ এক্ষণে আপনাকে সভ্যতা-ভিম্বানী ও পাণ্ডিত্যভিম্বানী বলিয়া সর্বত্র পরিচয় দিতেছে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে সেই ইউরোপে ইতিহাসের অবস্থা কিরূপ ছিল? বাহা প্রকৃত ইতিহাসপদে বাচ্য, তাহা কেবল গত শতাব্দী হইতে ইউরোপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে।

খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর বিপ্লবের সংঘাতে ইউরোপীয় জনগণের মানসিক স্বাভাবিক উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই উৎকর্ষ হইতেই ইউরোপে প্রকৃত ইতিহাসের উৎপত্তি। যখন অষ্টাদশ শতাব্দীর সভ্যতাক্ষরী ইউরোপে ইতিহাস বাস্তবীকৃত হইতে

লাগিত, তখন বহু প্রাচীন আর্ধ্যগণের তদ্বিষয়ক অনভিজ্ঞতা বড় অপমানের কথা নহে। স্বদেশবৎসল বক্তার তেজস্বিনী বক্তৃতা নিবন্ধ এইরূপ সগর্ভ জ্ঞপ্তি বাক্য কি মনোহর! কদম্বের স্তরে স্তরে বাহার স্বদেশ বৎসল্য, স্বদেশ মমতা লীলা করিয়া বেড়াইতেছে, তিনি বক্তার এইরূপ গর্ভে ক্রিতে অবশ্যই আনন্দে উৎফুল্ল হইবেন।

আর্ধ্য-পূর্ব-পুরুষগণ ঐতিহাসিক বলিয়া পরিচিত হউন বা না হউন, এক্ষণে তদ্বিষয়ের অমুশীলন অপেক্ষা আমাদের স্বদেশীয় ইতিহাসের অমুশীলনেরই অধিকতর আবশ্যিকতা লক্ষিত হইতেছে। যদি কেহ স্বদেশের ব্যথায় ব্যথিত-চিত্ত হইয়া নির্জ্ঞান প্রদেশে নীরবে বসিয়া এক বিশেষ অশ্রুপাত করিয়া থাকেন, যদি কেহ অত্যাচার-পীড়িত জঘন্মুখে শান্তির কোড়ে লালিত করিতে কার্যমনোবাক্যে যত্নপর হয়েন, যদি কেহ মহাজন মুখ বিনিঃসৃত “জননী জঘন্মুখ অর্গাদপি গরীয়সী” বাক্যের প্রকৃত মর্মজ হইয়া স্বদেশের হিতের তরে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে সর্বপ্রায়ে তাঁহার স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করা বিধেয়। স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে তিনি স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে পারিবেন না। বেদনার প্রকৃত কারণ না বুঝিলে ঐক্যপ্রয়োগ ব্যর্থ হইবে। স্বদেশের অতীত বিষয়ক জ্ঞান ও তাহার সহিত বর্তমান বিষয়ক



জামের সামঞ্জস্য বিধানই ঈদৃশ শোকস-  
স্তাপ প্রতীকার করিবার অমোঘ উপায়।  
এই উপায়ের অনুসরণ করিতে হইলে  
স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলন অ-  
বশ্য কর্তব্য।

দ্বিতীয়তঃ স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়নের  
অন্যরূপ সার্থকতা লক্ষিত হইয়া থাকে।  
এক্ষণে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের রাজনীতির স-  
হিত স্বদেশের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে অ-  
নুস্থ্যত রহিয়াছে। সুতরাং বর্তমান সময়ে  
স্বদেশের হিতকর ব্যাপারে লিপ্ত হইতে  
হইলে প্রকৃত পদ্ধতি ক্রমে ব্রিটিশ রাজনী-  
তির সহিত পরিচিত হওয়া বিধেয়। ম-  
নোযোগ সহকারে স্বদেশের ইতিহাস অ-  
ধ্যয়ন না করিলে ব্রিটিশ রাজনীতির কৌ-  
শল অবগত হইবার সম্ভাবনা নাই।

স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন কর্তব্য  
বটে, কিন্তু যে ইতিহাস বৈদেশিক জাতির  
হস্তে পড়িয়া বিকৃত হইয়াছে, তাহার অ-  
নুশীলন করিয়া মনোমালিন্যের উৎপাদন  
বিধেয় নহে। ইংরেজ চিত্রকরের হস্তে  
ভারতের ঐতিহাসিক চিত্র কোথাও অর-  
ঞ্জিত, কোথাও বা অতিরঞ্জিত হইয়া উঠি-  
য়াছে। অরঞ্জিত বা অতিরঞ্জিত চিত্র দ্বারা  
যে রূপ আলেখ্যের প্রকৃততাব হৃদয়ঙ্গম হয়  
না, সেইরূপ অতিবর্ণিত বা অবর্ণিত ইতি-  
হাস পড়িয়া ঐতিহাসিক জ্ঞান পরিষ্কৃত  
হয় না। ইংরেজ ঐতিহাসিকের হস্তে  
ভারতীয় ইতিহাসের যে যে ঘটনা বিপ-  
ল্যস্ত হইয়াছে বলা এইস্থলে তাহার করে-

কটির উল্লেখ করিয়াছেন। যথাক্রমে ভ-  
বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

যের, সুরেন প্রভৃতি ইংরেজ লেখক-  
গণ সিরাজউদ্দৌলাকে অন্ধরূপ-হত্যার  
প্রধান অধিনায়ক বলেন। সিরাজ উদ্দৌল-  
া শত অপরাধে অপরাধী হউন, জন সমাজে  
প্রজাপীড়ক প্রজাদাতক বলিয়া দ্বিকৃত হ-  
উন, ঐতিহাসিকের কঠোর লেখনীর সং-  
ঘাতে তাঁহার চারিত্রপট ক্ষত বিক্ষত হউক,  
কিন্তু সিরাজ অন্ধরূপ হত্যার পাণে পাণী  
নছেন। ন্যায়ের পক্ষপাত বিবজ্জিত বি-  
চার এই আরোপিত অপরাধহইতে তাঁ-  
হাকে বিমুক্ত করিবে সমুদয় বিষয়েই ন্যায়-  
বিকরণ বিধেয়। সিরাজ এক বিষয়ে ঘো-  
রতর অপরাধী বলিয়া যে রূপ ন্যায়ের ক-  
ঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য, অপর  
বিষয়ে দোষ-শূন্য বলিয়া সেইরূপ ন্যায়ের  
পক্ষপাতশূন্য বিচারে বিমুক্ত হইবার পাত্র।

১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুন ইংরেজ-  
হস্তহইতে ফোর্ট উইলিয়মের পতন হয়।  
দুর্গ অধিকৃত হইলে হলওয়েল প্রভৃতি ১৪৬  
জন ইংরেজ বন্দী শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া সিরাজ  
উদ্দৌলার সমক্ষে সমানীত হইলেন। সি-  
রাজ, হলওয়েল প্রভৃতিকে শৃঙ্খল-বিমুক্ত  
করিয়া দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, কেহ  
তাঁহাদিগের কেশাগ্রও স্পর্শ করিবে না।  
রাত্রিতে নবাব বিজ্ঞান-ভবনে গমন ক-  
রিলে জর্জের সেনাপতি এই ইংরেজ বন্দি-  
দিগকে প্রায় ১৮ কীট বর্গ পরিমিত একটি  
সুশ্রাব্যতন গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

তাহারা অন্ধরূপ-হত্যার ইতিহাস পড়িয়াছেন, তাহারা এই কার্যকর ত্রিটিস বন্দিদের দ্বারা ছরবস্থা অনেকাংশে হ্রাসকর করিতে পারিবেন। প্রচণ্ড নিদাঘ-সম্পূর্ণ রাত্রিতে স্বপ্নপারিসর নির্বীত গৃহে বড়চারিংশাধিক একশত মনুষ্যের ঘন-সন্নিবেশ, কি ভয়ঙ্কর! কি লোমহর্ষণ!!

কাল-রাত্রি প্রভাত হইল। অকণ-সহস্রী উষা ধীরে ধীরে জগতীতল আশ্রয় করিল। নবাবসেনাপতি কারা গৃহের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তখন কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! সুপীত ১২৩ জন মৃত দেহের মধ্যহইতে ২৩ জন বিবর্ণ, বিশীর্ণ, কঙ্কালাবশিষ্ট জীবিত শরীর বাহিরে আসিল। নবাব এই সাংঘাতিক ব্যাপারের কিছুই অবগত ছিলেন না। তিনি সেনাপতি-দিগের হস্তে দুর্গ-রক্ষার ভার দিয়া বিশ্রাম-ভবনে বিশ্রাম করিতে ছিলেন, স্মৃতরাং দোষভার বন্দিরক্ষক সেনাপতির স্বন্ধেই অর্পিত হইতেছে। এরূপ স্থলে সিরাজ-উদ্দৌলাকে দোষী করা ন্যায়সঙ্গত নহে। তবে সিরাজ অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান করেন নাই। এ অংশে অবশ্য তাহার ত্রুটি লক্ষিত হইতেছে। সিরাজউদ্দৌলা সর্বদা ভোবামোদ-প্রিয় সুপোষ্য সম্প্রদায়ে পরিবেষ্টিত থাকিতেন। অতিচা-ইবচনে তাহার গর্ভ উত্তরোত্তর স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। অমিতাচার ও অতিবিন্যাসের ক্রোড়ে লালিত হইয়া এইরূপ চাটু-কার্যগণের সংসর্গে থাকিতে সিরাজের

হৃদয় নিতান্ত সহানুভূতি-শূন্য হইয়া পড়িয়া ছিল। বলা বাহুল্য, এই সহানুভূতির অভাব বশতঃই তিনি বন্দিষাতক অপরাধীর প্রতি দণ্ড বিধান করেন নাই।

বন্ধা এইস্থলে ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় উইলিয়মের রাজ্যকালীন স্ট্রেনকোর হত্যার সহিত অন্ধরূপ হত্যার তারতম্য করিয়াছেন। সিরাজের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই হত্যাকাণ্ড সম্ভটিত হয়। যে ইংলণ্ড সভ্যতাভিমান ও পাণ্ডিত্যভি-মানে স্ফীত হইয়া প্রাচ্য বিষয়ের সমা-লোচন করিয়া থাকে, সেই ইংলণ্ডের অ-ধিপতিই যখন এই লোমহর্ষণ নরহত্যার পাপে পাপী, তখন সিরাজ যদিও অন্ধরূ-পহত্যার অপরাধে অপরাধী হইয়া, তাহা হইলেও তাহাকে তৃতীয় উইলিয়ম অপেক্ষা অধিকতর হৃদয়স বলা সর্বথা অসঙ্গত।

দ্বিতীয় ঘটনা; দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধ ও পঞ্জাব অধিকার। ইংরেজ লেখকগণের অনেকে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ নির্দেশ করেন নাই। অনেকে কেবল মুলতানের শাসন-কর্তা মুলরাজের অভ্যুত্থানকেই উ-হার প্রধান হেতু বলিয়া নীরব হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের কারণ নির্দেশ করিতে এই কয়েকটি ধরিতে হয়, ১ম মহারাজ রণজিৎ সিংহের বিধবা দ্বিতীয় মহারানী য়াকবের নির্বাসন, ২য় দলীপ সিংহের বিবাহের দিন ঠিক করিতে ত্রিটিস রেসিডেন্টের অমত, এবং ৩য় হা-জরার শাসন-কর্তা সর্দার হুজিৎসিংহের

প্রতি দুর্ব্যবহার । এই কারণত্রয় হইতেই দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের উৎপত্তি । ব্রিটিশ জাতি ইহার প্রত্যেকটিতেই যথেষ্ট চারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে । এই শিখযুদ্ধের পর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পঞ্জাব আত্মসাৎ করেন । ইহাতে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ দুর্ব্যবহার শিখ জাতির অমায়ূরপরতার ফল ও পঞ্জাব অধিকার ন্যায়-সজত বলিয়া নির্দেশ পূর্বক পবিত্র ইতিহাসের সম্মান অপলাপ করা নিতান্ত বিগর্হিত ।

তৃতীয় ঘটনা অযোধ্যা অধিকার । অক্ষুপ্ত হত্যা ও দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের ন্যায় ইহাও অধিকাংশ ইংরেজ লেখকের পক্ষপাতিত্ব লেখনীর সংঘাতে বিকৃত হইয়া ভারত ইতিহাসে স্থান পরিগ্রহ করিয়াছে । এই লেখকদিগের মতে অযোধ্যা অত্যাচার ও অবিচারের বিলাসভূমি ছিল । ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে ইহার প্রতীকার বিধানার্থ নবাব ওয়াজিদ আলীকে পদচ্যুত করিয়া অযোধ্যা গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্তু বিসপ হেবার, হারমান্ সেরিডেন প্রভৃতি অযোধ্যাকে সৌভাগ্য-লক্ষ্যীর আধার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । যে রাজ্য সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত, সে রাজ্যে অত্যাচারের প্রাদুর্ভাব সম্ভাবিত নহে । \*

\* বর্তমান প্রস্তাবলেখক প্রণীত সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাসের অবতারণিকার পঞ্জাব ও অযোধ্যা অধিকারের আত্মপুঞ্জিক ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে । উক্ত পুস্তক এক্ষণে বজ্রহ ।

সকল ইংরেজ লেখকই যে ভারতীয় ঐতিহাসিক ঘটনা এইরূপ বিপর্যাস্ত করিয়াছেন, তাহা নহে । অনেকানেক লেখক পক্ষপাতশূন্য হইয়া এই বিষয়ে মায়ামুখোদিত পক্ষ অবলম্বন করিতে ক্রটি করেন নাই । ভারতবর্ষ এই মহাপুরুষদিগের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতাশাশে আবদ্ধ ।

যাহা হউক ; সর্বস্ব-সম্পূর্ণ ও প্রমাদ-রহিত স্বদেশের ইতিহাস পাঠ করা স্বদেশীয় ব্যক্তি যাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য । স্বদেশের ইতিহাস পাঠ করিলে মনে স্বদেশের প্রতি গভীর হিতৈষণার উৎপত্তি হয়, গভীর উদাত্ত ভাবের সঞ্চার হয় এবং গভীর সহৃদয়তার হৃদয় আধুত হইয়া থাকে । বাল্মীকি, ব্যাসের ন্যায় কবি, পানিনি, পতঞ্জলির ন্যায় বৈয়াকরণ ও গৌতম, শঙ্করাচার্যের ন্যায় ধর্ম প্রচারকের নাম মনোমধ্যে উদিত হইলে কোন্ সহৃদয় ভারতবাসীর হৃদয় হিতৈষিতা ও উদাত্ত ভাবে উন্নত না হয় ? কেনা এই মহাপুরুষদিগের ইতিহাস পাঠে সমুদাত্ত হইবেন ? মহামনাঃ আর্ষা পূর্বপুরুষের এক সময়ে জগতের পুঞ্জীয় ছিলেন । তাঁহারা কোমল বিষয়ের কোমল সৌন্দর্যের সম্বোধেই ব্যাসক্ত থাকিতেন না, তাঁহারা কেবল ভ্রমরচূষিত প্রভাতকমলের অঙ্গবিলাস দেখিয়া অথবা কাব্য নাটকের অমূলীনন করিয়াই কালাতিপাত করিতেন না । তাঁহারা গভীর বিষয়ের গভীর জিজ্ঞাসার সর্বদা সংবত থাকিতেন, তাঁহাদি-

গের স্বয়ং প্রত্যক্ষ, বিপদে, সম্পদে  
অভ্রংশিহ গিরিবরের ন্যায় সদা উন্নত থাকিত। তাঁহারা সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শাস্ত্রে  
অধিতী, সমরকৌশলে অধিতীয় এবং ধর্ম-  
নীতিতে অধিতীয় ছিলেন। এক সময়ে  
ভারতভূমি এইরূপ মহাতেজস্বী, মহাসম-  
আর্থা পুরুষগণের লীলাস্থল ছিল, এক স-  
ময়ে এইরূপ আর্থাতেজ, আর্থাসাহস, আর্থা  
জ্ঞানের মহিমায় ভারতবর্ষ মহীয়ান হইয়া  
উঠিয়াছিল।

আর্য্য হিন্দুগণ দশগোত্রের সংখ্যা নি-  
য়মের অষ্ট। আর্য্য হিন্দুগণ ক্ষেত্রতত্ত্ব,  
ত্রিকোণমতি, বীজগণিতের উৎকর্ষ-কা-  
রক। আর্য্য হিন্দুগণ প্রভাববতী চিকিৎসা  
বিদ্যার প্রধান অনুশীলনকারী। আরব,  
গ্রীস দেশীয়গণ আর্য্য হিন্দুদিগের নিকট-  
হইতেই গণিতাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে।  
যে গ্রীস হইতে ইউরোপের ইয়তী জীৱজি,  
সেই গ্রীসই প্রাচীন ভারতের মন্ত্র-শিষ্য।

আর্য্য হিন্দুগণ গণিতাদি শাস্ত্রের ন্যায়  
বুদ্ধি বিদ্যাতেও পারদর্শী। এক সময়ে  
হিন্দুদিগের সমর-কৌশলে সমস্ত পৃথিবী  
চমকিত হইয়াছিল। বক্তা বক্তৃতার এ-  
ইস্থলে আশ্চর্য্যজনক সঙ্ক্ষে মত প্রকাশ ক-  
রিয়াছেন, আমরা এক্ষণে এ বিষয়ে তুচ্ছ-  
ভাবে অবলম্বন করিলাম। প্রাচীন ভারত  
ও আশ্চর্য্যজ্ঞানের ব্যবহার সম্বন্ধে একটি অ-  
তন্ত্র প্রস্তাব লিখিবার বাসনা রহিল। সা-  
হিত্য, দর্শন, বুদ্ধি বিদ্যা প্রভৃতিতে আর্য্য  
হিন্দুগণ যেরূপ শ্রেষ্ঠ, ধর্ম নীতিতে তাহা

অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতম। শাক্য সিংহের ধ-  
র্মভাব অদ্যাপি সমস্ত পৃথিবীর বরণীয় হ-  
ইয়া রহিয়াছে। রাজ্যেশ্বরের স্নেহাস্পদ  
পুত্র ও আজন্ম সৌভাগ্য সম্পত্তির ক্রোড়ে  
লালিত হইয়াও শাক্য সিংহ কেবল ধর্মের  
জনা সমস্ত পরিভ্যাগ করিয়াছিলেন। স-  
র্বপ্রকার উদাসীনতা, সর্বপ্রকার বিষয়-  
নিরস্ত্রি তাঁহার জীবনের অবলম্বন ছিল।  
তিনি “নলিনীদলগত” জলের ন্যায় জী-  
বনের ক্ষণস্থায়িতা, বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায়  
সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর চঞ্চলতা, এবং চক্রনেমির  
ন্যায় অদৃষ্টের পরিবর্তনশীলতা জানিয়া  
সংসার-পাশেছন্দন পূর্বক নির্জন গিরিক-  
ন্দরে বা নির্জন অরণ্যে নীরবে বসিয়া অ-  
ন্তিমে অনন্তপদ প্রাপ্তির আশায় অনন্ত-  
শক্তির ধ্যানে নিরস্ত্র-চিন্তিত ছিলেন। এই-  
রূপ ধর্মভাব জগতে অতুল্য ও অমূল্য।  
শাক্য সিংহের প্রচারিত ধর্ম এক্ষণে মধ্য-  
আসিয়া অতিক্রম করিয়া চীনে লঙ্কপ্রসার  
হইয়াছে, অতুল্য হিমগিরির অভ্রংশিহ  
শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ ক-  
রিয়াছে। সংক্ষেপতঃ স্রবিস্তীর্ণ তুহার-  
ক্ষেত্রশালী কাম্যকটকার উপকূল হইতে  
জলধি-স্রব-বিলম্বিত সিংহল দ্বীপ পর্যন্ত  
হাঁইয়া পড়িয়াছে। ঈদৃশ অলৌকিক ধ-  
র্মভাবসম্পন্ন শাক্যসিংহ ভারতের স্নে-  
হাস্পদ সন্তান।

প্রাচীন আর্য্য-ঐশ্বের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ  
কর, তাহাতেও আর্য্যগণের ধর্মভাব দেদী-  
প্যমান দেখিবে। রামায়ণ ও মহাভার-

তের রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির ধর্মভয়ের জন্য  
অদ্যাপি সকলের হৃদয়গত আত্মা ও ভ-  
ক্তির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছেন।  
অধিক কি, আর্ষা হিন্দুগণের ধর্মনীতি বৈ-  
দেশিক গণকেও বিস্মিত করিয়া তুলি-  
য়াছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এরিয়ান  
এবং বিখ্যাত পরিব্রাজক হোয়েন্স সাক্স-  
উভয়েই মুক্তকণ্ঠে হিন্দুদিগকে সত্যবাদী,  
উদার-স্বভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।  
ভারতভূমি এইরূপ বিদ্যাবত্তা, তেজোবত্তা  
ও ধর্মনীতির বিলাসক্ষেত্র।

আইস ত্রাতৃগণ । আমরা একবার  
সেই মহামনস্বী আর্ষা পূর্বপুরুষগণের চ-  
রণে প্রণত হই ; আইস একবার সেই পূর্ব  
পুরুষগণের ধর্মনীতির আলোচনা করিয়া  
চিত্তের উদারতা, হৃদয়ের সরলতা সাধন  
করি ; যতদিন পবিত্র আর্ষা শোণিতের  
শেষবিন্দু আমাদের ধর্মনীতে প্রবাহিত  
থাকিবে, আইস, ততদিন আমরা পূর্বপু-

রুষগণের ন্যায় কার্যমমোৎসাহে জীবনের  
শান্তিময় উৎকৃষ্টতম পথে অগ্রসর হ-  
ইতে থাকি।

বক্তা এইরূপ অবনত-মস্তকে পূর্ব  
পুরুষগণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া শ্রীয  
ক্ততার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। বক্তা  
তার গোরস্তে যেরূপ হস্তরাক্ষসীপক স্বদেশ-  
বৎসলতা, উপসংহারেও সেইরূপ হৃদয়ো-  
ক্ষীপক স্বজাতি-প্রিয়তা। বক্তার হৃদয়  
যে স্বদেশ-হিতৈষিতা ও স্বজাতি-প্রেমে  
পরিপূর্ণ, এই বক্তৃতাটি তাহার পরি-  
চায়ক।

উপসংহার সময়ে আমরা সুরেন্দ্রবা-  
বুকে ভারতের একখানি সর্বস্ব সম্পূর্ণ  
ইতিহাস প্রণয়ন করিতে অনুবোধ করি।  
ঐহার বক্তৃতার প্রতিবাক্যে গভীর সহ-  
দয়তা উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়ে, তাঁহার নিকট  
এ বিষয়ে কেন আশা না করিব ?

— জীরঃ—

## পার্সিজাতি ।।

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তবাসী পারস্য-  
জাতি রূপে, গুণে, কার্যদক্ষতা ও অপরা-  
জিত উৎসাহশালিতায় ইদানীং অমেকেরই  
লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই  
প্রবন্ধে তাহাদিগের বিবরণ সংক্ষেপে বি-  
বৃত্ত করিব।

এই জাতি পার্সি, গুইবার বা ঘিবার  
এই তিন সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে।  
প্রাচীন পারস্যজাতিহইতে এই জাতির  
উৎপত্তি হইয়াছে। অষ্টম খৃষ্টাব্দে মু-  
সলমানেরা তাহাদিগকে স্বদেশ হইতে সং-  
গ্রামে তাড়াইয়া দেয়। সুতরাং পার্সিজাতি

তাহাদিগের সহিত প্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহারা মুসলমানদিগের ক্রমিক উৎপীড়নে পারস্য দেশের কোন অঞ্চলে নিৰ্ব্বাহে অবস্থান করিতে না পারিয়া সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তস্থিত গুজরাটে আগমন পূর্বক আশ্রয় গ্রহণ করিল। যে সময়ে ইহারা কথিত প্রদেশে আগমন করে, তখন ইহাদের সংখ্যা তত অধিক ছিল না। কিন্তু ক্রমশঃ সন্তান সন্ততি দ্বারা সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে ইহাদের মধ্যে অনেকে সুরাট, বোম্বাই, বরোচ ও ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমার অন্যান্য স্থলে বাস করিতে বাধ্য হয়। ইহারা প্রথমতঃ পারস্য হইতে তাড়িত হইয়া পারস্যখাড়ির অন্তর্গত অরমস দ্বীপে ১৫ বৎসরকাল অবস্থিতি করিয়াছিল। কিন্তু একদিকে জীবিকা নিৰ্ব্বাহের নিকপায় দেখিয়া ও অন্যদিকে শত্রুবর্গের উৎপীড়নে ক্লান্ত হইয়া, কতিপয় ক্ষুদ্র জলপোতারোহণে ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তে আগমন করিল। আসিবার সময় ইহারা ইহাদিগের ধর্মের বীজস্বরূপ “পুতামি” সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। প্রাচীন রোমকদিগের ভেষ্মাল (দেবমন্দির) হইতে চিরপ্রজ্বলিত পবিত্র অগ্নির নাম এই অগ্নিও নিৰ্ব্বাহ করা নিষিদ্ধ। এই অগ্নি নিৰ্ব্বাপিত হইলে পার্সিদিগের ধর্মের একেবারে অলঙ্ঘন ঘটিয়া উঠে। এই জন্য বহুসংখ্যক পুতামি এখনো ইহাদিগের দেবমন্দিরে সমভাবে প্রজ্বলিত হইয়া আসিতেছে।

সত্য মিথ্যা ঈশ্বর জ্ঞানেন; কিন্তু ইহাদিগের যেকোন অগ্নির প্রতি ভক্তি ও যত্ন, তাহাতে এরূপ হইলেও হইতে পারে। আমাদিগের বিবেচনায় প্রাচীন রোমানদিগের দেবমন্দিরে চিরপ্রজ্বলিত অগ্নিপূজার প্রথা এই পার্সিদিগের পূর্বপুরুষগণের অগ্নিপূজার অনুকরণেই প্রচলিত হইয়াছিল। যেহেতু রোমের বহুকাল পূর্বে পারস্যের ধর্ম, সমাজ, ও অন্যান্য বিষয়ের যে উন্নতি হইয়াছিল, পুরাতন আমাদিগকে সে কথা বলিয়া দিতেছে। সুতরাং পূর্ববর্তীদিগের অনুকরণ করিয়া পরবর্তীয়েরা অনেক বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পার্সিরা গুজরাটে উত্তীর্ণ হইয়া কাশে খাড়ির তীরস্থ ডিউ নামক নগরে প্রথমতঃ অবস্থান করিয়াছিল। পরবর্তী সময়ে পৰ্তুগিজেরা এস্থান অনেক দিন পর্যন্ত অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। পার্সিরা কিছুকাল এই স্থানে অবস্থান করতঃ খাড়ি পার হইয়া সুরাটের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গিয়া অবস্থিতি করিল। তদঞ্চলের হিন্দুরাজা তাদৃশ সজ্জিতপন্ন ও সমরনিপুণ ছিলেন না, সুতরাং অপরিচিত আগন্তুকদিগকে কোন মতে দূরীকৃত করিতে না পারিয়া অগত্যা বসবাস ও অগ্নিদেবতার মন্দির নির্মাণ করিবার অনুমতিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন।

অষ্ট শতাব্দী অতীত হইতে না হইতে কেবল বোম্বাইতে পার্সি জাতির সংখ্যা

২০০০ সহস্র হইয়াছিল। এক্ষণে উক্ত স্থানে ইহাদের সংখ্যা অপরিমাণে পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর প্রদেশেও এই জাতির সংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে। পূর্বে যে জাতি খ্রীষ্টকালের ক্রীণ শ্রোতের ন্যায় ভারতবর্ষে আগমন করে, সেই জাতি এক্ষণে বর্ষাকালীন শ্রোতের আকার ধারণ করিয়াছে। অধুনা ভারতবর্ষের লোকসংখ্যাসম্বন্ধে এই জাতি অনেকটা পুষ্টিসাধন করিতেছে।

পার্সিগণ নিরতিশয় পরিভ্রমী, কার্যদক্ষ ও শ্রুতর। ইহারা অর্থাজ্ঞানের জন্য দেশ দেশান্তরে অনায়াসে বাতায়ত ও বসবাস করিয়া থাকে। একরূপ কথিত আছে যে, যেখানে অন্য কেহই আহার্যাহরণ করিতে পারেনা, সেখানে একজন পার্সি অনায়াসে উহা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। ফল কথা, পরিভ্রম, কার্যদক্ষতা-প্রভৃতির গুণে পার্সি যেখানে যাউক না কেন, কিছু না কিছু অর্থলাভ করিতে অশক্ত হয় না। ইহারা দীর্ঘ ও শক্তিশালী অবয়বসম্পন্ন। দৌন্দর্য্য বিষয়েও ইহাদিগকে প্রশংসা করিতে হয়। কিন্তু পার্সিজাতীয়া বালিকাগণ শৈশবকালে যাদৃশী রূপবতী ও মাধুর্য্যশালিনী থাকে, বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইবার পূর্বেই সে রূপ ও মধুরতা হইতে বঞ্চিত হয়। তখন পুরুষজাতির ন্যায় অনেকাংশে তাহাদের আবয়বিক পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। সুতরাং বিংশতিবর্ষীয়া একটি পার্সি রমণী

অপেক্ষা একজন ঐরূপ বয়ঃস্থা হিন্দু বা মুসলমান কামিনী যে অধিকতর সুলভ্য, তাহা বলা বাহুল্য।

হিন্দুজাতির বেদ, মুসলমান জাতির কোরান, খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণের বাইবেল-যে-রূপ মৌলিক ও সর্বপ্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ, সেই-রূপ পার্সিদিগের “জেন্দ আভেস্তা” আদি ধর্ম্মপুস্তক। প্রাচীন পারস্য জাতীয় জোরোস্তর নামক জনৈক মহর্ষিকর্তৃক সেই ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, পার্সিরা অম্মুপাসক। এতদ্ভা-তীত ইহারা সূর্যের ও আরাধনা করিয়া থাকে। জোরোস্তর প্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থে যে সকল ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিধি আছে, পার্সিরা তাহার কতক কতক স্বেচ্ছানুসারে পরি-বর্তিত ও পরিবর্তিত করিয়াছে। প্রাচীন পারস্যবাসী অগ্নিপূজকদিগের সহিত অধুনাতন পার্সি অগ্নিসেবকগণের ধর্ম্মশাসন দেখিলেই তাহা এক প্রকার প্রতীয়মান হয়। প্রোস নামক একজন ভ্রমণকারী বলেন যে, প্রাচীন পারস্যবাসীরা সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পূজা করিত, কিন্তু অগ্নি ও সূর্যকে ঈশ্বরজ্ঞানে কখনই সেবা করিত না। কেবল ঐ দুই তেজস্কর জড়-পদার্থ ঈশ্বরের স্বষ্টিমধ্যে সর্বপ্রধান বলিয়া বর্ণিত এই মাত্র, তাহার মতে জোরোস্তরের “জেন্দ আভেস্তা” এইরূপ শাসনে রচিত; কিন্তু পরবর্তী পার্সিগণে অজ্ঞতা ও অকম্প-নাদোষে সূর্য ও অগ্নিকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছে। এই জড় প-

দার্থ্র্যের পূজাপ্রচলনবিধি বড় আধুনিক নহে, বহু প্রাচীনকাল হইতে, ইহা চলিয়া আসিতেছে। কথিত আছে, যখন দেবায়ুস্ সৈকেন্দর সার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন, তখন তাঁহার সম্মুখে রোপা বেদীতে করিয়া এই “অনন্ত অগ্নি” লইয়া গিয়াছিলেন। যাইবার সময় মেগাইগণ (পুরোহিত মণ্ডলী) অগ্নির স্তব গান করিতে করিতে সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং বৎসরের দিনসংখ্যা স্মরণার্থ ৩৬৫ জন যুবা বক্তবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সমভিব্যাহারী হইয়াছিল। পাঠক, শেষোক্ত ঘটনাটির নিগূঢ় তত্ত্ব কি কিছু বুঝিতে পারিলেন? আমিতো পারিসাম না। যাহা হউক, বৈদিক সময়ের পরবর্তী হিন্দুধর্মিগণ যেমন যজ্ঞসমুদয়ে পুরাণাদি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ জৈন আভ্যন্তরিক সময়ের উত্তরবর্তী প্রাচীন পার্সিরা জোরোস্তরের ধর্মবিধির উপর অল্প অল্প ভিত্তিতে দৈবের পরিবর্তে অগ্নি ও সূর্য্যকে পরমদেবতা করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন-পারস্য-বংশীয় আধুনিক পার্সিরা যে সেই পথের অনুসরণ করিবে, তাহাতে বৈচিত্র্য কি?

ঐসদেশীয় প্রাচীনইতিহাসবেত্তা হিরোদটস্ বলেন যে, পূর্ব্বতন পারস্যেরা দৈবরাজ্যে অগ্নির পূজা করিত। তাৎকালিক মেগাইগণ অন্যান্য দেবমূর্তিতে দৈবের অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত না, কেবল

অগ্নিই তাহাদিগের মতে দৈবের দ্বিতীয় মূর্তি বলিয়া তাহারা অজ্ঞা ভক্তি প্রদর্শন করিত। মেগাইগণ দুইটি মূল সূত্র স্থাপিত করিয়াছিল। সেই দুইটির মধ্যে একটি মঙ্গল ও অপরাধ অমঙ্গলের কাবণ। প্রথমটির নাম ‘অরস্মাদিস্’ ও দ্বিতীয়টির নাম ‘অদমান’। আলোক ও অন্ধকারকে লক্ষ্য করিয়া এই দুইটি সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। পাঠক, বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রাচীন মেগাইগণ মানবজগতের উপকারার্থ কেমন কৌশলে এই দুইটি সূত্র বা মূল বাক্য নিধাইয়া গিয়াছেন। এখানে আলোক অর্থাৎ দৈবের বিশ্বাস, দয়া, হিতৈষিতা, পরোপকার প্রভৃতি এবং অন্ধকার অর্থাৎ নাস্তিকতা, পাণাচারিতা ইত্যাদি এই সূত্রদ্বয়ের মধ্যে কৌশল সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। মহর্ষি জোরোস্তর-কৃত নীতিগুলি অতি উৎকৃষ্ট। সেগুলি এক একটি করিয়া দেখাইতে গেলে বাক্যবেদ্য হইবে না, সুতরাং তাহার কএকটি মাত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

১। “যে ব্যক্তি মানস-ক্ষেত্রে পরিশ্রম-রূপ বীজ বপন করে, সে দশ সহস্র মৌখিক প্রার্থনা অপেক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে ধর্মরূপ শস্য লাভ করিতে সক্ষম হয়।”

২। “যে ব্যক্তি একমাত্র সত্য-রত্নকে চিন্তাধারে রাখিতে সক্ষম হয়, তাহার নিকট অচিরস্থায়ী মণি মুক্তাদি ভাস্কর্য্য প্রতীক্ষমান হয়।”



৩। “যে ব্যক্তি আন্তরিকতা-রূপ আলোকে অবস্থান করে, তাকে অমাবসার অন্ধকার ভীত করিতে পারে না।”

৪। “যাহার চিত্ত নাস্তিকতা অবলম্বন করে, সে বিজ্ঞতালোকের পরক্ষণ-জাত গাঢ়তর তমসে পড়িয়া মরে।”

৫। “আহার্য যেমন শরীরকে জীবিত রাখে, সেইরূপ ধর্ম চিত্তকে তেজস্বি করে।”

৬। “ধর্মে অবিশ্বাস করা আর অস্বহতা করা উভয়ই সমান।”

৭। “যে পিতা, মাতা, শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনকে আদ্রা ভক্তি করে, সে ঈশ্বরের দর্শন পায়।”

৮। “পরোপকারই জীবন ও পরাপকারই মরণ।”

৯। “অর্থের বশীভূত হইয়া পরমার্থ তাগ করা আর নক্ষত্রালোক প্রিয় জ্ঞান করিয়া চন্দ্রালোকে অবহেলা প্রদর্শন করা উভয়ই তুল্য।

১০। “পরিনিম্মা করিলে আপনার নিম্মা করা হয়। এ জগতে আত্মপর কেহই নহে।” ইত্যাদি।

জ্যোতিষশাস্ত্রের এইরূপ বিবিধ প্রকার ধর্মনীতি ও সমাজনীতি আছে।

পার্সিরা প্রভাতে পূর্বমুখ এবং সন্ধ্যার পূর্বে পশ্চিম মুখ হইয়া সূর্যের আরাধনা করে। ইহাদিগের ধর্মসম্বন্ধীয় কোন কার্য উপস্থিত হইলে চিরপ্রজ্বলিত পবিত্র অগ্নির সম্মুখে বসিতে হয়। হিন্দুদিগের

পুরোহিত যেমন ‘অপবিত্রঃ পবিত্রোবা’ ইত্যাদি মন্ত্রে যজমানের চিত্তশুদ্ধি করিয়া থাকেন, ইহাদিগের পুরোহিত সেরূপ কোন মন্ত্র না বলিয়া যজমানদিগকে স্বহস্তে কিঞ্চিৎ জলপান এবং তৎসঙ্গে দাড়িষের পত্র চর্চন করিতে দেন। এইরূপ করিলে চিত্তশুদ্ধি সংসাধিত হইয়া থাকে। পার্সিদিগের মতে উপবাস করা নিষিদ্ধ।

এই জাতির মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা যেমন প্রচলিত নাই, সেইরূপ আবার অবিবাহিত অবস্থায় অবস্থান করাও ব্যবহার বিকল্প। পূর্বে পার্সিদিগের উগ্রাহ প্রথা স্বতন্ত্ররূপ ছিল, এক্ষণে কিয়দংশ হিন্দুপ্রথার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে দেখা যায়।—কিন্তু ইহাদিগের শব-সংকার-প্রণালী হিন্দুদিগের সঙ্গে কোন রূপেই মিলে না; পাঠকের পক্ষে নূতনবোধে উক্ত জাতির শবদাহপ্রথা সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে।

সাংঘাতিক পীড়ায় বা আকস্মিক ঘটনায় প্রাণবিরোগ হইবামাত্রই প্রায় ইহারা মৃত্যুব্যক্তিকে সমাধিস্থলে লইয়া যায়। এই জাতির শববহনের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট লোক নিযুক্ত আছে। তাহারা মৃতদেহ বহনকালে বাকা উচ্চারণ বা কাষ্ঠ স্পর্শ করে না। মৃতরাং লৌহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুময় আধারে করিয়া মৃতদেহ লইয়া বাইতে হয়। যদি সমাধিস্থলে যাইবার সময় কোন কাষ্ঠনির্মিত সেতু উপলব্ধ হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার উপর

তাত্তপত্র বা মৃত্তকা বিশেষরূপে বিছাইয়া দিতে হয়। শববহনাদ্বারা শ্বেতবস্ত্র বিছাইয়া, শ্বেতবস্ত্রে মৃতদেহ আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে স্থাপন করিতে হয়। শ্বেতবস্ত্র পরিহিত ছয় ব্যক্তি সেই শবসমেত শবাবধার বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাদিগের পশ্চাতে দুই দুই জন পার্শ্বপার্শ্ব করিয়া অনেকগুলি আত্মীয় ব্যক্তি ধীরে ধীরে গমন করিতে থাকে। পার্সিজাতির সমাধিভূমি উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া গোলাকারে নির্মিত। প্রাচীরের মূল-হইতে সমাধিভূমির মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ঢালুভাবে নির্মিত। ঠিক মধ্যস্থলে একটা গভীর কূপ আছে। ঢালুভাগ এত ম-  
 স্ত্রণ যে, মৃতদেহ গড়াইয়া দিলে একেবারে সেই কূপের ভিতর গিয়া পতিত হয়। শব নিক্ষেপের সময় ইহারা শবকে উলঙ্গ করিয়া ফেলে। ইহাদিগের একরূপ বিশ্বাস যে, শকুনি, গৃধ্রীণী প্রভৃতি শবখাদক পক্ষিগণ শবের সমুদয় মাংস খাইয়া ফেলিলে মৃত ব্যক্তির পরলোকে যথেষ্ট মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে। যাহা হউক এতদ্বারা মৃত ব্যক্তির মঙ্গল হউক আর না হউক, সমাজের কতকটা মঙ্গল হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জাতির সমাধি ভূমি তিনভাগে বিভক্ত। মৃত স্ত্রী, পুরুষ ও শিশুদিগের জন্য একরূপ করা হইয়াছে। সমাধি কার্য সমাধা হইবার পর সকলে চলিয়া গেলে কেবল একজন মৃতব্যক্তির আত্মীয় সমাধিস্থলের কিঞ্চিদূরে দণ্ডায়মান হইয়া

নিষ্কিণ্ড শবের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। একরূপ করিবার মর্ম্ম এই যে, শবখাদক পক্ষী নিষ্কিণ্ড শবের কোন চক্ষু অগ্রে উৎপাটন করে। দক্ষিণ চক্ষু অগ্রে উৎপাটন করিলে মৃত ব্যক্তির আত্মা সুখী, কিন্তু বাম নেত্র প্রথমে ঐরূপ করিলে উহার আত্মা দুঃখী। পার্সিদিগের দ্বারা ক্রমান্বয়ে শবরাশির মাংস ভক্ষিত হইয়া অন্তিমরূপে সমাধিকূপ পরিপূর্ণ হইয়া যায়, স্তরান্ত মধ্যো মধ্যে অস্থিরাশি অপসারণ করিবার জন্য ঐ কূপহইতে একটা স্বতন্ত্র স্রুঙ্গ আছে, তাহাতেই ঐ কার্য সমাধা হইয়া থাকে। পার্সিদিগের সমাধিভূমি ও সমাধিক্রিয়া সম্বন্ধে টমসন্ হার্বর্ট বলেন যে, “পার্সিদিগের এই অপরিষ্কৃত ও বিভীষণ সমাধিভূমি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করা অপেক্ষা কর্ণে শ্রবণ করাই ভাল। ইহারা শব সমাধিস্থ করিবার পর আর সেখানে গমন বা তদ্বিষয়ে কোন অনুসন্ধান করে না, কেবল গৃহেতেই অনবরত বিনাপ করিয়া থাকে। কাষ্ঠদ্বারা ইহাদিগের পবিত্র অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় বলিয়া ইহারা মৃতদেহ লৌহাধারে করিয়া লইয়া যায়।” অন্ত্যোক্তি-ক্রিয়ার সময় পার্সিরা কোন ইউরোপীয়কে সমাধিস্থলের ঘটনা দেখিতে দেয় না; এমন কি, (এলফিনিটোম বলেন) যদি তাহাদিগের ধর্ম্মবহির্ভূত অন্য কোন ব্যক্তিকেও সমাধি কার্যের সময় তথায় দেখিতে পার, তাহা হইলে তাহারা তাহাকে

যৎপরোনাস্তি পীড়ন করে। পূর্বে প্রাচীন পারস্যাবাসী মেগাইগন এই প্রণালীতে অস্ত্যোক্তিক্রিয়া সম্পাদন করিত। আধুনিক পার্সিগণ তাহাদিগের সেই প্রথা ও পুতায়ি প্রভৃতি ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়াছে।

বোধে স্বীপের মধ্যে মালাবার নামক

একটা ক্ষুদ্র পর্বত আছে। সেইখানেই উক্ত দ্বীপস্থ পার্সিদের সমাধি ভূমি, ইউরোপীয় ও মুসলমানদিগের সমাধি মন্দির আছে। এতদ্ব্যতীত সে স্থলে হিন্দুজাতিরও শবদাহ হইয়া থাকে। দেখিতে গেলে মালাবার পর্বত একটা ভীষণ দৃশ্যমান।

শ্রীরাজ—

## রুল ব্রীটানিয়া।

১

প্রমোদ-কানন, শোভার আধার,  
বীরভের খনি, বিদ্যার ভাণ্ডার,  
রক্ত-আন্তরণ রাজেন্দ্রানীপ্রায়  
শোভে শ্বেতদ্বীপ সলিল-শয্যায় ;  
রাজবস্ত্রে বহে বাণিজ্যের স্রোত,  
পোতাশ্রমে শোভে শত শত পোত ;  
শাল-রক্ষ-সম গুণ-রক্ষ-চূড়ে  
সারি সারি কেতু ধীরে ধীরে উড়ে ;  
চতুর্দিকে বাসু ভ্রমিছে গাইয়া,—  
‘মাগর-বাসিনী কল ব্রীটানিয়া।’

২

শত-স্বর্ণ-মৌদ-মালিনী লগুন  
টেমস-সলিলে হেরিছে আপন  
বিচিত্র চিত্রিত সূন্দর মুরতি,  
যেন রূপবতী ষোড়শী যুবতী  
হীরা, মুক্তা, মণি, মাণিক্যে আদরে  
সাজাইয়া দেহ, গরবের ভরে,

স্বচ্ছ দরপণে হেরিছে বনন ;  
বক্ষে সেই ছায়া করিয়া ধারণ  
স্রোতঃ ছলে যেন নাচিয়া নাচিয়া  
গায় স্রোতস্বতী,—‘কল ব্রীটানিয়া।’

৩

শ্বেত-দ্বীপ, তব মহিমা অপার !  
ব্রহ্মজলধি পরিখা তোমার,  
ঝড় ঝঞ্ঝাবাত তব আজাবহ,  
বিদ্রোহ তোমার দুতী অহরহ ;  
চতুর্দিকে তব নীল বারি-রাশি  
মধ্যে তুমি,—যেন পূর্ণিমার শশী  
শারদ অম্বরে—কিবা মনোহর !  
তব পদ সদা চুম্বিছে মাগর ;  
আপনি বকণ তরঙ্গ তুলিয়া  
গায় প্রতি দিন,—‘কল ব্রীটানিয়া।’

৪

ক্রতগতি তরী করি আরোহণ,  
হেলায় তরঙ্গে করিয়া দলন

নির্ভীক নাবিক দূর দেশে যার,  
ত্রীটনের নামে দিগন্ত জাগায়;  
প্রকাশে ঘুরতি রণতরী ভরি  
ত্রীটন-তনয় যুদ্ধ সজ্জা করি  
চলে শত শত, ক্রম্ ক্রম্ ক্রম্  
'কল ত্রীটানিয়া' বাজে অশ্রুশ্রম;  
দূরশৈলমালা আকাশে মিশিয়া  
করে প্রতিধ্বনি,—'কল ত্রীটানিয়া!'

৫

বীর অবতার ত্রীটন তনয়,  
মহা বীর্যবান, কেশরি-কন্দর;  
ভেরাগিয়া মুখ, সংসারের মারা,  
পিতা, পুত্র, ভাই, প্রাণাধিকা জায়া,  
স্মরি জন্মভূমি, স্মরি শেষবার  
প্রিয়জনমুখ,—বাজে বীরংবার  
ভীষণ বাজনা—প্রবেশে সমরে,  
পদভরে ধরা টলমল করে;  
বীরবক্ষে যেন বিদ্রাৎ ঢালিয়া  
বাজে ঘোর রোলে—'কল ত্রীটানিয়া!'

৬

রত্নগর্ভা, শত-বীর-প্রসবিনী,  
ওরেলিটন, বেক, নেলসন-জননী!  
নীলের সমরে যে দিন নেলসন  
ভীম প্রসরণে করিল বেঞ্চন  
ফরাসীর সেনা; কাঁপারে মিশর,  
কাঁপারে জলধি, মহাভরতর  
শত শত তোপ গরজি উঠিল,  
গন্ধকের ধূমে জগত ঝাঁসিল;  
সেই অন্ধকারে রহিয়া রহিয়া  
বাজিল গভীরে—'কল ত্রীটানিয়া!'

৭

হতাশে বিবাদে আকুল হৃদয়,  
যে কূলমে নেপোলিয়ান দুর্জয়,  
—(যেন মুছিবারে লসার্ট-লিখন)  
ওয়াটলুর ক্ষেত্রে আরম্ভিলা রণ;  
দুই সৈন্যে ঘোর সংগ্রাম বাধিল,—  
সিংহে সিংহে যেন মুকিতে লাগিল;  
ঘোর ঝগাঝকার হেঁচা হোঁচরা রবে  
বরসল-বাদী সশস্ত্র যবে,  
প্রণীয় সংগীত সহিত মিশিয়া  
বাজিল সে দিন,—'কল ত্রীটানিয়া!'

৮

হৈমবতী চাক উবার কিরণে  
যে দিন শোভিল পলাসি-প্রাক্ষণে  
সিরাজ সমক্ষে ইংরেজের বল;  
হন হন করি ঘোর কোলাহল  
বাজিল দামাঘা, শিঙ্গা, ঢাক, ঢোল,  
উঠিল চৌদিকে ডয়ঙ্কর রোল;  
পড়িল মদন; কামান ধলিল,  
ইংরেজের জয় ঘোষণা করিল;  
গভীর উল্লাসে উঠিল বাজিয়া  
বিজয়ী সংগীত,—'কল ত্রীটানিয়া!'

৯

তুনি প্রতিদিন শুইয়া শয্যায়  
'কল ত্রীটানিয়া' সৈনিকেরা গায়;  
কল ত্রীটানিয়া ?—কোথায় ?—ভারতে ?  
আর্থের নিবাস এ আর্থাবরতে ?  
ভাবি মনে মনে, বুঝা যুগ ঘোরে  
শ্রুপন শ্রুদরী প্রতারিছে ঘোরে;  
পরক্ষণে, হায়, গরজিয়া ওঠে

প্রাকালিক তোপ ; প্রতিধ্বনি ছোটে,  
ত্রিগুণ দাপটে দিক্ ডুবাউয়া  
বাজে যন যন,—‘কল ত্রীটানিয়া !’

১০

মেলিয়া নয়ন অপরূপ হেরি,—  
হাসে কলিকাতা সোণার নগরী ;  
সৌধমালা-শিরে সৌরকর খেলে ;  
দুর্গ-চূড়ে কেতু ধীরে ধীরে দোলে ;  
ফিট্‌ পরিচ্ছদ পরিধান করি,  
অঙ্গের সৌরভে চতুর্দিক ভরি,  
কেটিলে চড়িয়া চলছে ইংরাজ.  
বামে বিধুমুখী করেন বিরাজ,  
বৈতালিক গীত সহিত মিশিয়া  
বাজয়ে ইডনে,—‘কল ত্রীটানিয়া !’

১১

সূর্য্যবংশীর সিংহাসনে আজ  
ত্রীটানিয়া, তুমি করিছ বিরাজ ;  
আজি অযোধ্যায় কি শুনিছি হায় !  
কোথা রঘুবীর ! সৌমিত্রী কোথায় !  
রাজরাজপুত্রী আজ অন্ধকার !  
মুছি নয়নের, হায়, শতধার,  
চারিদিকে চাই, শূন্য সব ঠাই !  
‘কোথায় এলাম’—স্মৃতির—মুখাই ;  
অমনি শুনিয়া উঠি চমকিয়া,

দূর দুর্গে বাজে ‘কল ত্রীটানিয়া !’

১২

কৈদনা লেখনি ! ফেল দুঃখসাজ,  
হস্তীনার মহারাজসুয় আজ ;  
ভিক্টোরিয়া আজ ভারত-সুধরী !  
রত্ন সিংহাসনে, আহা মরি মরি,  
চেয়ে দেখ দেখ, আসীন লিটন !  
মহা মহিমায় উজ্জ্বল বদন !  
চতুর্দিকে বসি রাজনামগুন,—  
আখণ্ডে বেড়ি যেন দেবদল !  
আর্য্যহুতে যেন স্তম্ভিত করিয়া  
হস্তে বাজিতেছে,—‘কল ত্রীটানিয়া !’

১৩

ছরস্ত প্রতাপ ত্রীটন তোমার !  
ভব নামে যেন কাঁপে চারিধার !  
হিন্দু রাজত্বের ভয়শেষোপরি  
মোগলের যেই অর্দ্ধ-শলী মরি  
বর্ষ পঞ্চশত করিল বিরাজ,  
অস্তাচলশায়ী সেই শলী আজ !  
সীক, রাজপুত, সবে ত্রীয়মাণ,  
পাদ্য অর্ঘ্য দেয় নেপাল ভোটান,  
নিয়তির গতি কে রাখে রোধিয়া ?  
আর্য্য-ভূমে বাজে—‘কল ত্রীটানিয়া !!’

জিদী—

## সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। জীবনালেখ্য। জীবন হুগো-মোহন দাসের পরলোকগতা সহধর্মিণী ব্রহ্মময়ী সংক্ষেপ জীবন রত্নান্ত। আমরা এই গ্রন্থখানি অত্যন্ত আদরসহকারে পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠসময়ে অনেক স্থলেই অশ্রুজলে আধুত হইয়াছি। গ্রন্থকার একজন প্রশস্তমনা সন্তদয় মনুষ্য। তাঁহার লেখ্যতেও সেই সন্তদয়তা প্রতি পংক্তি-তেই প্রতিফলিত হইয়াছে।

চরিতাখ্যায়কের সাধারণতঃ নিম্নশ্রেণির ব্যক্তি। তাঁহারা প্রায়শঃ যশোরনিরই পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইয়া থাকেন। যে সকল সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা সত্ত লোক-কোলাহলে অভিনন্দিত রহেন, উৎসানে ও উপবেশনে জ্ঞতির অভ্যর্থনা পান, এবং ইজিতমাত্রেরই লোকের স্মৃতি-সম্পর্কে প্রভুহস্তিতে সমর্থ হন, চরিতাখ্যায়কদিগের ধূমাক্ষ চক্ষু তাঁহাদিগের প্রতিই আকৃষ্ট থাকে। তাঁহারা ঐ সকল আপাতমনোরম উজ্জ্বলদৃশ্য পরিভাগ করিয়া প্রকৃত মণিযুক্তার মলিন প্রভাষ মোহিত হন না। কিন্তু যিনি যথার্থরূপে মানবজীবন পাঠ করিতে পারিয়াছেন, তিনি বুঝিয়াছেন যে, সিংহাসনের প্রান্তদেশেও যে প্রবাহ, পর্বতভূমির অভ্যন্তরেও সেই

প্রবাহ;—কীর্তির কাককার্যময় ঝল ঝল দীপালোকেও যে জ্যোতিঃ, কীর্তিবিরহিত অজ্ঞাতজীবনের অকৃত্রিম আলোকেও সেই জ্যোতিঃ। জীবনালেখ্যের রচয়িতাকে আমরা এই শেষোক্ত শ্রেণির একজন নিপুণ ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিলাম। একটি সাধুদয়ী সরলপ্রাণা অবলা, সংসারে অপরিচিত রহিয়াও, অলক্ষিত দেবতার মত কত লোকের দুঃখতার মোচনে ক্লত-কার্য্য হইতে পারেন, তিনি এই অযত্নসম্পন্ন আলোকে তাহা অতি বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দি।—

২। সতীপরিণয়ম্। ময়মনসিংহ, সেরপুরাধিবাসি জীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-প্রণীতম্।—ইহা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, যে বঙ্গীয় সমাজে ইদানীং কাব্যের এত আদর, এত অনুশীলন, সতীপরিণয়ের মত উপাদেয় ও মনোহর বস্তু অত্য়পি সেখানে লোকের নিকট অপরিচিত! আ-মাদিগের বিবেচনায় ইহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য, এবং ইহার রচয়িতা সর্ব্বথা যশস্বী হওয়ার উপযুক্ত। এইজন্য তাঁহারা সংস্কৃত লিখেন, তাঁহাদিগের অনেকেই ব্যাকরণশাস্ত্রের সহায়তার শব্দের সহিত

শব্দমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন; কিন্তু কো-  
থার কিরূপ শব্দবিন্যাসে কিরূপ রসের উ-  
চ্ছ্বাস হয়, তাহা অনুভব করিতে সমর্থ  
হন না। আধুনিক অনেক সংস্কৃতকবিতায়  
শ্লীলিত ব্যক্তিদিগের এই জন্যই অবজ্ঞা।  
সতীপরিণয়ের সংস্কৃত প্রায় প্রাচীন সং-  
স্কৃতের ন্যায়,—প্রাঞ্জল, মধুর, মদালস;  
পাঠমাত্রেই অর্থ প্রতীতি হয়, এবং পাঠ-  
মাত্রেই পাঠকের প্রাণ কবির প্রাণের সূ-  
খ সংস্পর্শে শীতল হইতে থাকে। ইহার  
লেখা বাঙ্গালিজাতির গৌরবকর। কারণ  
ব্রটিশ-ইণ্ডিয়াবাসী বর্তমান বাঙ্গালির  
দ্বারা এইরূপ সম্ভাবিত্বিত পুন্দলিত সংস্কৃত  
কাব্য রচিত হওয়া সামান্য আত্মলাভ এবং  
সামান্য অভিমানের বিষয় নহে।—আ-  
মরা পাঠকবর্গের তৃষ্ণার জন্য সতীপরিণ-  
য়ের দুই একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া  
দিলাম। আমাদের ভরসা আছে, ইহারা  
সংস্কৃতে অনুরাগী, তাঁহারা ইহার আদ্যা-  
পান্ত পাঠ করিবেন। এই কাব্যের অনেক  
স্থলেই কুমারসম্ভবের অমুকৃত দৃষ্ট হইবে;  
কিন্তু কালিদাসের এইরূপ অমুকরণ-চেচ্চা  
বশেরই কথা, অপবশের কথা নহে।—

“বামেন, বামাকি ! বিলোকয়ৌর্জঃ  
কৈলাসমালোকয়িতুং দিগন্তম্ ।  
শৃঙ্গেরনৈকৈককভির্করোক ।  
এবং স্ত্রিতং মন্তকমুরময্য ।”

\* \* \*

“অশ্বিন শশকোপলভিত্তিভাণে  
নিশাপ্ত সুসুদুর্কৌমুদীকে ।

সিদ্ধাঙ্গনামাষতিসারিকাণাং  
চলন্তি পাদাঃ কলশিঞ্জিতানাম্ ॥  
নিশাপ্ত তারানিকরস্য শব্দং  
সমস্ততোহসৌ প্রতিবিম্বিতাঙ্গঃ  
শাখীব সংলগ্নতুবারগৌরঃ,  
খদ্যোতমালা খচিতো বিভাতি ॥”

৩। রামের বিয়ে। প্রহসন। জীকৃষ্ণ-  
প্রসাদ মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকা-  
শিত। এইরূপ কদম্বা পুস্তক বাঙ্গালা য-  
ত্নালয়সমূহ কর্তৃক অদ্যাপি উদ্যোতিত হই-  
তেছে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।  
কিছু দিন হইল, বাঙ্গলবকার্যালয়ের একজন  
কর্মজারী কর্তৃক ‘কলির বো ঘরভাঙ্গানী’  
নাথ একখানি নাটক প্রকাশিত হইয়া-  
ছিল। সে খানি যেমন নাটক, রামের  
বিয়ে তেমনই প্রহসন। পাঠকবর্গের কো-  
তুহল নিবারণার্থে এই একটি কথা বলিয়া  
দেওয়া আবশ্যিক যে, এই প্রহসনের রাম  
সৌভাগ্য বশতঃ অযোধ্যার রামচন্দ্র ন-  
হেন। ইহার নাম রামতারণ মুখোপা-  
ধ্যায়; নিবাস কলিকাতা।

৪। এর উপায় কি। জীবীর মশা-  
ররক্ হোসেন প্রণীত। ইহাও আর এক  
খানি প্রহসন। এদেশের মুসলমান ভদ্র-  
লোকেরা সাধারণতঃ সাহিত্যে বীতল্পহ;  
বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহাদিগের  
কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয়  
না। সুতরাং যখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ  
কদাপি সখ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে ইচ্ছা  
করেন, তখন আমরা বিভ্রান্ত পূরী হই,

এবং তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতেই প্রা-  
ণপণে যত্ন করি। কিন্তু যদি তাঁহারা, ব-  
শোলাভের এমন সহজ পথ থাকিতেও,  
কম্পনায় ও ভাবায় যার পর নাই জগদা  
কচির পরিচয় দেন,—অল্লী পদাবলীর  
ছড়াছড়িকেই কাব্যরসে রসিকতা মনে  
করেন, তখন এই গ্রন্থকারের ন্যায়  
আমরাও বিপন্ন হইয়া ইহাই জিজ্ঞাসা  
করি,—এর উপায় কি?

৫। রত্নাবতী। পতিব্রতা-উপাখ্যান।  
বেনারসনিবাসিনী জীমতী ভুবনমোহিনী  
দেবী প্রণীত। এই ছন্দোবদ্ধ উপাখ্যানটি  
পাঠ করিয়া আমরা অপ্রীত হই নাই; গ্রীত  
হইয়াছি, এমনও বলিতে পারি না। ইহার  
কোথাও কবিত্বের ক্রীড়া নাই, কিন্তু লেখা  
বালিকার পক্ষে নিতান্ত দ্বন্দ্বীয় নহে।

৬। সরলা। প্রথমভাগ। শিশু-  
দিগের উপযোগি কবিতা। জীহরিদাস  
গজোপাধ্যায় প্রকাশক। ইহাতে উবা,  
মহাকাল, শরতের শশী, মৌমাছি ইত্যাদি  
শীর্ষক কতকগুলি অসংখ্যক বর্ণে রচিত  
মূললিপি কবিতা আছে, আর কবিতাপাঠে  
শিশুদিগের উপকার হয়, এমন অনেক পু-  
ষধুর উপদেশ আছে। আমরা শিশুশি-  
কার উপযোগিনী কবিতা না দেখিয়া স-  
র্বদা দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি। সরলার  
রচয়িতা বহুপরিমাণে আমাদের সেই  
দুঃখ অপনোদন করিয়াছেন। এই পুস্তক  
খানি এদেশীয় বিদ্যালয়সমূহের নিম্নতম  
শ্রেণির বালকদিগের নিতান্তই উপযুক্ত।

৭। শিশুপ্রবেশ। অর্থাৎ অল্প-  
বয়স্ক বালক-বালিকাদিগের নিমিত্ত প্রচ-  
লিত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ। জীপ্রসন্ন  
চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত।—আমরা বাঙ্গালার  
শিশুশিক্ষার ব্যাকরণ যতখানি দেখিয়াছি,  
এখানি তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। ইহার রচনাপ্রণালীতে গ্রন্থকারের বিশিষ্ট  
বুদ্ধিমত্তা ও নিপুণতা প্রদর্শিত হইয়াছে।  
সাদারণ্যের সংস্কার এই যে, বালকদিগকে  
যে সে ব্যক্তিই শিক্ষা দিতে পারে, এবং  
যে কোন পুস্তক হইতেই তাহাদিগের বি-  
দ্যাল্যভ্যাস সম্ভব। ইহা ভ্রম। সরলমতি  
বালকদিগের শক্তির পরিমাণ বুঝিয়া তা-  
হার সমতলবর্তী হওয়া নিতান্তই কঠিন।  
প্রসন্ন বাবু এই ব্যাকরণ রচনার সেই কা-  
ঠিন্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন, এবং  
সেই হেতুই এত দূর কৃতকার্য হইয়াছেন।

৮। হেলেনাকাব্য। প্রথমখণ্ড।  
সটীক। আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত। যে সকল  
আধুনিক কাব্য বাঙ্গালাভাষার কঠোর  
আভরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে, এখানি  
নিশ্চয়ই তন্মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য।  
ইহার দ্বিতীয়খণ্ড যখন প্রকাশিত হইবে,  
তখন আমরা ইহার নিম্নতম সমালোচনা  
করিব, এবং সেই সমালোচনার কাব্যের  
আদর্শে উদ্ভাষন করিয়া অমূল্যভাবে অবতরণ  
করিতে যত্নপর হইব। এইক্ষণ এইমাত্র  
বলিতে পারি যে, বাহারা অতিবিশেষ-  
সহকারে ইহার আয়োজন পাঠ করি-  
বেন, তাঁহারা স্থানে স্থানে কম্পনার কম-



নীর লীলাচাতুরী দেখিয়া যেমন পুলকিত  
হইবেম, সেইরূপ অতিসুখাবহ পদবিম্বাস  
দর্শনেও নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিবেন।

ইহার ভাষা মেঘনাদবধের ভাষা অ-  
পেক্ষা অনেক গুণে তরল। এইজন্যই ইহার  
রচনায় রসগত গান্ধীর্থের কিছু অভাব দৃষ্ট  
হয়, এবং এইজন্যই আবার ইহাতে যাদু-  
র্থের ভাগ কোথাও কিঞ্চিৎ অধিক। নি-  
ম্নোক্ত পংক্তিগুলির তুলনা করিলে, এ-  
কথার অর্থগ্রহ হইতে পারে।

মেঘনাদবধে,—

“একাকিনী শোকাহুলা, অশোককাননে,  
কাঁদেন রাসববাণী আঁধার কুটীরে  
নীরবে! হ্রস্ব চেড়ী সতীরে ছাড়িয়া,  
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে,—  
হীনপ্রাণা হরিনীরে রাখিয়া বাধিনী  
নির্ভয়হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে!  
মলিনবদনা দেবী, হায়রে, যেমতি  
খনির তিমির গর্ভে, ( না পারে পশিতে  
সৌর-কর-রাশি যথা ) সূর্য্যকান্ত মগ্ন,  
কিহা বিশ্বাধরা রমা অসুরাশি-তলে!”

হেলেনা কাব্যে,—

“ \* \* \* একাকিনী ধনী—  
মানিনী কণিনী যথা!—কাঁদেন নীরবে।  
বিমুক্ত কবরী, কটি; কুঞ্চিত বিবাহে  
সে কচির মুখছবি! হায়রে যেমতি  
বিজ্ঞাচলে মহামারা, পঞ্চবটীবনে  
জনম-মুখিনী সীতা; ইন্দ্রাণী সন্দরী  
দৈমিষ কাননে কিহা একাকিনী যথা  
অশ্রুরে অত্যাচারে ইন্দ্রাণল ছাড়ি।”

পুনশ্চ মেঘনাদবধে,—

“ \* \* \* হাসি, কহিলা ললনা;  
ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী  
দাসী, কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।  
অবহেলি শরানলে; বিরহ-অনলে  
( দ্রুহ ) ডরাই সদা; তেঁই সে আইনু,  
নিত্য মিত্য মন যারে চাহে, তাঁর কাছে।”

হেলেনা কাব্যে,—

“উত্তরিল। ইন্দুমুখী পূর্ণেন্দুবদনা  
প্রিয়ক্লদা;—প্রাণেশ্বর! কাতর কি দাসী  
সংগ্রামে? বিমুখ কবে নবীনা যুবতী  
উদ্বাহ-উৎসব-রঙ্গে? বীর কুলাজনা  
আমঙ্গা, আজন্ম দেব বীরধর্মে রত।”

২। মিত্রকাব্য। এখানিও হেলেনা  
কাব্যের রচয়িতা ঐযুক্তবাবু আনন্দচন্দ্র  
মিত্র কর্তৃত্ব প্রণীত। ঐযুক্তবাবু জীনাথ  
চন্দ্র ইহার এক ভূমিকা লিখিয়াছেন, এবং  
সেই ভূমিকায় হেলেনা কাব্যকে কবির  
ডমকধনি বলিয়া এখানিকে কবির বংশী-  
ধনিরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। আমা-  
দিগের বিবেচনায় হেলেনা কাব্যে ডম-  
কধনির সাদৃশ্য আছে, কিন্তু যদিও মিত্র-  
কাব্য অন্যত্রে একখানি উপাঙ্গের গ্রন্থ,  
—কবির যশস্বর এবং ভাষার পুষ্টিবর্ধক,  
তথাপি বংশীধনিতে হৃদয় যেরূপ ওদাস্য  
ও আবেশে লগ্ন ও অবশ হইয়া পড়ে, ই-  
হার কোম কবিতাতেই হৃদয়ে তেমন এক  
ওদাস্য ও আবেশ জন্মে না। মিত্রকাব্যের  
একটি গীত এইরূপ,—

“ওরে মন তুমি গৃহে কিরে চলে যাই।

কেন আশার ছলে সকল ভুলে,

ও মন। ইগুগোলে কাল কাটাও ॥

শোন শোনের অজ্ঞান,

তোর কি নাইরে কাণ্ডজ্ঞান

দেশে দেশে ঘুরে কেন হুচ্ছ অপমান ;

এরা ধূর্ত অতি অশ্ল মতি

ওরে দেখে কি না দেখতে পাও। ”

যাঁহার। কবিতায় একতৃ বংশীধ্বনি অবগ  
করিতে চান, তাঁহার। ইহার সহিত মাধবী  
বংশীর নিম্নোদ্ধৃত পদ কয়টির তুলনা  
করুন।

“আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিহু হায়।

তাই ভাবি মনে।

জীবন প্রবাহ বহি, কাল-সিন্ধু পানে যায়,

ফিরাব কেমনে ?

দিন দিন আনু ছীন ; ছীনবল দিন দিন,

তবু এ আশার নেশা ছুটিল না ? একি দায় !

রে প্রমত্ত মন মম, কবে পৌছাইবে রাতি?

জাগিবিরে কবে ?

জীবন উদ্যানে তোর ঘোবন কুহুম ভাতি

কতকাল হবে ?

নীরবিন্দু হুর্দ্বাদলে, নিত্য কিরে ঝল ঝলে ?

কেনা জানে অমুখে অমুবিধ সদ্যঃপাতি। ”

মিত্রকাব্যের বিজয়া দশমী ও লুক্র-

সিয়া অতি সুন্দর কবিতা। ইহার পরব-

র্ণনা এবং কমলে কামিনী আরও সুন্দর ;

—পড়িবার সময়ে মনে আনন্দ লঞ্চার

হয়।

১০। বঙ্গজনা কাব্য। প্রথমখণ্ড।

শ্রীরজনীনাত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা

অমিত্রাক্ষর চন্দ্রে রচিত কতিপয় স্ততিপ-

ত্রিকায় প্রণীত। প্রমুখকার যাঁহাদিগকে

বঙ্গদেশের ভূষণস্বরূপ মনে করিয়াছেন,

ঐ সকল পত্রে অবলা-মুখে তাঁহাদিগের

স্ততিপাঠ হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর চন্দ্র প্র-

মুখকারের অভ্যস্ত হইয়াছে এমন বোধ হ-

ইল না। তিনি হেলেনা কাব্যের কোন

অংশের সহিত তাঁহার লেখার কোন এক

অংশ মিলাইয়া পড়িলেই ইহা বুঝিতে পাই-

বেন। আর, স্ততিবাদের জন্য যেরূপ সাব-

ধানবিন্যাস সূমার্জিত শব্দের আবশ্যকতা,

তাঁহাও তাঁহার এই কাব্যে দৃষ্ট হইল না।

পণ্ডিতগর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের শ্রোত্র

হইতে আমরা দ্বাদশটি পংক্তি উদ্ধৃত ক-

রিলাম। যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহা

পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি

লজ্জিত হইয়াছেন।

“একটি রতন মাত্র এবল-গোঁহুলে—

তুমিহে দ্বারকানাথ ! উজ্জ্বল চৌদিগ—

তব কীর্তি—দৈবস্বক—মঞ্জুল-ময়ুখে।

মধুর মলয়ানিলে দোলয়ে মাধবী—

বসন্ত-ভসন্তে যথা ; কিবা ভূজঙ্গিনী—

ডমকর হনি শুনি করিয়া যেমতি—

উর্দ্ধগণ ; দোলিছে মোদের হিরা দেব,

তোমার সোমপ্রকাশ বাঁশরী সুরে।

বিরক্ত প্রকাশি—কিছু নব্য দল তাহে,

শুনিতেছে আধীনতা—কাল-বিব-ধরী—

গরজন। স্মৃতিতেছে—মাতঙ্গিনী যথা—

মধুপানে ! কি তাবিহু বসি গুণ দিখি। ”

রাজদেশকে গ্রহণকারি অর্থে এবং কোন্ ভাবের আবেশে গোকুল বলিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না, এবং বসন্ত শব্দের সহিত 'ভসন্ত' কি হসন্ত, কি অসন্ত অথবা লসন্ত শব্দের একত্র বিম্বাস হইলে কিরূপ মধুর অনুপ্রাস হয়, তাহাও আমরা দিগের বুদ্ধিতে প্রবেশ করিল না । হারকানাথ-স্তোত্রের আর একস্থলে রুক্মিণীভূষণ মহাশয়ের কিরূপ সম্মাননা অথবা বিভূষণা হইয়াছে, তাহাও পাঠক দেখুন । গ্রন্থকারের কম্পিত অবলা বলিতেছেন ।—

“কে না জানে,—এ অঞ্চল-ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে—  
রসিক হারকানাথ—কুঞ্জবন-প্রিয়” ।

হা! বিদ্যাভূষণ! আপনাত্মক কপালে কি এই ছিল! আপনি কি এই জন্য এত দিন বজ্রভাষার সেবা এবং বজ্রীয় নবা কবিসম্প্রদায়ের শিক্ষকতা করিয়াছিলেন! আর সোমপ্রকাশ! তুমিও কি এতদিনের পর ব্রজের ‘বাঁশরী’ হইলে?

১১। নীতিশিক্ষা; প্রথমভাগ । জ্ঞানচন্দ্র রায় প্রণীত ।—আমরা ইহার দ্বিতীয়ভাগের সমালোচনার গ্রন্থকারের বিশেষ প্রশংসা করিতে পারি নাই; কিন্তু নীতিশিক্ষা প্রথমভাগের জন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ দিতে প্রস্তুত আছি । বালকদিগের জন্য সরল ভাষায় সুপাঠ্য পদাবলীতে ভাল ভাল পুস্তক রচিত হইলে, আশাদিগের বড়ই আশঙ্ক

জন্মে । নীতিশিক্ষা প্রথম ভাগ বালকদিগের যে উপকারে আসিবে, তাহাতে আশাদিগের অগম্যত্ব সন্দেহ নাই ।

১২। বঙ্গসংগীত । ঐবিবিকিলাল শর্মা কর্তৃক প্রণীত ।—হই! হেম বাবুর ভারত সংগীত কিংবা ভারতশিক্ষার সামান্য একখানি অনুলিপি । গ্রন্থকারের সরস-শব্দ-গ্রন্থনে ক্ষমতা আছে । কিন্তু তাঁহার বঙ্গসংগীতের এক অংশের সহিত আর এক অংশের ভাবে ও পদবিন্যাসে বড়ই বিচিত্র বিরোধ । সংগীতের আরম্ভ এইরূপ ।—

“মরি কি সুন্দর! স্তিমিত নক্ষত্র  
মিশিছে উষার তিমির বাসে,  
অরুণ তপন,—কোমল কিরণে  
হাসিছে মধুর তাহার পাশে ।  
নিশির শিশিরে ফুলবধূগণ  
ফোট ফোট ভাব ধরেছে সবে,  
তা দেখি ত্রমর অধর চুম্বিতে  
ছুটিছে অকারি মধুর রবে ॥

সংগীতের আর এক স্থলে আছে,—

“খাজানা, করজ, সেলামি, নজর,  
তার পরে আছে পথের কর,—  
আগে খান গরু, পরে ভিটা বেচে  
তখাচ উদ্ধার নাহিক তার ।  
সর্বস্বান্ত হয়,—পেটে অন্ন নাই  
তখন মামলা বিপাকে ফেলে,  
কৈদে কৈদে মরে,—কেহ না শুধায়,  
অগত্যা শেষেতে যায় ছে জেলেরে ॥”

## জীর্ণোদ্ধার ।

অর্থাৎ

প্রাচীন আর্ষাদিগের জ্ঞান সমালোচনা

### সলিল

জল, বায়ু, তেজঃ, পৃথিবী, চন্দ্রমণ্ডল, সূর্যমণ্ডল, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা প্রভৃতি জাতব্য পদার্থে আর্ষাদিগের জ্ঞান কি পরিমাণে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল এবং তাঁহাদের মনন শক্তিই বা কিরূপ ছিল—এই সকল প্রকট করাই এই ‘জীর্ণোদ্ধার’ শীর্ষক প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

সকলেই অবগত আছেন যে, আর্ষাদিগের জ্ঞানে জল একটি প্রধান ভূত অর্থাৎ মৌলিক পদার্থ। আর, নব্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে জল একটি যৌগিক পদার্থ। এই মতে দুই প্রকার গাঙ্গু সংযুক্ত হইলে জল উৎপন্ন হয়, সুতরাং উহা ভূত বা মূল বস্তু নহে। এই মতদ্বয়ের তারতম্য যথেষ্ট সর্বপেক্ষে তুল্য। যদিও প্রথমোক্ত বিখ্যাত মতটি পর-মতের নিকট ভ্রম-কল্পিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি আমরা একবার ঐ মতের সমালোচনা করিব। কাকদন্ত পরীক্ষা অর্থাৎ কাকের দাঁত আছে কি না? জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে যে ব্যক্তির গাঙ্গে হাসি ধরে না, তাঁহাকে

এ প্রস্তাব সূখী করিতে পারিবে না। যাঁহারা পুরাতন তত্ত্বের প্রেমিক—ভরসা করি তাঁহারা এই প্রস্তাবে সূখী হইবেন। উল্লিনীষু অথচ বালবৎ নিত্যস্ত সরল-হৃদয় আদিম পিতামহগণের জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক আলোচ্য না থাকিলেও প্রথমতঃ সলিল বিষয়ক জ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। তাঁহারা এই সলিল সম্বন্ধে কি কি বিষয় কি কি রূপে জানিতে পারিয়াছিলেন, ক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে।

অনেক আর্ষাজ্ঞানে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচ প্রকারই ভূত, “নাহানং নাতিরিক্তম্” হানও নহে, অতিরিক্তও নহে। কিন্তু কোন কোন আর্ষের মতে আকাশের বস্তুত্ব নাই, “আবরণাভাবোহি আকাশঃ” আবরণ অর্থাৎ কিছু না থাকিলেই তাহা আকাশ নামে ব্যবহৃত হয়; সুতরাং এমতে ভূত চারি প্রকার মাত্র। ভূত ও পরমাণু নামান্তর মাত্র, পদার্থান্তর নহে। এই চতুর্বিধ পরমাণুর উৎপত্তি বিনাশ নাই—ইহাদের সংযোগ বি-

যোগে ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত। ইহা ন্যায় ও বৈশেষিক সম্মত; কিন্তু বেদ ও বেদানুগত উত্তর-মীমাংসা ও সাংখ্যদর্শনের মতে পরমাণু সকলের স্বজনকর্তা ঈশ্বর। সূত্রাত উহার সাংসিদ্ধিক বা চিরনিত্য নহে, কল্পান্ত সময়ে পরমাণুও বিনষ্ট হইবে। পরমাণু সকল উৎপন্ন হ্রব্য হইলেও প্রক্ষিপ্ত বদরমুক্তির ন্যায় যুগপৎ উৎপন্ন হয় নাই। ক্রমশঃ হইয়াছে। সে ক্রম এইরূপ—অগ্রে আকাশ, তৎপরে বায়ু, তৎপরে তেজঃ, তৎপরে জল, অবশেষে পৃথিবী। ইহা পৃথক পৃথক রূপে উৎপন্ন হয় নাই—পরস্পরের সংযোগেই হইয়াছে। যথা, আকাশসংযুক্ত-বায়ু হইতে তেজঃ—তজ্জিতয়ের পরিণাম জল—তচ্ছত্বের পরিণামে পৃথিবী। এই সকল ভূত, উৎপত্তিকালে পরমাণুরূপেই উৎপন্ন হইয়াছিল—পরে তাহা ভাগে ভাগে সংহত বা সম্বন্ধ হইয়া স্থূল হইয়াছে এবং ব্যবহারের উপযোগী হইয়াছে।

উপাদান বা কারণ-দ্রব্যের গুণ কার্য-দ্রব্যে সংক্রান্ত হয়—এবং সেই উৎপন্ন দ্রব্যের স্বতন্ত্র সূত্র গুণও তন্মধ্যে। এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থ জন্মিলে তাহা কথিত নিয়মের অধীন হয়। অতএব কথিত নিয়মানুসারে জল, আকাশ, বায়ু ও তেজের অনন্তরোৎপত্তি বলিয়া উহাতে আকাশ, বায়ু ও তেজের গুণ কিছু কিছু আছে এবং নিজের সাংসিদ্ধিক গুণও আছে। এই সাংসিদ্ধিক বা বিশেষ গুণটি রস বা আশ্বাদ নামে পরিচিত। এতাবত আর্ধ্যদিগের

সিদ্ধান্ত এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, জলের প্রধানতঃ শব্দকারিত্ব, স্পর্শ, রূপ ও আশ্বাদ গুণ আছে। এতদ্বিধ বেগ প্রভৃতি যে সকল অবাস্তব গুণ আছে তাহা পশ্চাৎ বিবেচ্য।

অপিচ, শব্দ যেমন শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ক, স্পর্শ ত্বকের, রূপ চক্ষুর, সেইরূপ রস রসনার বা জিহ্বার বিষয়। ঈশ্বরই হউন, আর ঈশ্বরীই (প্রকৃতি) হউন, যিনি এই জগতের সমাবেশ কর্তা, উহার সমাবেশশক্তি অত্যন্তচর্য। জীবকে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা প্রদান করিয়া এবং বাহিরে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধের অধিকরণীভূত পদার্থের স্রষ্টি করিয়া যে ঐ সকলকে সদল বা সপ্রয়োজন করিয়াছেন—এতদপেক্ষা সুরমাবেশ আর কি হইতে পারে? এই সিদ্ধান্ত দ্বারা আর্ধ্যদিগের আর একটি সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত হইতেছে যে যেমন বস্তু গ্রাহক ইন্দ্রিয় পাঁচটির অতিরিক্ত নাই—তেমনি মূল বস্তুও পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত নাই। সূত্রাত পাঁচটিই ভূত, চতুষষ্টি বা পঞ্চষ্টি ভূত ভূত নহে, তাহা ভৌতিক।

ইন্দ্রিয়গুলি যেমন প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ গুণ বা শক্তি সম্পন্ন, ভূতগুলিও তেমনি বিশেষ বিশেষ গুণ সম্পন্ন। এই বিশেষ বিশেষ গুণ দ্বারাই পদার্থ সকল পরিচিত হয়। যে সকল গুণ অনন্তসাধারণ, সেই সকল গুণই বিশেষ গুণ। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, বায়ুর বিশেষ গুণ

স্পর্শ, তেজের বিশেষ গুণরূপ, আর জলের বিশেষ গুণরূপ বা আশ্বাদ ও পৃথিবীর বিশেষ গুণগন্ধ। আকাশ, বায়ু, তেজঃ, এই তিন ভূতের কোন প্রকার আশ্বাদ নাই, কিন্তু তাহা জলের আছে। এই জন্মই আশ্বাদ গুণটি জলের বিশেষ গুণ বলিয়া পরিচিত। কার্যপদার্থ কারণে অতিসামান্য আকারে অবস্থিতি করে, এই নিয়ম অনুসারে নির্ধারণ করিতে হইবে যে জলে নীলপীতাদি পার্থিব গুণও অতিসামান্যাকারে (অবাস্তবাবে) আছে, এবং কটু তিক্তাদি নানাপ্রকার পার্থিব ধর্ম তৎকারণীভূত সলিলে অতিসামান্যাকারে লুক্কায়িত আছে।

“রূপমাত্রাদিকুর্বাণাতৈজসো দৈবচোদিতাৎ।

রসমাত্রমভূতমাদিত্তোজিহ্বারসগ্রহঃ ॥

কষায়ো মধুরস্তিক্তঃ কটুঃ ইতি নৈকধা।  
ভৌতিকানাং বিকারেণ রস একো বিভিন্দাতে ॥”

(শ্রীভাগবত)

অর্থাৎ বায়ু-সংযুক্ত বিক্রিয়া-প্রাপ্ত রূপতন্মাত্র বা তেজ বিশেষ হইতে রস-তন্মাত্র বা জল ভূতের উৎপত্তি হয়। রস গ্রাহক ইন্দ্রিয় জিহ্বা। প্রথমোৎপন্ন রস এক প্রকার কিন্তু ঐ এক প্রকার রস মানা বিধ ভৌতিক বিকারের সংযোগে কটু, তিক্ত, কষায়াদি ভাব প্রাপ্ত হয়।

বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত এই যে, জলের কারণীভূত বায়বীর অংশ সম্বলিত

তৈজস অংশের রূপ বা আশ্বাদ কিছুই নাই। কিন্তু তদুৎপন্ন জলের রূপও আছে, আশ্বাদও আছে, আশ্বাদটি মধুর এবং রূপটি ভাস্বরশুক্ল। তৈজস ও বায়বীর অংশ থাকিতে জল রূপ, রস ও স্পর্শ বিশিষ্ট হইয়াছে। বায়ুর স্পর্শ অনুক্ষণীত কিন্তু জলের স্পর্শ শীত।

আর্যাদিগের এই সিদ্ধান্ত অ'র শ্বেত-দ্বীপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত (অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসজলের উপাদান, ঐ দুই গ্যাসের কোন বর্ণ নাই এবং আশ্বাদ নাই) প্রায় একরূপ হইতেছে। তবে দ্যাননিমীলিতনেত্রে দেখা আর বিকসিতনেত্রে যন্ত্র সংযোগে দেখার যেরূপ প্রভেদ হওয়া উচিত—সেইরূপ প্রভেদ থাকিতে পারে। জল মিশ্রপদার্থ এবং সংযোগোৎপন্ন জানিয়াও স্ববিধা যে জলকে ভূত বলিয়াছেন তাহার ভাব এই,—জল আপনার কারণীভূত বায়বীর অংশ-সংযুক্ত তৈজস অংশ হইতে সম্পূর্ণ তত্ত্বান্তর এবং জলের পরিণামেও অপর এক তত্ত্বান্তর জগৎগ্রহণ করিয়াছে। যে পদার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থের কারণ, তাহাই ভূত “তত্ত্বান্তরমাত্তত্ত্বান্তরাণি”। জল যে আপনার কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন তাহার পরিচায়ক আশ্বাদ। এই আশ্বাদ নামক গুণ জল-স্থিতির পূর্বে ছিল না এবং ইহার গ্রাহক জিহ্বা ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ান্তর নাই। এই হেতুক, এবং উহা হইতে পৃথিবীনাশক তত্ত্বান্তরের জন্ম হইয়াছে এই হেতুক, জল

চতুর্থ স্থানের ভূত। আমরা এখন জল জমাইয়া মুক্তিকা করিতে পারি না, কিংবা জল হইতে পার্থিব পরমাণু নিষ্কাশিত করিতে পারি না বলিয়া “জলের পরিণামে পৃথিবী” এই কথায় অবিশ্বাস হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কতদূর যোগ্য সহসা বলা মুকঠিন। যাহা হউক আর্ধ্যদিগের মতে ভূতের লক্ষণ “অমিশ্র মৌলিক পদার্থ ভূত” এরূপ নহে। তাঁহারা বলেন এরূপ লক্ষণে অনেক দোষ আছে। অতএব যে তত্ত্বান্তরের জনক, তাহাই ভূত। পৃথিবী কি জল হইতে যাহা অতঃ পদার্থ, অর্থাৎ ঘট, পট, পতঙ্গ, কীট, তৃণ, গুল্ম, রক্ষ প্রভৃতি পদার্থ জন্মে—তাহা সেই পৃথিব্যাদি হইতে তত্ত্বান্তর নহে। কেননা, তাহাতে পৃথিব্যাদির বিশেষ গুণ ভিন্ন কোন স্বতন্ত্র বিশেষ বা অসাধারণ গুণ নাই, এবং তাহার গ্রহণের নিমিত্ত ইন্দ্রিয়ান্তরও নাই। যে যে পদার্থ দ্বারা এই জগৎ পিও নির্মিত হইয়াছে—সেই সেই পদার্থ নির্বাচন আরম্ভ করিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ পদার্থ পাওয়া যায় না, সুতরাং তাহার অতিরিক্ত পদার্থ থাকিবার সম্ভাবনা নাই।

তিষ্ঠতু। এই জলের যে অবতাব দৃষ্ট হয়, তাহা সাংসদিক “জলে সাংসদিকো জবঃ”। সাংসদিক শব্দের অর্থ স্বাভাবিক। যিনি জলের পিতা, তিনিই পুত্রের ঐ সাংসদিক রক্ষা করিতেছেন। তাঁহার অনুগ্রহের ক্রীড়া হইলে জল বিকৃত-

তাব দারণ করে [ অর্থাৎ উষ্ণাংশযুক্ত বায়ুর সংসর্গ রহিত হইলে জল বিকৃততাব ( কাঠিন্য ) প্রাপ্ত হয়, ] এই সকল বিকৃত জল করকা ( বর্ষোপল ), হিমানী ( বরফ ) নামে প্রসিদ্ধ।

“উষ্ণাংশযুক্ত বায়ু জলের অবতাব রক্ষা করিতেছে, এবং সেই উষ্ণাংশযুক্ত বায়ুর সংসর্গ রহিত হইলে জল জমিয়া যায়।” আর্ধ্যদিগের এই সিদ্ধান্তকে খেত দীপীয় সিদ্ধান্ত বড় অতিক্রম করিতে পারিতেছে না। তবে কি না আর্ধ্যদিগের জানা না জানা সমস্তই বহিঃ-প্রোত-নিরুদ্ধ জ্ঞানের অধীন, সে জন্য তাঁহারা “যেখানে ৩২ তাপাংশ বা তন্নান সংখ্যাত গ্রীষ্ম হয়, সেখানে নকার জল জমিয়া যায়, এ কারণ যে সকল দেশে সূর্য্য কিরণ সরলভাবে পতিত না হয় সেই সকল দেশে গ্রীষ্মের বা তাপের অপ্পত্তা প্রযুক্ত সর্বদাই জল সকল জমিয়া বরফ হইয়া থাকে এবং পৃথিবী অপেক্ষা পৃথিবীর উচ্চের অধিক শীতলতা নিবন্ধন উদ্ধৃস্থিত মেঘের জল কখন কখন কঠিন হইয়া শিলা রূপের উৎপাদন করে ” এইরূপ করিয়া ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। অহিফেন-ভোজীর মতন, চক্ষু মুদিত করিয়া, বলিয়া গেলেন “জলে সাংসদিকো জবঃ।” “অবতাবপ্রতিরোধন্ত বৈজাত্যাহুপদ্যতে।”

অপিচ, “উষ্ণসংযোগেন দিব্যতেজঃ সংযোগবিগমে পুনঃপ্রবত্তমুৎপদ্যতে ”।

( পদার্থতত্ত্ব )

এখানে ‘দিব্যতেজঃ’ শব্দের অর্থ পার্থিব উ-

অতঃ পরে বিপরীত শৈতাবিকার বায়ু বিশেষ। এই দিব্যভেজের সংসর্গে জলের অবস্থা প্রতি-  
রোধ হয়—আবার উষ্ণতা সংযোগ হইলে  
তাহা দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ পুনশ্চ দ্রব হয়।

কথিত নিয়মানুসারে উষ্ণতা বা তাপ,  
পিণ্ডীভূত বস্তু যাত্রেয়ই লঘুতা ও ক্ষীণতা  
বা প্রসারিত হইবার কারণ হইতেছে। প-  
রন্তু সাংস্কৃতিক দ্রব বা স্বভাব তরল প-  
দার্থ তাপসংযোগে যে পরিমাণে ক্ষীণ  
হয়, সংহত কর্তন বস্তু সে পরিমাণে ক্ষীণ  
হয় না। অপিচ, কোন কোন বস্তুর এরূপ  
বিশেষ স্বার্থ আছে যে, যাহা থাকায় ত-  
দ্বস্তুর উপরিভাগস্থ পরমাণুসমূহ অন্তর্ভা-  
গস্থ পরমাণুর তাপাংশ সমাহরণ এবং নি-  
কট বায়ুর তাপাংশ সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং  
বাষ্পভাব প্রাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে  
কপূর প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য তাপসংযোগ-  
বশতঃ সর্বদাই বাষ্প হইয়া থাকে। জলও  
এরূপ কাণে অবলম্বন করিয়া বাষ্পীভূত  
হয়। জলের বাষ্পীভূত হইবার প্রধান  
কারণ সূর্য। সৌর উষ্ণতা সংযোগে জ-  
লের বাষ্পভাব প্রাপ্ত হওয়ার বিষয় অর্থাৎ  
শাস্ত্রে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সৃষ্টি-  
কালে যে জল জন্মিয়াছিল তাহাই আব-  
হমান চলিয়া আসিতেছে। এখন আর নূ-  
তন জলের সৃষ্টি হয় না। সমুদ্রাদির জল  
ও পার্থিব রস সূর্য্যাকিরণ দ্বারা বাষ্পতা  
প্রাপ্ত হইয়া বায়ুকর্তৃক উর্দ্ধে উন্নত ও প্র-  
সারিত হয়—আবার তাহাই উপরিস্থিত  
অল্প বায়ুর দ্বারা শীতল ও উপযুক্ত দ্রবতা

প্রাপ্ত হইয়া রক্ষিত আকারে পৃথিবীতে  
নিপতিত হয়। এই নিমিত্তই বেদে এবং মনু  
প্রভৃতি স্মার্তগ্রন্থে সূর্য্য হইতে সৃষ্টি হও-  
য়ার কথা উল্লেখ আছে। যথা :—

“আদিত্যাজ্জায়তে রক্ষির্নক্ষত্রমঃ ততঃ  
প্রজাঃ।” (ঋতি ও মনু)

“গহোত্তরায়ণং তেজোরমানুজ্ঞাতা রক্ষিভিঃ।  
দক্ষিণায়নমাব্রতো মহীং নিবিশতে রবিঃ ॥  
ক্ষেত্রভূতে ততস্তস্মিন্ ওষধীরোষদীপতিঃ।  
দিবস্তেজঃ সমুজ্জ্বাতা জনয়ামাস বারিণা ॥”

(বনপর্ব, ৩ অধ্যায়)

“ঐরাবত হস্তিকর্তৃক শুণ্ডদ্বারা স-  
মুদ্র হইতে জল উত্তোলিত হইয়া রক্ষি হয়”  
এই জন-প্রবাদ যে কিং-মূলক, তাহা জা-  
নিয়া। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, কোথাও  
একথা লেখা নাই। বরং সর্বত্রই পূর্ব  
প্রণালী ক্রমেই রক্ষিত কারণ বর্ণিত আছে।  
“অষ্টোমাসান্নিপীতং যন্তুম্যা উদময়ং বনু।  
স্বগোভিমোক্তুমারেতে পর্য্যণাঃ কাল-  
আগতে ॥”

(জীভাগবত)

অর্থাৎ যেরূপ ভূপতি এক সময়ে প্র-  
জাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া  
অন্য সময়ে আবার তাহাই তাদের প্রতি  
বিতরণ করেন, সেইরূপ সূর্য্যদেবও আট মাস  
ব্যাপিয়া আপন রক্ষি দ্বারা পৃথিবী হইতে  
জলময় ধন আহরণ করিয়া কালে তাহাই  
আবার পৃথিবীতে রক্ষিরূপে বিতরণ করেন।  
যদিচ সকল মাসেই সূর্য্যের কিরণ আছে  
এবং সকল সময়েই জল বাষ্প হইয়া থাকে,



তথাপি শীত ও উষ্ণকালে যে রূপ ও যে পরিমাণে বাষ্প হয় এবং তাহা উর্দ্ধে উন্মিত হয়, বর্ষাকালে তদ্রূপ ও সে পরিমাণে হইতে পারে না। কারণ, উত্তাপ দ্বারা যে বাষ্প জন্মে তাহা বায়ুর দ্বারা উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। অতএব বায়ু যে সময়ে সিক্ত থাকে, সে সময়ে বায়ু অধিকতর বাষ্প উৎসর্জন করিতে পারে না। শীত সময়ের বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক থাকে সুতরাং উক্ত কালে সূর্যের লঘুতাপ-জন্য উদ্ভূত বাষ্প সকল যত অধিক উৎক্ষিপ্ত হয়, গ্রীষ্মাদিকালে আদিভোর প্রথর কর দ্বারা ততোধিক বাষ্প জন্মিলেও তত্ৰাবৎ সম্পূর্ণ উৎক্ষিপ্ত হয় না। তাহার প্রধান হেতু এই যে, শীতকালের সঞ্চিত বাষ্প দ্বারা সিক্ত থাকায় বায়ুর উৎসর্জন শক্তি তৎকালে হ্রাস থাকে। অতএব শীতকালে সরোবরাদির জল যে রূপে শুষ্ক হয়, গ্রীষ্মকালে তত হয় না। বর্ষাকালের ত কথাই নাই। এই জন্য প্রস্তাবিত ভাগবত পুরাণের বচনে আট মাস পর্যন্ত বাষ্প সঞ্চিত হও-

য়ার কথা উল্লেখ হইয়াছে এবং চারি মাস বর্ষার কথা বলা হইয়াছে। বর্ষা যদিও চারি মাস ব্যাপক নিয়মিত নহে, তথাপি প্রায়িক অথবা বর্ষার মুখ্যকাল বলিয়া গ্রহণ বলা হইয়াছে। অতএব ঐরাবত হস্তীর জলবর্ষণ-কর্তৃত্ব প্রবাদ কোথা হইতে উদ্ভূত হইল নির্ধারণ করিয়া বলা যায় না। বোধ হয়

“মেঘস্যোপরি যো মেঘঃ স ঐরাবত উচ্যতে।” (মহাভারত-বচন)  
এই অংশ হইতে ঐ জনপ্রবাদ উদ্ভূত হইয়াছে। এই শ্লোকের সংক্ষেপ অর্থ এই যে, মেঘ সকল স্তরে স্তরে উদয় না হইলে ফাঁকা মেঘে জল হয় না। মেঘ যখন বায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া স্তরে স্তরে জমিয়া যায়, সেই সময়েই উপরিস্থিত মেঘের সংঘর্ষ-জন্য উষ্ণ-বলে নিম্ন স্তরের মেঘ গুলি গুলিয়া গিয়া বৃষ্টিরূপে পতিত হয়। অতএব উপরিস্থিত মেঘের নাম ঐরাবত এবং ঐ ঐরাবতই বৃষ্টির কারণ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

শ্রীকালীদাস বেদান্তবাগীশ।



## বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত

বোপদেবকে সংস্কৃত-বিদ্যা-বিশারদ উইলসন সাহেব দেবগিরির ( দেওঘর বা দৌলতাবাদের) অধীশ্বর হেমাস্ত্রির সভাসদ স্থির করিয়াছেন \* এবং আমরাও তাহাই প্রামাণিক বিবেচনা করি নহি। দিবস হইল একটি প্রস্তাবে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সেটি এক্ষণে ভ্রমপূর্ণ বোধ হইতেছে। আমরা অন্য একজন্য বিবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা দ্বারা, বোপদেবের বিবরণ স্বতন্ত্ররূপে লিপিবদ্ধ করিতে প্ররত হইলাম।

উইলসন সাহেবের ন্যায়, পণ্ডিত ভর-তচন্দ্র শিরোমণি বোপদেবকে হেমাস্ত্রির দানখণ্ডের ভূমিকার, হেমাস্ত্রির পার্শ্ব বলিয়াছেন। যথা “ হেমাস্ত্রিরপি-অয়ং নৃপতিঃ, যস্য সভাপণ্ডিতো মহা-ম-হোপাধ্যায়ঃ শ্রীবোপদেব আসীৎ, অনুমী-য়তে পক্ষবন্দুধরেন্দুমিতে শকসংসারে দ্বিত্বাদিবৎসর নৃনামিকোন সমজনিষ্ঠ। ” শিরোমণি মহাশয় পুনশ্চ লিখিয়াছেন “ সাংপ্রত্যং বিজ্ঞাপাতে হেমাস্ত্রিস্ত, দে-বগিরিস্ত-বাদবংশ-মহারাজাধিরাজ-মহা-দেবচক্রবর্তিনো রাজোধ্যায়িকরণ-পণ্ডিত আসীৎ। ” ইহাতে হেমাস্ত্রিকে বাদবংশ-বতংশ মহারাজ মহাদেবের ধর্ম্যাধ্যক্ষ বলা

হইয়াছে এবং ইহা চতুর্ভুজ চিন্তামণি মধো হেমাস্ত্রিযে স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহার সহিত ঐক্য আছে; হেমাস্ত্রি কোন স্থলেই আপনাকে রাজা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন নাই। উইলসন সাহেব ও পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় তাঁহাকে নৃ-পতি স্থির করিয়া বোপদেবকে যে তাঁহার সভাসদ বলিয়াছেন, এবিষয় কোন প্রামা-ণিক সংস্কৃত গ্রন্থে দেখিতে পাইলাম না; সতরাং আমরা ইহাতে কিছুমাত্র ঐতিহ্য-মিক সত্য প্রাপ্ত হইতেছি না। হেমাস্ত্রি দানখণ্ডের প্রারম্ভে, তাঁহাকে মহারাজ ম-হাদেবের ধর্ম্যাধ্যক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়া-ছেন, এবং চতুর্ভুজ চিন্তামণি প্রতি অধ্যা-য়ের শেষে এইরূপ লিখিয়াছেন : যথা “ ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজ শ্রীমহাদেবস্য সমস্ত-করণাধীশ্বর-সকল-বিদ্যা-বিশারদ-শ্রী-হেমাস্ত্রি-বিরচিতো চতুর্ভুজ চিন্তামণোদান-খণ্ডে ” ইত্যাদি হেমাস্ত্রি স্বীয় পরিচয় এই পর্য্যন্ত প্রদান করিয়াছেন। এই গ্রন্থে বোপদেবের কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। বো-পদেবকৃত মুক্তাফল গ্রন্থের চীক নির্মাণ-কালে হেমাস্ত্রি প্রথমতঃ বোপদেবকৃত গ্রন্থাবলীর এইরূপ গণনা করিয়াছেন, যথা,

“ যস্য ব্যাকরণেবেরণ্যঘটনাঃ স্কীতাঃ

প্রবন্ধাদশ,

\* Vide Wilson's Vishnu Purana vol.

1. Preface, page L (Trubner & Co.)

প্রখ্যাতানব বৈদ্যকেহণতিথি নির্ধারণার্থ  
মেকোহ-  
ভূতঃ । সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবতভোক্তি  
ভূরন্তবর্ণী শিরোমণে রিহগুণাঃ কে কে ন  
লোকোত্তরাঃ ॥

অর্থাৎ যাহার ব্যাকরণের কীর্তি অদ্ভুত,  
ব্যাকরণ বিষয়ে যাহার ১০ টি প্রবন্ধ,—  
বৈদ্যক গ্রন্থের উপর ৯ টি প্রবন্ধ, তিথিনি-  
র্ণয় নামক ধর্মশাস্ত্র সাহিত্য ওখান, ভাগ-  
বতের উপর ৩ টি প্রবন্ধ—সেই অন্তবর্ণী ম-  
হামহোপাধ্যায় বোপদেবের কোন গুণ না  
অলৌকিক ? বোপদেবও হেমাদ্রির উল্লেখ  
করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন “ আমি হে-  
মাদ্রির সন্তোষের নিমিত্ত হরিলীলাধ্য ভা-  
গবতব্যাখ্যা করিলাম ।” যথা,  
“শ্রীমদ্ভাগবত স্কন্ধাধ্যায়ার্থাদি নিকপাতে ।  
বিহবা বোপদেবেন মজ্জিহেমাদ্রিভুস্তয়ে ॥

( বোপদেবকৃত হরিলীলা টীকা )

হেমাদ্রি বোপদেবকৃত হরিলীলা টীকার  
টীকা লিখিয়াছেন । হেমাদ্রি ও বোপদেব  
সমসাময়িক এবং এই হেমাদ্রি দাক্ষিণা-  
তোর দেবগিরীশ্বর মহাদেবের মজ্জী ছি-  
লেন । মহারাজ মহাদেবের আজ্ঞায়  
হেমাদ্রি ও বোপদেব উভয়েই দেবগিরিতে  
বাস করিতেন ।

হেমাদ্রির সহিত বোপদেবের বিশেষ  
বন্ধুত্ব ছিল, এজন্য তিনি হরিলীলাটীকার  
“ মজ্জি-হেমাদ্রি-ভুস্তয়ে ” এরূপ লিখিয়া-  
ছেন, নতুবা তিনি হেমাদ্রির সভাসদ হ-  
ইলে কিঞ্চিৎ নত হইয়াই বলিতেন ।

করহাট ক্ষেত্রবাসী গোপালাচার্য্য  
বলেন বিটলভক্ত-কৃত প্রাকৃত গ্রন্থে লিখিত  
আছে—“ সচায়ং হেমাদ্রিঃ দ্বাদশাধিক  
দ্বাদশ শত ( ১২১২ ) শকোদ্ভব-দাক্ষিণা-  
ত্যালন্দী-গ্রামস্থ-জ্ঞানেশ্বর সংজ্ঞক-ভগবদ্ভ-  
ক্ত-কৃত-গীতা-ব্যাখ্যানোক্তর-কালিকঃ, “অ-  
র্থাৎ হেমাদ্রি ১২১২ শকাब्दे দাক্ষিণা-  
তোর অলন্দী গ্রামের জ্ঞানেশ্বরকৃত গীতা  
ব্যাখ্যানের পরভাবিক ” এবং তদাশ্রিত-  
তৎসমকালিক-বোপদেব-প্রাক্কালিক-একা-  
দশশতে শাকে বিংশতাব্দ-মুখে সতে অব-  
তীর্ণমধুমুনিং সদা বন্দে মহাশুকম্, ইতি  
শ্রুতার্থ-সাগরাদি-মহানিবন্ধ-মহিত-শ্রীসদান-  
ন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যোঃ—” অর্থাৎ হে-  
মাদ্রির আশ্রিত এবং সম সাময়িক বো-  
পদেবের পূর্বে ১১২৫ শকে মহাচার্য্য  
জন্মিয়াছিলেন । ইত্যাদি, পুনরায় বোপদেব  
সম্বন্ধে নন্দমিশ্রকছেন “ শঙ্করাচার্য্য-সময়া-  
দুত্তরে বৎসরশতমুখে ব্যতীতে বোপদে-  
বোইভূৎ ” অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের সময়হইতে  
২০০ শত বৎসর অতীত হইলে বোপদেবের  
জন্ম হয় । পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি  
বোপদেবের ১১৮২ শকে জন্ম হইয়াছিল  
অনুমান করেন । উইল্‌সন অফেক্ট \*  
ওএটোরগার্ড্‌ন কর্ণেল কেনিডি, কোলব্রক,  
গোলডফ্‌টর ও বর্নেল সকলেই বোপদেব  
কে ষষ্ঠীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক হির করি

\* Aufrecht, “ Catalogus ” p. 174 b etc.

† Radices Linguae Sanskritae.

গাছেন, কেবল বহুকের মতে তিনি ১৩০০ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন।

মুক্তাকল গ্রন্থে বোপদেব নিজের পরিচয় বাহা দিয়াছেন, তদনুসারে তিনি চিকিৎসক কেশবের পুত্র ও ধনেশ মিশ্রের শিষ্য। যথা;—

“বিষক্শনেশ-শিবেণ ভিস্ককেশব-স্বনুমা।  
হেমাঙ্গি বোপদেবেন মুক্তাকল মচীকরং ॥”

বোপদেব ভিস্ক-নন্দন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে অনেকে তাঁহাকে ভ্রমক্রমে বৈদ্যজাতীর মনে করিতে পারেন, কিন্তু বোপদেব ব্রাহ্মণ ছিলেন। যথা;—“বোপদেব-বশ্চকারেদং বিশ্রোবেদপদাম্পদং” পূর্বে এবং এক্ষণে দাক্ষিণাত্য ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ব্রাহ্মণগণ চিকিৎসা ব্যবসা করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশেও আত্রেয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবসা একাল পর্যন্ত প্রচলিত আছে।

প্রাজ্য ভট্টরূপ ২য় রাজতরঙ্গিনীতে এক বোপদেবের কথা উল্লেখ আছে, তিনিও পণ্ডিত-শিরোমণি এবং তিনি ৯ বৎসর কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার জাতীর নাম জম্বুদেব। এই বোপদেব আমাদের আলোচ্য মুক্তবোধ-বাকরণ-প্রণেতা বোপদেবহইতে পৃথক ব্যক্তি।

বোপদেব ভাগবতের উপর প্রবন্ধ ত্রিতয় (হরিলীলা, মুক্তাকল, ও পরমহংস-প্রিয়া,) শতশ্লোকচন্দ্রিকা, মুক্তবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পজম ও ৩৭ টীকা, কাব্যাক্ষ-যেমু, রামব্যাকরণ প্রভৃতি লিখিয়াছেন।

তাহার মধ্যে মুক্তবোধ ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ। খাতু পাঠের আরম্ভে তিনি ইস্র, চন্দ্র, কাশ-রুক, আপিশালী, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র এই অষ্ট প্রসিদ্ধ শাস্ত্রিকের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

মুক্তবোধ ব্যাকরণ এতদংক্ষেপে নিখিত যে, বোপদেব পাণিনির সমুদয় সূত্রের মধ্য ইহার ১১১ শত সূত্রে নিহিত করিয়াছেন। বোপদেব বৈয়াকরণিক সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম ও পরিভাষার অক্ষর পর্যন্ত কর্তন করিয়াছেন। যথা; বৃদ্ধির-ত্ৰী, গুণের-গু, দীর্ঘের-ঘ, সমাসের-স ইত্যাদি; লট-লোট, লুঙ ইত্যাদি পরিভাষার স্থানে কি, খি, গি, ঘি ইত্যাদি। এক অক্ষরে নামের সঙ্কেত করিয়াছেন, স্বাক্ষর সংজ্ঞা প্রায় নাই।

“আনিগোচোগুত্রী” এই সূত্র দ্বারা বোপদেব পাণিনির দুইটি সূত্র সঙ্কলন করিয়াছেন। “ঘলায়নায়াবোহীচীচঃ” এই সূত্রে পাণিনির দুইটি সূত্র নিবিষ্ট আছে। এইরূপ কোথাও দুই, কোথাও তিন, কোথাও চারি পর্যন্ত সূত্রের কার্য বোপদেবের এক সূত্রে নির্বাহ হয়। এইরূপ সংক্ষেপে করাতে মুক্তবোধ ব্যাকরণ অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে; তাহাতে টীকা ব্যতীত সংস্কারলাভের আশা নাই। মুক্তবোধের সূত্রগুলির উচ্চারণ অতি কঠোর ক্রেশজনক। তাহার কারণ, ২৩৪ বর্ণ একত্রে এবং একযোগে, এক প্রবন্ধে উচ্চারণ করিতে হয়। যথা; “বর্নচত্বীকোষো বাহুহুঁরোহধঃ”

“বুর্ণোহদ্যন্তেনোহব কৃপুস্তরেহপাতকাস্ত-  
পকস্বান্নঃ। সসেনপ্লামাদেনৈকাচকোস্ত  
বা।” ইত্যাদি।

বোপদেব বৈকবধর্ষাবলম্বী ছিলেন  
একমা উদাহরণসমস্ত বিজ্ঞানমণ্ডিত ক-  
রিয়াজেন। সংস্কৃতশিক্ষা এবং হরিনাম-  
কীর্তন এই দুইটি একস্থানে পাওয়া সহজ।  
মুখ্যবোধ ব্যাকরণ উহা লাভ হয় না, এজন্য  
মুখ্যবোধ ব্যাকরণই পাঠ্য। যথা—  
“গীর্ষণা বাণী বদনং মুহুম্-  
সকীর্তনক্লেভ্যভয়ং হি লোকে।  
সুহৃদভং তজন মুখ্যবোধ-  
মলভ্যভেদতঃ পঠনীয়া য়েতৎ ॥”

বোপদেব “বৈশ্বদিত্যসাম্ভা—” ই-  
ত্যাদি সূত্রের উদাহরণ কেবল হরিনাম ঘ-  
টিত করিয়াছেন; ‘দদাতু সস্তাঃ’ ইত্যাদি।

মুখ্যবোধে বৈদিক প্রক্রিয়া নাই। যে  
সকল পদ সাধারণতঃ কবিগণ প্রয়োগ ক-  
রেন না, এমন সকল পদনিষ্পাদক সূত্র,  
যাহা অন্যান্য ব্যাকরণে আছে, তাহা  
মুখ্যবোধে আর পরিভাষ্য হইয়াছে। এমন  
কতক গুলিপদ আছে যাহা বৈকল্পিত অ-  
র্থার্থ একবার হয়, একবার হয় না; এমন  
দুই একটি পদনিষ্পাদক সূত্র একবারে নাই  
বলিলেও অত্যাতি হয় না।

শুপদ, পাণিনি, সংকিশোর প্রভৃতি  
ব্যাকরণের দ্বারা ( উক্তভং ) পদ সিদ্ধ হয়;  
মুখ্যবোধ মতে হয় না, ( উক্তভং ) হয়।  
দধি দধি, মধু মধু ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগ  
অন্যান্য ব্যাকরণের মতে হয়, কিন্তু মুখ্যবোধ

মতে হয় না। এইরূপ অনেক প্রকার  
প্রয়োগ মুখ্যবোধ মতে হয় না; সুতরাং  
তাহা অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ বলিতে হইবে।  
প্রমুখকার স্বয়ং ইহার রুচি করিয়াছেন।

মুখ্যবোধের দুর্গাদাস, রামতর্কবাগীশ,  
রামানন্দ, মধুসূদন, দেবীদাস, রামভট্ট,  
রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, জীবনভাচার্য্য, দয়-  
রাম বাচস্পতি, ভোলানাথ মিশ্র, কার্তিক  
সিদ্ধান্ত, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, গোবিন্দ-  
রাম প্রভৃতির চীকা আছে। এই সকল  
চীকার মধ্যে দুর্গাদাস ও রামতর্কবাগীশের  
চীকা উৎকৃষ্ট ও এক্ষণে প্রচলিত। কানীশ্বর  
ও মন্দাকিশোর মুখ্যবোধের পরিশিষ্ট  
লিখিয়াছেন।

প্রস্তাবের শীর্ষ দেশে “বোপদেব ও  
জীবদ্ভাগবত” লিখিয়াছি। কিন্তু এতক্ষণ  
জীবদ্ভাগবতের বিষয় কিছুই বলি নাই  
এবং বোপদেবের সহিত জীবদ্ভাগবত  
প্রভৃতির নাম কি জন্য সংযুক্ত করিয়াছি।  
তাহারও আভাস পাঠকবর্গকে প্রদান  
করি নাই। উপসংহারকালে তাহার বি-  
বরণ লিখিতেছি। ভাগবতের স্তার উৎ-  
কৃষ্ট গ্রন্থ পুরাণের মধ্যে নাই। মায়,  
সাংখ্য, পাতঞ্জলাদি সমস্ত দর্শনের সার ই-  
হাতে গৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থ এত গা-  
ভীর্ণপূর্ণ যে, অন্যান্যসেই উহার মর্য্যোভেদ  
করা যায় না। এজন্য পণ্ডিতেরা বলিয়া  
থাকেন “বিদ্যাবতঃ ভাগবতে পরীক্ষা”  
বিদ্যান ব্যক্তির পরীক্ষা একমাত্র ভাগবত  
কর্তব্য। এতদূর উৎকৃষ্ট গ্রন্থের

এতি অনেক সংশয় করিয়া থাকেন এবং কেহ কেহ ইহা বোপদেব প্রণীত বলিয়া হত্যা করেন। অনেক পণ্ডিত সেই সংশয়ের কারণ ছেদ করত ভাগবত বাস-প্রণীত সপ্রমাণ করিয়া, বিবিধ ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আমরা অদ্য ভাগবত বাস-প্রণীত সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পাই-তেছি না এবং সকল পুরাণই যে বেদব্যা-সের দ্বারা রচিত, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি না; তবে এই সকল গ্রন্থ যে আধুনিক এবং মুসলমানদিগের রাজ্যাশাসনকালে রচিত হইয়াছে, ইহা আমাদের বলা উ-দ্দেশ্য নহে। আমরা এক্ষণে ভাগবত বোপদেব প্রণীত নহে এবং তাহা অতি-প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ, ইহাই সপ্রমাণ ক-রিতে যত্ন পাইতেছি।

হাঁহারা বলেন শ্রীমদ্ভাগবত বাসদেব কৃত নহে, উহা বোপদেব-প্রণীত, তাঁহাদি-গের তর্কের প্রণালী এইরূপ, যথা;—  
শঙ্কাপত্রবিশিষ্ট নিবন্ধাযুদ্বাদতত্ত্বদূটবদ্ধ পদমালিত্যাহেতুকপ্রামাণ্যানধিকারণমেতৎ

অর্থাৎ ভবিষ্যৎবাণী কখনকালে কতক-গুলি আধুনিক রাজা ও ঘটনাবলীর উল্লেখ দেখা যায়। কোন মান্য সংগ্রহকারেরা ইহার বচন উদ্ধার করেন নাই। আর্য গ্র-ন্থের দ্বারা ভাগবতের রচনা প্রাক্তন নহে, অন্তত আধুনিক স্মৃতি শাস্ত্রের দ্বারা এই গ্রন্থের নির্মাণ এবং বৈরাগ্য পদমা-লিত্য ও পদবিলাসপ্রভৃতি দৃষ্ট হয়, এরূপ পদবিলাস ও লালিত্য আর্য সময়ে ছিল

না। এই সকল কারণে ভাগবত বাস-কৃত নহে, উহা বোপদেব কৃত, কারণ বোপ-দেবের রচনা প্রণালী এইরূপ দেখা যায়।

“ভাগবতভূষণ” কবি এই সকল আ-পত্তির অকিঞ্চিৎকর প্রতীপাদনের নিমিত্ত এইরূপ বলিয়াছেন;—

১ম—কাঠক, কাপাপক, মৌহল, মৌগল প্রভৃতি বেদভাগের নাম থাকি-লেও তাহা যেমন জৈমিনি, তত্ত্বৎস্বকৃত শব্দা করিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন—  
অপৌকষের বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, এখানেও সেইরূপ কর। ২য়—মান্য গু-ন্যকারেরা ভাগবতের প্রমাণ একবারে ধ-রেন নাই, এমত নহে; আবশ্যকমতে বো-পদেবের পূর্বভাবিক চিত্তস্থ মুনি প্রভৃতি অনেক মান্য গ্রন্থকারেরা ভাগবতের প্র-মাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তবে হাঁহারা ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদিগের প্রবন্ধ ভিন্নপ্রকার। অর্থাৎ তাঁহাদের গ্রন্থ সকল তত্ত্বপ্রতিপাদক নহে, কেবল মাত্র বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা বা প্রাধান্যরূপে জ্ঞানমার্গ প্রকাশক গ্রন্থ ব-লিয়া তাঁহারা ভাগবতকে আপনাদের গ্রন্থমধ্যে আময়ন করেন নাই। ৩য়—যদি ছান্দোগ্য উপনিষৎ, বিষ্ণুপুরাণ, ভা-গবতীর অষ্টাবক্রাখ্যান, সমৎসজাত প্র-ভৃতি যৎসম্পূর্ণ কঠিন, গভীরার্থ, পদমা-লিত্য ও বিদ্যাসপরিপাটীযুক্ত হইলেও তাহা আর্য হয়, তবে ভাগবত আর্য না হ-ইবে কেন? অদন্ত সংকৃত প্রাকৃত ভাষা-

ভিন্ন ত্রিকালদর্শী ভাগবান বেদব্যাসের নিকট সকলই সম্ভব, অসম্ভব কিছুই নহে । তিনি অম্মদাদির ন্যায় ক্ষুদ্র জ্ঞানের পাত্র নহেন । বিশেষ তিনি এক সময়ে সকল গ্রন্থ রচনা করেন নাই--তখন সময়ভেদ আছে, তখন লিপির প্রকার ভেদ না হইবে কেন? আমরা অদ্য যে রীতিতে গ্রন্থ লিখিতেছি, পরম্ব লিখিতে হইলে তাহা ভিন্ন প্রকার হইবে । ইত্যাদি বিচার দ্বারা ভাগবত-ভূষণকার আপত্তিকারিগণের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া ভাগবত প্রাচীন গ্রন্থ, বোপদেব কৃত নহে, সপ্রমাণ করিয়াছেন ।

শঙ্করাচার্য্যের সময়ের ২০০ শত বৎসর পরে বোপদেবের জন্ম হয়, এবং শঙ্করাচার্য্য বিষ্ণুসহস্র নাম ভাষ্যে ও চতুর্দশ মত বিবেকে ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন । পুনরায় শঙ্করাচার্য্যের পূর্ববর্তী হুম্মৎ ও চিংসুখ মুনি ভাগবতের টীকা করিয়াছেন । তাহা হইলে ভাগবত বোপদেব প্রণীত বলা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? সিদ্ধান্ত দর্পণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে--  
“ বোপদেবকৃতেষু বোপদেবপুরাতনৈঃ ।  
কথংটীকাঃকৃতং বৈশ্বাছর্ম্মৎচিংসুখাদিত্তিঃ ”  
অর্থাৎ যদি ভাগবত বোপদেবের কৃত হয়, তবে তৎপূর্ববর্তী চিংসুখাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মারা তাহার কি জন্য টীকা করিবেন ? গৌড়পাদ ভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন । ইনি শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে বর্তমান ছিলেন । কেন না বৈদ্যাসিকেরা অদ্যাপি পাঠকালে সম্প্রদায় প্রবর্তকগণের

নমস্কার করিয়া থাকেন । তাহাতে আদি পুরুষ ব্রহ্মা হইতে পরপর শঙ্কর শিষ্য পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে । যথা--

“নারায়ণং পদ্মভরং বশিষ্ঠং শক্তিঞ্চ ত-  
ত্পুত্র পরাশরঞ্চ ।

বাসংশুকং গৌড়পদং মহাস্তং গোবিন্দ-

যে'গেস্ত্রমথাস্য শিষ্যম্ ।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য মথাস্য শিষ্যং \* \* \* \* ।

রামানুজের গ্রন্থে ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ।—স্মৃতি কালভরঙ্গের মতে রামানুজ ১০৪২ শকাব্দে বর্তমান ছিলেন । সুতরাং তিনি বোপদেবের পূর্ববর্তী ।

কাশ্মীর দেশীয় ক্ষেমেস্ত্র-প্রকাশে, ক্ষেমেস্ত্র ভাগবতের উল্লেখ করিয়াছেন । এই ক্ষেমেস্ত্র রাজতরঙ্গিনীকার অপেক্ষা প্রাচীন, কেন না তিনি “ক্ষেমেস্ত্রন্য নৃপা-বর্শো ” এই কথা বলিয়া ক্ষেমেস্ত্রকৃত রাজাবলীর কথা গ্রহণ করিয়াছেন । ইহাতেও ভাগবতের প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে । ভাগবত বোপদেবের বহুকাল পূর্বের গ্রন্থ না হইলে কি জন্য হেমাদ্রি বোপদেবের সমসাময়িক হইয়া তাহার প্রমাণ সাধনের চতুর্বর্গচিন্তামণি মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন ? তিনি যদি ভাগবত বোপদেবকৃত কৃত্রিম পুরাণ জানিতেন, তাহা হইলে ভাগবতের প্রমাণ কখনই গ্রহণ করিতেন না । ভাগবত বোপদেব প্রণীত আধুনিক গ্রন্থ হইলে, তাহা কখনই চৈতন্যদেব, রূপ, স-কৃত্তনজীব গোস্বামীর দ্বারা আদৃত হইত

না ? ভাগবত বোপদেব প্রণীত গ্রন্থ হইলে তাহার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন ও মান্য লেখক গণ কি জন্য টীকা করিলেন ? নিম্নে ভাগবতের টীকাসমূহের উল্লেখ করা গেল, ইহার মধ্যে বোপদেব কৃত ও খানি টীকা আছে ।—

জীধরীয়া, বিজয়ধ্বজ, হরিলীলা মুক্তা-  
কল, পরম হংসপ্রিয়া, বিদ্বৎ কামধেনু, সত্ব-  
জ্যোতি, তত্ত্বদীপিকা, শুকহৃদয়, সুদর্শনী,  
মুনি প্রকাশিকা, প্রহর্ষণী, বাহুপতী, বৃহ-  
তোষিণী, চক্রবর্তীয়া সন্দর্ভ, বোধিনীসার,  
মাধবীয়া, বামনী, একনাথী, পুরুষোত্তমী,  
মধুসূদনী ইত্যাদি ।

যে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ভাগবতের নামোল্লেখ  
আছে, তাহার নামগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল ।  
গৌরীতন্ত্র ২ পটল, পদ্ম-পুরাণ, গজ-  
পুরাণ, নারদ-পুরাণ, ক্ষুদ্র-পুরাণ, তত্ত্ব-  
প্রকাশিকা, তাৎপর্য চন্দ্রিকা, দিনত্রয়  
মীমাংসা, ক্ষীরনিধি, সদাচার বৃহস্পতি  
ব্যাখ্যা, স্মৃতি-কোষভূত, স্মৃত্যর্থ-সাগর,  
নির্ণয়রত্ন, বিভ্রাটরাম্যমুক্তিত্ত্ব জীবমুক্তি প্রক-  
রণ, হেমাদ্রিকৃত ব্রতখণ্ড ওদানখণ্ড, নির্ণয়-  
সিদ্ধি, ভট্টোজ্জীদীক্ষিত কৃত পুঞ্জ প্রকরণ,  
নাগোজি ভট্টকৃত আত্মিক শেখর, সংকার  
কোষভূত, মথুরাসেতু, আত্মময়ুধ, ব্যবহার  
ময়ুধ, কালদিনকর, বিধানপারিজাত, ভো-  
জন প্রকরণ, প্রয়োগ পারিজাত, আচার-  
রত্ন, সংবৎসর প্রদীপ, কলধর্ম প্রকরণ,  
অধৈতানন্দ সাগর, কালনির্ণয়, কালনির্ণয়-  
দীপিকা, কালনির্ণয় বিবরণ, শঙ্করাচার্য্য

কৃত বিষ্ণু সহস্র নামভাষ্য, ও তৎকৃত চতুর্দশ  
মত বিবেক, মহারাজ্যীয় গৌড়পাদকৃত  
পঞ্জীকরণ ব্যাখ্যা, নন্দমিশ্র কৃত গোবিন্দা-  
ষ্টক, রামায়ণ চন্দ্রিকা, রামতাপনী ব্যাখ্যা,  
বল্লভাচার্য্য নিবন্ধ, উৎসাহ প্রতান, শুদ্ধা-  
দৈত্য মার্ভণ্ড, নিরঞ্জন, পুরুষোত্তম মহা-  
রাজকৃত সুবর্ণমূত্র, নিম্বাকীর স্বমত নির্ণয়-  
সিদ্ধি, হরিভক্তি বিলাস, রামানুজীয়, ও তৎ-  
কৃত সারসংগ্রহ, অপায়দীক্ষিত কৃত শিব-  
তত্ত্ব বিবেক, বাচস্পতিকৃত ভক্তি প্রকাশ,  
অধৈতসিদ্ধিকার কৃত ভক্তিরসায়ন, নাম-  
কৌমুদী, সন্নিহিত মীমাংসা, ভক্তিরত্নাবলী,  
ক্ষেমেন্দ্র প্রকাশ, ভাস্কর-রাজকৃত ললিতা  
টীকা, নীলকণ্ঠকৃত দেবী ভাগবত টীকা,  
ভক্তিমূত্র ইত্যাদি। একগণে সুবিজ্ঞ পাঠক-  
গণ দেখুন ভাগবত যদি আধুনিক বোপ-  
দেব প্রণীত গ্রন্থ হইত, তাহা হইলে এত-  
গুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাহার নামোল্লেখ  
কখনই থাকিত না; এবং তাহা হইলে  
তাহার প্রমাণ প্রসিদ্ধ যাত্র ও প্রাচীন গ্র-  
ন্থকারগণ সাদরে কখনই গ্রহণ করিতেন  
না। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে আবার অ-  
নেকগুলি বোপদেবের পূর্বের রচিত গ্রন্থ-  
আছে। এই সকল আলোচনার ভাগবত  
কখনই বোপদেব প্রণীত বলিতে সাহস  
হয় না। “প্রবাদো বোপদেবী তু বদ্ধা পু-  
ত্রায়তে তরাং” ভাগবত বোপদেব প্রণীত  
একথা বলা আর বদ্ধার পুত্র সমান। আ-  
মরা গৌড়ানীর পক্ষপাতী নহি, কতক-  
গুলি লেখক কেবল বৈকব ধর্মের প্রতি



বিষেব তাব প্রকাল করিবার তত্ত্ব অসার মান্য বিচার সত্ত্ব প্রস্তাবে লিখিব।  
ও অবৌক্তিক তর্ক উপস্থাপন করিয়া ভাগ- এই প্রস্তাবে বোপদেবের প্রসঙ্গ ক্রমে  
বত পুরাণ বোপদেবপ্রণীত বলিতে সাহসী ভাগবত সম্বন্ধে বাহা বক্তব্য তাহাই ব-  
হইয়াছেন। আমরা ভাগবত সম্বন্ধে অ- লিলাম। জীয়ামনাস সেন

## রণরঘুর প্রলাপ।

### ৩। পরিতাপ ও পরিণাম ;—দোষ কাহার ?

মমে বড়ই ব্যথা পাঁইয়াছি ; দুঃখে, দুগার, লজ্জার আর ইচ্ছা হয় না যে সং- সারের কাছাকেও মুখ দেখাই। বস্তুতঃ আমার মত অপদার্থ অকর্মণ্য জীব বোধ হয় ভারতে আর নাই। “সাখিলেই সিদ্ধি” বলিয়া, সদর্পে আশ্ৰয়লাভ করিয়া প্রকৃত কর্মশীল কত পুরুষ অসাধ্য সাধন করি- তেছেন ; আর আমি ?—দূর হউক, সে কথা মুখে আনিতেও কষ্ট বোধ হয়।

কষ্ট বোধ হয় বটে ; কিন্তু না বলি- যাই বা থাকিতে পারি কৈ ? বলিলেও কাহারও ক্ষতি দেখিতেছি না, বরং মজ- লের সম্ভাবনা। তবে, লোকে দুঃখিবে, দুঃখুক। লোকে যেমন বুকে ডেমনি বলে, তাহাতে লোকের ত দোষ নাই। আমি কেন জনরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া, তাহাতে স্বখাসম্ভব আলোক সম্প্রদান করিয়া, তা- হার গুণ্ডতম গুহার অন্তস্তল পর্যন্ত দেখাই না। তখনও যদি লোকে আমার দোষ- নের, মন্তক অবনত করিয়া দোষ স্বীকার

করিল, দ্বিতীয় বার বাক্যব্যয় করিব না, দ্বিতীয় নিশ্চিত জানিব, কোথায়ও না কোথায়ও আমার ক্রটি আছেই আছে। এখন যে আমার ক্রটি নাই মনে করি, তাহা নয় ; কিন্তু আত্মচক্ষে আত্মদোষ দেখিতে পাই নাই, তাই সময়ে সময়ে স্ব- ভাব-মূলভ বা শিক্ষা-মূলভ জ্ঞান যেন আপনা আপনি আসিয়া চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তুলে, নিজদোষের অস্তিত্বের সম্ব- দ্ধেও সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। তখন প্রাণ ব্যাকুল হয়, হৃদয় উৎক্লিষ্ট হয়, জ্ঞান যোহাঙ্গর হইয়া যায়, উদারতা আত্মাভি- মানে মিশাইয়া যায়। তখন তাবিত্তে ইচ্ছা হয়, অন্ততঃ তাবিত্তে কুণ্ঠা বোধ হয় না যে দোষ আমার নহে, দোষ বধূরই। মনে হয়, বুঝি ঈর্ষাপ্রণোদিত—

ধিক্ আদ্যায় ! এমন গরলও আমার জংশোণিতে মিশ্রিত রাখিয়াছি। অবসানে একদূর আত্ম বিজ্ঞান জগিতে দিয়াছি। বাহাকে বুঝাইতে যত্ন করি নাই, বাহার

কার্য পরম্পরা আমি বুঝিতে সমর্থ হই  
নাই, আর অজ্ঞতার নির্ভর করিয়া সেই  
বধূচাকুরাণীর সহজে এমন ভরস্করী কল্পনা  
একবারের তরেও আমি করিতে সাহসী  
হইরাছি। আমার এ পাণের প্রায়শ্চিত্ত  
নাই, আমার আত্মবাতী হওয়া উচিত।

আত্মবাতী হওয়া উচিত, কিন্তু, আত্ম-  
হত্যা করি নাই, করিব না। বাহা উচিত,  
তাহাই কি কর্তব্য? বাহা প্রতিদান ক-  
রিতে আমার সামর্থ্য নাই, আমি তাহা  
লইবার কে? বাহা গড়িতে পারি না,  
আমি তাহা ডাঙ্গিয়ার কে? জরায়ুতে  
আমি যখন প্রথম প্রাণ পরিগ্রহ করি,  
তখন ত তদ্বিবরে আমার কিছুমাত্র কৃতিত্ব  
ছিল না। ভূমিষ্ঠ হইলে আমার সজীবতায়  
ত আমার কৃতিত্ব ছিল না। জননী আমার  
শুনা দিয়াছিলেন; খাজী-আমার অঙ্গ সং-  
স্কার করিয়া আমার সেই উজ্জলিতানন্দ  
ময়নে কজ্জল রেখা পরাইয়া কণে পীঠো-  
পরি, কণে সেই পরম-সুখ-শয্যা মাতৃ-  
অঙ্কে প্রহরে প্রহরে, দিনে দিনে, মাসে  
মাসে, অতি বড়ে, অতি আসরে সাবধানে  
রাখিয়া দিয়াছিল; গোপ-তনয় আমার  
জন্ম গাভী দোহন করিয়াছিল; গোপ-  
বালা আমার জন্ম গাভী-বৎস পৃথক  
রাখিয়াছিল; পিতা আমার ক্রীড়মকের  
নিমিত্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন; স্বর্ণকার,  
সময়ে আমার শোভা সর্ব্বদা করিয়া উ-  
ঠিতে পারে নাই বলিয়া, ভিরঙ্কার সহিয়া  
ছিল; চক্ৰবর্ত্ত আমার জন্ম তাবির্য্য ব্যস্ত

হইরাছিল; কৃষক আমার জন্ম বৈশাখের  
রৌদ্র, আবণের বৃষ্টি, মাঘের শীত সম-  
ভাবে, অকাতরে সহ্য করিয়াছিল; গুরু  
আমার জন্ম সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া,  
ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের সহিত অন্তঃ  
জ্ঞান করিয়া, কাব্য-বাকরণে সমান কচি  
দেখাইয়া সঙ্গীক হব বরল কঠিন করিতে  
কষ্ট বোধ করেন না; বসন্ত কুমার আ-  
মাকে ভালবাসা শিখাইয়াছিল; দাদা  
আমাকে সমাজ শাসনের মূলমন্ত্র বুঝাইয়া  
দিয়াছিলেন; আর, বধূচাকুরাণী আমাকে  
সংসার চিনাইয়াছিলেন;—এতগুলি ব্যা-  
পারের মধ্যে, কবে, কোন্‌মুহূর্ত্তে আমি  
কৃতী? এই যে এত কাল লোক হাসাই-  
লাম, এই যে এতবার প্রণয়ী কঁাদাইলাম,  
ইহা কি আমার কৃতিত্ব গুণে? এত যে  
কাব্যে আনন্দ ভোগ করিলাম, বিজ্ঞানে  
বিমোহিত হইলাম, গণিতে চিন্তা করিলাম,  
ইতিহাসে জীবন্ত হইলাম; আবার আ-  
লসো আত্ম-বিশ্মৃত হইলাম, দিলসে বি-  
ভোর হইলাম, রাগে টলিলাম, যন্ত্রতার  
টলিলাম,—ইহাতে আমার কৃতিত্ব-বল  
কোথায়? দেহ আমার; প্রাণ আমার;  
কিন্তু আমি কাহার? কোটি কোটি মনবে  
কোটি কোটি বৃগ আমার মঙ্গল কামনায়  
তদুগত চিত্ত থাকিয়া আমার অস্ত্রকার  
অবস্থার আমাকে উপহাসিত করিয়াছে।  
অতএব আমি আমার মহি, আমি সংসা-  
রের। এতজন্মের যত্নের, এতজন্মের লালন  
পালনের ফল আমার এই দেহ প্রাণ হে-

লাগ হারাইতে আমার অধিকার নাই।  
 “যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি”।  
 আমি আপন আপনি মরিব না, আত্ম-  
 হত্যা করিতে পারিব না। আবার, সর্বো-  
 পরি গরীয়সী কথা, আমি মরিলে, লোকে  
 বুঝে না, কিন্তু বলিবে, বধু আমার মৃত্যুর  
 কারণ। বধুর হৈতে নিম্মা হইবে, আ-  
 মার দোষে আমার জন্য নিম্মা হইবে;  
 আমি মরিব না। মরিব কেন? আমি যা-  
 হার চক্ষুশূল, সে মরুক !

মরিব না; কিন্তু মনে বড় ব্যাথা পা-  
 ইয়াছি; এত করিয়াও বধুর মনস্তৃষ্টি, আ-  
 মার কর্তব্য সাধন করিতে পারিলাম না,  
 এই দুঃখ আমার মর্মভেদ করিতেছে।  
 বধুকে আমার ব্যবহার বুঝাইতে পারিলাম  
 না, বধুও দয়া প্রকাশিয়া তাঁহার মনের  
 কথা আমার ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। আমি  
 অন্ধকারে যত পাদবিক্ষেপ করিতেছি, ত-  
 তই স্থলিতপদ হইতেছি। এখন ইহার  
 উপায়? না বুঝিয়াও যেন মানিলাম যে  
 দোষ আমারই; বিশ্বাস না করিয়াও যেন  
 স্বীকার করিলাম আমার জাতি বহুতর।  
 কিন্তু সে ত এখনকার কথা, এখনি ফুরা-  
 ইবে; তাহার পর ভবিষ্যতের পন্থা কি?

যাহা হউক, যেজন্য আমার দুঃখ,  
 তাহা আমি বলি; যেগুলি মূল ঘটনা,  
 আমি তাহা যে ভাবে দেখিয়াছি, যথাবৎ  
 প্রকাশ করি। আমার সাধ যে বধুও সব  
 ভীড়িয়া ছুরিয়া, গাড়িয়া পিটিয়া, যেমন  
 হউক, মনের কথা একবার মুখে বলুন।

লোকে শুধুক, আমার কথা তাঁহাকে বু-  
 জাইয়া বলুক, বধু প্রসন্ন হউন, আমি সুখী  
 হই। কিন্তু বধু কি তাহা বলিবেন?  
 বধুই যদি বলিবেন, তবে আমার এত দুঃখ  
 কেন? ফলে বধু বলুন আর নাই বলুন,  
 আমি বলি। লোকে তাহাতে আমার  
 দোষ আমার দেখাইয়া দিলে, আমি সং-  
 শোধন করিব, বধুর চরণে ধরিয়া ক্ষমা  
 চাঙ্গিন, তথাপি সুখী হইব। আমি  
 বলি।—

উপর্যুপরি বধুচাকুরাণীর দুইটি সন্তান  
 জন্মিয়া, প্রথমটি তিন দিন পরে, অপরটি  
 দশদশ দিন পরে মরিয়া যায়। ইহাতে বধুর  
 ও দাদার বিষম মনোবেদনা; আমিও  
 তাঁহাদের দুঃখে দুঃখিত।

আমি যে দুঃখিত, বধুচাকুরাণী তাহা  
 বিশ্বাস করেন না, আমি ইহার চাক্ষুষ প্র-  
 মাণ দিয়াছি, তথাপি তিনি বিশ্বাস করেন  
 না। আমাদের প্রতিবেশিনীদের মধ্যে  
 কেহ কেহ আমাকে একাধিক বার বলি-  
 য়াছিলেন—“ছি! রণরথ, এমন করাটা  
 তোমার উচিত নয়, ভাল দেখায় না।  
 তোমার বিবাহ হয় নাই; তাহা বলিয়া  
 বাহার হইয়াছে, তাহার হিংসা করাটা  
 কি ভাল? এজ্ঞাপতির নির্বন্ধ, যখন  
 ঘটবার তখন ঘটবে; তোমার দাদার  
 ত ইহাতে দোষ নাই। আর দাদার অ-  
 মনোযোগ, অস্বস্তি যদি ভাব, সে ভাল  
 মানুষের মেয়ে ত কোম কিছুতেই নাই;  
 তাহার মনে কেন কষ্ট দেও? আর বি-

বেচনা করিয়া দেখ, তোমার দাদার ছেলে-ও ত পর নয়; সে বাঁটিলে তোমাদেরই বংশ থাকিবে, তোমাদেরই নাম থাকিবে।” ইত্যাদি অনেক কথা, অনেক বার, স্থির ভাবে আমি শুনিয়াছি। কিন্তু কখনই বাঙ-নিপত্তি করি নাই। যিনি যখন বলিয়াছেন, তাঁহার কথা না কুরাইতেই হাসিতে আরম্ভ করিয়াছি, শেষে অট্টহাসি হাসিয়াছি। তখন যে তাঁহারা মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাউতেন, এখন, এত দিনে বুঝিতেছি, যে আমার সেই হাসি তাঁহারা অমুদার দৃষ্টিতে দেখিতেম, তাহার দোষ ভাব গ্রহণ করিতেন; করিয়া বিরক্ত হইয়া শেষে হয় ত বধুর নিকট গিয়া বধুর প্রতি তাঁহাদের ভালবাসা জানাইতেন। সংসারে এ ভালবাসার সৃষ্টি কে করিল? তোমার অমোদে যে আমার সর্বনাশ হয়, লোকে ইহা কবে শিখিবে?

যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহা করিয়াছে, সে তাহা বলিয়াছে। কিন্তু বধুর মধ্যে যে আমি দুঃখ পাইয়াছি, তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ আমি দিতে ক্রটি করি নাই। তাঁহার সেই প্রথম সন্তান মফ্ট হইলে, সেই মাঘ মাসে, সেই অমানিশিতে, সেই স্কুলারুকার-বিদারি ঘন ঘন বিদ্যুতের বিকট কুটিস হাস্য উপেক্ষিয়া, সেই শূন্যতা বাহি পবনের ভীতিসঞ্চারী গুহ্বাসে কণপাত না করিয়া, সেই প্রাণশূন্য জ্ঞানশূন্য বিকলাঙ্ক একমাত্র নরদেহের অস্ত্র-ভেদী দুর্গন্ধ পরিচ্ছন্ন করিতে গিয়া সেই

বীভৎস ককাল-রাশির প্রতিধাতে সেই শবদেহোপরি পতিত হইয়া, আবার সেই সখা-শূন্য, প্রেমশূন্য, অশ্রুশূন্য সেই পরকাল প্রতিবিম্ব প্রেতভূমি অতিক্রম করিয়া, অজ্ঞবস্ত্রে, কম্পিত-কলেবরে বধুর জন্য কেউ যথ আনিয়া দিয়াছিল? দূরে, নিকটে, গ্রামে, নগরে, একক অপরিচিত, এ দেবতার পুষ্প, ও দেবতার আতোদক, বধুর জন্য কে আহরণ করিয়াছিল? অগণিত অমায়ুষের তোষামোদ, চণ্ডালের পরিচর্যা বধুর জন্য কে করিয়াছিল? এত করিয়াও দ্বিতীয়বার সন্তান মফ্ট হইল বটে, কিন্তু সে কি আমারই দোষে? বধু বলিয়া ছিলেন “ভক্তি করিয়া আনে নাই”—তিনি আমার নাম করেন নাই, কিন্তু এই কথা গুলি বলিয়াছিলেন, আর অকপটে কাঁদিয়া ছিলেন। পুত্রশোক তিনি কাঁদিতেন, তাঁহার চিত্ত তখন উৎকিণ্ড, আমি তাঁহার কথা গ্রাহ্য করি নাই, বরং নির্জনে, নীরবে দুই বিন্দু অশ্রুমার্জ্জন করিয়াছি। যাহা হউক, আমার কর্তব্য আমি করিয়াছি, আমার যাহা সহিতে হয়, তাহা সহিয়াছি। আমি না করিলে কে করিবে? আমি না সহিলে কে সহিবে? এবারেও তাহাই ভাবিয়া করিলাম এবং সহিলাম; তথাপি হা দৈব! বধুর মন পাইলাম না।

এবারে আনুমান্য পুত্রকামনার বধুর সঙ্কপমতে দাদা মহাশয় যজ্ঞ করিয়াছেন। অন্য সেই যজ্ঞ ক্রিয়া; ব্রাহ্মণ পতিতের পরিচর্যা, অতিথির সংকার, আগন্তকের

অভ্যর্থনা, এই সকল ব্যাপারে আজি সকলেই ব্যস্ত । আমিও বসিয়া নাই ।

সপ্তাহ ব্যাপিয়া এই ব্যাপারের আয়োজন হইতেছে । বিষয় কার্যে অমনোযোগ করিলে সকল দিকেই ক্ষতি, সুতরাং অগ্রজ মহাশয় তাহাতেই ব্যাপৃত ; আমাদের ভৃত্য ও কৃষাণ সংপ্রতি বহুলীকৃত গৃহ কার্যে ব্যস্ত, আর আমি মানা স্থান হইতে মানা প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সংযোগ করিতেছি । এই সাত দিন, দিনমানের মধ্যে বাতীতে আহার করি নাই ; প্রভাতে বাহির হইয়াছি, হাটে বাজারে যাহা পাইয়াছি, কিনিয়া লইয়া ক্ষুদ্রিবারণ করিয়াছি, সন্ধ্যার পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়াছি । কেবল গত কল্য একবার মধ্যাহ্নে বাতী আসিয়াছিলাম, কার্যসম্বাদন করিয়া আসিয়াছিলাম । ভাবিয়াছিলাম, স্নানাহার সমাপন করিয়া একবার বসন্তকুমারকে দেখিয়া আসিব । স্নানাহার করিলাম, আমার সেই চণ্ডীমণ্ডপের কুঠরী হইতে বাহির হইতেছি, এমন সময়ে দাদার দৃষ্ট পথে পতিত হইলাম । দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন “ কোথায় যাইতেছ ? ” কি জন্য বলিতে পারি না, আমি বলিয়া ফেলিলাম “ কোথায়ও না ” । সুতরাং আর যাওয়া ঘটিল না ; কণকাল পরেই দাদা মহাশয় আমাকে কার্যান্তরে, আমান্তরে পাঠাইয়া দিলেন । দূরে যাইতে হইয়াছিল, কল্য প্রত্যাবর্তন করিতে পারি নাই ; অন্য বেলার এক প্রহর না হইতেই আসিয়াছি ।

তখন আমাদের বহির্বাটীতে লোক সমাগম হইয়াছে, সুতরাং বাহিরেই রহিলাম, তাড়া তাড়ি স্নান করিয়া লইলাম, তাহার পর সেইখানেই উপস্থিত মত, কার্য করিতে লাগিলাম । মধ্যাহ্নে এক বার বাতীর মধ্যে গেলাম, বধূর নিকট যাহা আবশ্যক হইয়াছিল, চাহিলাম । যাহা চাহিলাম, তাহা তিনি দিলেন না, কিছু বলিলেন । তখন বুঝিয়াছিলাম যে তিনি বলিতেছেন “ তোমার আজি কিছু করিতে হইবে না । ” এখন বুঝিতেছি তিনি বলিয়াছিলেন “ তোমার ‘আমার’ কিছু করিতে হইবে না ! ”

তখন ভাবিয়াছিলাম, কয় দিন আমার কষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া বধু আমার বিশ্রাম করিতে বলিতেছেন । সেই ভাবে, আনন্দে অধুত হইয়া, আমার শরীর মনের ক্লেশাবসান হইল বিবেচনা করিয়া সত্য সত্যই বিরাম করিতে আমার সেই ঘরে গেলাম ।

আমার তৎকালের সে আত্মাদের । গৌরব অনির্বচনীয় ; অপরে তাহা অনুভব করিতে পারিবে না । তামাক সাজিলাম, সকল ভুলিয়া সেন্ধিকারের কথা লইয়া বলিলাম, আমিই সর্ষে সর্ষা, আমি মহারাজ চক্রবর্তী, আমি অনুপম, আমি শরীর-বদ্ধ মুখ । আমার মুখ-বিনির্গত ধূমপুঞ্জ যেমন উর্ধ্বে উঠিতে লাগিল, আমার অন্তর তেমনি লম্বু, ততোধিক লম্বুভাবে উৎফুল্ল হইতে লাগিল । তখন আমার মনে কত

ভাবেরই উদয় হইতে লাগিল। মনে হইল যে কতকাল পরে আজি আমার সাধের মুখ পাইলাম; তখনই আবার মনে হইল প্রকৃত মুখের এই নিয়ম, প্রকৃতি আমা-  
দিগকে দেখাইতেছেন। ভাবিলাম যাহা মুখ, তাহা এমনি দুর্লভ বটে! বর্ষে কয়টি পৌর্ণমাসী রজনী? আবার পূর্ণিমাতিথি সত্ত্বেও বৎসর মধ্যে যামিনী সুল্লরী কত বার সুখা-নিসান্দিনী কৌমুদীতে অভিষিক্ত হয়? কিন্তু হায়! আমারই মুখচন্দ্র যে মেঘাচ্ছন্ন হইবে, তখন আমি তাহা ভাবি নাই। মুখের দিনে কে কবে দেব হু-  
র্ঘ্যোগের কল্পনা করিয়া থাকে? ভ্রান্তিই মুখ, নহিলে সংসারে হাসি কান্না থাকিত না; এ সংসার এমন সংসার হইত না।

বসিয়া ধূমপান করিতেছি, বাহির হইতে এক ব্যক্তি অপরিচিত স্বরে আ-  
মার নাম ধরিয়া ডাকিল। আমি বাহিবে আসিলে, এক ব্যক্তি আমার হস্তে এক খানি পত্র দিল। শিরোনামার হস্তাক্ষর অপক, এবং আমার অপরিচিত; অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিলাম, কিন্তু কাহার লেখা, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। পত্র বাহককে জিজ্ঞাসা করি, মনে করি-  
লাম; কিন্তু চাহিয়া দেখি সে ব্যক্তি দেখানো নাই। কাহার লেখা, তাহাতে আমার কতক্ষণ লাগিয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারি নাই।

পত্র পাঠ করিতে উৎসুক হইল;

কিন্তু যেই পত্র খুলিতে যাইব, অমন দাদা ডাকিলেন। আমি প্রায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাটীর মধ্যে গেলাম। গিয়া দেখিলাম দাদাব মুখ গভীর; আর যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মস্তকে বজ্রা-  
ঘাত হইল। শুনিলাম বধু বলিতেছেন “আমার ছেলে বাঁচে আর না বাঁচে, তা-  
হার কি? তোমার ভাই—” আর শুনি-  
লাম না, বাহিরে চলিয়া আসিলাম। সঙ্গে সঙ্গে দাদাও বাহিরে আসিলেন। আসিয়া সেই লোকসমারোহের মধ্যে আমাকে ব-  
লিলেন “রণরঘু, তুমি সহোদর, ভাল বাসিবার বস্তু; কিন্তু আর বুঝি ভালবাসা রাখিতে পারি না। আমার সম্ভান হউক না উহক, বাঁচুক না বাঁচুক, আমার তাহাতে ক্ষতি রুজি নাই। বরং তুমি বাঁচিয়া থাকি-  
লেই আমার পরম মুখের বিষয়। কিন্তু স্ত্রী-  
লোকে তাহা বুঝে না; বিশেষতঃ তাহার এত কষ্টে তাহার না বুঝাতেও আমি দোষ দিতে পারি না। তথাপি তুমি অজ্ঞানের মত, মুখের মত, বর্ষরের মত, নিষ্ঠুরের মত, তাহার সেই হৃৎকের জ্বালা রিণুণিত করি-  
তেছ ”

আমি নিকন্তর, অবাক্। অবসর দে-  
খিয়া দাদার অগোচরে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

এখন আমি একাকী, একবস্ত্র, কপর্দ-  
কহীন, সঁহায়হীন, নিরাশ্রয়, নিকশেধ্য। কোথায় চলিলাম, আমিই জানি না। আমার এই পরিণাম; দোষ কাহার?

এই রাত্তিকালে, এই প্রাণিশূন্য প্রান্তরে আছেন, একবার সেই পত্র খানি পড়িবার  
প্রতিশ্রুতি বলিবে—“কাহার ?” চেষ্টা করি ।

আমি এখন কি করিব ? জ্যোৎস্না

জীরগরষু গোলমামী

## অধ্যয়ন বিষয়ে ক একটি উপদেশ ।

“ভালর অম্পও ভাল,”—কতিপয় বৎসর পূর্বে অধ্যয়ন বিষয়েও এই প্রবাদ খাটিত । কদর্যা অসার গ্রন্থাদি বহুল পরিমাণে অধ্যয়ন করা অপেক্ষা দুই একখানি সদা স্মৃ পাঠ করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় ; এখন একখানি নাটক, তখন একখানি ইতিহাস, অপর সময়ে একখানি সংবাদ-পত্র এরূপ পাঠে কোন ফল নাই ; ভাল এক খানি গ্রন্থ ভাল করিয়া পাঠ করিয়া স্মরণ রাখ, তবেই কাজ চলিবে ; অধিক কিছু পড়িবার প্রয়োজন নাই । যখন মুক্তাযন্ত্র প্রচলিত ছিল না ; যখন সাধারণ-পুস্তকালয় স্থাপিত হয় নাই ; যখন মাসে মাসে দিনে দিনে নূতন নূতন গ্রন্থ, মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক সংবাদ পত্র, সাহিত্যিক পত্রিকা ও সমালোচনা প্রভৃতি প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয় নাই; তখন “ভালর অম্পও ভাল” একথা শোভা পাইত এবং এই প্রবাদানুসারে চলিলে ক্ষতি ছিল না । কিন্তু আজি কালি সে দিন নাই ; এখন নিত্য মুখ ও ঙ্গল ভিন্ন এরূপ উপদেশের বশবর্তী হইয়া কেহই চলিতে পারে

না । কাল-ধর্ম পরিবর্তিত হইয়াছে ; কাল-স্রোত উন্নতি-বশে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, কালক্রমে নিরন্তর ঘুরিতেছে, পৃথিবী ঘুরি-  
রিজেছে, গ্রহ উপগ্রহ ঘুরিতেছে, সকলেই উন্নতির পথে অগ্রসর । কালের তাড়নে অগ্র-  
সর—তুমি কেমন করিয়া “অম্পে” সমুদ্র হইয়া বসিয়া থাকিবে ? যদি পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে নিত্য প্রতিজ্ঞারূঢ় না হইয়া থাক, তবে তোমাকেও কাল-স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে, হয় অগ্রসর হইবে, নতুবা তুমি জড়ভরতের মত পড়িয়া থাকিবে, পৃথিবী তোমার উদ্দেশ লইবে না—কারণ কালের সঙ্গে যোগ না দিলে তুমি পৃথিবীর কেহ নও, পৃথিবীও তোমার কেহ নয় । মোট কথা, তোমাকে অম্প সময়ে নানা বিষয় অধ্যয়ন করিতে হইবে, এক সময়ে নানাবিধ বিষয়ে তোমার মনঃসংযোগ করিতে হইবে, অন্যথা সমাজ তোমাকে নিত্য জড় পদার্থবৎ মনে করিবে,—লোকের নিকট নিত্য ছের হইয়া তোমাকে থাকিতে হইবে । এরূপ যখন হইল, তখন কি কি বিষয় পড়িতে হইবে,

এবং কি প্রকারে পড়িতে হইবে, এসম্বন্ধে যদি আমরা কএকটি নিয়ম নির্ধারণ করি, তবে বোধ হয় পাঠকের মিকট “বান্ধ-বের” অকর্তব্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

আমরা উপরে যে কর্তব্যের উল্লেখ করিলাম, তাহা আপাততঃ যেরূপ সহজ বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। সর্ব-শ্রেণীর পাঠকের প্রীতিকর ও প্রয়োজনীয় সাধারণ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা অসাধ্য ব্যাপার। ভিন্ন ভিন্ন পাঠকের ভিন্ন ভিন্ন প্ৰহা, ভিন্ন ভিন্ন কচি, ভিন্ন ভিন্ন শ্রুযোগ ইত্যাদি। সুতরাং পাঠবিষয়ে সাধারণ নিয়ম কেমন করিয়া হইতে পারে? পাঠের নিয়ম পাঠকের হাতে। ফলতঃ যে পাঠক প্ৰহা, কচি, শ্রুযোগ প্রভৃতি অনুসারে আপনাদের জন্য শ্রুয় অধ্যয়ন বিষয়ে নিয়ম নির্ধারণ করিতে অসমর্থ, তিনি পাঠকনামের যোগাই নহেন, এবং তাঁহার অধ্যয়ন বাংলাকীড়া মাত্র। সাধারণ নিয়ম নির্ধারণ করা একপ্রকার অসম্ভব হইলেও, আমরা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি?

১মতঃ। তুমি এক সময়ে নানা বিষয় ঘটত নানা পুস্তক পত্রিকা ইত্যাদি পড়িতে চাও কতি নাই—বরং না পড়িলে চলিবে না। কিন্তু একখানি সঙ্গ্রহ নির্বাচন করিয়া লইবে। উক্ত গ্রন্থ তোমার অধ্যয়নের প্রধান সামগ্রী হইবে। অপরাপর ক্ষুদ্র গ্রন্থ পত্রিকাদি তাহার আনুষঙ্গিক নাত্র। নির্দিষ্টকালে কোন সঙ্গ্রহ

অধ্যয়ন করিলে মনের ভাব ক্রমশঃ সংকুত ও উন্নত হইবে; বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হইবে; হৃদয় প্রশস্ত হইবে; বিচার শক্তি দৃঢ়ীভূত হইবে; এবং গ্রন্থ অধ্যয়নে যে ফল তাহা সম্পূর্ণ রূপে ফলিবে। কিন্তু কোন রূপে গ্রন্থ যত উৎকৃষ্ট ও জান-বার্ত্ত হইক না কেন, এক বিষয়ে অনেককণ অভিনিবেশ থাকে না। বহুক্ষণ কোন এক বিষয় পাঠ করিলে মনে এক প্রকাঃ বৈরক্তি জন্মে। প্রত্যহ এক প্রকার আহার করিলে যেরূপ ভাল লাগে না এবং স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত জন্মে; এক প্রকার পুস্তক পাঠেও তদ্রূপ বৈরক্তির উৎপাদন করে, এবং মনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। যিনি প্রত্যহ পলার ভোজন করেন, তাঁহার যেমন কখন কখন লুচি, কচী, ভাত খাওয়া আবশ্যক; যিনি কোম্ব, মিল, বা বেকন অধ্যয়নে নিয়ত নিযুক্ত, তাঁহার পক্ষে তেমনি উপন্যাস, নাটক সংবাদ পত্র ও সাহিত্যিক পত্রিকা মধ্যে পাঠকরা আবশ্যক। পুস্তকস্বরে নিয়ত শাকার ভোজনে যেরূপ শরীর কষ্ট ও ভগ্ন হয়; নিয়ত উপন্যাস নাটকাদি পাঠে মনও তেমনি নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অতএবই বলি কোন চিন্তা-সাধ্য সঙ্গ্রহ প্রধান পাঠ্য স্বরূপ নির্দিষ্ট করিবে; অন্যবিধ চিন্তা ও বৈরক্তি অপনয়নের জন্য কেবল সহজ বোধ্য নাটক উপন্যাস প্রভৃতি পাঠ করিবে। আমাদের বক্তব্য বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য সহজ একটি উদাহরণ দিতেছি। মনে কর তুমি এলিসন



কৃত “ফরাসিবিপ্লব” পাঠ করিয়াছ। সংপ্রতি যে কমিয়ার ভারত-আক্রমণ আশঙ্কা হইতেছে, তাহা সত্য কিনা; তাহা সম্ভব কিনা, সম্ভব হইলে তাহার কি কি কারণ আছে; আক্রমণ করিলে তাহার ভাবি ফল কি হইবে? ইত্যাদি বিষয় তুমি যেরূপ অনুমান করিতে পারিবে; যে সকল পাঠক শুদ্ধ দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া রাজ-নীতি, সৈনিক বিদ্যা, বা বার্তাশাস্ত্রের আভাস মাত্র অবগত হইয়া থাকেন, তাঁহারা এবিষয়ে কোনও মতামত প্রকাশে আদৌ সক্ষমই হইবেন না। বালক যেমন উপকথা শুনিতো “তার পর কি?” বলিয়া উৎসুক হয়, সংবাদ পত্র পাঠকেরা তেমনি “আজিকার কাগজে যেন কি খবর আছে” বলিয়া ডাকের হরকরার জন্ত পথ পানে তাকাইয়া থাকেন। যে পাঠক নেপোলিয়ান বোনাপার্টের পতনের আনুপূর্বিক ঘটনা অবগত আছেন, বিগত ফরাসী প্রেসীয় যুদ্ধে কাহার পতন হইবে, তিনি আগেই জানিতেন। কিন্তু সংবাদ পত্র মাত্র পাঠ করিয়া তাঁহারা উক্ত যুদ্ধের বিবরণ অবগত হইতেছিলেন, তাঁহারা শেষ ফলের বিষয় বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বিগত সিপাহী যুদ্ধে সামান্য ইংরেজেরা জাহি জাহি রব ছাড়িয়াছিলেন, লর্ডক্যানিং ইংরেজের ভাবিজয় নিশ্চয় রূপে বুঝিতে পারিয়া অচলবৎ অটল ছিলেন।

২য়তঃ। যেপ্রস্থ তোমার প্রধান পা-

ঠ্যরূপে নির্বাচন করিয়াছ, তদ্ব্যতীত আর মত বা বক্তব্য সমর্থন জন্ত যে সকল ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, বা যে সকল লেখকের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সত্য কি না সে বিষয় নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিবে। অনেক লেখকের রোগ আছে, তাঁহারা স্বকপোল-কল্পিত মতকে অন্যের মত বলিয়া উল্লেখ করেন; অথবা কখন কখন এমন এক একটি বচন বা, বাক্য উদ্ধৃত করেন যাহার একাংশমাত্র তাঁহার বাক্যের প্রতিপোষকে, কিন্তু সম্পূর্ণ বাক্যটির ভাব অনারূপ; আবার অনেকে অন্যের মত, বা বাক্য চুরি করিয়া আপনার বলিয়া প্রকাশ করেন। এ সকল বিষয় ধরা সকল পাঠকের পক্ষে সহজ নহে; কিন্তু দুই-চারিটি স্থান ধরিয়া বিচার করিলেই বুঝিতে পারা যায়, আমরা যে প্রস্থ পড়িতেছি, তাহার মত ও বাক্য কতদূর বিশ্বাসনীয়, যদি শতকের মধ্যে একটি স্থানেও এইরূপ জুরাচুরি ধরিতে পারি, তবে নিরনব্বই স্থানেও যে ঐরূপ জুরাচুরি আছে, তাহা একরূপ অনুমান করিয়া লওয়া যায়। এরূপ প্রস্থ যত কেন উৎকৃষ্ট হউক না, একমাত্র এরূপ “অসামু্যতর” জন্য উহা সর্বথা অপাঠ্যও পরিবর্জনীয়। মনে কর কোন প্রস্থকার বলিতেছেন “গালিলিও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছে; তাহার হেতু এই এই”। হেতু গুলি ন্যায় সঙ্গত ও বিজ্ঞানসম্মত হইতে পারে; কিন্তু মিউটমের স্থলে গালিলিওর নামের উল্লেখ

করাতেই ঐশ্বর্যকারের বিদ্যাভ্রম্মাণ্ড একাংশ পাইয়াছে। পুনশ্চ, মনে কর, কোন ধর্মোপদেশটি বলিয়া গিয়াছেন “যত তীর্থ-পরিভ্রম, সকলি মনের ভ্রম, সারকর ঐশ্বর্য-চরণ।” এস্থলে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, ঐশ্বর্যপী ভগবানের পাদ পদ্ম যিনি সার জ্ঞান করিয়াছেন, তাঁহার তীর্থ পর্যটনাদি-বাহ্যধর্মকর্মের কোন প্রয়োজন নাই, ইহা বলাই ঐশ্বর্যকারের উদ্দেশ্য, অন্যথা তীর্থপর্যটন নিষিদ্ধ বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু যিনি তীর্থ পর্যটনাদির বিপক্ষ, তিনি স্বীয়-মতসমর্থন করিবার জন্য, শেব চরণটি বাদ দিয়া প্রথম দুটি চরণ উদ্ধৃত করিয়া আপনার মনোমত মীমাংসা করিয়াছেন। আর উদাহরণের প্রয়োজন নাই; পাঠককে এইমাত্র বলিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি যে একপ ঐশ্বর্য পাঠে ক্ষতি ব্যতীত লাভ নাই। এই উপদেশ মত চলিলে শীত্রই পাঠকের “সমালোচনশক্তি” বিকাশ হইবে।

৩য়তঃ। পাঠ্য বিষয়ানুসারে দ্রুত বা ধীরে পড়িতে হইবে। যে বিষয় বুঝিতে অধিক চিন্তার প্রয়োজন করে না, তাহা শীত্র শীত্র পড়িবে; বাহ্য বুঝিতে বুঝির তীক্ষ্ণতা, চিন্তা ও বিচার শক্তির আবশ্যক, তাহা যত ধীরে হয় পড়িবে, কেবল পাত উন্টাইয়া গেলে হইবে না। গত কল্যা ৫০ পৃষ্ঠা পড়িয়াছ বলিয়া অস্যাও যে ৫০ পৃষ্ঠাই পড়িতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ নিয়মে

কোন আবশ্যকতা নাই; কারণ, প্রত্যেক পাঠক স্বতঃই এ নিয়মানুসারে চলিয়া থাকেন। যদি যথার্থই পাঠকমাত্রের একপ নিয়মে চলিতেন, তাহা হইলে একপ নিয়মের যে প্রয়োজন ছিল না, তাহা কে অস্বীকার করে? কিন্তু হৃৎকের বিষয় এই যে, অতি অল্প পাঠকই এ নিয়মে পড়েন; তাতেই আমাদের এ উপদেশ। পড়িতে পড়িতে অনেকের এক প্রকার বৈরক্তি জন্মে, তখন তাড়াতাড়ি পাত উন্টাইয়া গেলেই তাঁহার রক্ষা পাইলেন মনে করেন। অনেক বিষয়ের প্রতি মনোযোগ বড় একটা না দিয়া জলজ্ঞাতের ন্যায় এক নিশ্বাসে এক এক পৃষ্ঠা পড়িয়া ফেলেন। একপ করাযে অনায়াস তাহা বলাই বাহুল্য। লেখক যে বিষয়টি চিন্তা করিয়া লিখিয়াছেন, তাহা চিন্তাশীলের ন্যায় না পড়িলে বুঝা যাইবে কেন? আর না বুঝিয়া পড়িলেই বা ফল কি? অন্ন বাঞ্ছনাদি যেরূপ শরীর রক্ষার সামগ্রী, মনের আহ্বার তেমন জ্ঞান। মন্দাধিসূত্রে আহ্বার করিলে যেমন জীর্ণ হয় না, অনিচ্ছাসূত্রে পড়িলেও তরুণ তুলিয়া যাইতে হয়। পঠিত বিষয় কার্যোপযোগী করিতে হইলে, তাহা অতিনিবেশপূর্বক পড়িতে হইবে; এবং পড়িয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। মর্ড বেকন কছেন “কোন কোন গ্রন্থের আশ্বাদমাত্র লইতে হইবে; কোন কোন গ্রন্থের রস পান করিতে হইবে; কোন কোন গ্রন্থ আস করিয়া জীর্ণ করিতে হইবে।” শে-

যদি করিবার ইচ্ছা না হইলে, প্রথম দুটি করিতে ক্ষতি নাই। কিন্তু যে সময় অধ্যয়নে একেবারে অভিনিবেশ না থাকে, তখন “অঙ্গুষ্ঠ পৰ্য্যন্ত” নিষিদ্ধ। জ্বর হইলে গুরু আহার না করিয়া সাংস, এরা-কট খাওয়া বিধিত; কিন্তু প্রবল নূতন জ্বরে “লজ্জনং পথ্যং”। আমরা তৃতীয় নিয়মের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি নিয়মেরও উল্লেখ করিয়াছি। অতএব দুইটি নিয়ম সংক্ষেপে পৃথক করিয়া বলিতেছি। (১) বিষয় বিশেষে ক্রম বা দীর্ঘের পড়িতে হইবে। (২) বৈরক্তি জন্মিবামাত্র পুস্তক বন্ধ করিয়া অন্য বিষয়ে ক্ষণকাল যনঃ-সংযোগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়টি আশ্রমের চতুর্থ উপদেশ। সংপ্রতি আমরা পঞ্চম নিয়মের উল্লেখ করিতেছি।

৫৩ঃ। পাঠ্যাগ্নে যে সকল নূতন শব্দ, নূতন ভাব, অথবা ঐতিহাসিক রূপান্তরের উল্লেখ থাকে, তাহা তৎক্ষণাৎ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নিকটে একটি পেন্সিল, শাদা কাগজ বা নোটবুক এবং একখানি অভিধান রাখা প্রয়োজন। অপরিজাত শব্দের অর্থ এইরূপে লিখিলে ক্রমে ভাষাতে অধিকার জন্মে। নূতন ভাব লিখিয়া রাখিয়া অবসরক্ৰমে লিখিলে ক্রমে মন প্রশস্ত হয়। এবং ঐতিহাসিক রূপান্তর প্রভৃতি স্মরণরূপে বুঝিতে পারিলে পাঠ্যবিষয়ও স্মরণরূপে বুঝা যায়; ও চিত্রপটে উক্ত বিষয়টি স্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়া থাকে। লর্ড মেকলে কত পুস্তক

পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই; সুতরাং তদীয় রচনার ইতিহাস, জীবনচরিত ও অন্যান্য বিষয়ের যত উল্লেখ আছে, অন্য কোন গ্রন্থকারের রচনায়ই তত দেখা যায় না। তিনি যে স্বীয় বিদ্যাপ্রকাশের জন্য এরূপ করিতেন তাহা নহে; লিখিতে লিখিতে স্বতঃই সেগুলি তদীয় লেখনীমুখে উপস্থিত হইত। ওয়ার্ল্ড হেরিৎসের বি-কঙ্কে যে বিচার হয়, তাহার সমালোচনা করার উপলক্ষে, লর্ড মেকলে এক স্থানে কহিয়াছেন “বার্ক ভারতবর্ষের বিবরণ এরূপ অবগত ছিলেন যে, জর্জ গার্ডনের বিদ্রোহের স্তায় বারাগসীর বিদ্রোহ, এবং ডাক্তার ডেভের প্রাণদণ্ডের স্তায় রাজা নন্দ-কুমারের প্রাণদণ্ড বিবরণ তাহার নিকট প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল।” জীবনচরিত-যদিও একখানি অভিধান খুলিলেই পাঠক ১৭২০ খৃষ্টাব্দের জর্জ গার্ডনকৃত কথলিক-মুক্তি সম্বন্ধীয় বিদ্রোহের বিবরণ জানিতে পারিবেন। এবং যিনি বসোএলকৃত জঙ্গনের চরিত পাঠ করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে জাল করা অপরাধে ডড নামক একজন যাজকের উপরোক্ত সময়ের কাসি হইয়াছিল, এবং জঙ্গন তাহার প্রাণরক্ষার্থে অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। এই দুটি বিবরণ অবগত হওয়াতে যে বিশেষ ফল আছে, তাহা আমরা বলি না। কিন্তু এই দুটি বিষয় জানা থাকিলে যেই লর্ড মেকলের উল্লিখিত ব্যক্তির উপদেশ উপমাদের সাহায্য দেখিয়া

মনে পুলক উপস্থিত হইবে, তেমনি এই ঘটনা চতুর্দশ চিরদিনের তরে মনোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে। বিশেষতঃ এইরূপ ভাবে পড়িলে, বৎসরান্তে পাঠক যত জ্ঞান লাভ করিবেন, অন্যথা পঞ্চাশৎ বৎসরও তাহা করিতে সমর্থ হইবেন না।

৬ষ্ঠতঃ। এক বিষয়ে যতগুলি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে যেখান সর্বোৎকৃষ্ট তাহাই পাঠ করা উচিত। হইতে পারে কোন গ্রন্থকারের প্রতি কোন কারণে তোমার বিদ্বেষ আছে; অথবা কোন বিষয়ে তোমার কোনরূপ দ্বির মত আছে; কিন্তু গ্রন্থকার বিশেষের গুণবিশেষ পাঠ করিলে সে মত আর বজায় রাখিতে পার না। এসকল সত্ত্বেও তদীয় গুণ যদি উপস্থিত বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ মধ্যে উৎকৃষ্ট হয়, তবে তাহাই পাঠ করিবে। মনে কর, তুমি অদ্যোপাস্ত ইংরাজদিগের ভারত-অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ জানিতে চাও; মরে, মার্সমেন ও মিল এই তিন জনের ইতিহাসই তোমার সম্মুখে বর্তমান। এই তিন জনের মধ্যে মিলের ইতিহাসের প্রতিপক্ষাতিতা ও জাতিবিদ্বেষিতা দোষের জন্য তোমার হৃদয় আছে; অথচ মিল না পড়িলে সকল বস্তুর বিস্তারিতরূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই; এমত স্থলে বিদ্বেষ সত্ত্বেও মিল পড়াই তোমার উচিত।

৭মতঃ। কেবল সমাজে আলাপ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া পড়িও না। অনেকের জন্ম আছে যে-যে কোন বিষয় উ-

পস্থিত হউক, তাহাতে দুই চারি কথা কহিতে পারিলেই বিদ্যার যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হইল। সর্ববিষয়ে বিশেষতঃ বর্তমান সময়-প্রচলিত সাধারণ আলোচ্য বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা আবশ্যক বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানটুকুই একমাত্র জ্ঞান নহে। অনেকে কোন গাফিলি পড়েন না, কেবল দৈনিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পড়িয়া লোকসমাজে বিদ্বান বলিয়া পরিচিত হইতে সাধ করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে আবার সংবাদ পত্রের সম্পাদকীয় লুপ্ত পর্থাৎ পাঠ করেন না; সংবাদ-লুপ্তই ইহাদের একমাত্র পাঠ্য। এরূপ পাঠক নিতান্ত অসংসার-বিহীন। বর্তমান ঘটনাবলী পত্রিকা-পাঠে জানা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত জ্ঞানলাভ কোথা? আইভানহোর কএক পৃষ্ঠা পড়িয়া বলিতে পারিবে বটে যে, অ'রেয়া রিবেকার ছায়া ও বঙ্গাধিপ-পরাজয়ের “সৈনিক প্রদর্শন” টুর্নেমেন্টের অনুকরণ; কিন্তু তাহাতে ফল কি? কোন দৈনিকপত্র পড়িয়া বলিতে পারিবে বটে “ইনস্পেক্টর—সাছেব আত্মহত্যা করিয়াছেন” এবং পরদিন অন্য একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়িয়া সে কথার প্রতিবাদ করিতে পারিবে বটে, কিন্তু তেমন খবরে জগতের বা তোমার নিজের কিছু উপকার কি আছে? উপকার দূরে থাকুক যথেষ্ট অপকারই সাধিত হইবে। এরূপ পল্লব-প্রাচীর অভ্যাস হইলে চিন্তা-সাধ্য কোন বিষয়ে মন আর যাইবে না, ক্রমে

মন অসার ও নিস্তেজ হইবে। বর্তমান শতাব্দীর একজন বিখ্যাত গ্ৰন্থকার \* বলিয়াছেন “সকল বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন বটে, কিন্তু কোন এক বিষয়ে প্রগাঢ় বুৎপত্তি থাকা আবশ্যিক।” একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেখ। প্রায় সকলেই দুই চারিটি ভাল কথা জানে; দুই একটি খোস গম্প জানে; দুই একটি তাল বাজাইতে পারে; দুই একটি গান করিতে পারে; একটুকু নাচিতে—অন্ততঃ লক্ষ রম্প দিতে সমর্থ; একটুকু চিত্র—অন্ততঃ একটা পেঁচা আঁকিতে জানে; দুই একটা আঁক কসিতে পারে; এবং একটুকু ব্যায়াম—অন্ততঃ এক খান লাঠী ঘুরাইতে জানে। কিন্তু কে তাহাদিককে জিজ্ঞাসা করে? অপর পক্ষে, এই সকল বিষয়ে সার উইলিয়ম জোন্সের কিছু কিছু জ্ঞান ছিল। তাহার সঙ্গে ভাষা বিষয়েও প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। সুতরাং এই শেষ কারণে তাঁহার নাম দিগন্ত-ব্যাপী। তাই বলি কেবল বহুভাষিহ লাভের জন্য অধ্যয়ন করিও না। শত শত নাটক পড়িলে সমাজে অংলাপ করিবার অনেক কথা পাইবে। কিন্তু তাহাতে ফল যত না হইবে, সেক্সপিয়রের একখান নাটকে তাহার সম-

\* সার আর্থর হেম্পস্।

হস্ত গুণ ফল পাইবে—নাটক কি বুঝিতে পারিবে—মানবচরিত্র বুঝিতে পারিবে—ঘটনা বৈচিত্র বুঝিতে সমর্থ হইবে—নাট্য কীর জ্ঞানের সহিত অপর সহস্রবিধ জ্ঞান লাভ হইবে।

৮মতঃ। এইটি আমাদের শেষ উপদেশ। কোন গ্রন্থপাঠ শেষ করিয়া সমগ্র গ্রন্থ বা প্রতি অধ্যায়ে গ্রন্থকার কি বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, যত দূর পার, গ্রন্থকারের ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে, গ্রন্থকার যে সকল হেতু দর্শাইয়াছেন তাহার সমর্থন বা প্রতিবাদ করিতে অথবা গ্রন্থকারের বক্তব্যের সারসংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে। এরূপ করিলে উক্ত গ্রন্থপাঠে যে উপকার তাহা সম্যক প্রকারে লাভ করিবে। অধ্যয়ন কোন উদ্দেশ্য নহে, জ্ঞানরূপ উদ্দেশ্য লাভের সোপান মাত্র। লিপিবদ্ধ সেই জ্ঞান কার্যে পরিণত করিতে পারিলে, ভোমারও উপকার, জগতেরও উপকার। চিন্তা ও বিচার শক্তির উন্নতি সাধনই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায়ই অধ্যয়ন। যত বড় বড় জ্ঞানী বা বাগ্মী এপর্যন্ত জন্মিয়াছেন, তাঁহারা প্রথমে এই শোভোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রমাণ বার্ক এবং জনফ্যুয়ার্ডমিল। শ্রীজ-



## পরিত্যক্ত-পল্লী।

১

অন্তরায় দিনমনি পশ্চিম গগনে,  
জলদের গিরিরাজি রঞ্জি থরে থরে,  
সোহাগে রঞ্জিত করি তরল কিরণে  
নীল কিশলয় দাম তরুর শিখরে।

২

ভানুর কিরণে গজা স্রবণ-বসনা  
কলকল রবে বয় মৃদু কমোদিনী,  
সলিল অলকে মরি! চঞ্চল-চরণা,  
কনক-কুমুদ-দাম পরি সুহাসিনী।

৩

দীরে দীরে শ্যাম সন্ধ্যা ভুবন-মোহিনী  
উত্তরে মরত ভূমে কানন বাসরে,  
কুটিছে মলিকা যুই সন্ধ্যা-মুশোভিনী,  
কুটিছে নীরবে তারা বিকচ অগরে।

৪

কলময়ী বনদেবী প্রফুল্ল অন্তরে  
জ্ঞানাকির মালা বাঁধে শ্যাম লতিকায়,  
কুটিছে কলকী চাঁদ নীল জলধরে,  
তালতরু-শ্যামশিরে সমীর খেলায়।

৫

মরি কিবা শ্যাম সন্ধ্যা অধরে ভূতলে,  
রঞ্জিত সন্ধ্যায় শ্যাম কান্তি মনোরম,  
দিবি উজ্জ্বলিনী তারা গগনে বিজলে,  
প্রফুল্ল কুমুদ জালে শোভিত ভুবন।

৬

অশ্রুট তিমির জালে এই সন্ধ্যা কালে  
অই যে সম্মুখে পল্লী পরি-দুশামান,  
মনোহর শ্যাম-কুচি রক্ষ অগুরালে,  
প্রকৃতির কমলীয় লাভণ্য নিদান।

৭

কেম আজি অই পল্লী বিবধ বদনে,  
প্রকাশিছে প্রকৃতির মূর্তি বিভীষণ?  
নিশ্চক্ৰ নিশীথে মান চক্সর কিরণে,  
অনন্ত বিবাদ বেশ করিছে কীর্তন।

৮

সকলি নীরব নৃধু প্রান্তরে প্রান্তরে  
জুহু করে অবিরল অনিল-নিশ্বসন,  
সকলি নীরব নৃধু তরুর শিখরে।  
পাতায় পাতায় নিশি-নীহার পতন।

৯

যে দিকে ফিরাই আঁখি নিরখি কেবল  
অনন্ত-বনন্ত বন তরুলতা ময়,  
কোণা আজি হায় সেই শোভা নিরমল,  
আরণ্য শোভায় এ বে পূর্ণ সমুদয়।

১০

অই যে সম্মুখে শত ভগ্ন নিকেতন,  
অন্ধকার পরিত্যক্ত বিবাদ ভাণ্ডায়,  
কেম আজি জনহীন করি দরশন,  
কে নাশিল হায় তার স্রবমার হার।

১১

এই ত হাসিছে মরি ! নক্ষত্র-কুণ্ডলা  
সলজ্জ কুমুমরী সন্ধ্যা মহাসিনী,  
বক্ষিম রজত টিপ ধূসর-অঞ্চলা,  
কোমল নীলাভ ভালে পরিয়া রঞ্জিনী ।

১২

নেহারিয়া এই সন্ধ্যা, প্রমোদে মাতিয়া,  
এক দিন এই শত ভয় নিকেতনে,  
সুকোমল করে শংখ যতনে ধরিয়',  
কত শত কুল-বধু সহ্যায়া বদনে

১৩

বাজাইত, জিনি নব কমলিনী-দল  
বিকচ কপোল হুটি উৎকুল নয়নে,  
করিয়া মূহুর্ত ক্ষীত পুনঃ অবিরল  
চম্পক বরণ রঞ্জি রক্তিম রঞ্জে ।

১৩

এই ত রে সেই চাক সন্ধ্যা সুকোমল,  
দাঁড়াইয়া এই আমি অবাচ্ বদনে,  
কোথা আজি সেই সব—হায় রে কেবল  
গুটী কত শংখ ধনি পশিছে শ্রবণে ।

২৫

জনহীন আজি পল্লী দিনেকের তরে,—  
হাসিল যথায় মরি নন্দন কানন ;  
নিরখিয়া সেই পল্লী হৃদয় বিদরে,  
আজি হায় সেই পল্লী অরণ্য বিজন !

১৬

সরল অস্তর সেই গ্রামবাসিগণ,  
চিরলজ্জাশীলা সেই পল্লী-নিবাসিনী,  
সরলতা প্রতিভাতি কোথায় এখন,  
কোথা সেই পল্লী শোভা নয়নরঞ্জিনী ?

১৭

সকলি সুমার এই তরঙ্গিনী তীরে—  
কালের অনন্ত অন্ধ জ্বয়ের মতন,  
পার্থিব পিঞ্জর সবে তাজিয়া অচিরে,  
সুখময় পুণ্য লোকে করেছে গমন ।

১৮

হাসিলে হেমাজী উষা পূরব অস্তরে,  
প্রভাতের সুকোমল অমিল নিশ্বনে  
কুজিলে কাননে পাখী স্নমধুর স্বরে,  
ঝড়ারিলে পিকেত্বরী ললিত পঙ্কজে,

১৯

শুনি সেই মধুময় বিহঙ্গ-কুন্ডন,  
পরিশিরা প্রভাতের অমৃত আসার,  
কোন দিন পুনঃ তারা পাবে না জীবন,  
মুহূর্তেক তরে কিবা জাগিবে না আর ।

২০

অন্তে গেলে দিনমণি গোখুলি-চুসনে,  
পল্লী-বিনোদিনী-মালা ষাইবে না আর,  
কলসী ধরিয়া কক্ষে বারি অয়েষণে,  
বদনে মধুর হাসি মাখি অনিবার ।

২১

সারাদিন পরে এই কুটার প্রাঙ্গণে  
নাচিয়া নাচিয়া আর কুলশিশুগণ,  
যবেনা জনকে হেরি চঞ্চল চরণে,  
লভিবারে জনকের সম্মুখে চুসন ।

২২

চাক সন্ধ্যা কালে ক্রান্ত বিস্তৃত অস্তরে  
পরিভ্রম-জীবী কিবা ভেটাবে না আর,  
শ্যামাজিনী প্রেরসীরে, কুটারের দ্বারে,  
চুবি মুখ খুলিবে না অর্গের দুয়ার ।

২৩

দরিদ্র যুবক কিবা দেখিবে না আর  
বসি সুখময় পর্ণকুটার সময়ে,  
লক্ষ্মীস্বরূপিণী কান্তা,—শত সুখাধার,  
পবিত্র-সরল-প্রেম-পূর্ণিত নয়নে।

২৪

অইত কুটার সেই শুষ্ক-পত্রময়,  
এই সেই মনোহরা সজ্জা মধুমতী,  
কিন্তু আজি কোথা সেই অভিন্ন-হৃদয়—  
যুগল প্রণয়-পদ্ম—দরিদ্র দম্পতী?

২৫

কালের সাগরে আজি ছায় রে সকল  
ভুবি ল অনন্ত জলে;—ভগ্ন নিকেতন,  
আর অই পর্ণগৃহ, সমীরে চঞ্চল,  
রহিয়াছে তাহাদের চিত্তের মতন।

২৬

একদিন এই স্থানে কত অভাগার  
খুলিল স্বর্গীয় প্রেমে পবিত্র অন্তর,  
কণ অভিন্ন পুনঃ ফুরাল আবার,  
মাটিতে সোণার অঙ্গ মিশিল সত্তর।

২৭

বিজয় বিপিন বন কুসুমের প্রায়—  
কত শত কালিদাস জন্মিল এখানে,  
হল না বিকাশ কিন্তু ধীরে ধীরে ছায়।  
হল ভয়ে পরিণত কৃতান্ত-রূপাণে।

২৮

কত শত মহামতি উন্নত-জীবন,  
অশেষমূল্য যার চির ইচ্ছা ছায়।  
কত শত দেব-আত্মা জীমূহুদন  
যুগাইছে ছায় এই পত্নীহৃতিকার।

২৯

জীব ক্রান্ত তব গিরি সকলি নশ্বর।  
মাটির স্রজন চির অসারতায়।  
সকলি কালের করে ঘোরে নিরন্তর,  
একদিন হবে পৃথী তিমির-মিলয়।

৩০

সাধের মানব জন্ম, এই কলেবর  
মৃত্তিকার অঙ্গে মাখা চক্ষুর কিরণ;  
অংশুমালী রবি কিবা তারা শশধর,  
সকলি কালের করে হবে নিপতন।

৩১

ছায় আজি কোথা মম শৈশব সরল,  
বোধ হয় যেন আজি হৃদয় স্থপন।  
স্মৃতির রূপায় সেই দিন নিরমল,  
দূর নক্ষত্রের প্রায় হতেছে অরণ।

৩২

আজি এই জীবনের প্রথম যৌবন,  
উন্নত জীবন যম নাহি বাতা জ্ঞান,  
চরণের তলে বিশ্ব করি দরশন,  
অতুল ঐশ্বর্যে আমি রাজেন্দ্রসম্মান।

৩৩

কিন্তু যবে সেই দিন, আসিবে আমার,—  
কোথায় রহিবে এই চাক নিকেতন,  
কবিত্ত-রূপিণী প্রিয়া প্রেম পারাবার,  
কিবা সেই সুখময় বিলাস কানন।

৩৪

পার্থিব জন্মে যেই প্রেমোদ কানন  
একপ্রাণে একমনে উন্নত জীবনে,  
বিশ্বের বিলাস ত্রব্য করি আহরণ  
নন্দন-কানন-সম সাজানু বতনে।



৩৫

আমিও আবার এই পল্লীবাসী সম  
বসুমতী জননীর অঙ্গে অনিবার,  
যুমাঈব একদিন জন্মের মতন,—  
যেই নিদ্রা কোনকালে ভাঙিবেনা আর।

৩৬

লো প্রকৃতি, কহ মোরে কহ লুহাসিনি  
এই কি মানব লীলা? এই পরিণাম?  
সৌদামিনী-সম ক্ষণ বিকাশি রঞ্জিণী  
লভিল,লভিবে সব অনন্ত বিরাম!! জীহঃ--

## সম্বন্ধ নির্ণয় ।

বঙ্গদেশীয় আদিম জাতিসমূহের সামাজিক বৃত্তান্ত । \*

‘সম্বন্ধ নির্ণয়’ বঙ্গভাষায় একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং ইহাতে লিখিত বিষয়গুলি বঙ্গবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য । গ্রন্থকার এই গ্রন্থে রাঢ়ীয়, বা-  
রেন্দ্র, বৈদিক, মধ্যাঙ্গেরী ও ঔপনিবেশিক  
ব্রাহ্মণের এবং কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির বি-  
বরণ বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন । গ্রন্থখানা  
বহুদিন যাবৎ আমাদের নিকট সমালোচ-  
নার জন্য প্রেরিত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থোক্ত  
বিষয়গুলিতে আমাদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা না  
থাকায় আমরা এপর্যন্ত ইহার সমালোচনে  
হস্তক্ষেপ করি নাই । এত দিন নানাবিধ  
কুলশাস্ত্রের গ্রন্থ পাঠ করিয়া এবং কুলজ  
পণ্ডিতগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অদ্য  
সম্বন্ধনির্ণয়ের সমালোচনার প্ররত্ত হইলাম ।  
এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, কুলশাস্ত্রের প্র-  
সিদ্ধ পণ্ডিত বিক্রমপুরের জীবন্ত নবীনচন্দ্র  
বিদ্যারত্ন ঘটক মহাশয়ের নিকট আমরা

অনেকগুলি অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হইয়াছি ।

আমাদের বিবেচনার সকলগুলি বি-  
ষয়ের সমালোচনা একবারে করিতে গেলে  
বহু বিস্তৃত হইয়া উঠে, তাহাতে পাঠকের  
বিরক্তি হওয়াও অসম্ভব নহে, অতএব অদ্য  
কেবল আমরা গ্রন্থের আদিভাগ সহিত  
রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের বিষয়েই মতামত প্রকাশ  
করিব । কোন কোন স্থলে বিদ্যানিধি ম-  
হাশয়ের মতের সঙ্গে আমাদের মতের অ-  
নৈক্য ঘটিলেও বহু গবেষণার জন্য আমরা  
তাঁহাকে ধন্যবাদ দিব ।

যিনি বাঙ্গালার বর্তমান জাতিসমূহের  
আদিম বিবরণ লিখিতে প্ররত্ত হইয়াছেন,  
তিনি অবশ্যই সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন ।  
গ্রন্থ লিখিবার উদ্দীপ্তা প্ররতি এইরূপ সহ-  
দেশ্যে পরিচালিত হইতে দেখিলে সন্দেহ  
পাঠকমাত্রই সন্তোষ লাভ করিবেন সন্দেহ  
নাই; কিন্তু এই ঐতিহাসিক বিবরণে পু-

\* কৃষ্ণনগর নর্থালস্থলের প্রধাম শিক্ষক জীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য প্রণীত ।

রাণাদি গ্রন্থসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা যোগ করা কিয়ৎপরিমাণে হইলেও অনুচিত হইয়াছে। গ্রন্থের ৫৬ পৃষ্ঠা হইতে ৭৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও নাগলোকের উপন্যাসগত বংশাবলী অনাবশ্যক। “রা'কস, বানর, যক্ষ, কিন্নর প্রভৃতি জাতি পুলস্ত্য ঋষির সন্তান।” “শলভ, নিংহ, কিস্পুকষ, ব্যাঘ্র, ঋক, ঈহা-যুগ পুলহ-ঋষির সন্তান।” “অশ্বিনী, ভরণী প্রভৃতি ২৭টি নক্ষত্র মক্ষের কন্যা।” এই কথাগুলির সত্যতা স্বীকার করিয়া ইতিহাসে সন্নিবেশ করা আমাদের বিবেচনার বড় ভাল দেখায় না; এখন আর বঙ্গীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় এই অলৌকিক বিবরণে বিশ্বাস করিতে চাহেন না। বাস্তবিক আমাদের পূর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে; উহার মধ্যে গৃহ ভাবার্থ সংযুক্ত অনেক কথা সংযোজিত রহিয়াছে। কীর্তি, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, আত্মা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, মতি, লক্ষ্য, ইহাদিগকে মক্ষের কন্যা ও ধর্ম্মপত্নী বলিবার কি কোন গুণার্থ নাই? যদি থাকে তবে তাহা ভাঙ্গিয়া বলাই কর্তব্য; ঐ ইতিহাসিক বংশাবলীতে উহাদিগকে দক্ষহতা বলিয়া নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

বিদ্যানিধি মহাশয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণ বিভাগের যে সকল কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাহাতেও সন্তোষ লাভ করিতে পারিলাম না; কারণ ইহাতেও তিনি পৌরাণিক কবিকল্পনারই

অনুগমন করিয়াছেন। আমরা বলিতে পারি এই পণ পরিচয় করিয়া যুক্তি অবলম্বন করিলেই ভাল হইত; অন্যথা ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন মতে লেখকেরও ভ্রম জন্মাইতে পারে। যথা;—লেখক এক স্থানে বলিয়াছেন “প্রজাপতিদিগের দুহিতৃ-সন্তান দৌহিতৃগুলিই ব্রাহ্মণপদব্যাচ্য হইলেন, পৌত্রগুলি ক্ষত্রিয় বা রাজন্য আখ্যা ধারণ করিলেন।” (৭৯ পৃ-ন)। আবার অন্যত্র ক্ষত্রিয়জাতি শীর্ণক প্রবন্ধে বলেন “ইহার ব্রাহ্মণ বাহু হইতে জন্ম-পরিগ্রহ করেন বলিয়া ব্রাহ্মণের নিম্নে ও অন্য বর্ণের উপরিভাগে আসন লাভ হন।” (৮৭ পৃ-ম)। পরস্পর বিরোধি এই উভয় বাক্য কখনই অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার করিতে পারা যায় না।

সম্বন্ধনির্ণয়ে গোত্রপ্রবর্ত্তগুলি অতি বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। গোত্র কি? তাহার সংখ্যা কত? প্রবর কাহ'কে বলে? প্রবরের আবশ্যকতা কি? কোন্ গোত্রে কত প্রবর? ইত্যাদি অবশ্যজ্ঞাত বিষয়গুলি পাঠকালে আমরা গ্রন্থকারকে ধন্যবাদ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় গ্রন্থের এই অংশ এমনি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন যে, অস্পষ্ট বালক বালিকারাও পাঠমাত্র সমস্ত বিবরণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। কর্তব্য হইলেও আমরা এই অংশের কিছু উদ্ধৃত করিলাম না। পাঠকগণ একবার গ্রন্থখানা ক্রয় করিয়া পাঠ কন।

এখন রাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের কথা কিছু বলিব । সম্বন্ধনির্ণয় রচয়িতা অনুসন্ধানে যতদূর পারিমাছেন, তাহাই এই গ্রন্থে সংকলন করিয়াছেন । এই নিমিত্ত আমরা তাঁহার অনুসন্ধিৎসা প্ররত্তির প্রশংসা করিব, কিন্তু সংকলিত বিষয়গুলি একেবারে নির্দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না । তবে সংসারের কেহই অভ্যস্ত নছেন, এই সূত্রানুসারে বিচার করিলে ইহা যুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, গ্রন্থকারের কিছু কিছু ভ্রম থাকিলেও তাঁহার গ্রন্থ হিন্দুসমাজে আদরণীয় । আমরা রাষ্ট্র প্রেণীর কথা অতি সংক্ষেপে ভিন্ন একটি প্রবন্ধে লিখিয়া যে যে স্থলে আমাদের মতের সঙ্গে গ্রন্থকারের মতের অনৈক্য ঘটে, তাহাই দেখাইয়া দিব ।

এরূপ প্রবাদ যে বিক্রমপুরাস্তম্ভগুপ্ত রামপাল নামক স্থানে মহারাজ আদিশূরের রাজধানী ছিল । যথাকালে তাঁহার পুত্র সম্ভান না হওয়ার তিনি পুত্রেক্ষি যজ্ঞ করিতে সংকল্প করেন । ঐ সময়ে বঙ্গ ৭০০ বর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল । বর্তমান সময়ে উহাদের সম্ভানগণই সাতশতী নামে পরিচিত । উহাদের অষ্টগোত্র এবং সপ্তবিংশতি গাঁই প্রসিদ্ধ । যথা—

গোত্র ।

শনকঃ শুনকঃ কাসো গোতমশ্চ পরাশরো ।  
বশিষ্ঠোহরিসৌরশ্চাফৌ গোত্রাঃপ্রকী-  
র্তিতাঃ ।”

গাঁই ।

১	২	৩	৪	৫
সাগাঁই	মুরাই	নালসী	ভগাই	হাসাই
৬	৭	৮	৯	১০
কালাই	ধাই,	বান্ধী	বাণ্ডুরী	ধান্দী
১১	১২	১৩	১৪	
কাটানী	কুশলোজ্জ্বলোগাঁই,	কাশ্যপকাজ্জারী		
১৫	১৬	১৭	১৮	
বাতারি	পীতারি	নাতারি	যার,	বেক
১৯	২০	২১	২২	২৩
বাগরাই	উলুক	অম্বম্ব,	মুলুক	কম্বকম্ব
২৪	২৫	২৬	২৭	
কম্বু	কড়ন	চেরচেরি	বাল্ধোপি	গাঁই ।

( কুলচাৰ্যের কারিকা )

কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন “সাতশতী ব্রাহ্মণগণও চল্লিশটি পৃথক্ (প্রাচীন) গাঁই বলিয়া বিতক্ত ছিলেন । এতোকের গোত্র পৃথক্ অর্থাৎ সাতশতীগণের এতোক গাঁই পৃথক্ পৃথক্ গোত্রসমুহ ।”

“লোকের কৌতূহল নিবারণ জন্য কুলজ্ঞের কুলশাস্ত্র হইতে সাতশতীদিগের গাঁইগুলি লিখিত হইল । পাঠকগণ মিলাইয়া দেখুন ।”

১	২	৩	৪
নগড়ি	দহড়ি	হামু	বাপি কাশ্যপকাজ্জিকা
৫	৬	৭	৮
বাণাড়ি	ভুসিকা	কেহু	গাঁইচ
			মুখদাসিকঃ
			ইত্যাদি । “মিঞাগ্রন্থ ।”

বিদ্যানিধি মহাশয়ের উক্ত এই মৌকাবলী মিঞাগ্রন্থে অপ্রাপ্য, অন্য কোন

এম্বে আছে কি না তাহাও জ্ঞানি না। সু-  
তরাং আমরা মিলাইয়া দেখিতে পারিলাম  
না। “অপিচ সাতশতীগণের প্রত্যেক গাঁই  
পৃথক পৃথক গোত্র সম্বৃত্ত” এই কথাও  
কোন সম্ভোষ জনক প্রমাণ পাইলাম না।  
যাহা হউক উক্ত সপ্তশতী ব্রাহ্মণ্যগণের  
মধ্যে তৎকালে কেহই এমন বেদজ্ঞ ও প-  
রিশুদ্ধ ছিলেন না, যে তাঁহারা মহারাজ অ-  
দিশ্বরেব সংকল্পিত পুত্রান্টি বজ্র নিক্ষেপ  
করিতে পারেন। অগত্যা মহারাজ উপযুক্ত  
ব্রাহ্মণের জন্ত কান্যকুব্জাধিপের নিকট  
পত্র লিখিলেন। তদনুসারে কান্যকুব্জ-  
স্থ পঞ্চ গোত্রের পঞ্চজন ব্রাহ্মণ এদেশে  
পাঠায়াদেন। (১১৯ সংবৎ)

“ভট্টনারায়ণোদকো বেদগর্ভোহ ছান্দঃ।  
তপ জীহ্বমাচ কান্যকুব্জাং সমাগতাঃ॥”

ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দঃ, জীহ্বা, এই  
পঞ্চ ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জহইতে আগমন করেন।

“শাণ্ডিল্যগৌরব্রহ্মশ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।  
দক্ষোপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠো বাৎস্যশ্রেষ্ঠোপি  
ছান্দঃ॥

ভরদ্বাজকগোত্রজীহ্বা হর্ষবর্জুনঃ।

বেদগর্ভোপি সাবর্ণে যথাবেদ ইতি স্মৃতঃ॥”

উহাদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ শাণ্ডিল্য  
গোত্র, দক্ষ কাশ্যপ গোত্র, ছান্দঃ বাৎস্য  
গোত্র, জীহ্বা ভরদ্বাজ, গোত্র এবং বেদগর্ভ  
সাবর্ণ গোত্র।

“কম্বকোটি ত্র্যম্বকোটি হরিকোটি তুর্ধৈবচ।

কক্ৰামো বটগ্রামস্তেবাং স্থানানি

পঞ্চ ॥” (কুলরমা)

বজ্রাধিপ আদিশ্বর বজ্র সমাপনান্তে  
উহাদের পাঁচজনের বাসের নিমিত্ত কাম-  
কোটি, ত্র্যম্বকোটি, হরিকোটি, কক্ৰগ্রাম,  
বটগ্রাম, এই পাঁচ খানা গ্রাম দান ক-  
রেন। এই সকল গ্রামের আধুনিক নাম  
পরিজ্ঞেয় নহে, এই বিষয়ে সম্বন্ধ-নির্ণয়ে  
নিম্ন লিখিত বচনটি উদ্ধৃত আছে।

“পঞ্চকোটিঃ কামকোটি হরিকোটি

তুর্ধৈবচ।

কক্ৰগ্রামো বটগ্রাম স্তেবাং স্থানানি

পঞ্চ ॥” (১৮ পৃ)

আমরা কুলরমা এম্বে পঞ্চকোটির  
পরিবর্তে ত্র্যম্বকোটি দেখিলাম।

কালক্রমে উক্ত বিজপঞ্চকের উনবন্টি

সন্তান জন্মে।—

“ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি

ষোড়শঃ।

চত্বারঃ জীহ্বাজাতা ভরদ্বাজকু-

লোদ্ভবঃ।

ষাদশ বেদগর্ভাচ্চ ছান্দঃকৈকাদশ

স্মৃতাঃ।” (কুলরমা)

ভট্টনারায়ণের ষোড়শ, দক্ষের ষোড়শ,  
জীহ্বার চারি, বেদগর্ভের ষাদশ এবং ছা-  
ন্দঃের একাদশ।

বিদ্যানিধি মহাশয় কান্যকুব্জগত প-  
ঞ্চবিধের ষট্ পঞ্চাশং সন্তান স্বীকার ক-  
রিয়। প্রমাণার্থ নিম্নলিখিত শ্লোক লিখিয়া-  
ছেন।

“ভট্টতঃ ষোড়শোদ্ভূতা দক্ষতশ্চাপি

ষোড়শঃ।

চত্বারঃ শ্রীহর্ষজাতা ষাটশ বেদগভঃ ।  
সত্কাবধ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতা শ্রীহর্ষজাতাঃ ॥  
( মিশ্রিতঃ ক্রবানন্দকৃতঃ । )

আমরা যতদূর জানিয়াছি তাহাতে ব-  
লিতে পারি ক্রবানন্দ মিশ্রে এই শ্লোক  
অনুশা ।

ভট্টনারায়ণ বংশ ।

“আনৌ বন্দো বরাহঃ স্যাৎ রামো গড়্গ-  
ডিকোমতঃ ।

হুপঃ স্যাৎ কেশরশ্চৈব নানোঃ কুসুম কু-  
লিকো-  
বাটুঃ স্যাৎ পারীহালোসৌ কুলডিঃ গু-  
নামকো ।

গণো ঘোবলিতাং প্রাপ্তঃ সেয়ুঃ শাণ্ডেশ্বরি-  
স্তথা ॥

বুড়ো মাশচরকশ্চৈব বটব্যালো বিকর্তনঃ ।  
বসুয়ারি স্তথানীলোঃ কয়ডালো মধুসূদনঃ ॥  
কুশীচ কোয়নামা চ কুলিসাটৈব বাসুকঃ ।  
আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামী চৈষমহামতিঃ ॥  
এতে বোড়শশাণ্ডিয়াঃ কথতা রাজপু-  
জিতাঃ ॥”

নাম	গাঁই
১ বরাহ	বন্দা
২ রাম	গড়্গডি
৩ হুপ	কেশরকুলী
৪ নানো	কুসুমকুলি
৫ বাটু	পারীহাল
৬ গুনি	কুলডি
৭ গণ	ঘোবাল
৮ শাণ্ডেশ্বর	সেয়ু

৯ বুড়ো	মাশচরক
১০ বিকর্তন	বটব্যাল
১১ নীলো	বসুয়ারি
১২ মধুসূদন	কয়ডাল
১৩ কোয়	কুশারি
১৪ বাসু	কুলিসা(কুলকুলী)
১৫ আকাশ	আকাশ
১৬ মাধব	দীর্ঘগ্রামী(দীর্ঘাল)
দক্ষ বংশ ।	

“দীর্ঘোত্তবৎ গুড়িগ্রামী নীরঃ সাদামক-  
লিকঃ ।

ভূটিগ্রামী শ্রুতশ্চৈব শজুঃ স্যাৎ তৈলবা-  
টিকঃ ॥

কৌতুকঃ পীতমুখীস্যাৎ চট্টগ্রামী শ্রলো-  
চনঃ ।

পালশায়ী পালুনাং হড়ঃ কাকোমতস্তথা ।  
পোড়ারিঃ ককসংজ্ঞোসৌ পালমী রামনা-  
মকঃ ।

কোয়ারিঃ স্যাজ্জননামা পর্কটি বর্ণমালিকঃ  
সিমলায়ী শ্রীহারিঃ স্যাৎ জটোপুলিকস্তথা ।

ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামী চ কেশবঃ ॥

এতে বোড়শ ভূদেবা জেরাঃ কাশ্যাপ-সং-  
জ্ঞকঃ ॥”

নাম	গাঁই
১ দীর	গুড়িগ্রামী
২ নীর	আবলী
৩ শ্রুত	ভূটিগ্রামী
৪ শজু	তৈলবাটী
৫ কৌতুক	পীতমুখী
৬ শ্রলোচন	চট্টগ্রামী

৭ পালু	পলশারী
৮ কাক	হড়
৯ কক্ষ	পোড়ারি
১০ রাম	পালবি
১১ জন	কোয়ারি
১২ বনমালী	পাকড়াসী
১৩ জীহরি	সিমলারী
১৪ জট	পুলি (পুলিলাল)
১৫ শশিধর	ডট্টগ্রামী
১৬ কেশব	মুলগ্রামী

জীহরি বংশ।

“ধাতু মামা দুইখটিঃ স্যাং জমঃ স্যাং দীন-

শায়িকঃ।

মানোঃ সাহরিকো জেরো রায়ীচ রামনা-

মিকঃ।

জীহরীয়া স্রুতা এতে ভররাজকুলোদ্ভবঃ।”

নাম গাঁই

১ ধাতু (জীগর্ভ)	দুইখটি
২ জম	দীনশায়ী (ডিংসাই)
৩ নালো	সাহরী
৪ রাম	রায়ী (রাইগাঁই)

বেদগর্ভ বংশ।

“হলনামাচ গাজুলী কুলো রাজ্যদ্রস্তা।

বশিষ্ঠঃ সিন্ধুলো জেরো দায়ীচ মদনোভবঃ।

বিশ্বরূপস্তথা নন্দী কুমারো বালী গ্রামকঃ।

যোগী সিন্নারিকো জেরঃ পুংসিকো রাম-

মায়িকঃ।

দক্ষঃ শাটকঃ সংজোসো পারীচ মধুহৃদনঃ।

ঘটেখরী মাদবঃ নারায়ীচ গুণাকরঃ।

এতে পুত্রা মহাপ্রাজাঃ সার্বগান্ধানশ্রুতাঃ।”

নাম	গাঁই।
১ হল	গাজুলী
২ রাজ্যধর	কুল
৩ বশিষ্ঠ	সিন্ধুল
৪ মদন	দায়ী
৫ বিশ্বরূপ	নন্দী
৬ কুমার	বালী
৭ যোগী	সিন্নারিক
৮ রাম	পুংসিক
৯ দক্ষ	শাট
১০ মধুহৃদন	পারীচাল
১১ মাদব	ঘটেখরী
১২ গুণাকর	নারায়ী

ছান্দ্র বংশ।

“রবির্মহিস্তাঃ সুরভিষ্ঠ যোষঃ।

কবিশ্রুতিবাং খলু শিবলালঃ।

মহাযশো বাপুলিঃ পিপ্পলিত।

ধীরশচ পুতি নমু শঙ্করাখাঃ।

বিশ্বজরোভূং খলু পূর্বগ্রামী।

বাংস্যাশচ তাদর্থ-নিবাস-দেশাঃ।

জীজীধরোভূং খলু কাজিহিলি।

নারায়ণো নামচ কাজিহাদী।

চৌৎখণ্ডিকো নাম গুণাকরঃ স্যাং।

মনো দীঘালো ভুবি কত্রতুলাঃ।

বাংসাস্য এতে কথিতাশচ পুত্রাঃ।”

(কুলরমা)

নাম	গাঁই
১ রবি	মহিস্তা
২ সুরভি	যোষ
৩ কবি	শিবলাল (শিমলাই)

মহাশয়	
ধীর	পিপ্পলী(পিপলাই)
শঙ্কর	পুতিতুণ্ড
বিশ্বস্তর	পূর্বগ্রামী
শ্রীধর	কাঞ্জিবিম্বী(কাঞ্জিলাল)
নারায়ণ	কা
১০ গুণাকর	চৌৎখণ্ডি
১১ মন	দীঘাল।

এতদ্বারা স্পষ্ট দেখা যায় যে, পঞ্চ-  
গোত্রে উনবন্দি গাঁই নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু  
বহুদিন পরে লুপ্তপঞ্চানন নামক জর্নৈক  
ঘটক বাংলা গোত্র হইতে পূর্বগ্রামী, দী-  
ঘাল আর চৌৎখণ্ডি পরিভ্যাগ করিয়া  
ছান্দড়ের অষ্ট পুত্র এবং তাঁহাদের আটটি  
গাঁই কল্পনা করেন। তদবধিই সাধারণ  
লোকে বলিয়া থাকে যে “পঞ্চগোত্র  
ছান্দড় গাঁই, তা ছাড়া বামুন নাই।”  
কিন্তু বিজয়গুণীতে এই কথা গ্রাহ্য নহে।  
আমাদের বিদ্যানিধি মহাশয় এই অকা-  
রনসম্মত যতের পরিপোষণ করিয়া কুল-  
দীপিকা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উ-  
দ্ধৃত করিয়াছেন।—

“কাঞ্জিবিম্বী মহিস্তাচ পুতিতুণ্ড পিপ্পলী  
ঘোষাল বাপুলিষ্ঠব কাঞ্জারীচ তথৈবচ।  
সিমলালশচ বিজ্ঞেয়ো ইমে বাংলাক সং-  
জ্ঞকাঃ ॥” (স—২৫ পৃ)

আমরা বুঝিতে পারিলাম না লুপ্ত-  
পঞ্চাননের মত রক্ষা অর্থাৎ ছান্দড় গাঁই  
ঠিক রাখিবার জন্য এই শ্লোকের একটি  
চরণ পরিভ্যাগ করিবার প্রয়োজন কি ?

তবে ইহাই দেখা যায় যে, এই স্থলে অষ্টা-  
ধিক গাঁই স্বীকার করিলে “অষ্টাবধ প-  
রিজ্ঞেয়া উক্ততা শ্চান্দড়ানুনে;” এই বাক্য  
রক্ষা পায় না, যাহা হউক আমাদের বি-  
বেচনায় একটা অমূলক কথাই সত্যতা  
দেখাইতে এত গুণগোল করা ভালবোধ  
হইল না। আমরা কুলদীপিকা পাঠ ক-  
রিয়া উপরোক্ত শ্লোকটি এইরূপ দেখিলাম।  
“কাঞ্জিবিম্বী মহিস্তাচ পুতিতুণ্ড

পিপ্পলী।

ঘোষালো বাপুলিষ্ঠব কাঞ্জারীচ তথৈবচ।  
পূর্বগ্রামী দীঘালচ চৌৎখণ্ডী শিবলালকঃ  
বাংসাগোত্রজাতা ইমে বিখ্যাতাঃ পুন্ডি-  
বীন্দে ॥”

আদিশ্রের দৌহিত্র বংশীয় সপ্তম  
সন্তান বল্লালসেন, উক্ত মহাত্মা গণের  
বংশধর দিগের গুণ বিচার করিয়া, আচার  
বিনয়াদি নবগুণাঙ্কিত দিগকে কুলীন এবং  
অটগুণবিশিষ্টদিগকে শ্রোত্রিয় আখ্যা  
প্রদান করেন। ১০৬৬ হইতে ১১০১ খৃঃ  
পর্যন্ত ৩৬ বৎসর বল্লালের রাজত্বকাল নি-  
র্গীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন সময়ে যে  
তিনি কুলীন শ্রোত্রিয় বিভাগ করিয়াছিলেন  
তাঁহা নিশ্চয় করা মুকঠিন। তবে অনুমান  
উপর নির্ভর করিয়া অনেকেই অনেক কথ  
বলেন বটে, কিন্তু আমরা এরূপ অনুমা-  
নিক কথা লিখিতে ইচ্ছা করি না।

বল্লালসেন, উক্ত উনবন্দি ব্যক্তির স  
ন্তানগণের মধ্যে ৩৭ বর পুন্ডি শ্রোত্রিয়  
আর ২২ বর কুলীন করেন।

স্বসিক্রম প্রোক্তিয়।

১ ২ ৩ ৪ ৫

“পূর্ব পালধি সিক্রলো কুশারি বাপুলি-

৬ ৭ ৮ ৯ ১০

কাঞ্জারিকাঃ। মাষ সাহিরাণ নন্দি কুসুমা:

১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫

ভুরি বটবালকো ॥ অম্বুলী কুলিমা সিরারী

১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০

কড়লা সিমলীরনী পর্কটিঃ। পোড়া তৈলক:

২১ ২২ ২৩ ২৪

পোশলাশচ পলশো নাইয়ারিদির্ষাজিকো ॥

২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯

মুলগ্রামিকঃ পারী বালী শিমলা শাণ্ডেখরি-

৩০ ৩১ ৩২ ৩৩

ভট্টকঃ ॥ সেয়ুঃ পুংসিকিয়ুব্রহ্মদপেরো

৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭

নাইয়ারিকো ঘোষলী। আকাশশচ কোয়ারি-

কোপি গণনাৎ ত্রিংশজ্জনঃ সপ্তচ ॥”

কুলীন।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

বন্দ্য চট্ট মুঠেটি মোষ পুতিকা গাজোথ

৭ ৮ ৯ ১০ ১১

কাঞ্জিভারঃ। কন্দো রায়ী গুড়ো মহিস্তা

১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬

কুলডি শোৎৎখণ্ডকঃ পিঙ্গলী ॥ ঘণ্ট পারী

১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২

হড়ো গড়োপি পীতমো দী কেশ দীর্ঘা-

জিকাঃ। জীবলাল হুপেণ হি পুরা ঘাং-

গাতঘাপিতাঃ।

কাঞ্জিভার=কাঞ্জিলাল; ঘট=ঘটে-

খরি; পীতম=পীতমণ্ডো; দী=ডিংসাঃ;

কেশ=কেশবকুলি; রায়ী=রাই গাঁই।

উক্ত ঘাংবিশং কুলীনের মধ্যে ৮ ঘর মুখা-

কুলীন আর ১৪ ঘর গোঁগ কুলীন।

“—————বন্দ্য মুং ঘোষ চট্টকাঃ।

পুতিচ গাজলী কাঞ্জী কুন্দেন সহ চাট্টমাঃ॥”

বন্দ্য, মুঠেটি, ঘোষাল, চট্ট, পুতিতুগ,

গাজলী, কাঞ্জিলাল, কন্দ, এই আট ঘর

মুখা; অবশিষ্ট ১৪ ঘর গোঁগ।

পরে বন্দ্যালের অপরন্ত পঞ্চম পুরুষ

লক্ষ্মণ সেন, আবার তদ্বংশীরদের মোষ-

গুণ নির্ধারচন সময়ে, আটঘর মুখাকুলীনের

মধ্যে ১৯ জনকে কোলিন্য মর্যাদা প্রদান

করেন।

“বহুরূপঃ স্বচো নান্না অরবিন্দো হলান্মুদঃ।

বাঙ্গালশচসমাখাতঃ পঞ্চৈতেচট্টবংশকাঃ॥

পুতিগোবর্দ্ধনাচার্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।

গাজুলীরঃ শিশোনান্না কন্দো রে'ষাক-

রেপিচ ॥

জাঙ্কলনাং স্তথা বন্দ্যো মহেশ্বর উদারদীঃ।

দেবলো বামনশচব জৈশানো মকরন্দকঃ ॥

উৎসাহ গকড়াখাতো মুখবংশসমুদ্ভবো।

কানু কতৃহলাবেতো কাঞ্জিকুল প্রতিষ্ঠিতো

উনবিংশতি সংখ্যাতা মহারাঞ্জন পুত্রিতঃ॥”

(ক্রানন্দ মিশ্রোক্ত।)

স—১৬৩ পৃ।

চট্টবংশজ—বহুরূপ, স্বচ, অরবিন্দ

হলান্মুদ, বাঙ্গাল।

পুতিতুগ—গোবর্দ্ধনাচার্য। ঘোষাল

—শির। গাজলী—শিশো।



কুম্ভ-রোষাকর।

বন্দা—স্বাক্ষর, মহেশ্বর, দেবল, বা-  
মন, ঈশান, মকরন্দ।

মুঠেটি—উৎসাহ, গরুড়। কাজি-  
লাল—কামু, কুতূহল।

এই সময়েই তিনি গোঁণ কুলীনদিগকে  
শোত্রিয় সংজ্ঞাদিয়া সিদ্ধ, সাধা, অরি এই  
তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া ছিেন।

১ ২ ৩  
“পিপ্পলী দিঘারী চৈব দীনশায়ি শুঠেবচ  
এতে সিদ্ধাঃ।”

১ ২ ৩ ৪  
“মহিস্তা হড় গুড় পারীহাল। এতে  
সাধাঃ।”

১ ২ ৩  
“কেশরঃ পীতমুণ্ডীচ রায়ী গায়িশ্চ  
৪  
গড়্গড়িঃ।

৫ ৬ ৭  
যটেধ্বরি শোত্র্যশিশু কুলডিরয়ন্তীমে  
বৎকন্যা লাভ যাত্রেণ সমুলস্ত বিন-  
শাতি।” (কুল্লরমা)

সদ্বন্ধ নির্ণয় রচয়িতা প্রমাণ করেন  
“লক্ষ্মণ সেন রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কিছু পূ-  
র্বেই কুলীনদিগের মধ্যাদার সমীকরণ হয়।  
অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্বে  
এইরূপ বিভাগকরা হইয়াছিল।” পাঠক-  
গণ উক্ত গ্রন্থের (১৬৪ পৃ) পাঠ করিয়া  
দেখিবেন।

এখন আমরা বংশজের কথা বলিব।

বর্তমান সময়ে কোন কুলীন, বংশজের  
কন্যা বিবাহ করিলেই ভজ হয় এবং  
৭।৮ পুরুষান্তে এই ভজ কুলীনের  
বংশধর গণই বংশজ্ঞত প্রাপ্ত হইয়া থাকে।  
কিন্তু আদিতে বংশজ না থাকিলে  
বংশজ কন্যাই সম্ভবে না। তবে আদি  
বংশজ কিরূপে হইল এখন তাহাই নি-  
র্ণয় করিতে হইবে। আমরা দিগকে নিতান্ত  
ক্ষোভের সহিত বলিতে হইল যে, প্রা-  
চ্যুর এই অংশে বিদ্যানিধি মহাশয় যে  
সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার একটিও  
আমাদের মনেপুত হইল না; সুতরাং আ-  
মরা ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়া “কুলগণব”  
গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক পাঠকগণের নি-  
টক উপস্থিত করিব।—

“ধেনুঃ স্বর্ণময়ীঃ রুড়া দর্দোবিপ্রায় ধার্মিকঃ।  
সং স্বর্ণময়ী ধেনুশ্ছেদনে প্রজগৌ মুক্তঃ ॥  
জিন্না বহিষ্ঠা রাজা স্বর্ণানাং বনিকোভবৎ।  
বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহাজাতাঃ সর্বধর্মবহিষ্ঠাঃ ॥”

মহারাজ বল্লাল স্বর্ণ ধেনু নির্মাণ ক-  
রিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন এবং উভা  
ছেদন করিতে অনুমতি দেন। তদনুসারে  
যাহারা ছেদন করিয়াছিল, তাহারা স্বর্ণ  
বণিক আর দানগ্রাহী ব্রাহ্মণগণ সর্ব-ধর্ম  
বহিষ্ঠত প্রতিগ্রহ সংজ্ঞাক্রান্ত হইলেন।

প্রতিগ্রহ নির্ণয়।

“শব্দরঃ পীতমুণ্ডীচ গড়োপিচ দিবাকরঃ।  
গুড়ো ডাউকনামাচ দোকড়িষ্টেবপিপ্পলী ॥  
বন্দ্যো যান্ত্রণামাচ ভোপোমিষ্ঠ-দুতত্রতঃ।

আমারিষ্ঠগায়িশ্চ ছাড়া গোপীচবন্দ্যাজাঃ ॥

মাদো দোকড়িনামাচ রায়ীচ মধুহৃদনঃ ॥  
কুশিকো যবনামাচ হড়ো নারায়ণোপিচ।  
মহিস্তা স্থিবিধনামা দায়ারিষ্টেব কেশবঃ ॥  
চট্টঃ শকুনি নামাচ তৈলবাটী নয়্যারিকঃ।  
কুন্দো বিশ্বেশ্বরো জ্যেয়ো বন্দ্যাজা বিঠু-

সংজ্ঞকঃ ॥

যোষজ্যো জ্যোতরাবেতৌ মদনবিশ্বরূপকৌ।  
গাংজ্যোক্তবোহাস্যানামা পুতিগৌতমসং-

জ্ঞকঃ ॥

শিম্বলী পরাশরো খাতঃ শঙ্করো ডিন্তি

সংজ্ঞকঃ।

অমীকুলোদ্ধবশৈব গোদানঃ কগুত্বিকঃ ॥  
তেবাং সম্বন্ধমাত্রেণ পক্ষে গৌরীব সীদতি।  
সম্বন্ধে ভোক্তনৈচব দানে যজ্ঞে তথৈবচ ॥  
বিবৃতিঃ শ্রাদ্ধকালেচ বর্জ্যা এত পুনঃপুনঃ।”

নাম	গাঁই
১ শঙ্কর	পীতমুণ্ডী
২ দিবাকর	গড়গড়ি
৩ ডাউক	গুড়
৪ দোকড়ি	পিপ্পলী
৫ মার্ত্তণ্ড	বন্দ্য
৬ আনাগি	
৭ গণাগি	
৮ জাড়	
৯ গোপী	
১০ বিঠু	
১১ দোকড়ি	মাশ্চরক
১২ মধুহৃদন	রায়ী
১৩ যব	কুশারি
১৪ নারায়ণ	হড়
১৫ দায়ারি	মহিস্তা
১৬ কেশব	

১৭ শকুনি	চট্ট	
১৮ নয়্যারী	তৈলবাটী	
১৯ বিশ্বেশ্বর	কুন্দ	
২০ মদন	}	যোষাল
২১ বিশ্বরূপ		
২২ হ্যাসা	গাংজলী	
২৩ গৌতম	পুতিভুণ্ডি	
২৪ পরাশর	শিমলাই	
২৫ শঙ্কর	ডিংসাই	

সংকুলজাত এই সকল দ্বিজগণ গো-  
দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের স-  
ম্বন্ধ মাত্রই কলঙ্কিত। সম্বন্ধে, ভোক্তনে,  
দানে, যজ্ঞে, এমন কি শ্রাদ্ধকালেও উ-  
হারা বর্জনীয়।

“গণোকন্যা বশিষ্ঠেন চৈঠেন শকুনি-মুতা।  
হাড়ো কজাদারিকেন কুবেরোহাস্যাজাপতিঃ ॥  
চক্রপাণিনাপি কন্যা গৃহীতা মনলোভতঃ।  
বিঠুমুতা পতিভূম্য চট্টকঃ কুলভূষণঃ ॥  
প্রতিগ্রহ মুতোষাহাত্ যড়তে বংশজাঃ  
মুতাঃ ॥”

বশিষ্ঠ গণাগির কন্যা, চৈঠ শকুনির  
কন্যা, দায়িক হাড়োর কন্যা, কুবের ও  
চক্রপাণি হাস্যোর কন্যা, এবং কুলভূষণ  
বিঠুর কন্যা। বিবাহ করিয়া প্রথম বংশজস্ব  
প্রাপ্ত হন; যে হেতুক গণাগি প্রভৃতি  
প্রতিগ্রহ হইয়াছিলেন। অতএব—

“প্রতিগ্রহ-মুতোষাহী বংশজঃ।”

কুলরমার এই বাক্যও যুক্তি-মূলক হইল।

এখন দেখাযাউক ঘটক কি? ঘট-  
কের মূল নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া বিদ্যানিধি

মহাশয় বলিয়াছেন “ ইহাও সম্পূর্ণ সম্ভব বোধহয়, এই আদি বংশজেরা বল্লালের নিকট দটক উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।” ( ২২৮পৃ—স ) । আরও বলেন “ যাহা-দিগের কোনরূপ কলঙ্ক হইয়াছিল, তাঁহারা বংশভ্রষ্ট পাইলেন । কালক্রমে ইহাদিগের মধ্যে যাহাদের বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ লক্ষণ স্মৃতি পাইতে লাগিল তাঁহারা ঘটক বা কুলার্চা হইলেন । ”

আমরা যতদূর জানি ত'হাতে বলিতে পারি, সকল ঘটকই বংশজ নহেন ; ঘটকের মধ্যেও অনেক কুলীন শ্রোত্রিয় আছে । কাঁচাদিয়ার ঘটক রামগঙ্গা বিশারদের সম্ভান, পারীহাল মেলের কুলীন । উভাদের মধ্যে অনেকেই এপর্যন্ত ভঙ্গ হয় নাই । উভাদের আদি পুরুষ হলগাজলী । আবার কোলা, বাইশারি ও সূন্দরদির ঘটকগণ মাশচরক শ্রোত্রিয়, উঁহারাও এপর্যন্ত শ্রোত্রিয় সমাজে উচ্চ আসনে আসীন আছেন । এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কুলীন, শ্রোত্রিয়, বংশজ এই তিনই ঘটক হইতে পারে । বাস্তবিক মহারাজ বল্লাল, উক্ত তিন শ্রেণী হইতেই করেক জনকে মনোনীত করিয়া ঘটকাখ্যা-প্রদান করেন । ঘটকদিগের প্রতি শ্রোত্রিয় কুলীনের দোষগুণ বিচারের ভার অর্পিত হয় । যথা—

“ বংশাংশভাবগুণদোষবিচারকর্তা,

সুনাতিরক্তপরিমাণযথার্থবক্তা,

পর্যা-বিপর্যা-গণনঞ্চ করোতি যশ্চ,

শাশ্বরূপেণ গদিতো ঘটকঃ স এব । ”

অংশ সমুদয়ে পঞ্চদশ । “ আর্তিত্রিধা ত্রিধাঃ ক্ষেমা মধ্যাংশো নবধাঃ স্মৃতাঃ ”—  
ত্রিধা আর্তি যথা—আর্তি, সমার্তি, পূর্ণার্তি  
ত্রিধা ক্ষেমা, যথা—ক্ষেমা, সংক্ষেমা, পূর্ণক্ষেমা ।

নবধা মধ্যাংশ যথা—কিঞ্চিক্ষেমা, কিঞ্চির্ভক্তি, লভা, অভিলভা, কিঞ্চিলভা, কিঞ্চিহান, গ্রাহ, হান, তুলা ।

এই সকল বিষয়ে বিশেষ পরিজ্ঞাত ব্যক্তিগণই ঘটক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । আমরা এতৎ সম্বন্ধে আর অধিক লিখিয়া প্রস্তাব দীর্ঘ করিতে বাসনা করি না । বাহার অংশ, বংশ, পর্যা এবং বিপর্যা জানিতে ইচ্ছা হয়, তিনি “ ব্রহ্মানন্দ-মিশ্র ” পাঠ করিবেন ।

ঘটকের মধ্যে দেবীর অতি প্রসিদ্ধ । দেবীরই মেলবন্ধন করিয়া রাটের কুলীন কন্যাদিগকে চিরদিনের নিমিত্ত জ্বলন্ত অনলে আছতি প্রদান করেন ; দেবীরই কুলীন সমাজ রসাতলে নিক্ষেপ করেন ; দেবীরই ভীষণ পাপপ্রবাহে সমস্ত বজ্র ভাসাইয়াছেন ; দেবীরই মূর্খ কুলীন সম্ভাদায়ের জজ্ঞ ঘোরতর নরক প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন এবং দেবীরই কুলীনদের ইহ পরকাল খাইয়াছেন । এমন গুণের সাগর দেবীরের পরিচয় শুনিতে কেনা উৎসুক হইবেন ? কেনা অনন্য মনে তাহার কথায় কাণ পাতিবেন ? যদিচ মাননীয় বিদ্যানিধি মহাশয় দেবীরের বিবরণ

বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন, তথাপি পাঠকের  
ঐশ্বর্য্য নিবারণার্থ আমরা এইস্থলে উহার  
বংশাবলী উল্লেখ করিলাম।

দেবীবরের পূর্বপুরুষদের  
পুরুষানুক্রমিক নাম।

ভট্টনারায়ণ, বরাহ, বৈনতেয়, শুবুজি,  
দিবুপেণ, গাউ, গজাধর, পাহল, শকুনি,  
মহেশ্বর, মহাদেব, দুর্বলী, সঙ্কত, অনন্ত,  
লক্ষ্মীনাথ, সর্বানন্দ, দেবীবর।

দেবীবর বন্দ্যবংশজ ; পিতা সর্বানন্দ  
হইতে ঘটকাখা প্রাপ্ত হন। ইহার উক্তন  
নবম পুরুষ শকুনির ভ্রাতা দিঠ প্রত্যাগ  
ছিলেন। বোধ হয় তাঁহার সঙ্গে শকুনির  
কোনরূপ সংশয় থাকতেই তৎসংশয় দে-  
বীবর কুলগৌরবহীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। দে-  
বীবর কুলীন দিগের দেশ নির্বাচন করিয়া  
উহাদিগকে ৩৬ মেলে বিভাগ করেন।

১ গজানন্দ ভট্টাচার্য্য কুলিয়া মেল ;  
২ যোগেশ্বর পণ্ডিতে খড়্‌দহ মেল ;  
৩ বন্দ্য বসুভাচার্য্য বলভী ; ৪ বন্দ্য স-  
র্বানন্দে সর্বানন্দী ; ৫ মুখটি দেবকীনন্দনে  
পণ্ডিতরী ; ৬ চট্টমুকুন্দে বাজাল ; ৭ পু-  
তিভুগ শুরাই ঘটকসিংহে সুরাই ; ৮ বন্দ্য  
ত্রিলোচনাচার্য্য শেখরে আচার্য্য, শেখরী ;  
৯ মুখ গোপাল ঘটকে গোপালঘটকী ;  
১০ চট্টরাধবে চট্টরাধবী ; ১১ বিজয়  
পণ্ডিতে বিজয়পণ্ডিতী ; ১২ বন্দ্যমাধবে  
মাধাই ; ১৩ চট্ট অবসতি বিদ্যাধরে বিভা-  
ধরী ; ১৪ অবসতি চট্টরাধবে পারীহাল ;  
১৫ পুতিভুগ জিঅজতটে জিঅজতটী ;

১৬ মুখ জিতামিত্রে প্রমোদিনী ; ১৭ অব-  
সতি চট্টকেশবে বালী ; ১৮ মুখ চন্দ্রপণ্ডিতে  
চন্দ্রপতি ; ১৯ মুখ জীবর্দনে জীবর্দনী ;  
২০ মুখ শতানন্দখানে শতানন্দখানী ;  
২২ খুইনার চট্টছরিতে ছরী ; ২২ মুখ  
চক্রপাণিতে আচরিতা ; ২৩ মুখ দ-  
শরথ ঘটকে দশরথ ঘটকী ; ২৪ আখ-  
গুলবংশ মাধবশুভরাজখানে শুভরা-  
জখানী ; ২৫ মুখ মালাধর খানে  
মালাধর খানী ; ২৬ ঘোষ রাঘবে রা-  
ঘব ঘোষলী ; ২৭ চট্টদেহাটা জীপতিতে  
দেহাটী ; ২৮ গাজ গজাধরে নৈড়া ;  
২৯ চৈতল কাকুছে কাকুছী ; ৩০ ঘোষ  
ধরাধরে ধরাধরী ; ৩১ কাজিলাল শতা-  
নন্দে রায় ; ৩২ বন্দ্য ভৈরব ঘটকে ভৈরব  
ঘটকী ; ৩৩ বন্দ্য পরমানন্দ মিশ্রে পরমা-  
নন্দ মিশি ; ৩৪ মুখ শ্রদ্ধোবংশীয় সর্ব-  
ানন্দে শ্রদ্ধোসর্বানন্দী ; ৩৫ চট্ট হুনিংহ  
বংশীয় হরি মজুমদারে হরি মজুমদারী ;  
এবং ৩৬ চাঁদাই মেল।

এই ৩৬ মেলের মধ্যে যে যে মেল  
হানদোষ দৃষ্ট হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠত্বে গণ্য ;  
তদনুসারে কুলিয়া ও খড়্‌দহ সর্বশ্রেষ্ঠ।  
কোন মেল কত দোষ, কাহারও জানি-  
বার ইচ্ছা হইলে “মেলমালা” দেখুন।

এই মেল বন্ধনে এক মেলীয় কুলীন  
কন্যা, অন্য মেলীয় পাত্র দেওয়া নিষিদ্ধ  
হইল। তদবধিই কুলীন কন্যাগণের বি-  
বাহের ‘বর’ দুর্গট হইয়াছে এবং অপর  
অপাত্রে কন্যাদান ঘটতেছে। বিদ্যানিধি

মহাশয় বহু যুক্তিতে প্রমাণ করেন যে মেল-  
বন্ধন সম্ভবতঃ ৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল।  
এ বিষয়ে তাঁহার যুক্তি ওলি নিতান্ত সার-  
গত ও অনুসন্ধান মূলক। বাস্তবিক সম্বন্ধ  
নির্ণয় যে একখানা প্রশংসার প্রস্তাভিষয়ে  
সন্দেহ নাই। তবে মধ্যে মধ্যে কিরূপ প-  
রিমাণে দোষ থাকিলেও তাহা ধর্তব্য নহে।

## ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য।

( বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তী সময় )

ব্রহ্মগুপ্ত ভারত ভূমি সাগরমৈথল্য স-  
ম্বিত্তা পৃথিবীর অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পু-  
থিবী। ভারতভূমির উর্বর গর্ভে প্রসূত  
না হয়, এমন পদার্থই প্রায় দৃষ্টিগোচর বা  
অতিমূল্যবান হয় নাই। এদেশীয়দি-  
গের কথা দূরে থাকুক, দেশদেশান্তরের  
মানবগণ ইহার প্রসাদে জীবনযাপনোপ-  
যোগী অপরিখ্যাত সামগ্রী প্রাপ্ত হয়। ব-  
শিষ্ঠ মুনির কামদুহা নন্দিনীর স্নান, স্বর্গীয়  
কপ্তকর স্নান ভারতভূমি আবহমানকাল  
উজ্জ্বল, খনিজ, প্রাণিক প্রভৃতি প্রভূত  
দ্রব্য নিচয় উৎপাদন করিয়া জগতীতলে  
সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছে; একথা কেহই অসঙ্গত  
বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিবে না। জ-  
গতের স্বষ্টি হইতে আজি পর্যন্ত প্রকৃতি  
দেবী ভারতের প্রতি সুপ্রসন্ন ও মুক্তহস্ত  
রহিয়াছেন, এবং উত্তরকালেও যে এইরূপ

থাকিবেন, তাহা অনুভূতি দ্বারা আমাদি-  
গের বশেবরূপ স্বদয়ঙ্গম হইতেছে। যদিও  
কালের অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতভূমি প্রা-  
কৃত সৌভাগ্যসুখে বঞ্চিত হইয়াছে, যদিও  
স্বাধীনতা রক্ত হারাইয়া আজি সপ্তশত ব-  
র্ষাধিক পরাদীনতার চিরক্লেশসম্মত উৎ-  
পীড়নে শক্তিহীন হইয়াছে; এবং যদিও  
সুখ-শান্তি স্বাধীনতা অমৃতময়ী, বিশ্বশোভিনী,  
জ্যোৎস্বাময়ী রজনীর সহবাস পরিবর্তে  
চিরদুর্ভিক্ষ অপর্যায়ী অমাবস্যাভাসময়ী  
অতি প্রগাঢ় তমিষ্রতালে আচ্ছন্ন হইয়াছে;  
তথাপি বহুভ্রমসংবিনী। ঈদৃশী অবস্থাতে  
ও যখন “যা চাই, তাই পাই”; তখন সত-  
শত বৎসরের পূর্বে ভারতভূমি যে কত  
বৃদ্ধ, কত জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী দ্রব্য  
এবং কত অমৃতময় ভোজ্য প্রদান করিত,  
তাহা অভিনিবিষ্টচিত্তে একবার চিন্তা

করিলেই চূড়ান্তরূপে সীমান্তিত হইয়া যায়।

প্রতিচা মিসরীয় এবং ফিনিসীয় জাতিই প্রথমে ভারতবর্ষজাত দ্রাব্যনিচয় বিদেশে লইয়া যায় \*; তাহাদিগের জুগী বাবহারের পূর্বে ভারতের ধন ভারত-পাকিত—সুখসৌভাগ্যেরও ইয়ত্তা ছিল না। কিন্তু কালক্রমে ভারতভূমিজাত অপরিমিত উৎকৃষ্টতর সামগ্রীসমূহ পর-রাজ্যে নীত হওয়াতে, বিদেশীয়দিগের নৈ-ত্রে ঘিলিত হইল। সেই সময় হইতে তা-হার ক্রমে ক্রমে ইহার সহিত স্থায়ী বা-ণিজ্য আরম্ভ করিল। মিসরীয় ও ফিনি-সীয়দিগের পরে, পারস, গ্রীক এবং রো-মানেরা পর্যায়ক্রমে ভারতবর্ষে আগমন করে। রোমানেরা এদেশ হইতে নানাবিধ

\* পুরাতত্ত্বোপস্থিত অতি প্রাচীন

মিসরীয় এবং ফিনিসীয় নাবিকদিগের ভূ-মধ্যসাগরেই প্রথম সমুদ্রযাত্রা হইয়াছিল। কিন্তু কেবল মাত্র ভূমধ্যসাগরের তটস্থিত প্রদেশসমূহেই তাহাদিগের বাণিজ্য সীমা-বদ্ধ ছিল না। আরব সাগরের উপকূল-স্থিত বন্দর সকল অধিকার করিয়া প্রথমেই তাহার বাণিজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়া-ছিল। এবং পাশ্চাত্য জাতিদিগের মধ্যে যাহারা ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য স্থাপন করিয়াছিল, উহারা তাহাদিগের সর্ব প্র-থম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

( রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতি-হাস। প্রথম অধ্যায়, ৫৫ পৃষ্ঠা )

বলম্বী রত্ন, উৎকৃষ্ট রেশম, মৃগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি অপর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করিয়া, তাহাদিগের স্বদেশের বহুল উন্নতি সংসা-ধন করিয়াছিল।† এতদ্বারা ইহাই সপ্রমা-ণিত হইতেছে যে, রোম সভ্যতা ভূষণে ভূষিত হইবার বহুকাল পূর্বে ভারতবর্ষ স-ভ্যতার সর্বোচ্চ সোপানে অর্জিত হইয়া-ছিল। ইতিহাস স্পষ্টাকারে বলিতেছে যে, রোম সভ্যতা সবদিক্‌ে গ্রীকজাতির নিকট অনেকাংশে শ্লথী; সেই ইতিহাসের উজ্জ্বল বর্ণ মালারই আবার গ্রীকজাতি ঐ বিষয়ে ভারতবর্ষ ও মিসরের সমীপে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়; ভারতবর্ষে আসিয়া পিথাগোরাসের দর্শন শাস্ত্র এবং গণিতবিজ্ঞান শিক্ষা করাও তাহার অন্যতর নিদর্শন দেখা যাইতেছে; সুতরাং বর্ত্তমানকালে অগুমাত্রও সন্দেহ করা যাইতে পারে না। যে সকল রাজ্যকে আমরা প্রাচীনকালে সভ্যতাসোপানাকৃত হইয়া-ছিল বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, তাহাদি-গের মধ্যে সকলেই কোন না কোনপ্রকারে আমাদিগের ভারতবর্ষের নিকট বহুল শিক্ষা ও উপকার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতভূমি কাহারও নিকটে তৎকালে কোন বিষয়েই কিছু গ্রহণ করে নাই। রোমের ব-হুকাল পূর্বে মিসরই যখন বাণিজ্য শ্রো-তের সহিত মিশাইয়া এদেশ হইতে কি গণিতাদি বিদ্যা, শিল্প বিদ্যা, কি রাজ্য-

† রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। দ্বিতীয় অধ্যায়। ৫৫ পৃষ্ঠা।

নীতি, কি সমাজনীতি, সকল বিষয়েরই কিছু কিছু অংশ লইয়া গিয়াছিল, তখন পরবর্তী সভ্যতাক্রুত রোমের কথায় প্রয়োজন কি? যাহা হউক, রোম বাণিজ্য সম্বন্ধে-তাত্‌কালিক অন্যান্য সভ্য দেশা-পেক্ষা ভারতবর্ষের নিকট বিশেষরূপে উপকৃত ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। যখন ভারতবর্ষের বাণিজ্যজাত দ্রব্য দ্বারা রোমই ঈদৃশ উন্নীত ও গৌরবান্বিত হইয়াছিল, তখন অপর কোন দেশই যে সেরূপ হইতে সক্ষম হয় নাই, তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

একগুণে একটি কথা উপস্থাপিত হইতেছে, রোম কি কেবল ভারতবর্ষের প্রসাদেই সুসভ্য হইয়াছিল? অন্যান্য দেশের সহিত কি তাহার উন্নতি সম্বন্ধে বাণিজ্য বিষয়ীণী ঘনিষ্ঠতা ছিল না? উত্তর, —ছিল; কিন্তু ভারতবর্ষই রোমের প্রতি সর্বাপেক্ষা প্রচুর পরিমাণে মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিয়াছিল।\*

পাশ্চাত্য প্রাচীন পুরাতত্ত্ববিৎ এরি-গান্ (Arian) বলেন, গ্রীক, রোমীয় প্রভৃতি প্রাচীন ইউরোপীয়েরা তাত্‌কালিক ভারতীয়দিগের কতকগুলি অজ্ঞাত স্বল্পমূল্য বিশিষ্ট দ্রব্যের বিনিময়ে নানাবিধ উৎকৃষ্ট নীলকান্ত মণি, অরুণকান্ত মণি, পদ্মরাগ মণি, হীরক প্রভৃতি রত্ন; বিবিধ সুগন্ধি দ্রব্য; নানাবিধ চিত্রিত কৌশিক ও স্বত্র বস্ত্র; রেসমী স্বত্র; হস্তিদন্ত প্রভৃতি দ্রব্য

\*। রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। ২ অ, ৫৮ এবং ৫৯ পৃষ্ঠা।

সমূহ লইয়া গিয়াছিল।† ফলে ভারতবর্ষের প্রসাদেই রোমেশ্বর জুলিয়স সিজার, কতাসের যাতা সার্ভিলিয়াকে ৪৮৩৫৭০) টাকা মূল্যের একটি রত্ন মুক্তা উপঢৌকন দিয়াছিলেন। রাজী ক্লিওপেট্রা প্রসিদ্ধ মৌক্তিক কণ্ঠস্বরের মূল্য ১৫১৪৫৮০) টাকা লইয়াছিল।‡ সুতরাং যে ভারত ভূমির রূপায় পাশ্চাত্য জাতীয়েরা এতদূর মূল্যবান রত্ন সমূহ লাভ করিয়াছিল, সে ভারত ভূমি যে কত দূর ঐশ্বর্যশালিনী, তাহা আর বাস্তব্য রূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। ভারত ভূমির ঐশ্বর্য প্রাচীনকালাবদি আজি পর্যন্ত স্বার্থপর প্রতীচ্যজাতিরা ক্রমান্বয়ে দোহন করিতেছে, তথাপি নিঃশেষ করিতে সমর্থ হয় নাই। শত শত বিদেশীয় ভূপতি ভারতের অতুল ঐশ্বর্য দর্শনে ইহার প্রতি বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তথাপি ভারত ভূমি রত্ন প্রসবে বিরত নহে। যে ভারত পুরাকালে মিসর, গ্রিস, পারস্য, রোম প্রভৃতির সমৃদ্ধি ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিল, সেই রত্ন প্রসবিনী ভারত ভূমি অধুনা ক্ষুদ্রোদরা অথচ সর্বগ্রাসিনী ইংলণ্ড ভূমির দেহ পুষ্টি সংসাধন করিতেছে। এক ভারতের সহিত প্রথমমূর্ত্তে বাণিজ্য-সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া ইংলণ্ড ভূমি সর্বাপেক্ষা অতুল ঐশ্বর্য

† রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। ২ অ, ৬১ এবং ৬২ পৃষ্ঠা।

‡ ইতিহাস ২ অ, ৫৮ পৃ।

বোঝারী হইয়াছে, ইহা কে না মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবে? কোন আধুনিক ইতিহাস না ইহা দেখাইয়া দিবে?

এক্ষণ দেখা যাউক, পাশ্চাত্য জাতিদের বাণিজ্য বলে যে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যে স্ব স্ব দেশের মহতী উন্নতি বর্ধন করিয়াছেন ও করিতেছেন, সেই ভারতের প্রাচীন বাণিজ্য কিরূপ ছিল। বাণিজ্য দুই প্রকার;—বহির্বাণিজ্য এবং আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। এতদ্বয়ের মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেই নিপুণ ছিল। ভারত কেন যে বহির্বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্বাণিজ্য করিত, অনুসন্ধান করিলে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বকল প্রভৃতি সুবিজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে যে দেশে প্রকৃতি মুক্তহস্ত, যে দেশে প্রকৃতির প্রসাদে অনতি ক্লেশে আশানুরূপ প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সামগ্রী হস্তগত হয়, সে দেশের অধিবাসী বিদেশজাত দ্রব্যের আশা করে না। \* সুতরাং এই কারণেই প্রভূত রত্ন প্রসবিনী ভারত ভূমির বহির্বাণিজ্যে বনিফীতা না থাকিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এই জন্যই এদেশে প্রাচীনকাল হইতে বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা কেবল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য। যে দেশে “এক আছে আর নাই” সেই দেশ, দেশ দেশান্তর হইতে আশানুরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য জলপথেই হউক, বা

জলপথেই হউক বাণিজ্য ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষেরা স্বদেশ ভিন্ন বিদেশজাত কিছুই উপযোগিতা বা আবশ্যকতা স্বীকার করিতেন না। বিশেষতঃ, স্বভাবোৎপন্ন দ্রব্য বাতীত এ দেশীয় শিল্পিমণ্ডলী লৌকিক ব্যবহারের নিমিত্ত এত উৎকৃষ্ট শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিত যে, তদ্রূপ দ্রব্য পৃথিবীর অন্য কোন দেশে পাওয়া মুকঠিন হইত। কোন দেশই প্রাচীন সময়ে ভারতবর্ষীয় শিল্পনিপুণের অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রাচীন ভারত বাসিগণ এইরূপে আপনাদের অপরাপর দ্রব্যে আপনাদিগকে অন্যান্য কালান্তিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবল কয়েক প্রকার ধাতু, রৌপ্যপাত্র, সজ্জীত যন্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য অপর দেশ হইতে

† ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্যসমূহে যে সর্বাবয়ব সম্পন্নতা প্রত্যক্ষীভূত হয়, তাহা এতৎ সংঘটিত। যদিও পৌরাণিক অভ্যন্তরীণ কার্যের সম্মান নাই, এতদেশীয়দিগের আবিষ্কারবৃত্তির প্রতিরোধক, তথাপি নিবিকচিত্তে তৎপ্রতি নিযুক্ত হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে আশ্চর্য কার্ষদক্ষতা ও চতুর্থা সমুৎপন্ন হইতেছে। এমন কি, ইউরোপীয়েরা সর্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞান এবং যন্ত্রাদির সাহায্যেও কার্ষক্ষেত্রে তাহাদের তুল্য ফলোৎপাদন করিতে সমর্থ হয় নাই।

( রবার্টসনকৃত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। পরিশিষ্ট ২০১ পৃষ্ঠা। )



প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু ঐ সকল দ্রব্য বিদেশীয়েরা স্বয়ং আনিয়া যোগাইত, ভারত বাসিগণকে উজ্জনা কোন স্থানে যাইতে হইত না। কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, আলেক্সেন্দ্রিয়ার বণিকসমূহে মিসর দেশ হইতে রত্নতপাত্র, সাইপ্রস দ্বীপ হইতে একপ্রকার স্রাব্য এবং পাশ্চাত্য অন্যান্য দেশ হইতে হৃত্যগীত নিপুণা সুন্দরী যুবতীদিগকে ভারতবর্ষে আনয়ন করিয়া বিক্রয় করিত। \* কিন্তু কোথাও এমন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না যে, প্রাচীন ভারতীয়েরা স্বদেশজাত কোন দ্রব্য সামগ্রী স্বয়ং ভারতবর্ষ বাতীত অন্য কোন দেশে বিক্রয় করিয়া আসিতেন। বিদেশীয়েরা এইরূপ কএক প্রকার স্বল্প মূল্যের দ্রব্য বিনিময়ে ভারতবর্ষে দ্রুত বহু মূল্যের অপূর্ণাপ্ত দ্রব্য লইয়া যাইত। এই বাপ'রটি দেখিলে কবির কবি কল্পণের কবিতার্ক "জীরার বদলে ছীরা" সহস্র মনোমধ্যে উদ্ভাসিত হয়। যাহা শুউক, ফল কথা এই যে, তাত্‌কালিক ভারতবর্ষ বাসিগণের সাধারণতঃ যাহা কিছু আবশ্যক হইত, তাহা "পায়ের উপর পা দিয়া" ঘরে বসিয়াই অনায়াসে প্রাপ্ত হইতেন; সুতরাং কোন মতেই বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইত না।

যাহা শুউক এক্ষণে ভারতবর্ষ বহির্বাণিজ্যে অন্তর্বাণিজ্য এতদ্বয়ের মধ্যে কেবল

\* বোহানকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস।

৪৭ পৃষ্ঠা।

মাত্র শেষোক্ত বাণিজ্যই যে কেন আসক্ত ছিল, তাহারই সমালোচনা করা কর্তব্য বোধ হইতেছে। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, কোন অতাবশ্যকীয় সামগ্রীর প্রয়োজন হইলেও, ভারতবর্ষকে পরদেশের মুখাপেক্ষা করিতে হইত না; প্রকৃতিই তত্ত্ববত্তের পূরণ করিয়া দিতেন। সুতরাং ভারতবাসিগণের স্বদুঃখের প্রদেশে যাইয়া বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হইবার আবশ্যক হইত না। আবার "জননী জন্ম ভূমিষ্ঠ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই অমূল্য কবিতার্ক প্রত্যেক ভারতীয়ের হৃদয়-ফলকে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত ছিল। আমাদের বিবেচনায় শ্রেষ্ঠতম মাতা এবং জন্মভূমির প্রতি বিশুদ্ধ ও অটল ভক্তি, আস্থা, মমতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট রক্তিম দৃষ্টিভূত ও চিরস্থায়ী করিবার জন্যই এইরূপ অপূর্ব কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে, এবং এই কবিতার মাহাত্ম্যই প্রাচীন ভারতবাসী অর্থাগণ স্বদেশের প্রভূত পরিমাণে উন্নতি ও গৌরব সংবর্দ্ধন করিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় তৎকালে এইরূপ না করিলে, ভারতে যে প্রাচীন গৌরব আজি পর্যন্ত দেনোপায়মান এবং যাহার প্রতিবিশ্ব অধুনাতন ইয়ুরোপীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মানস-মুহুরে প্রতিফলিত হইয়া অগ্রেব বিধ উপকার সাধন করিতেছে, তাহা এত অধিক পরিমাণে হইতে পারিত না। কেহ হয়ত বলিবেন যে, প্রাচীন কৈলার, গ্রীক ও রোমীয়েরা তবে কিরূপে দূর দেশে গমন করিয়া স্ব স্ব দেশের ভূ-

য়সী উন্নতি বর্দ্ধন করিয়াছিলেন? তত্ত্বের ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তত্ত্ব দেশে যে যে বিষয়ের অভাব পরিলক্ষিত হইত, তাহারা সেইগুলির পরিপূরণ করিবার জন্যই দেশ দেশান্তরে বাণিজ্য করিত। যদ্যপি ভারতের ন্যায় ঐ সকল দেশেও প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ প্রসন্নতা ও মুক্তহস্ততা প্রদর্শিত হইত, তাহা হইলে, বোধ করি, তাহারা কোন ক্রমেই বিদেশ পর্য্যটন করিত না। কিন্তু ভারতবর্ষের ওল্লসিত অ-বস্থা অত্যাশ্চর্য্য; সুতরাং প্রাগ্ভারতীয়েরা স্বদেশের উন্নতির জন্য বিদেশীয়দিগের দ্বারা অভাবপূরণের প্রার্থী হইতেন না। ফসকপা, ভারতবর্ষের উন্নতির পথ ভারতবর্ষেই ছিল; তাহা না থাকিলে, প্রাচীন ভারতীয় অর্থাগণ অবশ্যই বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হইতেন।

কিন্তু ইহাও দৃষ্ট হইতেছে যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে কতকগুলি লোক বহির্বাণিজ্যে সংবদ্ধ হইয়া পোতারোহণে অপরাপর দেশে গমনাগমন করিতেন। সুমাত্রা, জাভা, বালী প্রভৃতি দ্বীপ সমূহে এখনও তাহার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। জাভাদ্বীপে হিন্দুদিগের কতকগুলি দেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও বালীদ্বীপে প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মাচারগণ বাস করিতেছেন। তাঁহাদিগের আচর ব্যবহার, রীতি নীতি এবং ধর্ম্মাদি ভারতবর্ষীয় হিন্দুদিগের ন্যায় সর্ব্বাংশে একরূপ না হউক, অনেক কাংশে সমীভূত দেখা যায়। \* বোধ

\* ত্রুক এবং টমসনের বিজ্ঞাপনী।

করি, বহুকাল তথায় অবস্থান করিতে এবং তাঁদৃশ বিশৃঙ্খলাও অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। অতএব তত্ত্ব স্থানে বহির্বাণিজ্য বশতঃই অবশ্য হিন্দুধর্ম্মবাস ঘটিয়া থাকিবে। এক্ষণে এরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, পূর্ব্বতন হিন্দুগণ ভারতবর্ষ ব্যতীত কোন কোন দেশে গিয়া বহির্বাণিজ্যব্যাপারে পরিলিপ্ত ছিলেন। কিন্তু এদিকে আবার মনু প্রভৃতি মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাঙ্গাতির বিদেশ গমন, তথায় বাণিজ্যাদি করিবার বিধান অথবা শাসন দেখা যায় না। যদিও মনুসংহিতার বাণিজ্যাদ্যায়ের মধ্যে একস্থানে লিখিত আছে যে, অত্যন্ত প্রয়োজন হইলে শূদ্র পরদেশে গিয়া বাণিজ্য করিতে পারে; কিন্তু তাহারা, বোধ হয়, অর্থাগণের ভারত প্রবেশের পূর্ব্বকালীয় আদিম জাতি। সুতরাং তাহাদিগের সহিত তাদৃশ আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতা না থাকাতেই মহাত্মা মনু এরূপ আদেশ করিয়া থাকিবেন; নতুবা ব্রাহ্মণ, ক্షত্রিয়, বৈশ্য ও দ্বিজ সেবক শূদ্র বর্ণের প্রতি এরূপ আদেশ করেন নাই কেন? অথবা আমাদিগের সামান্য বুদ্ধিতে যতদূর পারিয়াছি, অনুসন্ধানের ক্রটি করি নাই, কিন্তু শেষোক্ত বর্ণ চতুষ্কয়ের ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য দেশে গমন বা তথায় যাওয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার-বিধি কোন শাস্ত্রেই দেখিতে পাই নাই। যে সকল হিন্দু ভারতবর্ষ ব্যতীত দেশে অর্থাৎ অনার্য্য বা স্বেচ্ছ দেশে গিয়া

বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের তথায় গমন শাস্ত্র সম্মত নহে, কেবল স্বেচ্ছাচারিতা বা নির্বাসন নিবন্ধনই তাহা ঘটয়াছিল। ব্রাত্য ( পতিত অর্থাৎ উপনয়নাদি দশ সংস্কার বর্জিত ) প্রাচীন হিন্দুগণই ভারতবর্ষভূত অনার্য্য দেশে যাইয়া বাস করিতেন। কারণ, সমাজচ্যুত হইয়া প্রতিবেশীদিগের নিকট আশ্রয় করা নিতান্ত কষ্টকর ও অসহ্য ; তদপেক্ষা স্বদেশ ত্যাগ করিয়া অপরিচিত দেশে বসতি করা অনেকাংশে শ্রেয়স্কর। একজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত বালিরাছেন যে, রোমনগরে সর্ব্বনাক্ষত হওয়া অপেক্ষা কোন সামান্য প্রাণে সর্ব্বপ্রধান হওয়া শ্রেয়স্কর বিষয়। ব্রাত্য হিন্দুগণও এইরূপ অভিপ্রায়ে স্বীয় জন্মভূমি ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া জাবা, বালী প্রভৃতি অনার্য্য দ্বীপে যাইয়া বাস করিতেন। অধুনা বালী দ্বীপে যে সকল হিন্দু অবস্থান করিতেছেন, তাঁহারা প্রাচীন ব্রাত্য হিন্দুগণের বংশোদ্ভব। অতএব এতদ্বারা ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, পুরাকালে যে সকল হিন্দু বিদেশে যাইয়া বাস করিতেন, তাঁহারা পতিত হইয়া লজ্জা ও ঘৃণাবশতঃই দেশত্যাগী হইতেন ;—শাস্ত্রানুসারে বা বহির্বাণিজ্য করিবার জন্য নহে। আবার দেখা যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ কোন অলঙ্ঘনীয় অপরাধ বা মরহত্যাদি করিতেন, মনু সংহিতা প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানানুসারে তাঁহাদিগকে জীবনদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া যাবজ্জীবনের

জন্য নির্বাসিত করা হইত। সুতরাং প্রাচীন আর্য্যদিগের বিদেশবাসী হইবার ইচ্ছাও একটি বলবৎ কারণ।

কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, প্রাচীন হিন্দুদিগের কি সমুদ্রগমনোপযোগী অর্ণবপোত ছিল ? তদ্বত্তরে এই বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, তাঁহাদিগের সমুদ্রপোত নির্মাণের প্রয়োজন ছিল না ; কারণ যে অভিপ্রায় উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকে সেই বহির্বাণিজ্য তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। কিন্তু অনার্য্যজাতিরা প্রাচীন ভারতে অর্ণবপোতে বাণিজ্য করিতে আসিত বলিয়া ঔৎকালিক হিন্দুগণ উহার কার্য্য ও আকারাদি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া ছিলেন। পতিত হিন্দুগণ স্বেচ্ছায় কিংবা নির্বাসিত হইয়া সেই সকল অনার্য্যজাতিদিগকে পার হওয়ার মূল্য প্রদাননস্তর তাঁহাদিগের পোতারে যোগে জাবা প্রভৃতি দ্বীপে গমন করিতেন। অতি প্রাচীনকালে অর্থাৎ বৈদিক সময়ে নবাবত আর্য্যদিগের মধ্যে সামাজিক পাপের প্রবলতা একপ্রকার ছিল না বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, তখন তাঁহারা প্রচুর আদিমনিবাসিপরিপূরিত ভারতে অনধিক সংখ্যায় আগমন করিয়াছিলেন ; সুতরাং তাহাদিগের ভয়ে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিতেন এবং কি কোণে তাহাদিগকে পরাজিত ও তাড়িত করিয়া রত্নভূমি ভারতবর্ষে চিরাধিপত্য সংস্থাপন করিবেন, কেবলমাত্র ইহাই চিন্তা করিতেন। এই

জনাই তৎকালে আৰ্য্যদিগের মধ্যে সামাজিক পাপের স্রোত প্রবাহিত হয় নাই। সকল প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের মতে যেখানে লোক সংখ্যা অধিক নহে, সেখানে পাপের পরিমাণও অতি অল্প। সুতরাং ভারতবর্ষে নবগত আৰ্য্যদিগের মধ্যে তৎকালে কোন গুরুতর পাপ সংঘটিত হইত না, এবং নিকরাসনের বিধি প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল না। মনু বৈদিক সময়ের অনেক পরবর্তী লোক। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণরূপে আৰ্য্যদিগের করতলগত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সংখ্যাও বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সুতরাং তখন আৰ্য্যমণ্ডলীতে বিবিধ প্রকার সামাজিক পাপের সংখ্যাও নূন ছিল না। এই জন্যই মনুসংহিতায় পাপ বিশেষে প্রায়শ্চিত্ত, অৰ্হদণ্ড, জীবনদণ্ড এবং নিকরাসনাদির বিবিধ প্রকার অনুশাসন লিখিত হইয়াছিল। মনুর সময়ে যাহারা নিকরাসিত হইত, তাহারা মাস্তাজ প্রভৃতি দক্ষিণাংশে যাইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিত। কিন্তু মনুর পরসময় হইতেই, বোধ হয়, অতি প্রাচীন পাশ্চাত্য জাতীয়েরা ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আগমন করে। সেই সময় হইতেই পতিত বা দণ্ডিত হিন্দুগণ জাবা প্রভৃতি দ্বীপে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

যাহা হউক, আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, বঙ্গেশ্বরের পুত্র বিজয় সিংহ পোতারোহণে সিংহলে গমন করি-

য়াছিলেন, তিনি ত পতিত হইয়া গমন করেন নাই? উত্তর, তিনি পতিত হইয়া সিংহলে যান নাই বটে, কিন্তু পিতার সহিত বিবাদ করিয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন। সুতরাং বিজয় সিংহের সিংহল যাত্রা শাস্ত্র সম্মত নহে। এতদ্ব্যতীত রামায়ণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের মতে সিংহল (Ceylon) বালক। এবং ভারতবর্ষের যদিও মধ্যে সমুদ্র ব্যবধান আছে, তথাপি উহা ভারতবর্ষের বহির্ভূত নহে। ইহা স্বীকার করিলে বিজয়ের সিংহল-যাত্রা দোষাবহ বলিয়া বোধ হয় না।

প্রাচীন হিন্দুগণ জলপথে যেরূপ বহির্বাণিজ্য করিতে অনার্য্য দেশে গমন করিতেন না, সেইরূপ স্থলপথেও তাঁহাদিগের সেই অভিপ্রায়ে কোন স্বেচ্ছদেশে গমন করিবার বিধি ছিল বলিয়া কোন শাস্ত্রাদিতে প্রমাণ নাই।—তবে মহাত্মারতাদিতে এইমাত্র দেখা যায় যে, রাজ্য বিস্তারের জন্য অর্জুন প্রভৃতি শূরগণ হিমালয়ের উত্তর দিকস্থ কোন কোন স্বেচ্ছদেশে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু বাণিজ্য বিস্তৃতির নিমিত্ত কেহই যান নাই। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ভূপতিগণ এইরূপে অনার্য্যদেশে পদার্পণ করিলে পতিত হইতেন না কেন? যাহারা এরূপ আপত্তি উত্থাপন করেন, সেই মহাত্মারতাদি গ্রন্থে তাঁহারা একবার অভি-নিবেশ পূর্বক দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে, রাজাদিগের জেদশ কার্য্যে

পাতিত্যা দোষ গটে না। একুপ অনুশাসন উল্লিখিত আছে। সুতরাং এবিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রাচ্যাত্ম প্রাচীন ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ঐ-সাধিপতি সেকন্দর সাহ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন তিনি শরুণাচার্য্য নামক জনৈক হিন্দু তপস্বীকে বল পূর্বক ঐসে পেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শরুণাচার্য্য ব্রাহ্মণ, তিনি জানিতেন যে, ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য দেশে পদার্পণ করিবা মাত্রই পতিত হইতে হয়। সুতরাং এই আশঙ্কায় তিনি ঐসের নিকটবর্তী কোন স্থলে চিতানল প্রজ্বলিত করিয়া জীবন বিসর্জন পূর্বক পাতিত্যা পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়াছিলেন। এখনও দেখা যায় যে, হিন্দু ধর্মের মতে সিজু নদের পূর্ব পারে স্নান করিলে পুণ্য সঞ্চয় হইয়া থাকে, কিন্তু উহার পশ্চিম পারে অবগাহনে পুণ্যের লেশনাত্রও নাই, বরং পতিত হইয়া পাপ-প্রাপ্ত হইতে হয়। এইরূপ অর্থাৎ যে অতি-প্রাচীন কালহইতেই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে সংশয় নাই। আবার কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, রোমীয় প্রাচীন মহাকাবি বার্জিলের 'ইণ্ডাস' নামক মহাকাব্যে ভারতবর্ষের ট্রয় প্রভৃতি দেশীয় ভূপতিদিগের নিকট সৈন্যসংক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, \* ইহাতে

\* ড্রাইডেনস্কৃত বার্জিলের অনুবাদ ; ১৪২ পৃষ্ঠা । টি ডাবিনসন হোয়াইট ক্লারর কর্তৃক ১৮২৪ সনে মুদ্রিত ।

কি বোধ করা যাইতে পারে ? এস্থলে বিবেচনা করিতে হইবে, যে সময়ে শাস্ত্রানুসারে ভারতবর্ষীয়দিগের অনার্য্য দেশে গমন করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তৎকালে তাহারা অনার্য্য দেশে যাইত, তাহারা নিশ্চয়ই পতিত বা ভারতবর্ষের অন্তর্গত পর্বত-নিবাসী পুলিন্দ, কিরাত প্রভৃতি স্বেচ্ছজাতি হইবে। তাহারা ভারতবর্ষের লোক বলিয়া বার্জিল তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় বলিতে পারেন, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু তাহারা অপতিত ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রাকৃত জাতিচতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। এই প্রকার যে কোন বিষয়েই হউক না কেন, প্রাচীন ভারতবর্ষবাসী আর্য্যগণ শাস্ত্রসম্মত হইয়া কখনই ভারতবর্ষ ব্যতীত অনার্য্য দেশে গমন করিতেন না ; সুতরাং কি স্থলপথে, কি জলপথে তাহাদিগের অনার্য্য দেশে বাণিজ্য করিতে যাইবার প্রমাণ প্রদর্শন করা এক প্রকার বিড়ম্বনামাত্র ।

যাহা হউক, আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তদ্বারা ইহাই সীমাংসিত হইতেছে যে, পুরাতন ভারতীয় আর্য্যগণ বহিঃবাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন না; অতএব এবিষয়ে আর অধিক বলিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে প্রাচীন ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের বিষয় কথঞ্চিৎ আলোচনা করা কর্তব্য ।

প্রাচীন আর্য্যগণ এতাদৃশ ব্রহ্মদেশপ্রিয় ছিলেন যে, জম্বুদ্বীপকে স্বর্গাপেকাও গরী-জান করিতেন। বাস্তবিক, জম্বুদ্বীপ

যে কিরূপ আদর ও মারার সামগ্রী, তাহা বলিয়া শেষ করা দুঃসাধ্য। জম্বুভূমির ক্রোড়শূন্য হইয়া জীবন যাপন করা এক প্রকার মৃত্যু বলিলেও অসঙ্গত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য প্রবাসীমাত্রই অবগত আছেন। যদিও অবস্থা এবং কার্য্যোপলক্ষে অনেককে প্রবাসী হইয়া বাহ্যিক জীবনের আহার্য্য করিতে হয়, তথাপি স্বদেশে থাকিয়া আবশ্যকীয় জীবনের সম্পূর্ণ লাভাংশে কষ্ট সহ্য করিয়াও মনের যেমন একপ্রকার অতৃপ্ত ও অভূতপূর্ব আনন্দ লাভ হইয়া থাকে, বিদেশে তাহা কখনই সম্ভবিত্তে পারে না। বিধাতা যে কি এক স্বর্গীয় পদার্থে জম্বুভূমির স্রষ্টি করিয়াছেন এবং সেই পদার্থ যে কীদৃশ মূল্যবান তাহা তিনিই জানেন। জম্বুভূমির সহিত মানবজন্মের নিরন্তর যুক্তি সম্বন্ধ। ইহার জন্য প্রাণ দিতেও কিছুমাত্র কষ্টানুভব হয় না। এই নিমিত্তই প্রাচীন আর্ধ্যগণ জম্বুভূমির এতদূর পক্ষপাতী ছিলেন। বর্তমান সময়েও সেই আর্ধ্যদিগের উত্তর বংশীয়েরা তাঁহাদেরই অনুসরণ করিতেছেন। ভবিষ্যতেও তাহাই অবিকলিত থাকিবার সম্ভাবনা। পৃথিবীতে এমন কোন স্থানই নাই, যেখানকার মানবজাতি জম্বুভূমির জন্য কাতর না হইয়া দূরদেশে নিশ্চিন্তমনে অবস্থান করিতে পারে। সকল ভাবার কাব্যগ্রন্থ খুলিয়া দেখ, কবিগণ জম্বুভূমির কতদূর মহিমা ও স্নেহ কীর্ত্তন করিয়াছেন। হিন্দুদের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ উন্মোচন কর,

জম্বুভূমির স্নেহময়ী স্রষ্টি অঙ্কিত দেখিতে পাইবে। প্রাচীন হিন্দুজাতি গভর্ধারণী মাতাকে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাঁহাদের সহিত জম্বুভূমিকে সমাবস্থ করিয়া অকপটচিত্তে “জননী জম্বুভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরীরসী” বলিয়াছেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জননীর তুলনা জম্বুভূমি এবং জম্বুভূমির তুলনা জননী; সুতরাং তদিতর যাহা কিছু সকলই নিম্নগণ্য।

এক্ষণে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, যদি প্রাচীন আর্ধ্যগণ জম্বুভূমির এতদূর পক্ষপাতী ও অনুরাগী ছিলেন, তবে কি জন্য আবার “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী শুদর্ভং ক্লষিকর্ম্মণি। তদর্ভং রাজসেবারাং ভিক্ষার্য্যৈব নৈবচ॥” এই কথা বলিতেন। অর্থাৎগণের সকল প্রকার উপায় অপেক্ষা বাণিজ্যেই প্রকটরূপ ধনোপার্জন হইয়া থাকে। এদিকে আবার বাণিজ্যাবলম্বন করিতে গেলে দূর দেশে যাইতে হয়; নচেৎ স্বদেশে থাকিয়া এমন কি ব্যবসায় আছে যে, তদ্বারা আশানুরূপ অর্থ লাভ হইতে পারে? ইহারা এবংবিধ আপত্তি তুলিয়া প্রাচীন আর্ধ্যদিগকে জম্বুভূমির প্রতি ভক্তি ও দৃঢ়তাপূন্য করিতে চেষ্টা করেন, তাহা তাঁহাদের অশ্রান্ত বিচার বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কেননা বাণিজ্য দুই প্রকার—বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য। সুতরাং স্বদেশে থাকিয়া অন্তর্বাণিজ্য অবলম্বন করিলেই “জননী জম্বুভূমিষ্ট স্বর্গাদপি গরীরসী” এবং “বা-

গিজো বসতে লক্ষ্মীঃ” এই উভয় মহামূল্য কবিতাংশেরই সার্থকতা সম্পাদিত হইতে পারে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা শেষোক্তটির অনুগামী হইয়াছিলেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের প্রতি প্রকৃতিদেবী একদূর সুরাসনা ছিলেন যে, তদানীন্তন হিন্দুদিগকে সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাণিজ্যের জন্য কোন দূর দেশেই যাইতে হইত না।

আমরা কেবল জন্মগ্রহণের স্থানকেই জন্মভূমি বলিব না। ভৌগোলিক মতের অনুসরণ করিয়া সীমাবদ্ধ এক একটি দেশকে এক একটি জাতির জন্মভূমি বলিব এবং ইহাই সাধারণ মত। যেমন লণ্ডন নগরে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তাহার জন্মভূমি শুদ্ধ লণ্ডন নহে, সমুদয় ইংলণ্ড। সেইরূপ কলিকাতা, কাশী, বোম্বাই, লাহোর বা মাদ্রাজ ওভূতি ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে যাহারই জন্ম হইক না কেন, ভৌগোলিক নিয়মে সমুদয় ভারতভূমি তাহার জন্মভূমি। তবে বিশেষ এই যে, জন্মাইবার স্থান মুখ্য জন্মভূমি ও সমুদয় ভারতবর্ষ গোণ জন্মভূমি। অতএব প্রাচীন ভারতীয়েরা স্বদেশে থাকিয়া উল্লিখিত কবিতাঙ্কণের অর্থ পালনে যে সফলমনোরথ হইয়াছিলেন, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ করা যাইতে পারে না।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ, ধাতুজ, প্রাণিজ ও শিল্পজ বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন

দেশই নাই, যাহাকে ভারতবর্ষের সহিত এবিষয়ে সমকক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। সুতরাং ভারতভূমির যাহা কিছু আবশ্যকীয়, তাহা এই ভারতেই জন্মিত, কিন্তু ভিন্ন দেশীয়েরা বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব দূরীকরণার্থে ভারতে জাগমন করিত। প্রাচীন ভারতের সহিত তদানীন্তন পরদেশীয়েরা স্বয়ংই বাণিজ্যস্থানে বদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা যে সকল দ্রব্য আনয়ন করিত, প্রাচীন ভারতবাসীরা তত্ত্ববত্তের বিনিময়ে স্বদেশজাত বস্তু প্রদান করিতেন। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বা-  
 তীত আর কি বলা যাইতে পারে? এইরূপ বাণিজ্যকে পরদেশ-সংশ্লিষ্ট অন্তর্বাণিজ্য বলে। এতদ্বাতিত প্রাচীন ভারতবর্ষের আর একপ্রকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল, তাহাকে স্বদেশ-সংশ্লিষ্ট অন্তর্বাণিজ্য বলিয়া অভিহিত করা যায়। উহা নিম্নলিখিতরূপে সম্পাদিত হইত; ভারতের এক সীমার দ্রব্য অপর সীমার নীত হইয়া আবার সেই সীমার আবশ্যকীয় দ্রব্য পূর্ব সীমায় আনীত হইত। পুনশ্চ কেবল বিনিময়ে আদান প্রদান না হইয়া প্রয়োজন মতে মূল্য দ্বারাও ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা ছিল।

বিদেশীয়েরা ভারতবর্ষীয়দের সহিত যেরূপ বাণিজ্যোপযোগী দ্রব্যের বিনিময় করিত, সেইরূপ মূল্য দিয়াও ভারতবর্ষজাত বিবিধ বস্তু ক্রয় করিত। পুরাতত্ত্ববিৎ উই-

লিয়ম রবার্টসন্ সাহেব বলেন যে, বহু প্রাচীন কালাবধি ভিন্ন দেশীয়েরা স্বর্ণ রৌপ্য নির্মিত মুদ্রা দ্বারা ভারতবর্ষজাত বিবিধ দ্রব্য ক্রয় করিত। ভারতবর্ষ প্রায় পৃথিবীর সকল দেশের নিকট মূল্য লইয়া ভূরি ভূরি দ্রব্য প্রদান করিয়াছে এবং এখনও করিয়া আসিতেছে; ইহার প্রতি প্রকৃতিদেবীর এতদূর দয়া যে, ইহা ভবিষ্যতেও এইরূপ করিতে থাকিবে। \* উক্ত সাহেবের সম্বন্ধিত আ-  
মাদেরও মতভেদ হয় না। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে স্বর্ণ রৌপ্য যে পরিমাণে ছিল, তাহাতে বোধ হয় যে, বিদেশীয়ে-  
রাই উহা মূল্যস্বরূপ প্রদান করিত এবং তা-  
দ্বাৰী ভারতবর্ষীয়েরা বিদেশীয়দের নিকট হইতে দ্রব্যের বিনিময়ে অনঙ্কিত (মুদ্রা নহে) স্বর্ণ রৌপ্যাদিও প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিতেন। যদিও ভারতবর্ষ অ-  
নান্য ধাতু বহুল পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে, তথাপি স্বর্ণ রজতাদির ভাগ তাদৃশ দেখা যায় না। † কিন্তু এদিকে আবার ভারতবর্ষের আপাদ মস্তক স্বর্ণ রৌপ্যে মণ্ডিত। তবে ইহা কোথা হইতে আসিতে পারে? উত্তর, পরদেশ-সংশ্লিষ্ট অ-  
ন্তবাণিজ্য। কতবার কত কত বিদেশীয় রা-  
জারা আসিয়া ভারতবর্ষের বিপুল ধৈর্য্য

\* রবার্টসন্‌রূপ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস। পরিশিষ্ট ২০৩ পৃষ্ঠা।

† খাজে আবদুল গণিমিঞা নামক কাস্মীর দেশীয় একজন প্রধান ব্যক্তির জীবনচরিত। ৪২ পৃষ্ঠা।

হরণ করিয়াছে, তথাপি ইহা অসীম রত্নের আকর। গিজনির মামুদ প্রভৃতির অত্যাচার ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তিমাঝেই অবগত আছেন। এই সকল অনুরেরা সাধ্যাতীত ভারতবর্ষ ঠন করিয়াছে, তথাপি ভারতভূমি বিশিষ্টরূপ ধনশালিনী। এতদৃশ ধনবস্তার কারণ উল্লিখিত বাণিজ্য বাতীত আর কিছুই নহে। বিখ্যাত পুরাবত্তা প্লিনি তাৎকালিক ভারত ভূমিকে যেরূপ অপৰ্যাপ্ত অর্থশালী বলিয়া গিয়াছেন, তাহার পরবর্তী পুরাবিদে-  
দেরও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। এবং একগুণ তাহাই দেখা যাইতেছে। অতএব এতদ্বারা জানা যাইতেছে যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে বিদেশীয়ে-  
রা স্ব দেশের স্বর্ণ রৌপ্যাদি মূল্যস্বরূপ দিয়াও ভারতবর্ষের স্বভাবজাত দ্রব্যাদি গ্রহণ করিত। কিন্তু ভারতীয়েরা স্বদেশে থাকিয়াই উহা গ্রহণ করিতেন, কদাপি বিদেশে যাইতেন না।

প্রাচীন হিন্দুদিগের পৌতিনির্মাণপ্রণালী যে প্রকার ছিল, তাহাতেও স্পষ্ট বোধ হয় যে, তাহার সমুদ্রগর্ভে বিচরণ করিয়া দেশদেশান্তরে বাণিজ্য করিতে যাইতেন না। সমুদ্রে যাইতে হইলে অবশ্য পুর্দীর্ঘ ও তরঙ্গাভিঘাতসহনীয় জলযানের প্রয়োজন; কিন্তু তাৎকালিক হিন্দু-  
জাতির তাদৃশ তরণী ছিল না। অধুনা ভারতবর্ষে যে সকল নৌকা দৃষ্ট হয়, প্রাচীনকালেও সেইরূপ থাকিবার অধিক সম্ভাবনা। তবে গঠনপ্রণালীর কিছু ইতর বিশেষ ছিল। যদি তৎকালে অর্ণব বিচ-



রণোপযোগী রুহৎ রুহৎ জলযান থাকিত, তাহা হইলে তাহার দ্রুতগমন্য প্রমাণও পাওয়া যাইত। কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, সমুদ্রতীরবর্তী উড়িয়া, সরকার প্রভৃতি প্রদেশ হইতে আশ্বিন ও কাৰ্ত্তিক মাসে কলিকাতায় যে সকল মূল্যপূর্ণ আইসে, তাহা সাধারণ নৌকা অপেক্ষা অনেক বড় এবং সমুদ্রগমনোপযোগী। যাহারা এই আপত্তি তুলিয়া প্রাচীন ভারতীয়দের সমুদ্রগমনোপযোগী রুহৎ রুহৎ নৌকার স্থায়িত্ব দেখাইতে যত্নবান্, আমরা তাঁহাদিগের বাক্যে আত্ম প্রদর্শন করিতে পারি না। কেন না, মূল্যপূর্ণ নিচর যদিও নৌকা অপেক্ষা অনেকাংশে রুহৎ বটে, তথাপি তাহাদিগের আকার প্রকার, যিনি একবার নিষিদ্ধচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি কখনই সে সকলকে দূর-সমুদ্রগামী বলিবেন না। ঐ সকল জলযানযোগে যে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য নীত এবং আনীত হয়, তাহা কেবল ভারতবর্ষেরই উপকূলে; সুতরাং ভারতবাসীরা ভারতবর্ষেই থাকেন এবং ভারতের বাণিজ্য ভারতেই সংসাধিত হয়। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এবং বিধ বাণিজ্যকে অন্তর্বাণিজ্য কহে। অতএব নৌকার প্রমাণ লইয়া ভারতীয় বহির্বাণিজ্যসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিবার আশাস বিভূষণাত্মক।

প্রস্তাব বাহুল্য ভরে এক্ষণে আর কিছু না বলিয়া নিরন্তর হইতেছি। উপসংহারকালে আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, প্রাচীন

কালে ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণ বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন না, ইহা শাস্ত্র সম্মত। এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে যে মিরত ছিলেন, ইহাও শাস্ত্রের প্রমাণ। প্রাচীন পাশ্চাত্য হিরোদটাস, এরিয়ান, প্লিনি, ডিওডোরস, সিকিউলস্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও প্রাচীন হিন্দুদিগের অন্তর্বাণিজ্য ব্যতিরেকে বহির্বাণিজ্যের কোন প্রমাণ দেখা যায় না। যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা ঘটয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন কালের স্বাধীন ভারতের সেরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল না। সুতরাং সেই এক দিন আর এই এক দিন! এক্ষণে আমাদের জাত্যাভিমান, পাতিতাদোষ প্রভৃতিকে সমুদ্রগর্ভে বিসর্জন দিয়া, সেই সমুদ্রগর্ভে হিন্দু বাণিজ্য-পোত ভাসমান করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। যে প্রবল পরাক্রান্ত জাতি একমাত্র বহির্বাণিজ্যস্বত্রেই সোণার ভারত করতলগত করিয়াছেন, সেই পরম হিতকর বহির্বাণিজ্যের কার্যমনোবাক্যে অনুসরণ করা আধুনিক ভারতবর্ষবাসী প্রত্যেক হিন্দুরই কর্তব্য। এবং তৎসঙ্গে মন্দীভূত অন্তর্বাণিজ্যের জীৱদ্ধি সাধন করাও নিতান্ত উচিত। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তবাসী পার্শ্বজাতি যে কেবল এই একমাত্র বহির্বাণিজ্যের প্রভাবেই উন্নত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তবে অধুনাতন হিন্দুদেরই কি তাহাদিগের ত্রুটে

তৃতী হওয়া উচিত নহে? অধুনা প্রাচীন ভারতীয়দিগের স্বাধীন অবস্থার সহিত আমাদিগের অবস্থা তুলনাই হইতে পারে না। দূতরাং এখন আর বহির্বাণিজ্যে লিপ্ত হওয়া শাস্ত্র সম্মত নহে বলিয়া অদূরদর্শিতা দেখান আমাদিগের বিবেচনার নিত্যন্ত অ-যৌক্তিক। আমাদিগের অধুনাতন অবস্থারূপ ধর্মশাস্ত্রের মর্ম এই, যে হিন্দু জা-হাজে চড়িয়া বিদেশবাণিজ্য করিতে গেলে

পতিত হইবার আশঙ্কা করে, সেই পতিত ও ক্ষয়ভূমির পরম শত্রু। অতএব হে বি-পুল ঐর্ষ্যশালী, মশাবিক্ত অথবা দরিদ্র হি-ন্দুসন্তানগণ! আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বর্তমান অবস্থারূপ ধর্ম শাস্ত্রের আদেশে বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হই। তাহা হইলে আ-মাদিগের দক্ষভাগ্যের কণামাত্রও কি প্রশ-মিত হইবে না?

শ্রীরাজ-

## অশিক্ষিত ইন্দিয়ের ভ্রম ও প্রমাদ।

বাহ্য জগতের সমুদয় বিষয়ই ইন্দির-জের। কিন্তু বাহ্যজ্ঞানলাভার্থ বাহ্য বস্তু এবং ইন্দিরচর থাকিলেই যথেষ্ট হয় না, আত্মজ্ঞানেরও আবশ্যক। শকুন্তলা কর-তলে কপোল বিজ্ঞাস করিয়া দুহ্মন্তচিন্তায় গাঢ় নিমগ্না ছিলেন, কোণন অভাব দু-র্কাসা তাঁহাকে বারংবার ডাকিলেন, তিনি শুনিতে পাঠিলেন না। এখানে দুর্কাসার তারস্বর এবং শকুন্তলার প্রবণেন্দ্রিয় উত্ত-রই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু শকুন্তলা এক চি-ন্তায় এত নিমগ্না যে অল্প সমস্ত বিষয়ে তিনি আত্মজ্ঞানসংশয়ী হইয়াছিলেন, এবং এই আত্মজ্ঞানশূন্য হওয়াতেই তিনি শুনিতে পারিলেন না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বহির্জগতের জ্ঞান উপলব্ধি জন্য তিনটি বিষয়ের আবশ্যক; প্রথমতঃ বাহ্যকারণ, দ্বিতীয়তঃ পূর্ণবিকসিত ইন্দির এবং তৃতী-

য়তঃ আত্মজ্ঞান। ইহার একতমের অভাব হইলেই আমরা বাহ্যজ্ঞান লাভে অশক্ত হই। উল্লিখিত উদাহরণে তৃতীয় কারণের অভাব ছিল; তাহা না হইয়া যদি প্রথম কিবা দ্বিতীয় কারণের অভাব হইত অর্থাৎ যদি দুর্কাসা না ডাকিতেন কিবা শকুন্তলা বহির হইতেন তাহা হইলেও শকুন্তলার আ-ত্মজ্ঞান হইত না। কারণভাবে যেরূপ জ্ঞানাতাব, কারণভ্রমেও তদ্রূপ জ্ঞানবিভ্রম হইয়া থাকে।

ইন্দিরের অগোচর পদার্থের সত্ত্বা যে সহসা দৃষ্টকারণের কারণ বলিয়া ম্য-নিয়া লয়, সে যেরূপ কুসংস্কারী ব-লিয়া আখ্যাত হয়, ইন্দিরগোচর পদার্থে যে সহসা বিশ্বাস করিতে চাহে না, সেও তদ্রূপ অবিবাহিতা অতিথি প্রাপ্ত হয়। অ-বিবাহিতা নামে স্থানার কটাক্ষ থাকিলেও ইহা

অক্ষুৰ্ণবদনে বলা যাইতে পারে যে, অবি-  
শ্বাসীরা জগতের মহোপকারী। তাহা-  
দের অবিশ্বাসেই বাহ্যজগতের অনেকগুলি  
সত্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা এই  
প্রবন্ধে কতগুলি ইন্দ্রিয়লব্ধ বাহ্যজগতের  
জ্ঞান দেখাইব এবং তত্ত্ব কারণ নি-  
র্দেশ করিতেও সূচন করিব। পাঠক দে-  
খিতে পাইবেন যে, বিনা পরীক্ষায় অ-  
নেক সময়ে যাহা তিনি ইন্দ্রিয়লব্ধ নিশ্চিত  
জ্ঞান মনে করিতেন তাহা কিরূপ ভ্রম-  
সঙ্কুল, এবং অশিক্ষিত ইন্দ্রিয় কত সহজে  
ভ্রমপ্রমাদে পতিত হয়।

ইন্দ্রিয়মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয়ই সর্বপ্রধান  
এবং চাক্ষুবজ্ঞানের উপর সকলেরই অ-  
ত্যন্ত বিশ্বাস। কিন্তু পদার্থের কি  
কি গুণ দর্শনেন্দ্রিয়লব্ধ তত্ত্বিয়মে পতিত-  
দিগের ঘোর মতবৈধ রহিয়াছে। এক  
পক্ষ কহেন পদার্থের কেবল বর্ণ এবং  
প্রভাই দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। অপরেরা  
তদতিরিক্ত আকার ও পরিমাণ, এবং আ-  
কার ও পরিমাণের সঙ্গে সঙ্গে দূরত্বও চ-  
ক্ষুর্গোচর বলিয়া নির্দেশ করেন। উভয়  
পক্ষই কুণ্ডী এবং বলা, এবং উভয় পক্ষেই  
প্রতিভাশালী নতুনসংখ্যক দার্শনিকের নাম  
দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের কূটতর্কজ্ঞান বি-  
লোড়ন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।  
সংক্ষেপতঃ ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে  
যে, প্রাথমিক \* চক্ষুঃ কেবল বর্ণ এবং

\* এক ব্যক্তি আজন্ম নেত্রমন্ড (ছান্দ্র)  
রোগগ্রস্ত ছিল। সে বয়স্ক হইলে তাহা

প্রভা জানিতে পারিলেও অভিজ্ঞ চক্ষুঃ ত-  
দতিরিক্ত পরিমাণ, আকার এবং দূরত্বও  
বুঝিতে পারে! কিন্তু এই পক্ষগণ মধ্যে  
এমন একটিও নাই যে, তৎসম্বন্ধে অশিক্ষিত  
চক্ষুঃ মধ্যে মধ্যে ভ্রমে পতিত না হয়। উ-  
দাহরণ ক্রমশঃ লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ বর্ণসম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রমের উদাহ-  
রণ। যদি একখানি তাসের এক পৃষ্ঠা  
গাঢ় উজ্জ্বল লোহিত এবং অপর পৃষ্ঠা গাঢ়  
উজ্জ্বল হরিত বর্ণে চিত্রিত করিয়া নাসি-  
কার উপর একপাভাবে ধারণ করা যায় যে,  
এক চক্ষুঃ লোহিত পৃষ্ঠা এবং অন্যতর চক্ষুঃ  
হরিত পৃষ্ঠা দেখিতে পায় এবং কিয়ৎকাল  
এইভাবে রাখিয়া যদি সহসা উক্ত তাসের  
পরিবর্তে উভয় পৃষ্ঠাই খেঁত একরূপ আর  
একখানি তাস ধারণ করা যায়, তাহা হ-  
ইলে পূর্বে যে দিকে লোহিত ছিল খেঁত  
তাসের সেইদিক হরিত এবং পূর্বে যেদিকে  
হরিত ছিল খেঁত তাসের সেই দিক লো-  
হিতবর্ণ দৃষ্ট হইবে। বজ্রের ঘোরবর্ণ-  
নির্নাম কিয়ৎকাল অবগন করিলে যেরূপ  
তৎপর মুহূর্ত্তে ষটিকাযন্ত্রের টিক্ টিক্ শব্দ  
কণ্ঠে অনুভূত হয় না, গাঢ় লোহিত কিয়-  
ন্ত্রর চিহ্নসদন তাহাকে আরোগ্য করেন।  
প্রথমে সে পদার্থের বর্ণ ও প্রভা ব্যতীত  
কিছুই বুঝিতে পারিত না; সমুদয় পদা-  
র্থই তাহার চক্ষে আসিয়া লাগিতেছে  
এইরূপ মনে করিত এবং স্পর্শ না করিয়া  
কোন পদার্থের আকার কিবা পরিমাণ  
বুঝিতে সক্ষম হইত না।

ংকাল দেখিলে চক্ষুঃ শ্বেত আলোকের লোহিতভাগ \* সেইরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। শ্বেত আলোকের লোহিত ভাগ অনুভূত না হইলে অবশিষ্ট বর্ণের সমবায়ে হরিত দৃষ্ট হয়। আবার অপর পৃষ্ঠায় পূর্বের গাঢ় উজ্জ্বল হরিত ছিল, তজ্জন্য শ্বেত আলোকের হরিত ভাগ অন্যতর চক্ষে অনুভূত হয় না, অবশিষ্ট বর্ণ বর্ণের সমবায়ে লোহিত দৃষ্ট হয়।

রক্তসন্ধাকালে দুইখানি লোহিত মেঘের মধ্যস্থান হরিবর্ণ দেখায়। বাস্তব

\* শ্বেত আলোক সপ্তবর্ণের সমবায়ে উৎপন্ন; যথা—লোহিত, নারঙ্গ (পাটল), পীত, হরিত, নীল, বেগুনী এবং বায়লেট। জলকণায় সূর্যের শ্বেত আলোক বিল্লিষ্ট হইয়া রামধনু উৎপন্ন হয় এবং উহাতে এই সপ্তবর্ণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে লোহিত, হরিত এবং বায়লেট এই তিনটি মূলবর্ণ। পূর্বের লোহিত, নীল, ও পীত এই তিনটি মূলবর্ণরূপে গৃহীত হইত, কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক উন্নতি সহকারে এই মত ভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত হইয়াছে। নারঙ্গ, পীত, নীল এবং বেগুনী মূল বর্ণ নহে; উহার মিশ্রবর্ণ। নারঙ্গ বর্ণ গাঢ় লোহিত এবং ঈষৎ হরিতযোগে; পীত-বর্ণ গাঢ় লোহিত এবং গাঢ় হরিত-যোগে; নীলবর্ণ, গাঢ় হরিত এবং গাঢ় বায়লেটযোগে; এবং বেগুনীবর্ণ ঈষৎ হরিত এবং গাঢ় বায়লেটযোগে উৎপন্ন হয়।

বিক উহা নীল আকাশমাত্র। উভয় পার্শ্বে লোহিত মেঘ থাকাতে হরিদাত অনুভূত হয়। বালসূর্য্য কিয়ৎক্ষণ স্থিরনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া যদি নয়ন মুদ্রিত করা যায়, তাহা হইলে কএক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটি নীলসূর্য্য অনুভূত হইয়া থাকে। লাল কালি দ্বারা কএক পৃষ্ঠা লিখিয়া যদি কাল কালি দ্বারা লিখিতে আরম্ভ করা যায়, তাহা হইলে উহা ঈষৎ নীলবর্ণ দেখায়। লাল যবনিকার ছায়া শ্বেত প্রাচীরে পতিত হইলে উহা রক্তিমাত দৃষ্ট হয়, কারণ যবনিকা সম্পূর্ণ অস্বচ্ছ নহে, আলোক কিয়ৎ পরিমাণে উহার মধ্য দিয়া যাইতে পারে। যদি যবনিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে তাহা হইলে ছায়ায় ঐ স্থান ঐ ঈষৎ নীল বোধ হইবে। উদাহরণ আরও অনেক সংগৃহীত করা যায়, কিন্তু যে কএকটি উদাহরণ দেওয়া হইল তাহাতেই পাঠক বর্ণ সম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রম সম্যক বুঝিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়তঃ প্রভা সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রমের উদাহরণ। রাত্রিকালে যদি সহসা প্রদীপ নিরূপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে বোধ হয় গৃহ ঘোর তমসালঙ্কার। গা-বাক এবং কবাট দ্বারা যে আলোক গৃহে প্রবিষ্ট হয় তাহাতে গৃহস্থিত কোন বস্তুই দৃষ্ট হয় না; কিন্তু কিয়ৎপরে পা-খাঁড় পদার্থ সমূহ ক্রমে ক্রমে দৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, চক্ষুর এক অবস্থায় যে স্থান ঘোর তমসারূপ

লিয়া অনুমিত হয় এবং যৎস্থানীয় পদার্থ সমূহ দৃষ্টি গোচর হয় না, চক্ষুর অবস্থান্তরে তৎস্থানীয় পদার্থ সমূহ দৃষ্ট হয় এবং গৃহও তত অন্ধকার বোধ হয় না। ইহা-কেই, আমরা প্রভা সম্বন্ধে দৃষ্টি বিজ্ঞম বলিতেছি। এইক্ষণে ইহার কারণ নির্দেশ করিব। চক্ষুর যে ভাগকে তারা কিম্বা কনীনিকা কহে; তদ্বা দিয়াই আলোক প্রবিষ্ট হইয়া দৃষ্টি কার্য সম্পাদন করে। উহা তারকামণ্ডল, কিম্বা কনীনিকা পরাধি দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই তারকা মণ্ডল ক-একটি পেশীর সহিত সংলগ্ন এবং তাহা-দিগের সাহায্যে উহা আকৃষ্ট কিম্বা বিক্ষারিত করিয়া আলোক প্রবেশ দ্বার ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ করা যায়। যখন গৃহে প্রদীপ থাকে তখন তারকা মণ্ডল এরূপ কুঞ্চিত হয়, যে দর্শনোপযোগী আলোক মাত্র চক্ষুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে। প্রদীপ নিৰ্বাপিত হইলে কবাট-গবাটগত ক্ষীণ আলোক মাত্র থাকে; কুঞ্চিত-দ্বার-প্রবিষ্ট সেই ক্ষীণ আলোক দৃষ্টি কার্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না। এই-জন্য তারকা মণ্ডল বিক্ষারিত করিয়া আলোক প্রবেশ দ্বার বৃহত্তর করিতে হয়। বিক্ষারিত করিতে স্নেহতিপয় মুহূর্ত্ত অতি-বাহিত হয়। সেই অত্যাশঙ্ক্য গৃহ ঘের তমসাস্ত্রের বোধ হয় এবং বিক্ষারিত হইলে ক্রমে দৃষ্টিভ্রম জন্মিতে থাকে। এইক্ষণে পুনরায় যদি গৃহে প্রদীপ আনয়ন করা যায়, তাহা হইলে বিক্ষারিত-দ্বার-প্রবিষ্ট

আলোক চক্ষুর অসীম হয় এবং চক্ষুঃ স্বতঃই মুদিত হইয়া আলোক-প্রবেশ-দ্বার কুঞ্চিত হইলে পুনরায় উদ্বীলিত হয়। সূ-র্য্যের প্রথর আলোক হইতে অম্পা-লোক গৃহে প্রবেশ করিলে কিম্বা অম্পা-লোক-গৃহ হইতে সূর্য্যের প্রথর আলোকে বহির্গত হইলেও এইরূপ প্রভা সম্বন্ধে দৃষ্টি বিজ্ঞম জন্মিয়া থাকে।

তৃতীয়তঃ। পরিমাণ বিষয়ক দৃষ্টিবি-জ্ঞমের উদাহরণ \*। মধ্যাহ্নের সূর্য্য অস্ত্রোক্ষা প্রভাতের এবং সায়াং কালের সূর্য্য বৃহত্তর বোধ হয়, এবং পৌর্ণমাসী নিশিতে উদয়শীল এবং অন্তোন্মুখ চন্দ্রও মধ্যাহ্নাগের চন্দ্র হইতে বৃহত্তর অনু-ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু মানযজ্ঞ দ্বারা মাপিলে সকল সময়েই সূর্য্যের কিম্বা চ-ন্দ্রের একই ব্যাস দৃষ্ট হয়। এখানে চক্ষুঃ চক্ষুর বিপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিনা যজ্ঞে চক্ষুঃ বাহ্যকে বৃহত্তর বলিতে-ছিল, যজ্ঞ সাহায্যে সেই চক্ষুঃই তাহাকে সমান বলিয়া স্বীকার করিল। শুদ্ধ চক্ষুঃ অপেক্ষা মানযজ্ঞ এবং চক্ষুঃ অধিকতর বিশ্বাস্য মনেহ নাই, কিন্তু প্রভাতে এবং সায়াংহে সূর্য্য এরূপ বৃহত্তর দেখায় কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাঠকবর্গের হৃদয় গ্রাহী হইবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু

\* এই উদাহরণটা মানসিক বিজ্ঞম মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত, কিন্তু সাধারণ নাম-করণ অনুসারে আমরা ইহাকে দৃষ্টি-বিজ্ঞম বলিয়াই উল্লেখ করিলাম।

এযাবৎ পণ্ডিতেরা ইহার এক মাত্র উত্তরই দিয়া আসিতেছেন এবং তাহাই প্রকটিত হইতেছে। অন্যান্য পদার্থের সহিত তুলনা করিয়াই আমরা পদার্থের পরিমাণ নিরূপণ করিয়া থাকি। যদি দুইটি বস্তু সমান উচ্চ বোধ হয় তাহা হইলে যেটি অপেক্ষাকৃত আমাদিগের নিকটস্থ তাহা হইতে যেটি অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত সেইটি যে উচ্চতর ইহা আমরা স্বতই নির্দেশ করিয়া থাকি। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে আমরা মনে মনে যে বৃত্তি পরম্পরা অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহা বৃত্তিতে পারি না। এক্ষণে স্বর্ষ্য সম্বন্ধে এইরূপ তর্ক অবলম্বন করিলে দেখা যাইবে যে উদয়শীল কিবা অন্তর্মুখ স্বর্ষ্য অবলোকন করিবার সময়ে স্বর্ষ্য এবং চকুর মধ্যে নানা পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহাদিগের সহিত তুলনা করিয়া আমরা স্বর্ষ্যের পরিমাণ অনুভব করি, কিন্তু মধ্যাহ্নে স্বর্ষ্য এবং চকুর মধ্যে কোন পদার্থই দৃষ্ট হয় না। তুলনা করিবার পদার্থের এই অভাবেই মধ্যাহ্নতপন ক্ষুদ্রতর অনুভূত হয়। ষাঁহার দার্শনিকদিগের স্বপ্ন তর্কে অনভ্যন্ত তাঁহাদিগের এই ব্যাখ্যাটি ক্ষণপ্রায় হইবে না; কিন্তু তাঁহারা মনে রাখিবেন যে প্রাতঃ স্বর্ষ্যমধ্যাহ্ন-স্বর্ষ্য অপেক্ষা বৃহত্তর না হইয়াও বৃহত্তর দেখায় এবং পণ্ডিতেরাও তাহার এই একমাত্র ব্যাখ্যাই দিয়া আসিতেছেন।

চকুঃ দ্বারা সংখ্যাজ্ঞানও জন্মে।

সংখ্যাজ্ঞান ও পরিমাণজ্ঞান উভয়ই একবিধ, অতএব পরিমাণ সম্বন্ধে দৃষ্টিভ্রম শেষ করিবার পূর্বে আমরা সংখ্যাসম্বন্ধে দৃষ্টিভ্রমের একটি উদাহরণ প্রদান করিব। উদাহরণটি অতিবিশ্বাস্যকর। নির্মল নৈশ নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে বোধ হয় যেন অসংখ্য তারকা উদ্ভিত হইয়াছে। বাস্তবিক যে সমস্ত তারকা আমরা দেখিতে পাই তাহা অসংখ্যও নহে, অধিক সংখ্যকও নহে, তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। অনিয়মে ইতস্ততঃ বিকিণ্ড থাকতেই এরূপ অধিক সংখ্যক বলিয়া বোধ হয়। দূরবীক্ষণের সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিলে তারকাসমূহ যে যথার্থই অসংখ্য তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু শুদ্ধ চক্ষে যে তারাগুলি দৃষ্ট হয় তাহার সংখ্যা অনধিক পঞ্চ সহস্র। আমরা নভোমণ্ডলের অর্দ্ধাংশ মাত্র দেখিতে পাই বলিয়া সার্ক দ্বিসহস্রের অধিক নক্ষত্র কখনও দৃষ্ট হয় না; তথাপি বিশৃঙ্খল ভাবে ইতস্ততঃ বিকিণ্ড থাকতে অসংখ্য বলিয়া বোধ হয়। দূরবীক্ষণের সাহায্য বিনা যে সমস্ত তারা দৃষ্টিগোচর হয় তাহা পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদেরা গণনা করিয়াছেন। আকার এবং উজ্জ্বলতা ভেদে উহা ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত।

১ম শ্রেণীর—২০

২য় শ্রেণীর—৬৫

৩য় শ্রেণীর—২০০

৪র্থ শ্রেণীর—৪০০

৫ ম শ্রেণীর—১১০০

৬ ঠ শ্রেণীর—৩১০০

৪২৮৫

এই তালিকাতে দৃষ্ট হইবে যে সমস্ত নভোমণ্ডলে চক্ষুর বিষয়ীভূত পঞ্চ সহস্রের অধিক নক্ষত্র নাই; তাহারও অর্ধেক অর্থাৎ সার্কি দ্বিসহস্র মাত্র একবারে দেখা যাইতে পারে।

চতুর্গতঃ, আকার সম্বন্ধে দৃষ্টি বিজ-  
মের উদাহরণ। চক্ষুঃ  $\frac{1}{2}$  অণুপল ( $\frac{1}{50}$  সে-  
কেণ্ড) পর্য্যন্ত দৃষ্ট পদার্থের সংস্কার রক্ষা  
করে অর্থাৎ পদার্থ অপসারিত হইলেও  $\frac{1}{8}$   
অণুপল পর্য্যন্ত উহা অনুভূত হইতে থাকে।  
বহ্লিমুখ একটা শলাকা বেগে ঘূর্ণিত ক-  
রিলে একটা বহ্লিচক্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।  
ইহা সকলেই দেখিয়াছেন এবং সকলেই  
জানেন যে চক্রের সমুদয় স্থানে বহ্লি নাই,  
বেগে ঘূর্ণিত হওয়াতে এরূপ দেখায়; মৃদু  
ঘূর্ণনে এরূপ দেখায় না। কত বেগে ঘূ-  
র্ণিত হইলে এরূপ দেখা যাইবে তাহা উ-  
পরোক্তসূত্রানুসারে সহজেই গণনা করা  
যাইতে পারে। অভিন্ন চক্র দৃষ্ট হইবার  
জন্য শলাকা প্রতি অণুপলে চারিবার (অ-  
র্থাৎ প্রতিসেকেন্ডে দশবার) ঘূর্ণিত হওয়া  
আবশ্যিক; বেগ অধিক হইলে হানি নাই,  
অল্প হইলে চক্র অভিন্ন হইবে না। এই  
সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া নানাপ্রকার  
খেলনা প্রস্তুত হইয়াছে। উহার একটীর

রূপান্তর আমরা প্রকটিত করিতেছি। ইহাকে  
নর্তকচিত্র (Waltzing figure) কহে।  
চক্রের প্রশস্ত পরিধিতে একটা মনুষ্য  
কিছু একটা বানর নানাভাবে চিত্রিত  
থাকে। চক্র বেগে ঘুরাইলে বোধ হয় মনুষ্য  
কিছু বানরটী নাচিতেছে। এক ভাবের  
চিত্র নয়ন হইতে অপসারিত হইবার  
সেকেন্ডের মধ্যেই যদি তৎপরবর্তী চিত্রটী  
নয়ন গোচর হয়, তাহা হইলে সর্বদাই দৃ-  
ষ্টিজ্ঞান হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ ভিন্ন  
ভিন্ন ভাবে চিত্রিত থাকিতে বোধ হয় যেন  
একটা চিত্রই আমরা দেখিতেছি এবং উহা  
নাচিতেছে।

প্রতিভন্ন কিরণমালাও আকার স-  
ম্বন্ধে ভ্রম জন্মাইয়া থাকে। কিরণমালা  
(প্রায়শই) সরল রেখায় গমন করে। ইহা  
অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। একখান  
তাসে একটা ছিদ্র করিয়া যদি বাহ্য বস্তু  
এবং চক্ষুর মধ্যে ধারণ করা যায়, তাহা  
হইলে ছিদ্র, চক্ষুঃ এবং বাহ্যবস্তু এক  
সরল রেখায় না হইলে বাহ্যবস্তু দৃষ্ট হইবে  
না। অর্থাৎ বাহ্যবস্তু হইতে আগত কিরণ-  
মালা সরল রেখায় আসিতে থাকে এবং  
ছিদ্র যদি ঐ সরলরেখায় স্থাপিত হয় তাহা  
হইলেই কিরণমালা ছিদ্র মধ্য দিয়া আ-  
সিতে পারে এবং দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে। তা-  
মের ছিদ্র অন্য কোন ভাবে স্থাপিত হ-  
ইলে কিরণমালার সরলগতি বন্ধ হয় এবং  
দৃষ্টি জ্ঞান হয় না। কিন্তু কিরণমালা যে  
সরল রেখায় গমন করে উহা কেবল এক-

বিধ পদার্থে। অর্থাৎ শুদ্ধ জলে কিম্বা শুদ্ধ কাচে, কিম্বা সমঘন বায়ুতে কিরণমালা সর্বদাই সরল রেখায় গমন করে। পক্ষান্তরে একবিধ পদার্থ হইতে অন্য বিধ পদার্থে, কিম্বা লঘু বায়ু হইতে ঘন বায়ুতে যাইতে কিরণমালা বক্র হইয়া অন্য সরল রেখায় গমন করে। ইহাকেই প্রতিভম্ব কিরণমালা কহে।

জলে প্রবিষ্ট হস্ত কিম্বা যম্বি কিরূপ বিকৃত দৃষ্ট হয়, তাহা সকলেই জানেন। জল হইতে বায়ুতে আসিতে কিরণমালা নিম্ন দিকে প্রতিভম্ব হয়, এই জন্য দৃষ্ট পদার্থের আকার বিকৃত বোধ হয় এবং স্বাভাবিক স্থান হইতে উচ্চতর স্থানে আছে বলিয়া অনুভূত হয়। শেষোক্ত বিয়েরের একটি সুন্দর এবং অতি সহজ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। একটি পাত্রে একটি মুদ্রা রাখিয়া এরূপ স্থানে বসিতে হয় যে আর মুদ্রাটী দেখা যায় না, একটু নিকটে আসিলেই দেখা যাইত। এরূপ স্থানে বসিয়া যদি পাত্রটী জলপূর্ণ করা যায় তাহা হইলে মুদ্রাটী দৃষ্টিগোচর হয় অর্থাৎ কিরণমালা জল হইতে বায়ুতে আসিতে প্রতিভম্ব হইয়া নরনে পতিত হয় এবং এই জন্য মুদ্রাটী স্বাভাবিক স্থান হইতে উচ্চতর স্থানে আছে বলিয়া অনুমিত হয়। অতিপ্রাতে এবং অতি সায়াহ্নে যে আমরা সূর্য দেখিতে পাই এবং তৎপ্রতি অনুব্রনননে দৃষ্টিপাত করিতে পারি তাহারও কারণ এই। তখন সূর্য্য বাস্তবিক অন্তর্গত থাকে; প্রতিভম্ব কিরণ

মালায় গঠিত সূর্য্যের বিম্ব মাত্র আমরা দেখিতে পাই। বায়ু স্তরে স্তরে ঘনতর অর্থাৎ উপরিস্থিত বায়ু হইতে নিম্ন স্থানের বায়ু ঘনতর এবং নিম্নতর স্থানের বায়ু তদপেক্ষা ঘনতর। বায়ুর স্তরে স্তরে প্রতিভম্ব হওয়াতে সূর্য্যের কিরণমালায় গতি ক্রমশঃ নিম্নদিকে হইতে থাকে। এইজন্য বোম্বয়ান সাহায্যে উর্দ্ধে না উঠিলে আমরা যে সূর্য্য দেখিতে পাইতাম না, ভূমিতে থাকিয়াই তাহা দেখিতে পাই এবং অস্প-সংখ্যক কিরণমালা প্রতিভম্ব হইয়া নরনে পতিত হয় বলিয়া সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না।

পঞ্চমতঃ। দূরতা এবং স্থান সম্বন্ধে দৃষ্টি বিভ্রমের উদাহরণ। পরিমাণ সম্বন্ধে দৃষ্টিবিভ্রমের মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে, অনেক সময়ে দূরতা তুলনা করিয়া আমরা পরিমাণ জ্ঞান লাভ করি। আবার জ্ঞাত পদার্থের পরিমাণ তুলনা করিয়া অনেক সময়ে দূরতা সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। যদি একখানি চিত্র পটে দুইটী পূর্ণবয়স্ক মনুষ্য অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে যেটী ক্ষুদ্রতর সেটী আমাদের হইতে দূরতর স্থানে রহিয়াছে, আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করি। মায়া প্রদীপ ( magic lantern ) অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে সরাইলে পটনিকিণ্ড বিষ ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ হইয়া থাকে এবং পটস্থ পদার্থ কিম্বা প্রাণী সমূহ অগ্রসর হইতেছে কিম্বা পশ্চাগমন করিতেছে বলিয়া আমাদের মনে ভ্রম জন্মে।



প্রতিভা কিরণমালা যে রূপ পদার্থ সমূহকে বিরূত দেখায় সেইরূপ তাহাদের দূরতা এবং স্থান সম্বন্ধে ভ্রম জন্মাইয়া থাকে। মরীচিকা বা মৃগতৃষ্ণিকা ইহার সুন্দর উদাহরণ। বায়ু উষ্ণ ভূভাগের সহিত সংলগ্ন হইলে তাপ-সাম্য হেতু উষ্ণ হয় এবং উষ্ণ হইলেই লঘু হয়। মরুভূমি অত্যন্ত উষ্ণ এইজন্য মরুস্পর্শ বায়ু অত্যন্ত লঘু। উপরিস্থিত বায়ু তদপেক্ষা গুরুতর। এই লঘু এবং গুরু বায়ুর স্তরে স্তরে কিরণমালা প্রতিভা হওয়াতেই এক স্থানের পদার্থ অন্য স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং অনভিজ্ঞ পথিক নির্দাক্ষণ ভ্রমে পতিত হয়।

দৃষ্টিবিভ্রমের পঞ্চ প্রকারেরই নানা উদাহরণ দেওয়া হইল। বাস্তব ভয়ে এবিষয়ের আর একটি মাত্র উদাহরণ দিয়াই আমরা অন্যান্য ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের ভ্রম দেখাইতে চেষ্টা করিব। “কাটামুণ্ড কথা কয়” ইহা অনেকে দেখিয়াছেন। লেখকের একজন বন্ধু একবার কাটামুণ্ড দেখিতে গিয়াছিলেন। দেখা গেল যে একটি টেবলের মধ্যস্থানে একটা মাথা রাখা কহিতেছে। গলা পর্যন্ত টেবলের উপরে; টেবলের নীচে দৃষ্টি করিলে বোধ হইল যে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছে কিন্তু মুণ্ডের শরীর দৃষ্ট হইল না। কিয়ৎকাল সাবধানে দর্শন করিলে বুঝা গেল যে, টেবলের নীচে দুইখানি দর্পণ ত্রিভাঙ্গভাবে এমন স্তম্ভরূপে স্থাপিত যে

দর্পণ আছে বলিয়া শীঘ্র বোধ হয় না। ত্রিভাঙ্গভাবে স্থাপিত হওয়াতে সমুখস্থ পদার্থসমূহ প্রতিকলিত না হইয়া, দর্পণ দুইখানিতে পার্শ্বস্থ পদার্থসমূহ এরূপ প্রতিকলিত হইয়াছে যে, সাধারণতঃ বোধ হয় টেবলের নীচ দিয়া অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছে; এই দর্পণদ্বয়ের অন্তরালে কাটামুণ্ডের শরীর লুকায়িত। দর্পণ দুইখানি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সহিত স্থাপিত তাহা বলা বাহুল্য। হয় ত অনেক পাঠক, যাহারা “কাটামুণ্ড” দেখেন নাই, তাহারা মনে মনে বলিতেছেন “এত টুকু বুদ্ধিও কি দর্শকদিগের নাই যে এইটা বুঝিতে পারে”। তাহাদিগকে আমরা দুর্বোধ্যনের কথা স্মরণ করিতে বলি। দুর্বোধ্যন বুদ্ধিতির রাজস্ব যজ্ঞে দর্পণ বুঝিতে না পারিয়া কিরণ লজ্জায় পতিত হইয়াছিলেন তাহা একবার মনে কখন। আরও বলি কলম্বুসের সঙ্গীরা কেহ ডিম বসাইতে পারিল না, কিন্তু তিনি বসাইয়া দিলে সকলেই বলিতে লাগিল যে ঐরূপে তাহারাও পারিত। কলিকাতায় যে সকল বিদেশী ঐশ্বর্যালিকেরা প্রতি বৎসর আগমন করে, তাহাদের অনেক কৌশলই দৃষ্টিবিভ্রমেরই উপর নির্ভর করে।

পাঠক এযাবৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের নানাবিধ ভ্রমপ্রদান দেখিলেন। এইরূপ নাসিকা, জিহ্বা এবং স্পর্শেন্দ্রিয়ও মধ্যে মধ্যে ভ্রমে পতিত হইয়া থাকে। জ্ঞানলাভ সময়ে যদি ইন্দ্রিয় অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে

কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকে, তাহা হইলে বাহ্যবিষয়ে ভ্রম হয়। নাসিকা বন্ধ করিয়া যদি দাকচিনি চর্ষণ করা যায় তাহা হইলে সাধারণ দেবদাক কাষ্ঠ চর্ষণ করা যাইতেছে বোধ হইবে। কেবল দাকচিনি সম্বন্ধেই যে এইরূপ তাহা নহে; নাসিকা বন্ধ করিলে অনেক পদার্থেরই স্বাদ পাওয়া যায় না। এই জন্য শিশুদিগকে অপ্রিয় ভেষ্যাদি খাওয়াইতে নাসিকা বন্ধ করিয়া লওয়া উচিত। ভিন্ন কিম্বা বিপরীত স্বাদের দুইটি পদার্থ যদি উপস্থাপিত আশ্বাদন করা যায়, তাহা হইলে ক্রিয়াকালপরেই দুইটিই একরূপ বোধ হইবে, উহাদিগের পার্থক্য অনুভব হইবে না। যদি চক্ষুঃ বন্ধ করিয়া তরু এবং ক্রেটেট মুরা উপস্থাপিত আশ্বাদন করা যায় তাহা হইলে কএক বারের পরে উভয়ই একবিধ বোধ হইবে, আশ্বাদের কোন পার্থক্য অনুভূত হইবে না।

ইন্দ্রিয় মধ্যে নাসিকা সর্বাপেক্ষা ক্ষীণতেন্দ্র। অপ্পারাসেই নাসিকা স্ব-কার্য সাধনে অক্ষম হইয়া পড়ে। সর্বদা তীব্রবর্ণের নানাবিধ পদার্থ দর্শন করিয়াও নয়ন কার্যকুশল থাকিয়া যায়, কিন্তু অতাপ্পসময় মাত্র উগ্র গন্ধ অনুভব করিলে নাসিকা আর কোন গন্ধের উপলব্ধি করিতে পারে না। মৃদু মিষ্ট গন্ধও অপ্প সময়মাত্র উপভুক্ত হইতে পারে। গোলাপ জল ও আতর প্রভৃত্য করিবার জন্য প্রাপ্ত ক্ষেত্রসমূহে গোলাপ

রস্করাজি রোপিত হয়। যাহারা এই গোলাপক্ষেত্রে বাস করে তাহারা উহার আমোদলহরী উপভোগ করিতে সক্ষম হয় না। যাহারা সর্বদা স্নানোদ্ভি ত্রব্য ব্যবহার করে, তাহাদের ব্যবহারই সার; ভোগ পার্থক্য ব্যক্তিগণের হয়।

নয়ন দ্বারা সর্বাপেক্ষা অধিকতম জ্ঞানলাভ হয় বটে, কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয় উহা অপেক্ষাও বিশ্বাস্য। পাশ্চাত্য ভূতের \* আবির্ভাব হইল; লোকে সহসা বিশ্বাস করিতে চাহিল না। ক্রুক সাহেব মহা বৈজ্ঞানিক। তিনি সংকল্প করিলেন স্পর্শ করিতে না পারিলে বিশ্বাস করিবেন না। ভূতেরা তাহাতেই স্বীকার। ক্রুক সাহেবকে তাহাদের শরীর স্পর্শ করিতে দিল। তদবধি ক্রুক সাহেব ভূতবিশ্বাসী। এইরূপে দেখা যাইবে যে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রমাণ পাইলেও যে বিষয়ে বিশ্বাস হয় না, স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রমাণ সে বিষয়ে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু স্পর্শেন্দ্রিয়ের প্রমাণও ভ্রমশূন্য নহে। বিশেষতঃ

\* পাশ্চাত্য সকল বিষয়ই যে সমগ্রগণের প্রাচ্য বিষয় অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ইহা একটা আধুনিক স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ( spirit ) কে ভূত বলিতে অনেকে চটিতে পারেন। যাহা হউক আমরা এই প্রবন্ধে পাশ্চাত্য ভূতে বিশ্বাস করা না করা সম্বন্ধে কিছুই বলিতেছি না। সময়ান্তরে এবিষয়ে আমাদের মত একটি কবির ইচ্ছা রহিল।

উহা প্রায়শই অবহিত জ্ঞানোৎপাদনে অক্ষম। দুইটি পদার্থ হস্ত দ্বারা পরিমাণ করিলে অনেক সময়ে কোনটি ঊষ্মতর তাহা বুঝা যায় বটে কিন্তু একটি অপরিচিত কত গুণ ভারী তাহা নির্দেশ করা যায় না, এবং প্রায় সমভারী হইলে কোনটি ঊষ্মতর তাহা নির্দেশ করা কঠিন। তাপ বিষয়েও এইরূপ। দুইটি পদার্থের কোনটি ঊষ্মতর তাহা কখন কখন নির্দেশ করা যায় বটে কিন্তু একটির তাপ অপরিচিত তাপের কত গুণ তাহা নির্দেশ করা যায় না এবং প্রায় সমতাপ দুইটি পদার্থের কোনটি ঊষ্মতর তাহা নির্দেশ করা কঠিন। এমন কি তাপ বিষয়ে অনেক সময়ে স্পর্শেষ্ট্রিয়ের প্রমাণ অতিব্রজমস্কুল। শরীরের তাপ সর্বদেশে এবং সর্বস্থানেই শতকীয় বিভাগের ৩৬ ডিগ্রি। যদি বস্ত্র, কাষ্ঠ এবং প্রস্তর এই তিনটি পদার্থ শরীর অপেক্ষা হিমতর হয় এবং যদি তাহাদের তাপ সমান হয়, তাহা হইলে বস্ত্র অপেক্ষা কাষ্ঠ এবং কাষ্ঠ অপেক্ষা প্রস্তর হিমতর বোধ হইবে। এই জন্য শীতকালে কাষ্ঠ এবং প্রস্তর বস্ত্রাপেক্ষা হিমতর বোধ হয়। আবার বিজ্ঞানার চন্দ্র কিম্বা নাদা পিরণ, লেপ কিম্বা ফ্লানেন অপেক্ষা হিমতর বোধ হয়। ইহার কারণ এই যে, বস্ত্র ফ্লানেল কিম্বা তুলা অপেক্ষা অধিকতর তাপপরিচালক, তদপেক্ষা কাষ্ঠ এবং তদপেক্ষা প্রস্তর। শরীরের তাপ যে পদার্থ যত পরিমাণে চালান করে

তাহা তত শীতল অনুভূত হয়। আবার রৌদ্রস্থিত তপ্ত বস্ত্র, কাষ্ঠ এবং প্রস্তরের মধ্যে প্রস্তর ঊষ্মতম বোধ হয়। কারণ উহা শীতল হইলে যত্রপ সর্বাপেক্ষা অধিকতম তাপ শরীর হইতে গ্রহণ করে, ঊষ্ম হইলে তত্রপ সর্বাপেক্ষা অধিকতম তাপ শরীরে প্রদান করে; কাষ্ঠ প্রস্তর অপেক্ষা অপ্ততর তাপ প্রদান করে বটে, কিন্তু বস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর তাপ প্রদান করে, এই জন্য বস্ত্র অপেক্ষা ঊষ্মতর এবং প্রস্তর অপেক্ষা হিমতর অনুভূত হয়। গ্রীষ্মকালে যদি বায়ু শরীর অপেক্ষা হিমতর থাকে, তাহা হইলে পাখা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিলে শীতলতা অনুভূত হয়। গাত্রস্পৃষ্ট বায়ু তাপসাম্য হেতু গাত্র হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া গাত্রের সমান ঊষ্ম হইতে চায়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ নবীকৃত হইলে তত ঊষ্ম হইতে পারে না, সুতরাং শীতল বোধ হইয়া থাকে। পাকান্তরে যদি বায়ু শরীর অপেক্ষা ঊষ্মতর হয়, তাহা হইলে পাখা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিলে পুনঃ পুনঃ ঊষ্মতর বায়ু গাত্রসংলগ্ন হওয়াতে গ্রীষ্মাধিকা হইয়া থাকে। স্পর্শেষ্ট্রিয় মধ্যে মধ্যে সংখ্যাজ্ঞান সহজ্ঞেও ভ্রম জন্মাইয়া থাকে। তর্জনী অঙ্গুলির উপরে মধ্যমা অঙ্গুলি তুলিয়া, চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া যদি ঐ দুই অঙ্গুলি দ্বারা একটি মটর কিংবা তত্রপ কোন একটি ক্ষুদ্র পদার্থ স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলে বোধ হইবে যে দুইটি পদার্থ রহিয়াছে।

ইন্দ্রিয় স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকিলে যে এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইয়া থাকে, তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। চক্ষুর নীচে বল পূর্জক অঙ্কুলি বসাইলে সকল দৃষ্ট পদার্থই যে দুইটি দুইটি বোধ হয়, তাহাও এইরূপ ইন্দ্রিয়ের স্বস্থানচ্যুততার জন্য ঘটিয়া থাকে।

আমরা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কএকটি ভ্রম দেখাইয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। রাত্রিতে রিতলগৃহবাসী ভয়ানক ব্যস্তিরা নিম্নতলের শব্দাদি ছাদে হইতেছে ভাবিয়া ভূতভয়ে কিরূপ আড়ষ্ট হয়, তাহা অমেকেই অবগত আছেন। প্রতিশব্দ দ্বারা বহুসংখ্যক ভ্রম উৎপাদিত হয়। দূরে প্রতিঘাতী কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকিলে শব্দতরঙ্গ তাহাতে প্রতিহত হইয়া পুনর্বার কর্ণে প্রবেশ করে। বোধ হয় যেন দূরে আর একটি শব্দ হইল। নদীর একতীরে যদি একটি কুকুর শব্দ করে, অপর তীরে তাহার প্রতিশব্দ হয় এবং বোধ হয় যেন আর একটি কুকুর অপর তীর হইতে ডাকিল। কুকুর ভ্রান্ত হইয়া অপর তীরস্থ কুকুরের সহিত বিরোধ করিবার আশয়ে ব্যস্ত হইয়া ডাকিতে থাকে।

প্রতি গুণপলে দুই অক্ষর অর্থাৎ প্রতি

সেকেণ্ডে পাঁচ অক্ষর উচ্চারিত এবং শ্রুত হইতে পারে এবং শব্দ প্রতি গুণপলে ৩০০ হস্ত অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ৭৫০ হস্ত ভ্রমণ করে। অতএব যদি ৭৫ হস্ত দূরে উচ্চ প্রাচীর কিংবা অন্য কোন প্রতিঘাতী পদার্থ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে শব্দতরঙ্গ গমনাগমনে ১৫০ হস্ত ভ্রমণ করে তাহাতে অর্ধপল সময় লাগে। অতএব কোন কথা কহিলে শেষ অক্ষর উচ্চারণ হইবার এবং শব্দ প্রতিহত হইয়া প্রতিগমন করিবার মধ্যে অর্ধপল সময় অতিবাহিত হয়; তাহাতে এক অক্ষর শ্রুত হইতে পারে। এরূপস্থলে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে “করিবে না” প্রতিশব্দ, উত্তর করিবে “না”। প্রাচীর কিংবা ভ্রূপ প্রতিঘাতী পদার্থ যদি ১৫০ হস্ত দূরে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে শেষ দুই অক্ষর পুনরায় স্পষ্ট শ্রুত হইবে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে “এখানে কি কেহ আছে?” প্রতিশব্দ উত্তর করিবে “আছে”। ২২৫ কিয়ৎ ৩০০ হস্ত দূরে প্রতিঘাতী পদার্থ থাকিলে শেষ তিন কিংবা চারি অক্ষর পুনরায় স্পষ্ট শ্রুত যাইবে। প্রতিশব্দের এই গুণের উপর নির্ভর করিয়া নানা ভাষার গদ্য পদ্যময় বহুবিধ সাহিত্যরত্ন রচিত হইয়াছে।

## খণ্ড কবিতা। \*

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা পরম্পর-নি-  
রপেক্ষ কবিতানিচয়কে লক্ষণভেদে যু-  
ক্তক, কুলক, কোষ, সংঘাত প্রভৃতি বিবিধ  
সংজ্ঞা দিয়াছেন, এবং ইতিহাস-কথাক্রিত  
অষ্টাধিক সর্গসম্বন্ধিত কাব্যগ্রন্থকে মহা  
কাব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আমরা  
এই প্রবন্ধে পরম্পর সম্পর্কশূন্য কবিতা  
মাত্রকেই সাধারণতঃ খণ্ড কবিতা বলিয়া  
নির্দেশ করিব, এবং কাব্যের সর্গ-সংখ্যা  
ঠিক অষ্টাধিক না হইলেও যদি উহার আদি  
অন্ত মধ্য সর্বত্র কোন একটি ঐতিহাসিক  
কাহিনীর সূত্রবন্ধন থাকে, তাহা হইলেই  
উহাকে আমরা মহাকাব্য বলিয়া গণনায়  
আনিব। পলাসির যুদ্ধ কাব্যে সর্গ-  
সংখ্যা আটের অধিক নহে, উহার অধি-  
নায়কও দেবতা কিংবা শাস্ত্রসম্মত ক্ষত্রিয়  
নহেন, এবং সর্গে সর্গে ছন্দোবন্ধনেরও  
বৈচিত্র্য নাই, তথাপি উহা মহাকাব্য; আর  
কবিকাহিনী কি অবসর-সরোজিনী প্রভৃ-  
তিতে বহুবিশয়ের বর্ণনা, বহুরসের অবতা-

রণা এবং বহুবিধ ছন্দের রচনা থাকিলেও  
এগুলি খণ্ডকাব্য।

আমাদিগের বিবেচনায় মহাকাব্য র-  
চনায় যে শক্তির পরীক্ষা ও পরিচয় হয়,  
খণ্ডকাব্যরচনায় তাহা কখনও হইতে পারে  
না। খণ্ডকাব্যের কবি আপনার ভাবে  
আপনি বিভোর, আত্মকথা লইয়াই ব্যস্ত।  
তঁাহার কবিতা হুঃখের গীত, কি হর্ষের উ-  
চ্ছ্বাস। উহাতে শুদ্ধ কবিস্বদয়ই প্রতী-  
বিম্বিত হয়, কিন্তু মানবহৃদয়রূপ অমন্ত  
জগতের প্রতিবিম্ব প্রতিকলিত হয় না।  
কবি প্রণয়ে নিরাশ হইয়া প্রীতির মর্ম্ম-স্থলে  
আঘাত করেন, প্রণয়ে প্রতারণিত হ-  
ইয়া মনুষ্য জাতিকেই শঠ, কপট, নি-  
র্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া বাস্পাগাদাদ ক্রুদ্ধকণ্ঠে  
তিরস্কার করিতে থাকেন। মহাকাব্যের  
কবি আত্মচিন্তারহিত, আত্মবিস্মৃত এবং  
আপনা হইতে দূরে অবস্থিত। তঁাহাকে  
তঁাহার কাব্যে আমরা দেখিতে পাই না।  
তঁাহার মূখ্য হুঃখ হর্ষ বিবাদ, তঁাহার মূণ

\* ১। মানস বিকাশ। কলিকাতা প্রাচীন ভারতযজ্ঞে মুদ্রিত।

২। কবিকাহিনী। জ্বীনেশচরণ বন্দ্র প্রণীত।

৩। পুষ্পমালা। জীবুজ শিবনাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী এম, এ, প্রণীত।

৪। অবসর সরোজিনী। জীর্বাঙ্কর রায় বিরচিত।

৫। বনহুম্মম। কলিকাতা ইন্টাইগুয়া প্রেসে মুদ্রিত।

৬। অবকাশ গাথা। জীবজয়কর বন্দ্র প্রণীত।

তাঁহার ঘেষ, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বি-  
লুপ্ত হয় এবং তিনি পরের প্রাণে আপ-  
নার প্রাণ ঢালিয়া দিয়া, পরের হৃদয়কে  
আপনার করিয়া, একেবারে সর্বময়ত্ব  
লাভে যত্নপর হন। তাঁহার ভাষা তীমের  
জ্বল্লাম করকাভিষাতেয় নায় গর্জ্জন  
করে, \* স্রোতদীর অভিমানপূর্ণ উদ্বেল অ-  
ন্তরে ক্রোধ-তরঙ্গের নায় উথলিয়া উঠে,  
রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখে “সহসা বিদদীত ন  
ক্রিয়াম্,” ইত্যাদি সদর্থযুক্ত হিতকথা ক্ষরণ  
করিতে থাকে, এবং প্রকৃতির সায়স্তন  
শোভামুগ্ধ দিব্যাজনাদিগের ক্ষুরিতাধরে  
শৈল-প্রস্থবাহিনী প্রোতস্থিনীর নায়, অথবা  
প্রেম কি বিরহের কণ্ঠধ্বনির নায়, আপনার  
ভরেই ঢলিয়া ঢলিয়া পড়ে।

বাজালা ভাষা এইক্ষণ খণ্ড কবিতার  
পরিপ্লাবিত। এদেশে মনুষ্যের সংখ্যা যত,  
বোধ হয় এইক্ষণ কবির সংখ্যাও প্রায়  
তত হইয়াছে। বালকেরা শব্দসময় কিংবা  
দন্তোদ্ভেদ না হইতে হইতেই “প্রেমসি আ-  
য়ার” বলিয়া কবিতা লিখেন; যুবজনেরা  
পার্বির ভোগে বীতরাগ হইয়া ওপোবন,  
উদাসীনতা এবং বৈরাগ্যের গুণ গান ক-  
রেন, অর্দ্ধ প্রাচীন বিষয়ী ব্যক্তির কবিতা  
লিখিয়া রসিকতার পরিচয় দেন; আর  
কাহ্নকেও স্মৃতি করিতে হইলে অথবা  
নিন্দা করিতে হইলে, ভূগোলের বিজ্ঞাপন  
লিখিতে হইলে অথবা ব্যাকরণের উপসং-  
হার লিখিতে হইলে, অধিক আর কি,—

\* যথা মহাকাব্য কীরাতাজর্জুনির।

কিছু না লিখিতে হইলেও আধুনিক, বহু-  
বাসী দেবী বীণাপাণির ত্রিলোকভ্রমভ  
দ্বারাবা পদ্যবিদ্যে আশ্রয় লন।

বর্তমান বাজালা সাহিত্যের এই অব-  
স্থাকে অনেকে দেশের সৌভাগ্য বলিয়া  
মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে, যুগান্তের  
আরাধনাতেও যে ফল না ফলে, যদি কোন  
দেশের সপত্র, নিষ্পত্র, মজীব, নিজীব,  
সমস্ত পাদপাই সেই ফলে পরিশোভিত হয়,  
তবে ইহাকে সৌভাগ্য লক্ষণ না বলিয়া  
আর কি নামে উল্লেখ করিব? কিন্তু দুঃখ  
এই, অশিক্ষিত হৃদয় যে সকল কথার প্রোত-  
রিত হয়, শিক্ষিত বুদ্ধি অনেক সময়েই তাহা  
প্রলাপ বাকা বলিয়া অগ্রাহ্য করে, এবং  
হৃদয় যে সকল আপাত-মনোরম স্রোত  
দৃশ্যে বিমোহিত হয়, বুদ্ধির কঠোর দৃষ্টি  
প্রায়শঃই তাহার মর্ষোদ্ভেদ করিয়া এক-  
বারে বস্তুর প্রকৃত অবস্থার পরীক্ষা লইতে  
থাকে। চিত্তাক্ষম বুদ্ধিমান ব্যক্তির উল্লি-  
খিত কাব্যপ্লাবন কিংবা পদ্যপ্লাবনের ক-  
একটি কারণ নির্দেশ করেন। এই কারণ  
গুলি আমাদের নিকটও নিত্যন্ত কল্পিত  
বলিয়া বোধ হয় না।

ইহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি,  
এবং পাঠকস্বর্গও একটুকু চিন্তা করিলেই  
স্বীকার করিবেন যে, বঙ্গে এই কবিতা বৃষ্টির  
এক কারণ বাজালির জ্বর-প্রকৃতি।  
বর্তমান সময়ের বাজালিকে যদি কিছুই স-  
হিত তুলনার আনা যায়, সেই তুলনামূল  
জ্বর। জ্বর যেমন বসন্ত-বাহু-হিমোলে

ফুলে ফুলে বিচরণ করে, ফুলে ফুলে মধু  
আহরণ করে, এবং স্রুথে দুঃখে সকল স-  
ময়েই গুণ গুণ ধনি করে, বঙ্গবাসীও ই-

নীে সেইরূপ হৃদয়গত ভাবের হিসোল  
ফুলে ফুলে বিচরণ করেন, ফুলে ফুলে মধু  
আহরণ করেন, এবং স্রুথে দুঃখে সকল স-  
ময়েই গুণ গুণ ধনি করিয়া চিত্ত বিনোদনে  
যত্ন করেন। তাঁহার স্বেচ্ছা নাই, তাঁহার  
গাভীরা নাই, কিছুতেই মনঃসন্নিবেশে  
তাঁহার ক্ষমতা নাই, এবং একটুকু উদ্ধে যে  
উভীন হইবেন, তাঁহার দুর্বল পক্ষপটেও  
এমন সামর্থ্য নাই। তিনি সর্ব্বাংশেই একটি  
ভ্রমর। যে দেশের লেখক এইরূপ ভ্রমর,  
পাঠক এইরূপ ভ্রমর, সে দেশে ভ্রমর-গীতি  
ভিন্ন আর কোন গীত স্রুতিগোচর হইবে,  
বল। ভারত-বিখ্যাত রঘুনাথ শিরোমণি  
বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন এবং বঙ্গবন্ধেই  
দালিত, পালিত, শিক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত  
হইয়াছিলেন। প্রবাদপরম্পরায় এইরূপ  
কথিত হইয়া থাকে যে, তিনি সূর্য্যের অ-  
ভ্যাস হইতে সূর্য্যের অন্তগমন পর্য্যন্ত কোন  
একই বিষয়ের চিন্তায়, পরমার্থ-চিন্তাময়  
তাপসের ন্যায়, একবারে নিমগ্ন হইয়া থা-  
কিতে পারিতেন। আধুনিক বঙ্গে কা-  
হাকে কি প্রহর কালও কোন একই ভ-  
বের চিন্তায় গাঢ়মগ্ন দেখিয়াছ? যদি  
দেখিয়া থাক, তবে তাহা দৃষ্টবিভ্রম।  
বাজালি এইকণ চিন্তা-বিমুখ, পরিভ্রম-বি-  
মুখ, ক্রেশ-বিমুখ। কালের তরঙ্গে ভা-  
সিয়া, আপনা হইতে বাহা গারে আসিয়া

না চৈকিল, সে তাহা উপার্জন করিবার  
জন্ত যত্নপর হইবে না।

বঙ্গীয় সাহিত্য যে সমুচিত বিকাশের  
পূর্বেই বিকার প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার আর  
এক কারণ বাঙ্গালির অসহিষ্ণুতা। অ-  
সহিষ্ণুতাকে অনেকে সামান্য দোষ ব-  
লিয়া মনে করেন, কিন্তু আমাদের বি-  
বেচনায় পুঙ্খবশের পুঙ্খবাস্থ্যধনে অসহি-  
ষ্ণুতার ন্যায় প্রতিবন্ধক আর নাই। যদি  
অসহিষ্ণুতাদোষে অধঃপাত না ঘটত, তবে  
বাজালি এতদিনে পৃথিবীর জাতীয় সমাজে  
অতি গৌরবের আসন গ্রহণ করিত, সন্দেহ  
নাই। কিন্তু এক অসহিষ্ণুতাই তাহার অশেষ  
আশার মুলোচ্ছেদ করিতেছে। ইউরোপ  
ও আসিয়ায় কোন্ জাতি বাঙ্গালির ন্যায়-  
যশোলালসার অধীন? বাঙ্গালির হৃদয়-  
যন্ত্র নিত্যন্ত স্নেহ ইয়া পড়িলেও যশো-  
লিপ্সা উহাতে অনির্ব্বচনীয় তাড়িত বেগ  
প্রদান করিতে পারে; বাঙ্গালির প্রাণ  
একবারে যখন দেহ ছাড়িয়া দেয়, যমুনার  
উজান জলে বংশীধ্বনির ন্যায়, যশের মৃদু-  
মোহন ধ্বনি, অন্ততঃ কণকালের জন্য হইলেও,  
উহাকে ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হয়। যে  
জাতি এইরূপ যশোলিপ্সু, সেই জাতির  
অবশ্যই নিত্যন্ত যশস্বী হওয়া সম্ভব, এবং  
যশস্কর কার্য্যসম্পাদনে তাহার অটল উৎ-  
সাহ থাকাই উচিত। কিন্তু বাঙ্গালির  
তাহা হয় না। তাহার অসহিষ্ণুতা তাকে  
যশঃসঞ্চয়ের পুঙ্খপাশ পথেও কণকাল  
তিষ্ঠিয়া থাকিতে দেয় না। অন্যান্য দে-

শের গ্রন্থকারেরা বয়সের একাধিক অধায়নে  
 যাপন করিয়া এবং বহু দিন চিন্তায় ডুবিয়া  
 রহিয়া গ্রন্থরচনায় প্ররক্ত হন। কিন্তু বা-  
 ঙ্গালির আকাঙ্ক্ষা ও তৃষ্ণা এককাল অ-  
 তৃপ্ত রহিতে পারে না। সুতরাং শিক্ষিত  
 হইবার পূর্বেই বাঙ্গালি, গ্রন্থকার;—  
 এবং কাব্য কাহাকে বলে তাহা হৃদয়ঙ্গম  
 হইবার পূর্বেই বাঙ্গালি, কবি!

ক্রমিক অধোগতির এত কারণ সত্ত্বেও  
 যে আমরা বহুক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে প্ররক্ত কবিতার  
 রসান্বাদে অধিকারী হই, ইহা সামান্য  
 আত্মাদের বিষয় নহে।—আমরা ইতঃ-  
 পূর্বে পাঠকবর্গের নিকট কতিপয় উৎকৃষ্ট  
 কাব্যের পরিচয় দিয়াছি। আমরা আজ  
 যে এককথানি কবিতা সংগ্রহ উপলব্ধ  
 করিয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি,  
 তাহাও সর্বথা কাব্য নামেরই উপযুক্ত  
 এবং আর কিছু না হউক, বাঙ্গালার অ-  
 যুতকোটি খণ্ড কবিতা হইতে একটুকু দূরে  
 স্থান পাইবার যোগ্য।

কোন এক ছলগ্রাহী কবি ভগবান  
 পানিনিিকে এই বলিয়া তিরস্কার করিয়া-  
 ছেন যে, যে সকল বস্তু একস্থানে প্রাপ্ত  
 হইলে নিত্য অনসিকতার পরিচয় দেয়,  
 তদীর অকোষায়ীর অনেক স্থলেই তাদৃশ  
 বহুবিধ বস্তু একস্থানে প্রাপ্ত রহিয়াছে।  
 মানস বিকাশ, কবিকাহিনী, অবসর সরো-  
 জিনী, পুষ্পমালা, বনকুম্ম এবং অবকাশ  
 গাথাকে একই প্রবন্ধে নিবদ্ধ এবং এ-  
 কত্র প্রাপ্ত দেখিয়া আমাদিগকেও অ-

নেকে ঐরূপ অরসিক বলিতে পারেন।  
 কিন্তু ফলতঃ আমরা তাদৃশ অপবাদে  
 বিষয় নহি। আমরা এই ছলগ্রাহি কা-  
 ব্যকে গুণ-গরিমান সমান বলিয়া স্বীকার  
 করি না। পুষ্পমালার রচনায় আমরা যে  
 রূপ পরিপকতা, প্রগাঢ়তা, যে রূপ সাব-  
 ধানতা ও মূললিত পদবিন্যাস দেখিতে  
 পাই, অবসরসরোজিনী কি বনকুম্মে তাহা  
 দেখিতে পাই না; এবং আমরা কবিকাহি-  
 নীতে কাব্যের যে রূপ বৈদ্যুত-স্পর্শ অনুভব  
 করি, পুষ্পমালা কি মানসবিকাশেও তাহা  
 অনুভব করিতে পাই না। রূপের সহিত রূপে,  
 লাভগোঁড় সহিত লাভগোঁড় কি রূপ বিভিন্নতা  
 আছে, পাঠকবর্গ তাহা জানেন। রসগত  
 মাধুর্য্যও সেইরূপ বিভিন্নতা আছে। এই  
 কাব্য সংগ্রহের প্রত্যেক খানিই রসমা-  
 ধুর্য্য বিশিষ্ট, এই অংশে ইহার পরস্পর স-  
 মান, অগত স্বাদগত পার্থক্যে ইহার একথা-  
 নির সহিত আর একখানির তুলনা হয় না।

কাব্যের প্রধান গুণ দুই, সৌন্দর্য্যের  
 স্রষ্টি আর উদ্দীপনা। ইহা পূর্বেই প্রকা-  
 রান্তরে বলা হইয়াছে যে, খণ্ড কবিতায়  
 মানব-প্রকৃতিগত পূর্ণ সৌন্দর্য্যের চিত্র-  
 দর্শন অসম্ভাবিত; কিন্তু খণ্ড কবিতায় ব-  
 হিঃপ্রকৃতির সর্ববিধ সৌন্দর্য্যই অনায়াসে  
 চিত্রিত হইতে পারে; এবং কবির শক্তি  
 থাকিলে তিনি উহাতে উদ্দীপনার উগ্র ম-  
 দিয়াও অনায়াসে ঢালিয়া দিতে পারেন।  
 উদ্দীপনা বিষয়ে বজ্র দুই তিনটি অভিনব  
 কবির উপমাগুলি নাই, আমরা তাঁহা-



দিগের পরই বাবু দীনেশ চরণ বসুর নামো-  
লেখ করিতে পারি । দীনেশ বাবুর লেখা  
মক্ষ-ম্পর্শিনী, মৃত-সঞ্জীবনী । তিনি যে প-  
রিমাণে মানকতা জন্মাইতে পারেন, যদি  
তদীয় লেখায় সেই পরিমাণে প্রগাঢ়তার  
পরিচয় দিতে পারিতেন, তবে তাঁহার ব-  
রসের অপ্পত্তা বিস্মৃত হইয়াও আমরা তাঁ-  
হাকে প্রবীণ বলিয়া পূজা করিতে সম্মত  
হইতাম । তাঁহার “উদাসীনের বিদায়”  
এবং “জাগো মা আমার” প্রভৃতি অব-  
বন্ধি-সদৃশ কবিতা নিচয় বান্ধবের পা-  
ঠকবর্গ ভ্রয়োভূয়ঃ পড়িয়াছেন । আমরা  
নিম্নে তাঁহার “প্রত্যাগত প্রবাসী” হইতে  
কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম । ইহা  
পাঠ করিবার সময়ে কাহার শরীর না  
কণ্টকিত হয়, তাহা বলিতে পারি না ।

\* \* \*

“যাই এবে যাই দেখি ছেরি গে নরনে  
ধৈর্যব ধরিয়া যদি পারিরে ছেরিতে,  
কি খেলা খেলেছে কাল সে মুখ সদনে  
যথায় প্রিয়ারে সদা পেতাম দেখিতে ;  
দেখি এবে কোন্ স্থানে রয়েছে কেমনে  
প্রেমসীর প্রিয় ত্রব্য প্রেমসী বিহীনে ।

এই ত আরশি সেই বাহার অন্তরে  
(খেলে যথা শশীকলা সলিল ভিতর)  
প্রস্ফুটিত, হায়, যেন যৌবনের তরে,  
খেলিয়াছে প্রেমসীর বদন সুন্দর ;  
তরল লাবণ্য, মরি, রূপের মাদুরী  
ভালিত আরশি অজ্ঞে, কনকলহরী ।

হায়! দেখি ওকি লেখা প্রাচীরের গায়;—  
‘প্রাণনাথ! বড় দুখে রছিল এ মনে  
নাহেরে তোমার মুখ বুঝি এগ ঘায়,  
হ’সনা সাক্ষাৎ আর এ ভব জীবনে ;  
বিদায়, বিদায়, নাথ বিদায় এখন,  
জীবনের যবনিকা হইল পতন !’

যথা কোন হীনবল অগ্নির কুণ্ডেতে  
ঢালিলে আহুতি, করি ভীষণ গর্জন  
উঠে জ্বলি বৈশ্বানর, দেখিতে দেখিতে  
স্বধূম-অনল-ধ্বজ পরশে গগন ;  
তেমতি শোকের অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া  
প্রেমসীর বাক্যরূপ আহুতি পাইয়া !

ঘুরিল মস্তক, হায়, ঘুরিল নয়নে  
সারশি, আরশি, ঘর, গৃহের প্রাচীর ;  
ভাবিলাম মনে আমি, হায়, কি কুক্ষেণে  
ধরলাম তবে এই মানব শরীর !  
মারিহু ডুবায়ৈ রুথা বিচ্ছেদ পাথারে  
শরদিম্মু-মুখী সেই স্বর্ণলভিকারে !

না জানি বিরলে বসি (জানকী যেমতি  
লঙ্কার অশোকবনে করিতা ক্রন্দন)  
কত দিন শ্রুতমারী শ্রুনেত্রী হুতী  
অশ্রুজলে আর্জিয়াছে অজের বসন ;  
কত দিন মম এই নিষ্ঠুরতা স্মরি,  
ভাবিয়া বিবর্ণ মরি, হয়েছে সুন্দরী !

না জানি বসিয়া এই গবাক্ষের ঘারে  
চাহিয়াছে কত দিন পশ্চিম-গগনে,

দেখি ক্রমে বসুধারের ডুবিতে আধারে  
সুদীর্ঘ নিশ্বাস এক তাজেছে ললনে ;  
ডুবেছে আধার-রূপে মানস আবার  
বহিয়াছে অশ্রু-জল চক্ষে অনিবার !

অস্থির হইল মন ; শিথিল শরীর ;  
ধীরে ধীরে বসিলাম পালঙ্ক উপরি,  
একি দেখি !! কে রয়েছে নিদ্রিত গভীর,  
আপাদ মস্তক জীর্ণ বসনে আবরি !  
শব যথা রহে পড়ি স্থির কলেবর,  
রহিয়াছে লম্বমান পালঙ্ক উপর।

বিস্মিত অন্তরে ধীরে উঠায়ে বসন  
যেমন চাহিব আমি সে মুখের প্রতি,  
সহসা অমনি, হায়, ফিরায়ে বদন,  
'নাথ' বলি পুনরায় নীরবিলা সতী ;  
মুদিল নয়ন হায়, সহজে আবার  
রাগিয়া শেষের অশ্রু মুকুতার ধার !

যথা বিদ্যুতের স্রোত প্রবেশিলে গায়  
সমস্ত শরীর উঠে সঘনে কাঁপিয়া,  
কাঁপিল এ দেহ মম শোকের জ্বালায়,  
পড়িলু ভূতলে হায়, আছাড় খাইয়া ;  
শোকের সজ্জিনী মুচ্ছা করিয়া যতন  
করিল এ অভাগারে পুনঃ অচেতন !

লভি সংজ্ঞা চাহিলাম চতুর্দিকে মরি,  
দেখিলাম প্রেরণীর প্রাণশূন্য কারা  
পড়িয়া রয়েছে হায়, পালঙ্ক উপরি,  
তাজিয়াছে অভাগিনী সংসারের মারা !

এ শূন্য ভবনে আর ত্রিমা কি ফল !  
আজ হ'তে আশা মোর ফুরাল সকল !"

দীনেশ বাবুর লেখনী প্রকৃতির লীলা-  
তরঙ্গবর্ণনেও অনিপুণা নহে। তিনি মানব-  
হৃদয়ের ভাবলহরী আঁকিতে গিয়া যে রূপ  
বসের উচ্ছ্বাস তুলিতে পারেন, প্রকৃতির  
শোভা রাশি চিত্র করিবার সময়েও কোন  
কোন স্থলে প্রায় সেইরূপ কৃতকার্যতা  
লাভ করেন। তাঁহার ধবল শেখরে না-  
মক কবিতার আরম্ভেই ইহার সূচক নিদ-  
র্শন আছে।—

"ভাসিতেছে জ্যোৎস্না নিখর অঘরে ;  
হিমাদ্রির স্তম্ভ শেখরে শেখরে  
খেনিছে তরঙ্গ—রজত তরল  
নির্ঝরিণী-নীরে পাতায় পাতায়,  
শতপুষ্প শিরে শত লতিকায়  
কৌমুদীর কায়া করে আলমল।"

যে সকল খণ্ডকবিতা পুষ্পমালায় প্র-  
থিত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে পুষ্পমালা  
নাম দেওয়া কোন অংশেই অসঙ্গত হয়  
নাই। এদেশে যাহারা কাব্যশাস্ত্রের অ-  
নুশীলন করেন, তাঁহাদিগের নিকট শিব-  
নাথ বাবুর কবিত্বশক্তির হূতন পরিচয় দে-  
ওয়া বিকল। তাঁহারা জানেন যে শিব-  
নাথ বাবুর হস্ত হইতে বাজালা সাহিত্যে  
প্রকৃতই নিরন্তর পুষ্পরষ্টি হইতেছে। তাঁ-  
হার কএকটি গুণ অনন্যসাধারণ। তিনি  
যেখানেই যে ভাবে প্রীতির বর্ণনা করিয়া-  
ছেন, তাহা হিমাদ্রিবন্ধোনিঃস্থত পবিত্র  
গজোদকের ন্যায় পুখদ হইয়াছে ; তা-

হাতে তুমার পরিতৃপ্তি হয়, অথচ আকর্ষণ-  
পানেও হৃদয় আকর্ষণ হয় না। ফুল, ফল,  
লতা, পাতা, বনের পাখী, স্রোতের জল,  
ইত্যাদি-কুত্র কুত্র বস্তুর বর্ণনাতেও শিবনাথ  
বাবু যার পর নাই প্রশংসনীয়। তিনি  
যাহা কিছু দেখেন, তাহাই যেন মধুময়,  
অথচ সে মধুতে নিত্যন্ত বিকৃতচিহ্নেরও  
চিত্তবিকার জন্মে না। বস্তুতঃ পুষ্পমালার  
কবিতাচয়ে, যেরূপ মাদুর্য্য, যেরূপ রসবস্তা  
অছে, যদি সেইরূপ আবেগ, তরঙ্গ ও তর-  
তর প্রবাহ থাকিত, তাহা হইলে ইহাকে  
আমরা ঋণকবিতার আদর্শ বলিয়াই ব্যাখ্যা  
করিতাম। আমরা তাঁহার পরিত্যক্তা র-  
মণীর গুটিকত কথা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।  
তিনি যখন পরদুঃখে কাতর হইয়া কাদিতে  
চাহেন, পরদুঃখকাতরা কবিতাও তখন কি  
রূপ কাদিতে পারে, পাঠক তাহা দেখিয়া  
বিমোহিত হইবেন।

“অভাগীর কেউ নাই! কার কাছে কাদিব?  
এ সব দুঃখের কথা কার কাছে বলিব?

তাই বলি বিভাবরি!

অভাগীকে রূপা করি

আঁধার অঞ্চলে ঢাকো প্রাণ-ভরে কাদিব,  
তোমারি নিকটে সখি! অশ্রুজলে ভাসিব।

কত শত অশ্রু তুমি রেখেছ ত ঢাকিয়া,  
সহস্র নিখাস যায় বাহু সনে বহিয়া।

মোর অশ্রু সেই সনে,

রাখ সখি! সংগোপনে;

জুড়াই তাপিত প্রাণ প্রাণ ভরে কাদিয়া,

তোমার অঞ্চল যাক অশ্রুজলে ভিজিয়া।

অরি! মুখময়ি নিশি! তারা-হার পরিয়া,  
বহুধার সিংহাসনে রয়েছ ত বসিয়া।

চেয়ে দেখ পদতলে

পড়ে লতা ভালে জলে,

তুলে লও প্রাণ-ফুল, দয়া করে ছিঁড়িয়া,  
নিরমল ফুল থাক তারা-সনে মিশিয়া।

অথবা পারলো যদি হাহাকার বহিতে,  
অভাগীর হাহাকার লও তথা দ্বিগিতে,  
যথা সেই নিরদয়,

সুমাঁইছে এ সময়;

যাও তথা হাহাকারে নিজাভঙ্গ করিতে,  
নিজাভঙ্গে অভাগীর দুঃখ-কথা কহিতে।

অভাগীর হাহাকারে যেই আঁখি মেলিবে  
অমনি রজনী! তুমি ধীর-স্বরে বলিবে,

‘সুমাঁও, এ রবে কেন

নয়ন মেলিলে হেন?

অবলার হাহাকার কেন রূথা শুনিবে?

সুমাঁও কাঁদুক তারা চিরকাল কাদিবে।’

রে দীপ! তোমার তৈল ফুরাইয়া আসিছে,  
তাই মরি শিক্ষা তব নিবু নিবু করিছে;

আশা-তৈল পামরার

বিন্দুমাত্র নাহি আর,

তবু কেন প্রাণশিক্ষা এতকণ জ্বলিছে?

দুর্বল হৃদয়বর্তি হুহ করে পুড়িছে?

পুড়িতে পুড়িতে শেষ অবশ্যই হইবে ;  
তখন এপাশ শিখা একেবারে নিবিবে ।

হাহাকার, অশ্রুজল,

যুচে যাবে এ সকল ;

নির্দয় পতির আশ সেই দিন মিটিবে,  
সেই দিন কমলের শতদল ফুটিবে ।

বিপন্নের বন্ধু তুমি চির দিন ঘোষণা,  
তবে কেন মৃত্যু! আজ অভাগীরে লওনা ?

নারী প্রাণে কত সয়,

তাই যদি দেখা হয়,

যথেষ্ট হয়েছে ! সত্য আর প্রাণে সয় না,

একা ছিহু, ছিহু ভাল একাকিনী পড়িয়া  
কাদিতাম এ বিজনে অশ্রুজলে ভাসিয়া,

কত কষ্ট আছে ভালে,

কেন এলি হেন কালে ?

নিজে মরি তোমাকে লোক করিব লইয়া ।

যাই যদি কার কাছে যাইব লো রাখিয়া ?”

অবসর সরোজিনীর রচয়িতা জীবন্ত  
বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ঋগু কবিতার এক অক্ষয়-  
প্রস্রবণ-স্বরূপ হইয়াছেন ; কবিতার তা-  
বাই এইক্ষণ তাঁহার স্বাভাবিক ভাষা হই-  
য়াছে, এবং বোধ হয় তিনি সকল বিষয়েই  
কবিতা লিখিতে পারেন । এদেশে ঋগু-  
কবিতার দুইটি যুগ গিয়াছে । এক যুগের  
প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধনামা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ;  
আর এক যুগের প্রতিষ্ঠাতা আধুনিক দুইটি  
কবি । ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কবিতার যে-  
রূপ শব্দালঙ্কার থাকিত, সেইরূপ কাব্য

থাকিত না ; এইক্ষণকার কবিতার কা-  
ব্যশক্তির জন্য যেরূপ যত্ন পরিলক্ষিত হয়,  
শব্দালঙ্কার গ্রন্থনে তাদৃশী চেষ্টা দেখা  
গায় না । রাজকৃষ্ণ বাবু এই উভয় যুগের  
মধ্যবর্তী । তাঁহার কবিতার শব্দসম্পদ ও  
রসবৈভব দুইই প্রশংসনীয় । বোধ হয়  
রসবৈভব অপেক্ষা শব্দসম্পদ একটুকু অ-  
ধিক । তিনি প্রেমের বিশ্বব্রাহ্মণীতা বর্ণন  
করিতে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

“ধনীর প্রাসাদে, দীনের কুটারে,

ভূধর-শেখরে, নীরধির নীরে,

বিজ্ঞান বিপিনে, মেঘের পবনে,

রবির, বিধুর উজ্জল কিরণে,

মকতূ মাঝারে, কুসুম নিকরে

জলের প্রপাতে, খনির ভিতরে,

অচল গহ্বরে, তটিনীর তটে,

জলধরজালে, নীল নভপটে,

পাদপ, ভুবারে, সাগর-পুলিনে,

সর-মুশোভিত কুমুদ, নলিনে,

উজ্জল জ্বলিত বিজলী-কোলে ;

অশনি নিনাদে, মৃদল ধারায়,

মেঘ-গরজনে, অনল-শিখায়,

সমীর-দুলিত গাছের পাতায়,

বিকচ-কুসুম-ভূষণা লতায়,

আরো কত আছে,—কব তা কেমনে ?

যা জানি,—না জানি নিখিল ভুবনে

সমভাবে তুমি সকল স্থলে ।”

বঙ্গে বাঁহার নবীন প্রতিভা এইক্ষণ  
এত সমাদৃত হইয়াছে, অতি অসম্পাক্ষরে  
তিনি এই বিষয়টির কিরূপ বর্ণনা ক-

রিয়াছেন, আমরা পাঠকে তাহাও দেখাইব ।

“ বুঝি নাই

যেই প্রেম বিরাজিছে অন্তরে অন্তরে  
হৃদয় শোণিতসহ হৃদয়ে সঞ্চারে,

আদি নাই, অন্ত নাই,

বিরাম বিশ্রাম নাই,

মানব হৃদয় গঙ্গা, স্রুধা প্রবাহিণী

শান্তভাবে, বিলোড়নে বিশ্ববিপ্লাবিনী । ”

লোকের কচি বহু প্রকারের ;—আমাদিগের এই বোধ হয় যে, কবিতা বহুভাষিণী না হইলেই অধিকতর হৃদয়গ্রাহিণী হয় । রাজকুমার বাবুর স্বরস্বতার বর্ণনা এই জন্যই তাঁহার অগাণ্য কবিতা অপেক্ষা আমাদের নিকট অধিকতর মনোরম বোধ হইল ।

বনকুমার কবি-হৃদয়ের প্রথম কুমুম ; অপূর্ণ বিকসিত, অযত্নরক্ষিত, অকৃত্রিম । আমরা ইহার সৌরভে পুলকিত হইয়াছি । গ্রন্থকার আমাদের নিতান্ত স্নেহাম্পদ । আমাদের বিবেচনার তিনি আরও কিছু কাল অপেক্ষা করিলেই ভাল হইত । তথাপি, তিনি প্রথম উদ্যমেই যাহা উপহার দিয়াছেন, আমরা আদরের সহিত তাহা গ্রহণ করিলাম । যাহাকে লোকে ললিত-কবিতা বলে এবং যে সকল শৃঙ্খলিত কবিতার সহিত ললিতবনিতার উপমা হইয়া থাকে, বনকুমারের রচয়িতা একটি পাণ্ডুর প্রতি সন্মোহনে ব্যতীত তাদৃশ কবিতার কৃতকার্য

হন নাই । কিন্তু যে সকল কবিতায় হৃদয়ের অন্তর্গত গভীর বেদনা, দ্বেষ, ক্রোধ, অভিমান এবং কালকূট হলাহল ঢালিয়া দিতে হয়, এই অভিনব কবি এখনই তাহাতে দক্ষতা দেখাইয়াছেন । তাঁহার “ বৈকুণ্ঠনিবাসে বহে না রে আজ, আনন্দ হিমোল ” ইত্যাদি পংক্তি পাঠসময়ে চিত্ত উদ্বেল হয় । আমরা নিম্নে তাঁহার একটি শ্লোকমাত্র তুলিয়া দিলাম । ইহা পাঠ করিয়া সকলেই হয় ত স্বীকার করিবেন যে, রচয়িতার আত্মনাম গোপনে প্রয়োজন নাই ।

“ দুর্ব্বার জলধি মরি ! ভারত বেক্ষিয়া

উচ্চে করিল রোদন !

হিমায় শিশিরচ্ছলে

তাজিলেক অশ্রুজলে

বরষিল অগ্নি রবি আরক্ত বদন

কাদিলেক চরাচর ভারত কারণ ! ”

অবকাশ গাথা শব্দের লালিত্য ও রচনার মাধুর্য্যে বনকুমার অপেক্ষাও অধিকতর আদরনীয় । কিন্তু বনকুমারের ভাষার যেরূপ ওজস্বিতা আছে, অবকাশগাথার কোন কবিতায়ই তাহা নাই । আমরা ইহার নিদ্রা, কাননে গ্রব ও দময়ন্তী প্রভৃতি কতিপয় কবিতা পাঠে মোহিত হইয়াছি ; আবার শারদীয় মহোৎসবের আরম্ভে কবিবর রায় শৃঙ্খলার সেই চানো ভাষার জঘন্য অনুকরণ দেখিয়া নিতান্ত লজ্জা অনুভব করিয়াছি ।

## বিনয়ে বাধা।

এজগতে বিনীত বলিয়া লোকের নি-  
কট প্রশংসিত হইতে কাহার না সাধ হয় ?  
কত কঠোর কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াও যে  
কীৰ্ত্তি উপার্জন করা যায় না, যদি দুটি  
কথা বিক্রয় করিলেই, সেই কীৰ্ত্তি স-  
ঞ্চয় করা যায়, তবে কাহার প্রতিতি না  
তাহাতে উদ্ভূত হয় ? তবে সকলেই বিনয়ে  
অবনত হয় না কেন ? ইহাই এই প্রবন্ধের  
আলোচ্য, এবং ইহা জদয়রহস্য অথবা প্র-  
কৃত দর্শন শাস্ত্রের কথা।

আমরা যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে  
এই বোধ জন্মিয়াছে যে, বিনয়ের পক্ষে  
অনেকেরই কতকগুলি বাস্তব, কি অবাস্তব,  
কল্পিত কি অকল্পিত বাধা আছে। মনুষ্য  
সেই বাধাগুলিকে যতক্ষণ না অতিক্রম ক-  
রিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার প্রকৃত  
বিনয়ী হওয়া অসম্ভব।

কাহারও মন স্বভাবতঃ বিনয়ের দিকে,  
কিন্তু তিনি বিনীত হন না,—লজ্জায়। লো-  
কের নিকট বিনীত হইলে, পাছে লোকে  
তাহাকে ছোট মনে করে, খাট মনে করে,  
অথবা শক্তিহীন, সামর্থ্যহীন ও ক্ষমতাশূন্য  
কি সমাজের নিম্নশ্রেণিস্থ বিবেচনায় উ-  
পেক্ষা করে, এই লজ্জাতেই তিনি সর্বদা  
সঙ্কুচিত থাকেন, এবং যেখানে ঐজ্ঞাত্য  
কিছুমাত্র সার্থকতা নাই, সেখানেও ঐজ্ঞাত্য  
দেখাইয়া, যেখানে দুরন্ধরের কোন প্র-

য়োজন নাই, সেখানেও দুরন্ধর বলিয়া,  
যেখানে অকৃত্রিম, বিষদৃষ্টবর্ষণ, ও মদপ-  
পদ-বিক্ষেপে, কোন আদ্যাকতা নাই  
সেখানেও কুঞ্চিতক, কঠোর চক্ষু এবং দা-  
স্তিক ভাবভঙ্গি ও কঠিনতা প্রদর্শন করিয়া  
রথা দুৰ্ব্বিনীত হন। এই শ্রেণিস্থ ব্যক্তিরা  
প্রকৃত দীনাত্মা, প্রকৃত দরিদ্র। বিদ্যাতা ষাঁ-  
হাদিগের অঙ্গে জ্যোৎস্নারশিরত্মায় রূপ-  
রাশি ঢালিয়া দিয়াছেন, রূপের কৃত্রিম ছটা  
দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগের যত্ন থাকে  
না ; এবং বিদ্যাতা ষাঁহাদিগকে শক্তি, সা-  
মর্থ্য, ক্ষমতা ও অত্ম প্রকারের বৈভব দি-  
য়াছেন, কৃত্রিম অভিমানের আবরণ দিয়া  
অঙ্গ ঢাকিয়া রাখিতেও তাঁহাদিগের যতি  
ভাঞ্জে না। ষাঁহাদিগের আছে, তাঁহাদি-  
গের আবার প্রদর্শন কি ? প্রদর্শন দরিদ্রের  
জন্য। ষাঁহাদিগের অন্তরে অভিমানের  
অমলজ্যোতিঃ, সাগরগর্ভনিহিত অমল্যরত্নের  
ন্যায়, লোকচক্ষুর অগোচরে লুকায়িত  
রহে, বিনয়ে তাঁহাদিগের আবার লজ্জা  
কি ? লজ্জা হীনজনের জন্য।

বিনয়ের আর এক বাধা ভয়। অনেক  
দের বিনয়ী হইতে লজ্জা নাই। তাহার  
জানেন যে, গরিমা আর বিনয়, কাঞ্চনময়ী  
প্রতিমাঃ কাস্তি ও দৃঢ়তার ন্যায় অনায়াসে  
ও অতিসুখে একত্র অবস্থান করিতে পারে।  
তথাপি তাঁহারা বিনীত হন না,—ভয়ে।

ভয় এই, পাছে বিনয়ের দিকে নাবিতে  
 নাবিতে ক্রমে আত্মবিস্ময় হয়, এবং অ-  
 ভ্যস্তরীণ সামর্থ্য দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়ে।  
 এই ভয়ের অর্থ, আপনাতে অবিশ্বাস । হা!  
 বিভ্রমনা ! মানবপ্রকৃতির যে সমস্ত ক্ষমতাকে  
 পৃথিবী 'শক্তি' বলিয়া পূজা করিয়াছে,  
 লোকসম্মতিকর্ষে ও সৌজন্য শিক্ষায় তাহার  
 ক্ষয় হয়, না বৃদ্ধি হয় ? বুদ্ধির স্বাভাবিক  
 প্রতিভা, মনস্তাত্ত্বিক অপরিহার্য গৌরব, আ-  
 ত্মার উচ্চতা, উদার হৃদয়ের মহিমা, এসকল  
 যদি বিনয়েই কমিবার বস্তু হয়, তবে আর  
 ইহাদের দুর্ব্বল ভারবহনের প্রয়োজন কি ?  
 তুমি যদি যথার্থ বড় লোক হও, নিশ্চয়  
 জানিও যে, লোকের পাদপ্রান্তে পড়িয়া  
 থাকিলেও তুমি মুকুটমণির ন্যায় শোভা  
 পাইবে, এবং সকলকে আপনার ক্ষমতায়  
 বাধিয়া রাখিবে । আর যদি তুমি যথার্থ  
 ক্ষুদ্র লোক হও, তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয়  
 জানিও যে, তোমার লোকের মস্তকে কি  
 স্বর্ণসিংহাসনের শীর্ষস্থলে তুলিয়া দিলেও,  
 তোমার স্বাভাবিক ক্ষুদ্রতা সমস্ত আচ্ছাদন  
 ভেদ করিয়া, বাহির হইয়া পড়িবে । অ-  
 দীনসদৃশী ঠাঁহার শিষ্যদিগের পদপ্র-  
 কালন করিয়াছিলেন ; ঠাঁহার মস্তমুণ্ডের  
 ন্যায় ভদ্রীয় আত্মা পালন করিতেন এবং  
 ঠাঁহাদিগের পরবর্তীরা অদ্যাপি ঠাঁহাকে  
 জগতে অতুল, অনন্যসাধারণ দেবত্ব-সম্পন্ন  
 বলিয়া আরাধনা করেন । নীরো রোম-  
 বাসীদিগকে ঠাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা ক-  
 রিতে আত্মা দিয়াছিলেন । লোকে অ-

দ্যাপি ঠাঁহার নাম হইলেই, ঐ নামের উ-  
 পরে, অন্ততঃ কপ্পনারও পাছুকাঁঘাত করে ।  
 বড় আর ছোট, লোহ আর চৌষক ;  
 চৌষককে উল্টে রাখ, অথোতে রাখ, উ-  
 ত্তরে রাখ, দক্ষিণে রাখ, লোহ অবধারিতই  
 উহার আকর্ষণীয় অধীন হইবে । কাবণ,  
 চৌষকে অন্তর্নিহিত শক্তি আছে । বড়  
 আর ছোট, বন্ধি আর তৃণশূপ ;—বন্ধি-  
 লিজকে তৃণশূপের উপরে রাখ আর নীচে  
 রাখ, তৃণসংযোগে বন্ধি আপনা হইতেই  
 জ্বলিয়া উঠিবে । কারণ, বন্ধিতেও চৌষ-  
 কের মত অদৃষ্ট শক্তি আছে ।

বিনয়ের তৃতীয় বাধা স্বার্থচিত্তা । মনে  
 লজ্জাও নাই, ভয়ও নাই অথচ এই বিশ্বাস  
 আছে যে, বিনয়ের অধীন হইলে স্বার্থরক্ষা  
 হইবে না । যখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে,  
 বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর আঘাত না করিলে,  
 কার্যোদ্ধার হয় না, তখন বিনয়ের মধুধারা  
 সিঞ্চে কি পুণ্য আছে, বল ।

বিনয়ের পক্ষে এই প্রতিবন্ধককেও  
 আমরা উপযুক্ত প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বী-  
 কার্য করি না । লৌকিক কার্যক্ষেত্রে  
 বজ্রের ন্যায় আঘাত যে সময়ে সময়ে  
 অনিবার্য, তাহা আমরা মানিয়া লইতে  
 প্রস্তুত আছি । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,  
 বজ্র কি দুর্দ্দমনী ? বজ্রপাতের প্রথমে  
 যেঘণ্টা,—কি শুল্কর, কি শূন্যদর্শন,  
 কি শূন্যতল ছায়াপ্রদ ! তার পর সৌন্দ-  
 মিনীর মূহু হাস্য । কাহার মন না উহা  
 কাড়িয়া লয় ? তার পর জলদম্বালার মি-

নতি, অবনতি ও অবিরামবারিধারা ; এবং তারপর উদ্ধতমন্তকে মুহুমুহুঃ অশনিপাত। তবে কেন বজ্রে রূপা আর অবিনয়ের অপবাদ দাও ? যদি বাহুতে বল থাকে, তবে পুরুষের মত দৃঢ়ভাবে কার্য্য কর, অথচ পুরুষের মত বিনীত হও। ইহাতে আর্থর-কার কখনও বিঘ্ন ঘটবে না।

বীরসমাজে বোনাপাট্টি নিতান্ত বিনীত ছিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, তিনি, সমর্যবসানে বিজয় বৈজয়ন্তী দোলাইয়া দিয়া, তৎক্ষণাৎই শত্রুপক্ষের নিকট অতি কাতর-কণ্ঠে সন্ধিসংস্থাপনের জন্য প্রার্থী হইতেন। ইংলণ্ডের চতুর্থ জর্জ এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের নিকট, পুনঃ পুনঃ জয়লাভের পরেও তিনি স্বহস্তে যে সকল বিনয়পূর্ণ কাতরোক্তি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, হীনতর কোন ব্যক্তি তদনুরূপ বিনীত হইতে সাহস পায় না।

পুরুষসিংহ প্রথম রিচার্ডও সামাজিকদিগের সহিত কথোপকথনে ও ব্যবহারে যার পর নাই বিনয়াবনত থাকিতেন। তিনি আপনার অমিত পরাক্রমকে এমনই এক হৃর্ভেদ্য বর্ষ বলিয়া জানিতেন, যে, স্বকীয় দৃঢ় দুই ভুজ এবং প্রশস্ত ললাট ভিন্ন রাজপরিচ্ছদের কিছুই আর আবশ্যক জ্ঞান করিতেন না। কিন্তু ইহাতেই তাঁহার সিংহের প্রতাপ সর্বত্র অনুভূত হইত এবং সকলে আপনা হইতে আসিয়া তাঁহার চরণোপাশ্বে গড়াইয়া পড়িত। অতি দুর্জয় অভিমানীরাও তাঁহার বিনয়ানুরূপ অভিমানের নিকট পরাভব স্বীকার করিত। এদিগে

তাঁহার কনিষ্ঠ, শৃগাল জ্বন, মানের কাপ্পনিক অনুরোধে দুর্জিনয়ের পরাক্রাণ প্রদর্শন করিয়াও, লোকের নিকট অপমানিত রহিতেন। অগ্রজের অনবদ্য পৌত্রবদেহে যে মাদুরী রূপমুগ্ধা কামিনীর ন্যায় একবারে মিশিয়া থাকিত, তিনি মণি মুক্তার মালা পরিয়াও তাঁহার ছায়া পাঠিতেন না।

পুরাকালে রোমের এক তেজঃপুঞ্জ সম্রাট একদা পারিসদবর্গ সমভিব্যাহারে রাজপথে বায়ু সেবন করিতেছিলেন। একটি দীনমূর্তি ভদ্রসন্তান দূর ভইতে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তাঁহাকে সসম্মখে অভিবাদন করিলেন। তিনি তাঁহা হইতেও অধিকতর অবনত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাভিবাদন করিলেন। পারিসদবর্গের মধ্যে একজন এই আচরণের অর্থগ্রহ করিতে না পারিয়া একটুকু হাঁসিতে ছিলেন। সম্রাট সেই হাঁসির তাৎপর্য্য বুঝিতে পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—“আপনার কি এই অভিলাষ যে সকল বিষয়ে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে অবস্থিত রহিয়া এইক্ষণ বিনয়ে আমি ইহার নিকট অধঃকৃত হইব ?”

বিনয়ে বাঁহাদিগের লজ্জা হয়, ভয় হয় অথবা সাহসের অভাব হয়, বুদ্ধি থাকিলে তাঁহারা এই মহানুভাব-সম্রাটের নিকট শিক্ষা লইবেন। আর, বাঁহাদিগের প্রকৃতিই বিনয়বিরোধিনী,—বিষবর্ষিনী,—ছিন্নতার বীণার মত বিসংবাদিনী, তাঁহারা আশ্চর্য্যকর্ষচিন্তায় এবং অধ্যাত্মসৌন্দর্য্যের গৌরবধানে নিমগ্ন হইবেন।



## সংক্ষিপ্তসমালোচন

১। বঙ্গবধুবিলাপ। শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন প্রণীত। আমরা এই পুস্তকখানি উপহার পাই নাই, কিন্তু সমালোচনার জন্য আদর সহকারে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। এই আদরের বিশিষ্ট কারণ আছে। গ্রন্থকারের সহিত বান্ধবের কোন রূপ সম্পর্ক নাই, তিনি কখনও বান্ধবে কিছু লিখেন নাই। তথাপি তিনি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে ভজিক্রমে আপনাকে বান্ধবের একজন লেখক, এবং বান্ধবের কতকগুলি কবিতাকে আপনার বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদের প্রতি যার পর নাই বন্ধুতা ও আদর দেখাইয়াছেন। বান্ধবের দ্বিতীয়খণ্ডে প্রেমোন্মাদিনী নামে একটি কবিতা আছে, এই কবিতা নবীন বাবুর; এবং বাঙ্গালার বর্ষা নামে আর একটি কবিতা আছে; উহা যমুনালহরী নামক গীতি কবিতার রচয়িতা গোবিন্দ বাবুর। গ্রন্থকার এই কবিতা দুটিকে আপনার বলিয়া তুলিয়া নিয়াছেন। আমরা এতদিনে বুঝিলাম যে, বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজে সকল লেখকই লম্বুচেতা নছেন। অন্ততঃ বঙ্গবধুবিলাপের রচয়িতার এই অপবাদ দেওয়া অসঙ্গত। কারণ শাস্ত্রে আছে।

‘অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লম্বু-

[ চেতসাম্ । ’]

অর্থাৎ ইনি আমার নিজ, উনি আমার পর এইরূপ ঝাঁহাদিগের গণনা তাঁহারা লম্বুচেতা। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লেখার এইরূপ আত্মপর গণনার চিহ্ন মাত্রও দেখা যায় না। তিনি বঙ্গদর্শনকেও নিজ বিলাসক্ষেত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে কথার সহিত বন্ধিম বাবুর সম্পর্ক, আমাদের দিগের কোন সম্পর্ক নাই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, আত্মপর-গণনারত অনুদারচেতা নবীনচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র গ্রন্থকারের উদারতার মাহাত্ম্য না বুঝিয়া একটা গোলযোগ বাধাইতে পারেন।

২। কবিতাকুঞ্জ। জীবরদাচরণ গুহ প্রণীত। বরদা বাবুর কবিতাকুঞ্জে কোকিলের কলকণ্ঠ কি ভ্রমর গুণ্ণন ইহার কী ছুই আমাদের দিগের অতিগোঁচর হইল না। কিন্তু বঙ্গে যে সকল ভেক আজি কালি নিরন্তর বিকটশব্দ করিয়া লোকের নিদ্রা-স্থখে ব্যাঘাত জন্মাইতেছে, তাহাদিগের কণ্ঠধ্বনি অপেক্ষা সুরম্যর ধ্বনি শুনিয়া আমরা সুখী হইলাম। কিন্তু এই স্বরম্যধ্বনি, মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে। কুঞ্জের দ্বারদেশে দূরগার প্রতি কঠোর দুঃস্বপ্ন গীত;—  
“যথা ধূর্তা-নীচা নারী প্রভারণা-পর্য,  
সদা দীর্ঘা-হিংসাত্মক, কতু নহে স্নেহপুতা  
লোলুপ অন্তরা।”

৩। মানসকুসুম। দ্বিতীয়ভাগ।  
শ্রীরামদয়াল ঘোষ প্রণীত। নামেই পরি-  
চিত হইতেছে যে মানসকুসুম একখানি  
পদ্য গ্রন্থ। ইহাতে কাম, ক্রোধ, লোভ,  
এই তিন বিষয়ে তিনটি সুদীর্ঘ কবিতা এবং  
আলেকজান্ডার ও দম্য নামে আর একটি  
সংক্ষিপ্ত কবিতা আছে। এই শেষোক্ত  
কবিতাটিই আমাদের নিকট অপেক্ষা-  
কৃত ভাল লাগিল।

৪। দুঃশা-কাব্য। প্রথমভাগ।  
ঐদেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্র-  
ণীত। ইহার লেখা পড়িয়া আশা অথবা  
আশঙ্কা হইল, ইনি নানা ফুলের মধু  
আহরণে এবং গীতে ভ্রমরাগুরুণে যত্ন-  
শীল হইবেন। বোধ হয় কাব্যের প্রকৃতি  
বিষয়ে সমুচিত শিক্ষা ও উপদেশ লাভ  
করিলে, ইনি খণ্ড কবিতা রচনায় কি-  
ঞ্চিৎ ক্ষমতা লাভও করিতে পারেন। এত  
দীর্ঘকালের পরেও কবিতায় জগদানন্দ বা-  
বুর কলঙ্ক করা ইহার পক্ষে শিষ্টতা সদা-  
শয়তা, ও সুরচিন্তিতার কার্য্য হয়, নাই।

৫। স্বপ্নদূত। ঐকিশোরীলাল রায়  
বিরচিত। এখানিতে স্বপ্নদর্শন-বর্ণনাচ্ছলে  
পরমার্থতত্ত্ব ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে কবিতায়  
উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের  
বিবেচনায় ইহার অর্থ্য নারিকেলের অভ্য-  
ন্তরস্থিত সূক্ষ্ম অল্প ন্যায়, নিভান্ত কঠিন  
আবরণে সমারূপ রহিয়াছে। একথা ক-  
তদূর সভ্য পাঠকবর্ণ নিম্নোক্ত চারিটি  
পংক্তি পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

“হাস্য হয় ক্রন্দনের অরক যেমন।  
যুক্তবাকে প্রলাপের রিপুতে গগন ॥  
হড্ডরিপু যথা হড্ড গ্রাসী পক্ষীবর।  
মধুর অরাতি হয় যেমন ভ্রমর ॥”

বোধ করি, সাধারণ পাঠকসম্মত অরক  
হড্ড হড্ডগ্রাসী প্রভৃতি শব্দের অর্থ্য জা-  
নেন না; জানিলেও এই সকল শব্দ চর্চণ  
করিয়া ইহাদের অভ্যন্তরস্থিত রস নিষ্ক-  
র্ষণ করা ভাল বাসেন না।

৬। স্তবমালা। শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বি-  
রচিত। অবসর-সরোজিনীর রচনিতা স্ত-  
বমালায় লক্ষ্মী নারায়ণের বন্দনা করিয়া  
ছেন। ইহার ভাষা স্তবের উপযোগিনী।

৭। কুসুমকাননে কণ্টকতক। ইহাতে  
বিরলে শিশিরবিন্দু, নির্ঝাসিতের বিলাপ,  
স্বপ্নানন্দরী, পতিহীনা কামিনী, নিশীথে  
কমলিনী, ও প্রিয়তমারে আমার এইরূপ  
কএকটি কবিতা আছে। ইহার ভাষা ক-  
বিতা ও মানসকুসুমের ভাষা অপেক্ষা সা-  
ধারণতঃ উৎকৃষ্ট, ভাবও অপেক্ষাকৃত সরল  
ও তরল। কিন্তু তথাপি দুই এক স্থানের  
শব্দবিন্যাস দেখিয়া আমরা প্রকৃত স্তম্ভিত  
হইরাছি। একটি কবিতার লেখা আছে,—

“প্রিয়তমারে আমার!—

সংসার সাহারা মাঝে তুমিই ওসিস্,

শোক শিরোকায় যবে, দেহ মন দগ্ধ হবে  
তুমিই সাহসাবারি দাও দিবানিশ্।”

আমরা ভাগ্যবশতঃ কোন দিন এক-  
টুকু ইংরেজী পড়িয়াছিলাম, তাই যেন সা-  
হারা আর ওসিস শব্দের লাগিতা ও অর্থ্য-

গত মাধুর্য্য কোন প্রকারে আমাদেরিগর ক্ষ-  
দয়জন্ম হইল ; কিন্তু প্রিয়তমারা ইহার তা-  
ৎপর্য্য পরিগ্রাহে সমর্থ্য্য হইবেন কি না, সে  
বিষয়ে অতি গভীর সন্দেহ আছে। বলিতে  
লজ্জা হয়, অথচ না বলিয়া ও পারি না ;  
শিরোকায় শব্দের অর্থ এখনও আমাদেরিগর  
বোধগম্য্য হয় নাই। ইহা কি সংস্কৃত  
শব্দ না ইংরেজী অভিধানে উল্লিখিত সি-  
রকো নামক বিষাক্ত বায়ু, পাঠক তাহার  
মীমাংসা করিবেন।

৮। ভারতেশ্বরী কাব্য। জীপ্যা-  
রীচরণ দাস প্রণীত।—

৯। ইংলণ্ড-ঈশ্বরী আত্র ভারত-ঈশ্বরী।  
জীরাধাবলভ দে প্রণীত।—

অর্থানুসারে নাম করিতে হইলে, এত-  
খানের নাম রাজহর্য্য কাব্য। যুধিষ্ঠিরের  
ইন্দ্রপ্রস্থে রুটেনিয়ার রাজপ্রতিনিধি এবার  
যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, এত-  
খানি তা'হাই অবলম্বন করিয়া লিখিত হই-  
রাছে। রাধাবলভ বাবু বরসে বালক। তাঁ-  
হার ক্ষমতার সহিত প্যারীবাবুর ক্ষমতার  
তুলনা করা অসম্ভব। কিন্তু তথাপি বলিতে  
হইবে যে, তাঁহার প্রথম কবিতাটি বড়ই ম-  
নোজ্ঞ হইরাছে। প্যারীবাবুর লেখা আ-  
দ্যোপান্ত শ্লেষপূর্ণ। তাঁহার বন্দনার শ্লেষ,  
বিলাপে শ্লেষ, আবেদনে শ্লেষ এবং অ-  
ভিনন্দনেও শ্লেষ। এইরূপ শ্লিষ্ট কবিতা  
রচনার তিনি স্পষ্টতঃ হেমবাবুর অনুকরণে

যত্নপর হইরাছেন, কিন্তু উপা-  
কার্য্য না হইয়া থাকিলেও।  
নাই। ভারতের বর্তমান ও  
প্যারীবাবুর অভিজ্ঞতা আছে।

১০। মিত্রোদয়। মাসি  
সমালোচন। জীহিরথয় মুখোপাধ্যায় ক-  
র্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে যে সকল বি-  
ষয়ের সমীবেশ দেখিলাম, এবং সেই সকল  
বিষয় যেভাবে লিখিত হইরাছে, তাহাতে  
বোধ হয় ইহার দ্বারা বাঙ্গালী সাহিত্যের  
উৎকার বই অপকার হইবে না। ইহার  
বর্ত্তসংখ্যায় চিতোরের যুদ্ধ নামে যে একটি  
কবিতা আছে, তাহা মুখপাঠ্য হইরাছে।  
পত্রিকা আকারে ক্ষুদ্র, কোন একটি দীর্ঘ-  
প্রবন্ধ ইহাতে একবারে পরিসমাপ্ত হইতে  
পারে না, তথাপি আবার ইহার মধ্যে ইং-  
রেজী প্রবন্ধ প্রকটিত হয়। ইহা কেন ?  
বাঙ্গালির দ্বারা কি ইংরেজী ভাষারও উ-  
ৎকর্ষ সাধন হইবে ?

১১। দিবাকর। মাসিক পত্র ও  
সমালোচন। জীরাভৈরবলাল সিংহ কর্তৃক  
সম্পাদিত। এই পত্রিকাখানি বর্ত্তমান হ-  
ইতে প্রচারিত হইতেছে। আমরা ইহার প্র-  
থম দুই সংখ্যা পাড়িয়া নুখী হইরাছি। ই-  
হার সম্পাদক কাব্যোত্তমরায়ী ; কাব্যর-  
সজ্ঞ এবং কাব্যের দোষগুণ বিচারে অ-  
ভিজ্ঞ কি না, তাহা এখন পর্য্যন্তও পরী-  
ক্ষিত হয় নাই।

## রামায়ণ \* ।

## দ্বিতীয় প্রস্তাব ।



রামায়ণশীর্ষক প্রথম প্রস্তাবে ইতালীয় পণ্ডিত গোরেসিওর মত যথাযথ বিবৃত হইয়াছে। বর্তমান দ্বিতীয় প্রস্তাবে ইংল-  
ণ্ডীয় পণ্ডিত মণিয়ার উইলিয়েম্‌সের মত সমালোচিত হইতেছে।

ভারতীয় সাহিত্যসংসার স্বভাবতঃ নিত্যন্ত বিপুল ও আয়ত। গম্ভীরদর্শন হিমগিরির গম্ভীর প্রকৃতির ক্রোড়ে ভার-  
তীয় কবিতা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। ভারতভূমির ন্যায় ভারতীয় কবিতাও স্বা-  
ভাবিক সৌন্দর্যের অদ্বিতীয় লীলাস্থল। কল্পনা যত্নপূর্ব্বক এই সৌন্দর্য্যরাশি ক-  
বিতার গায় গায় সাজাইয়া দিয়াছে। প-  
বিত্রহৃদয় গজার সহিত অনায়াসে এই ভারতীয় কবিতার তুলনা হইতে পারে—  
উভয়ই বহুদা প্রসারিণী, রসবহুলা ও মা-  
র্দব, প্রসন্নতা প্রভৃতিতে আতট পূর্ণ। রা-  
মায়ণ ও মহাভারত এই কবিতা-ক্ষেত্রের অনির্বচনীয় সম্পাদন করিতেছে। পা-  
শ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই দুই মহাকাব্যের গুণে এতদূর মোহিত হইয়াছেন যে, তাঁহাদি-  
গের অনেকেই ইহার গুণগরিমার বর্ণনার  
স্ব স্ব প্রবন্ধ পল্লবিত করিতে ক্রটি করেন

নাই। মণিয়ার উইলিয়েম্‌স্ এই পণ্ডিতস-  
ম্প্রদায়ের অন্যতম ব্যক্তি। তিনি রামায়ণ-  
সংক্রান্ত প্রস্তাবের অনেক স্থলেই স্বীয়  
পাণ্ডিত্য ও বিচারদক্ষতার পরিচয় দিয়া-  
ছেন। রামায়ণের গুণে মোহিত হইয়া  
কোন কোন স্থলে তাঁহার লেখনী অজ্ঞপ্র-  
প্রশংসা-ধারা বর্ষণ করিয়াছে। রামায়ণ  
যখন বৈদেশীক পণ্ডিতগণের হৃদয় এইরূপ  
আকর্ষণ করিয়াছে, তখন যে উহা পৃথিবীর  
মধ্যে একটি উৎকৃষ্টতম রত্ন ভদ্রবয়ে মত-  
বৈধ নাই।

আর্য্যগণ বেলুর্ভাগের তুষারমণ্ডিত  
প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদৌ সপ্তসি-  
ন্ধুর প্রসন্ন-সলিল-বিমোহিত পঞ্চনদে অব-  
স্থিতি করেন। কালক্রমে তাঁহাদিগের  
বংশ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ইত-  
স্ততঃ বিস্তৃত হয়। এই বিস্তৃত বংশের  
সমুত্তিবর্গ যখন গাজপ্রদেশে উপনিবেশ  
স্থাপন করেন, তখন একদল সাহসিক, যু-  
দ্ধকুশল অসম্ভ্য জাতি বিজয়োগন্ত হইয়া  
দাক্ষিণাত্য হইতে সিংহলদ্বীপ পর্য্যন্ত আ-  
পনাদিগের অধিকার বিস্তার করে। মণি-  
য়ার উইলিয়েম্‌সের মতে এই গাজপ্রদেশ-

বাসী আৰ্য্যসন্ততিগণের সহিত দাক্ষিণাত্য-বিজয়ী অনাৰ্য্যদিগের সামরিক সংঘর্ষেই রামায়ণের উৎপত্তি । রামায়ণে বিজ্ঞা ও তল্লিকটস্থ শৈলসমানার অধিবাসিগণ বানর এবং দাক্ষিণাত্যের আৰ্য্যোত্তর অসভ্যগণ নরশোণিত-লোলুপ বহুযশুক বহুহস্ত রা-ক্ষস শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে । বোধ হয় বান্দীকি বানরগণের জিগীষারূতি ও শক্রদমন স্পৃহা দেখিয়াই রামের সৈন্য-দিগকে বানরীরূতিতে পরিনত করিয়াছেন । ঐতিহাসিক বিশেষের লিখিত বিবরণ এই অনুমানের পোষকতা করিতেছে \* ।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, রামায়ণ যুদ্ধ-কুশল আৰ্য্য ও অনাৰ্য্য জাতির অবদান প-রম্পরার সংগ্রহ । বেদের নায় ইহা আদৌ লিপিবদ্ধ ছিল না । সাধারণ সমাজে ইহা মৌখিক বক্তৃতায় বিস্তৃত হইত । মণিয়ার উইলিয়েম্‌স্ বলেন, রামায়ণ-প্রতিপাদ্য এই ঘটনা সমূহ সম্ভবতঃ প্রথমে গদ্যে বিস্তৃত

\* ত্রাবো এক স্থলে লিখিয়াছেন, একদা বহু সংখ্য বানর বন হইতে বহির্গত হইয়া সদলে মাসিনদীয় সৈন্যের সম্মুখ-ভাগে দণ্ডায়মান হয় । যুদ্ধসজ্জিত শক্র-সম্মুখীন সৈন্যের অবস্থানের সহিত ভাষা-দিগের অবস্থানের অনুমাত্র বৈলক্ষণ্য ল-ক্ষিত হয় নাই । ইহাতে মাসিনদীয় সৈ-ন্যের এরূপ মতিভ্রম হয় যে, তাহারা প্র-কৃত শক্রসেনা ভাবিয়া এই দলবদ্ধ বানর-দিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যোগ করে ।

হইয়া পরে সময় অনুসারে সহজবোধ্য অনুষ্ঠুভ্ৰম্মে নিবদ্ধ হইয়াছে ।

রামায়ণের পরিবর্তন সময় দ্রুত । এক সময়ে উহা পদ্যে গ্রথিত হয়, অন্য সময়ে বহুপরিবর্তিত ও বর্তমান অবস্থায় স্থাপিত হইয়া উঠে । মণিয়ার উইলিয়েম্‌সের মতে রামায়ণের প্রথম অবস্থা ত্রাক্ষণ্যকালের পূর্ববর্তী । এই সময় খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শ-তাব্দীর পরবর্তী নয় । তিনি স্বমতের স-মর্থক জনা নিম্নলিখিত কএকটি যুক্তির উল্লেখ করিয়াছেন :—

১। রামায়ণে সতীদাহের কোনও বিব-রণ লক্ষিত হয় না । মহাভারতে দৃষ্ট হয়, পাণ্ডুপত্নী মাত্রী এবং বশুদেব ও কৃষ্ণের সহকর্ম্মীনিগণ স্বামীসহগমন করিয়াছিলেন কিন্তু স্প্রসিদ্ধ কুক-পাণ্ডব যুদ্ধে যে সমস্ত যোদ্ধা গতান্ত হয়, তাহাদিগের পত্নীগণ এই রীতির অনুসরণ করে নাই । ইহাতে প্রতীত হইতেছে সতীদাহ প্রথা ভারতবর্ষের পশ্চি-মোত্তরভাগে পঞ্জাবের নিকটস্থ প্রদেশে প্রথমে প্রবর্তিত হয় । রামায়ণের প্রথম প্রচার সময়ে ইহা অপেক্ষাকৃত প্রাচ্য প্র-দেশে প্রস্রুত হয় নাই । পঞ্জাবে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতেই এই প্রথা প্রচলিত হইয়া উঠে । মেগাস্থিনিম্‌ উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত সময়ে ঐ প্রথা মগধ পর্য্যন্তও বিস্তৃত হইয়াছিল । স্মৃতিস্বীকার করিতে হইবে, রামায়ণ খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে প্রণীত হইয়াছে ( \* ) ।

\* মনিয়ার উইলিয়েম্‌স্ রামায়ণ ও

২। রামায়ণের প্রথম প্রণয়ন সময় ব্রাহ্মণ্যকালের আর বৌদ্ধকালেরও পূর্ববর্তী। রামায়ণের স্থলবিশেষে বুদ্ধের বিষয় উল্লিখিত আছে বটে, কিন্তু উহা মূল গ্রন্থের অন্তর্গত নয়। সময়ান্তরে উক্ত বিষয় রামায়ণে প্রকিপ্ত হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। সুতরাং রামায়ণ এই সময়ের অপেক্ষাও প্রাচীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

৩। মহারাজ অশোকের খোদিত লিপি পাঠে লক্ষ্য অবগত হওয়া গিয়াছে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সাধারণ লোকের ভাষা অমিশ্র সংস্কৃত ছিল না। তখনকার ভাষা বিমিশ্র সংস্কৃতের প্রকার ভেদমাত্র। সচরাচর এই ভাষা “প্রাকৃত” সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। রামায়ণে এই প্রাকৃতের লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না। যদি রামায়ণ তৃতীয় শতাব্দীতে বিরচিত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই উহাতে সংস্কৃত নাটকাদির ন্যায় কোম প্রকার প্রাকৃতের সংজ্ঞা থাকিত। কিন্তু রামায়ণ সরল, সহজবোধ্য ও পরিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিত। ইহাতে কোন প্রকার কঙ্কণ্পনা অথবা কার্টিনোর চিহ্ন নাই। ইহাতে প্রতীত হইতেছে, সাধারণের ভাষা মহাভারত উভয়ই এক প্রস্তাবে নিবদ্ধ করিয়া ইনিমাদ ও ওদিসির সহিত ভাষার তুলনা ও সমালোচন করিয়াছেন। আমরা বর্ণনীয় প্রবন্ধের অনুরোধে রামায়ণ হইতে মহাভারত বিযুক্ত করিয়া লইলাম।

প্রাকৃতে পরিণত হইবার পূর্বে ভারতবর্ষের প্রায় সকলেই সরল সংস্কৃত বুঝিতে পারিত। খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে অর্থাৎ প্রায় পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সাধারণের এইরূপ সংস্কৃত ভাষার অধিকার ছিল।

৪। রামায়ণের বিবরণ পাঠে লক্ষ্য প্রতিপন্ন হয়, দাক্ষিণাত্য ও তাহার দক্ষিণ পশ্চিমবর্তী প্রদেশে আর্যগণের অধিবাস ছিল না। সুতরাং রামায়ণ যখন প্রণীত হয়, তখন উক্ত প্রদেশে আর্যসন্ততির উপনিবেশ স্থাপিত হয় নাই। কিন্তু অশোকের অনুশাসন লিপি অনুসারে বোধ হয়, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে মগধের আধিপত্য ভারতবর্ষের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। পঞ্জাব, দিল্লী, কটক এবং গুজরাটে মগধসাম্রাজ্যের খোদিত লিপি সমূহ পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বারা লক্ষ্য প্রতিপন্ন হইতেছে, খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর বহুপূর্বে রামায়ণ প্রণীত হইয়াছে।

৫। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ডিওনক্রিস্টোমাস নামক জনৈক গ্রীক লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে হিন্দুদিগের বিরত মহাকাব্যের বিবরণ বর্তমান ছিল। এই বিবরণ হোমারের ইনিমাদ হইতে লিখিত অথবা অনুবাদিত হইয়াছিল। অধ্যাপক লাসেন্স প্রমাণ করিয়াছেন যে, ডিওনক্রিস্টোমাস মেগাস্থিনিসের লিখিত বিবরণ অবলম্বন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। মেগাস্থিনিস নুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্তের

সভায় অনেক কাল ছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন, ভারতবর্ষে খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে ইনিয়াদের সূচক কাব্য বর্তমান ছিল । কিন্তু হিন্দুগণ যে এবিষয়ে হোমার হইতে কোন ভাব সংগ্রহ করিয়াছেন, মেগাস্থিনিসের এই বিবরণে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয় না ।

মণিয়ার উইলিয়েম্‌স্‌ এই পাঁচটী যুক্তি দেখাইয়া স্থির করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সময়ের পূর্ব্বে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে রামায়ণ প্রথম প্রণীত হয় । প্রথম অবস্থায় রামায়ণের যে সমস্ত প্রণেতা ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে । এটী না হইলে বাল্মীকিকেই প্রণেতা বলা উচিত । কিন্তু মণিয়ার মতে বাল্মীকি কখনই সমস্ত গ্রন্থের প্রণেতা নহেন ।

ভারতবর্ষের যে অংশ কোশল নামে অভিহিত হইত, মণিয়ার উইলিয়েম্‌স্‌য়ের অনুমান অনুসারে বাল্মীকি সেই অংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন । কোশলরাজ্যের প্রধান নগর অযোধ্যা । হৃষ্যবংশপ্রভব মহারাজ দশরথ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন । এই কোশল রাজ্যের নিকটেই রাজর্ষি জনকামিষ্ঠীত বিদেহ রাজ্য অবস্থিত । বাল্মীকি কুম্ভজকুর্সেদের মতানুবর্তী ছিলেন । রামায়ণযাচিৎ গম্পও তৈত্তিরীয়ক সমূহের মধ্যে যতপূর্ব্বক সংরক্ষিত ছিল । কলিকাতা প্রিভিউতে ( ১ ) কন্‌ সাহেব লিখিয়াছেন বাল্মীকি গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থল এ-

লাহাবাদের নিকটে যমুনাতে অবস্থিত করিতেন । কিম্বদন্তী অনুসারে বৃন্দাবনও হু বান্দা বিভাগের একটি পাহাড়ও তাঁহার আবাসস্থান বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে । অনেকে স্থির করিয়াছেন, বাল্মীকি জীবনের প্রথমাবস্থায় ক্রুরকর্ম্মা দন্দ্য ছিলেন, পরিশেষে আপনার পাপকার্য্যে অনুতপ্ত হইয়া এই বান্দা বিভাগের পাহাড়ে মুনিরূপে অবলম্বন করেন । এই স্থানেই রাম-পরিভ্রান্ত সীতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় । সীতা বাল্মীকির আশ্রমে অবস্থিত করিয়া কুমারদ্বয় প্রসব করেন । বাল্মীকি এই কুমারদ্বয়কে স্বপ্রণীত রামচরিত শিক্ষণ দেন । কন্‌ সাহেবের মতে বাল্মীকি রামের সমকালবর্তী নহেন ।

রামায়ণের গম্প নিতান্ত হৃদয়াকর্ষক এবং লোকপ্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে বিরচিত । ইহা অতি বিস্তৃত, দোষরহিত ও বক্তব্য বিষয়ে সংযত । ইহার গম্পাংশ পরম্পরের সহিত সমঞ্জসীভূত । ইহার ভাষা সরল সুখবোধ্য ও সর্ব্বপ্রকার কাঠিন্য বিবর্জিত । এই সমস্ত গুণ থাকাতে রামায়ণ সহজেই মনে রাখিতে পারা যায় । স্মৃতির এইরূপ অমূল্যতার জন্য রামায়ণ যখন শেখাবস্থায় স্থাপিত হয়, তখনও ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে মুখে মুখে কীর্তিত হইত । রামায়ণ প্রায় অমূল্য জ্ঞানে বিরচিত । এইক্ষণে যে রামায়ণ লোকসমাজে প্রচলিত আছে তাহাতে প্রায় ২৪ সহস্র শ্লোক দৃষ্ট হয় ।

মণিরার উইলিয়াম্‌সের মতে রামায়ণের দ্বিতীয় অবস্থার সময় খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দী। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে রামায়ণ প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে সংগৃহীত ও সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণ্যসাময়িক রামায়ণই এক্ষণে সর্বত্র প্রচলিত।

রামায়ণের সহিত ইনিয়াদের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বাস্তবিক ও হোমার উভয়েই নুনিপুণ চিত্রকরের ন্যায় ঘটনাপট চিত্র করিতে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরন্তু রামায়ণের সহিত ইনিয়াদের সাদৃশ্য থাকিলেও বিষয় বিশেষে পরম্পরের সহিত পরম্পরের বহু বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। যদিও উভয়ে আৰ্য্যজাতীয়, তথাপি দেশ কালাদির দুরতা অনুসারে আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে উভয়ের কাব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন লক্ষণাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, মানবজীবনের প্রকৃত চিত্র অঙ্কণে ও প্রাচীন সময়ের ব্যবহার বর্ণনায় রামায়ণ হোমারের কাব্য অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। রামায়ণ প্রাচ্যদেশ-পরিদৃষ্ট অমানুষী কল্পনায় পরিপূর্ণ, ইনিয়াদ সরল মানবী ঘটনায় সংঘত। সুরতরাং যেস্থানে ইউরোপীয় প্রকৃতি অল্প বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকিত, সেস্থলে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি কঠোর অভ্যক্তির পরিচয় দিয়া কল্পনাসামর্থ্য প্রকাশ করিত।

এই কারণে সময়, স্থান ও কার্য অংশে ইনিয়াদ অতি অপ্রশস্ত নীমায় সঙ্কচিত;

কিন্তু রামায়ণে ইহাদিগের ক্ষেত্র অসীম। এক একটি চরিত্রের অঙ্কণ বিষয়ে রামায়ণ এদিসির সহিত তুলনীয় হইতে পারে, কিন্তু গম্পসংযোজন ও রচনাসারল্য প্রভৃতিতে রামায়ণ ইনিয়াদের তুল্য লক্ষণাক্রান্ত। রামায়ণে যে সমস্ত হৃদয়গ্রাহণী বর্ণনা আছে, হোমারের কাব্য কোন অংশেই তাহার গুণাতিক্রম হইতে পারে না। ভাবের সরলতা ও সুপরিচ্ছন্নতা এবং রচনার গাভীর্য ও পরিপূর্ণতা বিষয়ে রামায়ণ ইনিয়াদ অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু রামায়ণ প্রাচ্যদেশপ্রসিদ্ধ রূপক, উপমা প্রভৃতিতে ভারাক্রান্ত। এইরূপ অলঙ্কারপ্রিয়তা অনেক সময়ে উদ্দীপনার ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে।

হিন্দু মহাকাব্যের প্রায় সমস্ত উপমাই আসিয়াজাত জন্তু অথবা রক্ষ লতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ বিশেষ হইতে আহৃত। পরন্তু স্বাভাবিক দৃশ্যের বর্ণনাস্থলে হিন্দুকবিগণ স্বীয় রচনা ঘেরূপ আলেখ্যবৎ রমণীয়তা ও স্বভাবোক্তিতে পরিশোভিত করিয়াছেন, গ্রীক অথবা লাতিন কবিগণ সেরূপ করিতে পারেন না। প্রাচ্যদেশের বহিঃ প্রকৃতি নিতান্ত রমণীয়; ফল-পুষ্প-সুশোভিত-রক্ষাবলী, উজ্জ্বল আকাশ, নবীকৃত বর্ষাকাল, প্রচণ্ড ঝটিকা, অশ্লিষ্ট চন্দ্রকিরণ প্রভৃতিতে প্রাচ্যভূমির যে অপূর্ণ শোভা হয়, তাহা ইউরোপীয় দিগের দৃষ্টিপথবর্তী হয় না। এই কারণে তাঁহারা অনেক স্থলেই স্বভাব



বর্ণনে হিন্দুদিগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন। আচার ব্যবহারের বিষয় বিবেচনা করিলেও রামায়ণ অপেক্ষা হোমারের কাব্য উচ্চসত্যতার পরিচয়স্থল নহে। যদিও রামায়ণের যুক্তক্ষেত্র ও অস্ত্রাদি প্রয়োগ নিতান্ত অভ্যুত্তীর্ণ এবং অমাব্যবী বিষয়ে পরিপূর্ণ, তথাপি তৎসমুদয়ে অসত্যতা বা নির্দয়তার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না। হেক্তরের প্রতি একিলিসের ব্যবহারের সহিত রাবণের প্রতি রামের ব্যবহারের তুলনা করিলেই এবিষয়টি পরিষ্কৃত হইবে। একিলিস পতিতশত্রুর প্রতি নির্দয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; রাম পতিত শত্রুর প্রতি সৌজ্ঞেয় একশেষ দেখাইয়াছেন। এইরূপ উদারতা-ওণে রামায়ণ, ইনিয়াদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মুখ সমৃদ্ধির বর্ণনাতে রামায়ণ ইনিয়াদের নিম্ন গণ্য নয়। বাঙ্গালিকির অযোধ্যা ও লঙ্কা হোমারের স্পার্টা ও ট্রয় অপেক্ষা অনেক অংশে ভোগবিসাস এবং সৌভাগ্যসম্পদের বিলাস ক্ষেত্র।

অনেক অবাস্তব গল্প বর্তমান থাকিতে রামায়ণের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়ে ধারাবাহিকত্বের অভাব দৃষ্ট হয়। এটি হিন্দু মহাকাব্যের একটি প্রধান বিয় এবং ইহাই কাব্যান্তরের সহিত তারতম্য করিবার একটি বিশেষ লক্ষণ। এখানে ইনিয়াদ যদিও সমালোচকগণকৃত দোষারোপ হইতে বিমুক্ত নহে তথাপি উহা রামায়ণ অপেক্ষা অনেকাংশে মার্জিত।

অনেকে বিশ্বাস করেন, ইনিয়াদ বিভিন্ন স্থান-প্রচলিত একবিষয়ক গীতি-কবিতার সংগ্রহ মাত্র। এই সংগ্রহে পরিশেষে মহাভারতের ন্যায় অন্যান্য কবিতা প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। গ্রীক সংযোজনী শক্তি এইরূপ বিভিন্ন অংশ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রক্ষেপ সমূহকে এক সূত্রে গ্রহণ করিয়া একাবয়বী করিয়া তুলিয়াছে। ইনিয়াদের স্থলবিশেষে গল্পান্তর দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাঁহা ভারতীয় কাব্যগত অবাস্তব গল্পের ন্যায় অতি বিস্তৃত ও বর্ণনীয় বিষয়ের বাধাজনক নহে। যদিও এগুলি মহাকাব্যের সমাপ্তি পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজ্য নহে, তথাপি একবার দেখিলেই বোধ হয় যেন উহা প্রধান গল্পগত বিষয়ের সহিত আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। এতদ্বিবন্ধন হোমারের অবাস্তব গল্পের সহিত প্রধান গল্পের বিশেষ অনৈক্য দৃষ্ট হয় না। পক্ষান্তরে প্রাচ্য লেখক ও কথকগণোক্ত গল্পের ধারাবাহিকত্ব অনেক স্থলেই ব্যাহত হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায় পরস্পর সংপ্রবৃত্ত্য ভিন্ন ভিন্ন গল্প সমূহ এক সূত্রে গাঁথিতে মুখ বোধ করেন, এবং ইচ্ছামুসারে প্রত্যেকটিরই সমাপ্তি ভঙ্গ করিয়া থাকেন। এইরূপে একটি গল্প শেষ না হইতেই অন্য একটি গল্পের আরম্ভ হয়, এবং এই আরম্ভটি সমাপ্ত না হইতেই আর একটি তাহার সহিত সংযোজিত হইয়া থাকে। এইরূপে গল্প রাশির শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া বর্ণনীয়

বিবরণটিকে সমালোচন করিয়া তুলে। ইহার তাহাই রামায়ণের রচনায় পরিস্ফুট হয়। দৃষ্টান্ত স্বলে হিতোপদেশ ও আরব্যোপ- এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, রামায়ণ অ-  
ত্মাসের উল্লেখ করা যাইতে পারে। যে পোক্ষা মহাভারতেই এই অবাস্তব গল্পের  
অবাস্তব গল্পপ্রিয়তা হিতোপদেশ ও আ- আধিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে।  
রব্যোপত্মাসের গ্রন্থে প্রকাশ পাইয়াছে, ক্রমণঃ

## দেবোপাখ্যান ।

( গ্রীস ও ভারতবর্ষ )

অষ্টম প্রস্তাব ।

কিয়ুপিড, এফ্রোডাইট, চেরিটেস্

কাম, রতি, যষ্টি ।



পূর্ববর্তী প্রস্তাব সকলে যে সমস্ত দেব দেবীর তুলনা করা গিয়াছে, উভয় দেশীয় দেবোপাখ্যানেই তাঁহাদের রূপবর্ণনা আছে। কিন্তু কাম ও রতির আ-  
কৃতি ও স্বরূপ যথায়থ বর্ণন করিতে কেহই প্রয়াস পান নাই—তাহারা পা-  
ইয়াছেন তাঁহারাও অকৃতকার্য হইয়া-  
ছেন। ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হস্তে প-  
ড়িয়া তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন আকার ধা-  
রণ করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর কবিগণ  
কএকটি মাত্র পেমসিলের চিহ্ন স্থাপন  
করিয়া দিয়া, সেই চিহ্ন অবলম্বনে রং  
ফলাইয়া সমগ্র দেহকে সূচ্যম এবং সুস-  
জ্জিত করিবার ভার পশ্চাত্তী কবি এবং  
ভাবুকদিগের স্ব স্ব কৃতি এবং অভি-

প্রায়ের উপর রাখিয়া দিয়াছেন। যে  
বিষয়ে ব্যাস, বাল্মীকি, মাঘ, ভারবি, কা-  
লিদাস, ভবভূতি, মেঘদূত, লিটন  
হস্তার্পণ করিতে অসমর্থ অথবা অকৃত-  
কার্য হইয়াছেন, সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উল-  
টিয়া গেলেও কি তাহা অন্যের সাধারণত  
হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে? হোমার  
বর্জিস, ডাটি যাহাতে অকৃতকার্য তা-  
হাতেই বা কে হস্তার্পণ করিবে? এজন্যই  
তাঁহাদের স্বরূপ বর্ণনা সাধাতিত।

সংস্কৃত কবি কারণ বুঝিয়াই, মদনকে  
অনঙ্গ, অতনু, অশরীর, মনসিজ প্রভৃতি  
নিরাকারহৃৎক নাম প্রদান করিয়াছেন।  
তিনি বিবেচনা করিয়াই মহাদেবের কো-  
পানলে কামকে দণ্ড করিয়া নাম গুলির

সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন। নিরাকার মনে ধারণা করা যায় না, সুতরাং কামনা বা বাসনা সমষ্টি জগতের সকল সৌন্দর্য্য, সকল কোমলতা সহ মিলিত করিয়া শিব-পার্বতীর বিবাহ সময় কামকে পুনর্জীবিত করিয়াছেন। যে সকলকে অহোরাত্র দগ্ধ করে তাহাকে দগ্ধ করিয়া ঈশ্বরের শক্তিমত্তাও প্রমাণ করিয়াছেন।

সম্বোধন, উদ্ঘাদন, শোষণ, তাপন এবং স্তম্ভন এই পাঁচটি কামের পঞ্চশর। আবার তাঁহার ধনু পুষ্পময়, তিনি পুষ্প-ধনু, নবচূড়াকুর সেই ধনুর নায়ক। বসন্ত তাঁহার চিরসহচর এবং হৃদয়সখা। তিনি 'ললিত লবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে, মধুকর নিকর করস্থিত কোকিল কুজিত কুঞ্জ কুটীরে' বাস করেন। উকরাজি যখন নবপল্লবে শূশোভিত হয়; প্রকৃতি নাতিশীতোষ্ণ ভাব ধারণ করেন; বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র সকল নবোপ্ত সবুজশস্যে মণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে; যখন কুজ্বটিকাভিনির্ম্মুক্ত নীল নভো-মণ্ডল শশীনক্ষত্রের বিমল কৌমুদীতে পরম-রমনীয় হইয়া উঠে; পরম প্রীতিপ্রদ নিকুঞ্জবনে বিবিধ পাদপ সমূহ পুষ্পিত ও মুকুলিত হইয়া সুবম্য বিস্তার করে, অশোক কিংশুক কেশরাদি কুসুম সকল মলয় সমীরণে ঈষদান্দোলিত হইয়া সুবাস বিস্তার করে; ত্রুতী সকল উজ্জ্বল পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া কান্তকণ্ঠবিক্রান্ত ললনার ক্ষীণ বাহুবলীর ন্যায় আশ্রয়স্থল অবলম্বন করে;

যখন কোকিলকুঞ্জে সমস্ত স্থলে অমৃত বর্ষণ করিতে থাকে এবং 'নন্দা ও হর্ষ' 'শম ও প্রাপ্তি' সহ বিরাজ করিতে আরম্ভ করে তখন জগতে মদনের আবির্ভাব। যেমন কোন দেশের আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা বুঝিয়া মাত্রই সতর্ক বিদেশীয় ভূপতি আপন অধিকার বিস্তার করিতে লোলুপ হইয়া অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করেন, সেইরূপ জীবগণের হৃদয়-রাজ্য বিলাস বাসনা দুর্ব্বল হইয়াছে দেখিয়া মাত্রই বিখ-বিজয়ী অনঙ্গদেব আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসেন। অপধৃষ্য শুক্রশি-বাও তাঁহার অধিকার বহির্ভূত হইতে পারেন না। মনুষ্যের ত কথাই নাই দেব-গণও তাঁহার অধীন।—

কামপরমবশং নবিপ্রকুর্ষ্য।

ঈতিমপিয়দমীম্পৃশতিভাবাঃ।

কাম মনসিজ, কারণ বাসনা মনেই উৎপন্ন। বাসনার প্রাবল্যে চিত্তের বিবেক শক্তি থাকে না, ভ্রান্তি আসিয়া সকল আলোড়িত করিয়া ফেলে, সুতরাং মদনের শর সম্বোধন, উদ্ঘাদ। লৌহাদি উপাদানে নির্ম্মিত শায়কে শরীর বিদীর্ণ করিতে পারে, কিন্তু মনের কিছুই করিতে পারে না। মদনশর হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দৃঢ় বিদ্ধ করে। তাঁহার সন্ধান অব্যর্থ।

প্রকৃতিতে যেখানে যাহা সুন্দর আছে একত্র কর, যেখানে কোমলতা পাও তাহাতে আনিয়া সংযুক্ত কর, কল্পনাতে মনে উপযুক্ত রূপ অবলম্বন গঠিত এবং যথা

যথ রঞ্জিত কর মনসিঞ্জের মনোমোহিনী  
মূর্তি দেখিতে পাইবে। সে এত সু-  
ন্দর, তাহাতে মার্দব এত অধিক যে কু-  
সুমসুবাসবাহী মলয়মাক্তের সুমন্দহি-  
মোলও তাহাতে সহ্য হয় না। আবার  
আক্রমণ এত ভরানক যে দেবমানব কা-  
হারও নিকৃতি নাই।

পৃথিবীতে চিরবসন্ত থাকে না, সখা ব্য-  
তীতও কামদেব একাকী থাকিতে ভাল  
বাসেন না। সুতরাং চিরবসন্তবিরাজিত  
বাসবপ্রভুনিকেতন অমরাবতীতে, পা-  
রিক্রান্তসুবাসিত, অঙ্গুরা ও বিদ্যাদরী প-  
রিত নন্দন কাননে সখাসহ মনের আ-  
ছাদে অনঙ্গদেব বাস করেন। আবার  
নিমেষ মাত্রে সমস্ত জগৎ পরিক্রমণ ক-  
রিতা একবার সকলের হৃদয় পর্যবেক্ষণ  
করিতা আইসেন।

ঐসের কিয়ুপিড অজ্ঞাত দেবগণের  
জ্ঞায় আকৃতিতে মনুবা। তিনি অন্ধ, অঙ্গ-  
বয়স্ক বালক। আবার কেহ কেহ এরূপ ব-  
লেন তাঁহার একটি মাত্র চক্ষু। তাঁহার পৃষ্ঠে  
তুণ, হস্তে ধনু। তিনি এবিষয়ে কামের  
অমুরূপ। তিনি অত্যন্ত দুর্বৃত্ত ও নিষ্ঠুরবৎ।  
হাসিতে হাসিতে একবার এদিক, এ-  
কবার ওদিক ঘাইতেছেন আর স্রবোং  
বুঝিয়া অতর্কিতভাবে, স্বয়ং অলক্ষ্য  
থাকিয়া, অসতর্ক দেবদেবী মানবমা-  
নবী-ভঙ্গরে দৃঢ়তর শর সন্ধান করিতে-  
ছেন। প্রণয় ভাল মন্দ বুঝে না, সুন্দর  
কুৎসিত বিবেচনা করে না সুতরাং ভিনস্-

হৃদয়বিহারী প্রণয়রূপী কিয়ুপিড অন্ধ।  
আবার প্রণয় অকারণে ব্যক্তিবিশেষের  
পক্ষপাতী, সুতরাং কিয়ুপিড এক চক্ষু-  
হীন।

আর্য্যকবি বলেন অন্য কোন চক্ষু দ্বারা  
যাহা দেখা যায় না, অথবা দেখা গেলে ভ্রমা-  
ন্ধতা প্রযুক্ত যাহা বুঝিতে পারা যায় না, প্র-  
ণয়চক্ষে তাহা দেখা যায় এবং বুঝা যায়।  
প্রণয়নেত্রে অলৌকিক জ্যোতি, অলৌকিক  
ক্ষমতা। প্রণয়চক্ষু দিব্যচক্ষু। সুতরাং  
মদনের নয়ন সর্বাপেক্ষা তেজস্বী

এই দুইটি মতের কোনটি উত্তম তাহা  
সম্বিবেচকের বিবেচনার উপর নির্ভর করে।  
এবিষয়ে কবির কল্পনা দুইদেশে দুইরূপ  
সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। বাস্তব, সা-  
ধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় সৌন্দর্য্য ও  
বাসনা প্রায় একত্র চলে। সুন্দরতাকে অন্ধ  
করিতা সৌন্দর্য্যের অবমাননা এই জন্তই  
আর্য্যকবি উপযুক্ত বোধ করেন নাই

রতি ও ভিনসের স্বরূপ বর্ণন করা আরও  
কঠিন। উভয়েই রূপ এবং প্রণয়ের অধি-  
ষ্ঠাত্রী দেবী। যাহার ইচ্ছারূপ উৎস হইতে  
সৌন্দর্য্য উচ্ছসিত হইয়া সমস্ত জগৎ  
উদ্ভাসিত করে; যিনি তরু, লতা, ফুল, ফল,  
পত্র, পল্লব, এবং শ্যামল দুর্বাদল প্র-  
ভৃতিকে স্তরে স্তরে মনোহর বেশে সা-  
জাইয়া রাখেন; যিনি বালকের প্রাণঃ-  
স্বর্য্যসদৃশ প্রফুল্ল বদন, এবং যুবক যুবতীর  
বিলাসপরিপূর্ণ রূপরাশি বিকশিত করেন;  
যিনি চন্দের কৌমুদী, স্বর্ঘ্যের রশ্মি এবং

নক্ষত্রের শোভাকে প্রাণারাম এবং মনোমদ করেন তাঁহার সৌন্দর্য্য কেমন করিয়া। কল্পনার বিষয়ীভূত হইবে! এখানে কবি হার মানেন, বিজ্ঞান বিবশ হন, গণিতশাস্ত্র বসিতেও আসন পান না। জায়শাস্ত্রের কুট প্রায় হাঁহার মর্য্যোদ্ধারে অসমর্থ, হাঁহার প্রকৃতিনির্ণয়ে দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন পরমপুরষ দেবগণও অসমর্থ, তাঁহার প্রকৃতি কিরূপে নির্ণিত হইবে? তিনি সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্যসমষ্টি। ঝটিকান্দোলিত, উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরের অনন্তজলরাশিতে অথবা ললিত-সবজলতা-পরিবৃত নিকুঞ্জবন-বিহারিনী ক্ষুদ্র কল্লোলিনীর মন্দ প্রবাহে; হিমাচলের তুষারমণ্ডিত গভীরাকৃতি শীর্ষদেশে অথবা হরিৎ-শসাশোভিত শমতল ক্ষেত্রে; পূর্ণায়ত রামধনুতে কিংবা কদলী, কেতকী, গুবাক-গর্ভপত্রে, অর্দ্ধপক পনস বা কুবক পত্রে; যোগীর যোগাবাস গিরিগঙ্ধর-মধ্যবর্তী শূত্র প্রদেশের আলোক ও অন্ধকারের মিশ্রণোৎপন্ন গভীর অগচ রমণীয় দৃশ্যে; কৌমুদীস্নাত নবদুর্বাদলে, প্রাণরবিকীর-গোদীপু মকভূমি মধ্যস্থিত ওয়েসিসে এবং বনঘটাস্থ বিদ্যামালায় যে সৌন্দর্য্য, রতি ও ভিনসে তাহার সকলই আছে। তাঁহাদের রূপে মানিনীর মলিন অঞ্চল প্রণয়পূর্ণ মুখচ্ছবি এবং বর্ষাকালের পূর্ণায়ত নদীর অথবা পুঞ্জকোণ্ডে পুঞ্জবতীর শোভা বিরাজ করে। সেতার ও এতাজের সুমধুর

বাদ্য, কোকিলের কলকণ্ঠ, ললনার মধুর প্রণয়াভিবাদন, শিশুর আধ আধ মধুর-কথা সকল, এবং যোগ্য পুঞ্জের রক্ত জনকের প্রতি আশ্বাস বাক্য যে মধুরতা উপাদান করে তাঁহাদের মধ্যে সে সমস্তই আছে। জীষের মৃদুমন্দ মাঝতহিল্লোল, বর্ষার দূরবর্তী মেঘরব ও বারিসিক্ত পাখীর স্বনি, শরতের ফলপূর্ণ রক্ষ, হেমন্তের শশাশোভা, শীতের সুখশয্যা ও বসন্তের পুষ্পরমণা অন্তঃকরণে যে সুখ উপাদান করিতে পারে, ভিনস্ ও রতির অনবদ্য সৌন্দর্য্যে সেই সুখ উপাদান করে। কি ভয়ঙ্করে, কি মনোহরে, কি মধ্যবর্তী মিশ্রণোৎপন্ন অবস্থায়, যেখানে যাহা কিছু সুন্দর দেখে তাহার সকল গুলিই একোডাইটে এবং রতিতে পাইবে। জ্যোতির্বিদদের গ্রহনক্ষত্রবিদ্যাস্ত চক্ষু যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় অথবা বিলাসীর রসালস চক্ষে যে কোমলতা আবিষ্কার করে তাহার সকলই একাধারে বিরাজ করে। সেইরূপ-সমুদ্রের এক বিন্দু একবার পতিবিরহবিধুরা ললনার নিস্ত্রিত নয়ন-সমক্ষে প্রাণকান্তের সহাস্য প্রেমপূর্ণ মুখচ্ছবি আনয়ন করিতেছে, আবার বৈজ্ঞানিক সমক্ষে সমস্ত জগতের উপপত্তি, স্থিতি, প্রলয়রূপে উপস্থিত হইয়া অন্য একপ্রকারের শোভা ধারণ করিতেছে। ভিনস্ ও রতি উভয়েই এরূপ সুন্দরী যে, তাঁহারা সমস্ত জগতের সৌন্দর্য্যের উপমাংস। যে অত্যন্ত সুন্দরী সে রতি বা একোডাইট,

তঁাহাদিগকে কাহার সহিত তুলনা করিব ?  
তঁাহারা “ অনির্ব্বাচ্য নিকপমা, আপনি  
আপনা সমা ” । এতদ্ব্যতীত আর কি  
বলিব ?

এক রূপ বলিতেই অস্থির,—চতুর্দিকে  
যাহা কিছু স্মরণ দেখিয়াছি একত্র করিতে  
ক্ৰটি করি নাই—ভালবাসা কেমনে প্রকাশ  
হইবে ? হৃদয়ের যে নিষ্ঠুর ভাব কিছুতেই  
প্রকাশ হইবার নয়, যাহার প্রকৃত অবস্থান  
মাত্র কবির কল্পনায়, তাহা কিরূপে প্র-  
কাশ হইবে । যিনি এক দিনের জন্যও  
নিঃস্বার্থ ভাল বাসিয়াছেন, যিনি মুহূর্ত্ত-  
জনাও আত্মসুখ, আত্মজীবন অন্যের জন্য  
উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই  
প্রণয়ের সত্তা ও স্বরূপ বুঝিবেন না । যিনি  
প্রকৃত প্রণয়াদার, তিনি আপন হৃদয় পর্য্য-  
বেক্ষণ করিলেই বুঝিবেন, রতি ও ভিনস্  
যে প্রণয়-উপাদানে নির্ম্মিত তাহার এক  
কণামাত্র, এক পরমাণু প্রমাণ পদার্থ তঁা-  
হাতে আছে বলিয়াই তিনি অন্যগত-  
প্রাণ । যে হৃদয় সম্পূর্ণ সেই উপা-  
দানে নির্ম্মিত তাহাতে কত সুখ ও কত  
দুঃখ । অনলের ক্ষুদ্র মাত্রের সমস্ত দগ্ধ  
করে, কিন্তু অনল স্বয়ং জ্বলে না । কারণ  
অনল অচেতন পদার্থ । কিন্তু যে অনলে অ-  
মৃত্যুভিষেক এবং দাঘ গুণ একত্র অবস্থান  
করে সঙ্গীত হৃদয়ে সেই অনল জ্বলিয়া উ-  
ঠিলে কত সুখ ও কত দুঃখ ।

ভিনস্ ও রতি একই প্রকার, রূপে ও  
গুণে উভয়েই অভূল্য । তবে কি তঁাহা-

দের কোন প্রভেদ নাই ? অবশ্যই আছে ।  
দুই কখনও এক হইতে পারে না । যাহা  
অনেকাংশে একরূপ তাহারও কিছু না  
কিছু প্রভেদ থাকে । যদি প্রভেদ থা-  
কিল তুলনায় কে শ্রেষ্ঠ দেখা যাউক ।

ভিনস্ বসন্তের কুম্বরেণু,—কুম্বমস-  
মষ্টির সৌন্দর্য্য,—সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূ-  
ন্দর বস্তু, অতি সুগন্ধ, এবং দেখিতে যার  
পর নাই মনোহর, কিন্তু প্রত্যেক বায়ুতে  
কলঙ্কিত ও বিঘটিত এবং প্রতি প্রদোষে  
পর্য্যুসিত । রতি নক্ষত্রের বিমল জ্যোতি,  
শরৎ শশীর কৌমুদী ছটা,—উজ্জ্বল, প-  
রম পবিত্রা এবং নয়ন ও মনের তৃপ্তি সা-  
ধিনী । ভিনস্ ও রতি, রতিও রতি ; কিন্তু  
রতির সতে আশঙ্কি, ভিনসের সদসৎ  
সকলেই আশঙ্কি । রতি পতিব্রতা সতী,  
ভিনস্ পরম্পূহা বতী । রতি গৌরবিনী,  
ভিনস্ কলঙ্কিনী ।

হরকোপানলে মদন ভস্মাবশেষ হই-  
লেন । রতি দেখিলেন তঁাহার জীবনে  
প্রয়োজন কি ? বিলম্বে পাপ হইতেছে ।  
অতএব সমস্ত জগৎকে বুঝাইলেন, অগ্নি  
প্রবেশ করিয়া শীঘ্র স্বামী সঙ্গিধানে গমন  
করা কর্তব্য, স্ত্রীর স্বতন্ত্র জীবন ও অবস্থান  
সম্ভবে না ।

“ শশিনাগহ যাতি কৌমুদী  
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়েতে ।  
প্রমদাঃ পতিবস্র্জ্জগা ইতি  
প্রতিপন্নং ছিবিচ্ছেতনৈরপি । ”  
তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে

স্বামী বিনা স্ত্রীর জীবন দীপশূন্য দশার  
ন্যায় নিতান্ত অকৰ্মণ্য ও অকিঞ্চিৎকর।  
আশ্রয় হ্রদের পতনে আশ্রিতা লতার অন্য  
গতি নাই। অতএব স্বামীসখা বসন্তের  
নিকট বলিলেন।

“গতএব নতে নিবর্ততে  
সসখা দীপইবানিলাহতঃ।  
অহমস্যা দশেব পশ্যাম্য।  
মবিসত্যা বাসনেন ধুমিতাম্ ॥  
বিধিনা কৃতমর্জ্জবৈশম্যম্  
নমুখ্যং কামবধে বিমুক্ততা  
অনপায়িনি সংশ্রয় দ্রুমে  
গজভয়ে পতনায় বল্লরী।”

ভিনসের কুকৰ্মী কলুষিত আত্মায় এ-  
রূপ ভাব কখনও উদয় হয় নাই। তিনি  
স্বকীয় স্বামী বর্তমানে, সেই নিরীহ প্রকৃতি  
ভক্তলোক ভালকান্কে অবজ্ঞা ও অনাদর  
করিয়া দেব মানব মধ্যে যাঁহাকে মখন  
মনে হইত তাঁহাকেই পতিতে বরণ করি-  
তেন। দেবসেনাপতি মার্চ এবং অজ্ঞাত  
শত্রু অনাগতযোবন এডনিসের সহিত  
তাঁহার গুপ্ত প্রণয়ের বর্ণনায় ইয়োৰোপীয়  
সকল দেশের কাব্যই কলঙ্কিত। ভালকান্  
বখন টের পাইতেন তখন ক্রোধে অগ্নীর  
হইয়া ভিনস্কে প্রহার করিতেন। ভিনস্  
অনেক সময় পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা  
করিতেন। এত তাঁহার নিজের চরিত্র।  
জগতে যত দুষ্কৰ্ম যত অত্যাচার সকলই  
ভিনস্ কর্তৃক সংসাধিত। মেনিলসের  
হেলেন্ পারিস্কে দিয়া যে বিষম অনর্থ

সংঘটন করিয়াছিলেন, তাহাতেই ট্রয়  
গর ধ্বংস হইল, এগামেম্ননের পরিবারের  
শোচনীয় দুর্গতি হইল, এবং গ্রীস ও ট্রয়ের  
বীরকুল নিখূল হইল।

কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়  
যে গ্রীক কবি প্রণয়কে স্বাধীন করিতে  
গিয়া, স্বাধীন মকরকেতুকে বিবাহ বন্ধনে  
বদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া এরূপ করিয়া-  
ছেন। যাঁহাকে ইংরেজীতে ‘ফিলড্’  
অর্থাৎ স্বাধীন প্রণয় বলে তাহা গ্রীক ক-  
বির অনুমোদিত। কিন্তু অর্থা কবির মত  
সেরূপ নহে। যেমন এক উৎসের জল  
চতুর্দিকে বাপ্ত হইলে তাহার বেগ, গভী-  
রতা, তরঙ্গ, তর্জন কিছুই থাকে না, সেই-  
রূপ হৃদয়ের তরলতা, প্রণয়ের উৎসের  
পবিত্রবারি এক স্রোতে প্রধাবিত না হইলে  
কখনই নিতা, গভীর, অবিরামবাহী এবং  
‘তটাবিনাশী’ হইতে পারে না। এমতটি  
যে কেবল যুক্তিধারা সাধ্য এমন নয়;  
এটি নীতি শাস্ত্রের তিস্তিতুমি। প্রণয় বি-  
কৃত হইয়া উদ্ভ্রান্ত ও উদ্ভূত হইলেও আধার  
পরিবর্তন করিতে পারে না, তাহা করিলে  
আর তখন ঐ নাম থাকে না। সে প্রণয়ের  
বিড়ম্বনা মাত্র। যদি ভালবাসা কবির কল্পনা  
মাত্র না হইয়া প্রকৃত কিছু থাকে তবে সে  
একের জন্য। প্রণয় ‘একমেবাবিভীষম্।’  
ভিনস্ ও রতিতে যে প্রভেদ তাহা প্রদর্শিত  
হইল। একগে বলা বাহুল্য যে রতির প্রেতভ  
বিষয়ে বিকল্পিত করা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক  
হইবে।

চেরিটেস্ (গ্রেস্) সহ ষষ্ঠীদেবীর তুলনাবলে উভয়েই মাতৃস্বরূপা, হৃদয়ানন্দ বিধায়িনী। গ্রীক কবি যতটি দেবমূর্তি ও প্রকৃতি কল্পনা করিয়াছেন চেরিটেস সর্বাপেক্ষা মনোহারিনী হইয়াছে। কবির মনের গতি সার চিত্রকরের তুলি সকল সময়ে একরূপ থাকে না। মনের সুখের অবস্থায় বাহ্য কল্পনা করা যায় তাহা অপেক্ষাকৃত সুন্দর হয়। চেরিটেস্ সেই সুখের সময় কল্পিত হইয়াছিলেন সংশয় নাই।

ঐ দেখ পিতৃমাতৃহীন বালক বালিকা রোদন করিতে করিতে গমন করিতেছিল, মূর্তিমতী ককণা, স্নেহময়ী জননী তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া দক্ষিণ হস্তে অভয় ও আহার দান করিতেছেন এবং বামহস্তে পরামর্শনে সকলের দুঃখ দূর ও শরীর শীতল করিতেছেন। কি মনোহারিনী মূর্তি! যেন হিন্দুদিগের পাবানময়ী অগচ হৃদয়শীলা ককণাময়ী। তাঁহাকে মিস্রুজ্ঞ ও বলে। নিরাজয়ের আশ্রয়দান, নিরন্নকে অন্ন বিতরণ এবং অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করণ তাঁহার নিত্য কর্তব্য।

আমাদের ষষ্ঠী দেবীও এই প্রকার হৃদয়ানন্দদায়িনী। শিশু মাতৃ অঙ্ক আঁধার করিয়া পরলোক গমন করিতেছে, মাতা ষষ্ঠী তাহাকে সাদরে ধুলাসহ অঙ্কে লইতেছেন—হুণা নাই, অনাদর নাই; আর মিষ্ট বাক্যে বালককে বুঝাইয়া ও নানাপ্রকার আশ্বাস দিয়া পুত্রপ্রার্থিনী সমক্ষে পাঠাইতেছেন। নিঃসন্তান মলিনবদন ল-

লনা মনের বেদনার ক্রন্দনে চক্ষু ফুলাইতেছে, তাহার হৃদয়ে তনয়াভাবে গুরুতর আঘাত লাগিতেছে; যখন তাহার সমক্ষে অনেকের বালক তাহার আপন জননীকে মা মা বলিয়া আঁধ আঁধ স্রুমিষ্ট সন্মোদন করিয়া তাঁহার শ্রবণ যুগলে অমৃত বর্ষন করিতেছে, প্রবালবৎ অপর অর্দ্ধ বিস্তার করিয়া মুক্তাশুভ্র দশনজ্যোতি বিকাশ করিতেছে, এবং কচি কচি মুখ খানিতে মধুর হাসি হাসিতেছে তখন তাহার মনে সন্তানভাবে কত কি লইতেছে, তাহার ইচ্ছা করা দুঃসাধ্য। এক একটি উষ্ণ নিঃশ্বাস নির্গত হইয়া নাসারন্ধ্র পুড়িয়া যাইতেছে, কোনটি বা অন্তর্গামী হইয়া হৃদয় স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছে, এবং তাহার পূর্ণেন্দু সদৃশ বদন স্নান করিতেছে। তখন ষষ্ঠীদেবী তাহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার উচ্ছসিত শোকাবেগ প্রশমিত করণার্থ তাহার অঙ্গ নবকুমারে সুরশোভিত করিতেছেন।

চেরিটেস্ তিনজন। পার্শ্বতী সহচরী জয়া বিজয়া নাম তাঁহারা ভিনস্‌সুহচরী। সুরতাং জয়া বিজয়া যেমন পার্শ্বতীর অনুকরণ করেন, তাঁহারাও ভিনসের অনুকরণ করেন। গ্রীক কবি গোলাপে কণ্টক, পুষ্পমধুতে বিষ দেখিয়া চেরিটিগণকে ভিনস্‌সজ্জিনী করিয়াছেন। তাঁহাদের আচরণ সম্বন্ধে কদর্য গাণ ও গণ্ণে দুঃখে গোমূত্র প্রক্ষেপ করিয়াছে।

ভারতের ভূতীর শ্রেণীর অনেক দেব-



দেবীর কার্যের সহিত, চেরটেস্‌দিগের আর তুলনা করা নিম্নয়োজন। যাহা কার্য ঐক্য হয় কিন্তু এসকল বিরত হইয়াছে তাহাতেই আমাদের উদ্দেশ্য করিলে পাঠকদিগের বিরক্তি জনক সফল হইবে এমন ভরসা করা যাইতে হইবে ভয়ে বিরত রহিলাম। অতঃপর পারে।

## কি করি ?

কি করি ? জিজ্ঞাসি কারে, কে দিবে উত্তর ?  
জ্ঞাতো নিশ্চাস সহ, বহে প্রশ্ন অহরহ,  
অজ্ঞাতে, নিত্রায় উঠি,—স্বপনে সিহরি,  
শুনি সনিশ্চাস প্রশ্ন—“কি করি কি করি”?

২

কি করি ? ইহার হয় ! নাহি কি উত্তর ?  
স্বর্গ, মর্ত্য, দয়াতলে, পাঁতালে, জলধিজলে,  
জিজ্ঞাসিমু একে একে, কেহ দয়া করি  
দিল না উত্তর, তবে বল না কি করি ?

৩

নিষ্ঠুর নক্ষত্রলোক, নক্ষত্র আলোকে  
সাজাইয়া নীলাশ্বর, চন্দ্রমুখ মনোহর  
বিকাশি নীরবে আহা ! রহিল চাহিয়া ;  
কি করি কিছুত কই দিল না বলিয়া।

৪

ওই চন্দ্রমুখ আর সেই চন্দ্রমুখ !  
ওই চন্দ্র শিলাময়, ওই চন্দ্রে বহিচর  
অলিতেছে, বহিতেছে স্রোতে নিরন্তর,  
দূর হতে সেও যদি এত মনোহর !

আমার সে পূর্ণচন্দ্র, অমৃত আধার,  
অমৃত অধরে ভাসে, অমৃত নয়নে হাসে,  
আমার সে পূর্ণচন্দ্র সুধার আকর,  
আজি দূর হতে ছায়। কতই সুন্দর !

৬

কি করি ? নিষ্ঠুর স্বর্গ,—দিলনা উত্তর,  
শুশ্যামাঙ্গ দয়াতল, খুলি নিজ বক্ষস্থল,  
দেখাইল কত বন, ভীষণ প্রান্তর,  
খাসিল সমীরে দীর্ঘ—দিল না উত্তর।

৭

বসুন্ধরে ! যাহা ছিল রয়েছে তোমার,  
ওখাণি এতুংখ তব, হয় যদি অনুভব,  
আমার কুসুমবন, কণ্টক কানন,  
হইয়াছে, মকমর স্রুকের জীবন।

৮

কি করি, কেমনে সহি ? তুমি পারাবার  
ছায়। তুমি মহাবাতে, ভীষণ ভরজাঘাতে  
গর্জিতেছে মহামস্ত্রে বিনারি গগণ,  
কুত্র মানবের দুঃখ শুনিবে কখন ?

৯

হায় রে সসীম তুমি, তুমি, পারাবার !  
অসীম মানব মন, করে যদি বিলোড়ন,  
মানসিক ঋটিকায় নাহি তব জ্ঞান  
কি ভীষণ দৃশ্য ! সেই নির্বাত তুফান !

১০

কাঁদি ভীমকণ্ঠে তুমি যাতনা তোমার  
নিবারহে অধুনিধি ; দাক্ষণ সংসারবিধি,  
নাহি দিবে সেই শান্তি আমারে কখন,  
একই ভরসা মনে নীরব রোদন ।

১১

বান্ধুকি পাঁতালে তুমি, সহস্র ফণার,  
ধরিয়ছি এক ধরা ;—তুচ্ছভার বহুধরা,  
নিরাশ জীবন সঙ্গে তুলনা তাহার ?  
এক ক্ষুদ্র ধূল্যসহ তুলনা ধরার ।

১২

কাতর এ তুচ্ছভারে, দিলে না উত্তর ?  
শতদন্তে চিরি বুক, একাধারে কত দুখ—  
চন্ডের আগ্নেয় গিরি, ধরার কানন,  
সমুদ্রে তরঙ্গ ভঙ্গ কর দরশন ।

১৩

কিন্তু নাহি সহ্য আর, কি করি এখন,  
কত কাল সন্ন বল, হায় এই ভীতানল,  
স্মৃতির সহস্র শিখা—সংসার নির্দয়,  
কটকিত, রক্তাকৃত করিবে হৃদয় ?

১৪

অতৃপ্ত প্রেমের এই ঋটিকা সংগ্রাম  
কতকাল সব আর, হায় এই গুহভার—  
নিরাশ জীবন ভার, কতকাল আর ?  
বহিতে হইবে দুঃখ অনন্ত, অপার !

১৫

বহি কারতরে বল ? সে কি ! কার তরে ?  
ওই আশা মৃদুস্বরে উত্তরিছে—“তার তরে,  
যারে তুমি প্রেম, প্রাণ করেছ অর্পণ,  
প্রতিদানে প্রেম, প্রাণ দিগেছে যে জন ।”

১৬

কিবা দান, প্রতিদান ! কিবা বিনিময়,  
হায় এই ধরাতলে ; এই এক মুখ ফলে  
যে দিগেছে, যে পেয়েছে দুই পুণ্যবান,  
কোথা স্বর্গ ? তাহাদের স্বর্গ ধরাধাম !

১৭

হেন স্বর্গ ফলিয়াছে অদৃষ্টে আমার,  
যা দিয়াছি অতি ক্ষুদ্র, যা পেয়েছি সে সমুদ্র,  
দিগে এই তুচ্ছ প্রাণ প্রেরণী আমার !  
পেয়েছি অমূল্য নিধি—প্রণয় তোমার !

১৮

তুমি হারে প্রিয়তমে বলেছ তোমার  
তোমারে যে এসংসারে, আমার বলিতে পারে  
ধরাতলে সেই মুখী, সেই ভাগ্যবান,  
মানব জীবন তার নন্দন উদ্যান ।

১৯

তবে কেন কি করিব ? আমি দীন হীনে,  
হায়রে অমূল্য নিধি, দিয়াও দিলনা বিধি,  
স্বপ্নরাজ্যে ভিন্ন নাই হবে দরশন ।  
“কি করি কি করি” তাই ভাবি অনুক্ষণ ।

২০

হায় ! হেন রত্নহার পড়িয়া গলায়,  
না পারিহু সগরবে, ধাঁধিতে বিন্মিত ভবে,  
জগত করিতে আলো রূপের প্রভায়,  
কি করি কি করি—তাই ভাবি কি সদায় ?

২১

শোভিবে না সেই বহু গলায় আমার,  
নাহি চাহি দরশন, নাহি চাহি পরশন,  
একবার বল প্রিয়ে তুমি কি আমার,  
ধরাতেলে আমি কিছু নাহি চাহি আর ।

২২

কি করিব ? আজি যথা দৃষ্টির সীমায়  
জলধি হ্রয়ে হায়, স্থাপিয়া হে পুর্ণিমায়া,  
নবোদিত পূর্ণশশি চাক জ্যোৎস্নায়  
বিভাসি অনন্তব্যাপি, সিকুনিলিমায়া ।

২৩

আশার সুদূর প্রান্তে ভেমতি তোমায়  
স্থাপিয়া ভীষন মম, এই নীল সিন্ধুসম,  
ঝলসিব, মুখ দুখে তরঙ্গ নিচয়  
সচঞ্চল হবে তব প্রতিবিম্বময় ।

২৪

জ্বলিবে, নিবিবে, উর্ধ্বি হাসিবে নাচিবে  
সেই প্রতিবিম্বতলে ; অনন্ত আশার জলে,  
সেই মৃত্যু, সেই ক্রীড়া, দেখিয়া দেখিয়া  
আশা জলে দেহ তরি দিব ভাসাইয়া ।

## প্রমোদিনী ।

### ঐতিহাসিক উপন্যাস ।

প্রথম পরিচ্ছেদ ।

সুতাত্ত্ব ।

বিস্তীর্ণ জলরাশি । পূর্বাদিকে দৃষ্টি-  
পাত করিলে বোধ হয় কুজ্জ্বটিকা যেন  
এই রৌদ্রের সমগুণ জল এবং আকাশ  
সংযুক্ত করিয়া রহিয়াছে । শূন্যে, বায়ু-  
সমুদ্রে কি যেন ঈষৎ কম্পিত হইতেছে,  
বুঝি এ নিদাকর্ণ গ্রীষ্ম অসহ্য হওয়ার জল-  
নিধি ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে  
ছেন, তাই বহু এত কাঁপিতেছে । বেলা  
এক প্রহরের অধিক নাই । একজন পথ-  
প্রান্ত অধারোহী উপকূলবর্তী একটি বৃক্ষ-  
শাখায় অশ্ববন্ধন করিয়া তকমূলে বসিয়া

আছেন, বিশ্রাম করিতেছেন । দেখিতে-  
ছেন, একটি নবপল্লবও সঞ্চালিত হইতেছে  
না, অথচ বীচিমালা-সমাকীর্ণ সাগরায়ু  
অনবরত সমীপবর্তী বেলাভূমি ধৌত ক-  
রিতেছে । দক্ষিণানিল সাগর সলিলে অ-  
বগাহন করিয়া মধ্যে মধ্যে শীতল হস্তে  
পথিকের ললাট স্পর্শ করিতেছে । সহসা  
একথণ্ড মেঘ আসিয়া সূর্য্যকে ঢাকিয়া  
ফেলিল, অপ্রকৃত জলধির নীল শরীর গাঢ়  
নীলবর্ণ হইল । বাতাস বহিতে লাগিল ;  
অশান্ত উর্মিরাজি আরও অশান্ত হইয়া  
উঠিল ; এক একটি তরঙ্গ পর্ব্বতশীর্ষ হইতেও  
উচ্চ হইয়া শতধা বিভক্ত হইতে লাগিল ।  
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেত্রপ্রাণিত তরঙ্গী সকল কো-

থায় ছুটিয়া গেল তাহার চিল্ল মাত্রও  
রহিল না। পথিক তখন দুর্যোগের লক্ষণ  
দেখিয়া আশ্রয়স্থান লাভে বাধ্য হইলেন,  
এবং সত্বর অশ্বারোহণ করিয়া প্রাণপণে  
ঘোটক চালাইতে লাগিলেন। তিনি এ-  
প্রদেশে ইতঃপূর্বে আর আইসেন নাই,  
সুতরাং এত অল্প সময়ে যে আকাশের এত-  
পরিবর্তন ঘটবে তাহা বুঝিতে পারেন নাই,  
এবং এই জন্যই এত আশ্বস্তচিত্তে বসিয়া-  
ছিলেন। কিয়দূর গমনের পরই ঝটিকা  
সহ রস্টি ও করকাপাত হইতে লাগিল।  
মেঘের ঘন ঘন গর্জনে তাঁহার অস্তঃ-  
করণ নিত্যস্ত ভীত হইল এবং তিনি অশ্বে  
ভীততর কশাঘাত করিতে লাগিলেন।  
সহসা একটি অট্টালিকা তাঁহার নিকটবর্তী  
হইল। তারাতারি অশ্বটিকে নিকটস্থ  
রক্ষাধায় বন্ধন করিয়া যেমন কিঞ্চিৎ  
অখোসর হইয়াছেন অমনি সেই তুরঙ্গের  
উপর বজ্রপাত হইল। অশ্বের প্রাণ বহি-  
র্গত হইল, তথাপি দাঁড়াইয়াই রহিল।  
সেই ভীষণ শব্দে এবং নরনাক্কর বি-  
দ্রাতালোকে পথিকও অচেতন হইয়া  
প্রাচীরপার্শ্বে পতিত রহিলেন।

পরক্ষণেই অট্টালিকার গবাক্ষ এবং  
কবাট সমুদ্র উদ্ভুক্ত হইল, কএকটি লোক  
আসিয়া মৃতকণ্ঠ পথিককে সম্বন্ধে উঠা-  
ইয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল এবং তাঁ-  
হার চৈতন্য সম্পাদনে বিশেষ যত্ন করিতে  
লাগিল। অল্পকাল পরেই তিনি সংজ্ঞা  
লাভ করিলেন। কিন্তু তখনই তাঁহার

মনে হইল যে দীর্ঘপথের একমাত্র সহচর  
প্রিয় অশ্বটি জীবিত নাই, তাহার উপরই  
বজ্রপাত হইয়াছে। পথিক অত্যন্ত দুঃখিত  
হইলেন এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া  
শয়ন করিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা অতীত  
হইলে পর নয়ন উন্মীলন করিলেন। দে-  
খিলেন, দুইটি পরম সুন্দরী ললনা এক-  
পার্শ্বে দাঁড়াইয়া অনিমেষ মরনে তাঁহাকে  
নিরীক্ষণ করিতেছেন। তাঁহার চক্ষে যেন  
আবার বিদ্যুৎ প্রকাশ পাইল, কিন্তু এবার  
জ্যোতি স্থির,—সুখদ। একটির বয়স আ-  
নুজ্ঞা অষ্টাদশ বৎসর—মোহন যৌবনপূর্ণ।  
তিনি অপূর্ণ অঙ্গজ্যোতির্বিশিষ্টা, গৌর-  
বর্ণা, এবং শুভ্রবসনপরিহিতা; দেখিতে  
যেন উষা দেবীর ললাটদেশস্থ সমুজ্জ্বল ন-  
ক্ষত্র, সুন্দর অথচ ঈষৎরান। অপরা পঞ্চ-  
দশবর্ষীয়া, যৌবন সোপানে দণ্ডায়মানা;  
অতুল্য মুখকমলে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের  
অনবদ্য লাবণ্যযুক্ত গঠনে, মনোহর কেশ-  
গুচ্ছে রূপমাদুরী যেন উছলিয়া পড়ি-  
তেছে। কি সুন্দর সুদীর্ঘ নয়ন, কি মনো-  
হারিনী শ্রীবাভঙ্গী, কি অনির্বচনীয় অধর  
শোভা! উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুস্নিগ্ধ মুখশ্রীতে  
এবং লাবণ্যযুক্ত কলেবরে পরম রমণীয়।  
পথিক বুঝিতে পারিলেন প্রথম বিধবা,  
দ্বিতীয়া কুমারী।

‘প্রথম বিধবা’? শোচনীয় চিন্তা!  
বিধাতার কি বিবেচনা মাত্রও নাই?  
তিনি গোলাপে কটক দিয়াছেন, ক্ষতি-  
নাই; পুষ্প একদিনেই পর্য্যুষিত হইবে;

চন্দ্র রাহুগ্রস্ত করেন, তাহাতেও বড় আশে যায় না, চন্দ্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের অঙ্গ সম্পর্ক; চন্দ্র অচেতন পদার্থ, পৃথিবীবহির্ভূত এবং পূর্ণ অবস্থায়ও কলঙ্ক পরিভাগ করে না। কিন্তু যেনয়ন ও মনের তৃপ্তিসাধনের প্রধান সাধন, এমন সুদৃশ্য কমনীয় পদার্থ বালিকায় বৈধব্য অসম্ভব! পথিক ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার চক্ষে জল আসিল! তিনি মন্তক উন্নত করিয়া কামিনীদ্বয়কে দৃষ্টেছিলেন। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি পতিত হওয়া মাত্রই বিধবা কক্ষান্তরে অন্তর্হিত হইলেন। গমন কালে তাঁহার অঙ্গজ্যোতি আবার পথিকের নয়ন স্পর্শ করিল। অপরা দাঁড়াইয়াই রহিলেন।

আমাদের পথিক যুবক। তাঁহার বয়স ত্রয়োবিংশ অতিক্রম করে নাই। বীরোচিত পূর্ণায়ত শরীর চিত্তার আশ্রয়স্থান হইয়া এপর্যন্ত শরীর শীর্ণ অথবা প্রকুল মুখশ্রী জ্ঞান করে নাই। তিনি যেন নিদাঘের নির্মল আকাশ দেখিতে দেখিতে কালজ্যোতে সুসজ্জিতা সুখের জীবন-তরনী ভাসাইয়াছেন, একটি নিঃশ্বাসেও সেই জলরাশি আন্দোলিত করে নাই। তাঁহার মানস-সরোবরে যেন স্বর্ণকমল ফুটিয়া রহিয়াছে, মরালবৎ মৃদু মন্দ গমনে স্বর্ণচক্কু বিস্তার করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বীরত্ব এবং দৃঢ়তা সৌন্দর্য্য ও কোমলতার মিশ্রিত হইলে যে একটি গান্ধার্য্যমিশ্র মনোহর লাবণ্য

উৎপাদন করে যুবকশরীরে তাহাই বিরাজ করিতেছে।

অপরা দাঁড়াইয়াই রহিয়াছেন। দাঁড়াইয়া কি করিতেছেন? পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকা যুবকের দিকে একমনে চাহিয়া আছেন, কেবল যুবক যখন সেই প্রকুল মুখ-কমল সন্দর্শন জন্য বিস্ময়বিস্ফারিত লোচন উত্তোলন করিতেছেন, তিনি তখন আপন নয়ন ভূপৃষ্ঠে রাখিতেছেন। যে বংশে চন্দ্র স্বর্গের অতিরিক্ত প্রাপিতামহ অবধি রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন, সেই নির্মল ক্ষত্রিয়কুলেও এমন রত্ন সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই বুঝি প্রমোদিনী সতৃষ্ণ-নয়নে সেই রূপ স্রুধা পান করিতেছিলেন; তাই বুঝি মনোনিবেশ করিয়া সৌম্যমু-র্ত্তিতে হৃদয়ের অবস্থা পাঠ করিতেছিলেন। অন্যটির এ সংসারের অভিনয় সাজ হইয়াছে—তাঁহার আর আশা কি, দেখাই বা কি, এবং দেখিয়া প্রয়োজনই বা কি?

যুবকের পাদপ্রান্তে শান্তপ্রকৃতি একটি পুষ্প এবং শয্যাসমীপে একটি রত্নাঞ্জী-লোক উপবিষ্টা ছিল। তিনি ইহাদের দুই জনকে পরিচারক এবং পরিচারিকা বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। বর্ষীয়সী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল “আপনার ত কোন শারীরিক অনিষ্ট হয় নাই?”

যুবক। “না। ক্ষণেক মাত্র কষ্ট ছিল, এখনও কাণের নিকট যেন শব্দ হইতেছে। কিন্তু কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।”

রত্না। “আমরা আহ্বানিত হইলাম।”

যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন “এ স্থানটির নাম কি?” রুদ্ধা করিল “কাকীপুর ইহার অতি সন্নিকট। ছাত্তের উপর দাঁড়াইলে রত্নেশ্বরের মন্দির দেখা যায়।” যুবক যেন বিস্ময়ান্বিত অথচ হর্ষিত হইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রকৃতই কি মন্দিরটি ভিত্তি হইতে চূড়া পর্যন্ত স্বর্ণমণ্ডিত?”

রুদ্ধা। “হাঁ, একবার গেলেই স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন।”

তখন রুদ্ধা আলাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণপ্রভাকে আসিতে বলিল। বিধবার নাম ক্ষণপ্রভা। তিনি নিকটে আসিলে ‘এখন যাওয়া উচিত, আর বেলা নাই’ এই কথা বলিয়া প্রমোদিনীকেও সত্বর হইতে বলিল। তাঁহারাই দুই জনেই দাঁড়াইলেন। কিন্তু প্রমোদ যে অমৃতত্বদে মক্ষিকার ন্যায় সাঁতার দিতে ইচ্ছা করিতেছিলেন, তাহার একবিন্দু স্বপ্না পান না করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। স্রুতরাং অমৃতকণাবর্ষী আর দুই একটি কথা শনিবার জন্য এবং হৃদয়কর্ভুক প্রণোদিত হইয়া কর্তব্যের অনুরোধে বলিলেন, “কি! ইনি আজ যার পর নাই কষ্ট পাইয়াছেন, অতএব এরূপে এতটুকু বিশ্রাম করিতে বল।”

যুবকের কর্ণে মধুবর্ষণ হইল! নিদাঘ-শুভ্র মকভূমিতে এই প্রথম রক্ষি হইল, বারি বিন্দু পতন মাত্রেই শুষ্কিয়া গেল, তৃষ্ণার নিরুত্তি হইল না। তখন ধন্যবাদ দেওয়া উপলক্ষে দুই একটি কথা বলা স্থির করি-

লেন। বলিলেন, “স্মরিত্রে! আপনার স্বকোমল হৃদয় যে দরিদ্র পথিকের দুঃখে ব্যথিত হইল এ তাহার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু আপনাকে মানসিক কষ্ট দেওয়া তাহার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত কর্তব্য। অদ্য জীবন রক্ষা করিয়া আপনারা তাহার যে উপকার করিলেন তাহার প্রতিদান এ পৃথিবীতে সম্ভবে না। জীবনের মূল্য সম্বন্ধে পক্ষা অধিক। যে জীবন রক্ষা করিলেন তাহা দান করিলেও যখন উপযুক্ত প্রতিদান হয় না, তখন আর তাহা চিন্তা করা রুখা। আপনার কথার অবশ্য হইতে পারি না, অদ্য রাত্রিতে এই গৃহে অবস্থান করিতে সম্মত হইলাম। জগদীশ্বর আপনাদিগকে সুখে রাখুন, আপনাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।”

ক্ষণপ্রভা আবার কক্ষান্তরে লুকায়িত হইলেন। প্রমোদিনী সূচ্যবিমুক্তমনে পথিকের কথা গুলি শুনিলেন,—ভাবিলেন “জীবন অপেক্ষা মূল্যবান কোন বস্তু কি এত বড় পৃথিবীর কোন অংশেই নাই? এ সংসারে অপার্থিব, নিত্য সুখদ এমন বস্তু আছে যাহা জীবন হইতেও মূল্যবান। আচ্ছা, যুবকের কথা সফল হউক, আমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। উপযুক্ত প্রতিদান যদি না থাকে চাই না, অথবা প্রতিদান আবার কিসের?” প্রকাশে বলিলেন—“আপনার জীবন রক্ষা হইয়াছে এই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার।

প্রমোদিনী এতগুলি কথা কহিলেন।

কেন कहিলেন ? অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিতে এত সাহসই বা কোথা হইতে আসিল ? অন্যদিন, যাহাদের সহিত একত্র অবস্থান তাহাদিগের নিকটেও কিছু বলিতে সতর্ক, আজ সে ভাব কেনই বা অন্তর্হিত হইল ? সকল প্রাশ্ন নিমেষ মধ্যে মনে মনে আন্দোলন করিলেন, লজ্জিত হইলেন, মন্তক অবনত করিলেন । মনুষ্যের মনোরত্তিগুলি নিতান্ত ভীক, তাহারা যে কর্ম আপাততঃ মন্দ বলিয়া মনে করে অথচ যাহার প্রতিরোধ করিতে পারে না, তাহা সম্পন্ন হইয়া গেলে পর অধিকক্ষণ মনকে ভৎসনাও করিতে পারে না । সেই সময় কৃতকর্মের অনুকূল শতশত যুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং মনোরত্তিগুলি পরাজিত হইয়া নিশ্চর হয় । প্রমোদের মনে হইল ‘যুবকের নিকট কিসের লজ্জা ?’ ‘ইনি আমার !’

প্রমোদিনীর এত আত্মদাদ, এত উৎসাহ ! অবোধিনী ! সংসারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা, তাই এত আশা, এত চাঞ্চল্য । ক্ষণপ্রভার মুখে হাসি নাই, স্বভাবজাত প্রকুলতা নাই, কারণ তাহার রত্নিল দর্পণ ভাঙ্গিয়াছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার । প্রমোদের ত তাহা নয় ! তাঁহার দর্পণ প্রতিপলে নুতন নুতন বর্ণের রঞ্জিত হইয়া ভবিষ্যৎ পরম সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে । মনে করিতেছেন ‘অদ্য কি শুভদিন ! দিবসের চিন্তা, রজনীর স্বপ্ন, কল্পনার মনোহর চিত্র সকলই আজ সফল হইল ।

মনুষ্যে মনুষ্যে কেমন প্রভেদ ! এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে দুই জনও সর্বোৎকৃষ্ট হয় না, একই অভুলা ’ তিনি কল্পনাবলে ভবিষ্যৎ জীবনবস্ত্রের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিলেন । কিন্তু মধ্যে যে কত বিজ্ঞান অরণ্য, দুরারোহ পর্বত, অনন্ত সমুদ্র, প্রাণনাশক কটক থাকিতে পারে তাহা একবার মনেও হইল না ।

পাখি প্রথম ভাবিয়াছিলেন এই ইহাদের বাড়ী । সুতরাং যাওয়ার কথা শুনিয়া নিরাশ ও চমৎকৃত হইলেন, তথাপি প্রমোদিনীর কথা অতিক্রম করিতে না পারিয়া সে রাত্রি সেই গৃহেই অবস্থান করিতে স্বীকৃত হইলেন । প্রমোদ অতি যত্নের সহিত তাঁহার আহার ও শয্যার যথা-সম্ভব সুবিধা করিয়া দিয়া ক্ষণপ্রভা এবং দাস দাসী সহ বহির্গত হইলেন । যতক্ষণ যুবকের মন্তক নত ছিল ততক্ষণ তাঁহাকে দেখিতে দেখিতে গেলেন, কিন্তু যখন বুঝিলেন, যুবকজঙ্কু তাঁহার অনুসরণ করিতেছে তখন আর ফিরিয়া চাহিলেন না । শিবিকারোহণে প্রস্থান করিলেন ।

পাখি আহারাদি করিয়া বিশ্রামার্থ শয়ন করিলেন । নিয়োজিত দাসগণ তাঁহার যাহাতে কোন কষ্ট না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিল, তথাপি তাঁহার সুখবোধ হইল না । তাঁহার নিকট সে গৃহ দশমীর পর চণ্ডীমণ্ডপ, অথবা অভিনয় সমাপনান্তে নাট্যশালার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । তিনি মনশচকুতে

সেই পুণেন্দুবদন, সেই গৌরব ও গান্ধীর্বা-  
মিশ্রিত হাসি হাসি মুখকান্তি, এবং  
প্রকৃত চক্ষু নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।  
যখন নিজাববোধ হইল, দেখিলেন বস্ত্রপাত  
হইল, সৌন্দর্যমণী বহির্গত হইয়া দুইভাগে  
বিভক্ত হইল, এবং দুইটি অপূর্ণ বামামুর্তি  
ধারণ করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল—একটি স্থির  
শুভ্র, কিন্তু জ্যোতি কণ হারী; অপরটি কিঞ্চিৎ  
রক্তিমাত, কিঞ্চিৎ তরল ও চপল অশচ-  
স্থারী, এবং বাহ্যিক দাহিকাশক্তি বিহীন  
হইয়াও অন্তর্দাহী। আবার সহসাই যেন  
পরিবর্তন। পথিকের বোধ হইতেছে কা-  
হার যেন অনুসরণ করিতেছেন, কিন্তু  
ধরিতে পারিতেছেন না। তিনি যেন রা-  
শীকৃত বালুকাস্তপে দণ্ডায়মান হইতে প্র-  
য়াস পাঠিতেছেন, কিন্তু পদতল হইতে  
বালুকা সকল সরিয়া যাইতেছে! কিছুই  
স্থির থাকিতেছে না। মনে আশা ও নি-  
রাশায় ভ্রান্তক বিবাদ আরম্ভ, কে জয়ী  
হইবে নিশ্চয় নাই।

স্ববক ভাবিতে লাগিলেন “আমি কি ক্ষ-  
ণেই উর্ণনাভের তন্তুনির্মিত জালের এক  
প্রান্ত স্পর্শ করিলাম, উর্ণনাভ সুদূরবর্তী প্রান্তে  
পলায়ন করিল! যদি হাত না দিতাম, হৃ-  
দয়-স্বত্বের গাঁথনি দেখিয়া লইতে পারিতাম।  
প্রণয়-তন্তু স্পর্শ করিয়া নিজের শান্তি মুখ  
সকলই বিসর্জন দিলাম! না, লুতা স্বজা-  
লেই বন্ধ, যে জাল বিস্তার করিয়াছে সে  
দূরবর্তী পাখের পলাইলেও জাল পরিত্যাগ  
করিবে না। তবে আমার অন্থ কি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মকতুমে প্রবাহিনী।

“আপনি আমাদের দক্ষিণ বাহু। বাহ-  
মনি রাজা আপন। হইতে কত উপকার লাভ  
করিয়াছে ইয়ত্তা করা যায় না। এরাজ্জ  
কতটুকু ছিল? আপনার বুদ্ধি বলে ক-  
খন প্রদেশ অতি সহজে আমাদের হস্তগত  
হইল, পূর্ববর্তী দুইজন নবাব যাঁহাতে অ-  
কৃতকার্য হইয়াছেন আপনি তাহা নিমেষ  
মধ্যে সম্পন্ন করিয়া উঠিলেন। পরাক্রান্ত  
বিজয় নগরের রাজাকে পরাভূত করিয়া  
গোরা প্রদেশ অধিকার করিলেন, উড়িষ্যা-  
ধিপতিকে আশ্রয় দান করিয়া সিংহাসনে  
পুনঃস্থাপন এবং তৎসঙ্গে আমাদের গো-  
রব বুদ্ধি করিয়া তুলিলেন। কন্দাপিলি ও  
রাজমহেন্দ্রী আমাদের রাজ্যভুক্ত হইল।  
অল্প দিন মধ্যেই এই বহুবিশীর্ণ ভূভাগে  
মুনিয়ম ব্যবস্থাপিত এবং শাসন প্রতি-  
ষ্ঠিত হইল, প্রজাদের অনবরত সমরজ-  
নিত অন্থ আর রহিল না। পরাক্রান্ত  
হিন্দুরাজগণ দূর হইতে এদেশ প্রতি দৃষ্টি-  
পাত করিতেও আর সাহসী হইলেন না।  
যত্ন আমার জননীর বুদ্ধিকৌশল ও বিচার-  
ক্ষমতা। শুভক্ষণে আপনার উন্নতিপথের  
কণ্টক অপসারিত করিয়াছিলেন। আমরা  
যেমন আপনার নিকট, আমাদের রাজাও  
সেইরূপ তাঁহার নিকট রুতজ্ঞ। বর্তমান  
হ্রতিক নিবারণ এবং উড়িষ্যাবিজ্ঞোহ  
দমন করার যে প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন ক-



হিলেন, এসকল বিষয়ে আমি যেন এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক আছি এইরূপ ভাবিগা কার্য্য করিবেন ।” শাহ এই বলিয়া নীরব হইলেন মজ্জীশ্রেষ্ঠ মহম্মদ গাওয়ান তখন কহিতে লাগিলেন ।

“ মহাশয় ! আমি আপনার আজাদীন ভৃত্য, নিজ ক্ষমতায় কিছুই করিবার সাধ্য নাই । আপনি যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলেন আমি তখনও আপনার জননীর অনুমতি না লইয়া কোন কার্য্য করি নাই । তবে যখন সচিবস্থলে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন তখন আমার বুদ্ধিতে যাহা উত্তম বোধ হয় তাহা পরামর্শ দিয়া থাকি মাত্র । আমি ক্ষমতার জন্ত লোলুপ নই । যখন যে কার্য্য করি, যদি তাহাতে আপনার মনস্তৃষ্টি সাধন করিতে পারি তবেই আমার পরিশ্রম সফল । যখন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি একজীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও এ শরীর এবং মন আপনার । শরীরে শোণিতের শেষ বিন্দু থাকা পর্য্যন্ত আপনার হিত সাধনে অবহিত থাকিব । আমি উড়িম্বার বিদ্রোহে ভীত নহি, ঈশ্বর প্রসাদে অতি শীঘ্রই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিব এবং ভরসা করি এই সুযোগে আমাদের রাজ্যের আরতন আরও রক্ষি হইবে । কিন্তু নিরন্নদিগের অন্ন কষ্ট নিবারণ চিন্তায় অত্যন্ত চিন্তিত আছি ।”

মামুদের আশ্বাস বাক্যে মহম্মদ শাহের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল । অস্পাকাল মধ্যেই স্থির হইল, অনতিবিলম্বে উড়িম্বার

বিকক্ষে দাবমান হইতে হইবে । রক্ত মজ্জীর সাহস দৃষ্টে শাহও সাহসী হইয়া উঠিলেন এবং স্বয়ং এই যুদ্ধে যাইবেন স্থির হইয়া গেল । নির্দ্ধারিত দিবস তিনি সকলের নিকট বিদায় লইতে অম্বরে প্রবেশ করিলেন । মজ্জী একটি পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম এসফ্ আদেল । তিনি বুদ্ধি ও ক্ষমতা বলে ক্রমে ক্রমে মজ্জীর অনুকৃতি হইয়া উঠিতে লাগিলেন । তাঁহার সমবয়স্ক আর একটি যুবক মামুদের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন ; তিনি ক্ষত্রীয়, নাম ধরনী নাথ । অতি কিশোর বয়সেই তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন । বিশেষতঃ পারস্য ভাষায় এবং রাজনীতিতে বিলক্ষণ আনুরক্তি থাকায় এবং গৃহপালিত সিংহের জায় নন্দ্র অথচ গৌরবপূর্ণ স্বভাব গুণে তিনি আদেল অপেক্ষাও মজ্জীর প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন । গাওয়ান এই দুই তত্ত্বণ বয়স্ক প্রশস্ত চিত্ত ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণ এবং বিদ্রোহ দমনে প্ররত হইলেন ।

প্রথমতঃ, বিবেচনা করিলেন, যুদ্ধ উপস্থিত, এসময় রাজকোষ হইতে অধিক অর্থব্যয় করা যুক্তি যুক্ত নয় । অতএব দুর্ভিক্ষ নিবারণে নিজের ধনাগার উন্মুক্ত করিলেন । তাঁহার প্রচুর পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, নিজের দৈনিক ব্যয়ের জন্ত বেতন হইতে দুই টাকা নির্দ্ধারণ করিলেন, তদ্বারাই পরিবারের ভরণ পোষণ নির্দ্ধারিত হইত ।

দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত প্রদেশ সমুহে প্রথমতঃ পঞ্চাশ লক্ষ, পরে আর পঁচিশ লক্ষ মুদ্রা প্রেরণ করিলেন। ইহার পর সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী এবং গৃহ শয্যা পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া আরন্ধ কার্য সম্পাদনে যত্নবান হইলেন। এত অর্থ থাকিতেও তিনি নিতান্ত দরিদ্রবৎ কাল যাপন করিতেন। কারণ, তাঁহার মনে এই ধারণা ছিল পূর্ব পুরুষেরা কোন মহত্বদেয়া সাধনের জন্য এত অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। উপস্থিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ তাহার প্রশস্ত সম্ভাব্যতার পথ দেখিলেন, তাই সর্বস্ব বিতরণ করিয়া বসিলেন। তাহার পর রাজসরকারে তাঁহার যে নিষ্কারিত জায়-গীর ও রুতি প্রভৃতি ছিল অল্প বেতন ভোগী-কর্মচারিগণের মধ্যে সে সমস্ত বিতরণ করিয়া দিলেন। এই সমুদায় দান রাজার নামে করা হইল। এইরূপে অপরিমিত বদান্যতার সহিত দুর্ভিক্ষ নিবারণ করিয়া উঠিলেন। তাহার নোঙ্গরে গৃহও একটি অন্ন-ছত্র হইয়াছিল, প্রতিদিন সহস্র সহস্র লোকে আহার পাইত। দেশ বিদেশে সকলেই একবাক্যে বলিত এমন উদার প্রকৃতি প্রশস্তমনা ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই।

মহম্মদশাহ মুক্তাগমন জন্য মাতার অনুমতি চাহিলেন। রজা বেগমের একমাত্র প্রথম মন্ত্রী যাইবেন কিনা? গোওয়ান স্বয়ং সেনাপত্য গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া আর আপত্তি করিলেন না, আশীর্বাদ ক-

রিয়া অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন তিনি প্রণয়িনী নুরমেহারের নিকট গমন করিলেন।

নুরমেহার একাকিনী বসিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রটি এক পাশে বসিয়া, মধুর হাসিতে, আধ আধ ভাসে কমনীয় অঙ্গসঞ্চালনে মাতৃহৃদয়ে স্রবাবর্ষণ করিতেছিল; মাতা তাই নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। শাহকে আগত দেখিয়া গাত্ৰোত্থান করিলেন, এবং তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া জামু চুষন করিলেন। শাহ তাঁহার হস্ত ধরিয়া মাদরে উঠাইলেন। নুরমেহার তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন, এবং রণবেশ দেখিয়া ভীত হইলেন। যুবতী প্রণয়িনীর নিকট হইতে যুদ্ধে যাইবার জন্য বিদায় লওয়া বড় সহজ নয়। মহম্মদ অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলিতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার কপ্পনা যেন কণেকের তরে বালকটিকে পিতৃহীন এবং প্রণয় পুত্রলি নুরমেহারকে এই বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে একাকিনী দেখিল। অস্পৃশ্য পরেই হৃদয় যেন চমকিয়া সচেতন হইল। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ভাগ করিয়া প্রিয়তমার হস্তধারণ করিলেন, এবং সেই প্রণয়পূর্ণ বিশ্ববিমোহন মুখের প্রতি স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন ‘এখন যাই?’ তিনি যে যুদ্ধে যাইবেন একথা অপরিণত বলেন নাই, অথচ তাঁহার মনে হইতেছিল বলিয়াছেন; সুতরাং বলিয়া উঠিলেন ‘তবে এখন যাই?’

যুরেন্নহারের শরীর শীহরিয়া উঠিল, শাহের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আপনাতঃপাশ্বে বসিয়া পড়িলেন। প্রফুল্ল কমলে ঈষৎ কালিমা আশ্রয় করিল, স্বামীর প্রতি কিয়ৎকাল স্থির নয়নে চাহিয়া রহিলেন, শরীরে ঘর্ষ ছুটিল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল, অস্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘কোথায় ? কি জন্য ?’ শাহ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সবিস্তার সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। যুরেন্নহারের পাশ্বেদেশে উপবেশন করিলেন, সুন্দরীর মুকোমল ঐশ্বর্য ঈষৎ হেলিয়া স্বামীর বক্ষঃসংলগ্ন হইল। উভয়েই নীরব রহিলেন। উভয়েই যেন নিমিত্ত। সম্রাট যখন আবার বলিলেন ‘এখন বিদায়, বাঁচিয়া থাকিলে সাক্ষাৎ হইবে’ রাজ্ঞী দুঃস্বপ্ন দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সচেতন হইয়াই যেন বলিলেন ‘যখন যাওয়া স্থির হইয়াছে তখন আর কি আমাদের কথায় থাকিবেন ? যাইবেন ক্ষতি নাই, কিন্তু এই বালক—’ আর বাক্য স্ফুরণ হইল না। বক্ষঃস্থলের গুরু আঘাত যেন শাহের কর্ণগোচর হইতে লাগিল। যখন তাঁহার কণ্ঠে মুকোমল বাজবলী অর্পিত হইল তখন যেন সকল সঙ্গম্প অন্তর্হিত হইল। অনেকক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর শাহের যুবহুদয়ে যশোলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিল। আন্তঃ আন্তঃ কণ্ঠ হইতে কোমল হাত দুই ধানি খুলিয়া রাখিলেন, আর অপেক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না।

‘তবে এখন ?’ এই বলিয়া বহির্গত হইলেন। তাঁহার কর্ণ শুনিষ ‘হৃদয়।’

শাহ দ্রুতপদে নিক্রান্ত হইয়া শিবিরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ধরনীনাথ এবং এসফ আদেল অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া মন্ত্রী মহাশয়ের এত বিলম্ব কেন তাঁহার আলোচনা করিতে লাগিলেন। মহাশয় যখন আন্দরে প্রবেশ করেন তখন মন্ত্রী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ‘পথে যদি গোলাপ পুষ্প কাহারও কার্য্যক্ষম হস্ত আকর্ষণ করে তাঁহার কণ্টক ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।’ এই কথাটি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। একবার স্থিরভাবে ঈষৎ হাসির সহিত কথাটি প্রকাশ করিয়া বলিলেন। এসফ হাসিলেন, কিন্তু কথা যেন ধরনীর হৃদয় স্পর্শ করিল, স্তম্ভিত হইলেন। মনে মনে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন ‘কণ্টক ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না।’

অদ্য গোয়ামের আসিতে এত বিলম্ব কেন ? অন্য দিন যিনি সকলের অগ্রগামী অদ্য কেন তিনি আসিতেছেন না ? কাহার জন্য গৃহে বসিয়া আছেন। স্ত্রী নাই, পুত্র নাই কাহার সহিত আলাপে এত ব্যাপ্ত। ঐ যে স্বর্ণলতার ন্যায় ক্ষীণাঙ্গী একটি অফম বর্ষীয়া বালিকা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ওটিকে ? গুলনোর—মন্ত্রী মহাশয়ের বার্ষিকের সরল, একমাত্র অপত্য স্নেহের পুতুল। গুলনোরকে এক বৎসর রাখিয়া তাঁহার মাতার লোকান্তর

হয়। বালিকা তদবধি পিতৃবাৎসল্যে প্রতি  
পালিত হওয়ার তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে  
পারে না। তাহার জন্যই মামুদের  
এত বিলম্ব।

মহম্মদশাহ সহজে মাতার নিকট বি-  
দায় হইতে পারিলেন,—মাতা বুদ্ধিমতী,  
রাজ্যশাসন করিয়াছেন, প্রয়োজন বুঝেন।  
প্রগল্ভিনীর নিকট বিদায় লইতে কষ্ট হইল  
বটে কিন্তু ঘুরেঘোরও যুবতী, বুদ্ধিশীল—  
তিনি হৃদয়ের অগ্নি গুপ্ত রাখিতে জানেন।  
কিন্তু মন্ত্রী বিদায় তেমন সহজ নয়। অ-  
ষ্টমবর্ষীয়া বালিকা মুখ চায়, দুঃখ বুঝে  
কিন্তু প্রয়োজন বুঝে না; হৃদয়ের অনলও  
গোপন করিতে শিখে নাই। সে মাতৃহীনা  
জন্মদুঃখিনী। সে কাহার নিকট থা-  
কিবে? পৃথিবী, রাজা, রাজ্য, মুক্ত বিগ্রহ  
এসমস্ত তাহার মনে স্থান পায় না, সে  
এইমাত্র জানে তাহার পিতাই সকল।  
লোকে যখন তাঁহাকে প্রশংসা করে  
সরলা বাসা সতৃষ্ণমনে সেই প্রশংসা-মুখা  
পান করিয়া মুখী হয়।

মন্ত্রী বলিলেন “মা! এখন আসি  
গিয়ে”। সর্বনাশ উপস্থিত! গুলনেরার  
কিঞ্চিৎ দূরে ছিল, ব্যস্ততার সহিত দৌ-  
ড়িয়া বাইরা পিতার গলা জড়াইয়া ধ-  
রিল; মন্ত্রীর সাধ্য কি এক পা আগ্রসর  
হন? হতবুদ্ধি হইলেন। যখন গুলনেরার  
কাঁদিয়া তাহার মা নাই ভাই নাই  
এই সকল কথা বলিতে লাগিল তখন  
সচিবশ্রেষ্ঠ গাওয়ান আর অশ্রু সংবরণ

করিতে পারিলেন না, নিঃস্মারিনী পর্ষত  
হইতে বাহির হইল। কোথায় তাঁহার প-  
রাক্রম, কোথায় বা বুদ্ধি! তিনি এক্ষণে  
অবলার অশ্রু অপেক্ষাও দুর্বল, নিম্না  
হইতেও বশীভূত, নিরাশ্রয়া নিদ্রিতা যুবতী  
অপেক্ষাও আশ্রয়বিহীন এবং অজ্ঞানতা-  
পেক্ষাও নির্বেদ্য। অষ্টমবর্ষীয়া বালি-  
কার অশ্রুর নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত  
হইলেন! দয় পিতৃস্নেহ, দয় সম্মানের  
প্রতি ভালবাসা। যে ব্যক্তির হিমার্জি-  
বৎ অবিচলিত হৃদয় রুদ্ধবরসে পত্নীবিরহে,  
উপযুক্ত পুত্রশোকে, পরাজিতের আর্ত-  
নাদে কখনও প্রকাশ হয় নাই, যাহার  
আবেগ, তরঙ্গ, গভীরতা কেহই পরিমাণ  
করিতে পারে নাই, অষ্টমবর্ষীয়া বা-  
লিকা সেই হৃদয় ব্রবীভূত করিল; এককাল  
যে শ্রোত অন্তরে সঞ্চালিত হইয়া তাঁহাকে  
দম্ব বিদম্ব করিয়াছে, আজি তাহা নয়ন  
পথে বাহির হইল। রুদ্ধ কথাকে অনেক  
বুঝাইলেন, বালিকা তাহা বুঝিল না, শু-  
নিল না, কোন প্রলোভনেই তাহাকে  
পিতার সঙ্গে যাওয়ার সঙ্কল্প হইতে বিরত  
করিতে পারিল না। গাওয়ান বাহ্যিক  
আকারে এবং পারিবারিক বিপদ সমু-  
হের আক্রমণে মক্ভূমির আগ্নেয় পর্বত।  
জল যে কত বালুকার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত  
কেহই বুঝিতে পারে না। উপরে সহস্র  
রশ্মি অগ্নিবর্ষ করিতেছেন, অভ্যন্তরে  
অগ্নিরাশি অনবরতঃ জ্বলিতেছে। অদ্য  
কোথা হইতে যেন এক বিন্দু জল সেই

অগ্নিতে পতিত হইল, মন্ত্রীরা হৃদয়ানল বর্জিতশিখার জ্বলিয়া উঠিল। নির্ধারিতী বালুকারণি প্রাবিত করিল, সকলে দেখিল, পাদদেশে শ্যামল শস্যাক্ষত্র! মনের এই সুকোমল অবস্থায় বালিকার মন কোমল প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকার করিলেন।

মহম্মদশাহের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, সকলের হৃদয় আত্ম হইল। সকলে গুল্মেন্নারকে পূর্বাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতে লাগিল। ভক্তগণ যেমন উপাস্য দেবতাকে মধ্যাহ্নে রাখিয়া সমারোহ-পূর্বক লইয়া যায়, সেনাগণও সেইরূপ আলোকলতাসদৃশা, কীর্ণালী, মাতৃহীন, যুগ্মমতী সরলতা গুল্মেন্নারকে সঙ্গে লইয়া চলিল। কিন্তু অবোধিনী কোথায় চলিল?—যেখানে যুদ্ধের ভীষণ শব্দ, অশ্রুর হ্রস্বরব, গজের বৃংহণ ধনি, অস্ত্রের বন্বনি ভয়ঙ্কর কোলাহল উৎপাদন করিয়া মাতৃগর্ভস্থ শিশুকেও কম্পিত করিয়া তুলিবে; যে স্থানের মৃতিকা রক্ত-স্রোতে প্রাবিত হইবে, সহস্র শৃগাল গৃধ্রী প্রভৃতি মৃতশরীর বিদারণ করিয়া ভক্ষণ করিবে এবং তদর্শনে তাহাদের পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র আত্মীয়বর্গ হাহাকার করিবে। সেখানে কি দৈর্ঘ্য? কোন্ মুখ লাভ করিবে? আর তাহার পিতা সন্ততিবর্ষ অতিক্রম করিয়াছেন, ঈশ্বর না

কখন যদি তাঁহার যুদ্ধক্ষেত্রে পতন অথবা পথেই আত্মকাল পূর্ণ হয় তবেই বা তাহার কি দশা হইবে? এ সকল নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাও তাহার মনে আসিল না। অবোধিনী যুদ্ধে চলিল। তাহার মনে আছে পিতার সহিত যাইতেছে আর কিসের ভয়? কেবল বর্তমানই তাহার বিবেচনা ও আলোচনার বিষয়। রাজি প্রভাত হইলে যে কি হইবে অনাগতবুদ্ধি বালিকা কি তাহা চিন্তা করিতে পারে? সে কিছুই ভাবিল না, আত্মাদে মন্ত্রীর সহিত যুদ্ধে চলিল।

এক দিবস পথে নিশীথ সময়ে মন্ত্রীর আপন শিবির মধ্যে পটমগুপে শয়ান আছেন, কত্যাটিও নিকটে শুইয়া আছে। মায়ুদ স্বপ্নে দেখিলেন কত্যা নিকটে নাই, চমকিয়া উঠিলেন। জাগরিত হইয়া শয্যা অমুসন্ধান করিলেন, তন্ময়া নাই; প্রদীপের আলোকে দেখিলেন সকলই শূন্য, নিশুন্ধ; তাহার প্রাণের গুল্মেন্নার বজ্রগৃহেও নাই; কি আশ্চর্য! চতুর্দিক সৈন্যগণ প্রহরী নিযুক্ত আছে, শিবির রক্ষা করিতেছে, পাখাটি উড়িয়া যাইতে পারে না, ইহার মধ্যে সেনাপতির ছুঁহিতাই নাই! অন্ধকার রাজি, আলোক লইয়া সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অমুসন্ধান করা হইল, চতুর্দিকে অসংখ্য লোক প্রেরিত হইল সকলেই দেখিল গুল্মেন্নার নাই!!

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।

পুনঃ প্রাপ্তে ।

হাঁহারা রাজনীতি-সমুদ্র সমুদ্রগ করিয়া রত্নসংগ্রহে যত্নশীল তাঁহাদের মন কোন্ সময় কোন্ বিষয়ে নিমগ্ন থাকে বুঝিয়া উঠা যায় না । মামুদগাওয়ান একমাত্র অপভারত হারা হইলেন, পৃথিবীর মধ্যে আপন বলিবার একমাত্র পাত্রী, সরলতার প্রতিকৃতি তনয়া হারাইয়া বসিলেন, অনেকেই ভাবিল তাঁহার মন নিতান্ত বিকল হইয়া থাকিবে, বুদ্ধ সম্বন্ধীয় কোন কর্মেই মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না । হারারা একপ ভাবিয়াছিল, তাহার রাজনীতি কি পদার্থ এ কথা বুঝিত না, অথবা গাওয়ানকে চিনিত না । তিনি সমস্ত ক্রোশ হৃদয়ে গোপন রাখিয়া অমসহিষ্ণু অধ্যবসায়সম্পন্ন যুবাণুকের ন্যায় অবিচলিত-চিত্তে সময়ে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অসাধারণ ক্ষমতাবলে অত্যন্ত সময়ের মধ্যে উড়িয়াধিপকে পরাজিত করিলেন, মহলিপতন তাঁহার প্রতিজ্ঞানুসারে হস্তগত হইল । অনন্তর মহম্মদশাহের কোঁতুহল নিবৃত্তি করণার্থ আপনার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাত্র ছয় সহস্র সৈন্যসহ ধাবমান হইয়া বহদুরবর্তী কাফিপুরস্থ রত্নেশ্বরের পূর্ণগম্বুজ মন্দির লুণ্ঠন করিলেন । এই কার্যে এত অল্প সময়ে সম্পন্ন হইল যে রাজা রক্ষার্থ আসিবার পূর্বেই তিনি

সৈন্যসহ পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী একটি স্থানে প্রতাগত হইয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন ।

কতিপয় দিবসের কঠিন পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত হওয়ায় সে রাত্রিতে তাঁহার শীত্রই নিদ্রাকর্ষণ হইল । অঙ্গক্ষণ পরেই একটি স্বপ্ন দেখিয়া ব্যস্ত হইলেন । তখনই ধরণীনাথ এবং এসফ আদেলকে ডাকাইয়া বলিলেন “ আজ এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম । আমার বোধ হইল যেন কাফিপুরের দেব রত্নেশ্বর আমার মস্তকের নিকটে দাঁড়াইয়া বজ্রগস্তীর স্বরে বলিলেন, ‘রে পাণ্ডায়া যবন! এতকাল তোর সংপথে মতি ছিল এজন্য তোর উন্নতি হইয়াছে, এখন কুকর্মে প্রবৃত্ত হইলি, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আমার মন্দির অপবিত্র করিলি! তোর কন্যাকে আসন্ন বিপদ হইতে আমিই আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছি, তৎপরিবর্তে তুই আমার সম্পত্তি হরণ করিলি! আর তোর উন্নতি হইবে না । এতকাল কেহ তোর শত্রু ছিল না, এখন আর শোচনীয় পরিণাম সময়েও কেহই মিত্রতাবে নিকটে দাঁড়াইবে না । আজ যে প্রভুর মনস্থিতি সাধনে এই বিগর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করিলি অন্য হইতে দুই বৎসর মধ্যে সেই প্রভুই তোর শিরশ্ছেদ করিবে । যে কন্যাকে রক্ষা করিয়াছি, তোর সেই প্রিয় তনয়া গুলনেয়ার তোর সমক্ষেই প্রাণত্যাগ করিবে । আর তোর প্রভুও তোর মৃত্যুর পর বৎসর মধ্যে মৃত্যু-যুখে পতিত হইবে ।’ এমন আর কখনও

হয় নাই। যদি ইহার কোন অংশ সত্য হয় তবে সে ঘটনা যৎপরোনাস্তি শোচনীয় হইবে। যাহাকে পাওয়া যাইবে না বলিয়া পাষণে হৃদয় দৃঢ় বদ্ধ করিয়াছি তাহাকে যদি আবার প্রাপ্ত হই আর তখন যদি এই প্রকার ঘটনা হয় তাহা কি সহ্য হইবে? স্বপ্ন সত্য হউক মিথ্যা হউক আমার নিতান্তই বিশ্বাস হইতেছে গুলনের আর কাঞ্চিপুরেই আছে, অতএব তোমরা তাহার অনুসন্ধান করিতে থাক।”

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া দুঃখের ভাবনা ভাবিয়া ধরনীনাথ কাঞ্চিপুরে যাইতে স্বীকার করিলেন। মন্ত্রীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সেই দোরাক্ষকারময়ী রাত্রিতে একাকীই নিজান্ত হইলেন। প্রভুর নিয়োগ তাহাতে আবার একটি সংকার্য সম্পাদন, সুতরাং ভয় তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

তাঁহার এই প্রযত্নে আরও একটি কারণ ছিল, কিন্তু তাহা বলিলে পাছে কেহ মনে করেন যে ‘ধরনীনাথ স্বকার্য সাধনে বাধ্য ছিলেন, মন্ত্রীর আদেশ না থাকিলে নিজেই অনুমতি লইয়া কার্য সাধন জন্য অপেক্ষা করিতেন’ এই ভয়ে কারণটি প্রকাশ করিলাম না। ধরনী সুদীর পুরুষ, নিঃস্বার্থ পরোপকার তাঁহার শরীরের এক প্রধান ধর্ম। এতাদৃশ মহাপুরুষের সদভিপ্রায়ে যদি কেহ সন্দেহান করেন এই ভয়ে প্রকাশ করিতে এত সূতর্ক।

ঘোর অন্ধকার। বন্যকীর্ণ পথ। এই বিজ্ঞান প্রদেশের মধ্যদিয়া কে যুবককে পথ

দেখাইয়া গুলনের আরে স্থানে লইয়া সুবিধা করিয়া দিবে? তিনি এই কথা মনে আন্দোলন করিতে করিতে সমুদ্রোত্তিমুখে চলিলেন, পাখিমধ্যে দেখিলেন স্থানে স্থানে মশাল জ্বলিতেছে। ধরনীনাথ বুঝিলেন মুসলমানেরা হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে এই ভয়ে কাঞ্চীরাজ রাত্রিতে সতর্ক হইয়া আছেন। এমত অবস্থায় প্রকাশ্য স্থান দিয়া গমন করিলে বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া আঁধারে গা ঢাকিয়া পূর্বোত্তিমুখে চলিয়া গেলেন, কেহ দেখিল না।

ধরনীনাথ মনে করিতেছিলেন, ঐদিকে কেবল একটি নক্ষত্র আছে, তাহার শুভ্র পবিত্র আলোকে গুলনের আর কোথায় আছে দেখাইয়া দিবে। সুতরাং একটি অট্টালিকা সমীপস্থ হইয়া তাহার উজ্জ্বল আলোতে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! জামেলা ঘোর অন্ধকারে আরত, সে গৃহে যে কেহ আছে এমন বোধ হইল না। তথাপি আশা এমনই বস্তু; বস্তু বিশেষের এমনই আকর্ষণ শক্তি যে, পদে পদে তাঁহার ভ্রম হইতে লাগিল। তাঁহার বোধ হইল সৌন্যমিনী নিবিড় কক্ষবর্ণ ঘেষ ভেদ করিয়া বাহির হইল, এবং অপূর্ব রমণীয়ুর্ভি পরিগ্রহ করিয়া গুলনের আরে হস্তধারণ পূর্বক পরপ্রান্তে দাঁড়াইল! পরে বুঝিলেন, ভ্রান্তি! ভ্রম বুঝিলেন অথচ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার পশ্চাদ্ধিক হইতে টপ্ টপাটপ্ টপ্ টপ্ শব্দ হইতে লাগিল। প্রণয়প্রতিমা প্রেমসীর মুখ-

কমলসম্মর্শনস্থাপান সময়ে হঠাৎ ঔকস্মিক উপস্থিত হইলে যেমন সেই পূর্ণেন্দু হইতে অতৃপ্ত নয়ন অতি কষ্টে অপসারিত হয়, এবং তাহাতে হৃদয় যেমন ছিঁড়িয়া যায় বলিয়া বোধ হয়, সেই শব্দ শুনিয়া যুবকেরও তাহাই হইল, অতি কষ্টে নয়ন অপসারিত করিলেন। শূন্যগবাক্ষ পানে চাহিয়াছিলেন তাহাতে ব্যাঘাত হইল, এককণ্ঠে তাঁহার সহ্য হইল না, হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইল। কিন্তু ঐ গৃহে বাহা দেখিতে আশা করিতেছেন তাহা যদি অন্যের প্রাপ্য হয় তাহা কি সহ্য হইবে?

প্রশ্ন হইল ‘কে’? উত্তর নাই। পুনরপি জিজ্ঞাসা হইল “শত্রু, না মিত্র?” উত্তর হইল “বাহা মনে করিতে ইচ্ছা হয়।” ধরণী এই কথা বলিবামাত্র প্রশ্নকারী বলিয়া উঠিলেন “এত আশ্পর্কী ক্ষত্রিয় সহ্য করিতে পারে না। প্রস্তুত হও।” সুরতাং তৎক্ষণাৎ উভয়ে ভয়ঙ্কর ঘৃষ্ম যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়ের আশ্চর্য্য রণকৌশল, অভূতপূর্ব্ব শিক্ষা এবং আত্মরক্ষা-প্রণালী যদি কেহ তখন দেখিতে পাইত সে অবশ্যই এতদুভয়ের বিবাদ মীমাংসা করিয়া দিয়া পরস্পর প্রণয় সংঘটন করিয়া দিত; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইল না। পরিশেষে ধরণীনাথের কৌশলের নিকট আগন্তুক পরাভূত হইলেন, তাঁহার দৃঢ় আঘাতে অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। ধরণীও তখন আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবার অপরিচিত

ব্যক্তি ধরাশায়ী হইলেন, ধরণী তাঁহার বক্ষঃস্থলে উপবেশন করিয়া প্রথমতঃ তাঁহাকে নিরস্ত্র করিয়া পরে যেমন তাঁহার কণ্ঠদেশে নিষ্ক্ষেপিত অসি ধারণ করিয়া বলিতেছিলেন “এখনই সংহার করিতে পারি, কিন্তু বীরত্ব দেখিরা তত্ত্বি উপস্থিত হওয়ার, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়-বেচনায় ক্ষমা করলাম” অমনি পশ্চাদ্ধিক হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া ধরণীর মন্তকোপরি বিশাল খজাঘাত করিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই শক্তি উন্নত তরবারিতে আঘাত করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিলেও কাহারও শরীরে লাগিল না। অপরিচিত ব্যক্তি উঠিয়া সেই কাপুরুষকে যার পর নাই তিরস্কার করিলেন। এই ঘটনার বিবাদকারী ক্ষত্রিয়-দ্বয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহার্দ্ব হইয়া উঠিল।

অপরিচিত বলিলেন আপনি বীরের উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন। আমার পক্ষীয় একজন লোক আসিয়া আপনার উপর আঘাত করিল, আমরা দুইজনে যুদ্ধ করিতেছিলাম তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া সহায় হইল ইহা বিশেষ লজ্জার কারণ হইয়াছে। আমি পরাজিত হইয়া অন্য একজনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি, কোন প্রকার সঙ্কট করিয়া আপনাকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিয়াছি অথবা বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে পরামর্শ করিয়া আসিয়াছি যদি এই সকল ভাব আপনার মনে উদয় হয় তবে আমাকে ক্ষত্রিয়ার



অনুপযুক্ত জানে অবজ্ঞা করিবেন সংশয় নাই ।’ তিনি আরও বলিতেছিলেন কিন্তু ধরনীনাথ বলিলেন ‘ ক্ষত্রিয়ের মনে কখনও এরূপ ভাব হইতে পারে না । যদি আপনি কাহারও সহায়তা প্রার্থনা করিতেন তাহা হইলেও আমি ভয় করিতাম না, শত শত বীরপুরুষপরিহৃত হইলেও আমি আত্মরক্ষা করিতে জানি ।’ উভয়েই আগন্তকের ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, যুবক তাঁহার আতিথ্যগ্রহণে ক্ষণেক পূর্ব্বেই সম্মত হইয়াছিলেন । এক্ষণে এই সাহসকার বাক্য শুনিয়া অপরিচিত ব্যক্তি বলিলেন ‘ তবে কি আপনার ইচ্ছা আছে ? ’ আর উত্তর প্রাপ্তির অপেক্ষা না করিয়াই একটি শব্দ করিলেন, অমনি সহস্র সহস্র সৈন্য নিমিষমধ্যে আসিয়া সে স্থান বেষ্টিত করিয়া লইল । যুবক মশালের আলোকে দেখিতে পাইলেন সকলেই সশস্ত্র, আজ্ঞা পাইলেই হয় । মনে বিস্ময় এবং বীরত্ব যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । তখন সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া পক্ষ প্রদান পূর্ব্বক অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং একটি রুকে পৃষ্ঠরক্ষা করিয়া পদাভিকগণকে বলিতে লাগিলেন ‘ এক এক জন করিয়া ইচ্ছা হয় অথবা সকলে একত্র ইচ্ছা হয় আক্রমণ কর, ঘাটগিরিকেও যদি স্থানচ্যুত করিতে পারি আমার একটি চরণও টলাইতে পারিবে না ।’ অপরিচিত ব্যক্তি কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন । ধরনীনাথের এতাদৃশ সাহস

সন্দর্শনে প্রীত হইলেন । আর একটি শব্দ করিবা মাত্র সৈন্যাগণ অবস্থত হইল । যেন পৃথিবী স্থিধা বিভক্ত হইল এবং সকলে তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, কে কোথায় গেল তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না । আগন্তক ধরনীনাথকে বলিলেন আমার ইচ্ছা নাই যে আপনাকে আর আক্রমণ করি । যখন উভয়ের মধ্যে প্রণয়ভাব সংঘটিত হইয়াছে প্রতিজ্ঞা করিলাম আপনার শরীরে আর কখনও অস্ত্র নিক্ষেপ করিব না । যুবক তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার প্রতি আর কখনও শত্রুতা প্রদর্শন করিবেন না এরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং উভয়ে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । একটি আলোকসন্নিপে উপস্থিত হইয়া আগন্তক বলিলেন ‘ সেনাপতি ! বিপক্ষেরা কতদূর ? ’ সেনাপতি কহিলেন ‘ মহারাজ ! তাহারা প্রায় পাঁচ কোশ ব্যবধানে যাইয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে, আর কিরিয়া আসিবে বোধ হয় না । আপনি এখন রাজধানীতে যাইয়া বিশ্রাম করুন ।’ ধরনীনাথ আশ্চর্য্য হইয়া অপরিচিত ব্যক্তির মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । বলিলেন ‘ মহারাজ ! না জানিয়া যে অন্যায় কার্য্য করিয়াছি ভক্তান্ত ক্ষমা প্রার্থনা করি ।’ রাজা যশোধন বলিলেন ‘ আপনার কোন অপরাধ হয় নাই সমস্ত অপরাধই আমার, আমার জ্রটি মার্জনা করিবেন ।’ কাকী-রাজ এই কথা বলিবার পর উভয়ে নানাবিধ কথা কহিতে লাগিলেন; তিনি বুঝিতে পা-

ইলেন, ধরনীনাথ শত্রুপাক্ষীয়, শত্রুতা বিরক্ত হইলেন। তিনি গুপ্তভাবে আসিয়া সমস্ত পথ প্রভৃতি জ্ঞাত হইলেন দেখিরা নিতান্ত চিন্তিতও হইলেন। ধরনীনাথ তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন “আমাকে শত্রুমনে করিবেন না। মুসলমানের পক্ষ হইয়া হিন্দুর বিক্ষেপে অস্ত্রধারণও আমার কার্য নয়। মজ্জীবর মামুদ গাওয়ান আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, এবং অনুগ্রহপূর্বক যুদ্ধবিদ্যা, রাজনীতি প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা দিয়া থাকেন। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধ, রণক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে যদি তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় তবে তাঁহার প্রতিকার করিতে পারিব এই আশয়ে যুদ্ধের সময় তাঁহার অনুগমন করিয়াছি। আপনার শত্রুগণ আর ফিরিবেন না, তাহারা গৃহাভিমুখে গমন করিয়াছে। মজ্জীজীবিত থাকিতে বাহ্মণিরাজকে আর হিন্দুরাজ্য আক্রমণ করিতেও দিব না।”

যশোধনের বৈরব্রজি অপনীত হইল। তিনি তখন যুবকের সহিত বহুবিধ আলাপ করিতে লাগিলেন। যশোধনও যুবক। তাঁহার বয়স্ক্রম পঞ্চবিংশ অতিক্রম করে নাই শত্রুতাও তাঁহার উভয়েই প্রায় সমবয়স্ক, বন্ধুতাও তজ্জন্যই দৃঢ় হইতে চলিল। পশ্চিমধ্যে ধরনীনাথ মজ্জীর গুনকীর্তন করিতে লাগিলেন। কঠোরব্রতাবলম্বী মুসলমান মধ্যে এমন লোক আছে কাঞ্চীপুর্বে জানিতেন না। কথায় কথায় মজ্জীর অপূর্ণ বিবরণ জ্ঞাত হইলেন। রাজা বলিলেন “রত্নেশ্বর যে স্বপ্ন প্রদর্শন করেন তাহার সকল গুলিই

সত্য হয়, এটি মিথ্যা হইবে সম্ভব নয়। ইহার প্রথমংশ সত্য হইয়াছে। মজ্জীব্রহ্মিতা গুলুনের আর আমার আশ্রয়েই আছে। যদি তাহাকে আপনার নিকট প্রত্যর্পণ করি আপনি বোধ হয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবেন। ধরনীনাথ তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন, কিন্তু মজ্জীর শোচনীয় পরিণাম স্মরণ হওয়ার নিতান্ত বিষাদ সাগরে মগ্ন হইলেন। তাঁহাকে চুঃখিত দেখিরা রাজাও স্নান হইলেন, তখন উভয়ে রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। রাজার অমায়িক বন্ধুবাবহারে ধরনী প্রীত হইলেন। চতুর্দিকে প্রহরী, অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা কেমন করিয়া পিতার নিকট হইতে উঠিয়াছিল, এবং কোথায় গিয়াছিল, কিরূপেই বা কাঞ্চীপুরে উপস্থিত হইল তিনি আশ্চর্য্যচিন্তায় সহকারে রাজার নিকট সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু যত আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল অবস্থা জ্ঞাত হইয়া তত প্রকাশ করিলেন না, বরং বলিলেন “এরূপ সম্ভবপর!”

সবিশেষ যত্নে আহারাদি সম্পন্ন হইল। যুবক শয়ন করিলেন, রাজাও বিশ্রামার্থ আপন কক্ষে গমন করিলেন।

বলা বাহুল্য যে এরাত্রি ধরণীর নিদ্রা হইল না, তাঁহার মনে হইতে লাগিল ‘বজ্রপাত, অট্টালিকা, গণাঙ্গ, ধ্রুব নক্ষত্র, স্থির সৌদামিনী, মজ্জীর স্বপ্ন, গুলুনের আর আশ্চর্য্য অন্তর্ধান, আর? আর কি?— তাঁহার হৃদয়ের চাঞ্চল্য।”

রাত্রি বেরুপেই হউক প্রভাত হইল।

পরদিবস নগরবাসীগণ দলে দলে দেবমন্দিরের শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিতে আসিল। দেবমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, মুসলমানের প্রতি অভিসম্পাত, ভক্তের ক্রন্দন প্রভৃতিতে অনেক সময় গেল। ধরনীনাথ সকল দেখিতে শুনিতে লাগিলেন। তাঁহার চক্ষু ওৎসুকোর সহিত কাছাকে যেন অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু দেখিতে পাইল না। একবার ছায়ার আয় দেখিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইলেন, কিন্তু আর তিনি দেখিতে পাইলেন না। মনের আবেগ নিবারণ করিতে একবার সমুদ্র-তীরবর্তী প্রাসাদটি দেখিয়া আসিলেন, কিন্তু তাহার দ্বার সকল বাহিরের দিক হইতে বন্ধ! তাঁহার সকল পরিশ্রম ব্যথা হইল।

বেলা এক ঘটিকার সময় রাজা যশোধন যবনদ্রুহিতাকে সমভিবাছারে লইয়া আসিলেন। গুলুনের ধরনীনাথকে দেখিয়া আশ্চর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল। সে হস্ত এমন কোমল, তাহার যত্নে গৌরবর্ণ লতাকাণ্ডিতে এমন অপূর্ণ স্নেহরস যে, ধরনীনাথ অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু মনুষ্যের মন এমনই চঞ্চল যে, সেই অকৃত্রিম জাত্স্নেহের রসাস্বাদন অনেকক্ষণ ঘটিল না। তাঁহার মনে হইতে লাগিল নগরে অবশ্যই এমন কেহ আছে যে এই ক্ষীণাঙ্গী অর্দ্ধমবর্ষীয়া বালিকাকেও তাঁহার কণ্ঠে

সংলগ্ন দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইবে। গুলুনের আরও অপরাধ কি? গুলুনের সন্দেহী, কালে আরও সুন্দরী হইবে এই তাহার অপরাধ! 'কাহারও' হৃদয়ে ব্যথা দেওয়া অমুচিত বিবেচনার ধরনীনাথ ধীরে ধীরে হস্ত দুইখানি কণ্ঠ হইতে মুক্ত করিলেন এবং বালিকাকে শিথিকায় স্থাপন করিলেন। রাজার সহিত দুই একটি কথা বলিয়া স্বয়ং অর্থাহারে নগরের প্রশস্ত বস্ত্রে বাহির হইলেন। রাজা প্রাসাদের বহির্দেখ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন, পরে আনন্দজনক করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু যুবককে মধ্যে মধ্যে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করার ভুল হইল না। তাঁহার পরিচয় না পাওয়ার কিঞ্চিৎ দুঃখিত রহিলেন।

কিয়দূর অগ্রসর হইয়াছেন পরেই একটি গৃহের ছাদের উপর ধরনীনাথের চক্ষু ধাবিত হইল, আর ফিরিল না। তিনি স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। পশ্চাৎ হইতে গুলুনের সহাস্য বদনে সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া ধরনীনাথকে কি দেখাইতে লাগিল। পাঠক বোধকরি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, যিনি ধরনীনাথের দৃষ্টিকে এত শীঘ্র, তাড়িত বেগে দিগদর্শনের কাটার ন্যায় স্থির রাখিয়াছেন তিনি একটি যুবতি রমণী এবং হস্ত তিনি তাঁহার পূর্ণপরিচিতি। বাস্তবিক বাহার অনুসন্ধান সর্বদা তাঁহার চক্ষু চতুর্দিকে ধাবমান হইতেছিল, বাহার অনুসন্ধান

তিনি রত্নেশ্বরের মন্দিরে গিয়াছিলেন ও ছারার ন্যায় দেখিয়া তৎপ্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন এবং যাহার অনুগঙ্গান তাঁহার কাঞ্চীপুর আসা এই অনাতর কারণ, ছাদের উপরে তাহারই মনোহারিনী মূর্তি বিরাজিত । পাঠকও তাহাকে অবশ্যই চিনেন, কারণ রত্নেশ্বরের মন্দিরে প্রথমেই তাহাকে দেখিয়াছেন ।

প্রমোদিনীও ধরনীনাথের প্রতি প্রগল্ভ-নেত্রে চাহিয়া রহিয়াছিল । আজ তাহার কেমন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য । বালার্কের কিরণ পরিহিত রক্তবস্ত্রে এবং স্বর্ণচম্পক শরীরে পতিত হইয়া কেমন অপূর্ণ দেখাইতেছিল । অপ্রকাশিতহাস্যপূর্ণ আসো কি প্রফুল্ল-তাই বিরাজ করিতেছিল । আমাদের যুবক স্থিরদৃষ্টিতে সেই রূপরাশি দেখিতে-ছিলেন এবং একমনে তাহার অন্তর্নিহিত ভাবগুলির আলোচনা করিতেছিলেন ।

প্রথম সাক্ষাতের স্তম্ভিত এবং বিস্ময়-পূর্ণ ভাব অপসারিত হইলে পর ধরনীনাথ একটু হাসিলেন, প্রমোদ হাসিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিল । কিন্তু সেই সুন্দর বদনের সেই মধুর হাসি লুপ্ত হইতে না হইতেই আবার অঞ্চল নাড়িয়া মাথা নোয়াইয়া, অভি-বাদন করিয়া দ্রুতবেগে কোথায় চলিয়া গেল । ধরনী অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট এবং অত্যন্ত মর্দ্বাহিত হইলেন, তাঁহার অন্তঃকরণ যেন ছিড়িয়া বাইতেছে এমন বোধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু পরক্ষণেই প্রমোদের চলিয়া যাওয়ার কারণ অনুসন্ধান

ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিতে পাইলেন যে, অদূরে রাজা যশোদন আসিতেছেন । মনে মনে ভাবিলেন ‘তবে ইনি কি আমার সুখের পণের কটক ?’ আবার ছাদের উপরে চাহিলেন, কিন্তু এবার আর কিছুই নাই ; শূন্য, শূন্য, শূন্য ; সমস্ত শূন্য, জগত আধার । আর ক্ষণমুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া গুলুনেয়ারের শিবিকাবাহকদিগকে শিবিকা চালাইতে আদেশ করিলেন এবং নিজেও অশ্ব চালাইয়া দিলেন । অশ্ব চালাইতে চালাইতে আর একবার ছাদের দিকে চাহিলেন কিন্তু এবারও আর কাহাকে দেখিলেন না ।

পাঠক এতদ্ব্যয়কে কিরূপ মনে করিতে-ছেন । যুবককে যেরূপই কল্পণ, প্রমোদিনী-কেত অত্যন্ত চপলা প্রগল্ভা জ্ঞান করিতে-ছেন । আমরাও তাহাকে তাহাই জ্ঞান করি, তবে করা যায় কি ; মতোর অনু-রোধে যেরূপ সেইরূপই রাখা হইল ।

অনেক দূর চলিয়া গেলে পর বাহকগণ পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ একস্থানে পাল্কি রাখিল । গুলুনেয়ার বাহিরে আসিল এবং ধরনীনাথ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন । দুই জনে একত্র হইয়া মনের মত্থে আলাপ করিতে লাগিলেন । গুলুনেয়ার বলিল ‘দাদা ! আজ কি আশ্চর্য্য নুখ বোধ হইতেছে ! তোমায় দেখিলাম, বাবাকে দেখিব । আবার যিনি আমায় এতদিন ভাল বাসিলেন যাওয়ার সময় তাহাকেও দেখিলাম । তুমি তাহাকে দে-

থিয়াছে, তিনিও তোমায় দেখিয়াছেন। যদি তোমাদের দুইজনের বিবাহ হয় আমি বড় সুখ বোধ করিব। বৌকে দেখিতে পাইব। তিনি বুঝি তোমায় বড় ভাল বাসেন ?’

যুবকের হৃদয় তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল; বালিকা সমস্ত রহস্য জানিতে পারিয়াছে বলিয়া আশ্চর্যায়িতও হইলেন। ভাবিলেন ‘যাচা বিশ্বাস করিতে আমার হৃদয় কদাপিও সাহস করে না, বালিকা তাহাই প্রকাশ করিতেছে?’ সন্মিতে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ‘বাঃ তুমি কি বলিতেছ; প্রমোদিনী যে আমাকে ভালবাসেন তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?’

“তিনি সর্বদাই তোমার কথা আলাপ করিতে ভাল বাসিতেন। যখন দুই জনে একত্র বসিতাম, কি সমুদ্র তীরে বেড়াইতে যাইতাম, কি নিদাঘগৃহে উপবিষ্ট থাকিতাম সর্বদা কেবল তোমার কথাই জিজ্ঞাসা ও আলাপ করিতেন। তোমার কে আছে, একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম কেহ নাই। তুমি বিবাহ করিয়াছ কি না একদিন তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম, না, বিবাহ করিলেত বৌ দেখিতাম। তোমার অনেক টাকা আছে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আমি তাহাও নাই বলিয়াছি, কারণ থাকিলেত আমি সকলই জানিতাম।’

যুবক হাসিতে লাগিলেন; হৃদয় কতকটা আশ্বস্ত হইল। গুলনেরার ব-

লিল ‘দাদা! আর তুমি এখানে আসিও না। প্রমোদিনী পুনঃ পুনঃ আমায় তোমাকে নিবেদন করিতে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন তুমি যাহাকে অত্যন্ত ভালবাস ও বিশ্বাস কর সে তোমার শত্রু, মিত্র নয়। হরত সুযোগ পাইলে তোমার প্রাণনাশ করিবে; প্রয়োজন হইলে তোমাকে হত্যা করা তাহার পক্ষে সহজ!’ যুবক চমৎকৃত হইলেন, কিছুই বুঝিলেন না। মনে লেশমাত্রও শঙ্কা জন্মিল না, কিন্তু হৃদয় গভীর সন্দেহে আলোড়িত হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

সংসারে কৃতজ্ঞতা ।

কি ধোর অদ্ভুতকার! প্রকৃতি কেমন নিশ্চল! কোন স্থানে একটি পত্র শাখাচ্যুত হইলে যে পরিমাণে শব্দ হওয়া সম্ভব তাহাও প্রতিকোচর হইতেছে না। প্রকৃতি শাখানবৎ ভয়ঙ্করী। সকলই নীরব। কেবল অদূরে একটি বালিকার অনতিপরিষ্কৃত বিলাপপূর্ণ কণকণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতেছে,— কি কহিতেছে, কাহার নিকট কহিতেছে, কিছুই বুঝা যায় না। রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ ধরাতল—মনুষ্যালোকের নন্দনকানন—মানবজীবনের নাট্যশালা—মৃত্যু গীত বাদ্য প্রভৃতি আমোদজনক ঘটনাপুঞ্জের প্রিয় নিকেতন পৃথিবী—একগে শ্মশান!

যদি আশানের একাংশ অন্য অংশ অপেক্ষা ভয়ানক হয় তবে সে স্থান আজ, এই অমাবস্যার তামসী নিশীতে, দেবগিরির কাণ্ডাণ্ডে। বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া সশস্ত্র প্রহরী দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছে। তাহার অভ্যন্তরে, এই যমচক্রের মধ্যস্থলে একজন বৃদ্ধ আবদ্ধ রহিয়াছেন। জীবনে সকল প্রকার অভূত অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে চরম অভিনয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আর একটি ক্ষুদ্রমূলিকা সন্দৃশী বালিকা, গবাক্ষ সমীপে দণ্ডায়মান হইয়া রোদন করিতেছে। প্রহরীগণ তাহার রোদনে দাঁড়াইয়া হইয়া নিয়ম এবং আদেশের বিবন্ধেও তাহাকে রাজিতে প্রাচীরাত্যন্তরে থাকিতে দিয়াছে। নিবেদন করিতে পারে নাই। নিজ নিজ সন্তান স্মরণ করিয়া পক্ষ হস্তে তাড়াইয়া দেয় নাই।

“বাবা! বাবা! বাবা!—তুমি স্মর দিচ্ছ না যে। ও কি, তুমি কান্দিতেছ যে বাবা! তোমাকে এখানে এমন করে আনিয়া বদ্ধ করেছে কেন? আমাকেই বা আসিতে দিতেছে না কেন! আমিও কি ছুই বুঝিতে পারিতেছি না বাবা! তুমি ওদিগকে বল আমাকে তোমার নিকট আসিতে দিওক, আমি আসিয়া তোমার কোলে বসি। আমার মন যে কেমন করিতেছে, আমার কান্না আসিতেছে। বাবা! তোমার এরূপ অবস্থা আমার সহ্য হয় না, আমাকে তোমার নিকটে নেও। আমি আর কতক্ষণ বাহিরে অন্ধকারে

দাড়াইয়া থাকিব! হীমে আমার শরীর শীতল হইতেছে। আমি আসিয়া তোমার চক্ষু মুছাইয়া দি।” এই বলিয়া লৌহশিক দুইটির মধ্যদিয়া গবাক্ষপথে বালিকা আপনার ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি গৃহ মধ্যে প্রবেশ করাইল। প্রাচীরের বেধ অধিক, হস্ত ক্ষুদ্র। অত্যাগিনী চেষ্টা করিল কিন্তু তাহার পিতার হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, চক্ষু মুছাইয়া দিয়া সুখী হইতে বা সুখী করিতে পারিল না।

বৃদ্ধ কান্দিতেছিলেন। ক্রন্দন সংবরণ করিয়া বাহু প্রসারণ করিয়া সেই ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি আপন হস্তে লইলেন। তাহার মনে এক্ষণে কি ভাব, কে বলিবে? নিরাশ্রয় বালিকা কাণ্ডাণ্ডের প্রাচীরাত্যন্তরে অথবা গৃহে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। তিনি তাহার পিতা অথচ সাহায্য করিতে পারিতেছেন না। হৃৎকণ্ঠ তাহার হৃদয় মুখবন্ধ পাত্রে উত্তপ্ত আশ্রয়বৎ দগ্ধ করিতে লাগিল। আর সংবরণ করিতে পারিলেন না। আবার কান্দিয়া ফেলিলেন।—তাঁহার ক্রন্দনে বালিকাও উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিল।

অত্যাগিনী আজ রাজিতে হতশ হৃদয়ে ব্যাকুল হইয়াছে, রাজি শীঘ্র প্রভাত হউক প্রার্থনা করিতেছে। কিন্তু প্রভাতে তাহার যে কি দশা ঘটবে তাহা কি সে বুঝিতেছে? ভাবিতেছিল শাহের পায় ধরিবে, বেগমদের পায় পড়িবে তাহা হইলে মজী অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবেন। তাহার পিতা আবার তাহাকে ক্রোড়ে

লইবেন। কিন্তু প্রাতঃকালে শাহের মুখ  
হইতে যে কি অব্যর্থ নিদাক্ষণ বাক্য বাহির  
হইবে তাহা সে কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে।

সহসা কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল।  
একজন লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার  
রোধ করিল। বালিকা দৌড়িয়া যাইয়াও  
প্রবেশ করিতে পারিল না। তাহার আর  
সহ্য হইল না, উঠকঃস্বরে কাদিতে কা-  
দিতে রুদ্ধের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লা-  
গিল।

পাঠক এতক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন  
বাহমণি রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মামুদ গা-  
ওয়ান কারাকঙ্ক। তাঁহার অপরাধ কি জা-  
নেন না, অথচ তিনি কারাকঙ্ক! তিনি এই  
সুবিভীর্ণ রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়াও দ-  
রিদ্র, অপ্রমেয় ক্ষমতা সত্ত্বেও দুর্ব্বল, এ-  
কান্ত প্রতুপায়ণ হইয়াও প্রভুর নিগ্রহভা-  
জন। ধনা সংসারের রুতজ্ঞতা! যিনি আ-  
পনার ভুজবলে ও বুদ্ধিকৌশলে, একটি  
ক্ষুদ্র প্রদেশকে সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়া  
সুশাসন জন্য প্রাচীন রাজ্যের অপেক্ষা  
স্বল্পহং আটটি প্রদেশে বিভক্ত করিলেন,  
নরখদা হইতে রুফা নদী পর্যন্ত এবং সাগর  
হইতে সাগর পর্যন্ত, পশ্চিম উপকূল হ-  
ইতে পূর্বোপকূল পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অ-  
ধিকার ও সুশাসিত করিলেন; শাসনকর্তা-  
গণের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া বিদ্রোহের  
ভয় দূরীকৃত করিলেন এবং আপন জায়-  
গীর, আপন সম্পত্তি অসম্বদ্ধ ও মর্য্যাবর্ণ-  
মধ্যে বটন করিয়া নিজের মহানুভব উদার

প্রকৃতির পরিচয় দিলেন অদ্য তাঁহার এই  
শোচনীয় দশা!

বালিকা গংগাকপথে দৃষ্টি সঞ্চালন  
করিয়া গৃহের অভ্যন্তরস্থ ক্ষীণ লোকে ভয়-  
চকিতচক্ষে প্রবেশকারীকে দেখিতে লা-  
গিল। সে ব্যক্তি পরিচিত, এতকাল তা-  
হার পিতার অঙ্গে প্রতিপালিত। নাম  
জুসেন বেহারী। জুসেনকে দেখিয়া বা-  
লিকা ভীতা হইল। এক একবার আ-  
কাশ পানে চাহিতে লাগিল। কিন্তু  
আবণের আকাশ মেঘাবৃত, তাহাকে আ-  
শ্বস্ত করিতে যদি একটি নক্ষত্র কোথাও  
বাহির হইতে চেষ্টা করিত অমনি নির্দয়  
মেঘ আসিয়া তাহা ঢাকিয়া ফেলিত।  
তাই বুঝি ভীতা হইতে ছিল!

জুসেন বলিল ‘মহাশয়! যখন একটি  
জীলোকের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া হিম্মুখ্য প-  
রিভ্রাণ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করি-  
য়াছিলাম, তখন প্রবল পরাক্রান্ত চিতোরের  
মহারাজার হস্ত হইতে আপনিই আমার  
রক্ষা করেন। দুর্ভাগ্য করিয়াছিলাম ব-  
লিয়া যিচ্চ তৎসনা করিয়াছিলেন বটে,  
কিন্তু আশ্রয় দিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল প্র-  
তিপালন করিয়া আপনিই আমার উন্নতির  
পথ করিয়া দিয়াছেন, অতএব আপনার  
বিপদে আমারও বিপদ। রাজার বিপক্ষ  
হওয়াও মহাপাপ, আমি আপনাকে যে  
পরামর্শ দিতেছি তাহাতে সম্মত হউন।  
এই দরখাস্তে নাম সাক্ষর করুন।’ এই  
বলিয়া দরখাস্ত পড়িতে আরম্ভ করিল।

“এতকাল সাধামুসারে আপনার কার্য করিয়াছি, এখন রক্ত বয়সে যদি কোন অন্যান্য করিয়া থাকি তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমি ভ্রান্ত হইয়া এরূপ কাজ করিয়াছি, এক্ষণে অনুতাপ হইতেছে। আমি মন্ত্রীও পরিভাগ করিলাম, অবশিষ্ট জীবন কাহাণীতে বাপনেও সম্মত আছি, তথাপি যেন আমার শোণিতপাত না হয়।”

দ্বিরপ্রকৃতি গাওয়ান আজ ক্রুদ্ধ হইলেন। দরখাস্তখানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং হুসেনের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিলেন। হুসেন ছিন্ন দরখাস্ত তুলিয়া লইল এবং ভীত হইয়া ক্ষতপদে গৃহ হইতে নিক্ষেপ হইল। বালিকা আবার এই সুযোগে যেমন গৃহে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইতেছিল, দুয়াচার দয়ার মস্তকে পদাঘাত করিয়া সেই সরলা বালিকার গ্রীবা ধরিয়া শূন্যে উঠাইল এবং সেই অবস্থায় তাহাকে প্রবেশ করিতে দিয়াছে বলিয়া প্রহরীগণকে ভয় প্রদর্শন ও গালি প্রদান করিতে লাগিল। গুলুনেয়ারকে আরও শূন্যে উঠাইয়া সজোরে প্রাচীরের বহিঃস্থিত বস্ত্রে প্রস্তরোপরি নিক্ষেপ করিল। পানী উঠিলেই বলিয়া উঠিল “যাহারা অন্যের উপাধিকারের ব্যাঘাত জন্মায় তাহাদের এই দশাই ঘটে! হাঃ! আমি যে কাদমাগ জান না? দশচক্রে ভগবান জুত!” মন্ত্রী শুনিলেন, বুঝিলেন, বালিকার যে বিপদ ঘটিল তাহাও জানিতে পাইলেন। একজন

প্রহরী কাদিয়া গিয়া সকল কথা কহিল, কিন্তু তিনি আর যে মন্ত্রী নহেন, বিষণ্ণতা বিষদর মাত্র!

কাদমাগি প্রভাত হইল। মহম্মদ শাহ সিংহাসনে আসীন হইয়া কঠোরস্বরে বলিলেন “পানীও রক্ত মন্ত্রীকে আমার সমক্ষে আনয়ন কর।”

আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র মসামুদ প্রভৃতি আবিসিনীয় দাসগণ রক্তবস্ত্রে রক্তকায় সজ্জিত করিয়া সশস্ত্র ধাবমান হইল। ওয়রাগণ সকলেই প্রকৃত অগচ চিন্তিত এবং বাহ্যিক আকারে কিঞ্চিৎ বিষন্ন। তাহারা ‘কি হয়’ কেবল এই ভাবনার অস্থির হইল।

ঘর উল্কাটিত হইল। মামুদ গাওয়ান দাতকপরিবেষ্টিত হইয়া প্রাচীরের বাহিরে আসিলেন। কি শোচনীয় দৃশ্য! ইহা যদি গুলুনেয়ারের নয়নগোচর হইত? গুলুনেয়ার এখন কোথায়?

মন্ত্রী বাহিরে আসিলেন; দেখিলেন বহির্দ্বারের অনতিদূরে একটি বালিকা শয়ান রহিয়াছে। তাহার বাম হস্ত মস্তকের নীচে, দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ চক্ষু আবৃত, যেন সূর্য্যাকিরণ চক্ষে বিদ্ধ হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইবে বলিয়া এরূপভাবে চক্ষু ঢাকিয়া রাখিয়াছে। রক্তবর্ণ কেশজাল অর্দ্ধারত শরীরে, অনারত মুখকমলে, এবং হস্তে, অর্দ্ধারত করিয়া অপূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছে। ক্ষীণ শরীরে অপূর্ণ জ্যোতিঃ! অর্দ্ধারত মুখকমলে সৌ-



ররখি পতিত হওয়ার বোধ হইতেছে যেন  
রজনীতে সন্ধ্যার প্রদীপহস্তে গৃহান্তরে যা-  
ইতেছে ! শরীরে অলঙ্কার নাই, কে যেন  
বলপূর্বক সে সকল অপহরণ করিয়াছে ।  
প্রমোদিনী যে সকল বস্ত্রমূল্য রত্নে এই  
সোনার প্রতিমাখানি সাজাইয়াছিলেন  
তাহার চিক্নমাত্রও নাই । মাথার কতকাংশ  
শোণিতসিক্ত । গাওয়ার সিহরিয়া উঠি-  
লেন । তিনি বুঝিলেন স্বপ্ন সফল হইল,  
হতভাগিনী জীবিতা নাই ! কণ্ঠস্বরে ব-  
লিলেন “দেখ তাই ! এতকাল তোমরা  
অনুগ্রহ করিয়া আমার কথা শুনিয়াছ আজ  
সেই পূর্বের কথা মনে করিয়া আমাকে  
একবার জন্মের মত ভাল করিয়া দেখিতে  
দেও ! ” কেহ কেহ সম্মত হইল । মস-  
নুদ বিকট হাস্য করিয়া বলিল “ রাজবি-  
জ্রোহীর প্রতি আবার অনুগ্রহ ? ” অমনি  
শোণিত তরবারি হস্তে লইয়া তাঁহার চক্ষুর  
নিকট ধরিল । তখন সেই হৃদয়বিদারক  
দৃশ্য হইতে বাধ্য হইয়া অতি কষ্টে চক্ষু ফি-  
রাইয়া লইলেন । একটি উচ্চ নিঃশ্বাস নি-  
র্গত হইল !

মহম্মদশাহ এখন পর্য্যন্ত সুরায় উন্মত্ত ।  
পূর্বদিন প্রাতঃকাল হইতে পান আরম্ভ  
করিয়াছেন, এপর্য্যন্ত প্রায় বিরতি নাই ।  
পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার পারিষদবর্গ  
মন্ত্রী অশুপস্থিতি সময়ে তাঁহার হস্তে এক  
খামা লিপি প্রদান করিয়াছিল । তাহাতে  
লিখিত ছিল যে, যদি উড়িষ্যারাজ বি-  
জ্রোহী হইয়া দেবগিরি আক্রমণ করিতে

পারেন, মন্ত্রী তাঁহার সহায়তা করিবেন ।  
যুদ্ধে যে রাজ্যলাভ হইবে উত্তরে বিভাগ  
করিয়া লইবেন । পত্রখানি যেন দৈবাৎ  
ধূত হইয়াছে এইভাবে সেই পত্রবাহকসহ  
শাহের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল ।  
লোকটিকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল  
“ কিসের পত্র জানি না । মন্ত্রী মহাশয়  
মধ্যে মধ্যে অতি গোপনে এই মত আরও  
লিখিয়া আমার দ্বারা পাঠাইয়া থাকেন,  
আমিও উড়িষ্যারাজকে দিয়া উত্তর আ-  
নিয়া থাকি, আর কিছুই জানি না । ”  
শাহ সাক্ষর দেখিলেন । মোহর গাও-  
রাধের তাহাতে সংশয় নাই । পারিষদ-  
বর্গকর্তৃক উত্তেজিত হইয়া মন্ত্রীকে কারা-  
বদ্ধ করিয়া রাখেন, অন্য তাঁহার বিচার ।  
মন্ত্রী গৃহে গমন করিয়াছিলেন, সন্ধ্যার  
সময় তাঁহাকে কারাগারে আনয়ন করিয়া  
রাখা হইয়াছিল ।

শাহ নিতান্ত কদর্য ভাষায় গালিবর্ষণ  
করিয়া গাওয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলেন  
“ এ সাক্ষর কার ? ” মন্ত্রী লিপিকথানি  
হস্তে লইয়া পাঠ করিলেন, কিছুকাল বি-  
স্ময়াবিষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিলেন । পরে  
বলিলেন “ হাঁ ! এ মোহর আমারই বটে,  
কিন্তু এই লিপির বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অ-  
নভিজ্ঞ । ”

শাহ ক্রোধকম্পিত কলেবরে তাঁহার  
প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন ।  
হুসেন বলিল “ রক্ত মৃত্যু নিকট বলিয়া ভয়  
পাইয়াছে, কিন্তু বুঝিতেছে না যে অপরাধ

স্বীকার করিলে দোষের অনেক মার্জনা হইতে পারে।” মহম্মদ তাঁহার প্রাণ-মাশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, অত্ৰ কোন রূপ শাস্তি দিবেন ভাবিতেছিলেন। তখন মন্ত্রী হুসেনের ভৎসনা অসহ্য হওয়ায় বলিয়া উঠিলেন “ভীষ্ণুর মৃত্যুর পূর্বে সহস্রবার যমযন্ত্রণা ভোগ করে। কিন্তু সাহসীগণ একবার বই মরে না।” শাহ ভাবিলেন মন্ত্রী প্রকৃত অপরাধী না হইলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এক্ষণে সে সাহস নাই বলিয়া মৃত্যুই নিশ্চয় জানিয়াছেন। এমন সময় হুসেন পূর্বরাত্রির ছিন্ন দরখাস্ত খানি তাঁহার হাতে দিয়া কহিল “এই দেখুন অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু ক্ষমা করিবেন না ভয়ে নিজেই ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে।”

শাহ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এদরখাস্ত ছিঁড়িয়াছ?” মন্ত্রী বলিলেন “হাঁ! কিন্তু আমি লিখি নাই।”

মাত্র ‘হাঁ’ শাহের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ষাতকদিগকে আদেশ করিলেন ক্ষণবিলম্ব না করিয়া মন্ত্রীর শিরচ্ছেদ কর। রুদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “আমার মৃত্যু সামান্য কথা, আমি এজন্য অনুমাত্রও ক্রুদ্ধ নহি। কিন্তু যে রাজ্য গঠন করিতে আমার মস্তিষ্ক অছোরাত্র ঘূর্ণিত হইয়াছে আমার মস্তকের সহিত সে রাজ্যও মস্তকহীন হইবে।” শাহ অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ষাতকগণ গাওয়ানকে প্রস্তুত হ-

ইতে বলিল। হুসেন অনুচরবর্গের সহিত আফ্রাদে মগ্ন, উপকারীর প্রাণ দণ্ড দর্শন করিতে দাঁড়াইল। একবার মসাম্মদের কাণে কাণে বলিল “শুভ কর্ণে বিলম্ব ভাল নয়। ধরনী নাথ এবং এসফ আদেল উপস্থিত হইলে বিষ ঘটতে পারে।” রুতয় পাঁয়র তখন বুঝে নাই যে, যে হস্তে উপকারীর শিরচ্ছেদ হইল একদিন পরে সেই হস্তই তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিবে। ষাতকও বুঝিল না যে তাহারও সেই দশা ঘটবে।

ধর্মপ্রচারক মহম্মদের সঙ্গুণসমূহের অনুরক্তি, ভারতীয় মুসলমান ইতিহাসের সর্বোৎকৃষ্ট শিরোরত্ন, দেবগিরির উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ মামুদ গাওয়ান রাজাজ্যায় মস্তকদানে প্রস্তুত। তিনি এক একটি কথা বলিয়া গম্ভীর ভাবে সকলের নিকট বিদায় লইলেন, যদি কখনও কোন অপ্রিয় কার্য করিয়া থাকেন তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এসফ এবং ধরনীনাথের নিকট যাহাতে এই ঘটনা প্রচারিত হইয়া প্রতিহিংসা লওয়া হুদে দেশীয় লোকের রক্তপাত না হয় তজ্জন্য প্রত্যেককে অনুরোধ করিলেন। জামুয় উপর বসিয়া পশ্চিম দিকে মুখ রাখিয়া দীপ্তিরে মাম স্মরণ করিতে লাগিলেন। স্বেতকেশ স্বেতশ্রষ্ট প্রশান্ত মুখমণ্ডল অনির্বচনীয় সৌম্যভাব ধারণ করিল। মসাম্মদ এই অবস্থায় তাঁহার মস্তকে সূতীক্স খড়গাঘাত করিল। মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভূতলে

পতিত হইল !! সকলে স্তম্ভিত হইল !  
 ছিন্নমুণ্ডেও কোন প্রকার ক্লেশের চিহ্ন  
 প্রকাশ পাইল না ! তৈলশূন্য দশা-  
 মাত্রাবশিষ্ট প্রদীপ হঠাৎ বাতাস আ-  
 সিয়া নির্বাপন করিল, কিন্তু তাঁহাতে ধূয়াও  
 নির্গত হইল না !!!

### পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।

#### হরিশে বিষাদ ।

একদিন দুইদিন তিনদিন করিয়া স-  
 চিবরু মামুদের শোচনীয় হত্যা কাণ্ডের  
 পর সপ্তাহ গত হইল । এই সময় এসফ  
 দক্ষিণে এবং ধরনীনাথ বিজাপুরে ছিলেন ।  
 সপ্তাহ পর তাঁহারা উভয়েই আসিয়া উপ-  
 স্থিত হইলেন । দেখিলেন, রাজসভার  
 কার্যাবদ্ধ হইয়া আছে, নগরবাসী এবং  
 প্রজাবর্গ হাহাকার করিতেছে ; বিদেশীয়  
 শাসনকর্তারা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠি-  
 যাছেন, হিন্দু রাজগণ স্ব স্ব অধিকার  
 বিস্তারে প্রয়াস পাইতেছেন । মহম্মদ শাহ  
 অসুপুর্বেই অহোরাত্র অবস্থান করেন, এ-  
 কেবার সর্বনাশ উপস্থিত । বাহমণি রাজ্য  
 ছার খার হয় ।

কি ক্ষয় এরূপ হইল তাহা আর অনু-  
 সন্ধান করিয়া জানিতে হইল না । শত  
 শত লোক হাহাকার করিয়া মন্ত্রীর শোচ-  
 নীয় পরিণামের বিষয় জ্ঞাপন করিল ।  
 ধরনী ও এসফ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন ।  
 তাঁহারা জানিতে পাইলেন, মোহররক্ষক-

কে সুরাপান করাইয়া তাহাভাৱা কাগজে  
 সাক্ষর করাইয়া লইয়াছিল, এবং পামর  
 হুসেন সেই কাগজে জাল চিঠি প্রস্তুত  
 করিয়া তদ্বারা মামুদের সর্বনাশ সাধন ক-  
 রিয়াছে । তাঁহারা আরও অবগত হইলেন  
 যে মন্ত্রীদুহিতাও সেই নির্দয় দুর্ভাগারের হ-  
 স্তেই নিহত হইয়াছেন । আর কে হুসেনকে  
 রক্ষা করে ? আর কে আসিয়া ষড়যন্ত্র-  
 কারী ওমরাগণের সহায় হয় । কে ই  
 বা সমায়ুদ প্রভৃতি আবিসিনিয় দস্যুবর্গের  
 দেহ ও মস্তক একত্র রাখে ? ফণি মণ্ডলা-  
 কারে বেষ্টন করিয়া নিদাঘসূর্যের প্রচণ্ড  
 তাপে নিশ্চল হইয়া আছে, নিদ্রা বাই-  
 তেছে । তাহাকে একবার জাগরিত কর  
 ভরস্কর গর্জন করিয়া উঠিবে, তৎক্ষণাৎ  
 দংশন করিবে । তীব্র বিষ শীত্রেই আত-  
 তারীর জীবন হনন করিবে । আততায়ী ষড়  
 যন্ত্রকারীগণ কাল সর্প জাগরিত করিল,  
 কে আর তাহাদিগকে রক্ষা করে ?

রক্ষা বেগম মন্ত্রীকে পুত্র অপেক্ষাও  
 অধিক স্নেহ করিত, তাঁহার শোচনীয়  
 মৃত্যু সংবাদে যারপর নাই ব্যথিত হইলেন,  
 এবং ইহা যে শুদ্ধ কুলোকে কুচক্র তাহা  
 বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন । সুতরাং পু-  
 ত্রকে প্রতিহিংসা লইতে আদেশ দিয়া ম-  
 ত্রীর মৃত্যুর তিন দিবস পরেই পৃথিবী পরি-  
 ত্যাগ করিলেন । প্রতি দিন যে ভাবে স-  
 হস্র সহস্র লোক জলে জল, মৃতিকায় মৃ-  
 ত্তিকা বান্ধতে বান্ধ দিশাইতেছে তিনিও  
 সেইরূপ দিশাইলেন । শাহ প্রকৃতিস্থ হই-

রাই গত বিষয় আলোচনার প্রস্তুত হইয়াছিলেন, মাতৃদত্ত উপদেশে আপনার অপ-  
রিষ্কৃত সন্দেহ আরও বন্ধমূল হইল, আ-  
বার ধরনীনাথ এবং এসফ আসিয়া তন্ন  
তন্ন করিয়া যখন সকল নিবরণ ক্ষান্ত হইয়া  
তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন তখন তিনি উ-  
ন্মত্তবৎ হইলেন। তৎক্ষণাৎ ষড়যন্ত্রসং-  
লিপ্ত সকলকে হত্যা করিতে আদেশ দি-  
লেন। অনতিবিলম্বে আদেশ কার্যে পরি-  
ণত হইল। তখন ধরনীনাথ এ পাণ্ডুরী  
পরিভ্রাণ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন।  
এসফও বিজাপুরে গমন পূর্বক স্বাধীন  
রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস পাইলেন। দেখিতে  
দেখিতে বাহ্মণি রাজ্যের সমস্ত উত্তরাংশ  
হিন্দুরাজ্যভুক্ত হইয়া গেল।

মহম্মদ শাহ দিন দিন অনুতাপানলে  
দগ্ধ হইতে লাগিলেন। একদিন প্রিয়তমা  
নুরমেহারের সহিত একগৃহে শয়ন করিয়া  
আছেন, গৃহে প্রদীপ স্তিমিতভাবে জ্বলি-  
তেছে। এমন সময়ে মহম্মদ দেখিলেন,  
ছানারূপী মন্ত্রী আসিয়া প্রদীপের পশ্চাতে  
দাঁড়াইয়া গভীরস্বরে বলিলেন “প্রতি-  
হিংসা লওয়া হইয়াছে, আর চিন্তা কেন?  
রাজ্য শাসন কর। হুই দিন পরে সকলেই  
একত্র হইব।” মহম্মদ চমকিয়া উঠিয়া ব-  
সিলেন। নুরমেহার নিদ্রা হইতেই সেই  
বক্তৃতিবোধবৎ গভীর স্বর শ্রবণ করিয়া  
জাগরিত হইলেন। উভয়েরই বিশ্বাস হইল  
মন্ত্রীর আত্মা শরীরধারণ করিয়া আসিয়া  
ছিল। এই অবধি প্রতিদিন স্বপ্নে ভরানক

হত্যাকাণ্ড দেখিতেন, দিবসেও “মামুদ  
গাওয়ান আমাকে খণ্ড খণ্ড করিল, হৃদয়  
বিদীর্ণ করিল” এই বলিয়া চীৎকার ক-  
রিয়া উঠিতেন। ইহার পর তিনি এক বৎ-  
সরমাত্র জীবিত ছিলেন, এই সময়ের  
মধ্যে তাঁহার আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম কোন  
বিষয়েই প্রণিধান ছিল না। পরিশেষে  
তাঁহার অস্পব্যাপী অথচ গৌরবপূর্ণ জী-  
বনের অবসান হইল; জলবুধুদের ভ্রায়,  
আতোষ বাজীর অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ভ্রায়, নখর  
জীবনের ক্ষণস্থায়ী ঘটনাবলীতে দর্শক-  
হৃদয়ের নয়ন ও মন তৃপ্ত করিয়া অনন্তসা-  
গরে মিশিয়া গেলেন। তাঁহার অভাবে  
রাজ্যের যে অবস্থা হইয়াছিল, ইতিহাস-  
বেত্তা পাঠকগণ সন্দিগ্ধতার জ্ঞাত আছেন।

গুলশেরার করূপে তাঁহার পিতার  
মিত্রিতাবস্থায় শিবিরমধ্য হইতে বাহিরে  
আসিল এবং করূপেই বা সে কাঞ্চিপু-  
রীত হইল, সময় অভাবে আমরা এপর্যন্ত  
তাঁহা বিবৃত করি নাই। এখন এস্থলে  
তাঁহা গ্রহণ করিলাম।

গুলশেরার মন্ত্রীর পটমণ্ডপে শয়ান  
ছিলেন। সহসা স্বপ্নে দেখিল যেন তা-  
হার পিতা শয্যায় নাই, কোণায় যাইতে-  
ছেন। বালিকা উঠিয়া তাঁহার পশ্চাৎ প-  
শ্চাৎ চলিল। তিনি দ্রুত যাইতে লাগিলেন  
সেও দৌড়িতে আরম্ভ করিল। অবশেষে  
তাঁহাকে পশ্চাত্তানে রাখিতে কোতুল্লা-  
ক্রান্ত হইয়া দৌড়িয়া তাঁহাকে ছাড়াইয়া

অনেক দূরে গেল। কিন্তু পশ্চাদ্ধিকে চাহিয়া দেখিল তাহার পিতা নাই। চমকে নিজ্জাভঙ্গ হইল। দেখে যে কোথায় শিবির, কোথায় তাহার পিতা, আর কোথায় বা তাঁবু। মাঠের মধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া আছে! তাহার ক্ষুদ্র শরীর কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে মণ্ডিত ছিল, অন্ধকারে কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইয়াছে কেহই দেখে নাই। পূর্বেও এরূপ স্বপ্ন দেখিত কিন্তু কখনও এমন ভয়ানক অবস্থায় পতিত হয় নাই।

অদূরে একটি আলোক দেখিয়া ভাবিল সেই খানে তাহার পিতা থাকিতে পারেন। অগ্রসর হইয়া দেখিল একজন সন্ন্যাসী। সে যোগবলেই হউক, অথবা তাহার অবস্থা দেখিয়াই হউক, সমস্ত বুঝিয়া তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া কাকীপুরে আনিয়া এবং প্রভাত সময়ে তাহাকে রাজ্যের নিকট রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইল। গুলনের আর এত ভীতা হইয়াছিল যে, এক দিন একটি কথাও বলিল না। পরিশেষে প্রমোদিনী ও কণপ্রভার সহিত একত্র অবস্থান করিয়া মনের অনেক কষ্ট ডুবিয়া গেল।

কোমলহৃদয়া ললনাগর যবনদ্বিতাকে সহোদরার মত স্নেহ করিতেন। তাহাকে তাহার পিতৃ পরিবারস্থ সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। বালিকা অন্যায়ের সহিত ধরণীনাথের নাম লইত, এবং শতযুগে তাঁহার প্রশংসা করিত। প্রমো-

দও শুনিতে ব্যগ্র হইয়া প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করিত এবং সেই কোমলকণ্ঠে প্রিয়তম নামের মধুরতায় তাঁহার শ্রবণের তৃপ্তি সাধন করিত। সর্বদাই শুনিত ধরণীনাথ, ধরণীনাথ। একদিন গুলনের জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাম কি? প্রমোদ বলিল ‘ধরণী’। বালিকা বুঝিল না, চাহিয়া রহিল। প্রমোদিনী তাহার গাল টিপিয়া ধরিয়া হাসিতে লাগিল, আবার অস্পষ্টকণ পরেই একটি নিঃশ্বাস ছাড়িয়া অন্যদিকে তাকাইল।

কুমারী কণপ্রভা এবং প্রমোদিনী, ধরণীনাথ নাম কিরূপে জানিল তাহা বলিয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রথমেই সমুদ্র-তীরে যাহার সঙ্গে পাঠকের দেখা হইয়াছে, যিনি বজ্রের শব্দে অচেতন হইয়া একটি অট্টালিকার সোপানোপরি পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং যিনি অট্টালিকামধ্যস্থিত রমণীরয়ের সেবার পুনরায় সংজ্ঞা, বলিতে গেলে এক রকম জীবন, লাভ করিয়াছিলেন, তিনিই ধরণীনাথ। তিনি অনুকল্প হইয়া সে রাত্রি সেখানে যাপন করিলেন, কিন্তু পরদিন অতি প্রত্যুষে আসিয়াও কণপ্রভা আর তাঁহাকে দেখিতে পারিল না। দেখিল তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বহুমূল্য পরিচ্ছদ, একখণ্ড বহুমূল্য হীরক, এবং একছড়া উৎকৃষ্ট গজমুক্তাহার একখানি কমালে বাঁধা আছে, একখণ্ড কাগজে “প্রমোদিনী” নামটিও তাহার মধ্যে লিখিত রহিয়াছে। কাককর্ষাধতিত স্বর্ণ-

মণ্ডিত একটি শিরস্ত্রাণ নিকটে পড়িয়া আছে, তাহার একপাশে লেখা আছে ধরনীনাথ।” সকল আছে কিন্তু তিনি কোথায় ? উন্মুক্ত গাভাক পথে দৃষ্টি সঞ্চালন করিল, দেখিল, মৃত অশ্বটিকে কাক-কুকুরে ভক্ষণ করিতেছে। তাঁহার মন নিতান্ত বিকল হইল। কিন্তু কিছু প্রকাশ করিল না। প্রমোদিনীর নাম লিখিত দেখিয়া তাহার মুখ বোধ হইল না, নামটি ছিড়িয়া ফেলিল। এমন সময় প্রমোদিনীও সেই স্থানে আসিল। ঐ সমস্ত বস্তু দেখিয়া তাহার মনে নানাপ্রকার ভয়ের উত্থেক হইল, চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল; ক্ষণপ্রভার মুখের দিকে তাকাইল কিছু কহিতে পারিল না; কিন্তু ক্ষণপ্রভা যখন জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কি মনে হয় ? এসকলের অর্থ কি ?” তখন তাহার মাথা ঘুরিতে, নাসিকারক্ষু ক্ষীত ও বক্ষস্থল একবার উন্নত একবার অবনত হইতে লাগিল, এবং ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। প্রমোদকে বুঝাইতে ক্ষণপ্রভা কত বলিতে লাগিল, কিন্তু যে ক্ষণ ক্ষণমাত্র সময়েতে একবারে আত্মদান করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাকে বুঝান সাধ্যান্য কথা নহে। প্রমোদ মাথা ধরিয়া প্রাচীরাবলম্বনে বসিয়া পড়িলেন। এক ঘণ্টা এইরূপে অভিহিত হইলে পর আশা আসিয়া তাহার কাণে কাণে মৃদুমধুর স্বরে কি যেন বলিয়া গেল, অমনি উঠিয়া যত্ন পূর্বক পথিকের সকল সংগ্রহ করিয়া লইল। আপনার হৃদয়ের, সতর্ক মনের অ-

জ্ঞাতসারে যুক্তাকণী কণ্ঠধারণ করিল, সমস্ত শরীর সিঁহরিয়া উঠিল। শিরস্ত্রাণে নামটি দেখিয়া পুনঃ পুনঃ পাঠ করিল। পাঁচ সাতবার মনে মনে পড়িয়া একবার প্রকাশো পড়িল “ধরনীনাথ।” ক্ষণপ্রভা যে নিকট ছিল তাহা তাহার মনেও ছিল না, স্তবরাং ক্ষণপ্রভা হাসিয়া উঠিলে প্রমোদ লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিল। ক্ষণপ্রভা বলিল “আমাকে দেখিয়া ভয় কি ? এজন্মে ভয় করিও না।” প্রমোদিনী মনে মনে বলিল “তবে কি জন্মান্তরে আমাকে বঞ্চিত করিবে ?”

কুমারীঘর গৃহগমন করিবার সময় নিদাঘগৃহের রক্ষককে ডাকাইয়া পথিকের বস্ত্রাদি রাখিয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল; সে বলিল, “তাঁহার উদ্দেশ্য কি জানি না। কিন্তু আমাকে দুইটি স্বর্ণ-মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়া এবং আমার একখানি রক্তবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রহ্মচারীর বেশে চলিয়া গিয়াছেন। যাওয়ার সময় ঐ সকল বস্তু কুমারী প্রমোদিনীকে রাখিতে বলিয়া গিয়াছেন।” প্রমোদের মনে কত মুখ, কত আনন্দ। ক্ষণপ্রভা যেন কিঞ্চিৎ বিষম হইল। তাহার উভয়েই বুঝিয়াছিল বোধ হয় ছদ্মবেশে যাওয়া কর্তব্য বোধ করিয়াছেন। কাঞ্চীপুরস্থ রত্নেশ্বরের মন্দির প্রভৃতি দেখিবেন, রাজার ন্যায় পরিচ্ছদ দৃষ্টে যদি কেহ সন্দেহ করে এই ভয়ে ছদ্মবেশ অবলম্বন করিয়াছেন।

## যষ্ঠ পরিচ্ছেদ ।

### আশা-মরীচিকা ।

কাকীপুরের দেবমন্দির লুণ্ঠন হওয়ার পর যখন ধরনীনাথ গুল্মেনয়ারকে আনিত্তে গিয়াছিলেন তখন প্রমোদিনীকে একটি অট্টালিকার ছাত্তের উপর দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনা জ্ঞাত প্রমোদ যে মস্তক নত করিয়াছিল সেই কমনীয় চিত্র সৰ্ব্বদা যুবকজন্মেরে জাগরক ছিল, এবং তাহাতেই তাঁহার মনও আশ্বস্ত ছিল। প্রথমদর্শনে তাঁহার মনে হইয়াছিল জড়োপাসকের ন্যায় তাঁহার হৃদয়াকাশের নক্ষত্রটিকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে এবং মনে মনে অনন্তজীবন পূজা করিতে হইবে, স্পর্শ অথবা অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারিবে না। কিন্তু দ্বিতীয় বার দেখিতে পাইয়া নিরাশাবস্থা দূর হইয়াছিল। তাহার মনে হইয়াছিল তাঁহার ন্যায় উৎকৃষ্ট জ্যোতির্বিদ এবং তাঁহার চক্ষুর ন্যায় দর্শনযন্ত্র পৃথিবীতে আর নাই। দূরবীক্ষণ কখনও আকাশের নক্ষত্র গৃহের ছাত্তের উপর আনিত্তে পারে না, জ্যোতির্বিদও গ্রহনক্ষত্রের হৃদয় পাঠ করিতে পারে না, তিনি দুই কার্যই করিলেন।

কিছু দিন পরে আবার কাকীপুরে উপস্থিত হইয়া প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা হইল। গুল্মেনয়ারের

মুখে আশ্বাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আত্মাদিত হইয়াছিলেন সুতরাং আবার তাঁহাকে দেখিতে চলিলেন। কিন্তু এবার ছদ্মবেশে, একজন সন্ন্যাসী। বৈশাখী পূর্ণিমার দিবস পরিচিত প্রাসাদ সমীপবর্তী সমুদ্রতীরে উপবিষ্ট হইয়া সন্ন্যাসী যুবক তপস্যায় নিবিষ্টচিত্ত হইলেন। কুমারীগণ ‘আত্মানমাত্মানাবলোকয়ন্তুম্’ সন্ন্যাসীকে গৃহপ্রবেশ সময়ে দেখিলেন। সন্ন্যাসীর চক্ষুও সেই কণু যুগ্ম শব্দ শ্রবণে তৎপ্রতি বদ্ধদৃষ্টি হইয়া যেন পরমাত্মায় লীন হইল। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি প্রকারে গৃহে প্রবেশ করিবে। অনেক ভাবনার পর মন উপদেশ দিল ‘কাকচরিত্র হইলে কুমারীগণের অদৃষ্ট গণনা করিতে যাইতে পারিবে না। সুতরাং সন্ন্যাসী কাকচরিত্র হইলেন। সংকল্প স্থির হওয়া মাত্রই গণনা করিবার ইচ্ছা হইল। আপনার অদৃষ্ট প্রথমতঃ আপনিই গণনা করিতে বসিলেন। হৃদয় দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল। দক্ষিণ নয়ন অনবরতঃ স্পন্দিত হইতে লাগিল সকলই অমঙ্গল। গৃহপ্রবেশের দিনই ঝড় বৃষ্টি। সুতরাং গণনায় স্থির হইল ‘যুবক! বিরত হও। তোমার অভিলষিত বস্তু সিংহের মথরাভাঙরে।’

যুবক ভীত হইলেন, কিন্তু বিরত হইলেন না। তার সমীপে উপস্থিত হইয়া আঘাত করিলেন, একটি বৃদ্ধা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ‘কে?’ তিনি বলিলেন

একজন কাকচরিত্র। 'ক্ষণপ্রভা কাকচ-  
রিত্রের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে  
গৃহে লইয়া যাঁইতে আদেশ করিল এবং  
রন্ধাকে প্রমোদিনীর বিবাহ এবং আপ-  
নার মৃত্যু গণনা করাইতে শিখাইয়া  
দিল। প্রমোদিনী হাসিল, কিন্তু মনে  
ভাবিল ক্ষণপ্রভা মরিতে চান কেন?

কাকচরিত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন।  
তাড়িৎ যেমন মেঘারুত আকাশ ভেদ ক-  
রিয়া বাহির হয়, ক্ষণপ্রভার প্রভাবিশিষ্ট  
চক্ষুও সেইরূপ সুবকের ছদ্মবেশ ভেদ ক-  
রিয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিল এবং  
তৎক্ষণাৎ হাসি অথবা লজ্জামিশ্র ব্য-  
গ্রতার সহিত একটি শব্দ করিয়া কক্ষা-  
ন্তরে প্রবেশ করিল। প্রমোদিনী কি  
চিনিল না? হাঁ সেও চিনিল, প্রাণ-  
য়ের চক্ষু বড় তীক্ষ্ণ, স্তবরাং সে সহজেই  
সুবকের হৃদয় পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল।  
কিন্তু মৃগয়ার্থীর আশা যেমন মৃগের দর্শন  
লাভেই চরিতার্থ হয় না অসুসরণ করিয়া  
মৃগটিকে করায়ত্ত করে, সেও তাহাই ক-  
রিতে যত্নবতী হইল। স্তবরাং কাকচ-  
রিত্রের নিকটেই বসিল।

আমাদের কাকচরিত্র পণ্ডিত। তিনি  
কেবল নভোমণ্ডল দেখিয়াই বিদ্যালান্ত  
করিয়াছেন এমন নয়, তাঁহার সামুদ্রিকও  
ব্যুৎপত্তি আছে। স্তবরাং প্রমোদের হস্ত  
দেখিতে চাহিলেন। প্রমোদ আস্তে আস্তে  
কোমল হস্তখানি সুবকের হস্তে স্থাপন ক-  
রিল; সন্ধ্যাসীর গণনা আর মনে রহিল না,

হস্ত ধরিয়া বিবশশরীরে ভ্রান্ত মনে ব-  
সিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পর প্রমোদ  
চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল 'বলত  
আমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে কি না?'

এবার কাকচরিত্রের আকাশ প্র-  
মোদিনীর গস্তীরভাবপূর্ণ মুখমণ্ডল। তিনি  
অনিমেঘময়নে সেই আকাশ দর্শন ক-  
রিলেন, চমকিত হইলেন। শূন্যমনে ব-  
সিলেন, 'যাহা অভিপ্রেত তাহা আপনার  
হস্তগত। কিন্তু তাহা ধারণ করিবার পূর্বে  
সিংহের কবল হইতে সেই হস্ত মুক্ত ক-  
রিতে হইবে।' প্রমোদিনীর শরীর কম্পিত  
হইল। মনে করিল যথার্থ কথা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন। মুক্ত হইবার সম্ভাবনা  
আছে কিনা?

উত্তর। আমি আশা করি হইবেন।  
ঈশ্বর এবিষয়ে আপনার সহায় হউন।

তৃতীয় প্রশ্ন। তাঁহাকে একদিন শয্যা  
পার্শ্বে অচেতন অবস্থায় শয়ান দেখিয়াছি-  
লাম, এবং আর একদিন ছাত্তের উপর।

উত্তর। আপনার নয়নে সে মূর্তি  
অঙ্কিত।

প্রমোদিনী চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, ল-  
জ্জিতা হইলেন, একটু হুঁ হাসিলেন। ভা-  
বিলেন উঠিয়া যাঁইবেন। কিন্তু আর যদি  
দেখা না পান? এই ভাবনা।

সুবক তখন বলিতে লাগিলেন "যে  
চিনিয়া অপরিচিতের ন্যায় কাহারও প্রতি  
ব্যবহার করে, তাহার গণনার যেটির  
ভাল ফল সেটিও যক্ষ হইয়া যায়"



প্রমোদিনী এবার আর থাকিতে পারিল না, আশ্বে আশ্বে উঠিয়া ছাত্তের উপর গেল। একবার মস্তক দ্বন্দ্ব বক্র করিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিল, কিন্তু তাঁহার চক্ষে চক্ষু মিলিত হইল দেখিয়া মুখমিশ্র লজ্জানিমিলিতনয়নে ক্ষতপদে প্রস্থান করিল। পরগীনাথ তাঁহার অনুগমন করিলেন। উভয়ে ছাত্তের প্রান্তভাগে দাঁড়াইলেন। প্রমোদ বলিল “এখন পড়িয়া মরিলে কেমন হয় ?

যুবক আর আত্মদমন করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, ‘সুন্দরি ! তোমার ন্যায় দুর্লভ ললনারত্নের যে কত দূর ক্ষমতা তাহা যদি বুঝিতে চাও একবার মুকুর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইও। আমি প্রথম দিন হইতেই তোমার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি, তাহা যে না বুঝিতেছ এমনও নয়। আমার দিন নাই, রাত্রি নাই, অরণ্য নাই, যখন যে অবস্থায় তোমাকে মনে হয় সকল অতিক্রম করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আসিয়া উপস্থিত হই। এই জন্যই আমার এত পরিশ্রম। তোমারই জন্য আমি ছদ্মবেশী। এতদিনের ভালবাসার যদি এই প্রতিদান হয়, যদি তুমি আমার পরি-ভাগ কর, এরূপ নির্ভর ব্যবহার কর, আর স্বদেশে প্রত্যাগমম করিব না। এই তুমি, এই সমুদ্র, অটালিকা এই সকল দেখিতে দেখিতে পাখির জীবন এই স্থানেই বিসর্জন দিব। পরকালে কখনই আমার এমন ভাবে পরিভাগ করিতে পারিবেনা।

পরগীরা চক্ষে জল আসিল। উভয়েই বসিলেন। কিঞ্চিৎ ব্যবধান হইয়া বসিলেন। কিন্তু উভয়ের আত্মবিস্মৃতি আরম্ভ হওয়ার প্রথমতঃ প্রমোদের হস্ত যুবকের হস্তে, পরে তাঁহার বক্ষঃস্থলে ন্যস্ত হইল। যুবকের চক্ষের জলে হস্তখানি সিক্ত হইতে লাগিল।

প্রমোদিনী কিঞ্চিৎ সুর্তির হইয়া বলিল, আমি কিরূপ বিপন্ন যদি তাহা একবার জানিতেন তবে আর আমার আশ্বস্ত হইতে বলিতে সাহসী হইতেন না। অমৃত্তে কে অনাদর করে ? প্রথম দর্শনের দিন হইতে অদ্যপর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কষ্টময় সময়ের মধ্যে তিলেকের জন্যও যদি আপনার দেবোপম মুখমুখী বিস্মৃত হইয়া থাকি তবে যেন আমার পরকালেও মুখ হয় না। আমি কি ছিলাম কি হইয়াছি ! হয়ত আপনি আমাকে চঞ্চলা মনে করিবেন, না হয়ত নিলজ্জ বলিয়া ঘৃণা করিবেন। কিন্তু সে সকলের কারণ আপনিই, দোষ আপনার। পূর্বে আমি এরূপ ছিলাম না। আশায় ক্ষান্ত হউন, বাস্তবিকই আমি সিংহের কবলগত। এই জন্যই আপনাকে সতর্ক করিতে গুলনেরারকে শিখাইয়া দিয়াছিলাম আপনি যেন এ প্রদেশে আর আইসেন না।’

যুবক বলিলেন, ‘সুচরিত্রে আমি মৃত্যুকে ভয় করি না, তোমার জন্য যদি মরিতেও হয় তাহাতেও আমার মুখ তথাপি না দেখিয়া থাকিতে পারিব না।

তুমি রাজকন্যা আমি ভিক্ষারী। এত উচ্চ আশা আমার পক্ষে দুরাশা মাত্র একথা আমি বিলক্ষণ জানি। তথাপি মন মানেন না, তথাপি হৃদয়কে প্রবোধ দিয়া রাখিতে পারি না, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। যদি সত্য করিতে পারিতাম তবে অনল শরীরসহ মনের অনল ভস্ম হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতাম, আর পারি না। তুমিই আমার স্বামী, তুমিই সর্বস্ব। তুমি যদি আমার পরিত্যাগ কর তবে—’আর বলিতে পারিলেন না।

প্রমোদ কাদিয়া বলিল ‘আপনি কেন আত্মনিন্দা করিতেছেন? ইহাতে যে আমি মনে বেদনা পাইয়া থাকি বুঝেন না? আপনি যে উচ্চবংশজাত একথা যদি শপথ করিয়াও অস্বীকার করেন তথাপি এবিখ্যাস আমার হৃদয়ে থাকিবেই থাকিবে। আমার নিকট আপনার যাহা আছে অনেক রাজার ঘরে তাহা নাই। যদি আপনি পথের ভিক্ষারী হইতেন, তাহা হইলেও কি ভুলিতে পারিতাম? এমন ভিক্ষারী লাভ করিতে কত রাজকন্যা ভিক্ষারী হইবে। আপনি যদি মুসলমান হইতেন তবে ভাল হইত।’

যুবক এই শেষাংশের অর্থ বুঝিতে পারিলেন না জিজ্ঞাসা করার প্রমোদ বলিল ‘মুন্সেরী গুলশেনারের উপযুক্ত স্বামী আপনা ব্যতীত আর নাই।’

ধরনী বুঝিলেন, এবং সেই জন্মদ্বঃখিনীর শোচনীয় পরিণাম বর্ণনা করিয়া

প্রমোদিনীর হৃদয় বাধিত করিলেন। প্রমোদ ভাবিল যে, আপন রূপের আকর্ষণী শক্তিতে আশ্বস্ত হইয়াই যেন মনে করিল ‘এখন আর পৃথিবীতে প্রতিদ্বন্দ্বী নাই।’ অনন্তর বলিতে আরম্ভ করিল।

‘আমাকে রাজকন্যা বলিয়া কেন হুঁকা কষ্ট দিতেছেন? একদিন রাজার কন্যা ছিলাম, এক্ষণে ভিক্ষারিনী। পিতা করুণ রাজা হারাইয়া কাঞ্চীরাজের আশ্রয়ে আসিয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে না পারিয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, আমরা মায়ে ঝিয়ে বন্দিনীর ন্যায় এই রাজার গৃহে আছি। মায়ের ইচ্ছা আমরা চিরদিনই এই গৃহে থাকি, তদনুসারে বিবাহের আয়োজন হইয়াছে।’

আর বলিতে পারিলেন না! দুই বৎসর পূর্বে যে ভয়ঙ্কর অশনিিনিবাদ ধরনীনাথকে অচেতন করিয়াছিল, আজ যদি সেই বজ্র তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিত তাহা হইলেও এত বেদনা পাইতেন না। যখন বুঝিলেন রাজা যশোধন প্রমোদকে বিবাহ করিবেন তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ভয়ানক অগ্নি হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিল, পড়িয়া গেলেন।

প্রমোদিনী কাদিয়া উঠিল। ক্ষণপ্রভা দৌড়িয়া গেল, হুঁকা জল আনিল। প্রমোদ যুবকের মস্তক বক্ষস্থলে রাখিয়া অঞ্চল দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিল, ক্ষণপ্রভা মস্তকে, চক্ষু, কণ্ঠে জল সিক্তন

করিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পর তাঁহার চৈতন্য হইল, কিন্তু কি ভয়ানক পরিবর্তন। উন্নতবৎ মূর্তি, তাঁহার পৃথিবী শূন্যময়। নগপ্রভা বলিল ‘অভাগিনি। আমিও পূর্বেই বলিয়াছি দুরাশায় প্রবৃত্ত হইও না। নিজেও মরিবে অন্য একজনকেও সজ্জী করবে। দাদা জানিতে পারিলে আমাদেরই বা কি উপায় হইবে?’

প্রমোদিনী উত্তর দিল না। যুবক উঠিয়া বসিলেন। তখন প্রমোদ গৃহ গমনের জন্য প্রস্তুত হইল। ধরনীনাথ তাঁহার মুখের দিকে এরূপ মর্মপীড়িত অবস্থায় দৃষ্টিপাত করিলেন যেন তাঁহার সমুদয় আশা ভরসা জন্মের মত বিসর্জিত হইল। তাহা দেখিয়া কুমারী বারবার নাই ব্যথিত হইলেন এবং মুক্তকণ্ঠে বলিলেন ‘যখন জ্ঞানে হউক অজ্ঞানে হউক তোমার কণ্ঠের মুক্তাহার হৃদয়ে ধারণ করিয়াছি তখন যদি এজীবন যায় তথাপি হৃদয় অন্যের হইবে না। জীবন গেলেও তোমারই থাকিব, পরকালেও তোমারই থাকিব। তুমি আমাকে এত ভালবাস আমি কেবল তোমাকে কষ্টই দিলাম।’

যুবক হতবুদ্ধি হইয়া সেই মহিমাপূর্ণ ভাববিকাশক মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। প্রমোদিনী আর একবার তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে ভবনে প্রস্থান করিল। যুবকও ধীরে ধীরে বাহির হইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যায়।

সায়ংকাল উপস্থিত। পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া সাগরের জল রঞ্জিতময় করিলেন, জলরাশি আছাদে নাচিতে লাগিল। একজন গম্ভীর প্রকৃতি চিন্মশীল ভাবুক একটি প্রক্ষুটিত গোলাপ হস্তে লইয়া উপবিষ্ট আছেন; সমুদ্রের লহরীলীলা অবলোকনেই যেন নিরীক্ষমনে বসিয়া আছেন। কিন্তু মুখশ্রী গম্ভীর হইলেও বিষম, হস্তস্থিত গোলাপটি একবার নাসিকার নিকট, একবার হস্তকে, একবার অধরে, একবার চক্ষে একবার কর্ণমূলে, একবার গণ্ডস্থলে, এবং অনবরতঃই হৃদয়ে স্থাপন করিতেছেন। সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এত প্রিয়, এত আদরের গোলাপটি সমুদ্রোর্গি মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। যতক্ষণ, যতটুকু দেখা গেল, দেখিলেন, যখন ডুবিয়া গেল বলিলেন, ‘আর না, আজ হইতে আমার আশাও বিসর্জন দিলাম।’ তখন সে স্থান হইতে উঠিলেন এবং অনিশ্চিতমনে ইতস্ততঃ পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

পাণি মধ্যে একটি যুবককে তাঁহার ন্যায় বিষমমনে বাইতে দেখিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তাই অদ্য তোমার এবেশ কেন? রাত্রিকালে কোথায় বাইতেছ?’

যিনি জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি আমা-  
দের পরিচিত যশোধন, বাঁহাকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন তিনি তাঁহার সখা ধরনীনাথ !

ধরনীনাথ বলিলেন ‘ ভাই ক্ষমা করণ ।  
বিশেষ প্রয়োজন আছে, অপেক্ষা করিতে  
পারি না । আপনি আমার এতপ্রকার হিত  
সাধন করিলেন, আমি অনিচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই  
করিতে পারিলাম না । আপনি আমাকে  
মিত্র বলেন, কিন্তু ভাই ! আমি চিরকালই  
আপনার সহিত শত্রুতা করিয়া আসি-  
তেছি । ভাই ! এ পাপিষ্ঠের শরীর স্পর্শ  
করিবেন না, এ আপনার অনুগ্রহের অ-  
যোগ্য । যদি এ পাপ জীবন পরিত্যাগ  
করিলে আপনার মুখ হইত, করিতাম—কিন্তু  
তাহাও হইবে না । ক্ষমা করণ, আমার  
ক্ষমা করণ ! ’ এই বলিয়া ধরনী এত দ্রুত  
চলিয়া গেল যে যশোধন আর অনুগমন  
করিতে সাহসী হইলেন না, তাঁহার মনের  
এতাদৃশ চাক্ষুশ্য কাঙ্ক্ষীরাঙ্গ আর কখনও  
দেখেন নাই, স্মৃতরাং বিস্মিত হইলেন,  
এবং আশ্বে আশ্বে গৃহে গমন করিলেন ।  
কএকজন লোককে যুবকের অনুসন্ধান  
যাইতে বলিলেন ।

প্রমোদিনী অপরাহ্ন বেলা দুই ঘটিকা  
থাকিতে গৃহে গমন করিয়াছিল । অস্ত্র-ক-  
রণ নিতান্ত বিমর্ষ । একাকিনী একটি গো-  
লাপ হস্তে লইয়া পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া-  
ছিল । রাজাও সেই সময় সেই দিকেই গ-  
মন করিয়াছিলেন । তিনি সোনার প্রমো-  
দকে তদবস্থ দেখিয়া ভীত হইলেন । কিছু

জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস পাইলেন না ।  
প্রমোদও তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত চকিতা  
ও ভীতা হইল, উঠিয়া দাঁড়াইল, শ-  
রীরের কম্পনে গোলাপটি হস্তচ্যুত হইল ।  
যশোধন অতি যত্নের সহিত তাহা তুলিয়া  
লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘ প্রমোদ !  
একি ? প্রমোদ কাদিয়া তাঁহার পায় প-  
ড়িল, বলিল ‘ মহারাজ ! আমার ক্ষমা  
করণ, আপনি আমার অনেক উপ-  
কার করিলেন, হতভাগিনী তাহার কিছুই  
প্রতিদান করিতে পারিলাম না । আমি  
অবলা, আমার কোন শক্তি নাই । আমি  
কেবল ঈশ্বরের নিকট আপনার মঙ্গল  
প্রার্থনা করিতে পারি । অধিক কি ব-  
লিব, এতকাল আপনাকে ভাল বাসিতাম  
না, আজ হইতে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায়  
ভালবাসিব, অন্য হইতে আমাকে ক্ষণ-  
প্রভার কনিষ্ঠা জ্ঞান করিবেন । আমার  
নির্বুদ্ধিতা যদি কখনও আপনার কোন  
অনিচ্ছা করিয়া থাকে আমাকে ক্ষমা  
করিবেন । দাদা ! বলুন আমাকে ক্ষমা  
করিবেন । ”

যশোধন অবাক হইলেন । তাঁহার  
এতদিনের অভিলাষ ছিন্নমূল হইল । তাঁ-  
হার সকল আশা, সকল ভরসা গভীর  
জলধিতলে নিষ্কিন্ত হইল । একটি নিঃ-  
শ্বাস নির্গত হইল । অতি কষ্টে, আপ-  
নার সহিত আপনাকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া  
বলিলেন “ ক্ষমা করিলাম, তুমি আজ  
হইতে আমার সহোদরা কনিষ্ঠা ভগ্নী ! ”

অনন্তর বাঁচী হইতে বহির্গত হইয়া সমুজ্জতীরে গমন করিলেন এবং এতদিনের আদরের হৃদয়কুসুম হস্তস্থিত গোলাপসহ সমুজ্জে বিসর্জন দিলেন ।

প্রমোদের নিকট ওরূপ বলিয়া আসিলেন সত্য কিন্তু পরম্পরবিকল্প ভাব গুলিতে তাঁহার হৃদয় আকুলিত করিয়া তুলিল এবং উপস্থিত রহস্য সম্বন্ধে গভীর সন্দেহে তাহার মন ত্রিধা বিভক্ত হইতে লাগিল । এক একবার ক্রোধে এবং প্রতিহিংসায় শরীর জর্জরিত হইতে লাগিল আবার উৎকর্ষ প্ররতিগুলি প্রবল হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে ক্ষমা করিতে বাধ্য করাইল । তিনি প্রমোদকে সর্বাস্তঃকরণে ক্ষমা করিলেন । গৃহে গমন করিয়া ক্ষণপ্রভার নিকট প্রমোদিনীর মনের ভাব সবিস্তার জিজ্ঞাসা করিলেন । সে অনেক চেষ্টা করিয়াও জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বিরত করিতে না পারিয়া শঙ্কা ও সঙ্কোচের সহিত সকল ঘটনা সংক্ষেপে বলিল ; গোপন করা অথবা মিথ্যা বলা তাহার অভাববিপরীত, স্মরণ্য সকলই যথার্থ রূপে বলিল । যশোধন স্তম্ভিত হইলেন । ক্ষণপ্রভা মনে করিয়াছিল আজ যেম কি ভূগটনাই ঘটে । কিন্তু একটি নিঃশ্বাসও শুনিতে না পাইয়া আশ্চর্য্য হইল । মনে মনে বলিল “ বাল-বিধবাগণ যেম দাদার নিকট চিত্তসংযম অভ্যাস করে । ”

যশোধন বহির্ভাগে গমন করিয়া স-

প্রাথমধ্যে বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন । আদেশ সম্পাদিত হইল । সকলেই বলিতে লাগিল প্রমোদিনীর সহিত যশোধনের বিবাহ । যশোধন বলিতেন প্রমোদের বিবাহ, সকলে বুঝিত তিনি বিবাহ করিবেন । দেশের মুখে শুনিয়া প্রমোদিনী ভীত হইল । মনে ভাবিল এমন ব্যক্তি কি এমন পাপ কার্য্য করিবে ?

দেখিতে দেখিতে সপ্তাহ অতীত হইল । গেল । বিবাহের দিন, পশ্চাৎ বিবাহের সময় উপস্থিত হইল । সভায় সকলে উপবেশন করিল, কন্যা আনীত হইল । প্রমোদিনী ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, নিদামের কেতকীগর্ভপত্রের ন্যায় তাঁহার রসনা শুষ্ক ও উষ্ণ হইল, নিঃশ্বাস অগ্নিময় হইল । তখনও ভাবিল “ সময়ও আছে, উপায়ও আছে । ”

পুরোহিত রাজাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন, কিন্তু রাজা বসিলেন না । নির্দ্ধারিত সময়ে একখান বস্ত্রারত পালাকির মধ্য হইতে বহুমুলাপরিচ্ছদপরিহিত এক পরমশুন্দর যুবাপুরুষকে বাহির করিলেন । এমন সুন্দরী পুরুষ কেহ কখনও দেখিয়াছে এমন বোধ হইল না । প্রমোদ দেখিল, চিনিল, আত্মলাভে অবশ হইল । ক্ষণপ্রভা দেখিল, দৌড়িয়া আপন কক্ষে প্রবেশ পূর্বক দ্বার রোধ করিল । এমন সময় প্রমোদিনীর নিকট একটি কোলাহল উঠিল । সকলে গিয়া

দেখিল একখান শাগিত ছুরিকা তাহার বস্ত্র হইতে সভামধ্যে পতিত হইয়াছে। যশোধন দেখিলেন, বুঝিলেন। কোন বিপদ ঘটে নাই দেখিয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন “অবোধিনি! তুমি কি কাঞ্চীপুরাধিপতিকে এমন পাষণ্ড অপদার্থই মনে করিয়াছিলে যে, প্রতিজ্ঞা করিয়া সে তাহা ভঙ্গ করিবে? আত্মহত্যার তুলা মহাপাপ জগতে আর নাই।”

পরে গস্তীরম্বরে সকলকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন “আপনারা হয় ত বিন্মিত হইতেছেন, এ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি কোথা হইতে আসিলেন?” কিন্তু আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি ইনি একজন অদ্বিতীয় বীরপুরুষ। আমি একবার ইহার বিরুদ্ধে পরাজিত ও সাহস দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছি। আমি ইহাও জানি প্রমোদিনী এই যুবকের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত এবং ধরনীনাথও প্রমোদকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন; এমন কি যদি এই দুই জনের মিলন না হইত, পৃথিবী তিনরাত্রিও এ দুই জনকে চক্ষে দেখিত কি না সন্দেহ। প্রমোদ আমার আশ্রিতা, যদি আমার ভয়ে ভীত হইয়া বিবাহে সম্মতি দিত, তবে পরে উভয়েরই যার পর নাই অসুখ হইত, প্রমোদ আত্মঘাতিনী হইত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনই দেখিলেন। আজ আমি যে কার্য্য করিলাম তাহাতে প্রতিপালিতা ও বন্ধু উভয়ের প্রতি কর্তব্য ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম, এজন্য আমার মন সর্ব্বদা

আনন্দিত থাকিবে। ইহার আকার প্রকার হইতেই বংশমর্যাদা একরূপ বুঝিয়া লওয়া যায়। আমার বিশ্বাস হয় ইনি কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ হইবেন। ইনি যে ক্ষত্রিয় তাহা আমি বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি। প্রমোদিনীর মাতা ও ভ্রাতা এখানে আছেন, তাহারা সম্মত হইলেই বিবাহ নিরীহ হইতে পারে।”

সকলেই সম্মত হইলেন, বিবাহ সম্পন্ন হইল। তখন রাজা যশোধন তাহাদের ভরণপোষণার্থ বিশেষ কোন উপায় বিধানের প্রস্তাব করিলেন। এতক্ষণ পর্য্যন্তও ধরনীনাথ নিশ্চিন্তভাবে বসিয়াছিলেন আর থাকিতে পারিলেন না। রাজার এতদূশ মহত্ব দেখিয়া সে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন, রক্তজ্ঞতার সমস্ত শরীর পুলকিত হইল। গদগদবচনে কহিলেন “মহারাজ! প্রচুর হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত উপকার করিলেন এই ঋণ পরিশোধ করিতেই আমার কয় জন্ম অতিবাহিত হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই, আর আমায় ঋণী করিবেন না। আমার প্রতিপালনের জন্য আপনার অর্থব্যয় করিয়া আবশ্যক নাই।”

“আমি কে?” এই প্রশ্ন অনেকদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু বলি নাই। যে অবধি প্রমোদিনীর প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলাম, সেই অবধিই আত্মগোপন আবশ্যক হইয়াছিল। তাহার দুইটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ, আমার মনে হইয়াছিল আপনার সহিত প্রমোদিনীর বিবাহ হইতে

পারে, আমি যদি আপনার সুখের পথের কটক হই, তবে নিতান্ত স্তব্ধের কার্য্য করা হয়। আপনি রাজা আমি পথের ভিখারী এইরূপ সংস্কার হইলে হয়ত প্রমোদের মন আপনার প্রতি ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, যদি তাহা না হয়, তবে প্রমোদ আমাকে ভিখারী জানে পতিভে বরণ করিয়া পরে সজ্জতিপন্ন জানিলে আরও অধিক সন্তুষ্ট হইবেন; এই দুইটি কারণ মনোমধ্যে উদয় হওয়াতে এত দিন প্রকাশ করি নাই। প্রমোদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আপনার বিষয়ে নিরাশ হইলাম, তাই সে দিন সাক্ষাৎ হওয়াতে অনুতপ্ত হৃদয়াবেগ গোপন করিতে পারিলাম না বলিয়া আপনার সহিত আলাপও করিলাম না। পরিশেষে অন্যায় হইল বুঝিতে পারিয়া আপনার প্রেরিত পালকিতে আসিলাম।

“শুনিয়া থাকিবেন বুন্দেলখণ্ড বলিয়া একটি প্রদেশ আছে। আমার পিতা সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও রাজা ছিলেন। আমরা দুই ভ্রাতা মেদিনীনাথ রায় ও ধরনীনাথ রায় তাঁহারই সন্তান। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর হইতে মেদিনী রায় চান্দ্রীতে রাজত্ব করিতেছেন, আমি দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া নির্মুক্তভাবে

সুখাশ্বেষণে এবং জ্ঞানালোচনার সময় যাপন করিতেছি। অদ্য প্রমোদিনী চান্দ্রীর সিংহাসনের পাটরাণী হইলেন, আমি গৃহে গমন করামাত্রই ভ্রাতা কোন বিশেষ কারণে সিংহাসন পরিত্যাগ করিবেন। তিনি মহারাণী সজ্জের সহকারী হইয়া যবন দমনে বাহির হইবেন।

সকলে আত্মদে মগ্ন হইল। যশোধন বলিলেন অগ্নি কেহই বস্ত্রের আবরণে গোপন রাখিতে পারে না। আপনি যত কেন ছদ্মবেশ অবলম্বন করুন না, রাজার নায়রূপ কোন ক্রমেই লুকাইতে পারিবেন না। যাহা হউক অদ্য আমি বড় সুখী হইলাম। এমন গৃহে ভগ্নী বিবাহ দিতে আমি স্বেচ্ছা জ্ঞান করিতাম। প্রমোদ আমার ভগ্নী হইল।

কএক দিন প্রমোদ আত্মদে করিয়া রাজা ধরনীনাথ প্রমোদিনীকে লইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। রাজা যশোধন অনেক দূর পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। প্রমোদিনীর মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। ধরণীর জীবনের স্রোত ভিন্ন দিকে ভিন্ন কার্য্যে প্রধাবিত হইল। নবদম্পতি সুখের সংসারে সুখের মিলনে পরম্পর পরম্পরের সুখ সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

## রণরঘুর প্রলাপ।

৪। মনোহর হইতে ভয়ঙ্কর; এই কি সেই?

~~~~~

নীল আকাশে কলধৌত কলানিধি; অপূর্ণ, তথাপি শোভায় অতুল। নিকটে নক্ষত্র নাই; থাকিলেও স্রুধাংশুর ভুবনমোহন রূপরাশীর সম্মুখে সঙ্কুচিত, স্রুতরাং অদূরবীক্ষণ মানবনয়নের অদৃশ্য; শ্রাবণের আটটপুর্ণ তরঙ্গিনীবক্ষে দূরস্থিত তরুণীর ক্ষুদ্র প্রদীপের ক্ষীণালোক সদৃশ, সেই নভস্তলে, চন্দ্র হইতে দূরে—বহু দূরে—হুই একটি তারকা মিটি মিটি করিতেছে। চন্দ্র থাকিলে তারার জ্যোতির্স্বীকৃতি অসম্ভব,—সতীর অঙ্গে হীরক মলিনপ্রভ হইয়া থাকে।

প্রকৃতিকে স্রুধাসারে ভাসাইয়া চন্দ্র আপনি আকাশে ভাসিয়া যাইতেছে। আকাশে মেঘ, কিন্তু ছিন্ন ভিন্ন, খণ্ড খণ্ড, এই আছে এই নাই; এক খণ্ড মেঘ এক পার্শ্বে দ্রবরজতের ভাবে আরক্ত হইয়া ক্রমে স্বক্ষান্তরগবৎ হইয়াছে, তাহার পরেই আবার নীল আকাশ; আবার সেই মেঘ, আবার সেই আকাশ। ইহাদের উপর দিয়া, ইহাদের মধ্য দিয়া চন্দ্র ভাসিয়া যাইতেছে; যে মেঘখণ্ডে চন্দ্র-সংস্পর্শ হইতেছে, সে ই হাসিতেছে; তাহার পর স্নান, স্নানতর, পাংশুবর্ণ, ক্রমে কা-

শ্মিকালুপিত। একটা প্রকাণ্ড অশ্বখ বৃক্ষের শাখা পত্রপুঞ্জ পাবনের মূহ হিমোলে তরতর নাচিতেছে আর মহোন্মাদে রাশি রাশি জ্যোৎস্না ধরিয়া মাখিতেছে; ক্ষণে ক্ষণে, মাখিতে মাখিতে তকতলে সেই জ্যোৎস্না ছড়াইয়া নিতেছে। অদূরে শস্যক্ষেত্র, কৌমুদীর বিলাস জন্য কোমল শয্যা; তথায় কৌমুদী যেন আবেশে বিলুপিত।

এ অশ্বখমূল হইতে কিছু অন্তরে, তৃণ গুল্মবর্জিত একটা উচ্চ স্থানে বসিয়া আমি নিম্পন্দপ্রায় এই স্নিগ্ধ মধুরিমা নিরীক্ষণ করিতেছি। আকাশে চন্দ্র ভাসিয়া যাইতেছে; ধরাতে আমি বসিয়া আছি, তথাপি আমিও ভাসিয়া যাইতেছি; কেবল সেই মেঘজাল যেমন তেমনি, যেখানকার সেইখানেই রহিয়াছে। চন্দ্র একক, চন্দ্র নিকৃদ্দেশ্য, চন্দ্র ভাসিয়া যাইতেছে; এমন চন্দ্রকে ভাসাইয়া দিয়া প্রকৃতির মুখ হইতেছে। আমিও একক, আমিও নিকৃদ্দেশ্য, তাই বুঝি আমিও ভাসিয়া যাইতেছি। আমাকে ভাসাইয়া দ্বীপি কাহারও মুখ হইয়াছে? দূর ইউক, এ প্রশ্ন তুলিব না, একথা ভাবিব না; ভাবিলে অনেক কথা



মনে পড়িবে, অনেক ব্যক্তি মনে আসিবে । তাহা হইলে হৃদয় আলোড়িত হইবে, সুখাকরকে ভুলিয়া যাইব ; সুখাকর ভাসিয়া যাইবে আমি একা রহিয়া যাইব । অতএব সে কথা ভাবিব না ; সেই পত্রখানি পড়িতে পড়িতে, চন্দ্ৰের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া যাই ।

কৈ ! আমার সে পত্র কৈ ! বিধাতা ! আমার কি কিছুই থাকিবে না ? তবে আমার রাখিয়াছ কেন ?

\* \* \* \* \*

আমি কে ?—কোথায় আমি ? কি জন্য এখানে আসিয়াছি ? কেমন করিয়া আসিলাম ?—এখানে বসিয়া কেন ?

ইহার প্রত্যেক প্রশ্নই এক একটি বিষয় সমস্যা ।

আমি কে ?—জানি না, জানিবার উপায়ও নাই ; কারণ কেহই জানে না । ‘আমি,—এই পদার্থের একটি পৃথক্ সত্তা আছে, ইহা বুঝিতে পারি ; পরিচিত অপরিচিত, সুন্দর কুৎসিত, নবীন প্রবীণ এইরূপ অগণিত ‘আমি’ পদার্থের সমবায় ‘মানুষ’ নামে একটা সম্ভ্রমণ, সমাজ বা জাতি আছে তাহাও শুনিতে পাই । কিন্তু ইহার অধিক কিছুই জানি না ; আবার এতদূরও যে জানি বলিতেছি, কিন্তু ইহার অর্থ বুঝিতে পারি না । কেমন করিয়া বুঝিব ?—এই তুমি যাহাকে ‘যোর অমানুষ’—নিতান্ত অপদার্থ—বলিয়া নাসিকাগ্র জম্বাঙ্কিত ক-

রিবার, জন্তু প্রায়স পাইতেছে,—সেও “মানুষ” । অতএব আমি কে, না জানিয়াও, না বুঝিয়াও আমাকে বলিতে হইতেছে—আমিও “মানুষ” । শুনিলে পরিহাস করিতে হৃদয় লোভ হয় বটে, কিন্তু কথাটা তথাপি পরিহাসের নয় । তুমি পরিহাস কর, তুমিই পরিহাসের পাত্র হইবে । তথাপি, পুনরায় সেই কথা, তুমি “মানুষ”, আমি “মানুষ” । চমৎকার সমস্যা, ইহার পূরণ নাই !

আমি মানুষ, আমার পৃথক্ সত্তা আছে, কিন্তু আমার পার্থক্যের শেষ এই অবদি । স্বাভাব্য বল, স্বাধীনতা বল, আমার কিছুই নাই ; আমি কোটি কোটি জনের একজন মাত্র । রূপ দর্শনের বিষয়, কিন্তু আমি দেখিতে পাইব না ; রস আশ্বাদনের বস্তু, কিন্তু তাহাতে আমার অধিকার নাই । আমার শত্রু আছে, কিন্তু শত্রুতা সাধিতে পাই না ; আমার প্রণয়ী আছে, কিন্তু ভালবাসিতে পাই না । যাহাতে আমার একান্ত প্ররুতি, তাহা দোষ ; যাহার নাম স্মরণ করিলে আমার অন্তর সিহরিয়া উঠে, তাহা গুণ । যখন দেবমন্দিরে থাকিতে আমার সাধ হয়, তখন আমার বাসস্থান কারাগৃহে ; যে মুহূর্তে প্রাণের প্রতি আমার বড়ই মমত্ব, তৎক্ষণাৎ আমাকে কান্দীর কাছে ঝুলিতে হয় । ইহা তোমার আমার বিধান নয়, তোমার আমার নিষেধ নয় ; অথচ,—মানুষের ! যখন আমি জনতামধ্যে, তখন এইরূপ ব্যবস্থা ;

যখন আমি নির্জনে, তখন আমার সঙ্গে  
সঙ্গে, আমার দেহ মন ব্যাপিয়া, জা-  
এতে স্বপ্নে, ভয়ঙ্করী বিভীষিকা!—স্বাশ্রা,  
পরকাল, স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর! বাহিরের  
কোলাহল যখন মল্লীভূত হয়, তখন অ-  
ন্তরে ইহার। তুমুল সংগ্রাম করিতে থকে।  
তখনও আবার সেই প্রকৃতি স্থলে নিরুত্তি,  
বিরাগের স্থলে অনুরাগ!—সেই অর্গপ্রা-  
সিনী বশ্যতা, সেই মর্ষণপেশণী অধীনতা।  
কিন্তু ইহাতেও মানুষ বাঁচিয়া থাকে, ম-  
নুষ্যবংশ উৎসন্ন হয় না, এক জন মরিতে  
চাহিলেও তাহাকে মরিতে দেয় না; আ-  
বার, যদি কেহ একজনের প্রাণহানি করে,  
সে বাঁচিতে চাহিলেও তাহাকে বাঁচিতে।  
এ বিষয় রহস্য, ইহার মর্যোন্তেদ কে ক-  
রিবে?

প্রত্যক্ষ যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে  
বুঝি, মনুষ্যের নায় অসহায়, নিকৃপায়,  
সাধাসামর্থ্যহীন জীব আর নাই;—প্রকৃ-  
তির ক্রীড়া জন্য মনুষ্য যেন কাচনির্মিত  
পুতল। প্রকৃতির কোটি কোটি বিশ্বাসি  
আছে, আর সর্বপ্রকার জীবেরই স্বাতন্ত্র্য  
আছে; তাহাদের প্রত্যেকেই বাঁচিতে  
মরিতে একা, মুখে দুঃখে একা, স্বপ্নে জা-  
এতে একা, কার্ষ্যে আস্রো একা। আ-  
বার, এই একের প্রতাপ আছে, বিক্রম  
আছে, অনন্যাপেক্ষ হইয়া চলিবার অধি-  
কার এবং সাধ্য আছে। কেবল মনুষ্যের  
ইহা নাই,—সিংহ হস্তী হইতে মশক পি-  
পাসিকা পর্যন্ত সকলকেই ভয় করিয়া ম-

নুষ্যের চলিতে হয়। মনুষ্যের এ সকল  
নাই, স্মৃতরাং মনুষ্যের মুখ নাই, শাস্তি  
নাই। কিন্তু মনুষ্যের কপ্পনা আছে  
অভিমান আছে, রাগ আছে। যে প্র-  
কৃতি তাহার এত প্রতিকূল, তাহাকে ক-  
রায়ত্ত, তাহাকে দাসীঘে নিযুক্ত, তাহার  
অনুশাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া তৎপ্রতি শাস্তি  
বিধান করিতে, মনুষ্যের স্মৃতরাং বাসনা  
আছে। সেই জন্য মনুষ্য আপন আপন  
ভুলিয়া, জাতীয় দুঃখে সমুপ্ত হইয়া, সকলে  
মিলিয়া এক হইয়াছে; তাই জনে জনে  
এক নাই, এক-এক করিয়া সকল একে ম-  
হৈকড় লাভ হইয়াছে। এখন, তাহার  
ফলে মনুষ্য ঘোর অস্বাভাবিক জীব! ম-  
নুষ্য আর প্রকৃতির কথা শুনিতে চাহে না,  
প্রকৃতিই মানুষের কথা শুনে।

অতএব “আমি” একা স্বাতন্ত্র্যহীন,  
সাধ্যহীন হইলেও ক্রিয়াকারী; জাতীয়  
মস্ত্রে মুগ্ধ হইয়া, আমার অহং ভাব নিসর্জন  
দিয়া সেই প্রকৃতিশাসন উদ্দেশে “আমি”  
কর্মশীল।

যতগুলি প্রেমের উত্থাপন করিয়াছি,  
তাহার এইমাত্র উত্তর সম্ভবপর; এতস্তির  
স্পষ্টতর, স্থিরতর, অধিকতর সম্ভব কো-  
নও উত্তর আছে কি না, জানি না;  
আর ভাবিবও না, কারণ ভাবনার পায়  
নাই।

কিন্তু,—হার! তথাপি ভাবনা?—  
কিন্তু, আমি রণরঘু, আমিও কি এই নিয়-  
মের বশে অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি?

আমি জানি, আমার ত নিয়ম নাই, সূত্র নাই, তবে আমি এখানে কেন ?

আমি এখানে কেন ? আকাশের নক্ষত্রমালা নিয়মের অধীন, যথানিয়মে শূন্যে বিরাট করিতেছে । আর, সেই নক্ষত্র মুর্তিতে নক্ষত্রের রূপকে তিরস্কার করিয়া দর্শকের হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ-বিস্ময়-ভয়ের সঞ্চার করিয়া উল্কা শূন্যপথে ছুটিয়া শূন্যে মিশিয়া যায় ।—আমিও মানব জগতের উল্কা, আমার কেহই নাই, কিছুই নাই; আমার স্বাধীনতা নাই, নশাতা নাই; আমার ইহকাল নাই, পরকাল নাই । আমি কাদিতে কাদিতে হাসিতে হাসিতে, স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভাসিয়া যাইতেছি ; যতদিন না শূন্যে মিশি, তত দিন এইভাবে ভাসিব । আমি ত মনুষ্য নহি !

সত্য সত্যই কি আমার কেহই নাই ? কিছুই নাই ? প্রাণী নাই ? সছোদর নাই ? আমার জন্ত এক বিন্দু অশ্রুপাত করে, এমন কেহই নাই ? নাই থাকুক, যাহার স্মৃতির দিনে আমি একবার হাসিতে পাই, এমন ও কি কেহ নাই ?

———আর,——

আমার সুধাকর ?—হায় ! তুমিও পশ্চিম গগনে চলিয়া গেলে ? আমার জন্য অপেক্ষা করিলে না ? আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে ভাসিতেছিলাম, সঙ্গে ভাসিয়া যাইতেও দিলে না ? সংসার তোমার অভাবে মলিন হইবে, আমি যে সকল হারা হইব ?——আর আমার সে

পত্র খানি, তাহাও নাই ! সত্য সত্যই আমার কেহ নাই ! কিছুই নাই ?

\* \* \* \* \*

আমি কি ভাবিতেছি ? কতক্ষণ এভাবে বসিয়া এই সকল অসীক ভাবনা করিতেছি ? আমি কি অজ্ঞান হইলাম ?

এখনও চন্দ্র আছে ; পত্র খানি কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, একবার খুজিয়া দেখি ।—কিন্তু, কোথায় খুজিব । আমি কোন্ পথে আসিয়াছি ?—তথাপি অন্বেষণ করি, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখি । কেন বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু আমার মন যেন বলিতেছে যে এই পত্রের সঙ্গে আমার ভবিষ্যতের বিশেষ সম্পর্ক । তবে ত দেখিতেই হইল ।

আমি গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, স্মরণ্য মনের বড়ই ব্যাকুলতা হইয়াছে । যে কখনও বিদেশে গিয়াছে, “বাই” বলিয়া একদিনের তরেও গ্রামান্তরে গিয়াছে, সেই জানে যাইতে হইলে চিত্ত কেমন বিকল হয় । বাল্যে যখন বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত প্রবাসে যাইতাম, মাতা, পিতা, ভ্রাতা এবং বয়সাবর্ণের সঙ্গসুখে যখন নিয়মিত কালের জন্য জলাঞ্জলি দিতে হইত, তখনও এই যত্নগা ভোগ করিয়াছি । কিন্তু তখন মনে হইত যে কষ্ট কেবল মাতা ও পিতা, সোদর ও বন্ধুবর্গকে দেখিতে পাইব না বলিয়া ; তখন প্রতি পাদক্ষেপে যখন এক একবার ফিরিয়া টল টল লোচনে চাহিতাম, আজিকার জন্ত কেহ আ-

মাকে ফিরাইয়া আরও এক দিন বাড়ীতে থাকিতে দিউক, এই কথা যখন মুহূর্ত্তে ভাবিতাম, তখন মনে মনে করিতাম যে তাহাদের সকলকে পাইলেই বুঝি ঘাইতে বাখা পাইব না। আমার যাত্রা কালে মাতার নয়নে ভয় ও ভালবাসা যখন উছলিয়া উছলিয়া পড়িত, তখন নিশ্চয় করিতাম যে এদৃশ্য দেখিতে না হইলেই বুঝি আর কষ্ট নাই। কিন্তু তাহা ত নয়;— মাতা পিতা স্বর্গে গিয়াছেন, আমি ত এই মায়ার সংসার ছারিতে চাহি না। যখন একে একে একাধিক বাল্য সখা আমার হৃদয়ে তাহাদের জীবিতের রেখা রাখিয়া অকালশুষ্ক, অপরিষ্কৃত প্রস্থন তুল্য খসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে, তখন ত আমি তাহাদের সঙ্গে ঘাইতে চাহি নাই। তবে আর কোন মুখে বলিব যে ইহার জন্ম কি তাহার জন্ম গৃহত্যাগে কট? যখন এতজ্ঞানে আমার ভালবাসিত, তখনও যে দুঃখ, আজি যে দাদা পর, বধূ পরাণ পর, আজিও আমার চিত্ত বৈকল্য হইয়াছিল। বস্তুতঃ আমাকে তুমি ভালবাস বলিয়া যে আমি তোমায় ভালবাসি, তাহা নয়; ভালবাসা কিছু নিরস, সঙ্কুচিত হৃদয়, নীচান্তঃকরণ পণ্যজীবের আদান প্রদানের সামগ্রী নয়। গৃহ বল, জন্মভূমি বল, স্বদেশ বল, ইহারা ভালবাসিতে জানে না, অথচ আমরা ইহাদিগকে ভালবাসি। তাই বলিতেছি, গৃহের জন্যই গৃহত্যাগের কষ্ট।

আমার সেই কষ্ট হইয়াছে; আবার, এমন গৃহে আমাকে ভালবাসিতে কেহ নাই মনে করিয়া আমার দ্বিগুণ যন্ত্রণা হইয়াছে। সেই জন্য কোন পথে বাটী হইতে আসিয়াছি, তাহা দেখিয়াও দেখি নাই; কতদূর আসিয়াছি তাহা পথশ্রমেও বুঝিতে পারি নাই; কোথায় আসিয়াছি, তাহা ত জানিই না। তাহার উপর ক্লান্ত হইয়া চন্দ্রশ্মিতে শরীর শিথিল করিতে বসিয়া, পথের একমাত্র সমল, সান্ত্বনার একমাত্র উপায় সেই অপরিচিত হস্তের পত্র খানি হারাইয়াছি যখন জানিলাম, তখন কি বলিয়া না অভিভূত হইব? কেমন করিয়া হৃদয়বেগে অবিচলিত থাকি?

সংজ্ঞা হারাইয়াছিলাম, এখন সংজ্ঞা পাইলাম; অচেতন ছিলাম, এখন চেতনা হইল, সেই জন্য সেই পত্রের উদ্দেশে, অনিশ্চিত, পূর্বমুখে চলিলাম

সেই পত্রের জন্য অনন্যমনে পাদযুলে, সম্মুখে, পাশ্বে দেখিতে দেখিতে পূর্বমুখ চলিলাম! স্থানে স্থানে গুল্মের ঝোপ; কাহাকেও অর্জবেষ্টন করিয়া, কাহাকেও বা পদ দলিত করিয়া, কাহারও একটা পল্লব ভাঙিয়া দিয়া, কোথায়ও একটি পাতা ছিড়িয়া লইয়া, সেই পাতা খণ্ড খণ্ড করিতে করিতে তাহাকে অঙ্গুলী ঘর্ষণে পেঘণ করিতে করিতে, সেই পূর্বমুখ লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। কিন্তু মমুষ্য গাত্যাতের পথ দেখিতে পাইলাম না। যে দিক্ হইতেই আসিয়া থাকি, আমি পথ ধরিয়াই আসিয়াছিলাম,

তবে আর এদিকে গিয়া কেন রুখা কাল-  
হরণ করি ? ক্ষণে ক্ষণে স্তম্ভিতের ন্যায়  
দাঁড়াইলাম, এদিক্ ওদিক্ দৃষ্টিপাত করি-  
লাম, আবার চলিলাম । কিন্তু আর বড়  
অধিক দূর যাইতেও হইল না । পত্রের  
চিন্তায় পথের কথা ভাবিতে ভাবিতে,  
সেই দিকে যাইতে যাইতে, সহসা দেখি-  
লাম আমার সম্মুখে দূরব্যাপী, ক্রমনিম্ন  
বালুকাময় প্রান্তর ;—দক্ষিণে, বামে, স-  
ম্মুখে নিরবচ্ছিন্ন বালুকার স্তূপ । আমার  
কৌতূহল জন্মিল, সেই সিকতারাশি অতিক্রম  
করিলাম, তখন দেখিলাম ভাগীরথী সা-  
গরসঙ্গমে যাইতেছেন । তিনি যে ভাগীরথী,  
তাহা কাহারও চিনাইয়া দিতে হইল না ;—  
মহাজনের মহত্ত্ব, মহাজনের গৌরব স-  
র্বক্ষেপে প্রতিভাত হইতে থাকে ।

ভাগীরথীদর্শনে আবার ক্ষণকালের  
জন্য সকল ভুলিয়া গেলাম । অনন্তকাল  
ধরিয়া গস্তা অবিচ্ছেদে সাগরসঙ্গমের স্খ-  
ললাভ করিতেছেন, তথাপি অনন্তপ্রবা-  
হিনী সেই সাগরাভিমুখেই প্রধাবিতা ।  
প্রণয়ের চরমোৎকর্ষের সেই সজীব মুক্তি,  
সেই পবিত্র জ্ঞানবীতীরে দাঁড়াইয়া, কম্প-  
নায় আলোচনা করিতে লাগিলাম । তখন  
দাদাকে, বউকে আপন বলিয়া মনে প-  
ড়িল ; আমি কোথায়, তাহা মনে হইল ;  
তাহার পর চক্ষে জল আসিল, আর গঙ্গা  
দেখিতে পাইলাম না । অমনি মুখ ফি-  
রাইলাম, আবার সেই পত্রের কথা স্মৃতি-  
পথে উদ্ভিত হইল, পুনরপি সেই বালুকা-

রাশির উপর দিয়া চলিলাম । কিন্তু তখন  
আমার দিগ্‌নির্ণয় ছিল না ।

কতকদূর গিয়া দেখিলাম বালুকা যেন  
মনুষ্যের পদক্ষেপে ভাজিয়া ভাজিয়া র-  
হিয়াছে ; নিকটে পথ আছে ভাবিয়া এ-  
কবার চতুর্দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখি-  
লাম———ভয়ঙ্কর দৃশ্য !—অনতি-  
দূরে মনুষ্যের মৃতদেহ ! তাহার পরিধানে  
বস্ত্র ছিল, তেমনি রহিয়াছে ; কণ্ঠের স্ফ-  
র্ণাভরণ অস্পষ্ট রহিয়াছে । আমি যে  
স্থানে দাঁড়াইয়া, সেখান হইতে দৃশ্যমান  
কোনও ক্ষত চিহ্নও সে দেহে দেখা গেল  
না । নিকটে গিয়া ভাল করিয়া দেখিতে  
সাহস হইল না, কিন্তু বিশ্বাস হইল যে সে  
বাস্তি সদ্যোমৃত । ভ্রিতগতিতে সে স্থান  
ভ্রাতৃগণের মানসে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু  
হুই পা না যাইতেই——একখানি পত্র ।

এই কি সেই পত্র ? আমি ত এ পথে  
গিয়াছিলাম বলিয়া আমার বোধ হয় না ।  
হউক বা না হউক, কৌতূহলের বশে পত্র  
খানি কুড়াইয়া লইলাম ; ভয় হইয়াছিল,  
কৌতূহলে তাহার কথঞ্চিৎ উপশম হইল ।  
তথাপি সেই পত্রহস্তে দৌড়িতে লাগি-  
লাম । তীর অতিক্রম করিয়া যখন বুঝি-  
লাম যে গঙ্গা বহুদূরে, পড়িয়াছে, তখন  
চন্দ্রালোকে পত্রখানি পড়িতে লাগিলাম ।  
অতি কষ্টে অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়ি-  
লাম———

“ প্রত্যুত্তরনিবেদনঞ্চ বিশেষঃ——  
আদৌ বসন্ত সে ধাতুর লোক নহে ।

ফলতঃ যাহার জন্ম আমি এই ভয়ানক  
কর্মে প্রস্তুত হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম,  
সেই অদ্য নিবন্ধেণ হইয়াছে, তাহাতে আ-  
মার মনে বড়ই উৎকণ্ঠা হইয়াছে। সুতরাং  
আর আমার দ্বারা কোনও প্রত্যাশা করি-  
বেন না। যাহা হউক, প্রকাশেরও কোনও  
আশঙ্কা নাই। আপনার পত্র পোড়াইয়া  
ফেলিয়াছি, এপত্রও ছিঁড়িয়া ফেলিবেন।  
ইতি ২৯ এ কার্তিক।”

পত্রের শিরোনামা নাই, কাহারও  
স্বাক্ষর নাই। বোধ হইল হস্তাক্ষর অপ-  
রিচিত নহে।

পাঠিকালে, পাঠান্তে বারংবার লো-  
মাঞ্চ হইতে লাগিল, শরীর ষষ্ঠাঙ্গ হইল,  
বার বার চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম।  
তখন চন্দ্র অন্তগত হইল। ক্ষণকাল পরে  
দেখিলাম কতকগুলি রক্তের অন্তরালে এ-  
কটা আলোক; একবার চন্দ্র বলিয়া স-  
ন্দেহ হইল, কিন্তু তাহার বর্তমান আয়তন,  
উদ্যমশীল ধূমপুঞ্জ এবং চট্‌পট শব্দে সে  
সন্দেহ শীঘ্রই দূরীভূত হইল।

লোকালয়ে অগ্নি লাগিয়াছে মনে করিয়া  
পত্রখানি বস্ত্রাঞ্চলে দৃঢ়বন্ধনপূর্বক সেই-  
দিকে দৌড়িলাম। গ্রীষ্মকাল গোস্বামী।



## কার্য ও কারণ।

এ জগতে কারণ বিনা কার্যের উৎ-  
পত্তি সম্ভবে না। আকাশের নক্ষত্র অ-  
বধি পৃথিবীর নিম্নতম স্তর পর্যন্ত যেখানে  
যে কিছু পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়,  
তাহারই কারণ আছে। ঐ যে নদীর  
জল জোয়ারে ফাঁপিতেছে, ভাঁটায় কমি-  
তেছে তাহারও কারণ আছে। ঐ যে মেঘ  
উঠিল, শূন্যমার্গ অন্ধকার হইয়া গেল, রক্ত  
মুসলধারে পড়িল, প্রবল ঝটিকা বহিল,  
তাহারও কারণ আছে। বায়ুহীন প্রদেশে  
শব্দ নাই, গন্ধ নাই; তথায় জল বরিশ  
পাদ উদ্ধে উঠে ইহারও কারণ আছে।  
এই পরিবর্তনশীল জগতে যে কিছু পরি-  
বর্তন দেখিতে পাওয়া যায়, সকলেরই

কারণ আছে। কারণ ব্যতীত কার্যের  
আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না।

পণ্ডিতেরা কারণের এইরূপ লক্ষণ নি-  
র্দেশ করিয়া থাকেন;—যাহা ব্যতীত কা-  
র্যাসিদ্ধি হয় না, তাহার নিয়ত পূর্ববর্তিতাই  
কারণঃ\*। কারণের অভাব হইলেই  
কার্যের অভাব হইবে†। কোন কা-

\* অন্যথা সিদ্ধিশূন্য। নিয়তপূর্ববর্তিতা  
কারণত্বং। ভাষা পরিচ্ছেদ।

† কারণাভাবাৎ কার্যভাবঃ।

আত্মিকঃ।

নৈয়্যায়িক ফাউলার সাহেবও কারণের  
এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন।

See Fowler's Inductive Logic Ch I

যেঁর কারণ নিরূপণের জন্য এইরূপ বিধি আছে,—ইতর কারণ থাকিলেও যাহার অভাবে কার্যের অভাব, তাহাই ঐ কার্যের কারণ বলিয়া জানিবে \* । কার্য ও কারণ মধ্যে এরূপ গাঢ় সম্বন্ধ যে, দ্বিতীয়ের অভাবে প্রথমটির অস্তিত্ব সম্ভবে না ; প্রথমটি না হইলে দ্বিতীয়টির ঘটন কোনরূপে স্বীকার করা যায় না । অনেক স্থলে এরূপ ঘটনা থাকে যে, কারণ বর্তমান থাকিলেও কোন প্রতিরোধী ঘটনা ঘটনা সেই কারণের কার্যোৎপাদক শক্তি নষ্ট করিয়া দেয় । সুতরাং যখনই আমরা বলিব যে, কারণ সত্ত্বে কার্যের সত্ত্বা অবশ্য স্বীকার্য, পাঠকগণকে বুঝিতে হইবে যে, কার্যোৎপত্তি সম্বন্ধে কোন প্রতিরোধী ঘটনা উপস্থিত নাই † ।

কারণ তিন প্রকার,—সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত । যাহা সমবেত হইলে কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহাকেই তাহার

\* ‘যদ্যতিরেকেণ ইতরকারণসমুদয়-সত্ত্বে যস্য অভাবঃ পশ্যতি তৎ কার্যং প্রতি তস্য কারণত্বং নিশ্চিনোতি ।’

পণ্ডিতবর জন্ট্রার্ট মিল তাঁহার রূত ন্যাশান্ত্রে কারণ নিরূপণের অবিকল এইরূপ উপায় নির্দেশ করিয়াছেন ।

Compare Mill's Inductive Logic, 2nd & 3rd Canons.

† See Fowler's Inductive Logic Chap I. ইহাকে ইংরেজীতে Negative conditions বলে ।

সমবায়ী কারণ কহে ; যাহা তাহাতে আসন্ন, তাহাই অসমবায়ী কারণ ; এবং এই উভয় হইতে ভিন্ন যে কারণ, তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলা যায় । ঘট প্রস্তুত সম্বন্ধে কপাল সমবায়ী, কপালসংযোগ অসমবায়ী এবং দণ্ডচক্রাদি নিমিত্ত কারণ \* । আমরা কোন বিশেষ কারণের উল্লেখ করিব না, কিন্তু যখনই ‘কারণ’ শব্দের প্রয়োগ করিব, তখনই পাঠকগণকে সকল কারণ একত্র করিয়া যাহা হয় ( অর্থাৎ যাহার একটি অভাবে কার্যোৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যাঘাত ঘটে ) তাহাই বুঝিতে হইবে † ।

\* নৈয়ায়িকেরা বলিয়া থাকেন ;—

ভবেত্তস্যা ( কারণস্য ) ত্রৈবিধ্যং পরিবীক্ষিতং । সমবায়িকারণত্বং জ্ঞেয়মথা-  
প্যাসমবায়িহেতুত্বং । এবং ন্যাগুনরজ্ঞৈস্তু-  
তী-  
য়মুস্তংনিমিত্তহেতুত্বং । যৎসমবেতং কার্যং  
ভবতি জ্ঞেয়ন্ত সমবায়ি জনকং তৎ । তত্রা-  
সন্নং জনকং দ্বিতীয়মাভ্যাং পরং তৃতীয়-  
স্যাং । পুনশ্চ—ভৎপ্রতি ( অর্থাৎ কার্যের  
প্রতি ) কারণং ত্রিবিধ্যং । সমবায়িকারণং  
১যথা ঘটকার্যং প্রতি কপালং । অসমবায়ী  
কারণং ২ যথা ঘটকার্যং প্রতি কপাল-  
সংযোগাদি । নিমিত্ত কারণং ৩ যথা  
ঘটং প্রতি দন্তচক্রাদি ।

ইতি তর্কশাস্ত্রং ।

† ইহার জন্য কখন কখন ইংরেজীতে Cause এই শব্দের পরিবর্তে Con-  
cause শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে ।

আমরা যাহাকে কার্যাকারণ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখ করি, তাহা পরিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই নহে। একটি ঘটনা ঘটিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে একটি পরিবর্তন দেখা গেল—একটি দৃঢ় মুষ্টিাঘাত করিলাম, তোমার অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া গেল, ইহাই কার্যাকারণ সম্বন্ধ। কারণের ফলটি যত ভয়ানক বা গুরুতর হয়, সেই পরিমাণে সম্বন্ধটি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকে। একবার দেখিলে আর জন্মে ভুলি না। যে একবার কামানের শব্দ শুনিয়াছে, সে তাহা কখন ভুলিতে পারিবে না। যে শিশু একবার প্রদীপের নিকট খেলা করিতে গিয়া দহনজ্বালা সহ্য করিয়াছে, সে প্রাণ থাকিতে আর প্রদীপের নিকট যাইবে না।

সর উইলিয়ম হ্যামিল্টন কার্যাকারণের এই রূপ সম্বন্ধ নির্দেশ করেন, যথা; এ জগতে আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহারই যে কারণ আছে, ইহা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু কার্যের কারণ আছে বলিলে আমরা কি বুঝি? যাহা আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি, তাহাই যে কারণকর্তৃক প্রথম সৃষ্ট, অর্থাৎ কারণ শূন্য হইতে (out of nothing) যে ইহাদিগকে সৃজন করিলেন, তাহা আমরা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারি না! সুতরাং যাহা আমরা দেখিতেছি, তাহা পূর্বে ছিল,—অন্য আকারে থাকুক, অন্য অবস্থায় থাকুক—তাহারা ছিল, এই ইহাদিগের আরম্ভ নহে; ইহা আমাদের

স্বীকার করা কর্তব্য। এ জগতের পরমাণু ক্রমিক নহে, বাড়িবার নহে, তাহার সমভাবেই আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। সুতরাং যাহা কেন চক্ষু দেখি না, তাহার পরমাণুগুলি অন্য কোন দ্রব্য হইতে আসিয়াছে; না আদিলে কোথা হইতে পরমাণুর সম্ভব হইতে পারে? সং হইতে অসং হইতে পারে না, অসং হইতেও সং হইতে পারে না\*। জৈব শূন্য হইতে এই জগৎ সৃজন করিয়াছেন শুনিলে আমরা কি বুঝি? তিনি আপন হইতেই এই জগতের সত্তা আবিষ্কার করিয়াছেন; ইহার অধিক আমাদের বুঝির অগম্য; চিন্তার অতীত ও স্বপ্নের অগোচর।

সুতরাং কারণের পরমাণু হইতেই কার্যের পরমাণুর সম্ভব হইয়া থাকে। কারণে যাহা থাকে কার্যেও তাহা থাকিতে দেখা যায়; যাহা কার্যে দেখিতে পাই না তাহা কারণেও ছিল না ইহা যুক্তিবদ্ধ বিবেচনা। সম্পূর্ণ আরম্ভ ও সম্পূর্ণ ধ্বংস† আমাদের বুঝির অগম্য। সুতরাং কার্যাকারণ ভাব আর কিছুই নহে, কেবল এই যে, যাহা এখন দেখিতেছি তাহা পূর্বে

\* “নামতো বিদ্যাতে ভাবো না। ভাবো বিদ্যাতে সত্যঃ।”

† Absolute commencement and absolute annihilation.



অন্য আকারে ও অন্য অবস্থায় বর্তমান ছিল \* ।

আমরা এরূপ তর্কের অনুমোদন করি না । সম্পূর্ণ আরম্ভ ও সম্পূর্ণ ধ্বংস আমাদের বুদ্ধির অগম্য, একথা আমরা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক । প্রতি দিনই আমরা ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পাইয়া থাকি । যখন পাত্রে জলটী শুকাইয়া যায়, তখন কি আমরা ভাবি না যে, জলটী ধ্বংস হইয়া গেল ; তখন কে ভাবে যে, বায়ু আসিয়া কণায় কণায় জলকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে ; সেই জলে মেঘ হইয়াছে ; সেই মেঘে বৃষ্টি পড়ে । এরূপ তর্ক যে সত্য, তাহা আমাদের বিশ্বাস আছে, কিন্তু এসত্য কয়জন জানে ? যখন প্রীত্বকালে জলাশয় সকল শুকাইয়া যায়, তখন ক্লেশক কি একবারও ভাবে, এই জল বাষ্পে পরিণত হইয়া মেঘ হইতে আবার বৃষ্টি হইবে ? সেই জল যে অত্যাচারে এ জগতে বর্তমান আছে, তাহা তাহার বুদ্ধির অগম্য । জল যে মেঘকণায় পরিণত হয়, এবং এজগতের কোন পরমাণুই ধ্বংস হইবার নহে, ইহা আমরা স্বীকার করি, কিন্তু হ্যামিলটন্ সাহেব যে বলিয়াছেন যে, এতদ্বিপরীত চিন্তার অগম্য, তাহা আমরা আপনাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বুঝিতে অক্ষম । জগতে সকলেই বিজ্ঞানবিৎ বা দার্শনিক হইলে, যে পরমাণু এক্ষণে আছে,

তাহার প্রকৃত আরম্ভ ও প্রকৃত ধ্বংস হইতে পারে না একথা একদিন বলিলে খাটিতে পারিত । প্রকৃত আরম্ভ ও প্রকৃত ধ্বংস হইতে পারে না একথার চিন্তা করিলে কি ফল ফলে, আমরা তাহাই দেখাইব ।

ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে ( হ্যামিলটন্ সাহেবের কথানুসারে ) যে, যে জগৎ এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি, তাহা পূর্বেও ছিল, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে । স্মরণ্য বলিতে হইবে যে, এই জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই, এবং কিছুতেই ইহা ধ্বংস হইবে না ।

হ্যামিলটন্ সাহেব তদন্তরে এই বলেন যে, পূর্বে ‘জগৎ-সৃষ্টি’ ক্ষমতা ঈশ্বরে ছিল ; সেই ক্ষমতা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে । সৎ হইতে অসৎ হয় নাই, ক্ষমতা হইতে জগৎ হইয়াছে । সে হিসাবে সে ক্ষমতা এক্ষণে আর ঈশ্বরে নাই । সে ক্ষমতা জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে । অতএব ঈশ্বর যদি এইরূপ আর একটা জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি পারিবেন না, কেন না, সে ক্ষমতা আর নাই ! এই জগৎ যখন ধ্বংস হইয়া আবার তাঁহার ক্ষমতায় পরিণত হইবে, তখন তিনি আবার জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিবেন, এক্ষণে নহে । স্মরণ্য হ্যামিলটনের কার্য্য কারণ সম্বন্ধে বিশ্বাস করিতে গেলে মহা গোলোযোগ আসিয়া পড়ে ।

অনেকে বলেন যে, কার্য্য হইলেই

\* Sir William Hamilton's Lectures on Metaphysics.

কারণ থাকিবে, এইটী আমাদেরই স্বতঃ-  
সিদ্ধ বিশ্বাস। তাঁহারা বলেন যে, প্র-  
ত্যেক কারণেরই কার্য থাকিতে হইবে ;  
ইহা প্রমাণের অতীত, প্রমাণ করা যাইতে  
পারে না। যাহা আপনি আপনাকে প্র-  
মাণিত করিতেছে, তাহার আবার অগ্র  
প্রমাণের প্রয়োজন কি ? পঞ্চমবর্ষীয় বা-  
লকও যাহা দেখে তাহারই কারণ অনুস-  
ন্ধান করিতে যত্নশীল হয়। পশ্চাদ্ধিক  
হইতে তাহার গাত্রে লোষ্ট্রক্ষেপ কর, অ-  
মনি সে সেই দিকে চাহিয়া দেখিবে ; না  
দেখিতে পাইলে কে, কেন, প্রস্থ করিতে  
নিকটবর্তী মাতা বা পিতাকে জিজ্ঞাসা  
করিবে। যদি কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্বতঃসিদ্ধ  
না হয়, তাহা হইলে এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের বালক  
কেমন করিয়া প্রত্যেক কার্য্যেরই কারণ  
আছে, এসত্য জানিবে ?

কিন্তু আমরা এমতের পোষকতা ক-  
রিতে পারি না। আজি পর্য্যন্ত কিছুই যে  
জগতে স্বতঃসিদ্ধ আছে ইহা আমরা স্বী-  
কার করি না। এক এরূপ স্বতঃসিদ্ধতা  
সম্বন্ধেও কোন প্রমাণ পাওয়া যায়  
নাই। আজি দেখিলাম, অগ্নিতে বস্ত্র  
দিলেই পুড়িয়া যায়, কালিও দেখিলাম,  
পরম্ব দিবসও ঐ ঘটনা ঘটিল ; এই-  
রূপ যখনই পরীক্ষা করিয়া দেখি, তখ-  
নই অগ্নিতে বস্ত্র দিলেই পুড়িয়া যায়। এই-  
রূপে বুঝিতে পারিলাম যে, অগ্নিতে বস্ত্র  
দিলেই পুড়িয়া যাইবে। তখনও আমার  
এরূপ জ্ঞান জন্মায় নাই যে, অগ্নিতে যাহা

দিব, তাহাই পুড়িয়া যাইবে। তখনও আ-  
মার বিশ্বাস হয় নাই যে, প্রত্যেক ঘটনা-  
রই কারণ আছে, কারণ ব্যতীত কার্য্যের  
উৎপত্তি হয় না। যে শিশু একবার প্রদী-  
পের নিকট গিয়া বিশেষ কষ্ট পাইয়াছে,  
সে আর প্রদীপের নিকট যাইতে চায় না।  
কেন ? তাহার কি জ্ঞান জন্মিয়াছে যে  
প্রত্যেক কারণেরই কার্য্য আছে, বা প্র-  
ত্যেক কার্য্যেরই কারণ আছে ? কখনই  
নহে, সে এই পর্য্যন্ত জানে যে, প্রদীপের  
নিকট গেলে পূর্ব্বের মত তাহার কষ্ট হ-  
ইবে, এই জন্য সে যাইতে চায় না ; নতুবা  
যে কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না, এজ্ঞান  
তখন তাহার হইয়াছে, ইহা আমরা বলি  
না। এইরূপে পরীক্ষা করিতে করিতে,  
নানা বিষয় দেখিতে দেখিতে, কার্য্য মাত্রের  
ই যে কারণ আছে, এই জ্ঞান আমরা লাভ  
করিয়া থাকি। যখন এরূপ ঘটনা  
আমরা স্বচক্ষে দেখি, তখন কার্য্যকারণ  
সম্বন্ধ আমরা কোন্ সাহসে স্বতঃসিদ্ধ  
বলি ? \*

\* সার উইলিয়ম হ্যা মিল্টন সাহেব তাঁহার  
প্রণীত Discussions on Philosophy &c.  
নামক পুস্তকে কারণত্বের স্বতঃসিদ্ধতা প্র-  
মাণ করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছেন।  
তৎপ্রণীত "Lectures on Metaphysics"  
তেও ইহার উল্লেখ অনেক স্থলে দেখিতে  
পাওয়া যায়। রিড এবং হিউয়েল  
(Red and Whewell) ও এই মতের পো-  
ষকতা করেন। হার্বার্ট স্পেন্সর (Her-

এতৎ সম্বন্ধে কোন সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক বলিয়াছেন, 'প্রত্যেক কার্যের কারণকে থাকিতেই হইবে, অনেকে এই কথা বলিয়া আমাদিগের কার্যকারণ ভাবকে স্বতঃসিদ্ধ বলিতে চাহেন। থাকিতেই হইবে, এই কথা বলিবার পূর্বে আমাদিগের দেখা উচিত, প্রত্যেক কার্যের কারণ আছে কি না? ইহা আমরা কোন রূপ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিতে পারি না, এবং কখনও পারিব না। সুতরাং কার্য হইলেই কারণ থাকিতে হইবে এই কথা বলিয়া এই ভাবকে স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ করিতে যাওয়া দুষ্টতার কার্য ব্যতীত আর কিছুই নহে।

বিপকীরেরা বলেন, যদি ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ না বল, তাহা হইলে কারণ ব্যতীত কোন কার্যকে একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। ভাব দেখি, কার্য আছে, তাহার *but a spenser* বলেন যে, বাস্তবিক বাহ্য-জগতের পর্যালোচনা দ্বারা আমরা ইহার জ্ঞান লাভ করি। কিন্তু বহু পূর্বপুরুষাবধি এইরূপ বলিয়া আসিতেছে বলিয়া, কারণত্ব এক প্রকার মনের স্বতঃজ্ঞাত বিশ্বাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মালব্রান্স (Malbranch) দেখরকেই একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং আমরা জগতে কারণের যাহা কিছু দেখিতে পাই, তাহার মতে তাহাতে দেখরের হস্তক্ষেপ আছে। See also Mill's Logic book chap 3.

কারণ নাই। আমরা এতদ্বত্তরে এই বলি যে, কারণ ব্যতীত কার্যের সম্ভব আমরা ভাবিতে পারি। আমরা কারণকে মনে স্থান না দিয়া কেবল কার্যটী ভাবিতে পারি। তবে কার্যের সহিত যে কারণকে ভাবিয়া থাকি তাহা কেবল এই সংসারের গতিতে। আমরা কারণ ব্যতীত কার্য কখন দেখি নাই, এই জ্ঞানই একটীর সত্য অপরিহার্য সত্য আমাদিগের মনোমধ্যে উদয় হয়। যতই আমরা বয়োবৃদ্ধ হইতে থাকি, ততই প্রত্যেক প্রবোধের নানা রূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাই; এই দেখিয়া দেখিয়া আশাদিগের মনে কার্যকারণের ভাব দৃঢ় অঙ্কিত হইয়া যায়।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে, কারণ যদি কার্যকে উৎপন্ন করিতে পারে, তাহা হইলে কার্যোৎপত্তির ক্ষমতা কারণে আছে। অগ্নিতে যদি কিছু পুড়িয়া যায়, তাহা হইলে অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে বলিতে হইবে; স্বর্ঘ্য উত্তাপ দেয়, সুতরাং উত্তাপ দিবার শক্তি স্বর্ঘ্যের আছে।

এইরূপে তাঁহারা কারণে একটি শক্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন। হ্যামিলটন নাহেবই এই মতের একজন প্রধান প্রবর্তয়িতা।

কিন্তু আমরা কারণে কোন রূপ ক্ষমতা বা শক্তি দেখিতে পাই না। অগ্নিতে কোন গুণ আছে (সে গুণ শক্তি নহে) এবং স্বর্ঘ্যেও কোন গুণ আছে, এই দুইটী গুণের

Alexander Bain.

সাম্রিধ্য হইলেই বস্তুর আর একরূপ কোন জন্মো পরিণত হইয়া যায়। ইহাতে এরূপ বলিতে পারি না যে, অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, কেন না তাহা হইলে অগ্নি সকল জন্মকেই ভস্মসং করিতে পারিত; এ জগতে অনেক সামগ্রী আছে যে, অগ্নি তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, যে গুণের অস্তিত্ব থাকিতে বস্তুর দগ্ধ হইয়া গেল, সেই গুণের অস্তিত্ব সেই সকল সামগ্রীতে নাই; এই জন্যই তাহার অগ্নি সংস্পর্শেও পুড়িল না। \*

এতদ্ব্যতীত আমরা বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি যে অগ্নিতে বস্তুর দিলেই বস্তুর আর এক প্রকার আকৃতি ধারণ করে। বস্তুর অগ্নিসংযোগ, এবং বস্তুর আকার-পরিবর্তন এই দুইটা ভাব আমাদের মনে গঠনবান্ধা হইতে এরূপ দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে যে, যখনই বস্তুর অগ্নিসংযোগ দেখিব, তখনই সেই পরিবর্তনের কথা মনে পড়িবে। কিন্তু বস্তুর পুড়িতেছে দেখিতে পাইলে আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না যে, অগ্নিতেই বস্তুর পুড়িয়াছে। কারণ হইতে কার্যের অনুমান করা যাইতে পারে, কিন্তু কার্য হইতে কোন বিশেষ কারণ নির্ণয় করা যাইতে পারে না।

\* ম্যাথসেল, কোম্‌ট, জেমস্‌ মিল এবং জনফ্র্যাংকলিন মছোদয়েরা কারণে যে কোনরূপ ক্ষমতা আছে তাহা স্বীকার করেন না।

কোন দার্শনিক বলেন, পূর্বাধার ভাবই কারণত্ব। ‘ক’ এর পূর্বে যদি ‘খ’ ও ‘গ’ ঘটয়া থাকে, তাহা হইলে ‘খ’ ও ‘গ’ কারণ, ‘ক’ কার্য। কিন্তু এটি যোর অসম্মত। একথা সত্য হইলে, দিনকে রাত্রির কারণ বলিতে হইবে, এবং রাত্রিকে দিনের কারণ বলিতে হইবে। এ তর্কটি অত্যাশ্চর্য্য দোষ যুক্ত। বিশেষতঃ দিবা এবং রাত্রির মধ্যে যে কার্য কারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রায় কোন নৈয়ামিকই স্বীকার করেন না। \*

কারণ সম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই;—

১। কারণত্ব অত্যাশ্চর্য্যমিশ্র নিয়তপূর্ব্ববর্তিতা; ব্যতীত আর কিছুই নহে।

২। ইহার সত্যসিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

৩। অনেকে কারণে কার্যাব্যাপাদক শক্তির উল্লেখ করিয়া থাকেন; এরূপ শক্তি কারণে দেখিতে পাওয়া যায় না।

৪। এক কারণ হইতে এক কার্যই হইয়া থাকে, সুতরাং কারণ হইতে আমরা কার্যের অনুমান করিতে পারি। কিন্তু এক কার্যের বহু কারণ থাকিতে পারে,

\* দিন রাত্রির কারণ নহে এবং রাত্রিও দিনের কারণ নহে পরস্পর উভয়ই একটা কারণের কার্য। অক্ষয় জন্মফ্র্যাংকলিনের ন্যায় শাস্ত্র। (Mill's Logic—chapter on causation)

এইজন্য আমরা কার্য্য দেখিয়া কোন বিশেষ কারণ নির্দেশ করিতে পারি না।

৫। যে কারণ হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে, যত দিন এই জগৎ থাকিবে

কিবে সেই কারণ হইতে সেই কার্য্যেরই উদ্ভব হইতে থাকিবে ইহার কোনরূপ অন্যথা ঘটিবে না।

## সমালোচনের সমালোচনা

গত কএক বৎসর যাবৎ আদিশূর-কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন ও সেই ব্রাহ্মণদিগের রাঢ়ী বায়েস্ত্রে বিভাগ সম্বন্ধে প্রস্তাব এবং গ্রন্থ লিখিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তন্মধ্যে ইউরোপীয় লেখক দ্বারা ইংরেজি ভাষাতে যে দুইখানি গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে তাহার একখানি হট্টের সাহেবের। তিনি বাঙ্গালার সংক্ষিপ্ত রূপান্তর লিখিতে লিখিতে প্রসঙ্গক্রমে আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন এবং রাঢ়ী বায়েস্ত্রে বিভাগের বিবরণ লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থ সেরিং সাহেব রচিত। উহা ব্রাহ্মণগণের গোত্রনির্ণয় এবং ভারতবর্ষের হিন্দুজাতি বিষয়ক। তিনিও প্রসঙ্গক্রমে উক্ত বিবরণ লিখিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে তৃতীয় গ্রন্থ গোবিন্দকান্ত বিদ্যাবূষণ কর্তৃক বিরচিত লঘুভারত; তিনিও আদিশূর কর্তৃক ব্রাহ্মণ আনয়ন এবং রাঢ়ী বায়েস্ত্রে বিভাগের বিবরণ লিখিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং উপরোক্ত তিন খানি গ্রন্থের

মুদ্রণ বিবরণ সাধারণের জ্ঞানগোচর হয় নাই। বহুদিন হইল কোলকাত্তক সাহেব আসিয়াটিক রিসার্চ নামক সাময়িক প্রচারিত গ্রন্থে, এবং ডাক্তার কে, এম্, বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতারিভিউতে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন কিন্তু তাহাও অনেকেই দেখিতে পান নাই। সম্প্রতি কলকাত্তক নর্থাল স্কুলের পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষাতে সম্বন্ধনির্ণয় নামে একখানি গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে। বোধ হয় সাধারণে ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকিবেন, এবং গত ১২৮৩ সনের পৌষ মাসের আখ্যাদর্শনে উক্ত পুস্তকের সমালোচন উপলক্ষে রাঢ়ী বায়েস্ত্রে বিভাগ সম্বন্ধে যে কিঞ্চিৎ বিবরণ লিখিত হইয়াছে তাহাও বোধ হয় সাধারণের গোচর হইয়াছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কোন গ্রন্থকর্ত্তা কি কোন প্রস্তাব লেখক কি কোন সমালোচকই এবিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই, সকলেই কেবল আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী মত প্রচার করিয়াছেন।

লালমোহন বাবু, গোবিন্দকান্ত বি-  
দ্যাভূষণ এবং সেরিং সাহেবের মতে  
রাষ্ট্রী বায়েস্ত্র উভয় শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণই কান্য-  
কুজাগত ব্রাহ্মণের সন্তান; যে দেশে তাঁ-  
হারা বাস করিয়াছিলেন সেই দেশের  
নামানুসারে তাঁহাদের শ্রেণীর নাম হই-  
য়াছে। হট্টর সাহেবের মতে রাষ্ট্রীয়গণ  
কান্যকুজীয় ব্রাহ্মণগণের স্বদেশবিবাহিত  
বৈধ পত্নীর সন্তান। বায়েস্ত্রগণ—এদেশের  
ব্রাহ্মণকন্যাতে উক্ত কান্যকুজাগত ব্রাহ্ম-  
ণের ঔরসজাত সন্তান। লালমোহন বাবু  
কহেন “ইহারাও অর্থাৎ বায়েস্ত্ররাও  
আদি পঞ্চগোত্রের পঞ্চ মহাপুরুষের স-  
ন্তান”। আখ্যাদর্শনের সমালোচক ত-  
দুপলক্ষে লিখিয়াছেন “ইহা লালমোহন  
বাবুর অনুমান মাত্র, কারণ তিনি ইহার  
সপক্ষে কোন প্রমাণ প্রদান করিতে পা-  
রেন না এবং তাঁহার এই অনুমান অপ্রতি-  
দ্বন্দ্বীও নহে; কারণ কেহ কেহ এবিষ-  
য়ের অন্য প্রকার মীমাংসাও করিয়া থা-  
কেন। তাঁহারা বলেন যে, পঞ্চগোত্রীয়  
ব্রাহ্মণেরা সত্বীক বঙ্গে আইসেন নাই,  
তাঁহারা যত্‌কালীন বঙ্গে আগমন করেন,  
তখন তাঁহাদের পুরোঁচা ভাষায়া বাটী-  
তেই ছিলেন, তাঁহারা বঙ্গে আসিয়া এখা-  
নকার ব্রাহ্মণগণের পঞ্চ কন্যাকে বিবাহ  
করেন ইত্যাদি।” সমালোচক প্রকারান্তরে  
হট্টর সাহেবের উক্তির পোষকতা করি-  
তেছেন।

সম্বন্ধনির্ণয়কর্তা এবং তৎসমালোচক

উভয়েই কহেন ১১৯ অব্দে আদিশূর পঞ্চ  
ব্রাহ্মণ আনিয়ন করেন। ক্ষিতীশবংশাবলী  
চরিতে ১১৯ শকে ব্রাহ্মণ আইসার বিবরণ  
লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি আধুনিক  
নবদ্বিপাধিপতি রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে  
প্রস্তুত হয়, স্মরণার্থ ইহার লেখার প্রতি-  
ত্তত বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। সম্বন্ধ-  
নির্ণয়কর্তা ঐ ১১৯ অব্দের সম্বৎ ব্যাখ্যা  
করিয়া ৮৩৩ কি ৮৩৪ শকাব্দে আদিশূর  
কর্তৃক গোঁড়ে ব্রাহ্মণ আনিয়ন সিদ্ধান্ত করি-  
য়াছেন\*। পশ্চিমবঙ্গের দৈবচন্দ্র বিদ্যা-  
মাগরও স্বকৃত বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ক  
পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ১১৯ শকাব্দে  
আদিশূর ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন বলিয়া  
লিখিয়াছেন। ঘটকদিগের কারিকা দৃষ্টে  
জানা যায় ১১৪ শকের কার্তিক মাসে  
ব্রাহ্মণেরা আসিয়াছিলেন। (১) কিন্তু  
কুলাচার্য্য ঐশ্বের লিখা ইহার বিপ-  
রীত। তাহাতে লিখিত আছে ১৫৪  
শকে ব্রাহ্মণেরা গোঁড়ে আসিয়াছিলেন।  
(২)। এখন কুলাচার্য্য ঐশ্বের লেখা সত্য  
কি না তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে;  
এবং তাহাতে বোদ্ধ রাজাদের অপিকার  
সময় এবং আদিশূরের রাজত্ব কাল বি-  
বেচনা করা আবশ্যক হইতেছে।

কনিঙহাম সাহেবের রুত আর্কি-  
ওলজিকেল সার্ভে নামা গ্রন্থে পাল-

\* সম্বন্ধ নির্ণয় ১৩১ পৃঃ এবং ঐ-  
শ্বের প্রথমে স্থিত ক্রোড় পত্র।

বংশীয় রাজাগণের যে তালিকা প্রকাশ  
হইয়াছে তাহা এই।

|            |      |          |
|------------|------|----------|
| গোপাল      | ৭৬৫  | খৃঃ অব্দ |
| ধর্মপাল    | ৭৯০  | ঐ        |
| দেবপাল     | ৮১৫  | "        |
| জয়পাল     | ৮৪০  | "        |
| দেবপাল     | ৮৬৫  | "        |
| শূরপাল     | ৮৯০  | "        |
| নারায়ণপাল | ৯১৫  | "        |
| রাজপাল     | ৯৪০  | "        |
| * * পালদেব | ৯৬৫  | "        |
| বিগ্রহপাল  | ৯৯০  | "        |
| মহীপাল     | ১০১৫ | "        |
| নয়পাল     | ১০৪০ | "        |
| বিগ্রহপাল  | ১০৬৫ | "        |

কাশীর নিকটবর্তী শরনাথে একটি নি-  
দর্শন পাওয়া গিয়াছে, উহা প্রাচীন পালি  
অক্ষরে ও পালি ভাষাতে লিখিত। তদ্ব্য-  
জ্ঞান যার ১০৮০ সংবতে মহীপাল কাশী  
অধিকার করিয়াছিলেন এবং তাহাতে  
মহীপাল গোড়রাজা বলিয়া লিখিত হ-  
ইয়াছে ঐ ১০৮০ সম্বৎ ১০১৫ খৃঃ অব্দ  
হইতেছে। কণিঙহাম সাহেব ১০১৫ হইতে  
১০৪০ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত মহীপালের রাজত্ব-  
কাল কহিতেছেন। মহীপালের কীর্তি  
অদ্যাপি দিনাজপুরে বর্তমান আছে। ম-  
হীপালের পর নয়পাল রাজা হন। ১০৪০  
হইতে ১০৬৫ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত তাহার  
রাজত্ব কাল। ডাক্তর বকানন কছেন  
পালবংশের শেষ রাজার পরেই আদিশূর

বান্ধালাতে রাজা হন। অধ্যাপক ল্যাশন  
সাহেবের বিবেচনা এই ১০৪০ খৃঃ অব্দে  
বৈদ্যবংশীয় রাজা কর্তৃক পালবংশের  
রাজত্ব লোপ হয়। সাহেবদিগের মতে  
আদিশূর বৈদ্যবংশীয় এবং সেনবংশের  
আদি ব্যক্তি। বাস্তবিক আদিশূর যে  
বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করিয়া বান্ধালা  
অধিকার করিয়াছিলেন তাহাতে আর কোন  
সন্দেহই নাই। কুলপ্রদীপ নামা প্রাচীন  
গ্রন্থেও লিখিত আছে, আদিশূর বৌদ্ধ রাজা-  
দিগকে পরাজয় করিয়া গোড় অধিকার  
ও তথাতে বৈদিকধর্ম প্রচার করেন।

লম্বুভারত নামা গ্রন্থে লিখিত হই-  
য়াছে আদিশূর তাহার শ্বশুরের সহায়-  
তাতে বীরসিংহকে পরাস্ত করিয়া, পাল-  
বংশীয় হুপতিগণের বংশোচ্ছেদ করিয়া,  
পালবংশাসনে গোড়ে স্বাধীন রাজা হন,  
এবং কলির ৪১৩০ বত্সর গতে (সুতরাং  
তাহার পুণ্ডক রচনার সময়ের সহিত ঐক্য  
করিলে ৯৫১ শক পাওয়া যায়) আদিশূরের  
রাজ্যারম্ভ হয়। অতএব আদিশূরের রা-  
জ্যারম্ভকাল সম্বন্ধে ডাক্তর বকানন এবং  
অধ্যাপক ল্যাশনের সহিত লম্বুভারতকর্তা  
প্রায় একমত হইতেছেন। অধ্যাপক ল্যাশ-  
নের মতে ৯৬২ শকে এবং বিদ্যাত্মগের  
লিখামতে ৯৫৯ শকে আদিশূর রাজা হন।

বারেন্সকুল গ্রন্থে লিখা আছে আ-  
দিশূর কান্যকুব্জাধিপতি চন্দ্রকেতুর কন্যা  
বিবাহ করেন। কিন্তু কান্যকুব্জ হুপতিগ-  
ণের মধ্যে চন্দ্রদেব নাম পাওয়া যায়। সু-

ভয়াং চন্দ্রকেতু এবং চন্দ্রদেবকে একব্যক্তি স্থির করিলাম। কাশীর ইতিহাসে লিখিত আছে ১০৭৪ সন্থতে কাশীতে বুনার নামা রাজা ছিলেন। তাহার দশ বৎসর পর কাশী মহীপাল রাজার অধীন হয় এবং তাহার হস্ত হইতে কণোজের রাজা চন্দ্রদেব কাশী অধিকার করেন। সম্ভবতঃ ১০৯০ সন্থত অর্থাৎ ৯৫১ শকাব্দে চন্দ্রদেব কাশী অধিকার করেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রমাণে আদিশূর যে কিঞ্চিৎ স্থানাত্মিক ৯৫০ শকাব্দের সমকালে গোড়ে রাজা হন ইহা প্রতীয়মান হয়, এবং সম্ভবতঃ তিনি বৌদ্ধ বংশীয় নয়পালকে পরাজয় করিয়াছিলেন। সত্য বটে নয়পালের পরেও আরও কতকটি বৌদ্ধ রাজার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের গোড়ে রাজত্ব করার কোন প্রমাণ নাই। নয়পাল আদিশূর কর্তৃক তাড়িত হইয়া মগধ দেশে রাজধানী করেন। তদবধি যে পর্যন্ত না মুসলমানগণ কর্তৃক পরাস্ত হইয়াছিলেন সে পর্যন্ত পালবংশীয় গণ মগধে রাজত্ব করেন।

যদি উপরের লেখা মতে ৯৫০ শকের সমকালে আদিশূর গোড়ে রাজা হইয়া থাকেন তাহা হইলে তৎসমকালেই ব্রাহ্মণ আনিয়া থাকিবেন। তিনি যৎকালে গোড়ে রাজা হন তখন এদেশে বৈদিক ধর্মের প্রচার ছিল না। কেন যে ছিল না তাহার সন্তুস্তর পাওয়া কঠিন। অনেক অনুমান করেন বৌদ্ধ রাজাগণের দৌ-

রাস্তা বৈদিক ধর্ম গোড় দেশ হইতে অন্তর্হিত হয়। ইহা তাদৃশ সঙ্গত বোধ হয় না। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলেই বৌদ্ধ ধর্মের অত্যন্ত প্রচার হইয়াছিল, অথচ সে দেশে বৈদিক ধর্মেরও প্রচার ছিল। বাজাসার জল বায়ুর এমনই গুণ যে আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণ সম্ভবতঃ বৈদিক ধর্মাবলম্বী হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহা হউক যখন আদিশূর বাজালাতে বৈদিক ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যেই উত্তর পশ্চিম দেশ হইতে বেদপারগ সাধ্বিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তখন তাহার রাজ্যারম্ভের অব্যবহিত পরেই ব্রাহ্মণ আনয়ন সম্ভব এবং তাহা হইলে “বেদব্রাহ্মণ্য কেতু গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” এই প্রমাণ সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয়। এই প্রমাণ কোন্ গ্রন্থের তাহা আমি অবগত নই, জর্নৈক প্রসিদ্ধ কুলজ্ঞ আমাকে এই প্রমাণ দিয়াছেন এবং নির্দোষ কুলপঞ্জিগত বচন বলিয়া লিখিয়াছেন।

এই বচনের সত্যতা সম্বন্ধে আরও পৌষক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কুলপঞ্জিগত স্মৃতি বচনের আর অধিক পৌষক প্রমাণ প্রদর্শন করা নিপ্পয়োজন বোধে বিরত হইলাম। সম্প্রতি সম্বন্ধনির্ণয় কর্তা আপন গ্রন্থে ৯৯৯ অব্দে ব্রাহ্মণ আনয়ন লিখিয়া সেই অব্দ শব্দের যে সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন এখন তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। প্রথমতঃ বিবেচনা কর, দ্বিতীয়াংশবলীচরিত বাজালা দেশে লিখিত, তাহাতে যে অব্দ



লেখা আছে তাহা শকাব্দই হইবেক ; বা-  
জালা দেশে সম্ভূত প্রচলিত নহে । বিশে-  
ষতঃ ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতে শকাব্দ  
এক স্পষ্টই লেখা আছে । আদিশূর হইতে  
বল্লাল সেন অষ্টম অথবা নবম পুরুষীয়  
অধস্তন রাজা । লালমোহন বাবু আ-  
ইন আকবরির প্রমানানুসারে ১০৬৬  
খৃঃ অব্দে বল্লাল সেনের রাজত্ব কাল স্থির  
করেন । যদি ১০৬৬ খৃঃ অব্দে বল্লাল সে-  
নের রাজ্য আরম্ভ কাল হয় তাহা হইলে  
তাহার অষ্টম অথবা নবম পুরুষের পূর্বের  
আদিশূর ৯১৯ শকাব্দে ( ১০৭৭ খৃঃ  
অব্দে ) কি প্রকারে রাজত্ব করিবেন ইহাই  
লাল মোহন বাবুর আশঙ্কার কারণ হই-  
য়াছে এবং তদনুসারে তিনি ৯৯৯ শকাব্দে  
সম্ভূত ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ৯৯৯ সম্ভতে  
৮৬৩ কি ৮৬৪ শকাব্দ অর্থাৎ ৯৪২ খৃঃ  
অব্দ হয় ঐ সময়ে বাজলাতে পাল বংশীয়  
রাজাগণের অধিকার ছিল । বাস্তবিক ব-  
ল্লাল সেন যে ১০৬৬ খৃঃ অব্দে রাজ্য প্রাপ্ত  
হন, এবিষয়ে সন্দেহ হয় । বল্লাল সেন  
কৃত দানসাগর নামে এক খানি গ্রন্থ  
আছে । এই গ্রন্থাবলিখক বহু যত্ন করিয়া  
ঐ গ্রন্থ খানি প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থ  
খানি কেন্ শকে প্রস্তুত হইয়াছে তা-  
হাতে তাহার কোন নিদর্শন নাই । কিন্তু  
সময়প্রকাশ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে  
“ নিখিলহৃৎপচক্রতিলক জীমূতবল্লাল সেন  
দেবেম । পূর্বে শশি নবদশমিতে শকাব্দে  
দান সাগরো রচিতঃ । ” এই বচনের প্র-

কৃতার্থে ১০৯১ শকে বল্লাল সেন কর্তৃক  
দান সাগর রচিত হওয়া প্রমাণ হই-  
তেছে । তাহা হইলে ১১৬৯ খৃঃ অব্দে  
দান সাগর রচনা হওয়া প্রমাণ হয় । সু-  
তরাং ১০৬৬ খৃঃ অব্দে বল্লাল সেনের  
রাজ্য আরম্ভ হইতে পারে না । লাল  
মোহন বাবুও আপন গ্রন্থে সময় প্রকা-  
শের বচনটি উচাইয়াছেন কিন্তু তিনি উহার  
১০৯৯ শক অর্থ করেন । “ পূর্বে শশি-  
নবদশমিতে ” এইরূপ পাঠ থাকাতে বিধেয়  
অঙ্কের বামগতি হেতু প্রথমে ১০ তত্পর  
৯ এইরূপে অঙ্ক স্থাপন করিয়া ১০৯১ শক  
অর্থ প্রাপ্ত হয় ।

মহারাজা আদিশূর কান্যকূজাধিপতির  
নিকট পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ যাননা  
করেন । তদনুসারে কান্যকূজাধিপতি গোড়  
দেশে আদিশূরের সভাতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ  
পাঠাইয়া দেন । রাত্তিরগণ কহেন ভট্ট-  
নারায়ণ, দক্ষ, জিহ্ব, বেদগর্ভ, এবং ছান্ড  
এই ৫ জন গোড় দেশে আসিয়াছিলেন ।  
তাহাদের আধুনিক গ্রন্থে ঐ পাঁচ নামই  
পাওয়া যায় । বারেন্দ্রগণ কহেন নারায়ণ  
ভট্ট, সুরেণ, কাশ্যাপ, ধরাদ্র এবং পরাশর  
এই পাঁচজন আসিয়াছিলেন । ইহাতেই সমস্ত  
বিরোধের উত্পত্তি হইতেছে, কারণ রাঢ়ী-  
য়গণের আধুনিক গ্রন্থোন্মেষিত ভট্টনারা-  
য়ণাদি পাঁচজন হইতে যে বংশ গণনা করা  
যায় তাহার মধ্যে বারেন্দ্র শ্রেণীর কোন  
উল্লেখ নাই । কিন্তু বারেন্দ্র গ্রন্থে বল্লাল  
সেন কর্তৃক শ্রেণী ভাগ কালে পঞ্চ গো-

জীয় পঁচজন ব্রাহ্মণ রাঢ়ী হওয়ার রস্তুস্ত  
পাওরা যায়। বারেন্দ্রকুল গ্রন্থে রাঢ়ী  
বারেন্দ্র বিভাগের সম্পূর্ণ ইতিহাস লি-  
খিত আছে কিন্তু রাঢ়ীয়-কুলজ্ঞ ঘটকগণ  
তৎপ্রতি আপত্তি করিতে পারেন, “এজ্ঞ  
রাঢ়ীয় নির্দোষ কুলপঞ্জিকা অনুসারে রাঢ়ী  
বারেন্দ্র রস্তুস্ত লিখিত হইতেছে। যথা—

একদিন মহারাজা আদিশূর সভাতে  
উপবেশন করিয়া পুরোহিত গণকে সন্মো-  
দন করিয়া কহিতেছেন “অহং ক্ষত্র কু-  
লেজ্ঞাতঃ নকুর্যাম্ তযজ্ঞকং। আয়িহোজীয়  
যজ্ঞঞ্চ করিয়ামি দ্বিজোত্তম। কুত্র কুত্র  
স্থিতা বিপ্রা বেদপারগ সজ্জবাঃ। তদহং  
শ্রোতুমিচ্ছামি রূপয়া কথং প্রভো ॥ বিপ্র  
উবাচ। কান্যকুজস্থিতা বিপ্রাঃ সাম্যিকা  
বেদ পারগাঃ। তস্যাং পঞ্চ দ্বিজাভীয় যজ্ঞ  
নিপ্পন্নতাং কুরু ॥” অর্থাৎ, আমি ক্ষত্রিয়  
কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু কোন  
রূপ যাগ যজ্ঞ করিলাম না অতএব অগ্নি  
হোজীয় যজ্ঞ করিব। বেদ পারগ ব্রা-  
হ্মণ কোথায় আছেন তাহা অবগত-  
করিতে ইচ্ছা করি; আপনি রূপা করিয়া  
তাহা বলুন। তদ্বত্তরে পুরোহিত কহি-  
লেন কান্যকুজ দেশে সাম্যিক এবং বেদ  
পারগ ব্রাহ্মণ আছেন তথা হইতে পঁচজন  
ব্রাহ্মণ আনিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করুন।

তদনুসারে আদিশূর ২৫৪ শকাব্দে  
কান্যকুজ হইতে পঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন  
করেন সেই সকল ব্রাহ্মণের নাম ক্ষিতীশ,  
তিথি মেধা, বীতরাগ, সূর্য্যানিধি এবং সৌ-

বরি। ইহারাই গোড় দেশে আসিয়াছি-  
লেন। যথা।

বেদ বাণীক শাক্যেতু গোড়ে বিপ্রা

সমাগতাঃ।

ক্ষিতীশস্তিথি মেধাচ বীতরাগঃ সূর্য্যানিধিঃ  
সৌবরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গোড়

মণ্ডনং ॥

অনেকের সংস্কার আছে ব্রাহ্মণেরা  
প্রথমে ক্রীসহিত আইসেন নাই এবং এ-  
দেশীয় ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন;  
পশ্চাত্ কান্যকুজ হইতে তাহাদের পূর্ব-  
বিবাহিতা পত্নীরা আইসেন। বোধ হয় স-  
ম্রাট্ নির্ণয়ের সমালোচকও এই মতের প-  
ক্ষপাতী, অতএব তাঁহাদের ভ্রম নিবারণ  
নিমিত্ত কুলগ্রন্থের নিম্নলিখিত কবিতাগুলি  
উদ্ধৃত হইল।

আরাতাঃ পঞ্চবিপ্রাঃ সূচতুর হৃদয়াঃ প-

ঞ্চকোনাস্ত দেশাত্

সস্ত্রীকা পুত্রযুক্তাঃ পরিজনসহিতাঃ সা-

ম্নাঃ কাস্তিমন্তঃ ॥

বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরমা।

হয়মানঃ সমাক্ষয় সোপানতকাঃ দ্বি-

জোত্তমাঃ।

সদারাশচ সপুত্রাশচ ভূর্তোরপি সমম্বিতাঃ ॥

বারেন্দ্র কুলপঞ্জি।

মহারাজ রাজাদিশূরোমহাশয়। তয়া  
বীরসিংহস্য মেহন্ত্যানিসম্বাং। তবাজানু-  
সারাক্ষি প্রস্থাপয়ামি দ্বিজান্ পঞ্চ গোত্রান্  
সদারাদিত্যান্—

শব্দকম্পজমম্বৃত কুলাচার্য্যাকারিকা।

ব্রাহ্মণগণ যে স্ত্রীপুত্রাদি সহিত আসিয়াছিলেন, ইহার আরও প্রমাণ দেওয়া যাউতে পারে । বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয় উল্লেখ করা গেল না ।

ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আগত হইয়া আদিশূরের অভিলষিত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া গৌড়ে বাস করিতে লাগিলেন । তৎপরে আদিশূরের মৃত্যু হইল, তাহার পুত্র ভূশূর রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কান্যকুব্জানীত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের ৫টি সন্তানকে বাস নিমিত্ত রাঢ়দেশে পাঠাইয়া দিলেন ।

শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠঃ ভট্টনারায়ণো-

কবিঃ ।

দক্ষোপি কাশ্যাপশ্রেষ্ঠঃ বাৎস্য শ্রে-

কৌপি ছান্দভঃ ॥

ভরদ্বাজক গোত্রৈচ জীহবোহর্ববর্জনঃ ।

বেদগর্ভোপি, সাবর্ণে রাঢ়দেশ গতা অমী ॥

দামোদরঃ সদাচার্য্যঃ শাণ্ডিল্যঃ গো-

ত্রজঃ সুরিঃ ।

গৌতমোপি ভরদ্বাজ কাশ্যাপেচ কৃপা-

নিধিঃ ॥

বাৎস্য গোত্র সমুৎপন্নোজয়যুক্তোদরা-

ধরঃ ॥

পরশরোপি সাবর্ণে বারেন্দ্রা ভূমী

ভূশূরঃ ॥

রাঢ়ীয় কুল্যার্চ্য্য গ্রন্থোক্ত এই প্রমাণের প্রতি সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই । আদিশূরের রাজধানী গৌড়ে ছিল ; সকলেই কহেন ব্রাহ্মণেরা প্রথমে গৌড়ে আসিয়াছিলেন । বারেন্দ্র দেশ

গৌড়ের একাংশ । মহানন্দার পূর্ব কবতোয়ার পশ্চিম পদ্মার দক্ষিণ এই সীমাবদ্ধিত দেশ বারেন্দ্র ; অতএব দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণেরা প্রথমে বারেন্দ্রদেশে বসতি করেন, তাহাদেবই পরিজন রঢ়ে গমন করেন ।

কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্তৃক আনীত ব্রাহ্মণ সন্তানরাই যে রাঢ়ী বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বল্লাল সেন কর্তৃক বিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহা শব্দকর্ণাধারিত কুল্যার্চ্য্য কারিকাতে লিখিত আছে যথা ;—

অথ বল্লাল ভূপাচ অযুষ্ঠ কুলনন্দনঃ ।

কুরুতেতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্র নিপক্লগং ॥

অদিশূরানীতাবিপ্রাঃ শুদ্রাশ্চৈব তথা-  
পর্য্যঃ ।

এতেষাং সন্ততীঃ সৰ্ব্বা আনয়ৎস নিজা-  
লয়ে ॥

যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রান্ত্রদেশে নিরু-  
পিতা : ।

শ্রেণীদ্বয়ন্ত নিৰ্ণীতং রাঢ়ী বারেন্দ্র সং-  
জকং ॥

তথৈব দ্বিবিধ প্রোক্তং কুলঞ্চ স বিজো-  
তমে ॥

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুল্যার্চ্য্য গ্রন্থে লিখিত আছে, বল্লাল সেন আদিশূরানীত বিপ্র সন্তানগণকে রাঢ়ী বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন, বাহারা রাঢ়দেশে বাস করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে রাঢ়ী, বাহারা বারেন্দ্র দেশে বাস

করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বারেন্দ্র, এই  
সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন । যথা—

প্রতাপেন শূরো মহানাদিশূরো

নৃপঃ পঞ্চগোত্রান্ দ্বিজান্ কান্যকুব্জাং ।

সমানীতবান্ পঞ্চ পঞ্চনলভান্

সতঃ সৎক্রিয়া দিক্ষয়ে গোড়দেশে ॥

ততোবহুতিথে কালে গোড়ে বৈদ্যকু-

লোবহঃ ।

বল্লালসেন নৃপতি রজারত গুণোত্তমঃ ।

রাঢ়ায়াং গোড়-বারেন্দ্র-পৌণ্ড্র-বঙ্গোপ-

বঙ্গকে ।

অদিকারো ভবেত্তস্য বলবীৰ্য্য-প্রভাবতঃ ॥

কান্যকুব্জারান্ বিপ্রান্ দৃষ্ট্বাচাতি

গুণোত্তরান্ ।

আদিশূরস্য নৃপতের্ষশো মূর্তিরিব স্থিতান্ ।

দ্বিধা বিভক্তান্ বিদ্রুষো রাঢ়া বারেন্দ্র

বাসিনঃ ।

আদিশূরস্য যশসঃ পশ্চাদ্বর্তী যশোময় ।

যথা ভ্রম্যাৎ সতঃ গেছে তর্কিব বিদধা-

ম, হং ।

ইতি সন্ধিস্তা মর্যাদাং স্থাপন মকরো-

ত্তরোঃ ।

কৃতবান্ গুণতঃ ধীমান্ কোলীনাং শো-

ত্রিফেচ সঃ ।

অর্থাৎ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে অ-  
নল সদৃশ ৫ পঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন ক-  
রিয়াছিলেন । তাহার বহুকাল পরে  
বৈদ্যকুলোদ্ভব গুণশ্রেষ্ঠ বল্লাল সেন গৌর  
দেশে রাজা হন । বলবীৰ্য্য প্রভাবে রাঢ়  
বারেন্দ্র, পৌণ্ড্র, বঙ্গ এবং উপবঙ্গ দেশে

তাঁহার অধিকার বিস্তার হইয়াছিল । তিনি  
আদিশূরের যশোমূর্তি স্বরূপ রাঢ় এবং  
বারেন্দ্রবাসী এই উভয় শ্রেণীভুক্ত কান্য-  
কুব্জাগত বিপ্রগণকে অতিশয় গুণশালী  
দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, যাহাতে আ-  
মার যশ আদিশূরের যশের পশ্চাদ্বর্তী  
হইয়া সজ্জনের মধ্যে প্রচলিত থাকে, ত-  
দ্রূপ কার্য্য করা আমার কর্তব্য । ইহা বি-  
বেচনা করিয়া উভয় শ্রেণীর বিপ্রগণের মধ্যে  
কৌলীনা মর্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন ।

আরও

দ্বিজাতিংগতুর্বর্ণানাং সৃষ্টিকর্তা । পৃথক্

কার্য্যসিদ্ধৈযথা সমজ্ঞা ।

তথাসৌমিত্র বল্লালসেনো বিভক্ত চকা-

রাত্রি বারেন্দ্র রাঢ়ী সংজ্ঞান্ ॥

স্থিতা রাঢ়দেশে দ্বিজা য়ে সমেতাঃ কু-

তাস্তেন রাঢ়ীসংজ্ঞান্তয়েব ।

তথা বঙ্গদেশাগতা ভূমীদেবাঃ কৃতাস্তেন

বারেন্দ্র-সংজ্ঞা-প্রসিদ্ধাঃ ॥

অস্বার্থঃ—

যজ্ঞপ সৃষ্টিকর্তা চারিবর্ণের সৃষ্টি ক-  
রিয়াছিলেন, তদ্রূপ বল্লাল সেন দ্বিজগ-  
ণকে রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র এই দুই ভাগে  
বিভক্ত করিয়াছিলেন ; যাহারা রাঢ়দেশে  
বসতি করেন তাঁহারা রাঢ়ী, এবং যাহারা  
বারেন্দ্র দেশে বসতি করেন তাঁহারা বা-  
রেন্দ্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ।

উপরি উক্ত প্রমাণ সকলে দৃষ্ট হই-  
তেছে, আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ক্ষিতীশ,  
তিথিমেধা, বীতরাণ, স্রধানিধি এবং

সৌবরি এই ৫ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। আদিশূরের পুত্র ভূশূর ঐ বিপ্র পঞ্চকের ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, জীহব ও ছান্দড় এই ৫ জনকে রাঢ়দেশে পাঠান, অবশিষ্টেরা বারেন্দ্র দেশে থাকেন এবং বল্লাল সেন তাহাদের মধ্যে শ্রেণীভাগ করেন। ইহা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র কুলার্চাৰ্য্য ঐশ্বের প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। বারেন্দ্র দেশেই প্রথমে ব্রাহ্মণেরা আইসেন এবং তথা হইতে ৫ জনমাত্র রাঢ় দেশে গিয়াছিলেন, এমত স্থলেও রাঢ়ীয় কুলার্চাৰ্য্য ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ কেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ হইতে আপনাদিগকে ভেদ কহেন তাহা বুঝিতে পারি না।

এই প্রস্তাব লেখক জটনৈক রাঢ়ীয় কুলার্চাৰ্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইয়াছেন যে তাহাদের মতে আদিশূর সামবেদী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন যথা;—“স-জীকান্ শাস্ত্রসংযুক্তান্ আনীতান্ সামগান্ দ্বিজান্” ইত্যাদি। অতএব যখন বারেন্দ্র শ্রেণীতে যখন ঋক্, যজু, সাম এই তিন বেদী ব্রাহ্মণ দেখা যায়, তখন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা আদিশূরানীত কান্যকুবীরি-প্রের সম্ভান নহেন ইহাই তাহাদের সিদ্ধান্ত। ঘটকগণের এই অনুমান হইতেই রাঢ়ীয়দলে লংকার জন্মিয়াছে; বারেন্দ্রগণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ নহেন। রাঢ়ীয়দলে ৫৬ টি গাঞি আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া উহার আরাও কহেন, “পঞ্চগোত্র ছাপ্পার গাঞি ইহা ছাড়া বামন নাই।”

এই আপত্তি স্বরের উত্তর সহজেই দেওয়া যাইতে পারে। রাঢ়ীয় কুলেও অনেক যজুর্বেদী এক্ষণে আছেন এবং যদি ৫৬ গাঞির অতিরিক্ত ঐমীকেরা ব্রাহ্মণ নাহন, তাহা হইলে রাঢ়ীয় কুলের আর তিনটি গাঞির দশা কি হইবে? কুলসমী ঐশ্বের মতে রাঢ়ীয় কুলে ৫৯ গাঞি।

আদিশূর কেবল সামবেদী ব্রাহ্মণ কি তিনবেদী ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে।—পূর্বে কথিত হইয়াছে যজ্ঞকরণ নিমিত্ত তিনি সামিক বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। বাল্লভ দেশে বৈদিক ধর্ম প্রচার করা তাহার উদ্দেশ্য ছিল, ইহাতে কেবল একবেদী ৫ জন ব্রাহ্মণ আনয়ন করা সম্ভব বোধ হয় না, বিশেষতঃ প্রত্যেক যজ্ঞেই তিনবেদী ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যথা;—

মজ্জামননং ছন্দাংসি জ্জাদনং স্তোমঃ  
সুবনং যজুর্বেদাদিতি এবং সতি অধ্বর্যু-  
সদ্বন্ধি যজুর্বেদ নিষ্পন্নং যজ্ঞশরীর মুপ-  
জীবা তদপেক্ষিতৌ স্তোত্র শত্ৰুরূপাবয়বৌ  
ইত্যেগ বেদস্বয়ং পূর্য্যত। মাধবাচার্য্যকৃত  
ঋগ্বেদ ভাষ্য উপক্রমণিকা ১ম অধ্যায়।

অর্থাৎ মনন হেতু মন্ত্র, জ্জাদন হেতু ছন্দ  
সুবন হেতু স্তোম, যজ্ঞন হেতু যজুঃ। অত-  
এব যজ্ঞের অধ্বর্যু সদ্বন্ধীর কার্য্য যজুর্বেদ  
দ্বারা নিষ্পন্ন। এবং যজ্ঞ শরীর সদ্বন্ধীর কার্য্য  
অপর দুই বেদ (ঋক্। সাম) দ্বারা পূরণ হয়।  
অধ্বর্য্যবং যজুভিঃ স্যাদৃগৃভির্হোত্রং দ্বি-  
জোতমাঃ।

উদ্যোগ সামান্তিক্যে ॥

কুর্খপুরাণ ৪৯ অধ্যায় ।

অর্থাৎ প্রত্যেক যজ্ঞের অর্থ্য হোত্র এবং গান এই তিন প্রকার অঙ্ক আছে, তাহার মধ্যে যজুর্বেদ দ্বারা অর্থ্যের কার্য্য, ঋগ্বেদ দ্বারা হোম এবং সামবেদ দ্বারা উদ্যোগ কার্য্য সম্পন্ন হয় ।

আদিশূর একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন । তিনি যজ্ঞ করণের নিমিত্ত একবেদী ব্রাহ্মণ আনায়েঁরা অনুকম্পা ব্যবস্থা করিবেন এমন বোধ হয় না । রাত্তির ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণ প্রারম্ভেই দেখা যায় না এবং সামবেদীয় সংখ্যা এত অধিক কেন হইল এই প্রশ্ন হইলে, এতাবস্থাত উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, কালে রাত্তরাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিদ্যা চর্চার অভাব এবং ঋগ্বেদগণের গৃহ কর্ত্ত্ব সকল কঠিন হওয়াতে সামবেদী ব্রাহ্মণের নিকট উপনীত হইয়া বেদভ্রষ্ট হইয়া থাকিবেন ।

বিজ্ঞানিদি মহাশয় রাঢ়দেশবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় জীহ্ব এবং নৈষধ কর্ত্তা জীহ্বকে একব্যক্তি বলিয়াছেন । এইমত তাহার উদ্ভাবিত নহে । তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই এই কম্পনা বাহির হইয়াছে । কিন্তু ইহা সঙ্গত নহে । নৈষধ কর্ত্তা জীহ্ব আশাশুকের জীহ্বের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন । অথচ রাঢ়ী শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রের আদি ব্যক্তি জীহ্ব কিতীশাদি বিপ্রপঞ্চকের অন্ততর তিথিমেষার পুত্র । নৈষধ কর্ত্তা জীহ্ব আপন গ্রন্থে আশু পরিচয়ে

লিখিয়াছেন, তিনি কান্তবৃজেশ্বর হইতে ভাসুল, হয় এবং আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । জৈন লেখক রাজ শেখর কৃত প্রবন্ধ কোষে লিখা আছে জীহ্বের পুত্র জীহ্ব বারানসীতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তত্ত্বত্বপতি জয়ন্ত চন্দ্রের আজায় নৈষধ কাব্য প্রস্তুত করেন । ডাক্তার বুলার কহেন এই জয়ন্তচন্দ্রই জয়চন্দ্র নামে খ্যাত । জয়চন্দ্র ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ খৃঃ অব্দের মধ্যে কান্তকূজ ও বারানসীর অধীশ্বর ছিলেন । বাবু রামদাস সেনও প্রবন্ধ-চিন্তা-মণি ও প্রবন্ধ কোষের লেখা ও ডাক্তার বুলারের মতানুসরণ করিয়া নৈষধ কর্ত্তা জীহ্বকে ১১৬৩ অব্দে জয়ন্তচন্দ্রের সভাসৎ থাকার স্থির করিয়াছেন । বিজ্ঞানিদি ১৯৯ সম্বতে জীহ্বের এদেশে আইসা কহেন । ১৯৯ সম্বতে ৮৬৩ শকাব্দ এবং নৈষধ কর্ত্তা জীহ্বের বর্ত্তমান ১১৬৩ খৃঃ অব্দে ১০৮৫ শকাব্দ । অতএব ১০৮৫ শকাব্দ হইতে ৮৬৩ শকাব্দা বাদ দিলে ২২২ দুইশত বাইশ বৎসর পাওয়া যায় । অতএব যে জীহ্ব তাহার মতে ৮৬৩ শকে আদিশূরের সভাতে গৌড়ে । তিনি ১০৮৫ শকে কি প্রকারে বারানসীতে থাকিয়া নৈষধ কাব্য প্রস্তুত করিবেন । বিদ্যানিধি অনুমান করেন যখন জীহ্ব গৌড়ে আইসেন তখন তাঁহার ১০ বৎসর বয়স ছিল । এমত হইলে নৈষধ প্রস্তুত করার সময়ে তাহার ৩১২ বৎসর বয়স পাওয়া যায় ।

বিদ্যানিধি আদিশূর ও বল্লাল সেন উভয়কেই বৈদ্যজাতীয় কহিয়াছেন। তিনি যতদূর জানিতে পারিয়াছেন তাহাই লিখিয়াছেন। দেবীর ঘটক উভয়কেই অস্বুট কহিয়াছেন। বারেন্দ্র কুল গ্রন্থে উভয়কেই বৈদ্য বলিয়া লিখিত। রাঢ়ীয় কোন কুল গ্রন্থে আদিশূরকে ক্ষত্রিয় কোন গ্রন্থে চন্দ্র বংশীয় বলিয়া লিখিত আছে। বিজয় সেন লক্ষ্মণ সেন এবং মাধব সেনের সময়ের যে সকল সমসাময়িক প্রস্তর লিপি ও তাম্রশাসন লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সেন বংশীয় রাজাদিগকে চন্দ্র বংশীয় বলিয়া লিখিত আছে। অতএব আদিশূর ও বল্লাল সেন যে বৈদ্যজাতি তৎ প্রতি সন্দেহ হয়। এই প্রস্তাব লেখক কর্তৃক যে পুস্তক লিখিত হইবার সম্ভাবনা আছে তাহাতে এবিষয় বাহ্যিক রূপ লিখা হইবে এবং তাম্রশাসনাদির সংস্কৃত ভাগ অবিকল প্রকাশিত হইবে।

বিদ্যানিধি কাশ্যপগোত্রীয় হলায়ুধ, যিনি উনিশ জনের মধ্যে একজন কুলীন, সেই হলায়ুধ চট্টকে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী বলিয়াছেন। বাস্তবিক নাম সাদৃশ্যে তাহার ভ্রম হইয়াছে লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ ব্রাহ্মণসর্বস্ব গ্রন্থে প্রস্তুত করিয়া ঐ গ্রন্থে আপনার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে জানা যায় তাহার পিতার নাম ধনঞ্জয় এবং তিনি বাৎস্য গোত্রোদ্ভূত। গ্রন্থ কর্তা লঘুভারতের লিখন মতে নরসিংহ লাড়ুনিকে অষ্টৈতের পিতা কহিয়াছেন। বাস্ত-

বিক তাহা নহে অষ্টৈতের পিতার নাম কুবেরাচার্য। গৌর গণোজ্ঞেশ দীপিকা নামক গ্রন্থ ও জাড়িয়ান গ্রামী ব্রাহ্মণ গণের বংশাবলী গ্রন্থে ইহার প্রমাণ আছে। অষ্টৈতাচার্য ভরদ্বাজ গোত্রীয় মাড়িয়ান অথবা লাড়ুনি গ্রামীণ ছিলেন, অদ্যাপি তাহার বংশধরেরা অষ্টৈত বংশীয় গোণ্ডামী বলিয়া খ্যাত আছেন।

লাল মোহন বাবু লঘুভারতের অনুসরণ করিয়া উত্তর বারেন্দ্রের বিবরণ লিখিয়াছেন তাহাও ভ্রম। আমি উত্তর বারেন্দ্র এবং বারেন্দ্র গণের কুল গ্রন্থ দেখিয়াছি তাহাতে জানাগিয়াছে উত্তর বারেন্দ্রগণ, বারেন্দ্রের এক শাখা মাত্র। উত্তর বারেন্দ্র কুলে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণি এই পাঁচ গোত্র ও ষোলটি গাত্রিত আছে। জেলা দিনাজপুর ও মালদহের অধীন গ্রাম সকলে ইহাদের বাস। পূর্বকালে উত্তর বারেন্দ্র এবং দক্ষিণ বারেন্দ্র শব্দ ব্যবহৃত হইত, বর্তমান কালে দক্ষিণ লোপ হইয়া বারেন্দ্র এবং উত্তর বারেন্দ্র নাম চলন হইয়াছে।

গ্রন্থ কর্তা বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ গণের বিবরণ যে লিখিয়াছেন তাহার অধিকাংশই ভ্রমপূর্ণ, তাহার প্রত্যেক বিষয় আশে লোচনা করিলে একখানি গ্রন্থ হয় এবং সঙ্ঘৎসরেই তজ্জপ একখানি গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনাও আছে। অতএব সংক্ষেপে ২১৩ টি মাত্র ভ্রমের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। লাল মোহন বাবু আপন গ্রন্থের

২৩৪। ২৩৫। ২৩৬ পৃষ্ঠাতে যেসকল কথা লিখিয়াছেন তাহার স্কুল মর্থ্য এই, “রাজা কংস নারায়ণ উদয়নাচার্য্য ভা-  
 দুড়ির সন্তিত একত্র হইয়া মধুর কুল রক্ষা  
 করেন। এবং তিনি মধুমৈত্রে কন্যা সম্প্র-  
 দান করিয়া নিজে কুলীন হইতে শ্রোত্রীয়  
 হন। উদয়নাচার্য্য তাহার লীলাবতী নামী  
 কন্যাকে মণ্ডল মিশ্রে সমর্পণ করেন, মণ্ডল  
 মিশ্র জলবিন্দু স্পর্শে ছিটা কাপ হন।  
 লীলাবতীর গর্ত্তে উমাপতি, ভূপতি, ভবানী-  
 পতি, রত্নপতি, পশুপতি ইহাদের জন্ম হয়”  
 কিন্তু এই লেখা সম্পূর্ণ ভ্রম মূলক। প্রথম  
 রাজা কংসনারায়ণ এবং উদয়নাচার্য্য এক  
 সময়ে বর্তমান ছিলেন না। উদয়নাচার্য্য  
 ১২৫০ শকের সমকালে বর্তমান থাকিয়া  
 বারেন্দ্র কুলে পরিবর্ত্ত মর্যাদা স্থাপন ক-  
 রেন। সেই উদয়নাচার্য্যের অধস্তন নবম পু-  
 কষে ত্রীকৃষ্ণ ভাটুড়ির জন্ম হয়। এই ত্রীকৃষ্ণ  
 ভাটুড়ি কংসনারায়ণের ভগ্নী বিবাহ ক-  
 রেন। পুঙ্কান্তরে দেখ মধুমৈত্রেয় অধ-  
 স্তন ৭ম পুঙ্ক জাত দুর্জয় মৈত্র কং-  
 সনারায়ণের সম সাময়িক ছিলেন। রাজা  
 কংসনারায়ণ এবং উদয়নাচার্য্যে কত পুঙ্ক  
 ব্যবধান তাহা অন্য প্রকারেও দেখা যায়;  
 উদয়নাচার্য্য এবং কুলক ভট্ট উভয়ে সম  
 সাময়িক এই কুলক এবং ময়ুরভট্ট ও মঙ্গল  
 ওঝাকে সহায় করিয়া উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্ত  
 মর্যাদা স্থাপন করেন। কুলকভট্ট এবং পু-

কষোত্তম বৈদান্তিক এই দুই ভাতা। এই পু-  
 কষোত্তম বৈদান্তিকের বংশে অধস্তন ১০ কি  
 ১১ পুঙ্কষে কংসনারায়ণের জন্ম হইয়াছিল।

রাজা কংসনারায়ণ কখনই কুলীন  
 ছিলেন না, তিনি মধুমৈত্রেয় সম সাময়িক  
 ব্যক্তি নহেন, তিনি কখনও মধুমৈত্রে কন্যা  
 সমর্পণ করেন নাই। তিনি তাহের পুত্রের  
 রাজগোষ্ঠীয় ব্যক্তি। এবং নন্দনাগামী  
 গ্রামীন পূর্ব হইতেই শ্রোত্রিয়।

উদয়নাচার্য্যের লীলাবতী নামী ক-  
 ন্যাকে মণ্ডল মিশ্র বিবাহ করেন নাই।  
 বাস্তবিক লাহিড়ি কুলোদ্ভব বল্লাভাচার্য্যে  
 লীলাবতী যে বিবাহ করেন এবং ভূপতি  
 ভবানীপতি, রত্নাগীপতি, গৌরীপতি, উ-  
 মাপতি এই ছয়জন উদয়নাচার্য্যের পুত্র  
 কিন্তু দৌহিত্র নহেন।

বিদ্যানিধি যে উদ্দেশ্যে গ্রন্থ প্রচার করেন  
 তাহা অতি মহৎ, কিন্তু আক্ষেপের বিষয়  
 এই প্রকৃত ইতিহাসের অনুসন্ধান না করিয়া  
 লোক মুখে শুনিয়া ইতিহাস লিখিয়া ব-  
 সিয়াছেন এবং তদ্বারা বহু লোকের ভ্রম  
 জন্মাইয়াছেন।

উপরে যে কএকটি ভ্রম প্রদর্শন করা  
 গেল, তাহা ভিন্ন আরও ভূরি ভূরি ভ্রম  
 আছে, অবকাশ মতে তাহার সমালোচনা  
 করা যাইবে অথবা ইতিমধ্যে সঙ্কলিত  
 গ্রন্থ প্রকাশের সম্ভাবনা হইলে তাহাতেই  
 লিখা যাইবে।



## সংক্ষিপ্তসমালোচন

১। সিপাহিযুদ্ধের ইতিহাস। জী-  
রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত প্রথম খণ্ড। ১৮৫৭  
খৃষ্টাব্দের সিপাহি-বিপ্লব ভারতীয় ইতি-  
হাসের এক প্রধানতম ঘটনা। ব্রিটিশ-বি-  
জিত ভারত সাম্রাজ্যে পূর্বে যে নীতি প্রব-  
র্তিত ছিল, ১৮৫৭ হইতেই তাহা পরি-  
বর্তিত হয়, এবং এদেশের অন্তস্তলে এখনও  
যে অতি ভয়াবহ আগ্নেয় পর্বত সকল প্র-  
চ্ছন্ন নিহিত রহিয়াছে—১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের  
চিরস্মরণীয় ইতিহাসই রাজনীতি বিশারদ  
বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগকে প্রথম তাহা বুঝিতে  
দেয়। কিন্তু হুঃখের বিষয় এই যে, এই  
ঘটনাবলী অদ্যাপি বাঙ্গালা ভাষায় বিস্তৃত  
হয় নাই। বাঙ্গালার গজরাজগতিগঞ্জিনী  
কবিন্দররঞ্জিনী জীমতী কমল কামিনীর  
পদ নথ ও আলুলারিত কুন্তল রাশির  
শোভা বর্ণনায় তিনশত মূললিত কাব্য নি-  
খিত হইয়াছে। বাঙ্গালি শিশুদিগের বি-  
রহ বিধুর দক্ষকনয়ের হুঃখ দুরাশা বর্ণনায়ও  
অর্ধলক্ষ ভূতন গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে।  
কিন্তু যে ঘটনা ভারতবর্ষের ভূত ভবিষ্য-  
তের গ্রন্থি স্বরূপ, যে ঘটনাতে এক যুগের  
লয়, আর এক যুগের অভ্যুদয়, পুরুষকার  
ও স্বজাতি বাংসলোর পরীক্ষা, সাহস ও  
কৌশল এই দুইয়ের ভারতম্য নির্ণয়, এবং  
জাতীয় সংঘর্ষের ফলাফল বিচার দুর্ভাগ্য

ভারতে, দুর্ভাগ্য বক্ষে কাহারও লেখনী  
সেই ঘটনার আমূল বিবরণ সংকলনে এবং  
আমূল তত্ত্বনিরূপণে ব্যাপৃত হয় নাই। র-  
জনী বাবু উল্লিখিত কলকপ্রকাশনে যত্নপর  
হইয়াছেন। তিনি যেরূপ কৃতী, পণ্ডিত,  
অনুসন্ধানপটু এবং অধ্যবসায়শীল তাহাতে  
আমাদিগের আশা হইতেছে, তিনি কৃত-  
কার্য হইবেন। কিন্তু তথাপি বলি, কা-  
র্যের শেষদর্শন না হইলে আমাদিগের শঙ্কা  
দূর হইবে না আর, বাঙ্গালার বর্তমান পা-  
ঠকসমাজ যে, গুপ্তকথা ও রসের কথা,  
প্রেমের কথা ও শ্যামের কথা পরিভাষা  
করিয়া নানা ধূলুপম্পের অন্তর্গত-গভীর  
বেদনার কথায় কণপাত করিবে ফলে  
পরিচয় না পাইলে আমাদিগের এমনও  
ভরসা জন্মিবে না।

রজনী বাবুর ভাষা, মত ও সিদ্ধান্ত  
প্রভৃতি বিষয়ে আমাদিগের অনেক বক্তব্য  
আছে। কিন্তু বোধ হয়, তাঁহার ইতিহা-  
সের প্রথম খণ্ড মাত্র অবলম্বন করিয়াই  
তাদৃশ সমালোচন সম্ভব নহে। তিনি এ-  
খন পর্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সি-  
পাহি যুদ্ধের উপক্রমণিকা; সিপাহিযুদ্ধের  
প্রকৃত ইতিহাস এখনও বহুদূরে। তবে ইহা  
অনুসন্ধানিতে বলিতে পারি যে যদি রজনী  
বাবু স্বয়ং বৃত্তান্ত সংকলন না করিয়া সং-

কলিত রক্তাস্তের উপর নির্ভর করেন, তাহা হইলে তাঁহার গ্রন্থ অভিনব একখানি ইতিহাস বলিয়া গৃহীত না হইয়া কে সাংস্বেব প্রভৃতির রচিত পুরাতন গ্রন্থসমূহের স্বাধীন সমালোচনা বলিয়াই পরিগৃহীত হইবে।

যাঁহারা সিপাহি যুদ্ধের আতঙ্কজনক অভিনয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অনেকে অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহাদিগের মুখে যাহা শুনা যায়, তাহাই এক, এবং গ্রন্থপাত্রে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহাই এক। তাদৃশ লোকদিগের নিকট হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সেই সংগৃহীত বিবরণের সহিত গ্রন্থোক্ত বিবরণের তুলনা করা, রজনী বাবুর একান্ত কর্তব্য হইতেছে।

২। কবিতা কলাপ। দ্বিতীয় ভাগ।

শান্তিপুর পুরাতন ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র জিরামলাল চক্রবর্তী বিরচিত। গ্রন্থকার মৃদুমধুর পদ বিন্যাসে পটু। আমরা নিম্নে তাঁহার কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম। কিন্তু এইরূপ লেখায় বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি কি অবনতি হইতেছে, পাঠকবর্গ তাহার বিচার করিবেন। আমাদের এইরূপ বোধ হয় যে, জয়দেবের অভি রক্ত প্রেরণার কথা কিছুদিনের জন্য অধ্যয়ন কি বিষয় চিন্তায় নিবিষ্ট রহিলেই ভাল হয়। সেই যে কোম দিন ললিত-লবঙ্গলতাপারিশীলন-কোবল পদাবলী এবং প্রিয়াগুণবর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, এখন পর্য্যন্তও এদেশে তাহারই তরঙ্গ চলিতেছে। হতভাগ্য বঙ্গবাসী বিজ্ঞান করিবারও অব-

সর পাইল না। একে বাজালি গ্রহবৈ-  
গুণ্য বশতঃ ইদানীং অন্ধ অবলা, তাহাতে  
আবার গ্রন্থকারবর্গ গুরু গৌরবান্বিত  
আসনে উপবিষ্ট হইয়া, নিরন্তর শিক্ষা দি-  
তেছেন,—

প্রিয়া বিনে এবে সব হস অন্ধকার

জীবন দুখের রাত,

তাঁহাতে প্রেমের বাতি

নিবাল রে ! নিরদয় কাল দুরাচার।

আর না হেরিব তার সে চন্দ্রবদন,

আর না শুনিব সেই পৌষ বচন,

কুরারেছে শ্বখের স্বপন ॥

হেরিলে আমার যার যে চাক অধরে

মেঘযুক্ত শশি সম,

হাস্যের বিকাশে ভ্রম—

জলদে খেলায় কিবা দামিনী অশ্বরে,

চকিতে ছেদিল করে মৃগাল সহিত

ফুলকমলিনী নীরে করিয়ে পাতিত ?

দন্ধ করি প্রণয়ীর চিত ॥

খরতেজে দহে চিত বিরহ অনল,

হায় হায় মরি মরি,

কোথা মম প্রাণেশ্বরী,

একবার হেরি, এস হই গো শীতল

হায় রে ! করাল কাল কেমন বিচার,

ছিঁড়িল রে ! প্রেমিকের প্রেম-কণ্ঠ-হার।

দহে যাছে বিরহ দুর্জয়ার ॥

৩। নীতিমঞ্জরী। প্রথমখণ্ড। জিম-

হিমচন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত। এই প্রকারের

কবিতার সহিত আমাদিগের পাঠকবর্গের অপরিচয় নাই। সুতরাং আমাদের মতন পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ফল কথা এখানি না লিখিত হইলে দোষ ছিল না।

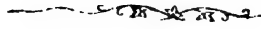
৪। যুধিষ্ঠিরোপাখ্যান। মহাভারতান্তর্গত প্রস্তাব বিশেষ। ঈনতী শরৎ শনী গুপ্ত। কর্তৃক সংকলিত। আমরা এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থকর্ত্তী বাঙ্গলা লেখার রীতি শিখিয়াছেন, বোধ হয় সমুচিত শিক্ষা লাভ করিলে তিনি যশস্বিনী হইতে পারিবেন। কুলমহিলাদিগের পক্ষে সাহিত্য সমাজে যশোলভ করা বন্ধে ইদানীং নিতান্ত সহজ। কারণ সহস্রর ব্যক্তি মাত্রই তাঁহাদিগকে উৎসাহ দান করিয়া থাকেন।

৫। কুসুম। সচিত্র মাসিকপত্র ও সমালোচন। জীঅন্নপ্রসাদ মৈত্র দ্বারা সম্পাদিত। যাঁহারা এই পত্রিকাখানি প্রচার করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে অবশ্যই বাঙালী সাহিত্যের সুহৃৎ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। নহিলে অনর্থক এই ক্লেশ স্বীকার কেন? কিন্তু তাঁহাদিগের দ্বারা বাঙালী সাহিত্যের কোন রূপ উপকার দর্শিবে—আমাদিগের মনে যুদ্ধভের তরেও এমন আশা স্থান পাইতেছে না। ইহার প্রথম প্রবন্ধের নাম কুসুম, অর্থাৎ কুসুম নামক পত্রিকা অবতরণিকা। ২৬ টি পংক্তিতেই এই প্রবন্ধটি

পরিসমাপ্ত হইয়াছে। ভূতপূর্ব ভ্রমের মুখবন্ধে যে রূপ লিখিত হইয়াছিল, ইহারও মুখবন্ধে সেই ভঙ্গির কদর্য্য অনুকরণে লিখিত হইয়াছে,—“কুসুম! তুমি আবাল বৃদ্ধ বনিতা হিন্দু মুসলমান ইংরেজ মানব রাক্ষস দেবতা সকল শ্রেণীস্থ লোকেরই আদরের—ধন—”তার পরের প্রবন্ধের নাম দুর্গা দর্শন। এইটি ৫৪ পংক্তিতে পরিসমাপিত। আমাদিগের শারীরিক বল নামক তৃতীয় প্রবন্ধও ঐ রূপ। তার পরে কুসুম নামে একটি কবিতা; কবিতার পর দুর্ভাগিনী বিমলা নামে এক উপন্যাস। উপন্যাসের পর মূল্যপ্রাপ্তির জন্য তাগিদ, তাগিদের পর বিজ্ঞাপন, সুতরাং মাসিক পত্র ও সমালোচনের সকলই ইহাতে আছে। নাই কেবল,— থাক্ তাহা আর বলিয়া প্রয়োজন নাই।

৬। ওলাউচার নিদান ও চিকিৎসা বিষয়ে বাঙ্গালার ভূতপূর্ব হস্পিটালসমূহের ইন্স্পেক্টর জেনারেল জীযুক্ত জন্মের এম্ ডি মহোদয়ের চত্বারিংশৎ বর্ষের ভূয়ান্দর্শনের ফল। বাঙ্গালী গবর্ণমেণ্টের অনুজ্ঞায় জীযুক্ত কানাইলাল দে রায়বাহাদুরের দ্বারা বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত। আমরা চিকিৎসা ব্যবসায়ী নহি, সুতরাং এই পুস্তকের গুণাগুণ পরীক্ষা আমাদিগের দ্বারা অসম্ভব। অনুবাদের ভাষা সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, উহা সর্ব্বাংশে প্রয়োজনের উপযোগী হইয়াছে।

## লোকরঞ্জন ।



মনুষ্যসমাজে সাধারণতঃ মনুষ্যের প্রশংসা কিসে ?—না, মনুষ্যের চিত্তরঞ্জে । যিনি লোকানুরঞ্জে পটু, তিনি পুরুষের মধ্যে পুরুষ, প্রীতিপ্রদ, প্রীতিভাজন, প্রশংসনীয় । আর, যিনি লোকরঞ্জে অপটু, তিনি যারপরনাই সাধু, যার পর নাই সরল এবং যতদূর সম্ভব মহানুভাব হইলেও সাধারণের অপ্রিয় ও অপ্রশংসনীয় । সকল লোকেই অসম্পর্কিত প্রিয়ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে এইরূপ বলিয়া থাকেন যে,—তুমি যদি মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্যেরই মনস্তত্ত্ব জ্ঞাহিতে না পারিলে, দশ জনে যাহা ভাল বাসে তাহা সম্পাদন করিয়া দশজনের মধ্যে গণনীয় ও দশজনের আদরের পাত্র হইতে সমর্থ না হইলে, তাহা হইলে একীবনে তোমার আর প্রয়োজন কি ? পুত্রের প্রতি পিতার এই উপদেশ, ভাতার প্রতি ভাতার এই উপদেশ, ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের এই উপদেশ, এবং যে যাহাকে উপদেশ দিতে পারে, তাহার প্রতিই তাহার এই উপদেশ ।

উল্লিখিতরূপ উপদেশে জগতের কার্যক্ষেত্রে কিরূপ ফল সর্বত্র ফলিতেছে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইতে পারে ।

কারণ, যাহার চক্ষু আছে, তিনিই ইহা দেখিতে পাইবেন যে, মনুষ্য যত প্রকারের কার্যে সংলিপ্ত রহিয়াছে, এই লোকরঞ্জনপ্রবৃত্তিই তত্তাবতের মূলে সর্বপ্রধান প্রবর্তনা । লোকের ধর্ম, কর্ম, দান, ধ্যান, শিক্ষা, সাধনা, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, উৎসাহ, উদ্যম, ক্রেশ-ভোগ, কষ্টস্বীকার, সমস্তই যেন লোকরঞ্জনের জন্য । সাধারণতঃ, বহুলোকের যাহাতে অনুরাগ, তাহাতেই লোকের অনুরাগ, এবং বহুলোকের যাহাতে বিরাগ, তাহাতেই লোকের বিরাগ । অপিচ, যে কার্যে লোকচক্ষু আকৃষ্ট হইল, এবং আকৃষ্ট হইয়া প্রীত হইল, তাহাই কার্য্য; এবং যে কার্যে লোকচক্ষু আকৃষ্ট হইল না, এবং আকৃষ্ট হইয়াও প্রীতি প্রকাশ করিল না, তাহা যত বড় উচ্চশ্রেণির কার্য্য হউক না কেন, আপাততঃ তাহা অকার্য্য ।

তুমি যোগী, তুমি কিসের জ্ঞাত যোগদান করিতেছ ? লোকের নিকট প্রদর্শনের জন্য, না তোমার আত্মার পরিতৃপ্তির জন্য ? যদি আত্মার পরিতৃপ্তির জন্যই তোমার এই যোগব্রত, এই কঠোর তপস্যা, তবে তোমার জন্মের ঐ তিলক কেন ? তোমার কণ্ঠে ঐ মালা,

কপালে ঐ ত্রিপুরক, অস্ত্রে ঐ মৃগয়ী  
রেখা এবং পরিধানে ঐ গৈরিক বস্ত্র  
কেন? ইহা কি সকলই লোকচক্ষু আক-  
র্ষণের জন্য নহে? তুমি নির্জনে আপনাত্তে  
আপনি নিমজ্জিত হইয়া, আত্মার অভ্য-  
ন্তরে ক্ষণকালের তরেও প্রবেশ করিতে  
ভাল বাস না, এবং একমাত্র ঐহিকতাই  
আত্মার চিরদিনের বিশ্রাম, তুমি তাঁহার  
অমৃতময় আবেশ উপভোগ করিতে কখনও  
অভিলাষী হও না;—অথচ যেই তোমার  
উপর লোকচক্ষু নিপতিত হয়, অমনি তুমি  
ধ্যানে নিরত হইয়া নেত্র নিম্নলীন কর, এবং  
যিনি বাক্যের অগম্য, অচিন্তনীয়, তাঁহাকে  
অতিসুখবহ বস্তুবাক্যে বর্ণনা করিতে প্র-  
রত হও। তোমার এই ধ্যান, এই স্তোত্র-  
পাঠ, এবং জিহ্বার এই ব্যায়াম কাহার  
প্রীতিার্থে?

তুমি দাতা, দীনপালক, পরহুঃখকা-  
তর, পরোপকারী সাধু, তুমিই বা কি উ-  
দ্দেশ্যে বর্ষাকালীন বারিধারার ন্যায় অ-  
বিশ্রামধারায় এই দান করিতেছ? ইহা  
কি লোকমুখে যশোধনির জন্য, না দুঃখীর  
দুঃখ মোচনের জন্য? যদি দুঃখীর দুঃখ-  
মোচনই তোমার অন্তরের প্রকৃত আ-  
কাঙ্ক্ষা, তবে তোমার দানপরম্পরার  
অগ্র ও পশ্চাৎ উভয়দ্রই এই চক্কানাদ ও  
পটহবাদ্য কেন? যখন কেহ দেখে না,  
ও কেহ শুনে না, তখন তোমার হৃদয় পা-  
ষণ হইতেও বর্জিত;—তখন তুমি অকু-  
ণ্ঠিতপ্রাণে অশ্রুধারাকূলা অনাথা বিদবার

সর্বস্ব অপহরণ কর, পিতৃহীন বালকের  
মুখের গ্রাস কাড়িয়া লও, অস্থিতাঙ্গসার  
দ্বিত দুঃখীকে দূর দূর বলিয়া স্বয়ং পঞ্চ-  
দশ বাত্মনে পরিতৃপ্ত হইতে উপবিষ্ট হও,  
এবং শীতবাত্তে কম্পিত অতিদীন ভিখা-  
রীকে দ্বারদেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়া  
স্বগন্ধিবাসিত সুকোমল শয্যায় সুখানুশ্রুতি  
সম্ভোগ কর। অথচ, যখন সহস্র চক্ষু  
তোমার দিকে তাকাইয়া থাকে, সহস্র র-  
সনা তোমার গুণানুকীর্ণনে ব্যাপ্ত হয়,  
এবং সহস্র বাহু তোমার আশীর্বাদে না-  
চিয়া উঠে, তখন তুমি ধ্বজপতাকা উড়াইয়া  
এবং লোককোলাহলে দশদিক্ নিনাদিত  
করিয়া, দান কর আর পরহুঃখে পরিতাপ  
কর, এবং পরহুঃখে পরিতাপ কর আর  
দান কর।

আর তুমি কবি, কল্পনার প্রিয়সেবক,  
দেবী কথলাসনার চির উপাসক। বল  
দেখি, তুমিও কাহার প্রীতিতে সর্বত্র এই-  
রূপ আকুলতা প্রদর্শন করিতেছ? কা-  
হার পদারবিন্দে চিত্ত সমর্পণ করিয়া  
সুখে দুঃখে সর্বদা এইরূপ গাইতেছ?  
তুমিও কি যোগী এবং তাপস, দাতা এবং  
পরোপকারীর ন্যায় লৌকিক যশেরই  
কাঙ্গাল নহ? যদি কল্পনার বিভ্রমবি-  
লাস এবং ভারতীর জ্যোতির্ময় রূপরা-  
শিতেই তোমার হৃদয় ডুবিয়া থাকিত, তবে  
কি তুমি কখনও আত্মবিস্মৃত হইয়া এবং  
আপনার উচ্চতর পরিত্যাগ করিয়া ইতর  
লোকের দ্বারে দ্বারে নানাবিধ সুংসিত

পট লইয়া হুতা করিতে, এবং অজ্ঞানতি-  
মিরারিত অশিক্ষিত লোকের চিত্তবিনো-  
দনের জন্য ভাষার নিরাবিল পবিত্রদেহে  
কলঙ্কের কালিমা তুলিয়া দিতে ? যখন  
প্রকৃতি, সৌদামিনীর কণিকবিকাশে হা-  
সিয়া হাসিয়া, এবং নিবিড়রুম্ব কলদমালার  
ইতস্ততঃ পরিচালনে অক্ষয় নোলাইয়া, সেই  
ভোমা ভুবনমোহিনী মূর্তিতে প্রকাশিত হন,  
হে প্রেমিক ! তোমার চক্ষু তখন পা-  
র্শ্ব-কতিলাভ-গগনীর অঙ্কপাতে নিবিষ্ট  
থাকে ; আবার যখন প্রকৃতি নৈশসমীর-  
ণের গভীরনিঃশ্বনে মানবজাতির হৃচ্ছতির  
জন্ম শোকাভুরার মত বিলাপ করেন,  
তোমার কর্ণ তখনও তৎপ্রতি বধির রহিয়া  
নিরুচ্ছজনভোগ্য নিরুচ্ছ স্বরের অ'হ্বানই  
শ্রবণ করিতে রহে । অথচ যেই তুমি লো-  
কবস্ত্র সভাস্থলে প্রবেশ কর, তোমার  
চক্ষু প্রকৃতির প্রেমে অজস্র বাষ্পবারি  
নিমোচন করে, তোমার হৃদয় কণ্পনার  
প্রমোদস্পর্শে উছলিয়া উঠে ।

বস্তুতঃ, এই প্রকারে দৃষ্ট হইবে যে,  
লোকজগতের অধিকাংশ ক্রিয়াই লোক-  
মোহনের এইরূপ প্রক্রিয়া মাত্র অথবা  
প্রাণশূন্য ক্রিয়ার প্রাণপ্রীতিকর সাড়ম্বর  
প্রদর্শন । কারণ, প্রকৃত ক্রিয়ায় তোমার  
যে আনন্দ নাই, ক্রিয়ার প্রদর্শনে তাহার  
শতগুণ আনন্দ, এবং অন্ধকারে তো-  
মার যে উৎসাহ নাই, লোকদৃষ্টির আ-  
লোকে তাহার শতগুণ উৎসাহ । লোকে  
যখন চালায়, তখন তুমি চল, এবং লোকে

যখন না চালায়, তখন তুমি নির্জীবের মত  
পড়িয়া রহ । শুধু ইহাই নহে,—লোকে  
যাহা ভালবাসে, অতি অপ্রিয় বস্তু হইলেও,  
তাছাই তুমি ভালবাসিতে চেষ্টা কর,  
এবং লোকে যাহা ভালবাসে না, অতি  
প্রিয়বস্তু হইলেও তাছাতে তুমি ঘৃণা প্র-  
কাশ করিতে যত্নবীল হও । যেন লো-  
কের উপাসনাতেই তোমার দীক্ষা, এবং  
লৌকিক প্রতিষ্ঠাতেই তোমার আশার  
পূর্ণতৃপ্তি এবং পরাংপর সুখ ।

অতঃপর সহজেই এই জিজ্ঞাসা উপ-  
স্থিত হয় যে, পৃথিবীতে শিক্ষিত ও অশি-  
ক্ষিত, বহুদর্শী ও অদূরদর্শী, সকলেই যদি  
লোকরঞ্জনের অনুকূল ক্রিয়াকলাপ লইয়া  
এইরূপ ব্যাপৃত, তবে কি লোকরঞ্জনই মান-  
বজীবনের একমাত্র কর্তব্য ও একমাত্র ব্রত ?

এই প্রশ্নের উত্তরে আবাদিগের প্রথম  
বক্তব্য এই যে, মনুষ্য যতই কেন চেষ্টা না  
করুক, যতই কেন আকুল না হউক,  
সর্বতঃসিদ্ধ লোকরঞ্জন আকাশকুসুমের  
নাগ অলীক পদার্থ ; উহা স্বভাবতঃই অ-  
সাধ্য ও অসম্ভব । যুধিষ্ঠির যেমন বলিয়া-  
ছেন,—নাগৌ মুনির্বম্য মতং ন ভিন্নং,—  
আমবাও সেইরূপ বলিতে পারি, নাগৌ  
জনো যস্য মতি ন ভিন্না । স্মরণ্যে, যে  
কার্য্যে একজনের মনে পরমাত্মা তৃপ্তি ; সেই  
কার্য্যেই আর এক জনের মনে যৎপরো-  
নাস্তি অতৃপ্তি, এবং যে কার্য্যে একজনের  
মুখে যশ, সেই কার্য্যেই আবার আর এক-  
জনের মুখে অযশ ।

তুমি যাহাকে প্রেমিক বলিয়া আদর কর, আমি তাহাকে শ্রৈণ বলিয়া উপহাস করি; এবং আমি যাহাকে প্রিয়বদ বলিয়া প্রশংসা করি, তৃতীয় এক ব্যক্তি তাহাকে চাটুকার বলিয়া ঘৃণা করেন। যিনি আমার বিবেচনায় একজন সমাজসংস্কারক সাধু পুরুষ, তোমার বিবেচনায় তিনি ধর্মস্রোহী, এবং যিনি তোমার বিবেচনায় একজন পরমভক্ত পূজ্যব্যক্তি, আমার বিবেচনায় তিনি একটি ক্রীড়াময় কাষ্ঠপুত্তল। ঐ যে যুবা, বহুবিধ বিচিত্র আভরণে অলঙ্কৃত এবং লুতাতস্তনদৃশ্য হৃদয়-অশ্বরে অর্দ্ধ-আবৃত হইয়া, কেবলই হাসিতেছে আর বিলাসভঙ্গী প্রদর্শন করিতেছে, এবং যিনি যে কোন প্রসঙ্গে যে কোন চিন্তাগর্ভকণার উল্লেখ করিতেছেন, তাহাই গোলাপ-স্মিথের থরণহিলের ন্যায় অসাময়িক হাস্যো উড়াইয়া দিয়া, আপনার আমোদ-শীলতা ও ইঙ্গিতনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে, ইহাকেই কি তোমরা, অলিভিয়া প্রভৃতি তরলমতি যুবতীদিগের ন্যায় সুরাসিক বলিয়া অভ্যর্থনা কর ? রসগ্রাহী বিজ্ঞসম্মানে ইনি একটি অন্তঃসংশয়ন অকালকুশ্মাণ্ড, কিংবা তাহা হইতেও অপকৃষ্ট। আর ঐ যে বহুপ্রতিষ্ঠাশ্রিত, পদানত, বিনীত পুরুষ, সকলের নিকটেই বিনয়ে নুইয়া পড়িয়া, সকলের সকল কথাই অবনতমস্তকে অনুমোদন করিতেছেন,—সত্যের অপলাপ কিংবা অসত্যের প্রশ্রয়, ইত্যাদি কিছুই প্রতি দুক্পাত না করিয়া, কিংবা

চিত্তের অবজ্ঞাজনক অধীরতায় দুক্পাত করিবার অবসর না পাওয়া, যে যাহা বলিতেছে তাহাই মুখভঙ্গিধারা মানিয়া লইতেছেন, এবং পরিশেষে, পরস্পর মত-বৈপর্য্যদর্শনে কিংবদন্ত্যবিস্মৃত হইয়া, উহার ও উহার মুখপানে অতিকাতরনয়নে চাহিতেছেন, ইহাকেই কি তোমরা সামাজিক বলিয়া সংবর্জন কর ? প্রকৃত সামাজিক-দিগের চক্ষে ইনি একটি মস্তিষ্কশূন্য মাংসপিণ্ড, অথবা গিণ্ডীভূতভণ্ড।

বল এখন লোকরঞ্জন কি ? এবং কিরূপে একই কার্ণার অনুষ্ঠানে কিংবা নীতির একই পথাবলম্বনে মনুষ্য যুগপৎ সকলশ্রেণিগণ লোকের মনোরঞ্জন করিবে ? যে গ্রীকজাতি আজি সফ্রেটিসের চিরস্মরণীয় নামে জগতে এত সম্মানিত, সেই গ্রীকজাতিই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সফ্রেটিসকে এক হস্তে দেবতার মত পূজা করিয়াছে, এবং তাঁহাকে অমর ও অপদেবতা হইতেও অধম বিবেচনায় আর এক হস্তে বিসপ্রয়োগ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছে। যখন নেজারথের সেই লোকবৎসল মহাযোগী চোর ও দস্যুর ন্যায় ভ্রূশকাষ্ঠে বিলম্বিত হন, তখন একদিকে লোকে শিরে করাঘাত করিয়া, হাহা কার করিয়া কান্দিয়াছে, আর একদিকে বিক্রপের বিকটহাস্য হাহাঃগণ্ডে সমুপ্ত হইয়াছে। স্টুয়ার্ট আর ক্রমওয়েলকে লইয়া ঐতিহাসিকেরা এই তিন শত বৎসর বিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, এবং বোধ হয়

আরও তিন সহস্র বৎসর বিবাদ করিবেন।  
যাঁহারা ক্রমওয়েলকে রাজদ্রোহী পাশও  
বলেন, স্টুয়ার্ট তাঁহাদিগের চক্ষে কমনীয়-  
তার প্রত্নবর্ণস্বরূপ; এবং যাঁহারা স্টুয়ার্টকে  
প্রজাপীড়ক পাশাওয়া বলেন, ক্রমও-  
য়েল তাঁহাদিগের চক্ষে ধর্মের অবতার, অ-  
থবা সাক্ষাৎ ধর্মপুরুষ। এসকল দেখিয়া  
শুনিয়া, এবং জগতীর প্রতি যুগের ইতিহাস  
অথবা সমাজের অহরহঃ পরিলক্ষিত প্র-  
তিদিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাপুঞ্জ পর্য্যায়-  
লোচনা করিয়া, কে আর লোকরঞ্জনে  
কৃতার্থ হইবার আশা করিতে পারে?  
এবং আশা করিবার কারণ থাকিলেও,  
লোকরঞ্জনের জন্যে লোকরঞ্জনকে মনুষ্য  
কোন সাহসে আর প্রতিভায় মনোজ্ঞ-  
নের উচিতবস্তু বলিয়া নির্দেশ করে?

লোকান্তিরাম রামচন্দ্র লোকরঞ্জনব্রতে  
ব্রতী হইয়া অষ্টাবক্র যুনির নিকট বলিয়া-  
ছিলেন যে, লোকের আরাধনার নিমিত্ত  
স্নেহ, দয়া, এবং সর্বপ্রকার সুখসম্প্রদায়  
অথবা জানকীকেও যদি তাঁহার পরিভাগ  
করিতে হয়, তথাপি তাঁহার মনে দুঃখ-  
শম্ভবের সম্ভাবনা নাই\*। কিন্তু আমা-  
দিগের বোধ হয়, স্নেহ, দয়া, জীবনের সুখ-  
সামগ্রী কিংবা প্রাণাধিকা ভাৰ্য্যাকে প-  
রিভাগ করিতে পারিলেও লোকে লোক-  
রঞ্জনব্রতে প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃতকার্য হইতে  
সমর্থ হয় না। স্নেহ আর দয়া, সুখ অথবা  
স্নেহঃ দয়াঃ তথা সৌখ্যঃ যদিবা জানকীমপি  
আরাধনার লোকসম্মুখতো নাস্তি যে ব্যথা

সুখময়ী প্রাণসহচরী একান্ত প্রিয়পদার্থ  
হইলেও সর্বথা অপরিহার্য নহে। অহি-  
মানদীপ্ত মহানুভাব মনুষ্যেরা অনেক সময়ে  
এবং অনেক স্থলেই স্বধ ও শাস্তির এসকল  
উপকরণ অন্যায়সে পরিভাগ করিয়া ক-  
র্তব্যের কঠোর অনুরোধ পালন করেন,  
এবং দুঃখ ও যন্ত্রণার তপ্তকটাহে অস্বাভাব-  
দনে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। যদি মনুষ্য,  
মমতার এই সমস্ত স্বকোমল বন্ধন হইতে  
মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই, লোকের  
আরাধনার পূর্ণমনোরথ হইতে পারিত,  
তাঁহা হইলে লোকরঞ্জনের কথা প্রসঙ্গে এই  
রূপ শঙ্কিত হইবার কারণ ছিল না। কিন্তু  
হায়! এসকল অতি কঠোর তাগত্বীকা-  
রেও লোকরঞ্জনের স্থাপ্যপ্রায়সে ইচ্ছাসিক্তির  
সম্ভাবনা নাই। মনুষ্যকে লোকরঞ্জনের  
জন্য ইহা অপেক্ষাও গুরুতর, যে ভগবৎ  
তাগ স্বীকার করিতে হয়, তাঁহা চিন্তা ক-  
রিলে চিত্ত আপনা হইতেই ভয়ে অবসন্ন  
হইয়া পড়ে। যাঁহারা সকল তত্ত্বেরই আ-  
মূল দর্শন করিতে যত্নপর হন, তাঁহারা অ-  
বশ্যই বুঝিয়াছেন যে, আমরা এস্থলে আ-  
ত্মার স্বাতন্ত্র্যকেই লক্ষ্য করিতেছি। কা-  
রণ, লোকরঞ্জনে কৃতসংকল্প হইয়া দীক্ষিত  
হইলে আত্মার স্বাতন্ত্র্যত্যাগেই ব্রতদক্ষিণ।

মনুষ্যাত্মার স্বাতন্ত্র্য যে কি এক ম-  
হামূল্য বস্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকেই তাঁহা  
অনুভব করিতে সমর্থ হয় না। মনুষ্য  
এই বহিঃস্থ জড়প্রকৃতির অনন্ত বৈভব ও  
অনন্ত মহিমা দর্শনেই মোহিত ও বিস্ময়ে



অভিভূত রহে, অথচ তাহার আপনারই অভ্যন্তরে অনন্তের পূর্ণ আভা করুণ আশ্চর্য্যভাবে নিহিত রহিয়াছে, তৎপ্রণিধানে ক্ষণকালের জন্যও তাহার চিত্রনিবেশ হইয়া উঠে না। সে যেময়গুণিত গিরিশৃঙ্গের উচ্চতা, সমুদ্রের অসীমবিস্তার, নদীর আবর্ত, সূর্য্যাস্তের উদয় ও লয়, এবং সৌরজগতের অনির্বচনীয় মাহাত্ম্য চিত্রা করিয়াই আপনার কল্পিত ক্ষুদ্রতায় আপনি সঙ্কুচিত রহে ;—অথচ তাহার অন্তরস্থিত আশা যে অতুল গিরিশৃঙ্গেরও বহু উর্দ্ধে উডীন হয়, তাহার হৃদয়ের বিস্তার যে সমুদ্রবিস্তারকেও লজ্জা দেয়, তাহার তৃষ্ণার আবর্ত যে নদীর ভয়াবহ আবর্তকেও উপহাস করে, এবং তাহার মন যে অনন্ত কোটি সূর্য্যচন্দ্র এবং অনন্ত কোটি সৌরজগৎকেও অবহেলায় গ্রাস করিতে পারে, বহির্বিপারমুগ্ধ মনুষ্য তাহা ধ্যানপূর্ণ হইয়া ভাবিয়া দেখে না। ফলতঃ এই স্বর্গ জগতে মনুষ্যের আত্মা হইতে কিছুই উচ্চতর নহে, কিছুই রহস্তর নহে, এবং কিছুই প্রাকৃত মহিমায় অধিকতর মহিমান্বিত নহে। মনুষ্য স্বষ্টির মুকুটমণি এবং স্রষ্টার প্রতিকৃতি। তাহার নিকট সিংহাসন ও তৃণশয্যা উভয়ই সমান ; এবং সে মানে কি অপমানে, আলোকে কি অন্ধকারে প্রাসাদে কি পর্ণকুটীরে যে ভাবে অপবা যেখানেই অবস্থান করুক, তাহার নাম মনুষ্য, এবং সে তাহার আত্মার অতুল গৌরবেই চির-গৌরবান্বিত। অখিল

ব্রহ্মাণ্ডও যদি তাহার প্রতি নির্দয় ও তাহার বিকল্পচারী হয়, সে একাকী এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডেরই বিকল্পে অক্ষুণ্ণ দণ্ডায়মান হইয়া আপনাকে আপনি ‘অহং’ অর্থাৎ ‘আমি’ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারে ; এবং যদি স্বায় তাহার অনুকূল ও সত্য তাহার সহায় হয়, সে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত লোকের সমবেত ইচ্ছার প্রতিকূলে একমাত্র আপনার ইচ্ছাকেই একটি শক্তিরূপে প্রয়োগ করিতে স্বয়ং ও সামর্থ্য রাখে। মনুষ্যের এমন যে অলৌকিক সম্পদ, এমন যে দেবহুম্মত স্বাতন্ত্র্য, লোকরঞ্জনর অতিসামান্য নটনৈপুণ্য রক্ষার জন্য ইহাকেও তাহার বিসর্জন করিতে হয় ! কেননা, আপনার আত্মাকে বলি স্বরূপ অর্পণ না করিলে কেহই প্রায়শঃ লোকের অনুজ্ঞেন একপাদভূমি গ্রাসের হইতে পারে না। জিহ্বা লোকরঞ্জনর জন্ত অসত্যভাষিনী, দৃষ্টি লোকরঞ্জনর জন্য অমৃতানুবাদিনী, প্রবৃত্তি লোকরঞ্জনর জন্য বিপণ্যমামিনী, এবং মনুষ্যের চিন্তাস্রোতও লোকরঞ্জনর জন্য নিম্নতলবাহিনী। কাহারও স্বাভাবিক তেজস্বিতা প্রদীপ্তপাবকশিখার ন্যায় ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতেছিল, লোকরঞ্জনলালসা তাহা নিভাইয়া ফেলিয়াছে ; কাহারও কচি ও চিত্র চিত্তার্জির নিরর্থকবারি ন্যায় নির্মল ছিল, লোকরঞ্জনলালসায় তাহা ক্রমে ক্রমে পয়ঃপ্রণালীর অস্পৃশ্য পত্র হইতেও আবিল হইয়াছে। পণ্ডিত লোকরঞ্জনর জন্য মুখের ন্যায়

ব্যবহার করিতেছে; এবং যে একদিন সিংহের ন্যায় প্রতাপশালী ছিল, সে আজি লোকরঞ্জনের জন্য, নিম্ন পুরুষকার পরিহার করিয়া, শৃংগালের চাতুরী অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে।

সংসারে কপট বিনয়, কপট প্রণয়, এবং কাপট্যের আরও শত সহস্র প্রকারের অভিনয় কেন? তাহা কি লোকরঞ্জনেরই অনুরোধে নহে? অনেকে শিক্ষাবলে স্বর্গবাসেরও উপযুক্ত হইয়া নিরয়নিবাসী কীটের ন্যায় দ্বিধৃত জীবন যাপন করিতেছেন; অনেকে আপনার দেহ, প্রাণ, মন ও মনস্বিতা লোকের বিকৃত প্ররক্তির সাময়িক প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়া, ইচ্ছাশূন্য তৃণের স্রাব, কোথায় কোন্ দিকে জানেন না, ভাসিয়া যাইতেছেন। অনুসন্ধান করিলে তাঁহাদিগের এই অধঃপাতের মূলেও কি লোকরঞ্জনকামনাই কারণ রূপে প্রতীয়মান হইবে না?

তবে কি লোকরঞ্জন পাপ? এই প্রশ্নের আন্দোলন ও মীমাংসার জন্তই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

লোকরঞ্জনপ্ররক্তির ছয়টি প্রধান কারণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যথা, লোকভয়, লোকসজ্জা, যশঃস্পৃহা, দয়া ও প্রীতি, এবং লোকপরায়ণা ভক্তিনিষ্ঠা। আমরা ভয়জন্য লোকরঞ্জনকে পাপ অথবা পাপ হইতেও অবজ্ঞাজনক জ্ঞান করি, এবং যিনি বিশ্ববিপত্তির শঙ্কায়, কিংবা কোনরূপ স্বার্থনাশ, সাংসারিক অনিষ্ট,

কি সমর্থ ও সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের ক্রোধভয়ে কর্তব্যের সরল পথ হইতে পূরিত্রস্ত হইয়া, লোকচক্ষুর দৃষ্টির পথে অতি জড়সড় ভাবে, কোনরূপে, কক্ষতলে প্রাণটিমাত্র নইয়া অবস্থান করেন, আমরা তাঁদৃশ ক্ষীণপ্রাণ, নিস্তেজ মনুষ্যকে, মনুষ্যের গণনার, স্বতঃপ্রবৃত্ত পাপীরও বহনিন্বে রাখি। ইচ্ছাকৃত পাপ, অতি বড় গর্হিত পাপ হইলেও, তাঁহার অন্তঃনে মনের নিরঙ্কুশ গতি এবং আত্মার স্বাধীনতা আছে। বিধাতা মনুষ্য ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় জীবকেই এই আংশিক বিধাতৃ-শক্তি এবং ভয়াবহ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদান করেন নাই। পশুপক্ষীর জন্য যে রেখা নির্দিষ্ট রহিয়াছে, তাঁহার সেই রেখাতেই সতত বিচরণ করিতেছে এবং সেই রেখাতেই চিরদিন বিচরণ করিবে। তাঁহাদিগের সহিত পাপপুণ্যের কোন সম্পর্ক নাই, এবং প্রকৃতির বিব্রোহাচরণেও তাঁহাদিগের কোনরূপ অধিকার ও ক্ষমতা নাই। এই সম্পর্ক মনুষ্যের, এবং এই রোমহর্ষণ অধিকার ও ক্ষমতাও একমাত্র মনুষ্যের। স্মরণ্য মনুষ্যের পাপেও মনুষ্যাত্মার পরিচয় হয়। অনিচ্ছাকৃত পাপ অথবা অনিচ্ছায় লোকানুরঞ্জনের আর-স্ত্রেই পশুপক্ষীর মত সেই অধ্যাত্মস্বাধীনতায় জলাঞ্জলি, এবং একান্ত ঘৃণাকর আত্মবিসর্জন; ইহা অপেক্ষা অবমাননা আর কি? ফলতঃ যাহারা আপনার ইচ্ছায় কি আপনার প্রয়োজনে, কোন নিচরিত্তি অবলম্বন করে, তাঁহারা এক শ্রে-

ণির লোক, এবং যাঁহারা পরের ইচ্ছায় কি পরের প্রয়োজনে, অথবা পরকীয় শাসনে নীচতা কি নিষ্কৃতি পথের আশ্রয় লয়, তাঁহারা আর এক শ্রেণির লোক । আমাদিগের চক্ষে এই ক্রকুটিভজ্জীভীত শৈথিল্য শ্রেণির মনুষ্যেরাই অধিকতর নিন্দ্যার্থ । একথা সত্য যে, ইহাদিগের দ্বারা জগতের বিশেষ কিছু অনিষ্ট, কিংবা লোকসমাজের বিশেষ কোন অকল্যাণ হয় না ; এবং ইহাও সত্য যে, হুঙ্করার মতি থাকিলেও ইহারা শাসনভয়ে তাঁহাতে প্রায়শঃ প্রকাশ্য হস্তক্ষেপ করে না । বরং ইহারা অনেক সময়ে সাধুর সান্নিধ্যে সাধু, এবং শিষ্টের সান্নিধ্যে শিষ্টবেশ পরিগ্রহ করিয়া সংকারণ্যেরও আনুকূল্য করে । কিন্তু তথাপি, যখনই মনে হয় যে, ইহাদিগের স্মৃতি ও কুমতি, উন্নতি ও অবনতি, সমস্যেরই মূলহেতু ভয়, চিত্ত তখনই যুগায় নিরন্তর হইয়া ফিরিয়া আসে ।

কুম্ভমে কিংবা কুম্ভমকোমল বস্ত্রপুটে যেমন কীট, তেমনই মনুষ্য-হৃদয়ে ভয় । মনুষ্যের হৃদয়ে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও উপাদেয়, যাহা কিছু সুদৃশ্য ও সুসৌরভযুক্ত, ভয় তৎসমুদয়ই চর্কণের পর চর্কণ করিয়া উহাকে একবারে অসার, অকর্মণ্য এবং অবশ্ব করিয়া ফেলে, এবং যৌবনে জরা ও বসন্তে শীত স্রষ্টি করিয়া প্রকৃতিকেই একবারে বিকৃত করিয়া তুলে । ঈশ্বরকে ভয় কর, এই নীতি পুরাতন শাস্ত্রের পুরাতন কথা । যখন ইহা প্রথম প্রচারিত

হয়, মনুষ্যজাতি তখন শিশু । তখন মনুষ্য বজ্রবিদ্রাভে ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্ত দেখিতে পাইত না, মেশে তাঁহার মাধুর্য্য অনুভব করিত না, এবং ঋটিকার ভৈরবনাদে তাঁহার স্তম্ভুর উপদেশ শুনিত সমর্থ হইত না । এইক্ষণকার পূর্ণবিকশিত পরমার্থবিদ্যা ঈশ্বরকে ভয় করিতে বলে না ; প্রীতি করিতে বলে । ঈশ্বরকে ভয় করাও যদি দোষ এবং মনুষ্যাত্মার বিকাশের পথে অন্তরায়, তবে কি মনুষ্য মনুষ্যকে ভয় করিবে, এবং মনুষ্যের ভয়ে অধীর, আকুল ও উৎকণ্ঠ রহিয়া লোকরঞ্জনের জন্য একে আর হইবে ? রাজা রামচন্দ্র প্রজার বিরাগভয়ে, কি প্রজারঞ্জন কার্য্যই রাজার পরম ধর্ম্ম এই বিবেচনায়, পবিত্রহৃদয়া জানকীকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়াও অকাতরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাঁহা নির্ণয় করা কঠিন । তাদৃশ তেজোরান্বিতে ভয় কি স্বার্থচিত্ততার প্রবেশসম্ভাবনা অল্প । যাঁহারা নিবিষ্টচিত্তে রাম-চরিত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এইরূপ ধারণা যে রামচন্দ্র রাজাকে সর্ব্বতোভাবেই প্রজাবর্গের ইচ্ছাধীন বলিয়া জানিতেন, এবং প্রতিনিধি বেক্রপ প্রভুর আজ্ঞাপালনে বাধ্য, তিনিও আপনাকে সেইরূপ প্রজার ইচ্ছাপালনে বাধ্য জ্ঞান করিতেন । স্মরণ্য তাঁহার এই কার্য্যে কর্তব্যবুদ্ধিরই প্রণোদনা কি প্রমাদ । কিন্তু যদি ইহা না হইয়া, ভয়ে তিনি ঐরূপ করিয়া থাকেন,—সীতাকে গৃহে রাখিলে প্রজা তাঁ-

হার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে, এবং রাজ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবে, যদি এই দুর্ভাবনার অধীন হইয়াই তিনি সেই প্রীতির প্রতিমা এবং মূর্তিমতী পবিত্রতাকে, কঠোরগর্তী-বস্ত্রায় ব্যাঘ্রভঙ্গুরের মুখে বিসর্জন দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহলোকেও তাঁহার ক্ষমা নাই, এবং লোকান্তরেও তাঁহার স্বর্গ নাই।

লোকলজ্জা ঠিক ভয় নহে, অথবা লোকের প্রতি দয়াও নহে, অথচ উহাতে ভয় ও দয়া এক উভয়েরই ঐক্য ছায়া আছে। উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভয় ও দয়ার মধ্যস্থিত এক বিচিত্র ভাব, এবং এই ভাবের বশ-বর্তী হইয়া অনেকেই অনেক সময়ে লোক-বিনোদনে বাধ্য হন। নিতান্ত যুগ্মিতচরিত্র ব্যক্তিও যদি আলাপ করিবার জন্য নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়, ভ্রাতৃলোকেরা মুখের উপরই তাহাকে তিরস্কার না করিয়া মনের ভাব গোপন করেন; এবং সে যে বিষয়ে আলাপ করিতে ভালবাসে, তাহার সহিত তদনুরূপ কোন বিষয়ে আলাপ করিয়া ক্ষণকালের জন্য তদীয় মনোরঞ্জে যত্নশীল হন। ইহারই নাম লোকলজ্জা। মনুষ্যের চক্ষুতে কি এক মোহিনী শক্তি আছে, উহা যাহার উপর নিপতিত হয়, তিনিই, অন্ততঃ তদুৎকৃষ্টের জন্য, আপনাই হইতে একটুকু স্থলিত হন। কৌরব-কুল-কলঙ্ক ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগের উপর সেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন, বোধহয় ঐরূপ সরলস্বভাব ও ধর্মপরায়ণ জ্ঞাতির

উপর কোনদিনও কোন রাজবংশ তেমন অত্যাচার করেন নাই। দ্রৌপদীর ন্যায় লক্ষলোকপূজিতা, রাজহৃদয়যজ্ঞে অভি-যিক্তা, রাজরাাজেশ্বরীকে প্রকাশ্য সভায় নিগূহীত হইতে দেওয়া একপ্রকারে অপ-মানের পরাকর্ষ। কেহ কম্পনাগ ও কা-তাকে এইরূপ অপমান করিতে সাহস পায় না। পাণ্ডবগণ এই অত্যাচার, অপ-মান ও অকথ্য নিগ্রহের প্রতিশোধ দিয়া সর্ব্বাংশেই পুরুষের মত কার্য্য করিয়াছি-লেন, সন্দেহ নাই। বৈরনির্ধাতন আর যে ভাবে এবং যে অর্থেই কেন পাতক হউক না, পাণ্ডবকৃত বৈরনির্ধাতনকে কেহই পাতক বলিয়া গণনা করিতে পা-রিলে না। কিন্তু যেই পাণ্ডবগণ কৃ-কাকতের যুদ্ধের পর, ধৃতরাষ্ট্রপ্রভৃতির সম্মুখীন হইলেন, অমনি তাঁহারা তাঁ-হাদিগের নিকট কৃতজ্ঞলিপুটে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং সত্যের আংশিক অপলাপ ক-রিয়া স্বকৃত কার্য্যসমূহকে প্রকারান্তরে পাপ বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ইহাও লোকলজ্জা। লোকলজ্জার আরও কত উদাহরণ আমাদিগের চক্ষুর উপরেই নিয়ত ভাসমান রহিয়াছে। আমরা জানি যে, গু-কজনসাম্রাজ্যে প্রিয়সম্মিলনে এবং প্রশংসায় রসপূর্ণ পবিত্র কথোপকথনে কিছুমাত্র দোষ নাই। বরং তাহাতে প্রীতি অধিকতর নির্মল হয়, এবং চিত্ত পঙ্কস্পর্শশূন্য নির্মলপ্রেমের সেই অনির্ব্বচনীয়স্বাদ অনুভব করিতে

পায়। কিন্তু আমরা লজ্জায় ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকি। আমরা বিলক্ষণরূপে অবগত আছি যে, সম্পর্কভেদে পরিহাস, এবং সমাজের আরও পাঁচ প্রকারের আচারব্যবহার নিত্য অর্থশূন্য। কিন্তু লজ্জার শাসনে আমরা তাহাতে প্রবৃত্ত হই। এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি কি ভয়ে, না দয়ায়? ইহার প্রকৃত কারণ লজ্জা। লজ্জা পরিচ্ছদাদিবিষয়ে আমাদের স্বাধীনতা অপহরণ করে, আমোদ প্রমোদের প্রকারবিষয়ে আমাদের পরের অধীন করিয়া রাখে, এবং আরও বহুবিধ লৌকিক কার্যে আমাদের সর্বতোভাবে পরমুখপ্রেক্ষী করিয়া তুলে। এই লজ্জাধীন লোকরঞ্জন সাধারণতঃ পাপ নহে, কারণ ইহার সহিত বিবেকের সকল সময়েই বিরোধ ঘটে না। কিন্তু যখন ইহা বিবেককেও অতিক্রম করে, এবং আত্মার স্বাভাবিক ক্ষুধা ও বিনাশ করিয়া ফেলে, তখন যে ইহাকে পাপ বলিয়া নির্দেশ করিব, তাহাতে আবার বিচার ও বিতর্ক কি?

প্রভুত্ব, ক্ষমতা, সম্মান, এবং অনন্য-সাধারণ সামর্থ্য প্রভৃতি লৌকিক সম্পদের জন্য যে লালসা তাহারই অপর নাম যশঃস্পৃহা। কেননা, যশে সর্বত্রই প্রভুত্বের বিস্তার, ক্ষমতার অনিবার্য বৃদ্ধি এবং সম্মান ও সামর্থ্যের অবশ্যাবিনী পরিপুষ্টি হইয়া থাকে। যশস্বী প্লাডফৌন রাজা না হইয়াও আজি ইংলণ্ডের রাজা।

ইংলণ্ড তাঁহার কথায় উল্লিখিত হয়, তাঁহার ইজিতে উপবিষ্ট রহে। যশস্বী গ্যারি-বল্ডী ইটালীর কোন এক লুকায়িত প্রদেশে কৃষি পরিদর্শন প্রভৃতি সামান্য কার্যে ভ্রম্যচ্ছাদিত বহির মত লুকায়িত রহিয়াছেন। অগতঃ সমগ্রে ইটালী প্রাতঃসময়ে তাঁহার নাম লইয়া উদ্দেশ্যে তাঁহাকে অভিবাদন করে, এবং যেখানে যে সময়ে জনসাধারণের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হয়, তাঁহার প্রতাপ ও প্রভাব দেখানোই সেই সময়ে প্রাতঃসূর্যের কিরণরাশির মত ছাঁইয়া পড়ে। যশস্বীগণের অগ্রগণ্য রায়েনজী, রমিও, ভল্টেয়ার, লুথর ও মিলাংথন, ডুবাঁল ও গ্যালিলিও, এবং কেপ্লার ও কলম্বাস বহুদিন হয়, লোকলীলা সংবরণ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদিগের অমল-যশোমণ্ডিত অবিনশ্বরজীবন অদ্যাপি সহস্রাব্দেকটি মানবজীবনে প্রতিভাত ও প্রবাহিত হইতেছে। ঈদৃশী যশঃস্পৃহা হইতে যে লোকানুগুণে মতি হয়, এবং শোকের মুখে কীর্তির কলধ্বনি জ্বলে বাসনা জন্মে, তাহাও কি পাপ? মানবজাতির অতীত ইতিহাস এবং মনুষ্যের হৃদয় ধীরে ধীরে, মৃদুমোহনস্বরে, অতিশয়স্বকণ্ঠে উত্তর করিতেছে,—না।

বস্তুতঃ, যে যশঃস্পৃহা, প্রভুত্বমদিয়ার ন্যায় দীনস্বয় দুর্বল মনুষ্যকেও, অনন্তঃমুহূর্তকালের জন্য, এক অতিমানুষ বল প্রদান করে; যাহার বংশীনাদ-বিনিমিত্ত মধুর আকাশে উদ্গাদিত হইয়া, তীক্ষ্ণ বী-

রের প্রভাবে গর্জিয়া উঠে, যোদ্ধা স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণসাধনে মৃত্যুর করাল-গ্রাসসাম্মিখেও অকম্প অবিচলিত পদে অগ্রসর হয় ; যে যশঃস্পৃহা জ্ঞানের অনুস-  
জ্ঞানে এবং কাঁরাদি শ্রুতুমার বিদ্যা অনু-  
শীলনে উগ্র উদ্দীপনা, পুরুষকারের প্রমত্ত-  
লীলারঞ্জে চিরপ্রবর্তনা ; যাঁহার জয়-বৈ-  
জয়ন্তী সাগরবক্ষে ও অত্রিশূঙ্গে সমান  
দোহলায়মানা, এবং লোকের হিতসম্পাদনেও  
যাঁহার সকল সময়েই অসামান্য উত্তেজনা,  
সেই যশঃস্পৃহাকে স্থগা করা মনুষ্যের  
পক্ষে নিতান্তই কঠিন । কিন্তু কঠিন কথা  
হইলেও বলিতে হইবে যে, যশঃস্পৃহা ন্যায়-  
পরতার ন্যায় নিখল নহে, নিঃস্বার্থ অনু-  
রাগের ন্যায় স্রবশ্য নহে, অভিমানসম্বন্ধ  
আসক্তির ন্যায় পুরুষের প্রীতিপ্রদ নহে,  
এবং মনুষ্যের ধর্মপথেও যথার্থ সহায়  
নহে । যাঁহার যশঃস্পৃহায় অতিমাত্র ব্যাকুল,  
তাঁহার জগতে প্রায়ই সংস্কারের অনুষ্ঠান  
দ্বারা লোকরঞ্জন করেন, তাঁহার কখনও  
বা ঐ ব্যাকুলতায় মনুষ্যত্বের উচ্চতর প্রা-  
মেও আরোহণ করেন । কিন্তু দুর্ভাগ্য-  
বশতঃ তাঁহার যুগল ও কৃষকের পাথর  
না বুলিয়া, অনেক সময়ে লোকপদবীর  
অযোগ্য, অপাত্র, অপদার্থের নিকটও  
যশঃপ্রার্থী হন ; এবং যে কোন উপায়ে  
উপার্জিত যশঃই যে মনুষ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নহে  
ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, কেহ বা  
ক্রমশঃ নাবিতে নাবিতে, পরিশেষে এক-  
বারে অধঃপাতে যান । ন্যায়পরতা ও

অনুরাগ, অথবা প্রকৃত অভিমান মনুষ্যকে  
কখনই অধঃপাতের দিকে নিতে পারে না ।

দয়া আর প্রীতিতে যে লোকরঞ্জন,  
তাঁহার আর এক পদার্থ । তাঁহার মেধারূত  
স্বর্ষা কি স্তবকাবনত্র বনপাদপের সেই  
এক মাধুর্যের ন্যায় অনেক সময়েই মনো-  
হর, অনেক সময়েই প্রশংসনীয় ; এবং য-  
খন মনোহর ও প্রশংসনীয় নহে, তখনও  
প্রায়শঃই সহনীয় ও ক্ষমাযোগ্য । বাল্যকি  
কি বশিষ্ঠের ন্যায় জ্ঞানী ও ব্রহ্ম, শ্রুতুমার-  
মতি শিশুর নিকট শিশু সাজিয়া ক্রীড়া  
করেন, দুঃস্বপ্নের ন্যায় বীর তপোবনবাসিনী  
সরলা কামিনীদিগের মনোরঞ্জনের জন্য  
সারল্যে মিশিয়া নানা রূপ আশ্রয় করেন,  
মেরুস্ত্রো ও জীনার বিজ্ঞতা যজ্ঞিফিন  
ও তাঁহার নর্মসহচরীদিগের নিকট মৃদু মৃদু  
হাসিয়া মৃত্যু শিক্ষা করেন, এবং শঙ্করা-  
চার্য্য কি নিয়ুটন প্রমোদ পরিহাসে পাঁচ-  
জনকে প্রকুল করিবার জন্য করপ্ত অক্ষ-  
মালা কি করে লেখনী পরিত্যাগ ক-  
রেন ;—এ সকল দেখিতে সুন্দর । তো-  
মার হৃদয় শোকদুঃখে আচ্ছন্ন, তোমার  
প্রতিবেশীর গৃহে শুভকার্যের শুভউৎসব ।  
তুমি যদি দয়ায় কি প্রীতিতে আপনায়  
শোকদুঃখ কিছু কাল বিস্মৃত হইয়া তা-  
হার সেই উৎসবে আনন্দধারা ঢালিতে  
পার, তাঁহাও সুন্দর ও প্রশংসাযোগ্য ।  
পিয়ুটিটান সম্প্রদায়ের প্রবর্তকেরা যে নী-  
তিই কেন প্রচার না করুন, যাঁহার নাম  
লইয়া তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ের স্বষ্টি, সেই

তপঃসাগরময় ধীর স্বয়ং অন্যরূপ ছিলেন । তিনি, যে হাসে, তাহার সহিত হাসিতে জানিতেন ; যে কাঁদে, তাহার সহিত কাঁদিতে পারিতেন ; এবং কোটি লোকের মঙ্গল চিন্তায় ডুবিয়া রহিয়াও পার্শ্বস্থ প্রিয়-ব্যক্তিদিগের সামান্য হর্ষবিষাদেই ভাবনা ভাঙিতে অবসর পাইতেন । দয়ার এমনই রীতি, এবং প্রীতিরও এমনই গতি ।

আমেরিকার প্রেসিডেন্সিয়ার থিয়োডোর পারকার পণ্ডিতের মধ্যে পণ্ডিত, বীরের মধ্যে বীর, এবং পরমার্থনিষ্ঠ সাধু-সমাজে পরমসাধু বলিয়া সর্বত্রই অসাধারণ পূজা পাইতেন । তাঁহার জ্ঞান-তৃষ্ণা প্রাচীন জ্ঞানিদিগের তত্ত্বসকলকে পঞ্চবিংশতি ভাষায় শোষণ করিয়াও অতৃপ্ত রহিত । ইতিহাসে ও দর্শনে এবং মূললিত সাহিত্যশাস্ত্রে তৎকালের কোন ব্যক্তিই তাহার সমকক্ষ ছিলেন কি না, সন্দেহ । কর্তব্যপারায়ণতার তিনি বজ্র হইতেও কঠোর এবং পূর্বত হইতেও অটল ছিলেন । গ্রন্থাদি লইয়া পরিশ্রমে তাঁহার এমন অভ্যাস ছিল যে, তিনি অধ্যয়নে নিরত অষ্টাদশ ঘটিকা নিবিষ্ট রহিলেও অধুমাত্র কাতরতা অনুভব করিতেন না । ইহার উপর আবার তিনি এমন বাগ্মী, এমন মূললেখক ছিলেন যে, যে কোন বিষয় তিনি স্পর্শ করিতেন, তাহাই তাঁহার শক্তির প্রভাবে সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি ধারণ করিত । কিন্তু আপনাতে আপনি অবস্থার পরিবার এ সকল মুখসামগ্রী স-

বেশ তাঁহার দয়া আর তাঁহার প্রীতি লোক-কানুরঞ্জে ও পরচিত্তবিনোদনে শারদ-শশীর জ্যোৎস্না এবং নিদাযকালীন সান্ধা সমীরণের ন্যায় ক্রীড়া করিত ; এবং যে একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, সেই তাঁহার মধুর হাসো, মধুর ব্যবহারে, মধুমাখা কথোপকথনে এবং মধু হইতেও মিষ্টতর সরস আহারে মোহিত হইরা, প্রথমদর্শন অবধিই আপনাকে তাঁহার জ্ঞানে তাঁহার ছায়ার পড়িয়া থাকিত । নগরের বালকরুন্দ, আপনাদিগের বাল-জন-মূলভ মুখহুংখের কাহিনী তাঁহার নিকট কহিতে পারিলেই আশ্বাসে অবশ হইত ; সরলস্বভাব যুবকযুবতীর মনে মর্ম্মবেদনা এবং অননুভূতপূর্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার জন্য, যেন আর স্থান না পাইয়া, তাঁহার নিকটে আসিত ; এবং চিত্তার কররেখার চিহ্নিত চিরজীবন-দগ্ধ রুদ্ধও তাঁহার নিকটে আসিতে পারিলেই অপার শান্তি লাভ করিত । লোকের মনোরঞ্জে এইরূপ ক্ষমতা সামান্য শক্তি নহে ; এবং যিনি ন্যায়ের লৌহবস্ত্র হইতে স্তম্ভিত না হইয়া এইরূপে লোকরঞ্জন করিতে পারেন, তিনিও সামান্য ব্যক্তি নহেন । তবে কথা এই, এই দুই ধূল রক্ষা করিতে গিয়া কৃতকার্য হওয়া ইহ জগতে কয়জনের সাধ্যায়ত ?

লোকের প্রতি অথবা লোকসমষ্টি-স্বরূপ মানবজাতির প্রতি ক্ষণাত তত্ত্ববশতঃ যে লোকরঞ্জন, তাহা পাপ কিংবা

পাণের সহিত কোনরূপে সংশ্লিষ্ট হওয়া  
দূরে থাকুক, তাহাই পুণ্যের প্রাণ। তা-  
দৃশী লোকপরায়ণতাকে লোকসেবার  
বলিলেই বোধ হয় অধিকতর সংগত হয়।  
ভক্তিতে তাহার আরম্ভ, বিবেক ও প্রীতির  
পরিমিশ্রণে তাহার পুষ্টি এবং ভক্তনার  
তাহার শেষ। তাহাতে পূর্ণমাত্রায় আ-  
ত্মোৎসর্গ হয়, অথচ আত্মার স্বাভাবিকতা ও  
স্বাধীনতা অগ্রমাত্রায়ও স্পষ্ট কি বিনষ্ট  
হয় না, এবং লোকরঞ্জনের জন্য হিতকর  
ও প্রীতিকর উভয়বিধ কার্যই সর্বপ্রযত্নে

অনুষ্ঠিত হয়, অথচ লোকসংস্কার, লোকভয়  
অথবা লোকিকবশঃস্পৃহাদি কিছুই অন্তঃ-  
করণে স্থান পায় না। ধনা তাঁহার, স্বাধার।  
এইরূপ লোকরঞ্জনমাত্রকে জীবনের একমাত্র  
ব্রত করিতে পারেন। ধনা তাঁহার, স্বাধার।  
মনুষ্যের পদতলে পড়িয়া রহিয়াও আপনায়  
মনুষ্যত্বকে সর্বতোভাবে অক্ষত রাখিতে  
সমর্থ হন। তাঁহার আগন্ত হইয়াও উদ্ভিষ্ট, হ,  
এবং উদ্ভিষ্ট হইয়াও অবনত। তাঁহারই  
মহাত্মা, তাঁহারই প্রকৃত মনুষ্য, এবং তাঁ-  
হারই মানুষ-শক্তির দেবক ও সহায়।



## চন্দ্রগ্রহণ।

( ১ )

নিম্নিতা জগতী গভীর রজনী ;  
নির্ঝাত নিম্পন্দ প্রকৃতি নিরব ।  
সহসা জাগিয়া শুনি ছলুধনি ।  
ঘোর লটা রোলে শঙ্খ ঘণ্টারব ।  
তাসহ মিশিয়া উচ্চ হরিধ্বনি,  
রহিয়া রহিয়া হতেছে ঘন ।  
শয্যা পরিহারি উঠি অনুমানি,  
ভাবিযু কি হেতু উৎসব হেন ?  
নিরামন্দ বঙ্গে আনন্দ কেন ?

( ২ )

পলাসী-প্রাঙ্গণে চির রাহুযুখে,  
বজ্রের সৌভাগ্য-শশী কবলিত ।  
ভাসি অন্ধনীরে সিংহলাভিযুখে

গিয়াছে জীমন্ত জনমের মত ।  
পুন কি সে শশী হইল উদয় ?  
পুন কি জীমন্ত আসিল দেশে ?  
নহিলে এ বস্তু কেন হর্ষময় ?  
মৃত প্রাণ বঙ্গ জর্জরিত নিমেষ ;  
সে বিব হইল—চেতাইল কি সে ?

( ৩ )

সহসা বাহিরে করিযু গমন,  
প্রহণের কথা পড়িল মনে ।  
রাহু যুখে চাঁদে করিযু দর্শন,  
কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিছে সঘনে ।  
নীচ হস্তে দেখি মহত লাঞ্জন,  
বিবাদে রজনী হুয়েছে মলিন ।  
কিন্তু বজ্রবাণী হরষে মগন !



বন্ধে কি মহত্ব হয়েছে বিলীন !

হায় বঙ্গবাসী এতই কি হীন ?

( ৪ )

ধনা ! নিশাপতি তুমিই মহান !

আপনি বিপদে হইয়া পতিত ;

পরের করিছ মঙ্গল বিধান ;

বন্ধে পুণ্যরাশি করিছ সঞ্চিত ।

বুঝিছু বুঝিছু বুঝিছু কারণ,

রুখা নিন্দা করি বঙ্গবাসীগণে ।

শশাঙ্ক-শিবার্থ ধন বিতরণ

করিছে ভিখারী, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণে ।

কর 'মুক্তি' বাঞ্ছা কর কায়োমনে ।

( ৫ )

নিম্বার্থ হৃদয়ে যদি পরহিত

এরূপে নিয়ত পার করিবার ;

হইবে জগতে যশ বিধোষিত ;

বন্ধের সৌভাগ্য ফিরিবে আবার ।

তোমাদের পুণ্যে বঙ্গ-সুখ-শশী

দ্রঃখ-রাজ মুক্ত হউক দ্বরিত ;

আঘাত করিয়া পুণ্য তীক্ষ্ণ অসী

রাজ-দম্ভা-শির কর দ্বিখণ্ডিত ;

ধরম-বীরত্ব হউক ধ্বনিত ।

( ৬ )

অই দেখ রাজ চণ্ডাল তত্ত্বর

পরাতুত হয়ে, করিছে প্রস্থান ।

রাজমুক্ত-শশী পুন স্নিগ্ধকর

কৌমদী জগতে করিতেছে দান ।

দেও হরি ধনি, কর জলুরব ;

ঘোর বোল কর শঙ্ক ঘটা মাদ ।

রাজমুক্ত হলো রজনীবান্ধব,

যামিনী সতীর ঘুচিল বিষাদ ।

মহতের জন্মে কার না আত্মদ ?

( ৭ )

হে শশী, তুমিত মুকতি পাইলে ;

বিপদ হইতে পাইলে উদ্ধার ।

পুনশ্চ জগতে সুখা বরষিলে,

নিশিসহ মুখে হাসিলে আবার ।

কিন্তু এ বন্ধের মুখ-শশধর,

যে বিষাদ-রাজ করিল গরাস ;

গত হলো কত মাস সম্বৎসর,

আর না সে শশী হইল প্রকাশ !

এ গ্রহণস্থিতি রবে বার মাস ?

শ্রীজ—

## ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশ \*

উনবিংশ শতাব্দী ( The Nineteenth Century ) নামক একখানি প্রথম শ্রেণীর সাময়িক পত্র, অষ্ট দিবস হইল লণ্ডন হইতে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ লেখক জেমস্ নোলস্ ইহার সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াছেন; রাজকবি টেনিসন্ ইহার আগমনী গাইয়াছেন; গ্লাডস্টোন ও ওয়াটসন্, কার্ডিনাল ম্যানিং ও ম্যাথিউ আর্নল্ড প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ এবং লেখক চূড়ামণিগণ ইহার নেতা হইয়াছেন। আমরা ভরসা করি যে, “পাক্ষিক” ও “সমসাময়িক” সমালোচন ঘরের প্রতিযোগী “উনবিংশ শতাব্দী” অচিরে উহাদিগের সমকক্ষ হইবে।

সারজন লুবকের নাম বোধ হয় অনেকেই শ্রবণ করিয়াছেন। ইনি ইংলণ্ডের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক, বক্তা এবং পার্লিয়ামেন্টের সভ্য। “উনবিংশ শতাব্দীর” প্রথম সংখ্যায় সারলুবক, ইংলণ্ডের উপনিবেশিক রাজনীতি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকটিত করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

ইংলণ্ডের বর্তমান কোন সুপ্রসিদ্ধ

বাগ্মী বলিয়াছেন যে, “আমরা আমাদের দিগের দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়া, অধিসভা, বিজিত রাজ্যসমূহের প্রতি যে নীতির অনুসরণ করি, অতুলশক্তিবৈভাবে প্রমত্ত হইয়া যেভাবে তাহাদিগকে ক্রীড়নকের ন্যায় ব্যবহার করি,—সময়ে সময়ে তাহা অন্ধ স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে।” এই মর্যাস্তিক আঘাতে জর্জরিত হইয়া, জাতীয় চরিত্রের এই কলঙ্ক অপনয়নার্থ লুবক, ইংলণ্ডীয় অনুদূর্ত রাজনীতির সমর্থন করিয়াছেন; এবং যে নীতিমূত্র অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ, কানেডা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সুরহৎ রাজ্যসমূহ শাসন করিতেছেন, তিনি তাহার সারবত্তা দেখাইতে যত্নপর হইয়াছেন। আমরা অদ্যকার এই প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, অন্যান্য উপনিবেশের সহিত তুলনা করিলে, ভারতে অনুষ্ঠিত ইংরাজ রাজনীতি সর্বথা উদার নহে।

ভারতবর্ষকে প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের উপনিবেশ বলা যাইতে পারে কি না, প্রস্তাবের প্রারম্ভেই আমাদের দিগকে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে। কানেডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতিকে আমরা যে ভাবে ইংল-

তীয় উপনিবেশ বলিয়া নির্দেশ করি, ভারতবর্ষকেও কি তাহাই বলিব ? আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ভূখণ্ডে যে সকল ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত আছে, তাহার প্রায় সকলগুলিই ইয়ুরোপীয়দিগের আগমন কালে, জনমানব সমাগমশূন্য বিজন অরণ্যমণী অথবা অসভ্য আদিম অধিবাসিদিগের সংখ্যা এত হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে যে, বর্তমান লোক সংখ্যা গ্রহণ করিলে, উহার সর্বথা উপেক্ষণীয় হইবার যোগ্য। এই সকল স্থানে বিদেশীয় লোকের সংখ্যাই অধিক, অথবা বিদেশীয়েরাই এখন এই সকল স্থানের প্রকৃত এবং স্থায়ী অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেন্টে, এমিগ্রেশন প্রথার অনুমোদন এবং প্রবর্তন করিয়াই এই সকল স্থলে অধিবাসীর সমাবেশ করিয়াছেন। গবর্ণমেন্টই এই সকল রাজ্যের বীজবপন এবং উহাতে জন সেচন করিয়াছেন। বাস্তবিক এই সকল রাজ্য গবর্ণমেন্টকর্তৃকই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই প্রতীত হইবে যে, বিভিন্ন প্রদেশ হইতে লোক সংগ্রহ করিয়া জনপ্রাণীহীন নির্জন প্রদেশে বহুজনসমাকীর্ণ গ্রাম নগর চত্বর প্রতিষ্ঠা করা বহু ব্যয় এবং প্রাণাৎ অথবাসায় সাপেক্ষ। আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়াতে স্বল্প সময়ে যুগসাধ্য, অভাবনীয় যে সকল পরিবর্তন

সংঘটিত হইতেছে, তাহাতে সহসা বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহস হয় না। এখন দেখা যাইতেছে যে, যদি আমরা উল্লিখিত রাজ্যসমূহকে উপনিবেশ বলিয়া নির্দেশ করি, তাহা হইলে সে অর্থে ভারতবর্ষকে কখনও ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ বলিতে পারি না। এখানে ইংরেজ বসন্তের কোকিল। পাঁচ, দশ, উর্দ্ধ সংখ্যা পনের বৎসর এখানে অবস্থান করিয়াই ইংরাজ স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। স্থায়ী ইংরাজ এখানে একজনও দৃষ্ট হয় না। এদেশকে স্বদেশ বলেন, খেতশরীরে এমন একটি লোকও এখানে বিন্যাস্য নাই। তবে ভারতকেও কি উপনিবেশ বলিয়া নির্দেশ করিব ?

উপনিবেশ নিচয়ের সাহায্যার্থ ১৮৫৯ অব্দ হইতে ১৮৬৯ অব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ড সর্বশুদ্ধ ৪১০০০০০০০ এক চল্লিশ কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন ; অর্থাৎ সাংকল্যে প্রতিবৎসর ৪১০০০০০০ চারি কোটি দশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। তাহার পর

১৮৭০ সালে ২২৭৩৫১৮০০ টাকা

১৮৭১ ,, ২২২৮১০৪০ ,,

১৮৭২ ,, ১৯১১০০৭০ ,,

১৮৭৩ ,, ১৮১৭৪৭১০ ,,

খরচ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে ইংলণ্ড যে ভারতবর্ষের জন্য একটি মুদ্রাও নিজ কোষাগার হইতে প্রদান করিয়াছেন, এমন দৃষ্ট হয় না। সারলুবকও এই সমস্ত অর্থ হইতে ভারতের জন্য কিছু ব্যয়

হইয়াছে কি না, তাহার উদ্দেশ্য করিতে পারেন নাই । বিগত ২৪ শে জুলাইর 'ইংলিশম্যান' নামক সংবাদপত্র দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইংলণ্ড সাধারণ ধনাগার হইতে ভারতবর্ষের উপকারার্থ এপর্যন্ত একটি পয়সাও ব্যয় করিলেন না । কিন্তু আমরা অবগত আছি যে, ১৮৬৭, ১৮৬৮ এবং ১৮৬৯ অব্দে প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের হিসাবে গড়ে ৬৭৫০০০০০ ছয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিয়াছেন \* । ১৮৬৯ সালের পর হইতে ইংলণ্ড, ভারতসংক্রান্ত ব্যয়-নির্বাহার্থে প্রতি বৎসর কত টাকা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিশ্বাসজনক প্রমাণ এপর্যন্ত আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই । কিন্তু প্রতিবর্ষেই যে উহা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার প্রয়োজনও কারণ নাই । সংবাদ পত্রের জনশ্রুতিতে বিশ্বাস করিলে, ইংলণ্ড হোম গবর্ণমেন্টের ব্যয়ের নিমিত্ত প্রতি বৎসর ১০০০০০০০ তের কোটি মুদ্রা গ্রহণ করিয়া থাকেন । এই সমস্ত টাকা নির্ধারিত সময়ে নিঃশেষিত হয় না । উদ্ধৃত অর্থ ইংলণ্ডে গচ্ছিত থাকে ।

সারলুবক বলেন যে উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের দেওয়ানী আদালতে আপীল

\* Indian Politics by George Chesney ; First edition, page 451, 'These sums include the money spent on stones,

করিতে পারে । সেখানে প্রীভিকাইন্স-সিল রহিয়াছে, তাহার ব্যয় কোন উপনিবেশকেই প্রদান করিতে হয় না । ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সহিত ইংলণ্ড নিজ বায়ে যে সকল সৌহার্দ সংস্থাপন করিয়াছেন ; ভিন্ন ভিন্ন রাজসভায় ইংলণ্ড নিজ বায়ে যে সমস্ত এজেন্ট, রেসিডেন্ট কিংবা কন্সল নিযুক্ত রাখিয়াছেন, উপনিবেশগুলি বিনা বায়ে তাহার ফলভোগ করিতেছে । ইংলণ্ডীয় উপনিবেশিক আফিসের ( The Colonial Office ) ব্যয় কোন উপনিবেশকেই প্রদান করিতে হয় না । এখন দেখা যাউক, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই সকল কথা কতদূর যথার্থ ।

সার লুবক আপনিই স্বীকার করিয়াছেন, চীনদেশে যে ইংলণ্ডীয় রাজদূত আছেন, তাহার ব্যয় ভারতবর্ষ হইতে নির্বাহিত হইয়া থাকে । আমরা জিজ্ঞাসা করি, পারস্য, জাঞ্জিবার এবং এডেন প্রভৃতি স্থলে যে সমস্ত এজেন্ট কিংবা কন্সল নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের ব্যয়ভার ইংলণ্ডকে, না ভারতবর্ষকে বহন করিতে হয় ? সময়ে সময়ে আফ্রিকা কিংবা আসিয়ার কোন রাজ্য ইংলণ্ডে গমন করিলে, তাঁহার সম্মানার্থে যে সমস্ত অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে, তাহা ভারতের ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করা ন্যায় শাস্ত্রের কোন সূত্রানুযায়ী, বলিতে পারি না । আর আফ্রিকার অসভ্যদিগের সহিত ইংলণ্ডীয় সংগ্রামের ব্যয় ভারতই বা ভারতবর্ষ কেন বহন করে, তাহ

কে বলিবে? পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, উল্লিখিত বর্ষত্রয়ের প্রতি মাসে ইংলণ্ড, ভারতবর্ষের ৫০০০০০০ পঞ্চাশলক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় করিয়াছেন, এবং এই টাকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। অন্যান্য উপনিবেশ হইতে কিছুই প্রেরিত হয় না এবং ভারতবর্ষ ব্যয়ের টাকা প্রদান করে না, এ কথা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। সংবাদ পত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়, এবার হোম গবর্নমেন্ট খরচের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে এক খণ্ড বজ্রের নৌকা ভাড়া এবং পাথের ২০০০ হুই সহস্র টাকা লাগিয়াছে!

ভারতবর্ষ, চীন দেশস্থ ইংরাজ কনসলের ব্যয় বহন করে; এখন দেখা যাউক অন্যান্য উপনিবেশ, ভিন্ন দেশের ব্যয় ভার গ্রহণে কতদূর আশ্রয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ১৮৭৪ সালে দেশীয় লোকদিগের প্রার্থনানুসারে এবং অষ্ট্রেলিয়ার আবদ্ধ ইংলণ্ড, ফিজী দ্বীপপুঞ্জের শাসন ভার গ্রহণ করেন। ফিজী দ্বীপ নিত্য ক্ষুদ্রকার্য, এবং দুর্বল শরীর, স্বকীয় ব্যয় ভারবহনে সমর্থ হইল না। সুতরাং ইংলিশ পার্লামেন্ট ১৮৭৫ সালে ৪০০০০০ চারি লক্ষ এবং ১৮৭৬ সালে ৩১০০০০ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা ইংলণ্ডের খনাগার হইতে প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন। অষ্ট্রেলিয়া, চারি প্রধান উপনিবেশে বিভক্ত। লর্ড কারনয়ারডন, উহার জন্য এই উপনিবেশ চতুষ্টয়ের প্রত্যেক হইতে প্রতিবর্ষে

৪০০০০ চারি সহস্র মুদ্রা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পাঠক, বিশ্বাস করিবে? নিউজিল্যান্ডের প্রধান কর্মসচিব উত্তর দিয়াছেন যে “মুক্তহস্ত হওয়া কোন গবর্নমেন্টেরই কর্ম নহে,” “ফিজী দ্বীপপুঞ্জ ইংলণ্ডের অধীন হওয়াতে নিউজিল্যান্ডের অনেক লাভ আছে বটে, কিন্তু ইংলণ্ডের লাভের নিকট নিউজিল্যান্ডের লাভ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর \*।”

এখন আরলণ্ড সম্বন্ধে গুটীকত কথা বলা আবশ্যিক। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে আইরিস সভা আছেন। সুতরাং আরলণ্ডের আভ্যন্তরিক শাসনের ভার শুধু ইংরাজের হস্তে নহে। আরলণ্ড সহযোগীভাবে ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা। সুতরাং ভারতবর্ষ এবং আরলণ্ডের অবস্থা সর্বদাশে বিভিন্ন। ১৮২২ সালে আলুর ফসলের সাতিশয় ক্ষতি হওয়াতে আরলণ্ডে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। পার্লামেন্টে, সাধারণ কোবাগার উদ্ভুক্ত করিয়া আরলণ্ডের সাহায্যার্থ ৩০০০০০ ত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করেন। এই উত্তর রাজ্য একত্র সম্মিলিত এবং উভয়ের আয় এক ধনাগারে গচ্ছিত থাকে। সুতরাং একের ক্ষতি হইলে, অন্যের তাহা পূরণ করিতেই হইবে। এই দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ইংলণ্ড উক্ত টাকা ব্যতীত আরও ২৬০০০০০ ছাশি লক্ষ টাকা চাঁদা করিয়া দিয়াছি-

\* The Nineteenth Century no. I. vol, I, p. 41-42.

লেন। তাহার পর ১৮৪৫ সালে উক্ত কারণে পুনর্ব্বার তথায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এবার উহা ১৮৪৭ সাল পর্য্যন্ত প্রবল থাকে। এডিনবরা রিভিউ অনুসারে, সমগ্রদেশব্যাপি দুর্ভিক্ষ দমনের এমন মহৎ চেষ্টা আর ভূমণ্ডলে কল্পিত কালেও হয় নাই। এবার ইংলণ্ড চাঁদা করিয়া ৩৬০০০০০ ছত্রিশ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। উহা বাতীত গবর্ণমেন্ট ৯৫০০০০০০ নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ধার দিবার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। গবর্ণমেন্ট প্রতিদিন ত্রিশ লক্ষ লোকের আহার যোগাইয়াছেন। ইংলণ্ড প্রথমে আশা করিয়াছিলেন যে, সাধারণ ধনাগার হইতে যে টাকা প্রদত্ত হইল, আরলও তাহা একদিন পরিশোধ করিবে। কিন্তু ১৮৫৩ সাল পর্য্যন্ত আইরিশদিগের কটের শমতা হইল না। সুতরাং আবার সেই সালে ৪৫০০০০০০ চারি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আরলওকে এক কালীন প্রদান করেন। \* এই সমস্ত অলোকবিত্ততদয়ার কার্যো জগৎ ভরিয়া ইংলণ্ডের সুখ্যাতি হইয়াছে; এবং ইংলণ্ড এই খ্যাতি লাভের উপযুক্ত কার্য্যও করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষেও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। ১৭৭০ সালের ভয়ানক দুর্ভিক্ষে বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ লোক কালগ্রাসে পতিত হয়। যাহা

\* The Nineteenth Century no, 1, vol, I. p. 46.

হউক, সে সময়ে ইংরাজ বঙ্গদেশের মৃতন অবিপত্তি; সুতরাং এই সকল লোকের মৃত্যুর জন্য তিনি দায়ী হইতে পারেন না।

তাহার পর উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ। এবারও কি বলিব যে, সহস্র সহস্র লোকের অকাল, ও অনাহারমৃত্যুর জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট নিন্দনীয় নহেন? সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিল, চতুর্দিকের হাহাকার রবে গগন বিদীর্ণ হইল; পিতা, পুত্র নিসর্জন করিয়া, দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিল; মাতা মায়ার দুঃশ্বেদাবন্ধন ছিন্ন করিয়া, শিশু পুত্রকন্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং জীবন রক্ষায় সচেষ্ট হইল; রক্তপিতা মাতা অনন্ত শযায় শয়ন করিল; বালক-বালিকা, যুবকরক্ত কাক, কুকুর ও শৃগালের আহারীয় হইল; ক্ষেত্রের শস্য, রন্ধের পত্র, মাঠের তৃণ,—অগ্নি মূল্য—দুস্ত্রীপা হইল;—তখনও কি বলিব যে এই অদৃষ্টের অশ্রুতপূর্ব্ব ভয়াবহ, শোচনীয় দৃশ্যের জন্য ব্রিটিশগবর্ণমেন্ট নিতান্ত নিগ্রহনীয় নহেন? যে ইংরাজ জাতি আইরিস দুর্ভিক্ষের জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অকাতরে ব্যয় করিলেন, স্বর্ণসিংহাসনাক্রান্তা মহারাজী হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ কাগাবাসী পর্য্যন্ত যাবতীয় লোকের ব্যয় সঙ্কোচিত করিয়া, আইরিস জাতির সাহায্যের জন্য মুদ্রা সংগ্রহ করিলেন; সেই ইংরাজ জাতি—উড়িষ্যার হৃদয়ভেদী আত্মনাশ, যমুঘুর কাতর-চীৎকারধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোন্ প্রাণে বধিরপ্রায় নিকন্তর রহিলেন? “উড়িষ্যা

বহুদূরস্থ ” এই যৎসামান্য উত্তরে ইংরাজ জাতির মস্তকহইতে যুগচেষ্টায় অনপনয়, দুর্স্বার্থ্য কলঙ্ক কখনও অপনীত হইবে না। সমস্ত সভ্যজগৎকর্তৃক তুরি তিরস্কৃত হইয়া ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের শিক্ষা লাভ হইল, কিন্তু ইংলণ্ডের চেতনা হইল না। বেহারের দুর্ভিক্ষ আসিল। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট এক যুদ্ধার স্বলে শত যুদ্ধা ব্যয় করিয়া উহার শমতার পক্ষে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন; পরিণামে ঐ চেষ্টার ফলও ফলিল। কিন্তু অগণিতসংখ্যক যুদ্ধার অনর্থক ব্যয়ের নিমিত্ত কেহই দায়ী হইলেন না। পরিশেষে মাস্ত্রাজ এবং বোম্বাইর বর্তমান দুর্ভিক্ষে দুচারি জন ইংরাজের দয়া হইয়া থাকিলেও গবর্ণমেন্ট নীরব। কোন দিনও শুনিতে পাইলাম না যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট স্বকীয় ফুবেরের ভাণ্ডারহইতে ভারতবর্ষের উপকারার্থ, উদ্ধারার্থ একটি কপর্দকও প্রেরণ করিলেন। বরং যখন দৈবদুর্ভিক্ষপাকে সলিল ও অনিলাড়ঘরে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ নরনারী অকালে কালকবলিত হইল; যখন মাস্ত্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে সহস্র সহস্র লোক অনাহারে, অসুখ-হারে জীবন বিসর্জন করিতে লাগিল; যখন গবর্ণমেন্ট রাজ্যের ব্যয়লাঘব করিয়া প্রজার জীবনরক্ষায় সচেত হইবেন বলিয়া সকলে অলীক আশার মোহমত্তে মুগ্ধ হইতেছিল; তখন লক্ষ লক্ষ যুদ্ধা ব্যয়িত করিয়া, বিশাল আড়ম্বরে, সমপ্রভারতে

বিজয়ভেরী বিজয়দ্রুমুড়ি নিনাদিত করিয়া, ইন্দ্রপ্রস্থের পূর্ণক্ষেত্রে ইংলণ্ডের একচক্রবর্তিৎ সংঘোষিত হইল। জীর্ণ-এম্বি-মণ্ডলপ্রাস্তে দরবিগলিত অক্ষুধারা মুছিয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণায় অস্থিরা, ব্যাধিপ-রিক্রিষ্টা ভারত, শীর্ণবাহু উত্তোলন করিয়া “মাতঙ্গর্যতু, জয়তু” বলিয়া ভারতেশ্বরীকে আশীর্বাদ করিল \*।

সার লুবক বলেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ব্যয় নির্বাহার্থ ভারতবর্ষকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কিছুই প্রদান করিতে হয় না। ইংলণ্ড নানা বিষয়ে যে প্রভূত অর্থ ব্যয় করেন, তাহাতে বহু উপরুত হইয়াও ভারতবর্ষ অস্বাভাবিক উপনিবেশের জায় কিছুমাত্র অনুকূল্য করে না। ইংলণ্ডীয় কোন ক্রমক কি করপ্রদাতা, ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীন বলিয়া একটি পয়সারও মূল্য: সাহায্য প্রাপ্ত হয়-

\* গবর্ণমেন্ট বলিতে পারেন যে, বর্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য ইংলণ্ড লোম খুলিয়া ভারতবর্ষকে অনেক টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। কিন্তু উপনিবেশের জন্য লোন খোলা ইংলণ্ড এই প্রথম কিম্বা তৃতীয় করেন নাই। সার লুবক যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, ১৮১৫ সাল হইতে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত ইংলণ্ড ৭৮৯০০০০০ সাত কোটি আট লক্ষ নব্বই সহস্র টাকা উপনিবেশগুলিকে প্রদান করিয়াছেন। এই তালিকায় ভারতবর্ষের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

না ; কিহা সেই কারণে রাজকোষে এক পয়সাও হান রাজস্ব প্রদান করে না । সার লুবকের এই উক্তি দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । প্রথমতঃ ভারতবর্ষ নিতান্ত অকৃতজ্ঞ ; ইংলণ্ড হোমচার্জ যে টাকা ব্যয় করেন, ভারতবর্ষ তাহার সাহায্য করে না ; অথচ তাহা হইতে যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হয় । দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষ বিজিত দেশ ; ইংরাজের অধীন । কিন্তু ইংলণ্ডের ধনাগারে রাজস্বস্বরূপ এক পয়সাও দিয়া থাকে না । প্রথম উক্তি যে নিতান্ত অযুক্ত, অগ্রহা এবং অবজ্ঞের তাহা বলা বাহুল্য । প্রতি বৎসর অজস্রধারে কোটি কোটি টাকা প্রদান করিয়াও যদি কিছু মাত্র না দেওয়ার অপযশের ভাগী হওয়া যায়, তাহা হইতে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? আমরা ইহার উত্তরে ইতিপূর্বেই যথেষ্ট বলিয়াছি । যে তিন বৎসরের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, ইংলণ্ড প্রতিমাসে ৫০০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । এবং এই সমস্ত অর্থ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে । যদিও এই অর্থের কিয়দংশ ভারতবর্ষের স্থানীয় ব্যয়ে প্রযুক্ত হইয়াছে; তথাপি স্পষ্ট দেখা গাইতেছে যে, ভারতবর্ষের জন্য ব্যয়িত টাকা ইংলণ্ড নিজ হইতে কদাপি প্রদান করেন নাই । নিঃস্বার্থ উপকার ইংলণ্ড, অন্যান্য উপনিবেশের প্রতি করিতেছেন; কিন্তু ভারতবর্ষের প্রতি নহে ।

দ্বিতীয় উক্তিটি বিশেষ বুদ্ধিসত্তার সহিত লিখিত হইয়াছে । ভারতবর্ষ অন্যান্য বিজিত দেশের ন্যায়, ইংলণ্ডের ধনাগারে রাজস্ব প্রদান করে না । ইংলণ্ডীয় লোক, ভারতবর্ষ হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন উপকার প্রাপ্ত হয় না । ভারতবর্ষ শাসনের মূলমন্ত্র এই যে, ' ভারতবর্ষের টাকা শুধু ভারতবর্ষের জন্যই ব্যয়িত হইবে । ' ১ আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইলাম যে, এই মূলমন্ত্রের উল্লেখ করিয়াও সার লুবক, ভারতবর্ষ কর দেয় না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন । প্রাচীন গ্রীশ-রোম প্রভৃতি রাজ্য সকল অধীনস্থ উপনিবেশ নিচয় হইতে কর গ্রহণ করিত । কিন্তু যে সময়ে ঐ সকল কর গৃহীত এবং প্রদত্ত হইত, সে সময় বহুকাল হইল অতীত হইয়াছে । তখন ইংরাজ স্বাক্ষরকোটের বাস করিতেন, বস্কল পরিধান করিতেন, এবং তীরধনুদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন । এখন আর সে দিন নাই । উনবিংশ শতাব্দী অতীত হইতে চলিল । যদি রোমগ্রীশ এবং বর্তমান ইংলণ্ড; খৃষ্ট জন্মের বহুপূর্বসময় আর উনবিংশ শতাব্দীতে কোন প্রভেদ না থাকে, তবে বর্তমান কালের সভ্যতা, ভাবা, নবাবতা আর পুরা কালের মুখতা, বন্যতা, ও স্থিরতা প্রভেদ কি ? কিন্তু রাজীকুললমামৃতভিক্টোরিয়ার এমত অভিলাষ নহে যে, ভা-



রতবর্ষ, ইংলণ্ডকে কর প্রদান করে। দ্বিপ-  
ক্ষাংশে প্রকরণে আদিত্য হইয়াছে, “যদি  
কোন স্থলে এমত বোধ হয় যে, ভারত-  
বর্ষের আগের টাকা ভারতবর্ষের ন্যায্য-  
বায় ভিন্ন, অন্য কোন বিষয়ে ব্যয়িত হই-  
য়াছে, তাহা হইলে অভ্যুতর উক্ত বিষয়  
বিশদ করিয়া উল্লেখ করিবেন; ভারত  
বর্ষের টাকা শুধু ভারতবর্ষ শাসনের নিমি-  
ত্বে ব্যয় হইবে।” ভারতবর্ষের টাকা কি  
প্রকারে ব্যয় করিতে হইবে, তাহার এই  
স্পষ্ট নির্দেশ রহিয়াছে। ইংলণ্ডের এই  
ঐদার্য্য ভারত কখনও ভুলিবে না, ভারত-  
বাসী এ বিষয়ে ইংলণ্ডের এই স্বার্থশূন্যতা  
স্মরণ করিয়া চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিবে।

‘অতঃ’ কিম্বা ‘সাক্ষাৎ সবন্ধে’  
এই কথাটি ব্যবহার করিয়া সার লুবক  
সাধারণের চক্ষে মুক্তি মুক্তি ধূলি নিক্ষেপ  
করিয়াছেন। আমরা এই মাত্র বলিতে  
পারি যে, ভারতবর্ষ লাভ করিয়া ইংরেজ  
যে রূপ সহস্র প্রকারে উপকৃত হইয়াছেন,  
ইংলণ্ডের আর সকলগুলি উপনিবেশ একত্র  
করিলেও তাহার সমান হইবে না। ভা-  
রতবর্ষীয়দিগের নিকট ইংলণ্ড সংবৎসরে  
২৫০০০০০০০ পঁচিশ কোটি টাকার  
পণ্য বিক্রয় করেন, এবং প্রতিবর্ষে বার  
পর নাই অল্প মূল্যে ৩০০০০০০০ ত্রিশ  
কোটি টাকার ভারতবর্ষীয় অব্যজাত ক্রয়  
করিয়া থাকেন। ১ এখন দেখা যাউক,

আজ যদি ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের হস্তবহি-  
ভূত হয়, এই ত্রিশ কোটি টাকার বাণিজ্য  
দ্রব্য, বিশেষতঃ এত অল্প মূল্যে, ইংলণ্ড  
কোথায় পাইবেন? আর প্রতি বৎসর  
ভারতবর্ষ যে পঁচিশ কোটি টাকার ইংল-  
ণ্ডীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে এই  
সমস্ত দ্রব্য ইংলণ্ড কোথায় চালাইবেন?  
এমন অবস্থা উপস্থিত হইলে, মানচেস্টার,  
লিভারপুল, গ্লাসগো এবং দৈনন্দিন অপরা  
পর সমস্ত স্থান একেবারে উৎসন্ন হইবে;  
এবং মেপোলিয়ন কর্তৃক সম্যক অভিহিত  
এই বণিক জাতির গৌরব চিরকালের  
তরে অন্তর্মিত হইবে। ভারতবর্ষ আজ  
কালি কৌশলচালিত কয়েকটি তত্ত্ব ব্য-  
বহৃত হইতেছে; এই সকল তত্ত্ব মানচে-  
স্টারের চক্ষুঃশূল হইয়াছে। ভারতবর্ষ  
যদি আপনার বস্ত্র আপনি বয়ন করিতে  
আরম্ভ করিল, তাহা হইলে বিলাতি তত্ত্ব-  
বায়ের উপায় কি? নতরায় তুলার শুল্ক  
উঠাইয়া দাও। এই শুল্ক থাকিতে ভারত-  
বর্ষের দুইটি লাভ আছে। প্রথমতঃ, উ-  
হাতে ভারতের কএক কোটি টাকা আয়  
হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ যে রূপ নির্ধন  
দেশ, তাহাতে এই কয়েক কোটি টাকা  
তাহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। মহাত্মা  
লর্ডনর্থব্রুক এই কারণ বশতঃই সেবার তু-  
লার শুল্ক রহিত করেন নাই। সে দিন তুলা  
ব্যবসায়ী একজন বিলাতি বণিক লজ্জা  
দূরে পরিভাগ করিয়া অনায়াসে বলিলেন  
যে ‘ভারতবর্ষের আর কম হউক, তাহাতে

1 Catechism of the Indian situation, an  
article of the Vanity, fairquoted in the  
Indian Mirror of the 6th June, 1877,

আমাদের কি ? আমাদিগের ইচ্ছানুরূপ, লাভ না হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টে তজ্জনা অবশ্য দায়ী । ” দ্বিতীয়তঃ, এই শুল্ক থাকিতে বিলাতীয় বস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে । সহসা হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগেরই ক্ষতি ; যে কাপড় দুই টাকা মূল্যে ক্রয় করা যাইতে পারিত, এই শুল্ক থাকিতে তাহা তিন টাকা মূল্যে ক্রয় করিতে হয় । কিন্তু একটুকু অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, এই শুল্ক দ্বারা ভারতের যথেষ্ট লাভ হইতেছে । উহা বর্তমান থাকিতে, বিলাতীয় বস্ত্র সমূহ অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতেছে । দেশীয় লোকের যত্নে এখন বোম্বাই প্রভৃতি ভারতবর্ষের কতিপয় স্থানে বস্ত্র বয়ন যন্ত্র সংস্থাপিত, হইয়াছে । বলা বাস্তব্য, এই সমুদায়, স্থানে যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে, সম্মুখিতে তাহার খরচ অনেক অধিক পড়িয়া থাকে । যদি এই শুল্ক উঠিয়া যাইয়া বিলাতি কাপড় আরও স্বল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা হইলে দেশীয় বস্ত্র বিক্রয় একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে । ভারতবর্ষ পরমুখপ্রেক্ষী । স্বল্পমূল্য বিলাতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আয়র্লণ্ড বাসী গণ সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,

যে, যত দিন পর্যন্ত ইংলণ্ড বাণিজ্য বিষয়ে আয়র্লণ্ডকে স্বাধীনতা প্রদান না করেন, ততদিন তাঁহারা ইংলণ্ডীয় কোন দ্রব্যই ব্যবহার করিবেন না ।

আজি মানচেষ্টারের ইচ্ছা স্বাধীন-বাণিজ্য প্রচার । মনুষ্য ঈশ্বরস্বর্গীয় স্বাধীন জীব ; সুতরাং স্বাধীনভাবে ব্যবসায় করিয়া সে যাহা লাভ করিবে, তাহাতে প্রতিবন্ধকতাচরণ কেন ? স্বাধীনতা প্রার্থনীয় ; তাই বলিয়া নিজীব মেঘপালের মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্রের স্বাধীনতা প্রদান সমিচীন বুদ্ধির কার্য্য নহে । স্বাধীন বাণিজ্য প্রচ'রের জন্য মানচেষ্টার আজি কালি এত ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানচেষ্টারই এই উদার নীতি স্বত্ব পাদন-লিত করিতে ক্রটি করেন নাই । উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে আয়র্লণ্ড যত কষ্ট ভোগ করিয়াছে, বোধ হয় পৃথিবীতে কোন যুগে কোন সভ্যদেশে এত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করে নাই । এই উক্তি যে অযথাচিত্রিত নহে, যাহারা ঐ সময়ের আইরিস ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাহারা ইহা সবিশেষ অবগত আছেন । উপস্থিত প্রস্তাবের সহিত আয়র্লণ্ডের তদানীন্তন অবস্থার কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই, সুতরাং আমরা তাহার বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব না । কেবল একটি মাত্র কথা উল্লেখ করিব । ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ দূরে থাকুক, বাণিজ্যের জন্য আইরিসগণ, লিনেন ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য

ইংলণ্ডেও প্রেরণ করিতে পারিত না ।

স্বাধীনবাণিজ্যের জন্য আয়লণ্ড এই সময় অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু চিরস্বার্থাক্ষ মানচেষ্টার এবং প্লাসগো প্রভৃতি তাহাতে সম্মত হইল না । আঙ্গ স্বাধীনবাণিজ্য প্রচারণের জন্য শুদ্ধ, শাস্ত, নিরীহ ভ্রমলোকের ন্যায় মানচেষ্টার এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু সে সময় আইরিস

দিগের প্রার্থনায় কর্ণপাতও করিত না !

\* কিন্তু আয়লণ্ড ত আর ভারতবর্ষ নহে । হেনরি ক্লড এবং হেনরি গ্রেটান আয়লণ্ডের প্রাতঃ স্মরণীয় নাম । ইহাদিগের প্রযত্নে অবশেষে আয়লণ্ডে এমন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং জাতীয় সৌহার্দ্য এত প্রবল হইয়া উঠে যে, ইংলণ্ড আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । অচিরে স্বাধীনবাণিজ্যে আয়লণ্ডের স্বয়ং সংস্থাপিত হইল । যে সমস্ত উপায় আলোচনা করিয়া আয়লণ্ড ইংলণ্ডের নিকট হইতে এই স্বাধীনতা গ্রহণ করে, তাহা তৎসাময়িক আয়লণ্ডীয় ইতিহাসে অদ্বার্য্যীয় । এখন দেখা যাইতেছে যে, বকব্রতী, বস্ত্রবিক্রেতা মাঞ্চেষ্টারের অন্ধ স্বার্থপরতা এই নূতন নহে † ।

\* The Leaders of Public Opinion in Ireland by Lecky, pp. 81-83.

† প্রবন্ধের এই অংশ লিখিত হইলে ষট্টাধের তাড়িত বার্তাবহে জ্ঞাত হওয়া গেল যে, পার্লামেন্টে অতি শীঘ্রই তুলার শুল্ক রহিত করিবেন, অঙ্গীকার করিয়া-

ইংলণ্ড আগতনে অতি ক্ষুদ্র স্থান ।

কিন্তু এই ক্ষুদ্র স্থলে লোকের এত ঘন সমাবেশ যে, অবকাংশকেই রাজকীয় পদের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে হয় । গবর্ণমেন্ট এত চাকুরী কোথা হইতে যোগাইবেন ? কিন্তু এই চাকুরীর অভাবই ইংলণ্ডের গৌরবের প্রভাব । ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায় গবর্ণমেন্টের মুখপ্রক্ষী হইলে ইংরাজ

জাতি আজিও সভ্য জগতের অপস্তুত পদবীতে বিচরণ করিতেন । চাকুরীর আশায় বঞ্চিত হইয়া অধিকাংশ লোকেই

স্বাধীন ভাবে জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বন করে । সুতরাং শিল্প শাস্ত্রের যথেষ্ট অনুশীলন এবং বাণিজ্যের ভূয়সী উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে । কেবল বাণিজ্যের প্রভাবই ইংলণ্ডের এত সম্মান, এত গৌরব, এবং এত প্রতাপ । কৌশল প্রয়োগ পূর্বক বাণিজ্য অবলম্বন করিলেই তদুপযোগি ত্রব্যসামগ্রীর প্রয়োজন হয় । কিন্তু ইংলণ্ডে তাহা উৎপন্ন হয় না, যাহা হয় তাহাতে প্রকট রূপে বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে না । সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ত্রব্যসামগ্রী আনয়ন করিতে হয় । আবার ইংলণ্ডে যে পরিমাণে বাণিজ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে,

ছেন ! এই নিদাক্ষণ সংবাদে আমরা একান্ত সন্তুষ্ট ও মৰ্ম্মপিড়িত হইয়াছি । এতৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কিছু বলিবার বাসনা রহিল ।

তাহা ক্রয় করিবার উপযুক্ত সংখ্যক লোক তথায় নাই। সুতরাং এই সকল পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরণ করিতে হয়। বিগত আমেরিকার গৃহ-বিবাদে সময় তথায় ইংলণ্ডীয় শিল্পজাত দ্রব্য সমূহের বিক্রয় এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায় এবং সেখান হইতে ইংলণ্ডে তুসার আমদানী সীতিশয় নূন হইয়া পড়ে। শুধু এই তুলার অভাবেই সহস্র সহস্র ইংরাজ-পরিবার একবারে উৎসন্ন গিয়াছিল। যদি ভারতবর্ষীয় দ্রব্যসামগ্রী ইংলণ্ডের হস্ত বহির্ভূত হইয়া যায় এবং ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রবেশ না করে, তাহা হইলে ইংরাজের যে কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়, তাহা এক্ষণে সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষ, ইংলণ্ডের অধীনে থাকিতে ইংরাজের 'স্বত' কোন উপকার হইতেছে না, এমন কথা মুখে আনিও না।

স্বাধীনভাবে যাহারা জীবিকা নির্বাহের উপায় অবলম্বন করে, তাহাদের সংখ্যা অধিক হইলেও বহু সংখ্যক লোক চাকুরীর প্রত্যাশা করিয়া থাকে। এত চাকুরী ইংলণ্ডে নাই, সুতরাং ভিন্ন দেশে ইহার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু সকলেই আপনাদের সুযোগ অন্বেষণ করে। ভিন্ন স্বাধীন দেশ; স্থানীয় লোক পরিত্যাগ করিয়া কেন ইংরেজকে চাকুরী প্রদান করিবে? সুতরাং যেখানে দেশীয় লোকের আপত্তি করিবার ক্ষমতা নাই, সেই

স্থানেই বিষয় কর্মের অন্বেষণ করিতে হয়। উপনিবেশ ভিন্ন এমন স্থান আর কোথাও নাই। ইংলণ্ডে থাকিয়া যাহাদের দৈনিক অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করাও নিতান্ত কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে, তাহারা উপনিবেশে আগমন করে; এবং যথেষ্ট সঞ্চিত করিতে পারিলেই পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রস্থান করে। কোন্ কোন্ উপনিবেশে এইরূপে ইংলণ্ডের অতিরিক্ত লোকদিগকে চাকুরী প্রদান করিয়া থাকে, এখন তাহার আলোচনা করা কর্তব্য বোধ হইতেছে।

কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি প্রধান প্রধান ইংলণ্ডীয় উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরিক শাসনের ভার ইংরাজের হস্তে নহে। ঐ সকল স্থলে ভিন্ন ভিন্ন পার্লামেন্ট সংস্থাপিত আছে। সুতরাং তত্ত্বস্থানীয় সমস্ত রাজকীয় পদের বিয়োগ প্রয়োগের ভার স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছে। তাহারা স্ব স্ব অভিলাষানুসারে আপনাদিগের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করিয়া, রাজকর্য্যে নিয়োগ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের হস্তে কেবল গবর্নর মাত্র নিযুক্ত করিবার ভার রাখিয়াছে। এই সকল গবর্নর আবার স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনভিমতে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। সুতরাং এই সকল স্থানে রাজসংজ্ঞাধারণ এবং গবর্নর নিয়োগ বাতীত ইংলণ্ডের অন্য কোন ক্ষমতা নিতান্ত বি-

রল। \* বলাবাহুল্য যে, ইংলণ্ডের অতিরিক্ত লোক, এই সমস্ত উপনিবেশে অতি অল্প চাকুরীই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তবে ইংরাজ কোথায় যায়? যেখানে দেশীয় লোকদিগের কোন বিষয়ে অপত্তি নাই, রাজকীয় কর্ম-চারীনিয়োগপক্ষে বাঙালি নিষ্পত্তি করিবার কোন ক্ষমতা নাই; থাকিলেও তাহা অ-প্রাচ্য, এমন কোন স্থান বর্তমান আছে কি না?

আছে; সে এই হুভাণ্ডা ভারতবর্ষ। যে সময়, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে করানী হইয়া ইংরাজ ভারতবর্ষে আগমন পূর্বক পরিশেষে গবর্নর পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহার কথা বলিব না। যে সময়, ছুরি কাঁচী বিক্রয় করিতে আসিয়া ইংরাজ নবাব হইয়া দেশে প্রতিগমন করিতেম, সে সময়ের কথা বলিব না; তখনও বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের উর্বরা ক্ষেত্রে মুজাশসবী রক্ষাবিষেব উৎপন্ন হইয়া থাকে; একটুকু বল প্রয়োগ পূর্বক আলোড়ন করিলেই কোষ পরিপূর্ণ করা যায়। লর্ড করণওয়ালিশ, গবর্নমেন্টের চাকুরী হইতে দেশীয়দিগকে একবারে ব-ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময় দেশীয়েরা অতি উপযুক্ত হইলে পঁচিশ টাকা বেতনে দারোগার পদ পাইতে পারিত। করণওয়ালিশের কথাই বা কেন বলি? বর্তমান সময় দেখ। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত

\*Froudos' Short Studies on great sub-

ject second series, First Edition," P.157,

সমস্ত প্রধান প্রধান কর্ম ইংরাজের হস্তে। দেশীয় লোকের তাহা প্রাপ্ত হইবার আশা, বিড়ম্বনা মাত্র। দেশীয় লোক, প্রধান প্রধান কার্য স্বচাকরূপে নির্বাহ করিতে আজিও সম্যক শিক্ষা লাভ করে নাই। ভারতবর্ষেই নরেন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন যে, শতবর্ষ ইংরাজের অধীনে থাকিয়া, ইংরাজের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, ইং-রাজীশিক্ষা ইয়ুরোপীয় সভ্যতা অভ্যাস করিয়াও যদি ভারতবর্ষীয় লোক রাজ্য-শাসন শিক্ষা করিতে পারিল না, তবে এ অপরাধ কাহার? এ রহস্যের মর্যোন্তেদ কে করিবে? গবর্নমেন্টের কার্য প্রণা-নীতে অবশ্যই কোন বিশেষ দোষ আছে; তাহা না হইলে সভ্যতম জাতির অধীনে থাকিয়া,—শ্রেষ্ঠতম শাসনপ্রণালীর অনু-বর্তী হইয়া—হুম্মবুদ্ধি, প্রতিভাশালী ভারতবর্ষীয় লোক আত্মশাসন শিক্ষা করিতে পারিল না কেন? যদি কখনও গবর্নমেন্ট উদারতার বশবর্তী হইয়া কোন প্রসন্নভাণ্ডা দেশীয়কে উচ্চপদে নিয়োগ করেন, তাহা হইলে অমনি পবিত্রীকৃত মণ্ডলীর মস্তকে বজ্রসম্পাত হয়। বিজাতীয় আগন্ত-কের সমাগমে স্বজাতীর লাভের ক্ষতি আ-শঙ্কা করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া বিকট চীৎকার অরম্ভ করেন। গবর্নমেন্ট সাহসী হইলে, তাঁহাদিগকে মীরব করিতে পারিতেন; কিন্তু তত দূর সাহস নাই; হুতরাং আগরে, মিষ্টবাক্যে গাত্রে হস্ত প্রলেপ করিয়া তাঁ-হাদিগকে শান্ত করিয়া রাখেন।

আবার দেখ, এই সকল ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়া কি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইতেছে! কএক মাস অতীত হইল, ভারতবঙ্গু ফেটসময়ান যে সকল তালিকা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে কাহার না প্রত্যয় হইবে যে, ইংরাজ এদেশের অর্থ লোষ্ট্রবৎ আহরণ করিতেছে? রাজকর্মচারীগণ, পৃথিবীর কোম দেশেও এত অধিক পরিমাণে বেতন পাইয়া থাকেন না। কিন্তু ভারতবর্ষের ক্ষতিতে কাহার শোক? দেশীয় লোকের হাহাকার কে শ্রবণ করিবে? দেশীয় লোকের স্বাভাবিক স্বভেদে কে আস্থা প্রদর্শন করিবে? বত পার গ্রহণ কর, মাটির দিকে ফিরিয়া চাহিও না। ব্যয় অধিক হইতেছে বিবেচনা হয়, কএক জন দপ্তরীর বেতন কমাইয়া দাও। অথবা দিল্লী কাসেজ উঠাইয়া দাও। কিন্তু কোন ক্রমেই যঁহার সহস্র সহস্র টাকা বেতন পাইতেছেন, তাঁহাদিগের একটি পয়সাও কমাইও না! ইংলণ্ডের উদারতা এবং স্বাধরাহিতা এমনই প্রশস্ত! সত্যের প্রতি অণুমাত্রও অনুরাগ থাকে ত বলিও না—ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অধীনে থাকিতে ইংরাজের “স্বতঃ” কোন উপকার হইতেছে না।

রাজ্যের সমস্ত প্রধান প্রধান পদ, অলৌকিক, অপার্থিব বেতন সংযুক্ত হইয়া ইংরাজের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে, আবার ফেটসেফ্রেটারী কর্তৃক নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হওয়াতে উচুপদপ্রবেশের এক-

মাত্র দ্বারদ্বারপ সিভিল সার্ভিস, দেশীয় দিগের পক্ষে সম্পূর্ণ রূপে দৃঢ় অর্গলিত হইয়াছে। কিন্তু কে বলিবে যে তাঁহার হৃদয়ে ককণা নাই? কে বলিবে, তিনি প্রজার লাভালাভ বুঝেন না? কে বলিবে তাঁহার হৃদয় পাষণ্ড?—যখন দেখিলেন, যে নব্বৈখান পরিগণনায় কএক জন ইংরাজপুত্র একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক-মের সময় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া অন্ন বজ্রের সংস্থান করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইল (!)—যখন দেখিলেন যে, ইহাদিগের আর উপায়াস্তর নাই, একবিংশতি বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া এরূপ বয়সে ইহারা কোন কার্যে প্ররুত হইতে সক্ষম হইবে না,—দয়ার শরীর, অমনি হৃদয়-উদ্বেগ-সংকুত হইয়া উঠিল। যাঁও তোমরা, উনবিংশ বৎসর পর্যন্ত এ পরীক্ষার সীমা নির্দিষ্ট হইল, তখনও যদি কৃতকার্য না হও, তবে অন্য চেষ্টা করিবার যথেষ্ট সময় থাকিবে; আর যদি কৃতকার্য হও, তবে হে অপোগণ্ড, অজ্ঞাত শত্রু ইংরাজশিশু, ভারতের রাজ্য ভার গ্রহণ কর। দেশীয় লোকেরা যে সকল আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছিল, তাহাতে কণপাত করিবার, কিছু মাত্র আবশ্যকতা নাই। বিংশতি কোটি লোকের উজ্জ্বল, গলদজ্ঞ ক্রন্দন, আবাহন, সঘোষন ভারতের হর্তা কর্তা বিধাতার প্রশস্ত কর্ণে প্রবেশ করিল না। দয়ার মহদে, উদারতার মিঃ-স্বার্থভায় যঁহার হৃদয় মিশ্রিত বিগলিত

হইতেছে, যিনি ভারতের মুখ স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত শান্তি, সভ্যতার নিমিত্ত অবিরত চিন্তাশ্রিত রহিয়াছেন,—তাঁহার গদ্যাদ্বয়ে বিংশতি কোটি লোকের যুগপৎ প্রার্থনা স্থান পাইল না !!!

এই নব প্রতিষ্ঠিত নিয়ম যে কেবল ভারতবর্ষীয়দিগেরই ইচ্ছা এবং স্বার্থের বিক্ষুব্ধতা নহে। ইহা প্রবর্তিত হওয়াতে স্কটলণ্ড এবং আয়ারলণ্ড দূরে থাকুক, অক্সফোর্ড ও কাম্ব্রিজ ভিন্ন ইংলণ্ডীয় অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়গুলিরও সমুহ অনিচ্ছা সাধিত হইবে। এসময়ে গত ২৪শে জুন তারিখের অধিবেশনে ডাক্তার প্লেফেরার পার্লিয়ার্মেন্টে যে কএকটি কথা বলিয়াছেন, আমরা তাঁহার সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি। যেসময় ভারতবর্ষীয় সিবিল সার্ভিসের দ্বার উন্মুক্ত হয়, তখন গবর্ণমেন্টে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে “উপযুক্ত হইলে রাজ্যের (এট্রিট্রিনের) সকল স্থানের সকলেই ইহাতে প্রবেশ করিতে পারিবেন; প্রবর্তিত নিয়ম গুলি কোনরূপে কাহারও সম্বন্ধে পক্ষপাত করিবে না।” কিন্তু এই নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হওয়াতে স্কটলণ্ডীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, আয়ারলণ্ডে কুইন্স কলেজনিচয় এবং লণ্ডন ও মফঃস্বলে এই প্রকার যে সকল কলেজ প্রতিষ্ঠিত আছে, সে গুলি কার্যতঃ বহিঃক্ষিপ্ত হইবে। কেননা এত অল্প বয়সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার চেষ্টা কার্যার্থীদিগের

পক্ষে সবিশেষ অপকার জনক। নূতন নিয়ম অনুসারে দুইটি প্রধান প্রকার প্রচলন হইবে। প্রথম কার্যার্থীর বয়স ১৯ বৎসরের অনধিক হওয়া আবশ্যিক; দ্বিতীয়, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে সিবিল সার্ভিস কমিশনারদিগের অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়বিশেষে অন্ততঃ দুই বৎসর কাল অধ্যয়ন করিতে হইবে। কর্মার্থীর বয়স ২১ হইতে ১৯ বৎসরে পরিবর্তিত করা সম্বন্ধে স্টেট সেক্রেটারী ভারতবর্ষ জজ, কোমিসলের মেম্বর, গবর্ণর ও সিবিল সার্ভিস কমিশনার হইতে প্রধান প্রধান ১১০ জন উপযুক্ত লোকের মত চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ৯৫ জন বয়স স্থান করার বিক্ষেপে এবং শুধু ১৫ জন মাত্র তাঁহার সপক্ষে মত প্রদান করেন\*। সিবিল সার্ভিস কমিশনারগণও ইহার বিক্ষেপে মত দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব প্রথানুসারেই কার্য সম্পন্নরূপ চলিতেছে। লর্ড সালিসবরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি নূতন প্রকার পক্ষপাতী; এ কথাও সম্পূর্ণ যথার্থ নহে।

\* এই ১১০ জনের মধ্যে ৪১ জন পূর্ব নিয়ম, অর্থাৎ ২১ বৎসর স্থির রাখার জন্য, মত দিয়াছিলেন; ৪১ জন ২১ হইতে ২২ বৎসরে বৃদ্ধি করিবার জন্য ১৩ জন, ২০ বৎসর করিবার জন্য মত প্রদান করেন। কেবল ১৫ জন, মাত্র সালিসবরী প্রবর্তিত ১৯ বৎসরের অভিপ্রায় দিয়াছিলেন।

সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তাহার মধ্যে শুধু অক্সফোর্ড বয়স হ্রান করা উচিত বিবেচনা করিয়াছেন, অবশিষ্ট নয়টি কোন উত্তর প্রদান করেন নাই। কেন যে অক্সফোর্ড মত দিয়াছেন, তাহা প্লেফার প্রদর্শন করিয়াছেন; আমরা বাস্তব ভয়ে তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলিব না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, যে ভারতবর্ষের বিংশতি কোটি লোকের স্বার্থ, সুবিধা এবং ইচ্ছা মালিসবরীর মনে একবারও উদ্ভিত হইল না। স্কটলণ্ড, আয়ারলণ্ডের অসুবিধাও কোন ফলদায়ক হইল না। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সেক্রেটারী এমনই অথগু প্রতাপ, অথবা ষাঁহাদিগের মনস্তত্ত্ব সম্পাদন করা তাহার পক্ষেও নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাদিগের প্রতাপ এমনই অলঙ্ঘ্য যে, লর্ড মালিসবরী কাহারও কথার কণপাত করা উচিত বিবেচনা করিলেন না। অণুর সেক্রেটারী লর্ড জর্জ হামিল্টন, প্লেফারকে যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অব্যবস্থিতচিত্ততা পরিচায়ক এবং কৌতুকজনক। এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, সেক্রেটারী ভারতবর্ষের মঙ্গলার্থে এই নূতন নিয়ম প্রচলিত করিয়াছেন!! স্বাবকতার সীমা কতদূর, তাহা মানব সমাজে আজিও স্থিরীকৃত হয় নাই। সিবিল সার্ভিস সম্বন্ধে আজিকালি এদেশে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে; প্রতি জনপদে এই বিষয়ের আলোচনার জন্য সভা সংস্থা-

পিত হইতেছে, প্রতি সংবাদ পত্র, দেশীয় প্রতিসুশিক্ষিত যুবক ইহার সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেছেন; সুতরাং আমরা এতৎ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না।

সিবিল সার্ভিস সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারি সম্বন্ধেও সেইরূপ অনেক কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রবন্ধের অতি বিস্তৃতিদোষ পরিহারবাসনায় তাহা হইতে বিরত হওয়া গেল। বিলাতে কুপারস্ হিল কলেজ সংস্থাপিত হইয়াছে, বায়, ভারতবর্ষের। ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সমস্ত প্রধান পদ ঐ কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে প্রদত্ত হইতেছে। প্রতি বৎসর যত লোক উত্তীর্ণ হইতেছে, ভারতবর্ষে তত কার্য্য নাই। কিন্তু গবর্ণমেন্ট চাকুরী দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অথচ ক্লার্ক এবং কলিকাতা কলেজ হইতে গবর্ণমেন্ট চাকুরী প্রদানের প্রতিশ্রুতি উঠাইয়া দিবার যত্ন করিতেছেন। এদেশের কলেজে দেশীয় লোক উত্তীর্ণ হয়, সুতরাং তাহার কার্য্য প্রাপ্ত হইলে কুপারস্ হিলের উপায় কি? ভারতসম্বন্ধে এমনই সুবিচার! আমরা সুখী হইলাম, বঙ্গদেশের বর্তমান লেফটেনেন্ট গবর্ণর, কুপারস্ হিলের অতি তীক্ষ্ণমন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক, কি সিবিল সার্ভিস, কি ইঞ্জিনিয়ারিং, কি ডাক্তারি, কি পোস্টাফিস, কি জঙ্গল বিভাগ, কি রেলওয়ে, কি শিক্ষা বিভাগ,—সকল বিভাগেই দেশীয় লোকের উচ্চ



আশা স্থাপন করা রূপ। বর্তমান সময়ে গবর্ণমেন্টের কিছু সৃষ্টি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভারতের অদৃষ্ট পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই সৃষ্টি কার্যতঃ কতদূর ফলদায়ক হইবে বলা যায় না।

দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্য আমরা ভারতীয় ইংরাজ ইতিহাসের কলঙ্কময় পরিচ্ছেদ পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছি বলিয়া, কেহ এমন বিবেচনা করিবেন না যে, আমরা ইংরাজবিদ্বেষী অথবা ইংরাজ ভারতের যে শত সহস্র উপকার সংসাধন করিতেছেন, তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। ইংরাজ ইতিহাসে অকলঙ্ক, উজ্জ্বলতর এক পরিচ্ছেদও রহিয়াছে; তাহা অতি বিস্তৃত এবং সম্যক প্রাপ্ত। যদি সে ভাগের পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিতাম, তাহা হইলে প্রবন্ধের প্রতি পংক্তি অর্গাঙ্করে মুগ্ধিত করিতাম; অতিধান তন্ন তন্ন করিয়া, জ্ঞতিস্মকর মনোহর শব্দ সংগ্রহ করিয়া, স্তুতি গীত গাইতাম; এবং শাসনের অধীনে থাকিয়া জাতি-কুল-ধন-মান রক্ষা করিয়া শান্তি-মুখ ভোগ করিতেছি, লেখক পাঠকে একত্র সম্মিলিত হইয়া জলদগভীরস্বরে যুগপৎ তাহার প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইতাম। কিন্তু তাহা বলিয়া সত্যের অপলাপ করিতে পারি না। ভারত জন্মের দক্ষাংশ আমরা শ্যামলদুর্জাদলপরিশোভিত করিয়া রঞ্জিত করিতে পারি না; সে অন্ধকারে শারদ চন্দ্রমার মধুর প্রফুল

হাসি আঁকিতে পারি না। বুদ্ধি দিয়াছ, জ্ঞান দিয়াছ, শান্তি দিয়াছ, সভ্যতা দিয়াছ, আরও দিতে হইবে। ভারত যদি অন্ধ থাকিত, তবে ইহাতেই পরিতৃপ্ত হইত। কিন্তু চক্ষু উন্মিলিত করিয়া দিয়াছ, ভারত কেমন করিয়া নীরব থাকিবে? সেই জন্যই আরও চায়; সেই জন্যই জিজ্ঞাসা করে—আজিও ভারতশাসনে এই সকল কলঙ্ক কেন? আজিও কেন রাজ্যের প্রধান প্রধান কার্যে দেশীয় লোকনিযুক্ত হয় না? আজিও কেন বর্ণবৈচিত্র্য পরিহার হইল না?

এই সকল প্রশ্নের এই কি উত্তর—ভারত-বর্ষ জনশূন্য গহন অরণ্য ছিল না, ভারতে মনুষ্য বাস করিত। মানুষ ছিল; কিন্তু তাহারা আফ্রিকার কৃষ্ণকায়, কৃষ্ণিতকেশ, সমতল-নাসিক, উন্নত চিবুক, স্থূলবিলম্বি-অধরযুক্ত নিগ্রো কিংবা আমেরিকার উৎকট নাম, বিকটমূর্তি, রঞ্জিতদেহ, মনুষ্যভোজী ও স্কুইমস ছিল না। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা ধনে মানে, ধর্মে কর্মে, সাহসে উদ্যমে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে, আচারে ব্যবহারে, সৌজন্যে আতিথেয় একদা সমগ্র ভূমণ্ডলে সর্বজনপুঞ্জ ও সর্বাগ্রগণ্য ছিল। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহারা জ্যোতিষে গণিতে, কাব্যে নাটকে, সঙ্গীতে সৌহার্দে, সামাজিকতায় চিকিৎসাবিদ্যায় জগতের শিক্ষাদাতা ও দীক্ষা-গুরু ছিল।—অপরাধ এই যে, অপ্রমিত শৌর্যবীর্য সহকারে তাহারা সময়ে স-

যয়ে দুর্জয়, দুর্জয়া ইংরাজসৈন্যগণকে কুত্র  
'মেঘপালের নায় \* দলে দলে বি-  
ভাঙিত ও বিপর্যস্ত করিয়াছে ।—আমরা  
যদি বলগারিয়া কিম্বা হারজিগোবিনি-  
য়াতে বাস করিতাম, তাহা হইলে এই স-  
কল কারণে বিশ্বাস করিতাম : কিন্তু উন্নত  
উনবিংশ শতাব্দীর উন্নততম জাতির অ-  
শীনে অবস্থিতি করিয়া কিরূপে এই সকল  
অকিঞ্চিৎকর কারণে বিশ্বাস করিব ?  
ইংলণ্ড ! যে সাম্রাজ্যের উন্নত রাজ্যকূট  
মস্তকে ধারণ করিয়া আজ জগতে এত ম-  
হিমাম্বিত, এত আদৃত, এত সম্মানিত, এবং  
এত যশস্বী হইয়াছে ; যে রাজ্য হস্তচ্যুত  
হইলে এক মুহূর্তেই তোমার সমস্ত রাজ-

\* অবিশ্বাস হয়, কে সাহেববরুত  
সিপাহীবিরোধের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড  
৪১৯ পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখ !

গর, রাজমহত্ব ছার খার হইয়া, স্পেন,  
পর্তুগাল, হলণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতির সম-  
তলবিরাজী হয় ; সে মহা সাম্রাজ্যের  
হৃদয়ে ব্যথা দিও না ; জগতে অতুলা, সে  
অমূল্য মহানিধি কোহিনুরকলঙ্কলাঞ্ছিত  
করিও না ।

ভারতবর্ষ হিন্দুস্থান, হিন্দুর আবাস  
ভূমি ; আমরা কুগ্রহের কোপদৃষ্টিতে বি-  
শ্বাস করি । অদৃষ্টচক্রের স্বাভাবিক আ-  
বর্তনে আজি ভারতে কোন কুগ্রহের বি-  
ষদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে ; শমনশচরের  
নির্মম নিস্পীড়নে ভারত জর্জরিত হই-  
তেছে ; কিন্তু নিরাশ হইও না, শনির কূট-  
মন্ত্রপ্রভাব শীঘ্রই তিরোহিত হইবে ; ভা-  
রতভাগ্যে শুরগুরু রহস্যপতির শুভমন্ত্রণা  
স্থান পাইবে ! !

## রণরঘুর প্রলাপ ।

চেষ্টা ;—তিন জন ।

শেষ রাত্রি ; এখন গাঢ় নিদ্রার সময় ।  
এখন দুগ্ধপোষা শিশুর শুভ্র মনে থাকে  
না, প্রসূতির সন্তান মনে থাকে না, এক-  
প্রাণ দম্পতি পরস্পরকে ভুলিয়া যায়—  
এমন সময়ে ঘরে আগুন লাগিলে একবা-  
রেই সর্বনাশ ! এইরূপে সশব্দে অগ্নির

দিকে আগ্রাসন হইতেছি, আর যত চটপট  
শব্দ অগ্নিগোচর হইতেছে, ততই অন্তরের  
ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পাইতেছে । উৎকণ্ঠায়  
দৌড়িয়া ।

আমে পৌছিয়া দেখি, অগ্নি অন্ধকা-  
রকে বিজয় করিয়া ভীষণ-স্বপ্ননে বিরাট-

মূর্তির গরিম। দেখাইতেছে । উচ্চে, অ-  
গ্নির অনীল অযুতজিহ্বার স্পর্শ অতিক্রম  
করিয়া, স্তূপে স্তূপে উদ্যাম্যমান ধূমপুঞ্জ  
আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে ; আর সেই  
নিবিড় ধূমজাল বিচ্ছিন্ন করিয়া উল্কাকারে  
ক্ষুণ্ণিলেহের পর ক্ষুণ্ণিলেহ অবিরাম গতিতে  
দূরশূন্যে উঠিয়া দূরস্থিত গৃহের চূড়ায়  
গিয়া পড়িতেছে । দূরে, নিকটে, সকল  
গৃহই ক্রমে ভস্মীভূত হইতেছে । এখানে  
ইচ্ছাক্রটিত গৃহ নাই বলিলেই হয়, ঘন ব-  
সতি, তাহার প্রায় সমস্তই তৃণাচ্ছাদিত  
মাটির ঘর । স্রোতোস্থিত সকলেই হতবুদ্ধি,  
অধিকাংশই নিকদ্যম ; কেহ হাংক'র  
করিতেছে ; আর সমুদয়ে মিশিয়া অমানুষ  
এক কোলাহল উঠিতেছে । যাহারা উ-  
দ্যমশীল, তাহারাও উপকারে আসিতেছে  
না ; কেহ অসাদাসাধন করিতে গিয়া আ-  
পনাকে নিপদগ্রস্ত করিতেছে । কেহ  
দৌড়িতে গিয়া পড়িয়া যাইতেছে, কাহা-  
রও পরিধেয় খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে ।  
বিলুপ্ত গণ্ডারাগ নরনারীর তৎকালীন বি-  
কট পাংশুবর্ণে সেই স্থানকে অশাশনভাবে  
পরিব্যাপ্ত করিতেছে ।

যেখানে এখনও আগুণ লাগে নাই,  
সেখানে যদি কাহারও কোন উপকার ক-  
রিতে পারি এই ভাবিয়া, যে দিকে অগ্নির  
বেগ, আমি সেই দিকে দৌড়িলাম । বড়  
অধিক দূর থাইতে হইল না ।

একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর তীরে—আগুণ  
এখনও এত দূর আইসে নাই—অনেক স্ত্রী

পুরুষ দাঁড়াইয়া, অথচ সকলেই চঞ্চল ।  
আর, লেপ কাঁথা, সিন্দূর পেটরা, বাসন-  
কোসন, কাপড়-চোপড়, হাঁড়ি কলসী,  
শিল যাতা, বাঁটি কাটারী,—সংক্ষেপে  
বলি, ধনধান্যপূর্ণ বঙ্গদেশের লুপ্তধাম প-  
ল্লীগোমে সার গৃহস্থের বাহা কিছু আছে  
সমুদয় সেই পুষ্করিণীতে রাশীকৃত ।—  
রক্তলোলুপ রাজার, রক্ষকরূপী সর্বভক্ষ  
রাজকর্মচারীর, বিচার-বিক্রয়ী ধর্মাবতা-  
রের, অর্থ-বজ্ররূপী রাজানুমোদিত প্রবঞ্চ-  
কের, বিজাতীয় শিক্ষাপ্রবীণ সজ্জাতীয় চি-  
কিৎসকের, হুভিক্ষের, মহামারির, লিবারপু-  
লের, মানচেটরের, কুইনাইনের ভুক্তাব-  
শিষ্ট বাহা কিছু আছে, এই পুষ্করিণীর  
তীরে সমুদয়ের প্রদর্শন হইয়াছিল । তখন  
অশ্রমোচনের সময় নাই, অথবা নেত্রে  
আর অশ্রুই নাই, সেই জন্য তখন কাঁদা হ-  
ইল না ; প্রাণ একবার কাঁদিয়া উঠিলেও  
আমি কাঁদিলাম না ।

আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র  
একজন বৃদ্ধ বলিয়া উঠিল ‘সাবিত্রি ! যা,  
ঐ দেখ গোয়ালের চালে আগুণ পড়ল ।  
কি হবে ? গোক—’

আর বুঝিতে পারিলাম না ; কথা  
কহিতে কহিতে বৃদ্ধ অগ্নির দিকে যথাশক্তি  
দৌড়িতে লাগিল ।

তাহার পশ্চাতে রমণীকণ্ঠ রক্ততক্ত্রে  
অমৃত্তরঙ্গ—সভর, কাতর, সঙ্কল্প ; “বাবা  
তুমি যেও না ; বাবা, আমি যাই, তুমি  
—” । রমণীও দৌড়িতেছে ।

আমার কর্তব্য কি, মন তাহা বলিয়া দিল। রক্ত ও তরুণীর পশ্চাতে আমিও দৌড়িলাম।

গোগৃহের নীৰস্থান জুলিয়া উঠিল, রক্ত গৃহমধ্যে; একটি গাভী বেগে বাহিরে আসিল, কিন্তু চকিত হইয়া আবার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে সার্বিকীও সেই জ্বলন্ত হতাশনে যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। একটি নবপ্রসূত বৎস ছুটিয়া আসিল, পশ্চাতে তাহার প্রসূতী; আর সেই গাভীর রক্ত ধরিয়া রক্ত যেমন বাহিরে আসিতেছেন, আরও দুই তিনটি গাভী সলস্বে বাহিরে আসিতে গিয়া রক্তকে ধরাশায়ী করিল, একটা তাঁহার উপর পাড়াইয়া গেল, এবং তিনি যে রক্ত ধরিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হতচূত হইয়া পায়ে জড়িয়া যাওয়াতে তিনি তদবস্থায় সবলে আঁকুট হইতে লাগিলেন।

রক্তকে সেই বিপদ হইতে মুক্ত করিতেছি, এমন সময়ে গোগৃহভাস্তুর হইতে “বাবা গো!” এই চীৎকার আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে সঙ্গে একখান জ্বলন্ত চাল গৃহের সম্মুখ ভাগ ব্যাপিয়া ভীষণ শব্দে পড়িল। রক্ত তখন মুচ্ছিত, তাঁহার সর্বদেহে কথির বহির্গত হইতেছে, তথাপি তাঁহাকে টানিয়া একটু দূরে রাখিয়া সেই আগুনের উপর দিয়া সলস্বে গৃহ মধ্যে পড়িলাম। সার্বিকীও মুচ্ছাগত। গো সেবার নিমিত্ত কতকগুলি রুহৎ মৃৎপাত্র ছিল, পদাঘাতে তাহা খণ্ড খণ্ড করিলাম;

এবং দ্বার দিয়া আগুনের উপর সেই গুল্ম ফেলিয়া দিলাম। সার্বিকীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কিঞ্চিৎ সাবধানে অগচ ভিত্তি বাহির হইলাম। যেখানে রক্তকে ফেলিয়া গিয়াছিলাম, সার্বিকীকেও তথায় লইয়া আসিলাম, পিতৃপার্শ্বে তাঁহাকেও রাখিলাম। পিতাও দুহিতা উভয়েই মৃতকণ্ঠ।

সমস্ত দিন আমি অনাহারী, সমস্ত দিবারাত্রি প্রায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সর্বদা যেন বাসিয়া গিয়াছে, পাগের স্থানে স্থানে ফোঁকা উঠিয়াছে, জ্বালা করিতেছে, আমি ক্লান্ত এবং কাতর হইলাম। মৌভাগ্য, যে আরও পূর্বে এরূপ হয় নাই। দুইটি জীবন রক্ষার নিমিত্ত হইয়াছি ভাবিয়া অন্তরে স্নেহ হইল, এবং পার্শ্বে মান সৌন্দর্য্য ও সম্মুখে, অদূরে সেই স্নন্দর ও ভয়ঙ্করের সমাবেশ—সেই ভীষণপারাক্রম অনলের ক্রমশঃ মন্দীভূতভাবে চিত্তে শান্তি উপস্থিত হইল। নিশ্চেষ্ট রূপে সেই স্থানে বসিয়া সাহায্য ও সুর্যোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

নির্বাক অগ্নির তাপশান্তি জন্য একজন যুবা পুরুষ এক কলস জল ঐ দিক দিয়া লইয়া যাইতেছিল। যুবার পদদ্বয় কর্দমসিক্ত, সর্বদেহে অঙ্গারসংস্পর্শজনিত কালিমা; যুবক অতিশয় অন্তবাস্ত। তাহার নিটক একটু জ্বল চাহিলাম, প্রথমে যেন শূন্যে পাইল না, বার বার ডাকিয়া তাহাকে বলিলাম, তখন কলসহস্তে সে আমার নিকট ফিরিয়া আসিল।

যুবক আমাকে বলিল “তুমি কে ? কোথায় আসিয়াছ ? পূর্বে তোমাকে দেখিয়াছি বলিয়া ত বোধ হইতেছে না। তুমি কাহাদের কুটুম্ব ? ”

আমি উত্তর দিলাম যে ক্ষুধাপিপাসায় আমার কষ্ট হইতেছে, আগে তৃষ্ণা নিবারণ করি ; তত্ত্বিন্ন আর দুই জন যুচ্ছাপন্ন হইয়া রহিয়াছে, ইহাদের মুখে একটু জল দিই ; তাহার পরে পরিচয় দিলে কি চলিবে না ?

যুবক আমার কথায় আশ্চর্য হইয়া গেল ; কিন্তু কলস ভূমিতে রাখিয়া যেখানে সাবিত্রী ও তাঁহার পিতা শয়ান ছিলেন সেই দিকে অগ্রসর হইল । আমি তাহার অনুমতির আর অপেক্ষা না করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করিলাম ; পরে সাবিত্রীর মুখে ও তাঁহার পিতার মুখে জল সেক করিলাম ।

যুবক বলিল “এ যে মথুর ঘোষাল ; এমন অবস্থায় কেন ? ইহার কন্যাকেই বা এখানে কে আনিল ? ” কথায় এই মাত্র বলিল বটে, কিন্তু জুহুটিতে যুবক আমাকে বিরক্ত করিল । আমি কথা কহিলাম না ।

যেন অর্ধচেতনে, সাবিত্রী বুকের কাপড় একটু টানিয়া দিলেন, সমগ্র পরিধেয় একটু সারিয়া সুরিয়া লইলেন । বুঝিলাম, তাঁহার সংজ্ঞার পুনঃ সঞ্চার হইতেছে, আমার বড় হর্ষ হইল । সাবিত্রীর যে মোহভঙ্গ হইবে না, এমন ভাবনা আমার কখনই হয় নাই, তথাপি আশ্বাস

হইল, আশ্বাসসাদে ক্ষুধার, তৃষ্ণার, আশ্বাসের জ্বালা যেন সব নিবিয়া গেল । যখন পরের কথা ভাবি তখন আপনাকে আপনি অভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় ; পরের বেলা অবহেলার সকল কার্যোন্নয়নই কারণ স্থির করিয়া ফেলি । আমি কিন্তু আমার হৃদয়ের পরিচয় তখন পাইলাম না ; আমার আশ্বাস হইল, তাহা বুঝিলাম, কিন্তু সে আশ্বাসের কারণ আছে কি না, থাকিলে সে কারণ কি—তাহা ভাবিলাম না, ভাবিলেও স্থির করিতে পারিতাম না ।

মুদিতনয়নে অতি মৃদুস্বরে, সাবিত্রী ডাকিলেন—“বাবা” —।

তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য আমি কহিলাম, ভয় নাই, তোমার পিতা এইখানেই আছেন, একটু পরেই স্নান হইবেন । সাবিত্রী আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন ; আমার স্বর সাবিত্রীর অপরিচিত, আমিও অপরিচিত ।

সাবিত্রী ব্যাকুল ভাবে উঠিয়া বসিলেন, পিতার দিকে সন্মুখ দৃষ্টিপাত করিলেন, আমাকে দেখিয়া একটু ত্রস্ত হইলেন, আর সেই যুবককে যখন সন্মুখ দেখিলেন তখন যেন অধিকতর কাতর হইলেন ।

গোমুহুর ভূপতিত চাল আস্তে আস্তে নিবিয়া গেল । আমরা যেখানে ছিলাম, তথায় আশ্বস্ত হইল । সাবিত্রীর পূর্ব-ক্ষণের কাতরতা মনে করিয়া তাঁহার পিতাকে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদের বাটীতে পৌছাইয়া দেওয়া বাড়িক, যুবকের নিকট

এই প্রস্তাব করিলাম । সাবিদ্রীও আ-  
মাদিগের সাহায্য করিলেন, তিন জনে  
মিলিয়া রক্তকে বাটীতে লইয়া যাওয়া হ-  
ইল । রক্তের সংজ্ঞা হইয়াছে, কিন্তু অ-  
তিশয় কাতর ।

সাবিদ্রী সমীপে আমি একটি যাচঞা  
করিলাম—এই আমার প্রথম যাচঞা ।  
আমি অতিশয় ক্ষুধার্ত, কিছু আহারীয়  
চাহিলাম । উৎসুকভাবে, অথচ সম-  
ঝোচে গৃহে বাহ্য ছিল সাবিদ্রী আমাকে  
খাইতে দিলেন । ‘ রক্তজ্ঞতা ’ আমার  
তৎকালীন মনোভাবের প্রচুর সংজ্ঞা নহে ।

একটা কথা বলা হয় নাই । অগ্নির  
বেগ সাবিদ্রীদের গোশালা পর্য্যন্ত আসি-  
য়াই প্রাণমিত হয় । ইহাদের দর পোড়েনাই,  
ইহাদের পাড়ার কাহারও পোড়ে নাই ।

সাবিদ্রী কষ্টে লজ্জা পরিহার করিয়া  
আমাকে জানাইলেন যে তাঁহাদের বহুতর  
গৃহসামগ্রী সেই পুষ্করিণীর ধারে রহি-  
য়াছে । আমাদের সঙ্গী যুবক সাবিদ্রীর  
সঙ্গে গিয়া তৎসমুদয় দেখিয়া লইতে এবং  
বহিয়া আনিতে চাহিলেন । সাবিদ্রী কথা  
কহিলেন না । আমি তখন যুবককে তাঁহার  
পিতার নিকট কিয়ৎকালের নিমিত্ত থাকিতে  
অনুরোধ করিলাম । যুবক সম্মত হইল, একটু  
হাসিল, হাসিবার সময়ে তাহার কু-  
ক্ষিত অধরপ্রান্তে দ্বয়ং ঘৃণা যেন কুটিতে  
কুটিতে রহিয়া গেল । আমি তাহা গ্রাহ্য  
করিলাম না ।

সাবিদ্রী আমার সঙ্গে পুষ্করিণীর  
তীরে গেলেন । আমি একে একে সকল  
সামগ্রী বহিয়া আনিলাম । যতক্ষণে কিছু  
পড়িয়া ছিল ; ততক্ষণ সাবিদ্রী সেই কা-  
তর পিতাকে যুবকের হস্তে রাখিয়া, স্বয়ং  
পুষ্করিণী তটে রহিলেন । পৃথিবীর সকল  
সামগ্রী হইতে সাবিদ্রী পিতাকে অধি-  
কত ভাল বাসেন তাহা আমি সহজেই  
বুঝিতে পারিলাম ; সাবিদ্রী কাদিতে-  
ছিলেন, তাহাও আমি দেখিলাম । ত-  
থাপি সাবিদ্রী পিতৃপার্শ্বে না রহিয়া,  
সেই পুষ্করিণীর তীরেই ছিলেন ।

শেষবারে সাবিদ্রী আমার সঙ্গে বা-  
টীতে প্রত্যাগমন করিলেন । সমস্ত সামগ্রী  
বাটী আসিয়াছে জানিয়া, যুবক আবার  
তেমনি হাসিয়া, বিনা বাকাবায়ে তথা  
হইতে চলিয়া গেল ।

সাবিদ্রী গৃহমধ্যে পিতার চরণো-  
পাস্ত্রে গিয়া বসিলেন । রোয়াকে একটা  
মণ্ডুর ছিল, আমি বাহ্যে মন্তক ন্যস্ত  
করিয়া শুইলাম । তখন রাত্রি প্রভাত হই-  
তেছে ; আমার নিদ্রা আসিল না, চিন্তা  
আসিল । বাহ্য জগতের অন্তিম ভুলাইয়া  
চিন্তা আমাকে অভিভূত করিল । সে চি-  
ন্তার অবস্থায় আমি নিদ্রিত কি জাগরিত  
অন্যে তাহা বলিতে পারিত না ।

সাবিদ্রী যুবতী, সাবিদ্রী দুন্দরী, সা-  
বিদ্রী বিধবা ।

জীরণরঘু গৌস্বামী ।

## দেবোপাখ্যান ।

( গ্রীস ও ভারত-ব্যৰ্থ । )

নবম প্রস্তাব ।

সাধারণ সমালোচনা ।

০১০০০০

পণ্ডিতবর বকল গ্রীকসভ্যতার উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতে যাওয়া, গ্রীক দেবদেবী-সমূহকে হিন্দুদিগের দেবদেবী হইতে অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, গ্রীক কবির কবিত্ব এত স্বাভাবিক, দেবগণের আকার প্রকার এবং স্বভাব-বর্ণনায় কল্পনা এমন হৃদয়গ্রাহণী যে হিন্দুদিগের ভয়ঙ্কর দেবগণ এবং হিন্দু কবিদিগের অসম্ভব কল্পনা তাহার সহিত উপমের নহে। মনুষ্যের মনোরত্তি নিচয় এবং দেবচরিত্র এমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত হইয়াছে যে, মানবগণ যে দেবগণের অনুকৃতি তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হয় না। তিনি বলেন, “জ্যোতীশের অপ্রসাদ ডায়োনাস, সৌন্দর্য্য ও ইন্দ্রিয়লালসা ভিনসেস, অহঙ্কার জুনোতে; এবং সর্ব্বগুণ-সম্পন্নতা মিনর্তাস চিত্রিত হইয়াছে। জুপিটার স্বপ্রেমিক, নুরসিক এবং সংস্কার রাজা। অন্যান্য দেবগণ সকলেই প্রয়োজন সাধনের উপযোগী, এজন্য নৈপচুন নাবিক; ভলকান কৰ্ম্মকার; এ-

পোলো বীণাবাদক, কবি এবং রাখাল; কাম ক্রীড়াশক্ত অস্থিরমতি বালক; মার্কিসুরি বিশ্বাসী দূত আবার সামান্য তস্তুর।”

আর্য্যকবি দেবগণকে বাহাজগতে এত সংস্কৃত রাখেন নাই, তাঁহারা মানবগণ হইতে অনেক উচ্চ, অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা ইচ্ছাময়, সুরতরং কবি তাঁহাদিগকে সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় বর্ণন করেন নাই। তিনি যে সকল দেবচরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, সে সমস্তে দুর্ব্বলতা নিতান্ত অস্পষ্ট আছে। যবগদ্যর্থশীল মানবের সামান্য মনোরত্তির বর্ণনায় দেবের স্থিতি, আর্য্যকবির নিকট নিতান্ত উপহাসজনক বোধ হইয়াছিল। তাঁহার দেবগণ সমস্ত গুণের পূর্ণতা ও সম্পন্নতা, কিন্তু সর্বদাই দোষ-বিবর্জিত। মনুষ্যবুদ্ধি দেবচরিত্রের উচ্চতা নিরীক্ষণে অসমর্থ মনুষ্যের কল্পনাও এত দূর উজ্জীযমান হইতে সমর্থ হয় না। তাঁহার বর্ণিত দেব

“তুগেন পর্ব্বতং হস্তং শক্তোদাত্তা চৈদেবতঃ

কীটেন সিংহং শার্দূলং মক্ষকেন গজং তথা।  
শিশুনাচ মহাবীরং মহাস্তং ক্ষুদ্রজন্তুভিঃ,  
মৃষিকেন চ মার্জারং মণ্ডুকেন ভূজঙ্গমং ।  
এবং জন্তোহ জনকং ভক্ষোণৈব চ ভক্ষকং  
বহ্নিনাচ জলং নক্ষং বহ্নিং শুক্লতুণেন চ ।  
পীতাঃ সপ্তসমুদ্রাশচ হিভেনৈকেন জক্ষুনা  
ধাতুর্গতিবিচিত্রাচ ভুজের্জা ভুবনত্রয়ে ।”\*

প্রত্যেকের শক্তি অনন্ত । দেবের  
এইরূপ ক্ষমতা বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া  
যাঁহারা উপহাস করেন, তাঁহারা, সকলই  
বলিতে পারেন । একজন দেবতা ইচ্ছা  
করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে পারেন, ইচ্ছা  
হইলে শরীর ছুই, তিন অথবা বহুভাণ্ডে  
বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবরূপে উপ-  
স্থিত হইতে পারেন ; যাঁহারা এ সমস্ত অ-  
স্বাভাবিক কবিকল্পনা বলিয়া অবজ্ঞা  
করেন, তাঁহারা যে কলহপ্রিয়, ইন্দ্রিয়প-  
রায়ণ, পাপপথপ্রদর্শক গ্রীক দেবদেবী-  
গণকে সমধিক প্রশংসা করিবেন, তাহাতে  
আর বিচিত্র কি ?

সহস্রগ হিন্দু পাঠক যখন অভিনিবেশ  
সহকারে আপনাদিগের দেবচরিত্র পাঠ  
করেন, তখন

“একোহপি সমাহাদেব ত্রিধাসৌ সমবস্থিতঃ  
সর্গরক্ষালয়গুণৈর্নিগুণোহপি নিরঞ্জনঃ ।  
একঃ সন্ স ত্রিধাচৈব ত্রিধাচ বহুধাপুনঃ  
ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সংপ্র-  
বর্ততে ।”†

\* ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ।

† কৌর্য পুরাণ, ৪র্থ অধ্যায় ।

এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া পুলকিত হন,  
আপনাদিগের দেবোপাখ্যান সারগর্ভ ও  
দৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত দেখিয়া অতুল  
আনন্দ উপভোগ করেন । দেবসংখ্যা  
রক্ষি হওয়ার কারণ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে  
সক্ষম হইলেন । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের  
প্রকৃতিগত গুণনিচয় অল্প জাতিয় ন্যাকের  
বোধগম্য হওয়া শ্রুতিনি । প্রত্যেকে প্র-  
কৃতি ও পুঙ্খ, স্বতরাং প্রত্যেকেই দুই  
ভাণ্ডে বিভক্ত ; সহ, রক্ষঃ, তমঃ গুণের  
আধার বলিয়া কার্য্যভেদে প্রত্যেকেই তিন  
ভাণ্ডে বিভক্ত ; আবার জীবগণের পর-  
মাত্মাস্বরূপ হওয়ার প্রত্যেকেই বহুধা বি-  
ভক্ত । যে যুক্তিসূত্র অবলম্বন করিয়া আ-  
র্য্যগণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা  
সামান্য কবির কাব্য হইতে অত্যাচ্ছ সাং-  
খ্যদর্শন পর্য্যন্ত সকল স্তরেই স্বস্পষ্ট বর্ণিত  
আছে । দেবগণের এতদূর মহত্ব ও ক্ষ-  
মতা যে, যাঁহার ক্ষমতায় একবার তাঁহাদের  
নাম ও মূর্ত্তি প্রবেশ করিয়াছে তাঁহার আর  
বিনাশ নাই ।

“নচ দুর্ব্বাসসঃ শাপো বজ্রধাপি শচীপতেঃ  
হস্তং সমর্থোহি সখে ! হ্রাসাতে মধুহৃদনে\*

যিয়স্ ত্রীসের শ্রেষ্ঠ দেব । তিনি  
অনাদি, অনন্ত, মঙ্গলময় । কিন্তু তাঁহার  
ইচ্ছার বিকল্পে প্রমিথিয়স্ স্বর্গহইতে অগ্নি  
অপহরণ করিয়া পৃথিবীতে আনয়ন ক-  
রিল । প্রমিথিয়স্ একজন সামান্য ম-  
নুষ্য । যিয়সের আপন দুহিতা সেই চৌ-

\* গাকড় পুরাণ ২৩৪ ।



ধর্মের সহায়তা করিলেন। যিস্ তাহাকে শান্তি প্রদান মানসে প্যাণ্ডোরাকে প্রেরণ করিলেন। কেবল তাহাকে নয় তাহার সহিত সমস্ত মানবজাতিকে কষ্টদিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। মনুষ্যের জন্য কি আশ্চর্য্য সহানুভূতি। কৌতুকের বিষয় এই যে, অগ্নি নিষ্কাশন করিয়া ফেলিতে, অথবা উদ্ভাবিত উপায় দ্বারা প্রমিথিয়স্কে শাস্তি দিতে পারিলেন না। পরিশেষে দয়া, সহানুভূতি ও সহিষ্ণুতার চরমসীমা প্রদর্শন করিতে, সজীবাবস্থায় প্রমিথিয়সের ছৎপিণ্ড বিদারণার্থ এক গৃধ্রীকে নিয়োগ করিয়া, আপনি উহাকে এক পর্ব্বতে বাঁধিয়া রাখিলেন। কি চমৎকার ক্ষমাশীলতা!

ভারতীয় দেবোপাখ্যানে বর্ণিত আছে, একবার অগ্নি কোন কারণে আপনা হইতে বিরক্ত হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন, তাহাতে দেবগণ অনেক অনুন্নয় বিনয় করিয়া তাঁহাকে লোকহিতার্থ পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন।

অন্যরের অত্যাচারে পৃথিবী অধঃপাতে যাওয়ার উপক্রম হইল। যেমন প্রত্যেকের শরীর হইতে তিল পরিমাণ পরমাণু প্রদান করিয়া, দেবগণ ঐসে প্যাণ্ডোরার স্রষ্টি করেন, ভারতের দেবগণও তাহাই করিলেন। কিন্তু ঐসের প্যাণ্ডোরা পৃথিবীকে দুঃখময় ও পাপপূর্ণ করিতে প্রেরিতা হন, ভারতের তিলোত্তমা সৌন্দর্য্যমুগ্ধ অনুর বিনাশ করিয়া ভূমণ্ডলে শান্তি ও সুখ প্রদানে উপস্থিত হন, এই প্রভেদ।

গ্রীককবি, মেনিলসের হেলেনকে পারিসের করে সমর্পণ করিলেন। ট্রয় বিনাশের পর, মেনিলস স্বীয় ভাৰ্য্যাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই রাখিতে পারিলেন না। ডিউফেলিয়স্ হেলেনকে বিবাহ করিলেন, আবার একিলেস্ মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ করিয়া হেলেনের স্বামী হইলেন। ট্রয়েলসের জীবনসর্ব্বস্ব ক্রেসিদা আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দেবগণ ডায়োমেডের সহায় হইয়া তাঁহার হস্তে ক্রেসিদাকে সমর্পণ করিলেন। এইরূপে একের পত্নী অপরের হস্তে সমর্পণ করা, স্ত্রী কর্তৃক স্বামী পরিবর্জন স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর তথাবিধ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি গ্রীক দেবগণের নিত্যকার্য্য ছিল। কিন্তু ভারতীয় দেবগণের তজ্রূপ নহে। তাঁহারা চিরকালই ন্যায়ের বন্ধু। রাবণ রামের স্ত্রী অপহরণ করিয়া, স্ত্রীর অবমাননার প্রসঙ্গ পাণ্ডার সম্বংশে নিধন প্রাপ্ত হইল। এইরূপ সহস্র সহস্র দৃষ্টান্তের অপ্রভুল নাই।

ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন গ্রীসের দেবদেবীগণ নরদেহ ও নরপ্রকৃতি বিশিষ্ট হওয়ার সহানুভূতি প্রদর্শনে অধিকতর সমর্থ। সম্পূর্ণ ভিন্নপ্রকৃতির প্রাণিগণ-মধ্যে সহানুভূতি থাকিতে পারে না। হিন্দুদিগের দেবদেবীগণ মানবগণের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশিষ্ট নহেন। অতরাং ইহা সম্ভবপর যে মানবগণ উপাস্য দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতে হইলে ভয়ে বিহ্বল

থাকিবে, উপাসনার উদ্দেশ্যও তজ্জ-  
নাই সংসিদ্ধ হইবে না। দেবমানবে  
একপ্রকার প্রণয় সংস্থাপিত না হইলে,  
আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইতে পারে না।  
কবিগণ এজন্য দেবজ্যেষ্ঠ যিগস্কে এবং  
অন্যান্য দেবগণকে মানবীপ্রিয় এবং দেবী-  
গণকে মানবপ্রিয় করিয়াছেন।

আরিস্তোতল নামক গ্রীসের প্রসিদ্ধ  
নৈয়ায়িক প্লেটোর মনোবিজ্ঞানের ভাব-  
বিষয় (idea) সমালোচনার দৃষ্টান্তরূপ  
বলিয়াছেন, “যেমন কেহ কেহ (গ্রীক  
পৌত্তলিকগণ) এমন নিরর্থক যে, তা-  
হার মরদেহবিশিষ্ট দেবমূর্তি নির্মাণ ক-  
রিয়া পূজা করে, মরণশীল অমর নির্মাণ  
করিয়া আরাধনা করে, অর্থাৎ যাহার  
অস্তিত্ব নাই, যাহা কিছুই হইতে পারে না  
(Non entities) তাহার উপাসনা করে।”  
বাস্তবিক একথা যথার্থ বোধ হয়। যে  
ব্যক্তি আমার নায় হইলেন, দুইপদ, প্র-  
কৃতি ও শরীরবিশিষ্ট, যাহার স্মৃৎ হুঃখ  
ভালবাসা সকলই আমার মত, তাহার  
প্রতি ভক্তি কত হইবে? যে আমার মত  
অমজীবি, কলহপ্রিয় ও দুর্বল প্রকৃতি যে মান-  
সিক কুপ্রবৃত্তিনিচয় শাসন করিয়া মহাজনের  
নায় হইতেও অসমর্থ, তাহার প্রতি কেন  
প্রীতির সঞ্চার হইবে? আমি মরণশীল,  
আমার মত শরীরবিশিষ্ট প্রাণী কেন অমর  
হইবে? তাহার যত কেন শক্তি থাকুক না,  
সে দেবতা নয়। তাহার বল ও পরাক্রম  
তাহাকে কুকর্ম সাধনে সক্ষম করে, তাহার

ক্ষমতা কুকর্মেরই অধিক উপযোগিনী হু-  
ফাদি মহৎকর্ম সম্পাদনে তাহার কিছুমাত্র  
সাধ্য নাই। যাহার সহিত ক্রীড়া করিতেছি,  
যাহাকে দুকর্মে সঙ্গী পাঠিতেছি, যে কু-  
কার্যসাধনে সহায়তা করিতেছে, আবার  
অপরিজ্ঞাত কার্যের জন্য শাস্তি প্রদান  
করিতেছে; যে ঈর্ষার বশবর্তী হইয়া বি-  
যাক্ত-বচনে ছলমস্ত্রে, চাতুর্যে ক্রীড়াতা  
প্রভৃতি মহাপাপ সাধনে কুণ্ঠিত হইতেছে  
না, সুরমা নগরী, সূদৃশ্য পর্ণাশাশা, মনো-  
হর উদ্যানসমূহ অনাগাসে বিনষ্ট করি-  
তেছে, একের সহধর্মিণী অন্যের হস্তে  
সমর্পণ করিতেছে, সে দেবতা নয়, তাহার  
প্রতি কেন ভক্তি হইবে? অভিসারিণী  
দেবী, অন্ধকারপ্রিয় দেব, উভয়ই যুগলীয়।  
আলোকস্বরূপ দেবগণ কুকর্মসাধনে অন্ধ-  
কারপ্রিয়! কি চমৎকার কল্পনা! কে  
ইচ্ছা করিয়া রুমসপের সহিত ক্রীড়া করিবে,  
যিগস্ প্রভুর আরাধনা ও মহানুভূতি প্রার্থনা  
করিবে? যদি ক্ষমতার পূজা করিতে হয়, গ্রীক  
যেমন একদিন সেকেন্দরকে, কার্থেজবাসী  
যেমন হানিবলকে, রোমান যেমন সিজার-  
কে, ফরাশি যেমন নেপোলিয়নকে অ-  
থবা শিক যেমন রণজিৎসিংহকে অ-  
র্চনা করিয়াছে, কোন্ গুণে যিগস তদ-  
পেক্ষা অধিক সম্মান লাভ করিবেন?  
তাঁহার দোষ প্রদর্শনে অথবা দোষ জন্য  
নিন্দা করিতে কেহই কুণ্ঠিত হইবে না।

এই মত সমর্থনের জন্য আমরা যাহা  
উল্লেখ করিব তাহা তত কার্যকর এবং গ্রীক-

প্রায় বাজালি বাবুগণের বিশ্বাসজনক না হইতে পারে, এই বিবেচনায় গ্রীক-শ্রুতিগণের এবং ইংলণ্ডের দুই একজন ভাষাবিদ প্রসিদ্ধ লেখকের মত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ।

প্রসিদ্ধ আর্বাগাতির দেবোপাখ্যান-লেখক জর্জ কক্স, এম্. এ, তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন “ যদি গ্রীসের দেবোপাখ্যান অনুযায়ী ধর্ম সাধারণের অন্তঃকরণে এত অনিষ্ট সঞ্চারিত না করিত, তবে হয়ত সকলে তাহাতে হাস্য করিয়া তাচ্ছল্য প্রদর্শন অথবা তৎপ্রতি দৃষ্টিপাতই করিতেন না । কিন্তু যখন দেখা গেল যে ইহাতে ভয়ানক নৈতিক অনিষ্ট সঞ্চারিত হইতেছে, তখন সকলে প্রকাশ্য অবজ্ঞার সহিত তাহা পরিভ্রাণ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না । বোধ হয় এই জন্যই জিনোফেনস্, প্রেতাগোরাস্, এলেকজাগোরাস্, হিরাক্লিটস্ পিটার ও প্লেটো প্রভৃতি পণ্ডিতগণ দেবোপাখ্যান প্রচলিত উপাসনার বিক্ষেপে তারস্বরে বক্তৃতা করিয়াছেন । যখন ইয়ুরিপাইডেস্ স্পর্শরূপে বলিয়াছিলেন, যদি দেবতারা সৎ হয়েন তবে কবিদিগের বর্ণিত গল্প সকল নিতান্ত মৃণাল ও অমূলক । আর যদি কবিগণ যাহা বলেন দেবতারা সেই সমস্ত কার্যই করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা কখনও দেবতা নহেন ” \* তখন অনেকে তাঁহার মত সমর্থন করিল । প্লেটো বলিতেন যিগস্

\* আর্ঘ্য দেবোপাখ্যান ৩৫৩ পৃ

ও হিরো দেবদেবীর অনুপস্থিত \* তিনি বীরোপাসনা সম্বন্ধে বলেন “ যিগস্কে পোাসির এবং পিরিথোয়স্কে যিগস্ সন্তান বলিয়া আমরা কখনও বিশ্বাস করিনা অথবা কাহাকে একথা উল্লেখ করিতে দিব না, এবং অন্য কেহ যে দেবপুত্র হইয়া কবির রুখা বর্ণনামূরূপ ব্যভিচার দোষে দূষিত এবং নানারূপ কলঙ্কিত একথার আমরা প্রত্যয় যাইব না । হয় তাহারা দেবপুত্রই নয়, না হয় কখনও উল্লিখিত রূপ কুকর্ম করে নাই এই দুই কথাই একটি স্বীকার করিতে সকলকে বাধ্য করিব । † কক্স সাহেব অন্য একস্থলে যিগস্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন “ যিনি সমস্ত উত্তমতা ও পবিত্রতার অতুল শেখর এবং আদর্শ স্বরূপ হইবেন, গ্রীসের দেবোপাখ্যানে তিনি অদম্য ইন্দ্রপারতা ও ব্যভিচারের জীবিত প্রতিমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন । ” ‡

এক্ষণে যেমন মুলার বংশীর জন্ম পণ্ডিতগণ, এবং প্লাড্‌স্টোন, কক্স প্রভৃতি শুলেখক সকল রূপক ব্যাখ্যা করিয়া দেবত্ব বুঝাইয়াছেন, গ্রীসের পণ্ডিতগণও তদ্রূপ করিয়াছিলেন । কিন্তু দেবোপাখ্যানে জাতীয় বিশ্বাস এত প্রবল ছিল যে, দেবনিন্দাপরাদে সঙ্ক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হইল, এলেকজাগোরাস্ দেশ হইতে ব-

\* গ্রোট রুত গ্রীসের ইতিহাস ।

† ঐ প্রথম পুস্তক ৫৮৮ পৃ ।

‡ আর্ঘ্য দেবোপাখ্যান ৪৫৭ পৃ ।

ছিক্ত ও বিদূরিত হইলেন। কিন্তু ইপি-  
কিস্থরস্ বহু শিষ্যের সমভিষাহারে দীর্ঘ-  
কাল জীবিত থাকিয়া অকৃত শরীরে ভি-  
নস্ ও বাবাসের মান রক্ষি করিলেন। \*

ভারতে সেকপ হয় নাই। ভারতের  
ইপিকিস্থরস, চার্বাক রাকস নাথে অভি-  
হিত হন। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিনাশ করিতে  
কৃতসঙ্কপ হন; চার্বাক নিহুতি লাভ  
করিতে পারেন না। তাঁহার বধবিরণ  
ও নিগ্রহ এদেশের অনেকেই জাত আ-  
ছেন সুতরাং বাহুল্যে প্রয়োজন নাই।

আর উদ্ধৃত না করিলেও একথা  
সকলেই স্পষ্ট দেখিতে পারিবেন যে,  
ইয়ুরোপীয় বর্তমান শতাব্দীর লেখক-  
গণ মধ্যে অনেকে এবং এদেশীয় কোন  
কোন যুবক যেমন গ্রীসের দেবোপাখ্যা-  
নের পক্ষপাতী, গ্রীকপণ্ডিতগণ তাঁহাদের  
অদেশীয় দেবোপাখ্যানের তত পক্ষপাতী  
ছিলেন না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে,  
যে বিষয় পৌত্তলিকগণও অবজ্ঞা করিয়া  
গিয়াছেন, খৃষ্টশিষ্যগণ তাহাতে কপ্পনার  
কুসুমবিকাশ দেখিতে পান এবং ইয়ুরো-  
চিত দৈবীশক্তি সন্দর্শনে পুলকিত হন।  
আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে দেশে  
পর্বতপ্রমাণ প্রভু নিচয় বিদ্যমান রহি-  
য়াছে, অষ্টাদশ মূলপুরাণ ও সেই পরি-  
মাণে উপপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ম-  
নুসংহিতা প্রভৃতি বর্তমান আছে এবং স-  
র্বোপরি মনুষ্যশক্তির অগম্য বেদচতুষ্টয়

\* গ্রোটস্কৃত ইতিহাস ৫৪৮ পৃ।

বিরাজ করিতেছে, ইয়াজী ভাষায় শি-  
কিত ও সংস্কৃতানভিজ্ঞ ইয়াজের মস্ত্রে  
দীক্ষিত দেশীয় যুবকগণ সেই আর্ধ্যদেবো-  
পাখ্যানের বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও  
অকুন্ধচিত্তে, দুইপাত ইলিয়ড পাঠ করিয়াই,  
গ্রীসের দেবগণের উৎকর্ষ প্রদর্শনে ও প্র-  
শংসাকীর্ণনে মুক্তকণ্ঠ এবং যত্নশীল। তাঁ-  
হাদিগকে আমরা নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় ইয়ু-  
রোপীর পণ্ডিতের মত পাঠ করিতে অনু-  
রোধ করি। এতদ্বারা তাঁহারা অনান্য  
দেবোপাখ্যান হইতে আর্ধ্য দেবোপাখ্যা-  
নের যে কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া-  
ছেন তাহা সম্যক বোধগম্য হইবেক।

গ্রোট সাহেব বলেন “গ্রীকদিগের  
দেবোপাখ্যান বহুপার্শ্ব বিশিষ্ট ও নানা  
চিত্রে অমুরঞ্জিত। ইহাতে অনেক দেব-  
দেবী এবং মানবমানবী আছে; তাহাদের  
চরিত্রও ভিন্ন ভিন্ন। মনুষ্যদিগের প্র-  
ত্যেক দোষ ও প্রত্যেক গুণ শরীর ধারণ  
করিয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; মহৎ ও কুস্র,  
কোমলাঙ্গ ও দৃঢ়কায়, নিঃস্বার্থ সাহসী  
পুরুষ এবং বিলাসপ্রিয় লম্পট, সকলেই  
দেবতা। † কি উপভাসের কথা! আবার  
আর্ধ্য দেবোপাখ্যান সম্বন্ধে কজ সাহেব  
লিখেন “ঐবদিক কবিগণের এই সহজ  
বাক্যাবলীদ্বারা একথা স্পষ্ট উপলব্ধ হই-  
তেছে যে যিনি আমাদের পিতা, আমা-  
দের শিক্ষক, এবং বিচারক, তিনিই সর্ব-  
শক্তিমান অদ্বিতীয় পরাংপর পরমেশ্বর,

† গ্রোটের ইতিহাস ৫৪৮ পৃষ্ঠা।

এই বিশ্বাস প্রাচীন আৰ্য্যভূমি হইতেই প্রথম উৎপন্ন হইয়াছে। বাহ্য জগতে তাঁ-  
হারা যত কিছু দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন।  
এবং হৃদয়ের সহজজ্ঞানদ্বারা যাহা অ-  
নবরত উপলব্ধি করিয়াছেন, তদ্বারাই  
তাঁহারা এই দৃঢ় বিশ্বাসের পথে নীত হ-  
ইয়াছিলেন। \* ”

এ বিষয় সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম ক-  
রিতে হইলে, ভট্ট মৌক্ষমূলর প্রণীত  
“ চিপস্ ফুন্ জার্ন ওয়ার্ক সপ ” নামক  
পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ড, রাজমন্ত্রী গ্লাড্-  
ফোর্টনের ভাষাবিষয়ক বক্তৃতা এবং এ-  
সিয়াটিক্ রিসার্চেস্ নামক গ্রন্থে সর উ-  
ইলিয়াম্ জোন্সের বক্তৃতা পাঠ করিতে  
হইবে।

ভারতবর্ষে যেমন দেবত্বের বর্ণনা  
আছে, গ্রীসের দেবোপাখ্যানেও সেইরূপ  
তিনটি দেবতার উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু উ-  
ভয়ে কত প্রভেদ! ভারতের পার্বতী,  
লক্ষ্মী, সরস্বতী কেমন অতুল্য!—সতী ও  
সরলা, উপকারিণী ও শ্রমবিধানী। কিন্তু  
গ্রীসের হিরি প্রভৃতির প্রকৃতি তাহার স-  
ম্পূর্ণ বিপরীত। ভারতের কৈলাস অতি  
পবিত্র স্থান, শান্তিনিকেতন ও যোগসা-  
ধনের উপযুক্ত স্থল। গ্রীসের অলিম্পাস্  
মন্দিরের বিলাসগৃহ প্রমোদাগার এবং  
কলহের রজভূমি। ভারতে গুণের অর্চনা,  
গ্রীসে রূপের সম্মান। হিন্দুদিগের প্রা-  
র্থনার উদ্দেশ্য মুক্তি, গ্রীকদিগের ঐহিক

ও দৈহিক শ্রুৎ। ভারতের দেবীগণের নিকট  
প্রার্থনা, মাতার নিকট বালকের প্রার্থনার  
মত, কিন্তু গ্রীসে পরীসাধনের ন্যায়।

ভারতের দেবোপাখ্যানে ভিনস্ এ-  
ডোনিস্ স্থান লাভ করিতে পারে নাই,  
এবং উছা মার্চের কলঙ্কেও কলঙ্কিত হয়  
নাই। ফলতঃ গ্রীসের দেবোপাখ্যানে  
সামান্য মনোবৃত্তির খেলা এত অধিক  
যে, উচ্চ বিষয়ের জন্য স্থান অতি অল্পই  
আছে। ভারতের দেবোপাখ্যানে কিঞ্চিৎ  
ভয়ের ভাগ থাকার সামান্য বৃত্তিনিচয়  
উৎসাহ পাইতে পারে নাই।

গ্রীসের দেবীগণের সহিত নির্ভিকঙ্ক-  
দয়ে প্রশংসা সংস্থাপনে অবজ্ঞা উৎপাদন ক-  
রিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষে সম্মান ও ভয় যু-  
গপৎ উপস্থিত থাকায়, সরূপ হইতে পারে  
নাই। এজন্য বলদৃশ্য উজ্জ্বল যুবাণুক  
গ্রীসের দেবোপাখ্যান ভাল বলিলেও  
সাহিত্যচর্চিত রত্ন তাহা বলিবেন না। দেবে  
ও মানবে প্রভেদ না থাকায় সমস্ত, অ-  
নর্থ উৎপাদিত হইয়াছে; এই জন্যই গ্রী-  
সের দেবোপাখ্যান অম্পদিনের মতোই  
রুখা হইয়া পড়িল। কিন্তু যখন গ্রীস  
জরায়ুগর্ভেও সংস্থিত হয় নাই, সেই স-  
ময়ের পূর্ব হইতে ভারতের দেবোপাখ্যান  
গঠিত হইয়াছে এবং আজি পর্যন্তও স্থির-  
ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। আৰ্য্য দেবো-  
পাখ্যানের দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠত্বের ইহাই প্রচুর  
প্রমাণ। ইহাতে, এক মাত্র ঈশ্বরোপাসনা,  
সাকার ও নিরাকার উভয় জ্ঞানই লাভ

হয়। এজন্যই এপর্যন্ত ইহার আদরের  
সুনতা হয় নাই, এবং লোকের বিশ্বাসের  
এত দ্রুত পরিবর্তন সত্ত্বেও যে, যাবৎ এই  
পৃথিবী আপনকক্ষে ঘূর্ণায়মান থাকিরা,

প্রকৃতির নিয়মে চক্রবর্ত্যকর্তৃক আলো-  
কিত হইবে তত দিন ইহা বিলুপ্ত হইয়া  
যাইবে না, তাহাতে আর অগুমাত্রও সন্দেহ  
নাই।

### দশম প্রস্তাব।

#### উপসংহার।

একদা একটি বালক চিত্র দেখিতে  
দেখিতে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া, তাহার রক্ত  
পিতামহকে দেখাইল একজন ক্ষীণদেহ  
ব্যাধ কেমন কৌশলে একটি ভয়ানক সিং-  
হকে বধ করিতেছে। রক্ত হাসিয়া বলি-  
লেন, মনুষ্যেরা চিত্র করিতে জানেন, তাই  
নিজের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য, নিজের  
বল বিক্রমপ্রদর্শনের জন্য সিংহ শিকার  
চিত্রিত করিয়াছে। কিন্তু সিংহ যদি ঐ  
রূপ ছবি আঁকিতে জানিত, তবে দেখিতে,  
একটি শিশুসিংহও অক্লান্তচিত্তে শত শত  
মনুষ্যের প্রাণ বধ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে  
সজোড়ে পাদ বিক্ষেপ করিতেছে, এইরূপ  
অনেক চিত্র চিত্রিত হইত। ভারতবা-  
সিগণের পক্ষেও এক্ষণে ঠিক তাহাই হ-  
ইয়াছে। বুদ্ধিবিক্রমকেশরী আর্য্যগণের  
কীৰ্ত্তিকলাপ সকল দেশীয় লেখকগণের  
বধা হইয়াছে। ভারতের ইতিহাস নাই,  
সেই বহুযায়ত চিত্রফলকে পূৰ্ব্বতন আৰ্য্য-  
গণের জ্ঞানগৌরবপ্রভৃতিও সবিস্তার অ-

নুরঞ্জিত হয় নাই; সুতরাং বিদেশীয়  
গণ ইচ্ছামত চিত্র রচনা করিয়া, স্ব স্ব দে-  
শের গৌরব রক্ষা এবং ভারতের গৌরব  
হাস করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন।  
অন্যের কথা দূরে থাকুক, পাশ্চাত্য বিদ্যা-  
ভিমानी সাহেবীপ্রিয় দুই চারিজন বাস্তা-  
লিও “ ভারতের প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, ইহা  
কেবল ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র প্রদেশ সমূহের একটি  
সাধারণ নাম মাত্র,” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে  
চিৎকার করিয়া থাকেন। যে দেশে দৈ-  
দৃশ নরাকারের অবস্থান, বিধাতা সে দে-  
শের কপালে কেন না দুঃখ লিখিবেন?

একেত ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত, তা-  
হাতে তাঁহাদের মত থণ্ডন করিবার উপ-  
যুক্ত ইতিহাসও বর্তমান নাই, সুতরাং এ-  
দেশের মহত্ত্ব ও গৌরব সম্বন্ধে অনেকের  
ভ্রম জন্মিবে বিচিত্র কি? যে দুই চারি  
খানি পুরাতত্ত্ব দেখা যায়, তাহাও অপর  
জাতীয় লোকেরা বিশ্বাস করে না। ভা-  
রতের প্রকৃত ইতিহাসই উপন্যাস; কিন্তু

অন্যে তাহা নিতান্ত কবিকল্পনা অথবা অ-  
তুল্য দোষে দূষিত বলিয়া অনাদর এবং  
উপেক্ষা করে। যদি প্রতিপক্ষ না থা-  
কিল, যুক্তি কেহই খণ্ডন করিতে প্রয়াস না  
পাইল, তবে আর লিখিতে বাধ্য কি ?  
এইজন্যই বকল্ তাঁহার সভাতার ইতি-  
হাসে ভারতীয় সভাতা উষাকালীন কুজ-  
ঝটিকার ন্যায় সহজ্রে উড়াইয়া দিলেন।  
দেবোপাখ্যানও নিতান্ত অবজ্ঞের এবং  
অশ্রদ্ধের বলিয়া সকলের প্রীতি জগাই-  
লেন, তাহাতে কেহই কিছু কহিল না।

তিনি গ্রীস ও ভারতবর্ষ এই দুই দে-  
শের প্রাকৃতিক অবস্থা ও অবস্থান হইতে  
আরম্ভ করিয়া সভাতার চরমসীমা পর্যাস্ত  
সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং  
সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞ, অথচ এতবড়  
এবং এত প্রাচীন আদিম সভ্য দেশটিকে  
তিন কথার সমালোচনা করিয়া গ্রীসের  
প্রাধান্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি তিনি  
অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় না হউক, কথঞ্চিৎ  
পরিমাণেও সংস্কৃত অবগত থাকিতেন,  
এবং ঐ ভাষার প্রধান প্রধান কতিপয়  
গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন, তবে বোধ হয়  
তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের কখনও ঐদৃশ ভ্রম-  
প্রমাদ সংঘটিত হইত না। অনুবাদ, রজ্জল-  
কাচসদৃশ। উহার মধ্যদিয়া প্রকৃত কি-  
ছুই দৃষ্ট হয় না। যে বর্ণের কাচ, দৃষ্ট  
বস্তুও সেই বর্ণের প্রতীত হয়। তা-  
হাতে আবার সংস্কৃতের প্রধান প্রধান  
গ্রন্থ সকল এখনও অনুবাদিত হয় নাই।

বিজ্ঞানশাস্ত্র এবং গণিতের শত শত  
গ্রন্থ আজিও অনুবাদিত রহিয়াছে। অথচ  
দুই পৃষ্ঠা অনুবাদ পাঠ করিয়া সকলেই  
সমালোচক হইয়া উঠে। গ্রীকগ্রন্থস-  
মূহ যেমন ইংরাজীতে অনুবাদিত হইয়াছে,  
সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থ সকল সরূপ হইলে  
কখনও এরূপ সমালোচনা দেখিতে হইত  
না। অনেকেই ভারতের সভাতা ও পাণ্ডি-  
তোর বিষয় অপেক্ষাকৃত উত্তম রূপ অবগত  
হইতেন। তাহা না হওয়াতেই, অনেক  
ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত ভ্রমাকারে পাদ চা-  
রণা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের অনু-  
গামী এদেশীয় যুবকগণও অনেকেই লজ্জা-  
জনক ভ্রমরূপে নিপতিত হইয়াছেন।

বকল্ সাহেব সংস্কৃতানভিজ্ঞ ছিলেন  
বলিয়াই স্বরচিত সভাতার ইতিহাসে, সহস্র  
সহস্র গ্রন্থের নামোল্লেখ করা সত্ত্বেও এ-  
কথার সংস্কৃত মূলগ্রন্থের নাম করিতে  
পারেন নাই; এজন্যই নিরপেক্ষ সমালো-  
চনা হয় নাই। আরও একটি কারণ ছিল।  
বসোয়েট্ ফ্রান্সের সভাতার ইতিহাস  
লিখিতে আরম্ভ করিয়া সাহস্বারে নির্দেশ  
করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি পৃথিবীর সভাতা  
জানিতে ইচ্ছা করে, সে ফ্রান্সের সভাতার  
ইতিহাস অধ্যয়ন করুক। বকলের মনেও  
কার্য্যে সেই ভাবই প্রকাশ পায়। তিনিও  
ইংলণ্ডকে সমস্ত পৃথিবীর অনুকৃতি স্বরূপ  
জ্ঞান করিয়া তাহার সভাতায় সমস্ত পৃথি-  
বীর সভাতা লীন করিয়াছেন। এই একটি  
উদ্দেশ্য সর্বদা দৃষ্টিপথে বিরাজমান থা-

কাতেই তিনি পক্ষপাতস্পর্শশূন্য হইতে পারেন নাই। বসোয়েট প্রাচীন সভ্য-জাতি সমূহের ইতিহাস প্রকটনে প্রয়াস পান নাই; তিনি ভারতবর্ষ, মিসর ও পারস্য প্রভৃতির আদিম সভ্যতাকে সমধিক নিন্দা করিয়া স্বদেশীয় সভ্যতার উৎকর্ষ প্রদর্শনে সঙ্কোচ জ্ঞান করিয়াছেন, সেই জন্যই ঐ সকল দেশের নামও উল্লেখ করেন নাই। এজন্য বকল বলেন “তিনি (বসোয়েট) পারস্যদেশবাসিনীগের কথা প্রায় কিছুই বলেন নাই; মিসরীয়দিগের বিষয় আরও অল্প বলিয়াছেন। বিশেষতঃ সিক্সন ও গ-জানদীর মধ্যবর্ত্তি প্রদেশস্থ পূর্বোক্ত জাতি-মুখ্য হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ অধিবাসিগণের—যাঁহাদের বিজ্ঞান শাস্ত্র আলেকজেন্দ্রিয়ার বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলস্বরূপ,—যাঁহাদের অ-তিন্মুখ্য ন্যায়শাস্ত্রের স্বত্ব সকল ইয়ুরোপীয় ন্যায়শাস্ত্রের সমস্ত উদ্যমের পুরোবর্ত্তি এবং যাঁহাদের অত্যাৎকৃষ্ট ভাষায় লিখিত অত্যাৎকষ্ট বৈজ্ঞানিকতত্ত্বের অনুসন্ধানসমূহ, যে সময় ইহুদিগণ সকল প্রকার পাপে কলঙ্কিত হইয়া এক ভ্রাম্যমান দলবাবাসায়ি জাতির ন্যায় পৃথিবীর স্থানে স্থানে বিচরণ করি-রাছিল, যখন সকলের বিব্রন্ধেই তাহারা হস্তোত্তোলন করিত এবং সকলের হস্তই তাহাদের বিব্রন্ধে উত্তোলিত হইত, তাহার সমসাময়িক,—সেই আৰ্য্য জাতির নামো-ল্লেখও করেন নাই \*। ” কিন্তু বকল যখন গ্রীসের সহিত ভারতের তুলনা ক-

\* সভ্যতার ইতিহাস, দ্বিতীয় পুস্তক

রিয়াছেন, তখন আর তাঁহার এরূপ ভাব ছিল না। তখন বলেন, “ ভারতবর্ষ গ্রী-ষ্মপ্রধান দেশ; প্রকৃতি অতিশয় ভয়ঙ্করী। পৃথিবীর মধ্যে অত্যাৎকষ্ট পর্ব্বতশ্রেণী, সুরহৎ নদনদীনিচয়, বিস্তীর্ণ মরুভূমিসমূহ, বহ্বা-য়ত বনরাজ্যী, তরঙ্গায়িত সমুদ্র প্রভৃতি অ-বিস্তৃত থাকায়, ভারতবর্ষ প্রকৃতির ভয়ঙ্করী সমুত্তি হইয়াছেন। সমুদ্রাশয়ও প্রকৃতিভয়ে ভীত হইয়া জড়োপাসনার নিরত হই-য়াছে। এই জন্যই ভারতে এত কুসং-স্কার। আমরা তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকে, দেবচরিত্রে, দেবমন্দিরের আকৃতিতে সর্ব-ত্রই ইহার প্রমাণ দেখিতে পাই। এই-রূপে তাহাদের কম্পনাশক্তি জ্ঞানের নীমা অতিক্রম করায়, তাহাদের সকলই অস্বাভাবিক ও অসীক হইয়াছে। কিন্তু গ্রীসে তাদৃশ কিছুই নাই। গ্রীস প্রকৃতির মধ্যবিস্তা সমুত্তি। সেখানে কবির কম্পনা জ্ঞানের অধীন থাকায়, সকলই স্বাভাবিক হইয়াছে। এই জন্যই গ্রীসে অন্যান্য দেশের পূর্বে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্রের আবির্ভাব দেখিতে পাই; এবং এই জন্যই দেবমূর্ত্তি সকলও অতি সহজ স্বতঃসিদ্ধ কম্পনার ফল অর্থাৎ মনুষ্যের ন্যায় শরীর-ধারী। সুতরাং গ্রীসের শ্রেষ্ঠই অবিসং-বাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইল। † ”

ভারতবর্ষ গ্রীস হইতে অত্যানু চম্পি-গুণে বহৎ। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য যে স-র্বত্রই ভয়ঙ্কর তাহা নহে। যেমন একদিকে

† সভ্যতার ইতিহাস, প্রথম পুস্তক।



অত্রভেদী হিমাচলের অনন্তত্বারমাণ্ডত ভীষণ দৃশ্য, তেমনই আবার অন্যদিকে, নর্থদাতটে হরিৎ শস্যশোভিত প্রাকৃতিক শোভাসম্বিত ক্ষেত্র সমুদায় বিরামমান; যেমন সিদ্ধু দেশের মক্ভূমি দৃষ্টিে অশুঃকরণে দাকণ আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তেমনই আবার বঙ্গদেশের রমণীয় নিকুঞ্জবন শ্যামলশস্যপূর্ণ ক্ষেত্রনিচয়, আনন্দপরিপূরিত বিলাসভবন এবং স্বচ্ছ সরোবরের মধুরিমা অবলোকন করিলে, হৃদয় উৎসাহে ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। যে দেশে অরণ্যে সিংহবাত্তাদি বিচরণ করে সে দেশের কুঞ্জবনে কোকিল, শ্যামা, বুনবুলের অভাব নাই। ভারতে ভয়ঙ্কর গ্রীষ্ম আছে, মনোহর গ্রীষ্ম আছে, এবং মধ্যমাবস্থা গ্রীষ্মও বর্তমান আছে; ভারত প্রকৃতির ক্রীড়ানিকেতন, সমস্ত পৃথিবীর অনুকৃতি। যদি বিরোসিয়া প্রভৃতি নগরীনিচয় গ্রীষ্মের মধ্যবর্ত্তি থাকিয়াও সমস্ত দেশ হইতে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইতে পারিল, ভারতের অন্তর্ভূত প্রদেশ সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে বিচিত্র কি? এরূপ হইলে হয়ত কোন অংশ অধিক কুসংস্কারজড়িত এবং কোন স্থল অল্প কুসংস্কারযুক্ত হইতে পারিত, কোন স্থলে নিরাকার উপাসনা হইত, কোথাও বা সাকার উপাসনা হইত অথবা কোন প্রদেশে গ্রীষ্মের নায় ধর্ম প্রচলিত থাকিতে পারিত। গ্রীষ্মের জন্মের বহু পূর্বে দাক্ষিণাত্য সভ্য হইয়াছে, তাৎকা-

লিক তামেল সাহিত্য যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল; তাহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, কিন্তু সে সমস্ত প্রদেশেও বিভিন্ন প্রকার ধর্ম প্রচলিত হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষে একরূপ দেবোপাসনা প্রচলিত থাকায় একথা স্পষ্ট উপলব্ধ হয় যে, মাত্র দেশের প্রাকৃতিক অবস্থানে ধর্মের পরিবর্তন বা ঐকমত্য হয় না, অন্যান্য কারণেও অনেক কার্য সম্পন্ন করে। যে বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া আখ্যাবর্ত্তে পৌরাণিক ধর্ম প্রবর্তিত হয়, সেইরূপ বিজ্ঞান অনুসরণে দাক্ষিণাত্যেও পুরাণপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। ইহা বাহ্যজগতে প্রকৃতির হস্ত সন্দর্শনের ফল না হইয়া বরং শত শত বৎসরের মানসিক চিন্তার ফল বলিতে হইবে। নতুবা সমস্ত স্বভাবজ হইলে যে দেশে স্থানভেদে কাব্যে কাব্যে এত প্রভেদ সে দেশে দেবোপাসনাও প্রদেশ বিশেষে নিশ্চয় ইভিন্ন ভিন্ন হইত।

একগুণে স্থানের সমাবেশ দেখিতে হইবে। ভারতের দক্ষিণাংশ উষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত, কিন্তু উত্তরাংশ বিশেষতঃ যে প্রদেশে প্রথমতঃ আখ্যাসভ্যতাবিস্তার হইয়াছে সেই সকল স্থল সমমণ্ডলেই অবস্থিত। সমস্ত আখ্যাবর্ত্ত, তথ্যাত্মক সভ্যতার বালশয্যা ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষ প্রদেশ সমমণ্ডলমধ্যবর্ত্তি। কাশ্মীর দেশ গ্রীষ্মের সহিত এক অক্ষাংশে অবস্থিত। কাশ্মীরও গ্রীষ্মের জ্যেষ্ঠ, শ্রুতরাং চতুর্দিকে ঈশালমালা পরিবেষ্টিত, অন্যান্য প্রদেশহইতে

বিযুক্ত কাশ্মীর রাজ্যে, প্রচলিত দেবোপা-  
খ্যানহইতে স্বতন্ত্র এণালীর, সম্ভবতঃ গ্রী-  
সের একরূপ ধর্ম-প্রবর্তিত হইতে পারিত।  
কাশ্মীর ও গ্রীসহইতে অনেক রুহু, প্রকাণ্ড  
পর্বতনিচয় মাত্র সম্ভুলের ভয়ঙ্কর দৃশ্য।  
লোকে মাত্র পর্বতেরই উপাসনা করিতে  
পারিত। তাহা না হইয়া যখন ভারতের  
সর্ব্বাংশ প্রতিষ্ঠিতপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে,  
তখন সূর্য্যের অবস্থান অনুযায়ী স্থানের  
সমাবেশও যে ভারতের ধর্ম পরিবর্তন  
করে নাই একথা স্বীকার করিতে হইবে।

সভ্যতার তুলনা করিতে স্বকীয় ইতি-  
হাসের প্রথম পৃথকে বকল যে গ্রীসের  
বিজ্ঞানপ্রভৃতি শাস্ত্রে প্রাথমিক জ্ঞান ও  
শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, যদি  
তিনি ভারতের জ্ঞানোন্নতির বিষয় অবগত  
থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপন মত  
ভ্রান্তিপ্রণোদিত বলিয়া স্বীকার করিতেন।  
ভারতীয় জ্ঞানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে অনেকে  
অনেক কথা লিখিয়াছেন, এক্ষণে তদ্বি-  
ষয়ের বাস্তবতা বর্ণনার প্ররুত হইলে অ-  
মাদের বর্ণনার বিষয় অতিক্রম করিয়া  
দূরে যাইতে হয়। কিন্তু বর্ণনীয় বিষয়ের  
সহিত সভ্যতার সম্বন্ধ অতি সন্নিহিত ব-  
লিয়া দুই একটি কথা উল্লেখ না করিয়া  
থাকিতে পারিলাম না। জ্যোতিষ, গ-  
ণিত, পদার্থতত্ত্ব, ভূগোল, দর্শন প্রভৃতি  
শাস্ত্র সমুদয়কে ভারতের সুস্থান বলিয়া  
অনেকেই নির্দেশ করিয়াছেন; যাহারা সে  
সকল সবিস্তারিত অবগত হইতে ইচ্ছা

করেন তাঁহারা ‘বজ্রদর্শনে’ ‘আর্য্যজা-  
তির মহিমা’ নামক প্রবন্ধ পাঠ করি-  
বেন। এক্ষণে এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে  
যে সমস্ত বাস্তবলিসাহেব তাহাতে অ-  
নায়া প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রাণ-  
ধের জন্য দুই একজন ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের  
মত উদ্ধৃত করিতেছি। সাহেবের নাম-  
সংযোগ না দেখিলে যাহারা বিশ্বাস ক-  
রেন না কেবল, তাঁহাদের জন্যই উদ্ধৃত  
করিতেছি।

আসিয়াটিক সোসাইটির তাত্‌কালিক  
সভাপতি সংস্কৃতভাষাবিশারদ প্রসিদ্ধ  
পণ্ডিত তাঁহার স্বজাতীয় ভাষা ইংরাজীতে  
যাচা লিখিয়াছেন, তাহার অনুবাদ এই।  
‘যাহা হইতে পিথাগোরসের শিবাগণ  
অনেক মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অ-  
নুমিত হয়, ভারতের এবং আনিয়ার প্রসিদ্ধ  
ও সম্মাননীয় অপরাপর প্রদেশের প্রা-  
কৃতিক বিজ্ঞানের সেই আংশের বিষয়  
জ্ঞানান্তরে উল্লেখ করিয়াছি। সিসিরো ব-  
লেন যে ইয়ুরোপের প্রাচীন পণ্ডিতগণ  
কেন্দ্রাতিমুখ বল ও মাধ্যাকর্ষণের সাধারণ  
নিয়মের কিছু কিছু অবগত ছিলেন, কিন্তু  
তাঁহারা তাহা প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান  
নাই। সূত্রাং অপর নিউটনের অফগ-  
কোর্টি কিরীট হইতে একটি পত্রও ছিন্ন না  
করিয়া একথা সাহস পূর্ব্বক নির্দেশ ক-  
রিতে পারি যে তাঁহার সমস্ত পরমার্থতত্ত্ব  
এবং বিজ্ঞানের একাংশ বেদের মধ্যে  
এবং সফি (পারস্যাবাসী) দিগের গ্রন্থেও

প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাও নির্দেশ করিতে পারি যে তিনি কেন্দ্রাভিমুখ ও কেন্দ্রবিমুখ বলের কারণ স্বরূপ যে অতি ক্ষুদ্রশক্তি প্রত্যেক জড় পদার্থে নিহিত আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা, আলোকের নির্গমন প্রতিফলন ও কিরণরেখাগুলির প্রতিগমন ও ভঙ্গ হওয়ার বিষয়; বিদ্যুতের ধর্ম, তাপের বিষয়, ইন্দ্রিয়দ্বারা বোধ হওয়া, এবং বল ও গতির বিষয় সমস্তই পাঞ্চভৌতিক কার্য বলিয়া হিন্দুগণ নবিস্তার বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। বেদেও জড় পদার্থের সাধারণ আকর্ষক এক বলের উল্লেখ আছে, তাহারা ( হিন্দুরা ) স্বর্ষ্যকেই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন; এজনা স্বর্ষ্যের নাম আদিতা ( আকর্ষক ) ” \* তিনি আরও বলেন যে ‘ পিথাগোরাসের মনোবিজ্ঞান এবং জিনোর পরমাখ্যত্ব ভারতের সাংখ্য দর্শনের অনুকরণ । ’ † তিনি বলেন ‘ নৃবিজ্ঞ দেবিস্তানের গুণ্যকার বলেন ‘ পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এবং পারস্যাদিকৃত অনেক প্রদেশে এরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যে তাহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কানিস্থিমেন্স তাহার পিতৃব্য সমীপে ভারতের যে সমস্ত আশ্চর্য্য বস্তু প্রেরণ করেন তন্মধ্যে এক প্রণালীর ন্যায় শাস্ত্রের গুণ্য ছিল, ( ন্যায় দ-

র্শন) ব্রহ্মাণেরা অমূল্যবস্তু গ্রীকজাতিকে সেই শাস্ত্রে দীক্ষিত করেন। ’ এই মুসলমান লেখক ইহা অনুমান করেন যে এই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া আরিস্তুতল তাঁহার মনোবিজ্ঞান ও ন্যায় শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। তিনি আরও বলেন যে প্লেটো ও ইপিকার্মস্ বেদান্তদর্শন অবলম্বন করিয়া আপন আপন ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ’ \*

একগণে পাঠক গ্রীসের বিজ্ঞানের প্রাচীনত্ব বিবেচনা করিবেন।

এই দীর্ঘ সমালোচনার সকলেই দেখিবেন ভারতের দেবোপাখ্যান প্রণেতৃবর্গের প্রতি কি অবিচার করা হইয়া থাকে। যিনি ইংরেজ গ্রন্থকারগণের মস্ত্রে দীক্ষিত, হয়ত তাঁহার মনে হইবে প্রস্তাব লেখক চেষ্টা করিয়া পক্ষপাত করিয়াছে, অনায়াসরূপে ভারতীয় দেবগণের প্রাধান্য সংস্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছে। আবার সংস্কৃতজ্ঞ গোড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনে করিবেন ইংরাজী ভাষা অধ্যয়ন করায় ইংরাজ লেখকগণের লম্বন ও গোঁরব রক্ষা করিতে গিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সমস্ত বর্ণন করিতে সাহসী হয় নাই। যেই বাহা মনে করেন, ষাঁহারাই দুই দেশের দেবরত্ন সম্মুখে রাখিয়া সমালোচনা করিবেন, এরূপ ভরসা হয় যে, তাহাদের মত আমাদিগের মত হইতে বড় বিভিন্ন হইবে না। তবে মনুষ্যের কচি ভিন্ন ভিন্ন; প্রকৃতিও স্বতন্ত্র

\* এসিয়াটিক রিসার্চেস্ চতুর্থ পুস্তক

১৭৭ পৃ।

† ঐ।

\* এসিয়াটিক রিসার্চেস্ ১৭৬ পৃ ইত্যাদি।

স্বতন্ত্র, স্বতরাং কোন কোন স্থলে প্রভেদ  
'হওয়া' আশ্চর্য্য নহে।

যে সমস্ত বাঙ্গালি বাবু ডাঃ ই-  
য়োর দুর্গাকালী বলিয়া সাহেবের ন্যায়  
জড়জী করেন এবং খ্রীস্টের দেবোপা-  
খ্যান অনেক ভাল বলিয়া নির্দেশ করেন,  
তঁাহাদিগকে জিজ্ঞাসা এই যে তঁাহারা  
কি দেখিয়া খ্রীস্টের দেবদেবীর পক্ষ-  
পাতী? যদি যিগসের ও ভিনসের ব্যভি-  
চার, হিরির ও তাহার সজিনী আরির  
ক্রোধ ঈশ্বা ও কোটীলা, হার্শেসের প্রতা-  
রণা চৌর্য্যহস্তি ও শঠতা প্রভৃতি প্রশংস-

নীর গুণ বলিয়া তঁাহারা গ্রীক দেবদেবীর  
পক্ষ অবলম্বন করেন, তঁাহাদের বন্ধুবর্গের  
ও অভিভাবকগণের কর্তব্য যে মথো  
মথো তঁাহাদের কার্য্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি  
রাখেন। এরূপ বাবুদের জন্য ব্যাকস্  
ইপিকিউরস্ আছে, এদেশেও চার্ব্বাকের  
প্রশস্ত পথ আছে। দুয়ারোহ ভারতের  
দেবোপাখ্যানশৈল আরোহণ করিয়া শীর্ষ  
দেশে কি আছে, তাহা তঁাহাদের দেখিয়া  
আবশ্যক নাই।

সমাপ্ত।

শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস।

## অবেক্ষণশক্তি।

পাঠক, বড় বিগদে পড়িয়াছি। নানা  
কারণে কিছু দিন বাঙ্গবসম্পাদকের কিছু  
মাত্র অবকাশ ছিল না; এই হেতু  
কএক সংখ্যা বাঙ্গব প্রকাশে বিলম্ব হয়।  
আপনারাও 'অনবকাশের' ওহর গ্রাহ্য  
করিবেন না; স্বতরাং সম্পাদক লে-  
খকদিগের নিকট প্রবন্ধ চান। করি  
কি লেখনী হস্তে কাগজ সম্মুখে লইয়া ভা-  
বিত্তে ভাবিত্তে একটি বিষয় নির্ণয় করি-  
লাম; কিন্তু কি নামে বিষয়টির নাম-  
করণ করি, তাই ভাবিয়াই অস্থির।  
'দৃশ্', 'লুচ্' ও 'ঈচ্' তিনটি ধাতু  
লইয়া একে একে উপসর্গ গুলি যোগ ক-

রিয়া দেখিলাম, কিছুতেই ইংরেজী শাস-  
ত্রের প্রতিশব্দ পাইলাম না। অবশেষে  
যেটি নির্বাচন পূর্ব্বক উপরে স্থাপিত ক-  
রিয়াছি, তাহাও মনোমত হয় নাই। তবে  
ইংরেজী উপসর্গের সহিত বাঙ্গলা উপসর্গ-  
টির মিল আছে, এইমাত্র। এস্থলে একটি  
গম্প মনে পড়িল। গত দুর্ভিক্ষ হইতে  
গবর্ণমেন্টে ফাটিক্‌ক্‌ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ  
করিয়াছেন। কোন স্থানের কালেক্টর  
একজন বাঙ্গলানবিশ ডেপুটীকালেক্টরের  
প্রতি উহা সংগ্রহ করিতে আদেশ করিবেন,  
মনে করিয়া, পাছে উক্ত কর্মচারী ঐ শ-  
ব্দের অর্থ না বুঝেন, এই সম্ভেদ করিয়া,

সেরেসাদারকে কহিলেন, উহা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দেও। সেরেসাদারের মহা বিপদ, দিশাহারা হইয়া তিনি উচ্চারণ সাধুশোর উপর নির্ভর করিয়া লিখিলেন ‘স্থিতি স্থাপক।’ সাহেব সম্মুখ হইলেন, ভাবিলেন সেরেসাদার বেশ বাঙ্গলা জানেন। কিন্তু পাঠক আমার অনুবাদটি কি আপনাদের নিকট তরুণ ‘পাশ’ হইবে? বাহউক, সংপ্রতি মূল প্রস্তাব আরম্ভ করা যাউক।

শ্রীমতী মিস্ নাইটিংগেলের নাম অনেকেই অবগত আছেন। তিনি কহিয়াছেন, ‘চিকিৎসালয়ে যে সকল খাজী আছে, তাহাদের অন্যান্য গুণ সত্ত্বেও একটি প্রধান দোষের জন্য রোগীদিগের তত সুবিধা হয় না। সে দোষটি অবৈষ্ণবের অভাব, এ দোষটি শুদ্ধ খাজীদিগের নহে; প্রায় লোক মাত্রেই। যদি লোক মাত্রেই এই শক্তিসম্পন্ন হইত, তবে পৃথিবীতে উন্নতি বিষয়ে এতদিন যুগান্তর উপস্থিত হইত। কেহ বলেন, অভিজ্ঞতাবারা লোকে জানী হয়, অর্থাৎ কেহ দেখিয়া শিখে, কেহ চেকিয়া শিখে, আবার কেহ বা ঠকিয়া শিখে। কিন্তু আমরা বলি এ মত নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমশূন্য নহে। কারণ, ‘দেখা’ ‘চেকা’ দূরে থাকুক, অনেকে পদে পদে ‘ঠকিয়াও’ যে অজ্ঞ সেই অজ্ঞই থাকে। বাহাদের চরিত্রে স্বাভাবিক দোষ থাকে, কোনরূপ অভিজ্ঞতাই তাহাদিগকে জানী করিতে পারে না। যদি তাহা

হইত, তবে প্রথম চার্লস ভূপতি রাজ্যচ্যুত ও ছিন্নশির হইতেন না। বোম্বেন পরিবার কোম কালে জানী হইল না; তাহা হইলে আজিও করাসের সিংহাসনে তাহারা বিরাজ করিত। কুলাঙ্গার জয়চন্দ্র ঘোড়িয়ান মহম্মদকে বৈরনির্ধাতম বানসে আব্বান করাতে ডারভরাজ্য স্বেচ্ছকবলিত হইল; তাহাতে যদি হিন্দুদিগের জ্ঞানোদয় হইত তবে কি পলাসীর অভিনয় হইত? ঐতিহাসিক প্রমাণেরই বা প্রয়োজন কি? আমরা সর্বদাই দেখিতে পাই অনেক লোক চিরকালই নির্বুদ্ধিতা প্রদর্শন করেন। অনেকে বাল্যকালে বরং একটুই জ্ঞানের স্মৃতি দেখান, যত বড় হন নির্বুদ্ধিতা তত বর্জিত হইতে থাকে। অবৈষ্ণবশক্তিসম্পন্ন লোকই স্বতন্ত্র—বাল্য ও বার্জিক্যের সহিত উক্ত শক্তির কোন সম্পর্ক নাই। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট যখন প্রথম কঙ্গন হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম কত? কিন্তু তখন তিনি অস্ট্রিয়ার অনেক বৃদ্ধ ও সমরাত্মক সৈন্যাদ্যাককে পরাভব করিতে পারিয়াছিলেন। সেনানী উল্কেসন বিক্রম প্রকাশ করিয়া সমরক্ষেত্রে শায়িত হইয়াছিলেন। অথচ মৃত্যু সময়ে তদীয় বয়ঃক্রম এত অল্প ছিল যে, তাঁহাকে বালক-সেনানী বলিলেও হয়; কিন্তু তদানীন্তন বয়োবৃদ্ধ সেনানীরাও তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিতেন। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী উলিয়ম পিট অপরিণত বয়সে পার্লামেন্টে স-

ভাতে তদীয় বিক্রপকাহ্নিদিগকে কেমন প্রবীণোচিত উত্তর দিয়াছিলেন। বালক— ফাঙ্কসন এক গাছি স্বত্র লইয়া খেলা-ইতে খেলাইতে নিশ্চল-নক্ষত্রপটলের পর-স্পর ব্যবধান পরিমাণ করিয়াছিলেন এবং বায়ুর অবস্থা-নির্ণয় করিয়া কতই প্রাজ্ঞতা দেখাইয়াছিলেন। এই মহাত্মারা সকলেই অবৈক্ষণশক্তি অপরাপর লোকদিগের অপেক্ষা এত শ্রেষ্ঠ হইয়া লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। ফলতঃ অবৈক্ষণ-বিশিষ্ট বালক অনেক বয়োবৃদ্ধ অপেক্ষা যে প্রবীণ তাহার আর তুল নাই।

জ্ঞানকে ঈশ্বরদত্ত গুণ বলিলে অসঙ্গত হয় না। অবৈক্ষণই জ্ঞানের প্রসূতি ও ধাত্রী। এই অবৈক্ষণশক্তি অন্যান্য শক্তির ন্যায় অভ্যাসে পরিবর্দ্ধিত হয়। মিস্ নাইটিংগেল যাহুর বরার্ট হুডিনের নাম উল্লেখ করিয়া কহেন ‘সে অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের জন্য বিখ্যাত হইলেও, অবৈক্ষণশক্তির পরিচালনার নিমিত্ত স্বীয় পুত্রকে যে পদ্ধতির অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত প্রাজ্ঞোচিত।’ সে পদ্ধতিটি এই;—হুডিন স্বীয় পুত্র সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে কোন বিপণীর নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে তাহাকে তৎক্ষণাত্ৰ ত্রব্য সকলের প্রতি মনোযোগ পূর্বক দৃষ্টি করিতে বলিত। পরে পিতাপুত্র দুই দৃষ্ট বস্তুগুলির একটি তালিকা লিখিত। এইরূপে উক্ত বালকের অবৈক্ষণশক্তি

এত উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, সে এক বার কোন দোকানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তৎক্ষণাত্ৰ ৬০।৭০টি বস্তুর আকৃতিস্থিতি প্রভৃতির যথাযথ বর্ণন করিতে পারিত। ইহার ‘দিব্যচক্ষু’ বলিয়া লোকসমাজে পরিচয় দিয়া অর্থোপার্জন করিত। বালক হুডিন এরূপ আশ্চর্য্য শক্তি লাভ করিয়া ছিল যে, কোন গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার চক্ষুর্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধন করিয়া ফেলিলেও, সে, গৃহস্থিত সমুদয় ব্যক্তি ও সকল সামগ্রীর স্বক্ষ বর্ণন করিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিতে পারিত। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত যে, সে শিরা ও ধমনী সংযোগে সমুদয় বস্তু দেখিতে পায়।

পাঠক মহাশয়দিগকে হুডিন ঘরের ন্যায় যাহুর হইবার জন্য আমরা পরামর্শ দেই না; কিন্তু অবৈক্ষণশক্তির পরিচালনা বিষয়ে তাহার নিশ্চয়ই অনুকরণীয়। এই শক্তির কত যে মহৎফল তাহা বলা যায় না। প্রাত্যহিক ব্যাপারে ইহার অভাবজনিত কুফল সর্বদাই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রভু অবৈক্ষণশক্তি বিরহিত হইলে ভ্রাতার দ্বারা আশানুরূপ কার্য্য পান না; কোন বিষয়ে মধ্যস্থতা করিতে গেলে জমে পতিত হইতে হয়; একটি সামান্য উদাহরণ প্রদর্শন করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। কিছুদিন হইল কোন বিদ্যালয়ের, একটি বালক সমপাঠীর একখান পুস্তক

অপহরণ করিয়াছিল; উক্ত পুস্তকের যে যে স্থানে অধিকারির নাম লেখা ছিল, তাহা তুলিয়া ছিল, পুস্তকের মলাট পৰ্য্যন্ত পরিবর্তন করিয়া ছিল, কিন্তু অধিকারী পত্রসমষ্টির গাত্রে পেন্সিল দিয়া যে স্বীয় নাম লিখিয়া রাখিয়াছিল, অবৈক্ষণাত্যব বশতঃ তাহা দেখিতে পার নাই; সুতরাং চুরির কএক দিন পরে বিদ্যালয়ে পুস্তক খানি লইয়া আসামাত্র ধরা পড়িল। পাঠক অনেক সময় শুনিয়া থাকিবেন, হতবাক্তির কোন বস্তু পরিধান পূৰ্ব্বক পুলিস কর্তৃক হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে।

ইতিহাস মন্থন করিলে এই অবৈক্ষণ শক্তির এত ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায় যে, তৎসমুদয় উল্লেখ করিতে গেলে এই একই প্রবন্ধে অনেক সংখ্যা বান্ধবের কলেবর পূর্ণ হইতে পারে। বালক বেঞ্জামিন ফ্রান্সলিন যুড়ি উড়াইতে উড়াইতে তাড়িতাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন; নিউটন আতা ফলের পতন অবলোকনে মাধ্যাকর্ষণ ও শিশুদিগকে সাবানবুদ্বুদ লইয়া ক্রীড়া করিতে দেখিয়া বর্ণবিজ্ঞানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র যখন লিখিয়াছিলেন—

‘কাঞ্চীপুর বর্জমান ছয় মাসের পথ।

ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥’

অথবা ভারতবর্ষে রেলওয়ের কথা হইলে একজন আধুনিক কবিওলা যখন গাইয়াছিল—

‘লোকে একদিনে কলকাতা হ’তে সদা  
যাবে কাশী।’

তখন লোকে উহা কবিকল্পনা বলিয়া ভাবিয়াছিল মাত্র; কিন্তু রেলওয়ে তাহা সত্য ঘটনা বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। অবৈক্ষণপ্রভাবে একটি সামান্য ঘটনা দেখিয়া জেমস্ ওয়াট এই বৃহৎ কাণ্ডের আবিষ্কার করেন। কেবলিতে চা সিজ হইতেছিল, তখন পাত্রমধ্যস্থ কক্ষবাল্পপ্রভাবে আবরণটি উত্তীর্ণ হইতেছে দেখিয়া ওয়াটের অন্তঃকরণে বাষ্পের শক্তির ভাব প্রথম উদ্ভূত হয়, এবং তাহারই ফল বাষ্পীয় পোত, বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি \*। এই যে ঘটনাবলীতে টক্ টক্ করিয়া দোলকটি ইতস্ততঃ নড়িতেছে, ইহাও অবৈক্ষণের ফল। পাইসা নগরীর একটি গির্জাতে একজন ফরাশ সন্ধ্যা সময়ে ঝড় লগ্নন জ্বালিয়া দিতেছিল, একটি শিকে হস্ত লাগিয়া ইতস্ততঃ হুলিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া গালিলিওর মনে হইল, যদি কোন ক্রমে এরূপ ভাবে একটি বস্তু দোলাইয়া দেওয়া যায় যে, তাহা বাধা না পাইলে চির দিন হুলিতে পারে তবেই তদ্বারা সময় নিরূপণ করা যায়। এই সিদ্ধান্ত

\* এই স্থলে পাঠককে কিংসলীকৃত

‘মেডাম হাউ লেডী হোয়াই’ গ্রন্থের ভূকম্প প্রস্তাবটি; ও বেনফোর্ডকৃত প্রাকৃত ভূগোলের উপক্রমণিকাটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

হইতেই ঘটিকায়ত্ত্বের সৃষ্টি। সামুদ্রিক মানচিত্র ও সামুদ্রিক স্রোত অববেক্ষণ করিয়া কলম্বাস নৃতন মহাদ্বীপের সত্ত্বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। পুনশ্চ যখন কলম্বাসের সঙ্গিগণ তান্ত্র ও ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া হতাশচিত্তে তদীয় প্রাণ সংহার করিতে রুতসংকল্প হইয়াছিল, তখনও তিনি এই শক্তির প্রভাবে একটি সামুদ্রিক তৃণ ও কএকটি পক্ষী দেখাইয়া কহিয়াছিলেন ভূমি অধিক দূর নহে। কলম্বাসের নামের উল্লেখ করাতে একটি গল্প মনে পড়িল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না \*। কলম্বাসের বিদ্রোহী বলিয়া ফিরিতেন, আমেরিকা আবিষ্কারে তাঁহার অধিক গুণপনা কি প্রকাশ পাইয়াছে? উহা অনেকই পারিত, অথচ পূর্বে অনেকেই কলম্বাসের কথাকে উদ্ভাটকের প্রলাপ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন†। একদা কোন স্থানে কলম্বাসের কএক জন দ্রোহী একত্রিত হইয়া ঐরূপ বিক্রম করিতেছেন, তখন কলম্বাস একটি অশু সোজাভাবে বসাইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন ‘আপনারা এক আঘাতে এটি ভগ্ন করুন’ সকলেই অরুত-কার্য্য হইলেন : তখন কলম্বাস অশুটিকে দ্বয়ং ছেলাইয়া বসাইয়া অশু আঘাতেই ভগ্ন করিলেন। তখন সকলেই হাসিয়া করতালি দিয়া উঠিলেন ‘ওরূপ করিলে

\* চেম্বার্স মিসেলেনিতে দ্রষ্টব্য।

† প্রেস্কটের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

আমরাও পারিতাম’ তখন কলম্বাস তভাবে উত্তর করিলেন ‘মহাশয়গণ, হাস্য ও করতালি প্রদান করা সহজ বটে; কিন্তু এই বুদ্ধিটুকু পূর্বে আপনাদের কাহারও ঘটে আসে নাই’। তখন সকলেই লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন।

আবিসিনিয়ার যুবরাজ স্বাধীন পশু পক্ষীর সহিত স্বীয় অবস্থার তুলনা করিয়া হুঃখিত হৃদয়ে বসিয়া আছেন। ‘মুখ-নিকেতন’ হইতে প্রশ্রয় করিতে এতদিন কোন যত্নই করেন নাই, এই ভাবিয়া আপনাকে ধিক্কার দিতেছেন; এমন সময়ে একটি দামী একটা কাচপাত্র ভাঙিয়া হুঃখ করিতেছিল, সহসা বলিয়া উঠিল, ‘বাহা গিয়াছে তাহা যখন আর পাওয়া যাইবে না, তখন গতানুশোচনায় ফল কি?’ যুবরাজ চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, ‘আমি কি অন্ধ! এই সহজ সত্যটুকু আমি অগ্রে বুঝিতে পারি নাই!’\* আর একটি গল্প আছে। কোন সময়ে এক জন প্রবলপ্রতাপ নৃপতি কোন দূর দেশ জয় করিবার জন্য সমরসজ্জা করিতেছিলেন, তদ্রূপে তদীয় একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন ‘এদেশ জয় হইলে কি করিবেন?’ রাজা বলিলেন ‘আর এক দেশ জয় করিব।’ বন্ধু ‘সেটি অধিকৃত হইলে?’ রাজা ‘অপর একদেশ।’ বন্ধু ‘তার পর?’ রাজা ‘এইরূপে ভূমণ্ডল অধিকার করিয়া মুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিব।’ বন্ধু

\* অঙ্গন কৃত রাসেলাস দেখ।



কহিলেন ‘এখনই যদি ভাবেন যে, ভূমণ্ডল অধিকৃত হইয়াছে, তবে ত অর্থনাশ, শারীরিক কষ্ট, মানসিক ক্লেশ ও অনিশ্চিত জয়পরাজয়ের চিন্তা ভোগিতে হয় না। সুতরাং সুখে কাল কাটাইতে পারেন।’ রাজা চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, ‘এই স্বক্ষ্ম দর্শনটি আমার এত দিন হয় নাই। আমি যথার্থই অন্ধ।’ ফলতঃ রাসেলাস ও এই নৃপতির ন্যায় আমরা সকলেই অন্ধ! অবৈজ্ঞানিকতার অপরিচালনাই এই অন্ধতার মূল।

কতিপয় বৎসর অতীত হইল জেনার নামে একজন অতি সামান্য ডাক্তর সাডবারি নামক স্থানে চিকিৎসা করিতেন। উদ্ভিদবিদ্যা বিষয়ে বহু গবেষণা দ্বারা তদীয় অবৈজ্ঞানিক ইতিপূর্বেই বিলক্ষণ উন্নত হইয়াছিল। তখন ইংলণ্ডে বসন্ত রোগের এমন প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রতি দিন বহুলোক এই রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। এমন কি অনেক পরিবার সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। একদা ডর্সেটসায়র-বাসিনী এক জন গোপিনী জেনারের নিকট কোন রোগ দেখাইতে আসিলে, জেনার তা-

হাকে বলিলেন সাবধান বসন্ত রোগে যেন আক্রান্ত না হও। তাহাতে উক্ত গোপিনী কহিল, কিছু দিন হইল আমার ‘গোবসন্ত’ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং বসন্তে আমার ভয় নাই। এরূপ কথা অনেক চিকিৎসকেই ইত্যার্থে শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই গ্রাহ্য করেন নাই। জেনার গোপিনী প্রমুখাৎ এই কথা শুনিবামাত্র অরণ-পুস্তকে লিখিয়া লইলেন, এবং ক্রমাগত অনুসন্ধান করিয়া নির্ণয় করিলেন যে, গোবীজ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে বসন্ত রোগের প্রায়ই ভয় থাকে না। সেই হইতে গোমহূর্য্যাদানের প্রচলন হইয়া কত লোকেরই প্রাণরক্ষা হইয়াছে। এবং অবৈজ্ঞানিক জেনারের নামও লোকহিতৈষি বলিয়া চিরস্মরণীয় থাকিবে\*। আর প্রস্তাব দীর্ঘ করিবার প্রয়োজন নাই। উপসংহার কালে এইমাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে, পণ্ডিত ও দূর্খে যে প্রভেদ, তাহার কারণ একজন অবৈজ্ঞানিক, অপর জন তাহা নহে।

শ্রীজ্ঞ—

\* গোমহূর্য্যাদান নামক চটি পুস্তকে দেখ।



## ঘোমটা

এদেশে ঘোমটার ব্যবহার কত কাল যাবৎ ? ইতিহাসে এই জিজ্ঞাসার সন্ধান পাই। অনেকেরই এইরূপ ধারণা যে, হিন্দু রাজাদিগের সময়ে হিন্দু মহিলাদিগের মধ্যে ঘোমটার প্রচলন ছিল না ;—যে অবধি ভারতে যবনের অত্যাচার, ভারত-ললনার মুখমণ্ডলেও সেই অবধিই ঘোমটা।

একথা অংশতঃ সত্য হইলেও আমার নিকট সর্বতোভাবে সঙ্গত বোধ হয় না। ভারতবর্ষে পূর্বেও যদি কোন না কোন রূপ ঘোমটার ব্যবহার না থাকিবে, তবে অবগুষ্ঠন ও অবগুষ্ঠিকা প্রভৃতি শব্দ কোথা হইতে আসিল ? বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক সাহিত্যে ইহার ভূরিপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়, ব্যাসের মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে, এবং অনুসন্ধান করিলে তৎপূর্ব-বর্ত্তি গ্রন্থাদিতেও যে ইহা দৃষ্ট হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু ইহাও অবধারিত যে, এখনকার ঘোমটা আর তখনকার অবগুষ্ঠন একরূপ কিংবা একই বস্তু নহে। এখনকার কুল-কামিনীরা সূর্য্য চন্দ্র, তরু লতা এবং পিঞ্জরকঙ্কা বিহঙ্গীর নিকটও ঘোমটা দিয়া থাকেন ; তখনকার কুলকামিনীরা অপরিচিত সভাঙ্গল ভিন্ন প্রারম্ভঃ কোন স্থ-

লেই মুখে অবগুষ্ঠন দিতেন না, এবং ষাঁ-হাদিগের সহিত স্নেহমমতা কি প্রীতির কোনরূপ সম্পর্ক, কিংবা ভাল পরিচয় থাকিত, তাঁহাদিগের নিকট কখনও অবগুষ্ঠন দিয়া, শারদীয় উৎসবের অবগুষ্ঠনা-রতা কদলী-বধূর ন্যায় দণ্ডায়মান হইতেন না। তাঁহারা স্বাশ্রয় প্রভৃতি গুরুজনদিগের নিকট কন্যার ন্যায় থাকিতেন, দে-বর ও ননামূল্য প্রভৃতি স্বসম্পর্কিত প্রিয় ব্যক্তিদিগকে ত্রাতা ও ভগিনীর মত জ্ঞানিতেন, এবং কি প্রতিবেশী, কি পৌরবর্গ, কি দূরাগত অতিথি, কি অভ্যর্থিত সাধু সজ্জন, সকলের নিকটেই নিরবগুষ্ঠন কথোপকথন ও নির্মুক্তবিচরণে অধিকার পাইতেন।

কালিদাসের শকুন্তলা, দুহন্তের জন-কোলাহলপূর্ণ অদৃষ্টপূর্ব্ব রাজসভায় আসিয়া অবগুষ্ঠন ব্যবহার করিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু সেই দুহন্তযশন তাঁহার পিতার তপোবনে প্রথম উপনীত হন, তখন তিনি এবং তাঁহার সহচরীরা দুহন্তের সমুচিত আদর ও সৎকার করিতে কিঞ্চিৎকাল কুণ্ঠিত হন নাই। ভবভূতির জনকতনয়া, পাদপকঠলগ্ন বাতহুলিত ত্রততীর ন্যায়, র-দুহুলপাতির কঠলগ্ন রহিতাও, রাজদূত, রা-

জর্বি এবং লক্ষণ ও মুমুক্ষুভূতি রাজ-  
পুত্রদিগের সহিত স্বচ্ছন্দ আলাপ করি-  
য়াছেন। ইন্দুধর্মী কুম্ভারিন্দ-সরোবর-  
সদৃশী স্বয়ংবরভায় রাজহংসীর ন্যায়  
লীনা করিয়াও অনবদ্য রহিয়াছেন। দম-  
রন্তী দেবপ্রেরিত নিষধ-নাথের নিকট অ-  
মানবদনে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক  
কথায় প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। পাঞ্চালী কৃষ্ণ-  
বৈপায়নপ্রভৃতি তেজঃপুঞ্জ তাপসদিগের  
সান্নিধ্যেও রাজনীতির নানা কথা লইয়া বা-  
দবিতর্ক করিয়াছেন, এবং পুরনারীরা সকলে-  
রদিকেই মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিয়াছেন।

যাহা হউক, সে অতীত কাহিনীর  
আলোড়ন করা, আমার এইক্ষণকার অ-  
ভিপ্রের্ত নহে। ভারতললনার বর্তমান  
ঘোমটা যবনাচারের অনুকরণ, কিংবা য-  
বন রাজাদিগের অত্যাচারেরই ফলস্বরূপ  
হউক, অথবা ইহা ভারতসমাজের ক্রমিক  
অধঃপাত হইতেই সমুদ্ভাবিত হইয়া থাকুক,  
ইহাকে এখনও যত্নের সহিত রক্ষা করাই  
উচিত কি না, ইহাই আমার জিজ্ঞাসা।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের পূজা ও অপূজা,  
শিক্ষিত ও অশিক্ষিত অনেকেই হয় ত এই  
প্রশ্ন শুনিয়া যুগপৎ জ্বলিয়া উঠিবেন, এবং  
বিবিধ ত্রীবাভঙ্গি সহকারে সমস্তরে বলি-  
বেন যে, কুলের কামিনী ঘোমটা দিবে কি  
না এবিষয়ে বাস্তবের একজন সহযোগী  
পণ্ডিতের ব্যবস্থা লওয়ার আবশ্যিকতা নাই  
আমি বলি, আবশ্যিকতা আছে। আদৌ

|| ঘোমটা কেন, তাহারই বিচার কর

ঘোমটা কি হিন্দু-ধর্ম-নীতির বিশুদ্ধতা  
ও পৌরাণিক গৌরবরক্ষার জন্য? এ-  
কথায় আমার মনে বড় দুঃখ হয়,  
এবং দুঃখের সঙ্গে হাসি জ্বাসে। হিন্দু  
ধর্ম কি? যে হিন্দুধর্ম পূর্বে আর্ধ্য-  
বংশ-ভিলক মহানুভাব আচার্য্যদিগের জ্ঞা-  
নের অমল জ্যোতিতে সমস্ত জগৎকে আ-  
লোকদান করিত, ক্ষত্রবীরদিগের সগর্ব  
পদনিক্ষেপে পৃথিবীকে কম্পিত রাখিত,  
—যে হিন্দুধর্ম একদিন সভ্যতার শিরোরত্ন  
স্বরূপ শোভা পাইত, এবং যোগে ভোগে  
সদাচারের প্রবর্তনা করিয়া, সমাজে সর্ব  
প্রকার স্ফুর্তির পথ দেখাইয়া এবং সা-  
মাজিকস্তায় কবিকল্পনার সুধা ঢালিয়া,  
প্রকৃত মৌর্যাস্তিতে বিলসিত রহিত,  
সেই হিন্দুধর্ম কি আজ ব্রহ্মাণ্ডের সকল  
ছাড়িয়া এবং প্রাচীনা কীর্তির সকল লী-  
লায় জলাঞ্জলি দিয়া হিন্দু-কুল-ললনার  
ঘোমটার গিয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে?  
তবে কি ঘোমটা লজ্জার অনুরোধে?  
ইহাও আমি মানিতে পারি না।

প্রচলিত লজ্জার অনেক প্রকার আছে,  
এবং উহা এক বিচিত্র বস্তু। আমি বহু  
চিন্তা করিয়াও উহার অনন্ত চাতুরীর অন্ত  
পাই নাই, এবং কোন দিনও যে পাইব  
আমার মনে এমন আশা নাই। ফলতঃ  
কিসে লজ্জা যায়, আর কিসে লজ্জা  
থাকে, তাহা মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক,  
দেবতারও বুজির অগম্য। বিলাতের বি-  
বিধা অর্দ্ধবিবসনা হইয়া অজ্ঞাতচরিত্র পু-

কবের সহিত প্রকাশ্য স্থলে ভালে ভালে  
খাটিতে গাইতে পারেন, পূর্বরাগের পু-  
স্তিত ছলনায় যে ভাবে ইচ্ছা সেই ভাবে  
এবং ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা তাঁহার সহিতই  
প্রণয়ের খেলা খেলিতে পারেন, এবং অ-  
স্বাভাব্য উগ্রচণ্ডার মত, অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়  
হইয়া, পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনা-  
রাসে প্রধাবিত হইতে পারেন। ইচ্ছার  
কিছুতেই তাঁহাদিগের লজ্জা বিনষ্ট হইয়া  
যায় না। কিন্তু চরণতলের অবরণ ক্ষণ-  
কালের তরেও উন্মোচন করিলে, অথবা  
কাহারও অধরে তাবুলরাগের রেখামাত্র  
দেখিলেই তাঁহার লজ্জায় একেবারে ম-  
রিয়া যান।

আমাদিগের মধ্যেও লজ্জার এইরূপ রস-  
বৈচিত্র্য এবং সর্বত্রই সেই বৈচিত্র্যের অ-  
সংখ্য উদাহরণ। যথা, বিনোদবালার শা-  
শুড়ী বড় লজ্জাশীল। সকলেই বলে, তিনি  
লজ্জার শাসনে স্ফোৰ্ত্তি কি কনিষ্ঠ সহোদ-  
রেরও মুখের দিকে চাহিয়া কথা কহিতে  
সমর্থ হন না, এবং তাঁহার স্বামীর সহিতও  
কোন দিন কথা কহিয়াছেন কি না, তাহা  
কেহ জানে না। কুলের কামিনী নিলজ্জা  
হইলে তাঁহার মনে এমনই যুগা ও 'ত্ৰীয-  
জ্ঞা' উপস্থিত হয় যে, যদি তাঁহার পুজব-  
ধুটি, সীমন্তে সিন্দূর দেওয়ার অভিলাষে,  
দর্পণের সম্মুখেও মুখের ঘোমটা কে-  
লিয়া বসে, তাহা হইলেই তিনি শিরে  
শতবার করাঘাত করেন, এবং কলির  
পাণাচারে আর লেখাপড়ার পাণচর্চার

পৃথিবীর লজ্জা সঙ্কোচ যে একবারে  
প্রকাশিত হইয়া গেল, ইহা চিন্তা করিয়া  
অতি গলাদ কণ্ঠে বিলাপ করিতে থাকেন।  
কিন্তু এদিগে পাঁচজনের মধ্যে অনব্যক্তনাদি  
পরিবেশনের সময় শান্তিপূরের দিগ-  
ম্বরী পরিয়া বাহির হইতে তাঁহার কষ্ট হয়  
না, গৃহের ভূতাদির উপর পুরুষের মত  
তাড়না ও তর্জন করিতে তাঁহার জিহ্বা  
একটুকুও বাধে না, এবং খিড়কীর খাটে  
কি ছাদের উপরে হাট মিলাইয়া বসিতে—  
এই আশ রক্তবয়সেও বাসরগৃহে রাইর-  
দিগী সাজিতে, কৌতুকপ্রসঙ্গে কথার  
ছড়া কাটিতে এবং বাসি বিবাহের কাদা-  
খেলা লইয়া, কমলকাননে করিণীর ন্যায়  
প্রমত্ত ক্রীড়া করিতে তাঁহার চিত্ত কখনও  
কোনরূপ কাতরতা অনুভব করে না।  
বাড়ির বহিঃপ্রান্তস্থে যখন কবিওয়ালার  
মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার কৌতুহল স-  
কলের উপরে। তিনি তখন সমবয়স্কা-  
দিগকে লইয়া সখ করিয়া সখীসংবাদ  
শুনেন, এবং যখন লহরীর আরম্ভ হয়,  
তখন তিনি তিরস্করণীর অন্তরালে চাত-  
কীর ন্যায় তুণ্ডিত উপবেশ্য রহেন।

বিরাজ মোহিনীর বড় পিসীও নিতান্ত  
লজ্জাবতী। তিনি কিয়ৎপরিমাণে সেকলে  
লোক। এখনকার কুৎসিত রীতি নীতি  
তাঁহার চক্ষে বিধ। ঘরের ঝি বউর ও  
কথাই নাই, পাড়া প্রতিবেশীর মেয়েরাও  
তাঁহার ভয়ে সতত জুড় সড় রহে। তিনি  
সর্বদাই সকলকে লজ্জার কথা লইয়া

নানা দৃষ্টান্তে উপদেশ দেন ও শাসন করেন ; এবং অতি ঘনিষ্ঠ কোন ব্যক্তিও যদি সহসা নিকটে আসে, তিনি তৎক্ষণাৎই আত্মাবিলম্বিত ঘোমটা টানিয়া মর্হকম্পিত ক্ষুরিত কলেবরে এক পার্শ্বে সরিয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহার শরীরে ক্রোধ একটুকু অধিক। ঐরূপ ক্রোধ যে নিম্ননীয়, এমন কথা বলিতে আমি সাহস পাইতেছি না। আমার কেবল এইমাত্র বক্তব্য যে, তাঁহার হৃদয় সময়ে সময়েই ক্রোধে দগ্ধ আচ্ছন্ন হয়। তিনি যখন সেই অবলা-জন-মূলত ক্ষণস্থায়ী ক্রোধের ক্ষণিক উত্তেজনায় বাড়ির ভিতর ছুঁড়ার দেন, বহির্বাটীর প্রাচীর চত্বরও তখন ধর ধর কাঁপিয়া উঠে এবং গ্রাম্য পাঠশালার অনেক গজকণ্ঠ পণ্ডিত এবং দুর্বার বাসকরন্দও তখন ক্ষণকালের জন্য চিত্রা-প্তিবৎ স্তম্ভিত রহে। কেহ পার্থমাণে তাঁহার সহিত বিবাদ বাধাইতে যায় না। কারণ সকলেই সংসারে সম্ভানসম্ভতি লইয়া নুখে বাস করিতে ইচ্ছা করে। তথাপি, যদি দৈবাৎ ও দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সহিত সত্য সত্যই কাহারও বিবাদ বাধিয়া উঠে, তবে তাঁহারই একদিন, কি তাহারই এক দিন। তিনি তখন একে একসহস্র এবং মূর্তিমতী মহিমমর্দ্দিনী। তাঁহার আলুলায়িত কেশকম্প তখন ঝঙ্কা-বায়ু-বিতাড়িত কাদম্বিনীর কমনীয় কান্তি ধারণ করে, চক্ষু আশ্রয় গিরির অভিনয় হয়, অঞ্চলের বস্ত্র কটিবন্ধনে পরিণতি পায়,

বাহুবল্লরী নাবিকের ক্ষেপণীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ উৎক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে, চরণদ্বয় শমানিপ্পেষণ দণ্ডের শক্তি ও মহিমা কাড়িয়া লয়, এবং ফেনায়মান বদনারবিন্দ তটিনীর ফেন-সমাচ্ছন্ন খেত পুলিনকেও বারংবার দিকার দেয়। এ সকল কিছুতেই তাঁহার লজ্জার বাধাত হয় না, এবং অন্যকে লজ্জাহীনা বলিয়া তিরস্কার করিবার বংশানুক্রমিক অধিকারও ইহাতে কোন ক্রমেই কমায় না।

প্রকৃত লজ্জা আর এক সামগ্রী। উহা বস্তুতঃই অবলার অমূল্য আভরণ এবং আভরণ অপেক্ষাও অধিকতর মূল্যবান এক প্রীতিপ্রদ মনোহর আবরণ। উহা অবলার মুখচ্ছবিকে ছায়ার ন্যায় ঢাকিয়া রাখে, দৃষ্টির তীব্রতা ও চাঞ্চল্য বিনাশ করে, অগচ্ছ দৃষ্টিতে কবিত্তনম্পৃহণীর কি এক অপূর্ব মাধুরী আনিয়া মাথিয়া দেয়, কণার কঠোরতাকে কোমলতার দ্রবীভূত করায়, এবং ক্রমশঃ বিকশিত, ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া, পবিত্রতারই আর এক মূর্তির মত অঙ্গে একেবারে মিশিয়া যায়। সেই লজ্জা কি এই? যদি লজ্জার জন্যই ঘোমটার আবরণ, তাহা হইলে অণুবীক্ষণেরও অদৃশ্য উর্ণনাভহৃৎের পরিচ্ছদ কেন? শরীরের যে সকল অঙ্গ আভরণের ছটার প্রদর্শন করিতে পণ্যাবল্যাসিনীরও লজ্জিত হওয়া উচিত, সে সকল অঙ্গে আভরণ কেন? যে মুহুমধুর মোহন হাস্য অবলার বিদ্যধরে কুমুমের অক্ষট বিকাশের ন্যায়

সুন্দর দেখায়, সেই হাস্যের এই ভীষণ হি-  
স্টোল কেন? আর, পুরুষের উপর স্নেহ  
পরিহাস, পুরুষেরও অবশ্য-পরিহার্য অস-  
জ্ঞত আশ্রয় প্রদানে উৎসাহ ও আনন্দ  
এবং বিরোধের ঘনঘটা ও ভৈরব গর্জন  
কেন?

ঘোমটা অবলার লজ্জারক্ষার সহায়  
হওয়া দূরে থাকুক, আমাদের বিবেচনার  
লজ্জার অমন ছদ্মবেশ, নিমজ্জিত শত্রু অঙ্গ  
আছে। সাঁহারী একথার গুঁড়ভাব গ্রহণে  
অসমর্থ, তাঁহারী, লোকাচারের পঙ্কিল  
পরিণামে, মানবপ্রকৃতির মর্যাদা পাঠ  
করিতে যত্নপর হইবেন, এবং যিহুদী দি-  
গের পুরাতন ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ ফল ভক্ষ-  
ণের যে এক পুরাতন কাহিনী আছে,  
তাঁহারও তাৎপর্য পরিগ্রহে চেষ্টা করি-  
বেন। এদেশে ঘোমটাই সেই নিষিদ্ধ  
ফল, সেই রহস্যের রহস্য; এবং নি-  
তান্ত্র হুংখের বিষয় এই যে, আজও ইহা  
আর্যসমাজ বলিয়া পরিচিত নির্মল হিন্দু-  
সমাজের একাধিকে কুলকলঙ্কের মত টা-  
কিয়া রাখিতে অধিকার পাইতেছে।

আমরা অনেক সময়ে অনেক শুদ্ধচারিণী  
কুলকামিনীরও চক্ষে কেমন এক চটুলতা,  
হৃদয়ে কেমন এক তরলতরঙ্গ এবং মনে  
কেমন এক কৌতূহলের আকুলতা দে-  
খিয়া, অশোবদন হইয়া রহি। প্রকৃত প্র-  
স্তাবে ঘোমটার কৃত্রিম আবরণই এ সকল  
কৃত্রিম বিভ্রমবিলাস ও কৃত্রিম লীলাচা-  
তুরীর প্রধান কারণ। স্কুর স্বাভাবিক

লাসসা লোকনিগ্রহে নিবদ্ধ হয়; এবং  
নিবদ্ধ হইয়া, অস্বাভাবিক বস্ত্রে বিচরণ  
করে। হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবাহ গতি-  
পথে বাধা পায়; এবং বাধা পাইয়া  
অস্বাভাবিক গর্হিত পথে গড়াইয়া পড়ে।  
মনের অনিবার্য জ্ঞানতৃষ্ণা স্বাভাবিক আ-  
নন্দে বঞ্চিত হয়; এবং বঞ্চিত হইয়া অ-  
স্বাভাবিক আনন্দে তৃপ্তির অন্বেষণ ক-  
রিতে থাকে। আমরা অনেক স্থলে আ-  
বার অনেক সাধুরত যুবজ্ঞানদিগের মধ্যেও  
পুরস্কন্দদিগের প্রচ্ছন্নরূপরাশি দেখি-  
বার মতি ও প্রবৃত্তির পরিচয় পাইয়া ব্য-  
থিত হই। একটুকু চিন্তা করিলেই প্রতীত  
হইবে যে, ঐ ঘোমটাই তাহার মূল। অব-  
লার স্মারজিত কচি, সুশিক্ষিত চন্দ্র সামা-  
ঙ্গিক পবিত্রতার অধিতীয় সূক্ষ্ম। সাঁহারী  
কিছুতেই লজ্জা পায় না, কিছুতেই  
আচারগত উচ্ছৃঙ্খলতাইতে নিবৃত্ত  
হয় না, এবং কিছুতেই আপনাদিগের  
অসভ্যতা ও অবজ্ঞাজনক ইতরতা অনু-  
ভব করিয়া সঙ্কুচিত হইতে শিখে না,  
অবলার অমৃত্যুভিষিক্ত গরলময়ী দৃষ্টি তা-  
হাদিগকেও তীব্র কশাঘাতের ন্যায় শা-  
মন করে। ঘোমটা আমাদের সমা-  
জকে সেই প্রার্থনীর শাসনে বঞ্চিত রা-  
খিয়াছে, এবং কতকগুলি কুকবি, কুরসিক,  
ও সরস্বতীর চিরবিদ্বেষী কুৎসিতচরিত্র  
নব্য সৌখিনের কাব্যলাপ, কৌতুকরঙ্গ  
এবং কথকতার এক জীড়া স্থল হইয়া  
রহিয়াছে।

অপিচ, ঘোমটা এক অপ্রাকৃত দৃশ্য, পুষ্করের নিল্লজ্জতা ও নিষ্ঠুরতার এক আশ্চর্য্য নিদর্শন । মনুষ্যের চক্ষু এই জগতের সৌন্দর্য্যসাগরে সম্ভরণ করিবার জন্য, বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত রাখিবার জন্য নহে । ঐ দেখ, শরতের চন্দ্র তোমার নয়নপথের পথিক হইবার জন্য মেঘের অন্তরালে কতই কি খেলিতেছে, আর হাসিতেছে । ঐ দেখ, মৃদল মাধবীলতা, তোমার চক্ষু দুটির সহিত প্রণয়ের আলাপ করিবার জন্য কিরূপ হুলিয়া হুলিয়া পাড়িতেছে, ও করসকত করিতেছে । ঐ দেখ, ধবল গিরির অভভেদি শৃঙ্গ, তোমার কম্পনাকে পৃথিবীর ধূলিকর্দম পরিত্যাগ করিয়া এক-

বার উর্ধ্বে উড়িবার জন্য, শবণের অগোচর অতিগন্তীরকণ্ঠে কিরূপ ডাকিতেছে ও তোমায় ধিকার দিতেছে । প্রকৃতির সহিত এইরূপ কথোপকথনই কাব্যের অমৃত, এবং কাব্যের অমৃতপানেই হৃদয়ের উন্নতি ও বিকাশ । ঘোমটা অবলার চক্ষুকে বস্ত্রে আবৃত রাখিয়া, প্রকৃতির বিড়ম্বনা করে, অবলা-হৃদয়ের উন্নতি ও বিকাশের পথে ভয়ানক অন্তরায় হয়, এবং যিনি প্রকৃতির প্রাণদেবতা ও পবিত্রতার প্রত্নবণ, তাঁহার করলেখায়ও অপবিত্রতার অপবাদ দেয় ।

ইতি

ঈকল্যাণ ভট্ট শর্মাণঃ \*

\* পরিব্রাজকবর ঈশ্বরক কল্যাণ ভট্ট শর্মা আমাদের একজন পুরাতন বন্ধু । তিনি বান্ধবের প্রথম বৎসরে, 'কুল বধু' প্রভৃতি প্রবন্ধে আমাদের কাছে আশ্রয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; আমরা অন্য তাঁহার এই ঘোমটাশীর্ষক প্রবন্ধ হইতেও বিস্তর উপদেশ পাইলাম । কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইয়াছে যে, তাঁহার সকল কথায় আমরা সায় দিতে অসমর্থ । ভট্ট মহাশয় পৌরাণিক সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ । তিনি কিংবা তাঁহার আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে কেহই কখনও বিলাত যান নাই । সুতরাং, বিলাতী মলমালিঙ্গের পূর্করাগ, প্রণয়খেলা এবং মৃত্যুগীত প্রভৃতি জীড়া প্রসঙ্গে তিনি যাহা লিখিয়াছেন,

তাহা শুনা কথা । শুনা কথার উপর তর্ক বিতর্ক এবং বিচারমল্লতা ও শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আমাদের নিকট ভাল বোধ হয় না ; এবং শুনা কথার উপর ভর করিয়া জাতি বিশেষের কুলকামিনীদিগকে প্রকারান্তরে লজ্জাহীন বলিয়া বিক্রপ করা আমাদের নিকট সঙ্গত জ্ঞান হয় না । বিলাতে মৃত্যুদিগের যেরূপ প্রচলন আছে, তাহা অতি জঘন্য, কিন্তু বিলাতে প্রণয়দিগের মধ্যে পরিণয়ের পূর্বে পরস্পরের যেরূপ উপাসনা হইয়া থাকে, সেই পূর্করাগের পবিত্র লীলাকে কোন অংশেও জঘন্য বলিতে আমাদের সাহস জন্মে না । দ্বিতীয়তঃ, ভট্ট মহাশয় অকৃতদার ব্যক্তি । অকৃতদার ব্যক্তি অবলার লজ্জা

সঙ্কোচ ও ‘ত্ৰীমুখ্য’ বিষয়ে অভিজ্ঞের  
সত কথা কহিতে পারে কি না, সে বি-  
ষয়েও আমাদের কিঞ্চিৎ সংশয় আছে।  
তবে ইহা আমরা, সাধারণতঃ, অক্ষুণ্ণচিত্তে  
বলিতে পারি যে, হিন্দুসমাজে হিন্দুর  
পুরাতন বিশুদ্ধ রীতি নীতি পুনঃ প্রবর্তিত

হউক, ইহা আমাদের গেরও ঐকান্তিক কা-  
মনা;—এবং এদেগে ঘোমটা এইক্ষণ  
যে ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার বি-  
লোপ হওয়া, সহযোগী পণ্ডিতবরের ন্যায়  
বাঞ্ছবেরও সৰ্ব্বান্তঃকরণসম্মত ব্যবস্থা।  
ইতি সম্পাদকস্য।

০০০০০০০০

## আত্মবর্ষদ

আমরা যখনই নিবিষ্টচিত্তে পূর্বতন  
আর্যচরিত্ত পৰ্যালোচনা করি, তখনই নে-  
খিতে পাই যে, আর্যগণ কোন বিষয়েই  
অসুস্থ বা পরপ্রত্যাশী ছিলেন না। তাঁ-  
হারা প্রত্যেক বিষয়েই অনন্যসাধারণ  
উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। এবং প্রত্যেক  
বিষয়েই অসাধারণ অধ্যবসায়, শ্রুগভীর  
চিন্তাশক্তি, ও অপ্রতিহত কার্যকুশলতার  
পরিচয় দিয়া পৃথিবীতে আর্য নাম পুজ-  
নীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

কিন্তু, নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই  
যে, প্রাচীন আর্যগণ বহুযত্নে ও বহুপ-  
রিশ্রমে যে অমূল্য রত্নরাশির সঞ্চয় করিয়া  
গিয়াছেন, কালসহকারে তাহার অধি-  
কাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে, যাহা কিছু অব-  
শিষ্ট আছে, তাহাও লুপ্তপ্রায়।

অন্য আমরা আর্যকীৰ্ত্তিবিটপার একটি  
ভগ্নাবশিষ্ট শাখার বিষয় পৰ্যালোচনা  
করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সেই শাখাটি আ-  
ত্মবর্ষদ। ক্ষণ-ভঙ্গুর-দেহধারি-মনুষ্যাগের

নিত্য প্রয়োজনীয় আত্মবর্ষদ বিদ্যায় প্রা-  
চীন আর্যগণ কিরূপ পারদর্শিতা লাভ  
করিয়াছিলেন, ভারতে উহার কতদূর সমু-  
ন্নতি হইয়াছিল, যদিচ ইহা দ্বারা তৎসমুদয়  
সম্যক পরিষ্কৃত হইবে না, তথাপি আত্ম-  
বর্ষদ বিষয়ে সাধারণের যে কএকটি স্থূল  
জন্ম আছে, আশা করি তাহার অপেক্ষা-  
কৃত লাভ হইবে।

আত্মবর্ষদ কি? বর্তমান সময়ের অ-  
নেকে ইহাও যথার্থরূপে অবগত নহেন।  
তাহাদিগের সংস্কার এইরূপ যে মাধবকর  
কৃত ‘নিদান’ বা চক্রপাণিদত্ত কৃত ‘চ-  
ক্রদত্ত’ ই আত্মবর্ষদ। বস্তুতঃ তাহা নহে।

আত্মবর্ষদ অর্থবর্ষদেবের এক উপাঙ্গ।  
শাস্ত্রে আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমতঃ  
অর্থবর্ষদেহহইতে লক্ষ্মীকাস্ত্রক আত্ম-  
বর্ষদশাস্ত্রের আবিষ্কার করেন। কিন্তু  
পরবর্ত্তি সময়ে মনুষ্যাগের আত্মকাল ও মে-  
ধাশক্তির নিতান্ত হীনতা দেখিয়া উপরোক্ত  
‘অর্থবর্ষদ’ আত্মবর্ষদশাস্ত্রকে সংক্ষেপিতঃ



অষ্টভাগে বিভক্ত করেন \* । যথা—

১ম, শলাতত্ত্ব ( ত্রণবিজ্ঞান এবং যজ্ঞ, শস্ত্র, কার ও অগ্নি প্রয়োগের বিধান ) ।

২য়, শালাকাতত্ত্ব ( শালাকা-চিকিৎসা ) ।

৩য়, কায়চিকিৎসা, ( সার্বস্বিক রোগের নিদান ও চিকিৎসা ) ।

৪র্থ, ভূতবিদ্যা, ( ঐহপ্রতীকারক শাস্তিকর্ম ও বলিদানাদি ) ।

৫ম, কৌমারভূতা ( শিশুপালন বিধি )

৬ষ্ঠ, অগদতত্ত্ব ( বিষচিকিৎসা ) ।

৭ম, রসায়নতত্ত্ব ( শারীরিক পুষ্টি-সাধন বিধি ) ।

৮ম, বাজীকরণতত্ত্ব ( শত্রুদোষসংশোধন ও তর্ককনোপায় )

ইহার আনুষঙ্গিক পদার্থনিরূপণ, মনোবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, রসায়নতত্ত্ব, আয়ু-নিরূপণ আয়ুস্তত্ত্ব, দ্রব্যগুণবিজ্ঞান স্বাস্থ্যপালনবিধি প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহও বিবৃত হইয়াছে ;

লিখিত আছে—পরম কাকনিক ব্রহ্মা

\* ইহ খন্ডায়ুর্বেদো নাম যদুপাজমথ-  
র্কবেদসানুৎপাদৈব প্রজাঃ শ্লোক শত-  
সহস্রমথ্যায় সহস্রঞ্চ কৃতবান্ অরভুঃ । ত-  
তোহুপাস্থকুম্পমেধকুণ্ডাবলোক্য নরা-  
ণাম্ভুজঃ অকুণ্ডা প্রণীতবান্ । তদযথা শলাং  
শালাক্যং কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা কৌ-  
মারভূতা অগদতত্ত্বং রসায়নতত্ত্বং বাজী-  
করণতত্ত্বমিতি । ( পুস্তকতঃ )

উক্ত প্রকারে আয়ুর্বেদের বিভাগ করিয়া  
প্রথমতঃ উহা দশ প্রজাপতিকে অধ্যয়ন  
করান, তৎপরে দক্ষহইতে অশ্বিনী কুমার,  
আশ্বিনীকুমারহইতে দেবরাজহইতে, ইন্দ্র  
হইতে ধনুস্তরি ও ভরহাজমুনি আয়ুর্বেদে  
শিক্ষা লাভ করেন । \*

ধনুস্তরি ও ভরহাজহইতেই লোক-  
সমাজে আয়ুর্বেদের প্রথম প্রচার হই-  
য়াছে । অতএব এই সময়কেই আমরা আ-  
য়ুর্বেদের প্রথম কাল বলিব ।

ধনুস্তরি ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভূত, এবং কা-  
শীপ্রদেশের অধিপতি ছিলেন । ইহার  
নামান্তর কাশীরাজ বা দিবোদাস । ইনি  
ধনুস্তরি সংহিতা প্রভৃতি অনেক আয়ুর্বেদ-  
দীয় গ্রন্থ রচনা করেন ।

কাশীরাজ ধনুস্তরি যখন সংসারবিরাগী  
হইয়া কাশীর নিকটগতি এক অরণ্য-  
মধ্যে বানপ্রস্থাত্মম অবলম্বন করেন, ত-  
খন মহামুনি বিশ্বামিত্রের পুত্র পুস্তকত,  
এবং ভগদেব, ঔরভ্র, বৈতরণ, পৌকলা-  
বত, গোপুররক্ষিত ও করবীৰ্য প্রভৃতি  
মুনিগণ তাঁহার নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা  
করেন । †

\* ব্রহ্মা প্রোবাচ ততঃ প্রজাপতিরধি-  
জগে, তন্মাদশ্বিনাবশ্বিত্যামিন্দ্র ইন্দ্রাদহং  
( ধনুস্তরিঃ ) ময়া দ্বিহ প্রদেয়মর্ষিভ্যঃ প্র-  
জাহিতহেতোঃ । ( পুস্তকতঃ )

† অদীত্য চান্দ্রবো বেদ মিত্রাদ্ ধনু-  
স্তরিঃ পুরা । আগত্য পৃথিবীং কাশ্যাং

ভগবান্ ধনুস্তরি শিক্ষাদানকালে যু-  
তশরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া শিষ্যদিগকে  
শারীরতত্ত্বের শিক্ষা প্রদান করিতেন \* ।  
জাতো বাহুজ্জবেশ্মনি । নান্নাতু মোহভবৎ  
খাতো দিবোদাস ইতি কিতো ॥ বাসএব  
বিরক্তোহভূচ্চতার নৃমহত্তপঃ । যত্নেন  
মহতা ব্রহ্মা তৎ কাশ্যামকরোরূপং । ততো  
ধনুস্তরি লৌকিকঃ কাশী রাজোহভিধীয়তে ।  
হিতাস দেহিনাং স্বীয়া সংহিতা বিহিতা-  
মুনা অয়ং বিদ্যার্থিনো লোকান্ সংহিতা-  
স্তামপাঠয়ৎ ।

বিশ্বামিত্রো মুনিশ্চেষু পুত্রঃ নৃশ্রেষ্ঠমুক্ত-  
বান্ । বৎস বারাগসীং গচ্ছ তৎ বিশ্বেশ্বর-  
বলভাং । তএ নান্না দিবোদাসঃ কাশীর-  
জোহস্তি বাহুজঃ । সহি ধনুস্তরিঃ সাক্ষাদাযু-  
ষেদবিদ্যাবরঃ । অ'য়ুর্বেদং ততোহদীতা  
লোকোপকৃতিহেতবে । সর্বপ্রাণিদয়াতীর্থং  
উপকারোমহামখঃ । পিতুর্কচনমংকর্যা নৃ-  
শ্রেষ্ঠতঃ কাশিকংগতঃ তেন সার্কং সম-  
ধোহুং মুনিম্ভুশতংযযৌ । অথ ধনুস্তরিং  
সর্বৈ বানপ্রস্থ্যশ্রমেস্থিতং । ইত্যাদি ।  
ভাবপ্রকাশঃ ।

\* তন্ম্যগ্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হব্রী শ-  
ল্যস্য বাহুজা । শোধয়িত্বা যুতং সমাক্ ক্র-  
ফ্যোহঙ্গবিনিশ্চয়ঃ । প্রত্যক্ষতোহি য-  
দৃফ্যং শাস্ত্রদৃফ্যং যন্তবেৎ । সমাসতন্তু-  
ভূভয়ং ভূয়োজ্ঞান বিবর্দ্ধনং ।

তন্মাং সমস্তগাঁত্রমবিষোপহতমদীর্ঘ-  
ব্যাধিপীড়িতমবর্ষণতীকং নিঃস্ফোক্তাপু-  
রীষং পুরুষমবহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধং প-

ধনুস্তরি শিষ্যবর্গহইতে অনেক আ-  
য়ুর্বেদীয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে  
নৃশ্রেষ্ঠ, ঔপদেনব, ঔরভ ও পৌকলাবত  
নামক চারিজন শিষ্যের প্রণীত চারিখানি  
গ্রন্থই প্রদান ও প্রসিদ্ধ \* ।

নৃশ্রেষ্ঠ প্রভৃতির শিষ্য প্রশিষ্যাদি  
দ্বারাও উত্তরোত্তর অনেক গ্রন্থ রচিত  
হইয়াছে ।

ভরদ্বাজ মুনি ব্রাহ্মণ বংশীয়, হিমা-  
লয় প্রদেশে ইহার বাসস্থান ছিল । যখন  
ময়ূষাশ্রমীয়ে নানাবিধ উৎকট রোগ প্রা-  
ভূত হইয়া কায়িক ও মানসিক বিবিধ  
যন্ত্রণা প্রদান করিতে লাগিল, তখন অ-  
জিরা, যমদগ্নি, ভৃগু, আত্রেয়, ভরদ্বাজ  
প্রভৃতি পরম কাকণিক ঋষিগণ প্রাণি-  
সমূহের স্বাস্থ্যকামনায় ছিমবৎ পাশ্বে  
সমবেত হইয়া একটি মন্ত্রসভার আ-  
হ্বান করিলেন । তাহাতে স্থির হ-  
ইল যে, দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নিনী কুমারের  
নিকট অ'য়ুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন ।  
তৎসং যুজ্জ্বল্কলকুশলগাদীনামন্যতমেনা-  
বেষ্টিতাজমপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ স-  
মাক্ প্রকৃথিতকোদ্ধৃতা ততোদেহং সপ্তরা-  
ত্রাহুণীর বালবেণুবল্কলকুদীনামন্যতমেন  
শনৈঃ শনৈরবর্ষয়ন্তুগাদীন্ সর্কানৈব বা-  
হ্যাতান্তরাস্ত্রপ্রত্যঙ্গবিশেষান্ যথোক্তান্  
লক্ষয়েৎ চক্ষুষা । ( নৃশ্রেষ্ঠতঃ )

\* ঔপদেনবমৌরভঃ সৌশ্রেষ্ঠতং পৌ-  
কলাবতং । শেবাগং শলাতন্ত্রাগং মূলা-  
নোতানির্দিশেৎ । ( নৃশ্রেষ্ঠতঃ )

তাহার নিকট আত্মকর্মেদ শিক্ষা করিলে এই দাক্ষণ্যাদিযজ্ঞগণা হইতে পরিমুক্ত হওয়া যায় ।

অনন্তর সমস্ত ঋষিগণের সম্মতি অনুসারে তীক্ষ্ণমনীষাসম্পন্ন ও বিপুল মেধাবী মহামুনি ভরদ্বাজ ইন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইয়া আত্মকর্মেদ বিদ্যার শিক্ষা লাভ করেন । এবং শিক্ষিত হইয়া পুনর্বার হিমবৎ প্রদেশে উপস্থিত হইলে আত্রেয় প্রভৃতি মুনিগণ তাহার নিকট সমস্ত আত্মকর্মেদজ্ঞান লাভ করেন ! \*

আত্রেয় বা পুনর্বার মুনি ভরদ্বাজ সমীপে আত্মকর্মেদ শিক্ষা করিয়া ‘আ-

\* বিদ্বভূতা যদারোগাঃ প্রোদ্রুতাঃ শারীরিণাঃ । \* \* \* তদাভূতেষুকোশং পুরস্ত্যামভবয়ঃ । সমেতাঃ পুণ্যকর্মাণঃ পার্শ্বে হিমবতঃ শুভে । \* \* \* অথোপবিষ্টান্তে তত্র পুণ্যং চক্লুঃ কথামিমাং । \* \* \* অথ তে শরণং শক্লুঃ দদৃশুর্জানচক্ষুযা । স বক্ষ্যতি শমোপায়ং যথাবদমরপ্রভুঃ । কঃ সহস্রাক্ষভবনং গচ্ছন্তঃ প্রকুংশচীপতিং । অহমর্থে নিযুক্তোঃমত্রেতিপ্রথমং বচঃ । ভরদ্বাজোহিব্রবীতস্মাদৃষিভিঃ স নিযোজিতঃ । স শক্লুভবনং গতা \* \* \* প্রোবাচ ভগবান্ ধীমান্ ঋষীগং বাক্যমুত্তমং । \* \* \* তস্মৈ প্রোবাচ ভগবান্নাত্মকর্মেদং শতক্রতুঃ । \* \* \*—ভরদ্বাজঃ স্রথাস্থিতং, ঋষিভ্যোহনধিকং তত্ত্বশশাসান বশেষয়ন্ । ঋষিষষ্ঠ ভরদ্বাজা-জগৃহস্তং প্রজাহিতং । ( চরক সংহিতা )

ত্রেয়সংহিতা’ নামক একখানি অত্যুৎকৃষ্ট আত্মকর্মেদীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । এবং অগ্নিবেশ, ভেল, হারীত, জতুকর্ণ, পরাশর ও ক্ষারপানি নামক ছয়জন প্রজাবান্ শিষ্যকে আত্মকর্মেদ শিক্ষা দেন । \*

আত্রেয়-শিষ্য উপরোক্ত অগ্নিবেশ প্রভৃতি প্রত্যেকে স্ব স্ব নামে এক এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন । তন্মধ্যে অগ্নিবেশকৃত গ্রন্থই সমধিক প্রসিদ্ধ ।

এইক্ষণে অগ্নিবেশকৃতগ্রন্থ চরকনামে অভিহিত হইয়া থাকে । অগ্নিবেশ এই গ্রন্থ রচনা করিলে, চরক নামক একজন মুনি কর্তৃক উহা প্রতিসংস্কৃত হইয়া, চরক নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে । †

অগ্নিবেশাদির শিষ্যপ্রশিষ্য দ্বারাও উত্তরকালে অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল ।

দ্বিতীয় কাল ।

এই সময়ে যে সমস্ত আত্মকর্মেদের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে বা-

\* অথ মৈত্রীপারঃ পুণ্যমাত্মকর্মেদং পুনর্বারঃ । শিষ্যোভ্যোদত্তবান্ ষড়্ভ্যঃ সর্কভূতানুকম্পয়া । অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ । হারীতঃ ক্ষারপানিশ্চ জগৃহস্তমুনৈবর্চঃ । \* \* \* অথ ভেলাদম্যশচক্লুঃ স্বং স্বং তজ্জং কৃতানিচ । আবার্যমাসুরাত্রেয়ং সর্ষিগজ্জবং স্রমেধসঃ ।

( চরক সংহিতা )

† অগ্নিবেশকৃতে তন্ত্রে চরক প্রতিসংস্কৃতে ইত্যাদি । এ

ভট্ট \* ভোজ, ভাহকি, বিদেহ, দুটবল

ধরনাদ প্রভৃতির গ্রন্থই প্রধান।

তৃতীয় কাল।

বাভট প্রভৃতির পরবর্তী কালকে সং-  
গ্রহকাল বলা যায়। এই সময়ে মহামতি  
পণ্ডিতগণ মনুষ্যাদিগের আয়ুষ্কাল ও মে-  
ধাশক্তির স্থানতা দেখিয়া বহুবিশীর্ণ চরক  
নৃশত প্রভৃতি মূলগ্রন্থহইতে সংক্ষেপে  
সার সংগ্রহ করিতে লাগিলেন।

সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে ভাবপ্রকাশ,  
যোগবিনিশ্চয়, সংগ্রহ বা নিনান, ঠ চিকিৎ-  
সা সংগ্রহ বা চক্রদন্ত ঠ ও শার্ঙ্গধর সং-  
হিতা প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থই প্রধান।

\* বাভটের নামান্তর অষ্টাদশদয় সং-  
হিতা। ইহা বৈদ্যবংশীয় বৈদ্যপতি সিং-  
হগুপ্তের পুত্র বাভট কর্তৃক রচিত। কিশ্ব-  
দত্তী এইরূপ যে ইনি ক্লকবংশীয় মহারাজ  
যুধিষ্ঠিরের সভাসদ ও রাজবৈদ্য ছিলেন।

† ইহা বৈদ্যবংশীয় ইন্দ্রকরের পুত্র  
মাদবকর বিরচিত।

‡ এই গ্রন্থ বৈদ্যবংশীয় নারায়ণ দ-  
ত্তের পুত্র চক্রপাণি দত্ত কর্তৃক প্রণীত।  
নারায়ণ দত্ত, পাল বংশীয় গোড়াধিপতি  
নয় পালের সভাসদ ও প্রধান চিকিৎসক  
ছিলেন, কনিষ্ঠাম সাহেবের প্রকাশিত  
তালিকা দর্শনে জানা যায় যে, নয় পাল  
১০৪০ খৃঃ অব্দ হইতে ১০৬৫ খৃঃ অব্দ  
পর্যন্ত গোড়া সিংহাসনে অধিরূঢ় ছি-  
লেন।

চতুর্থকাল।

এই সময়ে বাহুল্যরূপে রস প্রয়োগের  
\* ব্যবহার আরম্ভ হয়। পূর্বে যে সকল  
আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের নাম উল্লিখিত হইয়াছে,  
তৎপ্রযুক্ত ঔষধ সমূহ প্রায়ই উদ্ভিজ্জবটিত।  
উহাতে রসপ্রয়োগের বিধান অতি অল্পই  
আছে। এমন কি নাই বলিলেও হয়।  
কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থে রস প্রয়োগের বিধান  
না থাকিলেও তৎকালে অন্যান্য রাসায়নিক  
গ্রন্থের নিত্যন্ত অসম্ভাব ছিল না। শাস্ত্রে  
লিখিত আছে—রসায়নতত্ত্বের প্রথম আবি-  
ষ্কর্তা স্বয়ং মহাদেব। তৎপরে অগস্ত্য,  
নারদ, নাগার্জুন ও কাশ্যরন প্রভৃতি অ-  
সাধারণ বিজ্ঞানবিৎ মুনিগণ কর্তৃক উহার  
অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু পূর্ব-  
কালে উহা সাধারণে বিশেষ প্রচলিত  
ছিল না। প্রায়ই সহজসাধ্য বলিয়া উ-  
দ্ভিজ্জবটিত ঔষধ ব্যবহৃত হইত।

অনন্তর চতুর্থ সময়ের ভেষজতত্ত্ববিৎ  
পণ্ডিতগণ শিব ও নারদাদিপ্রণীত গ্রন্থে  
রসপ্রয়োগের অসাধারণ শক্তিমত্তার উ-  
ল্লেখ দেখিয়া, এবং বন্য ঔষধের বীৰ্য্য-ল-  
বৃত্তা ও হস্তাপাতা দর্শন করিয়া ক্রমশঃ  
রস প্রয়োগের পক্ষপাতী হইলেন। এবং  
সাধারণে সাহায্যে বাহুল্যরূপে উহা প্র-  
চারিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করিতে  
লাগিলেন। এই সময়ে অনেক রাসায়নিক

\* এস্থলে রসপ্রয়োগ শব্দে পারদ,  
গন্ধক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতির প্রয়োগ বু-  
ঝিতে হইবে।

|                                            |     |                               |
|--------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| এস্থ প্রণীত হইয়াছিল, তথ্যে রসরত্নাকর      | ১৭। | বৈদ্য রহস্য।                  |
| রসচন্দ্রিকা, রসেন্দ্র চিন্তামণি ও রসেন্দ্র | ১৮। | বৈদ্য সর্কষ।                  |
| সারসংগ্রহ প্রভৃতি কএক খানি এস্থই           | ১৯। | বৈদ্যামৃত।                    |
| বিশিষ্টরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।            | ২০। | সার কলিকা।                    |
| আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের কত এস্থ প্রচারিত       | ২১। | রত্নাবলী ( কবিচন্দ্র র্ত্ত )। |
| হইয়াছিল এইক্ষণে তাহার সম্যক নিরূপণ        | ২২। | তত্ত্ব চন্দ্রিকা।             |
| করা অত্যন্ত শ্রুতকঠিন। আমরা নেপাল,         | ২৩। | ধাতু রত্নমালা।                |
| কাশী, কলিকাতা ও বিক্রমপুর এই কয়           | ২৪। | ঔষধ রত্নমালা।                 |
| স্থলে অনুসন্ধান করিয়া বহুপরিশ্রমে যে      | ২৫। | মদন পাল নির্ঘণ্ট।             |
| কতিপয় এস্থের নাম সংগ্রহ করিয়াছি,         | ২৬। | ধনুস্তর নির্ঘণ্ট।             |
| নিম্নে তাহার একখানি তালিকা প্রদর্শন        | ২৭। | রস মঞ্জরী।                    |
| করিলাম। পাঠকগণ ইহাৱারাই বুঝিতে             | ২৮। | রসরত্নাকর। ( বাণী কবির্ত্ত )। |
| পারিবেন যে, প্রাচীন ভারতে আয়ুর্বেদ-       | ২৯। | বাণী কবি।                     |
| বিদ্যার কত দূর সমৃদ্ধি হইয়াছিল।           | ৩০। | বীরসিংহাবলোক।                 |
| ১। ধনুস্তর সংহিতা।                         | ৩১। | শতশ্লোকী।                     |
| ২। আত্মের সংহিতা।                          | ৩২। | ঔষধ ( রাজবল্লভী )।            |
| ৩। শ্রুত।                                  | ৩৩। | রসেন্দ্র সার সংগ্রহ।          |
| ৪। চরক সংহিতা বা অগ্নিবৈশতন্ত্র।           | ৩৪। | গজায়ুর্বেদ।                  |
| ৫। বাতট বা অক্টাঙ্গ ছন্দ সংহিতা।           | ৩৫। | পাষণ্ড শাসন পত্র।             |
| ৬। ভাব প্রকাশ।                             | ৩৬। | সর্কষ চিন্তামণি।              |
| ৭। শার্ঙ্গধর সংহিতা।                       | ৩৭। | সংক্ষিপ্ত সার।                |
| ৮। চিকিৎসা-সার-সংগ্রহ বা চক্রদত্ত।         | ৩৮। | চিকিৎসারত্ন।                  |
| ৯। ঔষধসংগ্রহ।                              | ৩৯। | চিকিৎসাণব।                    |
| ১০। রোগ বিনিশ্চয় সংগ্রহ বা নিদান।         | ৪০। | সার কোমুদী।                   |
| ১১। রস চন্দ্রিকা।                          | ৪১। | মুগ্ধ বোধ।                    |
| ১২। চিকিৎসা সার সংগ্রহ।                    | ৪২। | ভৈষজ্যরত্নাবলী।               |
| ১৩। মহা রসারন বিধি।                        | ৪৩। | রত্নমালা।                     |
| ১৪। বৈদ্যক সংগ্রহ।                         | ৪৪। | মুক্তাবলী।                    |
| ১৫। বৈদ্য জীবন।                            | ৪৫। | নাড়ীতত্ত্ব।                  |
| ১৬। বৈদ্য বিনোদ।                           | ৪৬। | নাড়ীচক্র।                    |

- ৪৭। পরিভাষা ।
- ৪৮। অয়োগ চিন্তামণি ।
- ৪৯। রাজ নির্ঘণ্ট ।
- ৫০। পথ্যাপথ্য বিদ্যি ।
- ৫১। নাড়ী পরীক্ষা ।
- ৫২। কালজ্ঞান ।
- ৫৩। পাকবিলাস ।
- ৫৪। কুণ্ডুমাংসলী ।
- ৫৫। তোড়বানন্দ ।
- ৫৬। অব্যগুণ বিবেক ।
- ৫৭। নিবন্ধ সংগ্রহ ।
- ৫৮। পাকাবলী ।
- ৫৯। পথ্যাপথ্য বিবেক ।
- ৬০। রসেন্দ্র কপ্পজম ।
- ৬১। রস প্রদীপ ।
- ৬২। বৈদ্যক ভাষ্য সংগ্রহ ।
- ৬৩। বিশ্ব নিদান ।
- ৬৪। যোগচক্রিকা ।
- ৬৫। সিদ্ধান্তসম্বোধ ।
- ৬৬। যোগ তরঙ্গিনী ।
- ৬৭। গুণ শিরোমণি ।
- ৬৮। স্তম্ভবোধ ।
- ৬৯। গুণ বোধ ।
- ৭০। চিকিৎসাদর্পণ ।
- ৭১। হৃদয় দীপিকা ।
- ৭২। সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ ।
- ৭৩। সিদ্ধিযোগ ।
- ৭৪। অষ্টচিকিৎসা ।
- ৭৫। বালচিকিৎসা ।
- ৭৬। ভাবার্থ দীপিকা ।

- ৭৭। অজ্ঞীর্ণ মঞ্জরী ।
- ৭৮। অমৃত সাগর ।
- ৭৯। সর্কসার সংগ্রহ ।
- ৮০। নিষটু রত্নাকর ।
- ৮১। মদন বিমোদ ।
- ৮২। রাম বিমোদ ।
- ৮৩। রসরত্নাকর ( মাধবকৃত ) ।
- ৮৪। নাড়ী প্রকাশ ।
- ৮৫। রত্নাবলী ( মাধবকৃত ) ।

এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ ছিল, তন্মধ্যে গ্রন্থকারের নাম মামুসারেই অধিকাংশ গ্রন্থের নাম নির্দেশ দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা নিম্নে সেই সেই গ্রন্থকারের নাম লিখিলাম। ইহাদিগের মধ্যে অনেক টীকাকারেরও নাম লিখিত হইল।

- ৮৬। ঔপদেশব ।
- ৮৭। ঔরভ ।
- ৮৮। পৌঞ্চলাবত ।
- ৮৯। গোপুন্নরকিত ।
- ৯০। করবীৰ্য্য ।
- ৯১। ভেল ।
- ৯২। ক্ষারপাণি ।
- ৯৩। হারীত ।
- ৯৪। জতুকর্ণ ।
- ৯৫। পরাশর ।
- ৯৬। ভোত্র ।
- ৯৭। ভাহুকি ।
- ৯৮। বিদেহ ।
- ৯৯। ধন নাদ ।

- ১০০। দূঢ় বল ।  
 ১০১। গয় দাস ।  
 ১০২। ব্যাস ।  
 ১০৩। নারদ ।  
 ১০৪। অগস্ত্য ।  
 ১০৫। নাগাজুন ।  
 ১০৬। কাঙ্কায়ন ।  
 ১০৭। হরিচন্দ্র ।  
 ১০৮। গদাধর ।  
 ১০৯। বাপ্পচন্দ্র ।  
 ১১০। বকুল ।  
 ১১১। ঈশান ।  
 ১১২। কার্তিক কুণ্ড ।  
 ১১৩। সুকীর ।  
 ১১৪। মৈত্রেয় ।  
 ১১৫। সুরদাস সেন ।  
 ১১৬। ত্রিশটাচার্য্য ।  
 ১১৭। জেজ্জুড় ।  
 ১১৮। অকণ দত্ত ।  
 ১১৯। উল্লন ।  
 ১২০। শিবদাস সেন ।  
 ১২১। বিজয় রক্ষিত ।  
 ১২২। জীকণ্ঠ দত্ত ।  
 ১২৩। ঈশ্বর সেন ।

দিন দিন আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি হইতেছে কেন ? অনেকে ইহার কারণ জিজ্ঞাস্য হইয়াছেন। আমাদিগের বিবেচনায় নিম্ন লিখিত কএকটি কারণই প্রধান ও প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়।

১ম। যবন দৌরাভ্যা । ২য়। রা-

জার অমনোযোগ । ৩য়। বিদেশীয় চিকিৎসার বহুলপ্রচার । ৪র্থ। অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত লোকের চিকিৎসকসম্প্রদায়ে প্রবেশ । ৫ম। বাহ্যরূপ সংস্কৃত চর্চার অভাব ।

১ম। আয়ুর্বেদাবনতির যে সমস্ত কারণ উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে যবনদৌরাভ্যা বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। কাপাত্তরে অন্যান্য কারণের অভাব সত্তাবিত হইলেও যবন অভ্যাচারে আয়ুর্বেদের অশ্বে যে আঘাত প্রদান করিয়াছে, তাহার পুনরুদ্ধার হইবে না। মুসলমান-রাজত্বকালে আমাদিগের অন্যান্য গ্রন্থের সহিত আয়ুর্বেদীয় অনেক গ্রন্থও ভস্মাবশেষ হইয়াছে। তাহা আর কোনও কালেও প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

২য়। আমাদিগের দেশ বিদেশীয় রাজার হস্তগত হওয়া অবধিই আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার ক্রমশঃ অবনতি দেখা যায়। ইতঃপুর্বে হিন্দুরাজার সময়ে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সমধিক গৌরব ছিল। চিকিৎসকগণ রাজসমীপে বিশেষ সম্মান লাভ করিতেন। এবং তাঁহাদিগের যথোচিত স্বত্তি নির্দিষ্ট ছিল। দেশীয় অন্যান্য লোকও রাজদৃষ্টিভেদের অনুকরণ করিত। সুতরাং চিকিৎসকগণ বহুসংখ্যক ছাত্রের ভরণ, পোষণ, ও শিক্ষাদান করিয়া অনায়াসে জীবিকা নিব্বাহ করিতে পারিতেন।

বর্তমান সময়ে আয়ুর্বেদের প্রতি রাজ

অল্পপ্রের নিতান্ত অভাব হইয়াছে। লোকে যে কার্যেই প্রবৃত্ত হয়, অবশ্যই তৎসম্পর্কে ভবিষ্যতে কোন লাভপ্রত্যাশা অন্তঃকরণে নিহিত থাকে। গবীর্গমেন্ট সংস্থাপিত মেডিকল কলেজে তিন বৎসর কি পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিলেই রাজপ্রদত্ত কর্ম পাটবে, এই ভবিষ্যৎ আশায় প্রোৎসাহিত হইয়াই, শত শত লোক বহু ব্যয় ও বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্বক ইয়ুরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। ভবিষ্যতে লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে, কেবল বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত কখনই এত লোক উছাতে প্রবৃষ্ট হইত না। হুর্ভাগা বশতঃ আয়ুর্বেদ শিক্ষার্থীগণের তদ্রূপ কোন নিশ্চিত আশা নাই। সুতরাং অনন্যোপায় না হইলে প্রায় কেহই আয়ুর্বেদ শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয় না।

৩য়। বিদেশীয় চিকিৎসার বহুল-প্রচারদ্বারাও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার অনেক অবনতি হইয়াছে। আপাত মুখকর বলিয়া অধিকাংশ দেশীয় লোকই বিদেশীয় চিকিৎসার পক্ষপাতী। কিন্তু ইয়ুরোপীয় চিকিৎসাদ্বারা আমাদিগের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক কত দূর অনিষ্ট হইতেছে তাহা কেহই বিবেচনা করেন না।

পূর্বতন শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, দেশ, কাল, ও পাত্র অনুসারেই ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইয়ুরোপ অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ, তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ঔষধ তদ্রূপ লোকের শরীরোপযোগী, এবং

তদনুসারেই উছা প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদিগের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, শারীর-বহু ইয়ুরোপীয় লোকের সম্পূর্ণ বিপরীত। সুতরাং ইয়ুরোপীয় তীক্ষ্ণবীৰ্য্য ঔষধ আমাদিগের শরীরোপযোগী হইতে পারে না। এই নিমিত্তই মহামতি বুদ্ধ বাভট বলিয়াছেন—

“যস্য দেশস্য যোজ্যস্তত্ত্বস্তমৌষধং

হিতং।

দেশাদনাত্ৰ বসতস্তত্ত্বল্যুগ্গমৌষধং ॥”

যে, যে দেশের লোক, তদ্রূপীয় ঔষধই তাহার পক্ষে হিতকর। স্বদেশ পরিভ্রমণ করিয়া দীর্ঘকাল দেশান্তরে বাস করিলে, তদ্রূপীয় ঔষধ ক্রমশঃ তাহার পক্ষে হিতকর হইতে পারে। যদিচ ইয়ুরোপীয় ঔষধদ্বারা আশু উপকার লাভ করিতেছি, কিন্তু উছাদ্বারা যে আমাদের শারীর-তেজ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে তাহার আর সন্দেহ কি।

৪র্থ। অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোক চিকিৎসক সম্মুখায় প্রবেশ করিয়া আয়ুর্বেদের ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। ইহারা যথার্থরূপে রোগ নির্ণয় করিয়া তদুপযোগী ঔষধ প্রদান করিতে পারে না। এক অবস্থার রোগে অন্য অবস্থার ঔষধ ব্যবস্থা করে; এবং যথোচিতরূপে ঔষধ প্রস্তুত করিতেও সমর্থ হয় না, নানা রূপ কৃত্রিমতা দ্বারা ঔষধের গৌরব নষ্ট করে। সুতরাং উছা সেবনে রোগীর উপকার না হইয়া বরং



অপকারই ঘটিয়া থাকে । এই কারণে সাধারণের আত্মকর্মেদীয় চিকিৎসার উপরে বিষয় বিবেচন জন্মিয়াছে ।

৫ম । বাতুল্যরূপে সংস্কৃত চর্চার অভাব হওয়াতে অনেকেই আত্মকর্মেদে মর্মে পরিগ্রহ করিতে পারেন না । আত্মকর্মেদীয় গ্রন্থ সকল দুঃস্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত । সংস্কৃত ভাষায় ভালরূপ অধিকার না থাকিলে, উহার মর্মবোধ করিতে পারা যায় না । এমন কি বাঁহারা অন্যান্য ভাষায় কৃতবিদ্যা, তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকের সংস্কার এইরূপ যে আত্মকর্মেদে 'শারীরতত্ত্ব' কিংবা 'অস্ত্রচিকিৎসা প্রণালী' বিরত হয় নাই । সংস্কৃতানভিজ্ঞতাই এরূপ রূখা সংস্কারের মূল । আত্মকর্মেদে শারীরতত্ত্ব কি অস্ত্র চিকিৎসা প্রণালী প্রভৃতি অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । দুর্ভাগ্যবশতঃ সংস্কৃত চর্চার নিতান্ত অভাব হওয়াতেই আত্মকর্মেদীয় গ্রন্থ সমূহের মর্মও ক্রমশঃ সাধারণের অপরিজ্ঞাত হইয়া উঠিতেছে । ইহা নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় ।

আত্মকর্মেদে পূর্নবাস্থা, বর্তমান অবস্থার কারণ, এবং প্রাপ্ত গ্রন্থাবলীর নাম উল্লিখিত হইল । এইক্ষেণে দেশীয় মহাস্থাগর সমীপে জিজ্ঞাস্য এই যে, দিন দিন আত্মকর্মেদীয় চিকিৎসার যে রূপ অবনতি হইতেছে, ইহাতে বোধ হয় অচিরকাল মধ্যেই উহা বিলয়দশা প্রাপ্ত হইবে । অতএব আত্মকর্মেদীয় চিকিৎসার বাহাতে পুনরুদ্ধার হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করা উচিত কি

না ? যদি উচিত হয়, তবে এখনও নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকি কেন ? সময়ে কাজ না করিয়া শেষে কাদিলে কি হইবে ? আমাদের পূর্বপুরুষগণ বন্যফলমূলে জীবিকা নির্বাহ করিয়া বহুযত্নে ও বহুপরিশ্রমে পৃথিবীমধ্যে যে অভূত কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন ; অযত্নবাতাবাতে তাহা ভগ্ন হইয়া কালশ্রোতে মিশিতে লাগিল, আর আমরা তাঁহাদেরই বংশধর হইয়া অন্নানবদনে, নিরস্ত্র নয়নে, উদাসীনের ন্যায় তাহা দেখিতে বসিলাম । ইহাই কি আমাদের গুরুত্বজ্ঞাত ? ইহাই কি আমাদের পুরুষকার ? ইহাই কি আমাদের গুরুত্বানিষ্ঠা ?

অন্যান্য সকল দেশীয় লোকেরই কোন না কোন বিষয়ে গৌরব করিবার অধিকার আছে ; কিন্তু আমাদের কি আছে ? আমরা কি লইয়া গৌরব করিতে পারি ? আমাদের যদি কোন গৌরবের বিষয় থাকে, তাহা পূর্বতন আর্ধ্যগণেরই কীর্তিকলাপ । আমরা আর্ধ্য সন্তান, এই আমাদের গৌরব । ইহা ভিন্ন আর কি আছে ? যে আর্ধ্যগণের আশ্রয় গৌরবান্বিত, সেই আর্ধ্যগণের কীর্তিগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে চলিল ; আমরা কি ইহার সংরক্ষণের জন্য কোন উপায় করিতে পারিব না ? অবশ্যই পারিব ; সমবেত চেষ্টার অসাধ্য কি ?

পাঠকগণ এইক্ষেণে জিজ্ঞাস্য করিতে পারেন যে কি উপায়ে লুপ্তপ্রায় আত্ম-

কেন্দ্রীয় চিকিৎসার পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে। লোকের উপকারের নিমিত্ত এক একটি নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে আয়ুর্বেদের পুনরুজ্জীবিত হইতে পারে।

উপরে যে উপায় নির্ধারিত হইল,

১ম। আয়ুর্বেদের প্রতি গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা। ২য়। দেশীয় ধনীদিগের আর্থিক সাহায্য দান। ৩য়। আয়ুর্বেদের পুস্তক সংগ্রহ এবং বিশুদ্ধ বাজালা ভাষায় তৎসমুদায়ের অনুবাদ। ৪র্থ। প্রধান প্রধান নগরে একটি একটি আয়ুর্বেদবিদ্যালয় এবং তৎসঙ্গে এক একটি ভেষজালয় ও এক একটি উদ্ভিদজ বাটিকার সংস্থাপন। ৫ম। পল্লীস্থ প্রধান প্রধান ধনীর বাটিতে আয়ুর্বেদপত্রী-ইহতে পারে।

কোভীর্ণ ছাত্রগণের ব্যবসায় ও দেশীয়

ঐহিরমোহন দাস গুপ্ত

## প্রাপ্ত।

বিনোদপুরস্থিত।

অবলাহিতৈষিণীসভার সাংবৎসরিকবিবরণ।

সভাস্থ সকলে সমবেত হইলে, ঐহুতা দেবী পারিজাতা স্বন্দরী, সকলের শিরোবন-মণে সম্মানিত হইয়া, সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন, এবং তৎপরে পাশ্চাত্য রী-তানুসারে দণ্ডায়মান হইয়া, যুগ্মমোহনকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—

“হে সভ্যাগণ, হে ভগিনীগণ, হে বজ্রের অনঙ্গারূপিণী পুরস্বন্দরীগণ, আমি অদ্য তোমাদিগের নিকট ক্ষমার কবটি

খুলিয়া আমার ক্ষমার অতি গভীর একটি হৃৎকের কথা প্রকাশ করিব। এ হৃৎক-হিবীর নহে, সহিবীরও নহে। কিন্তু যখন তোমরাই আমার চক্ষু কর্ণ, তোমরাই আমার সহায় সম্পদ, এবং তোমাদিগের হৃ-স্তেই চিরহৃৎখিনী বজ্রত্মির ভবিষ্যৎ উ-ন্নতির ভার, তখন কথাটি যত কেন অগ্রিম হউক না, আমি তাহা তোমাদিগের নিকট অদ্য নির্খুস্কচিত্তে ব্যক্ত করিব।

“তোমরা আজি বঙ্গে কি দেখিতেছ ? বঙ্গে কি উন্নতি হইতেছে ? আমার চক্ষে বঙ্গের বর্তমান উন্নতি, উন্নতি নহে, প্রত্যুত উহা অধঃপাতের প্রশস্ত পথ ;—বঙ্গবাসীর বর্তমান সভ্যতা, সভ্যতা নহে ; প্রত্যুত উহা অসভ্যতার আদি সোপান । দেশের উন্নতি কিসে ? জ্ঞান বিস্তারে ? রসস্বাদ-শূন্য গোপণ্ডিতের মুখেই এমন নীরস কথা শোভা পায় । দেশের সভ্যতা কিসে ? সাহিত্যশাস্ত্রের বিকাশে ? নিত্য অনক্ষর অজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই এমন কথা বলিতে পারে না । আমার বিবেচনায়, দেশের প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত সভ্যতার মূলবীজ ত্রীর প্রতি ভক্তি এবং ত্রীজাতির আজ্ঞাপালনে অকৃত্রিম অনুরাগ । ইংলণ্ড যে আজি এত উন্নত এবং সভ্যতার এত ভূষণে বিভূষিত হইয়াছে, ত্রীর প্রতি ভক্তিই তাহার নিদান । ফরাসিজাতির উন্নতিও ত্রী-ভক্তিরই ফল, এবং আমেরিকা যে আধুনিক সভ্যতার সীমন্তে সিন্দূর সদৃশ সুন্দর-দৃশ্য হইয়াছে, ত্রী-ভক্তিই তাহার একমাত্র কারণ । নিত্য পরিতাপের বিষয়, এই ত্রীশাসিত বঙ্গরাজ্যে সেই সর্বমঙ্গলময় ত্রী-ভক্তি ইদানীং ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে ; এবং বঙ্গদেশ যাহাদিগের দিকে তৃষিত নয়নে চাহিয়া রহিয়াছিল, যাহাদিগের উপর এত আশা করিয়া রহিয়াছিল, সেই ন্যাসভ্যতাভিমानी মুশিক্ষিত বঙ্গ-সম্প্রদায়ই ত্রীভক্তির মূলদেশে কুঠারের আঘাত করিতেছে । তোমরা কি ইহাদিগকে বিশ্বাস

কর ? আমার বিশ্বাস বহুদিন হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে । আমি বুঝিয়াছি ইহারা অন্তরে আমাদের বিষেবী ও বিকৃদ্ধাচারী এবং আমাদের সম্পদ ও শান্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী । ইহারা যে প্রকাশ্যে আমাদের আত্মাধীন, সে কেবল শাসন-ভয়ে । ইহারা যে সম্মুখে আমাদের চাটুকর, সে কেবল চটুলনয়নের তীব্র দৃষ্টি, অথবা অঞ্চল তাড়না কি সম্মার্জনীর অপরিহার্য শঙ্কায় । কিন্তু ইহাদিগের চিত্ত প্রকৃত-প্রভাবে মধুমুখ বিষকুস্ত স্বরূপ । ইহাদিগের জিহ্বা আমাদের কলঙ্ক ঘোষণার ঢকা বিশেষ । ইহাদিগের লেখনী আমাদের অপমণের পরিচয়-স্তুত স্বরূপ । আমি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি, ইহারা যখন পারে তখনই আমাদের ত্রী-পাট-নীতির নিন্দা করে ; যেখানে সেখানে আমাদের গ্লানি করে ; আমাদের যে সকল দোষ লোকে দেখিতে পায় না ও জানিতে পায় না, ইহারা পঞ্চমুখে তাহা প্রচার করে, এবং যাহাতে সংসারে আমাদের প্রভুত্ব ও অধিপত্য না থাকে, অতি প্রসঙ্গভাবে নিয়ত তাহারই চেষ্টা করে ।

“আমার এসকল কথা কি তোমাদিগের নিকট অলীক বোধ হইতেছে ? যদি অলীক বোধ হয়, তোমরা মনোনিবেশ সহকারে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠ কর । আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যই আমার উল্লিখিত কথাগুলির প্রত্যক্ষ নিদর্শন । উহার আদ্যন্ত সমস্তই গরলময় এবং ত্রীজাতির

দোষাণুকীৰ্ত্তন ও স্ত্রীর প্রতি অভক্তির ভাবে পরিপূর্ণ। তোমাদিগের মধ্যে অনেক যারপরনাই অশলীলা, কার্যনিপুণা এবং পুরুষ জাতির হিত-চিন্তা-পারায়ণা। কিন্তু আমি বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি গ্রন্থে কি একখানি পত্রের তোমাদিগের কাছ-রও কমনীয়চ্ছবি কমনীয় বর্ণে চিত্রিত দেখিতে পাই না। অথচ, তোমরা কে কবে অন্ধকারে কি করিয়াছিলে, কাহার অন্ন কাহাকে দিয়া কাহাকে উপবাসী রাখিয়াছিলে, কাহাকে পদাঘাতে গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে দূর করিয়াছিলে, কাহাকে কটুকথা বলিয়া কাঁদাইয়াছিলে, অথবা কাহার কি কাড়িয়া নিয়া আপনি কি করিয়াছিলে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থেই কেবল এই সকল কথার আন্দোলন এবং এই সকল কথার আলোচনা, এমন অকৃতজ্ঞ অধম জাতিকেও কি তোমরা আবার প্রশ্রয় দিতে ইচ্ছা কর? ইহাদিগের সহিতও কি তোমরা আবার আলাপ করিয়া মুখী হইতে ইচ্ছুক হও, এবং এইরূপ ভিক্ষারক্ৰীড়ী, প্রসাদভোজী, পরপুষ্ঠ পামরদিগকেও কি তোমরা সরলহৃদয়ে ভাল বাস? আমার বিবেচনায় ইহাদিগকে সমূলে উচ্ছিন্ন অথবা বিনষ্ট করা উচিত। যদি আমার কথা শুন, তাহা হইলে ইহাদিগকে অন্নজপে বঞ্চিত করিয়া, দেশহইতে দূরীভূত করাই সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য। যাহাতে পৃথিবী, ইহাদিগের পাপম্পর্শে আর পঙ্কিল না রহে, এবং ইহাদি-

গের জিহ্বা ও লেখনী আর আমাদিগের নিন্দাবাদে ব্যাপ্ত না হয়, তজ্জন্য ইহাদিগের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলোপ করাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়। নহিলে আমাদিগের মঙ্গল নাই, আমাদিগের নিস্তার নাই। মৃদুশাসনে যাহা ফলে নাই, তাহার জন্য এক্ষণ দৃঢ় শাসন আবশ্যক। কমলদলসদৃশ কোমল হস্তের স্নেহকমল আবর্তনে যাহা সিদ্ধ হয় নাই, এক্ষণ তাহার জন্য বজ্রমুষ্টির প্রয়োজন। আমার যাহা বক্তব্য, আমি তাহা নির্ভয়েই বলিয়া ফেলিলাম; এক্ষণ তোমরাও এই কথা লইয়া বিচার বিতর্ক ও স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতে পার। আমাদিগের সভার আর যাহা কিছু কার্য থাকে, তাহা পরে হইবে। এইরূপ সাময়িক শুভ-উৎসবের অন্তত কটক নিচয় যাহাতে একবারে উন্মূলিত ও উৎপাটিত হয়, তোমরা অগ্রে তাহারই উপায় নির্ধারণ কর। (সকলের করতালীর মধ্যে উৎপবেশন।)

ইহার পর স্বদেশাহিতৈষিনী স্রীযুতা কৃষ্ণকামিনীদাসী গাত্রোস্থান করিয়া বলিলেন,—“আমি সভাপতি মহাশয়ার সকল কথাই সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি। আমি চির দিনই তাঁহার মতের পোষকতা করিয়া আসিয়াছি, আজিও তাঁহারই মতের পোষকতা করিতে পারিমা, আস্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে পারিতেছি। আমার বিবেচনায় তাঁহার বক্তৃতার প্রত্যেক কথাই শুক্তিগর্ত্ত্ব যুক্তাস্বরূপ। আমাদিগের এ-

দেশে ক্রীড়াতির প্রতি ভক্তির প্রবাহে যে প্রবল ভাটা লাগিয়াছে, তাহাতে অণু-মাত্রও সন্দেহ নাই, এবং অভক্ত নব্য স-স্রদায়ের অন্তর্গত বিজ্ঞোহিতাই এই অবস্থা-পরিবর্তের নিদান। কিন্তু নায়ের অনু-রোধে তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, নব্য সমাজের সকল ব্যক্তিকে এই কলঙ্কে কলঙ্কিত নহে। যেমন কটকবনেও কু-লুমলতা দৃষ্ট হয়, নব্যদিগের মধ্যেও সেই রূপ কদাচিৎ কখনও ভক্তিভাবাপন্ন ভ-জলোক আদ্যদিগের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এবং ইহার উদাহরণস্থলে আমি সর্বপ্রায়ে বস্তুদর্শনের ভূতপূর্ব সম্পা-দকের নাম উল্লেখ করিতেছি। আমার বোধ হয়, এই ব্যক্তির অন্তঃকরণ ভক্তি-রসে আতটপূর্ণ। নহিলে, ইহার লে-খনী হইতে নিরন্তর এইরূপ অমৃতধারা প্রবাহিত হইবে কেন? ইহার সমস্ত লে-খাই আদ্যদিগের স্তুতিবাদে পরিপূরিত, মৃতরাং অভক্তের গণনায় ইহাকে পরি-গণনা করা কখনও বিচারসঙ্গত নহে।—

এই কথার পর, ক্রীষতা দেবী চন্দ্রাবলী মুখোপাধ্যায়, নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, জেতুফন সহকারে ভাবগঙ্গাদ্বারে বলিতে লাগি-লেন যে,—“আমি আমার এই উনবিং-শতি বৎসর বয়সের মধ্যে অনেক স্থলে অনেক অকথা শুনিয়াছি; কিন্তু কোন দিনও কোন স্থলে কৃষ্ণকামিনীর উক্তির মত, অলীক অমূলক কথা শুনিয়াছি কি না, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে।

তিনি ভক্তের গণনায় বঙ্গদর্শনসম্পাদকের নাম উল্লেখ করিলেন! আমার বিবেচনায় সে একটি বিষের হাঁড়ি, এবং তাঁহার মত অভক্ত ত্রিভুবনেও নাই। তাহাকে বিধাতা অসামান্য শক্তি দিয়াছেন। কিন্তু সে শক্তি আদ্যদিগের সর্বনাশের জন্য। যদি তাহার অন্তরে আদ্যদিগের প্রতি মতা স-তাই ভক্তির ভাব থাকিবে, তবে সে লো-কললামভূতা আয়োগ্যকে ভুযানলে পুড়িয়া মারিল কেন, এবং প্রভাতকমলসদৃশী পবিত্রহৃদয়া তিলোত্তমারই বা অত নিগ্রহ এবং বিড়ম্বনা ঘটাইল কেন? যদি ভক্তি-রসেই তাহার হৃদয় জব রহিবে, তবে সে কপাপকুণ্ডলার মত কম্পলতাকে নবকুমা-রের ন্যায় অশিক্ষিত, অরসিক বনপশুর কণ্ঠে দোলাইয়া দিল কেন? আর স্বর্গ-মুখী এবং কুন্দনন্দিনীর ন্যায় দুইটি স্বর্গ-বিদ্যাদ্বরীকে একটা অকালকুখ্যাও গ্রাম্য ভূতের প্রতি অনুরাগিনী করিয়া, উভয়েরই এমন লাঞ্ছনা ঘটাইল কেন? ফলতঃ ইহার কথা আমার নিকট আর বলিও না। আমি বুঝিয়াছি, আমি ইহা অশেষ প্রকারে বু-ঝিয়াছি যে, যে আদ্যদিগের এত অবমা-ননা করিয়াও পুনরায় আদ্যদিগেরই নিকট প্রশংসাতাজন হইতেছে, জগতে তাহার মত মণিমণ্ডিত ফণী দুইটি আর দৃষ্ট হইবে না। (অনেকের করতালি এবং কাহারও কাহারও দীর্ঘ নিঃশ্বাস।)

ক্রীষতা সৌদামিনী বলিলেন,—“বো-ধ হয় অক্ষয়চন্দ্রের এ অপবাদ নাই। সে

সাধারণের নিকট অনেক সময়ে আমা-  
দিগের গুণানুবাদ করিয়াছে ।”

ইহাতে জীযুতা প্রসন্নময়ী বলিলেন,—  
“তুমি অমন প্রভু-কুল-জ্যোতী নিম্নকের নাম  
সভাস্থলে উচ্চারণ করিও না। আমরা  
উঁহার হাতে প্রোবুর তাস আর খেলার  
খেলেনা। উঁহার যত গুণপনা তাহা পাঁচ-  
লহরীর কাহিনী এবং ফুল্লরার ও ককটীর  
বাখ্যানেনই প্রকাশ পাইয়াছে ।”

ইহার পর একটি আধ-বিবি পোষাকী বউ  
উঠিয়া বলিলেন,—“তবে মোহিনীমোহন ?  
সে ত ভক্তিপত্রমিদংকার্যাক্ষাগে এই বলিয়া  
দলীল লিখিয়া রেজেক্টরী করিয়া দিয়াছে ।”

জীযুতা বগলামুন্দরীগুপ্তা এই কথার  
প্রভুত্তরে বলিলেন,—“মোহিনীমোহ-  
নের নিবাস কিচ্ছিক্কায়া। কিচ্ছিক্কায়া-  
সীতে আমার প্রত্যয় নাই ।”

দেবী বিলাসমণি ও বসন্তকুমারী ব-  
লিলেন,—“তবে দীনবন্ধু ?”—দেবী আ-  
নন্দময়ী বলিলেন,—“তাহার যত ভক্তি  
আছে, তাহা জগদম্বার রূপগুণ বর্ণনায়ই  
প্রকাশ পাইয়াছে। কুলের কামিনী পাদ-  
প্রহারে কবে কাহার প্রীতি বিদারণ করি-  
য়াছে, একথা লইয়া সে রগড় করিল  
কেন ? যে ভক্ত, সে ভক্তিভাবে আন-  
ন্দাশ্রুপাত করিবে, রগড় করিবে না ।”

জীযুতা সভাপতিমহাশয়া বলিলেন,  
‘সাবধান তোমরা মৃতের সহিত যুদ্ধ করিও  
না, ইচ্ছা হয় ত, জীবিতদিগের বিক্ষে-  
তোমরা যুদ্ধ করিতে পার ।’

এই সময়ে জীযুতা অনাথবিনোদিনী  
গুহজায়া গাত্ৰোত্থান করিয়া, তাঁহার সেই  
গম্ভীর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—‘আমি  
বুঝিতে পারিতেছি না, আমাদের মধ্যে  
কেন আজি এই অহুতপূৰ্ণ কোলাহল,  
এবং কি জনাই বা বজ্রীয় নবাসম্প্রদায়ের  
উপর আমাদের এই বিদ্বেষ, আর তা-  
হাদিগের সহিত এইরূপ যুদ্ধবিগ্রহের  
আয়োজন ? কে বলিয়াছে, যে মুশিক্ষিত  
নবাসম্প্রদায় আমাদের বিদ্বেষী ?  
যদি নবাসম্প্রদায়ের পুরসের ব্যক্তিরাই  
আমাদের বিদ্বেষী হইবে, তবে নারী-  
জাতিবিশেষক প্রস্তাব এবং অবলাবান্ধবের  
স্তুতিগীত-মালায়, বঙ্গভাষা পরিপূর্ণ হইবে  
কেন ? যদি নবাসম্প্রদায়ই আমাদের  
বিদ্বেষী হইবে, তবে হেম, নবীন, রাজকুমার  
ও দীনেশ প্রভৃতির কবিতাময় পুষ্পহারে  
আমাদের কবরীগুলি আজি কিরূপে অ-  
লঙ্ঘিত হইল ?—যদি নবাসম্প্রদায়ই আমা-  
দিগের অহিতাচারে প্ররত রহিলে, তাহা  
হইলে, কে আমাদের এই স্ত্রী-পাট-রা-  
জ্যের প্রকৃত অবস্থা পরিজ্ঞাত করাইল ?  
কাহার নিকট আমরা শ্রমাসনের উপদেশ  
পাইলাম ? আর, আমাদের যে রাজ্য  
কোন দিন মথুর রাজ্য বলিয়া সর্বত্র যুগিত  
ছিল, সেই রাজ্য আজি কাহার গুণে অ-  
র্গোক্ষল প্রতীতমান হইতেছে ? প্রকৃত কথা  
এই, নবাসম্প্রদায় আমাদের বিদ্বেষী  
নহে, আমরাই তাহাদিগের মনের অবস্থা  
এবং মনোনিহিত ভক্তিভাবে বুঝিতে না

পাইয়া, অনেক সময়ে অকারণ তাহাদিগের নিন্দাবাদ করি।—তোমরা কি প্রত্যাশা কর যে, আমরা যাহাদিগের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিব, তাহারা আমাদের পদারবিন্দে পুষ্পচন্দন স্থষ্টি করিবে?—আমরা যাহাদিগকে অস্পৃশ্য অগণ্য বলিয়া অবজ্ঞা করিব, তাহারা পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া আমাদের পূজা করিতে আসিবে? ধিক্ তোমাদিগের স্বার্থপরতায়, ধিক্ তোমাদিগের চাটুবাদপ্রিয়তায়! যদি তোমরা বশ চাও, তবে যশস্কর কার্যের অনুষ্ঠান কর, কুটিল নীতি পরিত্যাগ করিয়া অবলার যোগ্য সরলতা শিক্ষা কর, এবং ক্ষুদ্র জন্মের মত আত্মপরগণনা পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃত মহানুভাবতার আশ্রয় লও। তাহা হইলে, দেখিতে পাইবে, আজি এখানে ওখানে যে দুচারি জন তোমাদিগের নিম্নুক রহিয়াছে, দুদিনের মধ্যে তাহারাও তোমাদিগের ভক্ত ও শুভক হইয়া, তোমাদিগের অলঙ্করঞ্জিত পাদপদ্মে আসিয়া গড়াইয়া পড়িবে, এবং আজি যাহারা প্রকৃত হিতকামনারই বশবর্তী হইয়া, তোমাদিগের জগদদ্বা ও শত্রুরী ঠাকুরানী, তোমাদিগের কুল্লরা, ও কর্কটায় এত ব্যাখ্যান করিতেছে, কালি তাহারাও আবার তোমাদিগের যশোগানে দশ দিক্ পূর্ণ করিবে।

অনাথবিনোদিনীর উল্লিখিত বক্তৃতায় সভাস্থলে এক তুমুল হুলস্থূল বাধিল। দেবী হেমন্তবিলাসিনী, নলিন-সুন্দরী এবং বগলাসুন্দরী ও প্রসন্নময়ী প্র-

ভৃতি কতিপয় দীর্ঘমতি সভা বক্তৃতার পোষকতা করিলেন, অন্যেরা সকলেই ছি ছি! ধিক্ ধিক্ বলিয়া কঙ্কনঝনৎকারের সঙ্গে বক্তৃতার নিন্দা করিতে লাগিলেন। একটি বিলাতের মেম বাঙ্গালি মেয়েদের বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিলেন, তিনি ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণকামিনী দাসীও সভা মণ্ডপ পরিত্যাগ করিলেন। ইহার পর সভাপতি মহাশয়া ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিলেন যে, অন্য এই সভা স্থগিত থাকিবে, এবং মাস ত্রয়ের পর পুনরায় সভার অধিবেশন ও তাহাতে পুনরায় এই বিতর্কিত বিষয়ের আলোচনা হইবে। তাহার বিবেচনার সভাগণের এইরূপ আত্মকলহ একান্ত গর্হিত। ( জীব ) \*

\* আমরা ইহা বিশেষরূপে জানি, এবং জানি বলিয়া পাঠকবর্গকে দৃঢ়তার সহিত জানাইতেছি যে, আমরা যাহার নিকট হইতে উল্লিখিত বিবরণটি প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনি নারীজাতির শিক্ষা, স্বাধীনতা এবং সামাজিক উন্নতির এক জন অকৃত্রিম স্নহুৎ। ইদানীং এদেশে পুরুষমহিলাদিগের দ্বারা যে সকল সভার শোভাবর্দ্ধন হয়, তাহা লইয়া পরিহাস করা, তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এবং স্রুতরাং অসম্ভব। পাঠকবর্গের নিকট এই নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছি, তাহারা পরকীর লেখার ভাষা করিতে গিয়া, শ্রীমন্তাগবতের ভাষাকারের ন্যায় একে আর করিবেন না। (সং)

## সংক্ষিপ্তসমালোচন

১। কল্পিতক। জীইন্দ্রনাথ বন্দো-  
পাধ্যায় প্রণীত। আমাদিগের নিকট বঙ্গ-  
বিজ্ঞেতা, চিত্তবিনোদিনী, কাননকুমার এবং  
দীপান্বিতা প্রভৃতি কএকখানি উৎকৃষ্ট  
বাজালা উপন্যাস সমালোচনার জন্য র-  
হিয়াছে। আমরা সকল গুলি আদ্যো-  
পান্ত পড়িতে পারি নাই বলিয়া মাসিক  
সমালোচনা দ্বারা ঐ সকল গ্রন্থের বিড়-  
ম্বনা করিতে সাহস পাই নাই। ইচ্ছা  
আছে, যে কয়খানি উপন্যাস বাঙ্গালীর  
নিকট প্রেরিত হইয়াছে, তত্তাবতের পরস্পর  
তুলনা করিয়া শীঘ্রই একটি প্রবন্ধ লিখিব,  
এবং কল্পিতক সম্বন্ধেও আমাদিগের যাহা  
বিশেষ বক্তব্য আছে, ঐ তুলনায় তাহা  
প্রকাশ করিব। কিন্তু আমরা এখানিকে  
যখন ভূয়োভূয়ঃ পাঠ করিয়াছি, এবং পাঠ  
করিবার সময়ে প্রত্যেক বারই এক নূতন  
আমোদে আমোদিত, এবং নূতন আনন্দে  
আপ্লুত হইয়াছি, তখন পাঠকসমাজে ই-  
হার পরিচয় দিতে বিলম্ব করা অনুচিত  
বোধ হইতেছে। আমাদিগের বিবেচনায়  
কল্পিতক বাঙ্গালাভাব্য একখানি অদৃষ্ট-  
পুঙ্খ আভরণ, এবং ইহার রচয়িতা বাঙ্গালি  
মাত্রেই কৃতজ্ঞতাভাজন। উপন্যাস-লে-  
খকদিগের মধ্যে কেহ সৌন্দর্য্যের অতুল

ছবি আঁকিয়া, এবং সেই ছবি অতি কো-  
শলের সহিত জননমাজে প্রদর্শন করিয়া  
সমাজের উন্নতি সাধন করেন; কেহ মা-  
নবচরিত্রের দোষনিচয়কে পুঙ্খানুপুঙ্খ  
রূপে বর্ণনা করিয়া এবং বর্ণনার সঙ্গে  
সঙ্গে দৃষ্টান্তভেদের নায় বিজ্ঞপ ক-  
রিয়া, মনুষ্যকে অকলঙ্ক ও উন্নত ছই-  
বার উপদেশ দেন। এদেশে পূর্বোক্ত  
শ্রেণির আখ্যায়িকদিগের মধ্যে স্মরামপ্র-  
সিদ্ধ জীযুক্ত বাবু বক্রিমচন্দ্র চট্টোপা-  
ধ্যায় সর্ব্বাংশে সকলের শিরঃস্থানীয়,  
এবং শেখোক্ত শ্রেণির লেখকদিগের  
মধ্যে বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ই স-  
র্ব্বাংশে অর্থাৎ পাইবার যোগ্য এবং সক-  
লের আগ্রগণ্য। ইন্দ্রনাথবাবুকে আমরা  
সাধারণ লেখকদিগের মধ্যে গণনা করি  
না। প্রকৃতি তাঁহাকে অতি উচ্চ শ্রে-  
ণির শক্তি দিয়াছেন, এবং এই কল্পিতক  
তাঁহার প্রথম স্রষ্টি হইলেও, ইহাতেই সেই  
শক্তির প্রচুর পরিচয় রহিয়াছে। কালে  
তাঁহার শক্তি কিরূপ বিকাশ লাভ ক-  
রিবে, এবং বাঙ্গালা সাহিত্য তাঁহা দ্বারা  
কিরূপ অলঙ্কৃত হইবে, তাহা কল্পিতক পাঠ  
করিলেই ভাবপ্রাণী বিচক্ষণ ব্যক্তিরা অ-  
নুমান করিতে পাইবেন।



ভাষার পরিস্ফুটতা সাধন বিষয়েও ইন্দ্রনাথবাবুর অসামান্য ক্ষমতা আছে। তাঁহার বান্ধালা প্রগল্ভা রমণীর ন্যায় পরিস্ফুটতা, অথচ ককণা ব্রহ্মদয়া ;— পণ্ডিতার ন্যায় সদালাপে প্রবীণ, অথচ সারস্বতী,--এবং যারপরনাই স্নেহচতুরা, অথচ সলজ্জমধুরা। যাহারা বান্ধালা ভাষাকে বৈরাগ্যের ভট্টাচার্য্যের ভাষালোচনা রক্ষা গ্রহণের ন্যায় সামুদায়িক স্বরে, কটমট শব্দ সহকারে কথা কহিতে দেখিলেই মুখী হন, তাঁহারাই হয়ত কল্পতরুর অনেক স্থান পড়িয়া, নরেন্দ্রের পিসী চাকুরাণীর মত, ছায় কি হইল বলিয়া কপালে করাঘাত করিবেন, এবং মনের দুঃখে ফোটা ফোটা চক্ষের জল ফেলিয়া বিলাপ করিতে রহিবেন। কিন্তু সোভাগ্যের বিষয় এই, এইরূপ স্বাদশক্তিশূন্য, উন্নতিবিমুখ অরসিকের সংখ্যা বড় ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে, এবং যাহাতে বান্ধালা ভাষা, কুপোদ্ভবের ন্যায় নিকর না রহিয়া, বর্ষাকালীন স্রোতস্বিনীর ন্যায় স্বচ্ছ, ক্রোধ এবং আশা, উৎসাহ ও আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া তর তর বেগে প্রবাহিত হয়, ইহাই আধুনিক মূল্যবান ব্যক্তির অস্তরের সাহিত্য কামনা করিতেছেন। কল্পতরুর ভাষার তরঙ্গ না থাকিলেও তীব্র-বেগ আছে, এবং কোন কোন স্থলে আবর্তের বৈচিত্র্য আছে।

২। রামায়ণ। মহর্ষিবাল্মীকিপ্রণীত মূলসংস্কৃতহইতে জীরাঙ্কুর রায়

কর্তৃক বান্ধালা পদ্যে অনুবাদিত। সতীক। কলিকাতা, ৩৭ নং যেছুয়া বাজার স্ট্রীট, আলবার্ট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বাল্মীকির সপ্তকণ্ঠ রামায়ণ অমৃতের মাতটি অক্ষয় প্রজবল। এই রাম-রস-সুধা-প্রবাহে অবগাহন করিয়া কালিদাস কীর্তি-শৈল্যের অত্যাচ্যতম শিখরে আরুঢ় হইয়াছেন, ভবভূতি ভারতীয় সাহিত্যজগতে, দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়াছেন এবং কৃত্তিবাস ও কবি-জ্ঞান-বরেন্দ্র না হইয়াও বঙ্গের সর্বত্র গ্রন্থ-পিঞ্জরকর কোকিলের ন্যায় আদরে রঞ্জিত। ফলতঃ রামায়ণের তুলনা নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, বাল্মীকি রামায়ণ যে কি পদার্থ, তাহা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অবগত নহেন। এদেশের কথক আর গায়কেরা রামায়ণের বিস্তার রূপান্তর করিয়াছেন, এবং কৃত্তিবাস পণ্ডিতও কথকদিগের কথার উপরই প্রাধান্যতঃ নির্ভর করিয়া, অনেক স্থলে একে আর করিয়া তুলিয়াছেন। আজি আমরা জীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়ের এই পদ্য রামায়ণ পড়িয়া আশা করিতেছি যে, বান্ধালির উল্লিখিত দুঃখ এত দিনে দূর হইতে চলিল। পণ্ডিতবর জীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মূল বাল্মীকীর গদ্য অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, কবির রাজকৃষ্ণ রায় বাল্মীকীর রামায়ণের পদ্য অনুবাদ করিয়া অমর হইতে চলিলেন।

রাজকৃষ্ণ বাবু কিরূপ শ্রুতি ও শ্রুতলেখক, তাহা বান্ধবের পাঠকবর্গ অবগত

ছেন ; এবং যাঁহারা তাঁহার অবসর-স-  
জিনী প্রভৃতি কাব্যনিচয় পাঠ করি-  
ছেন, তাঁহারা তাঁহার ললিতপদাবলী  
এবং সরস ভাবলহরী দেখিয়াও, অনেক  
য়েই, যারপর নাই প্রীত হইয়াছেন।

রাং, ইহা না বলিলেও চলে যে, তাঁহার  
ই অনুবাদ সর্ব্বথা কবি নামেরই উপযুক্ত  
বে। কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদ বড় ক-  
ম কার্য্য। রাজকৃষ্ণ বাবু অক্ষরে অ-  
ক্সরে অনুবাদ করিতে গিয়াও, যে, তাঁহার  
ই পদ্য রামায়ণে ছন্দের মাধুর্য্য, শ-  
ব্দর প্রাঞ্জলতা এবং শব্দবিন্যাসের কবি-  
বিনোদিত চাতুরী ও কৌশল রক্ষা করিতে  
পারিতেছেন, ইহা সামান্য প্রশংসার নি-  
মিত্ত নহে। আমরা অনেক স্থলে মূলপ্র-  
কায় কবিতা পড়িয়া, পরে তাহার অনু-  
বাদ পড়িয়াছি ; এবং অনুবাদ যে এইরূপ  
শুণ্য অথচ সর্ব্বজ্ঞানব্দের হইতে পারে,  
ইহা দেখিয়া, রাজকৃষ্ণ বাবুকে সত্য সত্যই  
মুগ্ধকণ্ঠে সাধুবাদ দিয়াছি।

এই পদ্য রামায়ণ প্রচলিত মাসিক প-  
ত্রিকাদির ন্যায় মাসে মাসে নানাবিধ টী-  
কা অলঙ্কৃত হইয়া খণ্ডশঃ প্রকাশিত হই-  
তেছে। ইহার বার্ষিক মূল্য ডাক মাংসুল স-  
মেত ৩৯/ আনা। যাঁহারা স্বস্বগৃহে বাঙ্গী-  
তের অমৃতরসাত্ত্বিক পবিত্র মূর্ত্তির প্র-  
তিকৃতি স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা  
করেন, আমাদিগের ভরসা আছে, তাঁ-  
হারা অবশ্যই ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ  
করিবেন।

৩। শাস্ত্রপ্রকাশঃ। বেদান্ত শাস্ত্রম্।  
অরৈতানুভূতিঃ।—জিগোবিন্দ পাদাচার্য্য  
স্বামিবিরচিত।—জিগগমোহন তর্কালঙ্কা-  
রেন ভাষান্তরিত।—আমরা শাস্ত্রপ্রকা-  
শের চতুর্থ ও পঞ্চম সংখ্যা দেখিতে  
পাইয়াছি। পণ্ডিতবর জিগুক্ত তর্কালঙ্কার  
মহাশয় শাস্ত্রার্থ প্রকাশে যেরূপ যত্নশীল  
হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আমরা ধন্য-  
বাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। তাঁহার  
বাঙ্গালা অনুবাদ উৎকৃষ্ট।

৪। জ্ঞানাত্ত্বম। জিগিশানন্দ্র বিদ্যা-  
রত্ন প্রণীত ইহাতে বালকদিগের পাঠোপ-  
যোগী কতগুলি কবিতা বিনিবেশিত হ-  
ইয়াছে। কবিতাগুলি নীতিগর্ভ ও সমুদ্রপ-  
দেশযুক্ত। আমাদিগের বিবেচনায় এই  
পুস্তকখানি বাঙ্গালা বিদ্যালয় সমূহে ব্য-  
বহৃত হওয়া উচিত।

৫। কবিতামালা। জিগিজকৃষ্ণ মু-  
খোপাধ্যায় এম এ, বি এল বিরচিত। আমরা  
রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস এবং ক-  
তিপয় পদ্য প্রবন্ধ পড়িয়া তাঁহার বিস্তর প্র-  
শংসা করিয়াছিলাম। আজি দেখিলাম, তাঁ-  
হার কবিতামালাও একান্ত মনোহারিণী। ব-  
স্তুতঃ একাদারে এতগুণ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না।  
এই কবিতামালার মধ্যে আমরা যেটি প-  
ড়িয়াছি, সেটিই আমাদিগের নিকট প্রী-  
তিপ্রদ বোধ হইয়াছে এবং কবির কল্পনা-  
চাতুর্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য উভয়ই আমা-  
দিগকে মুগ্ধপং আনন্দিত করিয়াছে। আ-  
মরা নিম্নে স্বক্টি নামক কবিতার কএকটি

পংক্তি উজ্জ্বল করিলাম । মুকুটসম্পন্ন  
পাঠকবর্গ এই করুটি পংক্তি পাঠ করিলেই,  
রাজকৃষ্ণ বাবুর শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয়  
পাইবেন ।

ধূ ধূ ধূ করিত অনন্ত আকাশ,  
নাহি ছিল তাহে রবির প্রকাশ,  
নাহি ছিল শশী, নাহি ছিল তারা,  
নাহি ছিল ছুটিত আলোকের ধারা,  
পুলকে প্রকাশি রূপের রাশি ।  
না হাসিত দিবা কিবা বিভাবরী,  
না খেলিত সন্ধ্যা-লাবণ্য-লছরী,  
না আসিত উষা অদিতি নন্দিনী,  
মুকুতা-জড়িত-কুণ্ডল মাণিক্য,  
প্রফুল্ল বদনে মধুর হাসি ।

না ছিল বসন্ত, ফুল মালা গলে,  
রসে ডগমগ নব ভাব বলে ;  
না ছিল নিদাঘ প্রতাপে প্রথর,  
অথবা বরষা, জলদ-অশ্রু,  
কণ্ঠে ঝল মল বিজলী হার ।  
না ছিল শরৎ কাশ-বিকশিত,  
বিমল-গগন-শশাঙ্ক-ভূষিত ;  
না ছিল হেমন্ত কুজবাটিকা অঙ্গে,  
অথবা শিশির, তুষার-তরঙ্গে,  
স্বলিত-শরীর-সজ্জিত-ভার ।

নাহি বিরাজিত সুখদা মেদিনী,

পুষ্প তরু লতা শৈল শৈবলিনী ;  
না ছিল মধুর বিহঙ্গম-রব,  
এ মহীমণ্ডল-মুকুট মানব,  
বিচিত্র জীবন-প্রবাহ-রঙ্গ ।  
না ছিল মরণ কিবা অমরতা,  
নাহি প্রকাশিত দু্যলোক দেবতা,  
নাহি ছিল এই বিশ্বের আভাস,  
ধূ ধূ ধূ করিত অনন্ত আকাশ,  
অনন্ত কালের বিরীট অঙ্গ ।

দশ দিক্ ব্যাপি আছিল তিমির,  
অনাদি অনন্ত গাঢ় মগন্ধীর,  
অকূল অতল অসংখ্য অপার,  
অকৃতি বিহীন ভীম পারাবার,  
ভাবিলে হৃদয়ে উপজে ভয় ।  
অজ্ঞাত অজ্ঞেয় অগত কারণ  
সে তিমির মাঝে নিহিত মতন  
আছিল অনন্ত আকাশে বিলীন  
অতরঙ্গ-কাল-সলিলে আসীন,  
অনন্ত শয়নে শক্তি ময় ।

৬ । জাতীয়-উদ্দীপনা । এই পুস্ত-  
খানিতে এদেশের কতিপয় উৎকৃষ্ট কবি  
কএকটি অতি উৎকৃষ্ট কবিতা সংকলিত  
হইয়াছে । ইহারা বাঙ্গালী কবিতা  
ড়িতে ভাল বাসেন, এখানি তাঁহাদের  
প্রয়োজনে আনিবে । অঙ্গের মধ্যে  
একখানি উপদেশ সংগ্রহ ।

